কথা অমৃতসমান

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।

যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।।

ধর্মশাস্ত্র বলুন কিংবা অর্থশাস্ত্রই বলুন, কামশাস্ত্রই বলুন অথবা মুক্তির শাস্ত্রই বলুন—যা এই মহাভারতে আছে, তা অন্যত্রও আছে ; আর যা এখানে নেই, তা অন্য কোথাও নেই।

9 788129 519153

মহাভারত মানে মহা-ভারত। যা এখানে নেই, তা অন্য কোথাও নেই। আর আর এখানে যা আছে, তা অন্য কোথাও নিশ্চয়ই আছে। আমরা এই নিরিখেই গ্রন্থটাকে দেখতে চেয়েছি—তারা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে। আজকের এই সর্ব-সমালোচনামুখর, ঈর্ষাসূয়ায় হন্যমান শতাব্দীর মধ্যে দাঁড়িয়ে শত শত শতাব্দী-প্রাচীন আরো এক সাসূয় সমাজের কথা বলতে লেগেছি, যদিও সেখানে প্রাতিপদিক বিচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ বার বার নিনাদিত হয় এবং সেটা ধর্ম—সে ধর্ম একদিকে নীতি এবং নৈতিকতা, অন্যদিকে সেটা 'জাস্টিস', শৃঙ্খলা, 'অরডিন্যান্স' এমন কী আইনও। মহাভারত অন্যায় এবং অধর্মকে সামাজিক সত্যের মতো ধ্রুব বলে মনে করে, কিন্তু সেটা যাতে না ঘটে তার জন্য অহরহ সচেতন করতে থাকে প্রিয়া রমণীর মতো। আমরা সেই মহা-ভারতকথা বলেছি এখানে, যা শতাব্দীর প্রাচীনতম আধুনিক উপন্যাস।

ISBN : 978-81-295-1915-3

এখনকার বাংলাদেশের পূর্ব-প্রারব্ধের মতো পাক-চক্র ছিল এক। লেখকের জন্ম সেখানে পাবনা জেলার গোপালপুর গ্রামে, ১৯৫০ সালে। কলকাতায় প্রবেশ ৫৭ সালে। শিক্ষাগত উপাধিগুলি ব্যাধির মতো সামনে-পিছনে আসতে চাইলেও বর্তমান লেখক সেগুলিকে মহাভারত-পাঠের সোপান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে আস্বাদন মহাভারতের স্বাধ্যায়-অধ্যয়নের মধ্যে আছে, তার প্রতিপদ-পাঠ বুঝতে গেলে অন্যান্য জাগতিক বিদ্যার প্রয়োজন হয়। লেখকের জীবন চলে শুধু মাধুকরী বিদ্যায়, সাংগ্রাহিক আস্বাদনে। লেখালেখির জীবনে এসে পড়াটা একেবারেই আকস্মিক ছিল। প্রবীণ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর লেখক জীবনের পরিণতি ঘটিয়েছেন বাচিক তিরস্কারে এবং বাচিক পুরস্কারে। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম লেখা এবং আনন্দ থেকে তাঁর প্রথম বই এককালে শিহরণ জাগাত লেখকের মনে। এখন শিহরণের বিষয়—মহাভারত-পুরাণের অজ্ঞান-তমোভেদী এক-একটি বিচিত্র শব্দ। গুরুদাস কলেজে অধ্যাপনা-কাল শেষ করে এখন মহাভারত-পুরাণের বিশাল বিশ্বকোষ রচনায় ব্যস্ত আছেন লেখক।

কথা অমৃতসমান

১

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

কথা অমৃতসমান

১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KATHA AMRITSAMAN (Vol-I)
by NRISINGHAPRASAD BHADURI
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 500.00

ISBN : 978-81-295-1915-3

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৩, অগ্রহায়ণ ১৪২০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৫০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

যার অবিরাম পিষ্ট-পেষণী প্রক্রিয়ায়
এই গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত প্রকাশনার পরিণতি লাভ করেছে,
আমার সেই প্রিয় পুত্র অনির্বাণ ভাদুড়ী-র জন্য॥

সিন্ধু-বিন্দু

২০১০ সালে পুজোর পর প্রখ্যাত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসেছি। সে আড্ডায় অবধারিতভাবে মহাভারতের প্রসঙ্গ চলে আসে। নানা কথার মধ্যে হঠাৎই ঋতু বলে — তুমি আমাদের জন্য লিখতে আরম্ভ করো 'রোববার'-এ। আমি এই কাগজের সম্পাদনার দায়িত্বে আছি। তুমি নিশ্চিন্তে লেখো। মহাভারত বুঝিয়ে দাও আমাদের। আমি বলেছিলাম, মহাভারত কখনো নিশ্চিন্তে লেখা যায় না। এই মহাকাব্যের বিশালতা এবং গভীরতা দুটোই এত বেশী যে, আমি যেভাবে মহাভারত বোঝাতে চাই, সেটা বোঝাতে গেলে জীবন কেটে যাবে। ঋতু বলল — লেখার মতো করে লেখো, ভেবে নাও তোমার চোখের বাইরে বসে-থাকা শত শত পাঠকের আকুল জিজ্ঞাসা। তাদের ছোট করে দেখো না। তাদের প্রশ্ন তুমি তৈরী করবে, তুমিই উত্তর দেবে।

ঋতুর কথা আমি মেনেছি। রোববারে আমার 'কথা অমৃতসমান' চলছে, কিন্তু এরই মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় পাঠক আমাদের ছেড়ে চলে গেছে বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে। ঋতুকে বলেছিলাম —আমি আগেও 'মহাভারত-কথা' লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তৎকালীন 'বর্তমান' পত্রিকার সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত-মশায়ের অনুরোধে। সাড়ে তিন বছর ফি-হপ্তায় লিখে আমি পাণ্ডবদের জতুগৃহ-দাহ পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলাম। তদবধি ভেবেছি—আমাকে তিনি অশেষ করেননি, এমন লীলা আমার ক্ষেত্রে হবেও না। কাজেই আবার নতুন করে মহাভারতকে পাকড়ে ধরা কী ঠিক হবে? ঋতু বলেছিল—তোমরাই কীসব বলো না—যারা বিদ্যে লাভ করতে চায়, যারা খুব টাকা-পয়সা পেতে চায়, তারা নিজেদের অজর, অমর মনে করে। তুমি তাই ভেবে লেখা আরম্ভ করো।

ঋতুকে আমি ফেলতে পারিনি। 'কথা অমৃতসমান' আরম্ভ করেছিলাম 'রোববার'-এ। এখনও চলছে, আমিও চলেছি। এরই মধ্যে একটা নতুন

প্রয়োজন দেখা দিল। একদিন 'দে'জ পাবলিশিং'-এর নব্যযুবক অপু—সুধাংশুদের যোগ্য উত্তরাধিকারী, আমার কাছে এসে 'কথা অমৃতসমান' ছাপতে চাইল বই আকারে। আমি বললাম—শর্ত আছে। এখন 'রোববারে' যে লেখা চলছে, সেটা আমার আগের লেখার 'কনটিনিউয়েশন'। কাজেই মহাভারত নিয়ে যদি এই বই ছাপতে চাও, তবে আগে বরুণদার দপ্তরী লেখাটা ছাপতে হবে। অপু বলল—তাই দিন—'আমরা তিন-চার খণ্ডে 'কথা অমৃতসমান' বার করবো।' ওর এই সাহসটা আমার ভাল লেগেছিল। এখন লেখকদের ওপর হুলিয়া আছে—লেখা পুরো শেষ করুন, তবে ছাপাবো। এটা কী সমরেশদার 'দেখি নাই ফিরে'-র ফলশ্রুতি কীনা কে জানে! লেখকের বুঝি মরেও শান্তি নেই। তবে কিনা মহাভারত তো সত্যিই আয়ু-শেষ-করা মহাকাব্য। ধন-জন, মান-যশ, আশা-আকাঙ্ক্ষার আকস্মিক ছেদে যে শান্তরসের বৈরাগ্য তৈরী হয়, সেই তো মহাভারতের চরম প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। কাজেই মহাভারতের কথা শেষ না হতেই আমিও যে ঋতুর মতো কোথাও চলে যাবো না, এ-কথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে? এখানে অপু সাহস দেখিয়েছে প্রকাশক হিসেবে।

আমি যে সেই বরুণদার সময় থেকে মহাভারতের বারুণী নিয়ে বসে আছি, তার একটা কারণ আছে। আমার মনে হয়েছে—মহাভারতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং তা এমন করেই যাতে মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে বসে বুঝতে পারে যে, মহাভারত এক চলমান জীবনের কথা বলে। এটা ইলিয়াড-ওডিসির মতো সামান্য মহাকাব্য নয়। মহাভারতীয় ঘৃণা, মান, অপমান, ভালবাসা, লজ্জা, ভয় এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এটা তো ঠিকই যে, মহাভারতের মূল কাহিনীটাই যদি ধরি শুধু, তাহলেও সেখানে বৈচিত্র্য কিছু কম নেই। অথচ সে বৈচিত্র্য কল্পনার মতো বায়ুভূত নিরালম্ব নয়। গ্রামে-গঞ্জে তিন পুরুষ আগে জমির উত্তরাধিকার নিয়ে শরিকি বিবাদ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন-মহাভারতের কাহিনী কোনো অমূলক অবাস্তব থেকে উঠে আসেনি। ভারতবর্ষের আইনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যাঁরা হতেন, সেখানে কাকা, ভাই কিন্তু জন্মজাত শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। এই বাস্তব থেকে মহাভারতের কাহিনী আরম্ভ হয়। অথচ উপপাদ্য জায়গাগুলিতে এমন সব কাহিনী একের পর এক আসতে থাকে, যা 'আজিও হইলেই হইতে পারিত'। অর্থাৎ সেখানেও বাস্তব। মহাভারত কখনোই শুধু কাহিনী বলে না, সে তার সমসাময়িকতার সঙ্গে প্রাচীন পরম্পরাও উল্লেখ করে ব'লে কথা প্রসঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতিতত্ত্ব, বর্ণব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থান, নীতি-অনীতি এমনকি যৌনতার কথাও পরিষ্কারভাবে জানায়। ফলত মহাভারতের কাহিনী একসময় এক বিরাট ইতিহাস হয়ে ওঠে।

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই গ্রন্থের মধ্যে যে নীরসিংহী কথাকথা আরম্ভ হয়েছে, তার প্রয়োজন শুধু এইটুকুই যে, আমরা মহাভারতের নায়ক-প্রতিনায়কদের তাঁদের গ্রাহ্য-বর্জ্য বৃহত্তর সমাজ এবং রাজনৈতিক

পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করিয়ে নিতে চাই। এটা করতে গিয়ে আমি কখনো 'দিলেতাঁত'-দের (dilettante) পথে চলিনি, অবশ্য এমনও মহান ভ্রান্তিতেও আমি বিশ্বাস করিনা যে, একবিংশ শতাব্দীর পরিশালিত সংস্কারে আমার সাংস্কৃতিক মানস দিয়ে তৎকালীন 'বিরাট' এবং 'বিশাল'-এর সমালোচনা করবো। বরঞ্চ মহাভারতের অন্তর্গত প্রমাণ দিয়েই আমি সেই সমাজের অন্তর্বেদনা, সুখ এবং আধুনিকতার কথা আমি ধরতে চেয়েছি—কখনো মহাভারতীয় মূলকে অতিক্রম না করে।

এটা ঠিক যে, 'ইনটারটেক্সচুয়ালিটি' নিশ্চয়ই আমার কাছে খুব বড়ো একটা ব্যাপার, কেননা এটা মহাভারত, এবং এটাও আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, মহাভারতের মধ্যে মাঝে-মাঝেই যে প্রক্ষেপগুলি ঘটেছে, সেটা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পরম্পরা বোঝার পক্ষে আরো বেশী সুবিধে দেয়, কাজেই মহাভারতকে যাঁরা 'কলোনিয়াল হ্যাংওভারে' পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের চেষ্টা-পরিশ্রমের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল, কিন্তু তাঁদের মানসিকতা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত প্রক্ষেপ যা কিছু এখানে ঘটেছে, তার প্রাচীনত্বের বিচার করাটা অতটা সহজ নয়, যতটা পূর্বাহ্নেই সংকল্পিত গবেষককুল মনে করেন। আর ওই যে এক প্রবাদ—'তাতে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয় না'—এই প্রবাদটা চিরকালীন মানুষের এই মানসটুকু বুঝিয়ে দেয় যে, প্রক্ষেপবাদিতার পক্ষবাদী পণ্ডিতেরা ব্যবচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে ভারতবর্ষের এক বিরাট সময়কে শুধু কাটাছেড়া করেই পণ্ডিতমানিতা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাতে লেখনীর বামতা তৈরী হয়। কবিজনোচিত বেদনাবোধ সেখানে পদে-পদে নিগৃহীত হয়। আমরা এই নৌকায় সাগর পাড়ি দিতে চাই না।

মহাভারত যেহেতু একটা বৃহৎ সময় ধরে আমাদের প্রাচীনদের চলার ইতিহাস, তাই মহাভারত বুঝতে গেলে প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে তার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, জাতি-বর্ণ, ভোজনাভ্যাস এবং ভোজ্য সবই জানতে হয়। আমরা সেই সর্বত্রিক দিগ্‌দার্শনিকতার মধ্যে মহাভারতের কাহিনী প্রবেশ করিয়েছি মণিমালার মধ্যে সুতোর মতো। অথবা কাহিনীর মধ্যে তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে এসেছি ব্যক্তিচিত্রের পিছনে ক্যান্‌ভাসের মতো। তপোবনবাসিনী শকুন্তলার ছবি আঁকতে গেলে তাঁর পূর্ণকুটীরে পাশ দিয়ে 'সৈকত-লীন-হংস-মিথুনা স্রোতোবহা মালিনী' নদীকে আঁকতেই হবে। আঁকতে হবে কুটীরের পাশে বড়ো গাছের ডালে শুকোতে দেওয়া ঋষিদের বল্কলবাস আর আঁকতে হবে অদূরে অলসে দাঁড়িয়ে থাকা এক কৃষ্ণসার মৃগ, যার বাম চোখে হরিণী তার শিঙ্‌ দিয়ে চুলকে দিচ্ছে সান্নিধ্যের প্রশ্রয়ে—শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্‌। এমন লিখেছেন কবি কালিদাস।

তার মানে, আমাদের বিশ্বাস—মহাভারতে কৌরব-পাণ্ডবদের জীবন-চর্যা দেখাতে গেলে মথুরা-মগধ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাল-কেকয়দের কথাও

বলতে হবে। বলতে হবে অনন্ত প্রান্তিক জীবনের কথাও। আমরা সেইভাবেই কথা আরম্ভ করেছি। এর শেষ কোথায় জানি না। তবে আমার মাথার ওপর সেই ত্রিভঙ্গিম প্রাণারাম মানুষটি আছেন, আমার আয়ু এবং আমার অক্ষয়-গতি সবটাই নির্ভর করছে সেই অক্ষর-পুরুষের ওপর। তাঁর বাঁশীর সুর যতদিন শুনতে পাবো, ততদিনই হয়তো চলবে এই মহাভারতী লেখনী।

আমার এই গ্রন্থের মধ্যে সহায়িকার গ্রন্থি আছে অনেক। কেউ সেইকালে আমার হিজিবিজি সাপ্তাহিকী লেখা পুনরায় 'কপি' করে সাজিয়ে দিয়েছেন, যেমন তাপসী মুখোপাধ্যায়। তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন, তবে শিষ্যাও। প্রাথমিক প্রুফ দেখে দিয়েছেন—আমার ছাত্রী সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির শব্দ এব শৈলী-পরিবর্তনের দায়িত্ব থেকে পূর্ণ গ্রন্থটির পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আমার স্ত্রী সুষমা। চাকরী ছাড়ার পর তিনি কাজ পাচ্ছিলেন না, কিন্তু এই গ্রন্থ ক্ষেত্রে তিনি আমার অকাজ পেয়েছেন প্রচুর—আমার নাতি ঋষভ ভাদুড়ীর প্রচুর লাফালাফি সেই অকাজ বাছাইতে সাহায্য করেছে বলে তাঁর কাছে শুনতে পাই। প্রবীণ শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে আমার প্রণাম। অবশেষে সেই অপু—দে'জ পাবলিশিং-এর নব্য যুবক—তাঁকে অশেষ স্নেহ জানাই ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ার জন্য, ওপারে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর গতির ওপর আমার ঠাকুর কৃষ্ণের আশীর্বাদ থাকুক।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

এক

নৈমিষারণ্য। ইতিহাস-পুরাণ খুললেই দেখবেন নৈমিষারণ্য। মহর্ষিদের তপোবন। সেখানে বারো বচ্ছর ধরে যজ্ঞ হবে এবং সেই যজ্ঞ চলছে। মহাভারত বলবে—এটি কুলপতি শৌনকের আশ্রম। শুধু মহাভারত কেন আঠারোটা মহাপুরাণের বেশির ভাগটার আরম্ভেই সেই একই কথা—নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের তত্ত্বাবধানে বারো বচ্ছরের যাগ-যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। নানা দেশ থেকে নানা মুনি-ঋষি এসেছেন এখানে। যজ্ঞ চলছে। ঋগ্‌বেদের ঋত্বিক্ ঋক-মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করছেন। সামবেদীরা সাম-গান করছেন। যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু—ইন্দ্রায় বৌষট, অগ্নয়ে স্বাহা—করে আগুনে আহুতি দিচ্ছেন। আর অথর্ব-বেদের পুরোহিত 'ব্রহ্মা' এই বিশাল যজ্ঞের সমস্তটার ওপর দৃষ্টি রাখছেন। কিন্তু সবার ওপরে আছেন কুলপতি শৌনক। বারো বচ্ছরের যজ্ঞ। সোজা ব্যাপার তো নয়। সমস্ত দায়টাই তাঁর। তিনি কুলপতি। মহাভারতের ভাষায়—নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে।

পিতৃকুল, মাতৃকুল, পক্ষিকুল, এমনকি কুলগুরু এরকম অনেক কুলের কথা শুনেছি, কিন্তু কুলপতি কথাটা তো শুনিনি। বাবা-টাবা গোছের কেউ হবে বুঝি। পণ্ডিতেরা বলবেন—শুনেছ, মনে নেই। এমনকি এই ঘোর কলিযুগে কুলপতি তুমি দেখেওছ। খেয়াল করে দেখো—কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলে, রাজার সঙ্গে শকুন্তলার তখনও দেখা হয়নি। ঋষি বালকেরা রাজাকে মহর্ষি কণ্বের খোঁজ দিয়ে বলল, এই তো মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম দেখা যাচ্ছে—এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতেরনুমালিনীতীরম্ আশ্রমো দৃশ্যতে।

যখন এসব পড়েছিলুম, তখন সিদ্ধবাবা, কাঠিয়াবাবা প্রমুখের সাম্যে কাশ্যপ-কণ্বকেও একজন মুনি-বাবাই ভেবেছিলুম। পরে সত্যিকারের পড়াশুনোর মধ্যে এসে দেখেছি—কুলপতি শব্দটার অর্থ নৈমিষারণ্যের মতোই বিশাল। এবং সত্যি কথা, কুলপতি গোছের মানুষ আমি

দেখেওছি। কুলপতি হলেন এমনই একজন বিশাল-বুদ্ধি অধ্যাপক ঋষি, যিনি নিজের জীবনে অন্তত দশ হাজার সংযমী বৈদিককে খাইয়ে-পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন—মুনীনাং দশ-সাহস্রম্ অন্নদানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ—তা দশ হাজার না হলেও অনেক ছাত্রকে বাড়িতে রেখে, খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করে পড়াশুনোর সুযোগ করে দিয়েছেন—এমন অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আমি দেখেছি এবং অনেক অব্রাহ্মণ বিশাল-বুদ্ধি মানুষও আমি দেখেছি, যাঁরা এই কুলপতির গোত্রে পড়তে পারেন।

শৌনক এই মাপেরই মানুষ। হয়তো আরও বড়। কারণ বৃহদ্দেবতার মতো বৈদিক গ্রন্থ তাঁরই রচনা। মহাভারত কিংবা অন্যান্য পুরাণের আরম্ভে কুলপতি শৌনককে আমরা দেখেছি, তিনি হয়তো বৃহদ্দেবতার লেখক নন, কিন্তু তিনি যে বিশাল এক মহর্ষি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ তা নইলে সমস্ত পুরাণকারই এই নৈমিষারণ্যের কুলপতি শৌনকের নাম ব্যবহার করতেন না।

কুলপতি কণ্বের আশ্রম যেমন মালিনীর তীরে, কুলপতি শৌনকের আশ্রমও তেমনই গোমতীর কোলঘেঁষা। গোটা ভারতে নৈমিষারণ্যের মতো এত বিশাল এবং এত সুন্দর তপোবন বোধহয় দ্বিতীয়টি ছিল না। এখনকার উত্তরপ্রদেশের লখনউ ছেড়ে মাইল পাঁচেক উত্তর-পশ্চিমে গেলেই দেখা যাবে তির-তির করে বয়ে যাচ্ছে গোমতী নদী। বর্ষাকালের জলোচ্ছ্বাস যাতে তপোবনের নিরুদ্বেগ শান্তি বিঘ্নিত না করে, তাই নৈমিষারণ্যের তপোবন গোমতী নদী থেকে একটু তফাতে, বাঁ-দিকে।

জায়গাটাও ভারি সুন্দর। ময়ূর কোকিল আর হাঁসের ছড়াছড়ি। গরু আর হরিণ একই সঙ্গে চরে বেড়াচ্ছে, অথচ বাঘ-সিংহের হিংসা নেই। শান্ত আশ্রম—শান্তস্বভাবৈর্ব্যাঘ্রাদ্যৈরাবৃতে নৈমিষে বনে। এই নৈমিষারণ্যে এলে কোটি-তীর্থ ভ্রমণের পুণ্য হয়। 'নিমিষ' মানে চোখের পলক। পুরাণ কাহিনীতে শোনা যায়, গৌরমুখ মুনি নাকি এখানে এক নিমেষে দুর্জয়-দানবের সৈন্য-সামন্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন—যতস্তু নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্— সেই থেকেই এই জায়গার নাম নৈমিষারণ্য। সুপ্রতীকের ছেলে দুর্জয় রাজত্ব করতেন এই অঞ্চলে। অসামান্য তাঁর শক্তি। তিনি একদিন শুনলেন যে, তাঁরই রাজ্যের অধিবাসী গৌরমুখ মুনির কাছে নাকি চিন্তামণি আছে। সেই চিন্তামণির কাছে যা চাইবে তাই পাবে। দুর্জয় দানব মণিটি চেয়ে পাঠালেন। মুনি দেখলেন—ওই মণি অপাত্রে পড়লে পৃথিবী এবং মানুষের ক্ষতি হবে অনেক। তিনি মণি দিলেন না।

কিন্তু দানব দুর্জয় মুনির এই পরার্থচিন্তা মানবেন কেন? তিনি সসৈন্যে মুনির আশ্রমে রওনা দিলেন মণির দখল নিতে। দুর্জয়কে দেখতে পেয়েই বিরক্ত গৌরমুখ চোখের নিমেষে পুড়িয়ে দিলেন তাঁর সৈন্যবাহিনী এবং স্বয়ং দানবকেও। দুর্জয়ের সেই ভস্মপীঠের ওপরেই গজিয়ে উঠল ঘন বন, যার নাম নৈমিষারণ্য।

এখন ওঁরা বলেন, নিমখারবন বা নিমসর। নিমসর নামে একটা রেল-স্টেশনও আছে ওখানে। নৈমিষারণ্য থেকে নিমখারবন বা নিমসর কী করে হল, ভাষাতত্ত্বের নিরিখে তা বোঝানো মুশকিল। তবে গোমতী নদী, যেমন নব-নব জলোচ্ছ্বাসে প্রতিদিন কূল ভেঙে নতুন চর তৈরি করে, তেমনই সাধারণের ভাষাও বহতা নদীর মতো নৈমিষারণ্য নামটিও ভেঙে-চুরে

নতুন নাম তৈরি করেছে। প্রথম কথা, সাধারণ মানুষ 'অরণ্য' বলে না, বলে 'বন'। এমনকি সাধারণ জনে এটাও খেয়াল করেনি যে, নৈমিষারণ্য দুটো শব্দের সন্ধি— নৈমিষ+অরণ্য। তাঁরা শুধু শেষের 'ণ্য'টাকে ছেঁটে দিয়ে প্রথমে বলতে আরম্ভ করেছিলেন নৈমিষার-বন, যেন নৈমিষার একটা কথা। আপনারা হয়তো জানেনই যে, 'ষ' বর্ণটাকে উত্তরভারতে অনেকই 'খ' উচ্চারণ করেন। 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' এই মন্ত্রটাকে বৈদিকরা অনেকেই 'পুরুখঃ' বলেন। কবিরা 'অনিমিষে' শব্দটাকে কাব্যি করে বলেছেন 'রইব চেয়ে অনিমিখে।' ফলে নৈমিষার-বন থেকে প্রথমে নৈমিখার-বন, আর তার থেকে নিমখার-বন শব্দটা বলতে আর কত সময় লাগবে। ছোট শব্দটা অর্থাৎ 'নিমসর' আরও সোজা। অর্থাৎ 'বন'টাকেও ছেঁটে দিন। থাকে নৈমিষার। তার থেকে সোজা করে নিমসর।

এই নিমসর, নিমখারবন বা নৈমিষারণ্যেই কুলপতি শৌনকের বারো বচ্ছরের যজ্ঞ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। কম কথা তো নয়। এক একটি বিশেষ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের জন্য একাধিক মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়েছেন। দিনভর ঋক্-মন্ত্রের উচ্চারণ, সামগান, যজ্ঞ-হোম, অগ্নি-সমিন্ধন, সোম-রস-নিষ্কাসন, আহুতি— এত সব চলছে। প্রতিদিনের অভ্যস্ত প্রক্রিয়ায় শান্ত-সমাহিত ঋষিরাও হাঁপিয়ে ওঠেন। তার ওপরে নিজেদের বিশেষ বৈদিক কর্মটি সাঙ্গ হওয়ার পর তাঁদের অবসরও জুটে যায় অনেক। তবু তো তখন অন্য মুনি-ঋষিদের সঙ্গে গল্প জোড়া চলে না। কেন না, একজনের কাজ শেষ হলে অন্যজনের বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ হয়।

তবে হ্যাঁ, দৈনন্দিন যজ্ঞক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা, ঋষিদের একঘেয়েমি অথবা তাঁদের অবসরের কথাগুলি মহাভারতে লেখা নেই। মহাভারতের কবির এসব কথা লেখা চলে না। মহাকাব্যের আরম্ভে তিনি শুধু জয়-শ্লোকটি উচ্চারণ করেই লিখে ফেলেছেন—বারো বচ্ছরের চলমান যজ্ঞ-ক্রিয়ার মধ্যেই এক পৌরাণিক এসে উপস্থিত হয়েছেন নৈমিষারণ্যে, শৌনকের তপোবনে। যে সে পৌরাণিক নন, একেবারে পৌরাণিকোত্তম লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা।

সেকালে লোমহর্ষণের মতো কথক ঠাকুর দ্বিতীয় ছিলেন না। জাতের বিচারে তিনি বামুনদের থেকে সামান্য খাটো, কেন না তাঁর জন্ম হয়েছিল বামুন-মায়ের গর্ভে, কিন্তু তাঁর বাবা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় কুলের যুদ্ধ-গৌরব আর বামুন-মায়ের শুদ্ধশীল বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ভাবনা এই সংকর-জন্মা ছেলেটির মনে এমন এক মিশ্রক্রিয়া তৈরি করেছিল যে, সে শুধু গল্প বলাই শিখেছে, গল্প বলাই তার প্রথম প্রেম। ক্ষত্রিয় হয়েও যার বাবা বামুনের ঘরের মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছিল, সেই ভালবাসার মধ্যেও গল্প ছিল, স্বপ্ন ছিল। গল্প আর স্বপ্নের মিলনেই সূত-জাতির জন্ম। লোমহর্ষণ সেই সূত-জাতির লোক।

সূতজাতি নাকি ভারতের প্রথম বর্ণসংকর। শোনা যায় রাজা পৃথু, যাঁর নামে এই পৃথিবী শব্দটি, সেই পৃথুর যজ্ঞে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির জন্য যে ঘৃতাহুতি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেই ঘিয়ের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের ঘৃতাহুতি মিশে যায়। এদিকে আহুতি দেওয়ার সময় বৃহস্পতির ঘৃতাহুতি হাতে নিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারিত হয়। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা, ক্ষত্রিয়ত্বই রাজার সংজ্ঞা। ফল যা হওয়ার তাই হল, এই হবির্মিশ্রণের ঘটনা থেকেই সূত জাতির উৎপত্তি। পৃথিবীর প্রথম বর্ণসংকর—সূত্যায়ামভবৎ সূতঃ প্রথমং বর্ণবৈকৃতম্। ক্ষত্রিয়

AMARBOI.COM

পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে তাঁর জন্ম। রাজাদের সারথিবৃত্তি অথবা তাঁদের মন্ত্রিসভায় একজন মাননীয় মন্ত্রী হওয়াটা তাঁর কাছে মুখ্য কোনও কাজ নয়। তার প্রধান কাজ— রাজা, মুনি-ঋষিদের বংশগৌরব কীর্তন করা, সৃষ্টি-প্রলয়-মন্বন্তরের বিচিত্র কথা শোনানো। আর ঠিক এই কাজেই সূত লোমহর্ষণের ভারত-জোড়া নাম।

লোমহর্ষণের আসল নাম কী ছিল, তাও বোধহয় সবাই ভুলে গেছে। তাঁর কথকতা, গল্প বলার ঢঙ ছিল এমনই উঁচু মানের যে তাঁর কথকতার আসরে শ্রোতাদের গায়ের লোম খুশিতে খাড়া হয়ে উঠত। তাই তাঁর নামই হয়ে গেল লোমহর্ষণ। লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ সুভাষিতৈঃ। স্বয়ং ব্যাসের তিনি প্রিয় শিষ্য। ব্যাস মহাকাব্য লিখেছেন, অষ্টাদশ পুরাণ লিখেছেন। তিনি লেখক—লেখার 'অডিও-এফেক্ট' তাঁর ভাল জানা নেই। যেদিন তিনি দেখলেন—তাঁরই লেখা জমিয়ে গল্প করে যে মানুষ শ্রোতাদের লোম খাড়া করে দিতে পারেন, সেদিনই বোধহয় তিনি এই সূতজাতীয় মেধাবী মানুষটির নাম দিয়েছিলেন লোমহর্ষণ এবং তাঁকে শিষ্যত্ব বরণ করে তাঁর মহাকাব্যের রসে দীক্ষা দিয়েছিলেন— শিষ্যো বভূব মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।

সেই লোমহর্ষণের ছেলে এসে উপস্থিত হয়েছেন শৌনকের আশ্রমে। উগ্রশ্রবা তাঁর নাম। কথকতায় লোম খাড়া করার ক্ষমতা তাঁরও আছে। লোকে তাঁকে যত না উগ্রশ্রবা নামে জানে, তার থেকে বেশি জানে—সে বাপকা বেটা— অর্থাৎ ভাবটা এই— আরে ও হচ্ছে লোমহর্ষণের ছেলে লৌমহর্ষণি, সূতের ছেলে সৌতি। আসলে লোমহর্ষণের কথকতা শুনলে যেমন শ্রোতার লোম খাড়া হয়ে ওঠে, তেমনই তাঁর ছেলেরও সেই ক্ষমতা আছে। এই জন্যই তাঁকে সবাই— লোমহর্ষণি বলেই বেশি ডাকে। মহাভারত তাই বলেছে— লোমহর্ষণপুত্রঃ উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ। বাপের সুবাদে উগ্রশ্রবা সৌতিও ব্যাসের সঙ্গ পেয়েছেন। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের তিনি বড় স্নেহভাজন।

লৌমহর্ষণি উগ্রশ্রবা যখন শৌনকের আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন হয়তো সূর্য অস্ত গেছে। সারাদিন যজ্ঞক্রিয়ার পর তখন ঋষিদের অনন্ত অবসর। সবাই একসঙ্গে বসে আছেন, কথা দিয়ে কথা বাড়াচ্ছেন। ব্রহ্মচারী বালকেরা সমিৎ কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। এই অবসর আর প্রশান্তির মধ্যেই লৌমহর্ষণি উগ্রশ্রবা তপোবনে প্রবেশ করেছেন।

লৌমহর্ষণিকে দেখে ঋষি-মুনিরা সব একেবারে হই-হই করে উঠলেন। সবাই মনে মনে একেবারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অনন্ত অবসর, অথচ বৃথা কাল না যায়— কেন হ্যবসরঃ কালো যাপনীয়ো বৃথা ন হি—কথক ঠাকুরের আগমন এই অবসর সফল করার একমাত্র উপায়। কথক ঠাকুর উগ্রশ্রবা সৎ-প্রসঙ্গ আর ধর্মকথা যতই বলুন, তার মধ্যে প্রধান আকর্ষণ হল গল্প। রাজা-রাজড়ার গল্প, ঋষি-মুনি অথবা ভগবানের বিচিত্র কাহিনী, লীলা প্রসঙ্গ। দিন-ভর বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে ব্যস্ত ঋষিরা গল্প শোনার আনন্দে সবাই মিলে একেবারে ঘিরে ধরলেন সৌতি উগ্রশ্রবাকে—চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ।

সৌতি সমবেত মুনি-ঋষিদের হাত-জোড় করে নমস্কার জানালেন। বললেন, ঠাকুরদের সব কুশল তো? আপনাদের ধর্ম-কর্ম-তপস্যা ঠিক মতো চলছে তো?

ঋষিরা কুশল বিনিময় করলেন উগ্রশ্রবা সৌতির সঙ্গে। এই বিশাল যজ্ঞ চলা-কালীন যদি

কোনও পৌরাণিক এসে পড়েন— এই রকম একটা প্রত্যাশার ভাবনা ঋষিদের মনে ছিল বলে তাঁরা একটা বিশেষ আসন ঠিক করেই রেখেছিলেন। মুনিরা সবাই উগ্রশ্রবাকে ঘিরে বসে পড়লে তিনিও তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। এত দূরের পথ বেয়ে এসেছেন, জল-মিষ্টি খেয়ে তিনি খানিক জিরোলেন। ঋষি-ব্রাহ্মণেরা যখন দেখলেন—তাঁর শ্রান্তি আর নেই, তিনি বেশ আরাম করে জমিয়ে বসেছেন নিজের আসনে—সুখাসীনং ততস্তং বৈ বিশ্রান্তমুপলক্ষ্য চ— তখন তাঁরা বললেন, কোত্থেকে আসছ, সৌতি? এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরলে?

উগ্রশ্রবা লৌমহর্ষণি বুঝলেন, ঋষিরা গল্প শোনার জন্য একেবারে মুখিয়ে আছেন। ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। তিনি বললেন—পরীক্ষিতের ছেলে মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ চলছিল, ঠাকুর। আমি সেইখানেই ছিলাম। সেখানে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্যাসের বলা মহাভারতের কথা শোনালেন সবিস্তারে। এতদিন সেই সব ভারত-কাহিনীই শুনলাম বসে বসে। তারপর সর্পযজ্ঞ সেরে এ তীর্থ সে তীর্থ ঘুরে পৌঁছলাম সমন্তপঞ্চকে, সেই যেখানে কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ হল—গতবানস্মি তং দেশং যুদ্ধং যত্রাভবৎ পুরা। সব দেখার পর মনে হল—একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই চলে এলাম।

এই দুটো কথা থেকেই উগ্রশ্রবা সৌতির গল্প বলার ক্ষমতা বোঝা যায়। উন্মুখ শ্রোতার কানে দুটো অব্যর্থ শব্দ সে ঢেলে দিয়েছে। এক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, দুই কুরু-পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ। নৈমিষারণ্যের ব্রতক্লিষ্ট ঋষিরা অনেক দিন থেকেই জানতেন যে, মহান কৌরব-কুলে এক বিরাট জ্ঞাতি-বিরোধ ধূমিয়ে উঠছে কতকাল ধরে। কখনও কৌরবদের অবস্থা ভাল, কখনও পাণ্ডবদের—এই রকমই চলছিল। কিন্তু মাঝখানে এত বড় যুদ্ধ ঘটে গেছে, পরীক্ষিত রাজা হয়েও বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি— এই সব খবর তাঁরা সবিস্তারে জানেন না। আর জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞটা তো একেবারেই নতুন খবর। অতএব উগ্রশ্রবা সৌতির কথার সূত্রপাতেই সমুৎসুক ঋষিদের শ্রবণেচ্ছা শানিত হল।

AMARBOI.COM

আর এই সৌতির নিজের বোধ-বুদ্ধিও কম নয়। বৈশম্পায়নের বলা কথা শুনেই তিনি সন্তুষ্ট হননি। তিনি সরেজমিনে সমন্তপঞ্চকে গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ পরিণতি দেখতে। জায়গাটা ভাল করে দেখা না থাকলে জ্ঞানী-গুণী ঋষি-মুনির সামনে ঘটনার বিবরণ দেবেন কী করে? তাছাড়া সমন্তপঞ্চক শব্দটা উপস্থিত ঋষি-মুনিদের কানটা খাড়া করে তুলল। কারণ, এই জায়গাটা অনেক কাহিনীর আকর। সেই সমন্তপঞ্চকে আবারও একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে— এটা শ্রোতা ঋষিদের প্রশ্রয় উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট।

ঋষিরাও বুদ্ধিমান। তাঁরা শুধু সমন্তপঞ্চকের পরিণতি শুনে বিশাল এক উপন্যাস কাহিনীর মজা নষ্ট করতে চাইলেন না। তাঁরা বললেন,— ওই যে বললে, দ্বৈপায়ন ব্যাসের কাহিনী, পুরাণ-কথা। তা ব্যাসের কথা মানেই তো বেদ-উপনিষদের নির্যাস, সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা, যার বহিরঙ্গে ভারতের ইতিহাস, বিচিত্র উপাখ্যান— ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।

আসলে ঋষিদের মনে একটা পাপবোধ কাজ করছে। তাঁরা যজ্ঞ করতে এসেছেন। তাঁদের মনটা সদা সর্বদা যজ্ঞ অথবা যজ্ঞাঙ্গীয় কাজেই ব্যাপৃত রাখার কথা। কিন্তু যজ্ঞের প্রাত্যহিক পৌনঃপুনিকতা এবং অবসর তাঁদের ঠেলে দিয়েছে অভিনব কাহিনীর সন্ধানে। কিন্তু কাহিনী, আখ্যান-উপাখ্যান যদি ব্যাসের লেখা হয়, তবে তাঁদের বিরাট সুবিধে। যে মহাকবি চতুর্বেদের

বিভাগ করেছেন, অষ্টাদশ পুরাণ লিখে তবে মহাভারত লিখতে বসেছেন, তিনি যে বেদ-উপনিষদ-পুরাণ উলটে দিয়ে শুধুই প্রাকৃতজনের গল্প-কথা বলে যাবেন না, সে কথা নিশ্চিত। ঋষিদের এইটাই বাঁচোয়া। যজ্ঞ-কার্যহীন একটা সময়েও তাঁরা বৃথা সময় কাটাচ্ছেন না —তাঁরা এমন একটা কাব্য-ইতিহাস শুনতে চাইছেন, যার মধ্যে পাপনাশিনী ধর্মকথাও যেমন আছে, তেমনই আছে বেদের হবির্গন্ধ এবং উপনিষদের শান্ত জ্ঞান— সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ।

ঋষিরা বললেন— তুমি আরম্ভ করো, সৌতি। আমরা শুনতে চাই দ্বৈপায়ন ব্যাসের লেখা সেই কাহিনী। অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা, যিনি মহাভারতের মতো বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন— ব্যাসস্য অদ্ভুতকর্মণঃ। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়ে বৈশম্পায়নের মুখে সেই কাহিনীই তো তুমি শুনে এলে— জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্। আরম্ভ করো তুমি।

দুই

সৌতি উগ্রশ্রবা এবার কথক-ঠাকুরের নিয়ম-কানুন মেনে—তাঁর গাওনা যাতে ভাল হয়, যাতে নির্বিঘ্নে মহাভারতের বিচিত্র পদ-পর্বগুলি শ্রোতার সামনে একের পর এক তিনি পরিবেশন করতে পারেন, তার জন্য পরম ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে বললেন—

শুনুন তাহলে ঋষি-ঠাকুররা। এই জগতের আদি পুরুষ ভগবান শ্রীহরিকে নমস্কার। অদ্ভুতকর্মা দ্বৈপায়ন ব্যাসের লেখা মহাভারতের কথা বলব আমি। তবে দেখুন—আমিই কিন্তু সেই প্রথম লোকটি নই যে এই কাহিনী প্রথম বলছে। আমার আগেও অন্য কবিওয়ালারা এই কাহিনী বলে গেছেন, আমার সমসাময়িকেরাও বলছেন— আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে— আবার ভবিষ্যতেও অন্য কবিরাও আমারই মতো এই মহাভারতের ইতিহাস বলবেন।

সৌতির মুখে এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একটু টান-টান হয়ে বসতে হয়। আজকের গবেষকরা অনেক তত্ত্ব-তথ্য প্রয়োগ করে, মহাভারতের নানান জায়গা খুঁজে নানান অসামঞ্জস্য খুঁজে বার করেন। এই অসামঞ্জস্যের সূত্রগুলি হল—বিভিন্ন চরিত্রের বয়স, ঘটনার সময়-অসময়, শব্দ-ব্যবহার, স্টাইল, ছন্দ সব কিছু।

সব বিচারের পর একেক পণ্ডিতের একেক রকম ব্যবচ্ছেদ-পর্ব শুরু হয় মহাভারতের শরীরে। কেউ বলবেন— ভীমের রক্তপান, সে যে একেবারে আদিম সমাজের প্রতিহিংসা-প্রবণতা। এই প্রবণতার সঙ্গে মহাভারতের পরিশীলিত ব্যাপারগুলি মেলে না। অতএব ওই পরিশীলিত অংশটুকু পরে লেখা হয়েছে, ওটা প্রক্ষেপ। আরেক পণ্ডিত বলবেন— মহাভারতের মূল ক্ষত্রিয়-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের নানা ঋষির জ্ঞান-দান, নীতি-কথা মোটেই মেলে না— ওগুলি সব ব্রাহ্মণ্য সংযোজন অর্থাৎ প্রক্ষেপ। আরেক দল কড়া পণ্ডিত—

যাঁরা মহাভারত অশুদ্ধ হলেই ভীষণ রেগে যান— তাঁরা আবার শুধু মহাভারতের জ্ঞাতিবিরোধ আর যুদ্ধ কাহিনীটুকুই ধরে রাখতে চান। সেটাই শুধু মহাভারতের শুদ্ধ কাহিনী। আর সব পরে সংযোজিত এবং সেই সংযোজন নাকি ভার্গব বংশীয় ব্রাহ্মণদের তৈরি; ঘটা করে তার নাম দেওয়া হল ভার্গব-প্রক্ষেপ। পণ্ডিতদের বুদ্ধি-ব্যায়ামে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখা যাবে মহাভারতের মূল কাহিনী মোটেই বড় নয়। শুধু জ্ঞাতিবিরোধ, মন-কষাকষি এবং যুদ্ধ, তারপর আর সবই প্রক্ষেপ।

এইসব অসামান্য গবেষকের চিন্তা-দৃপ্ত পত্ররচনা দেখলে মনে মনে যুগপৎ প্রশংসা এবং মায়া-দুয়েরই উদয় হয়। প্রশংসা এই কারণে যে, এঁদের পড়াশুনো এবং বিদ্যার বিন্যাস-কৌশল সত্যিই অপূর্ব। আর মায়া এই জন্য যে, এঁরা কোনও কিছুই আর সামগ্রিকভাবে, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পান না। সহজ জিনিসকে অনর্থকভাবে জটিল করে ফেলতে এঁরা এতই দক্ষ যে, প্রক্ষেপ-প্রক্ষেপ করতে করতে এঁরা মহাভারতের বিশাল আখ্যান-রসটাই আর অনুভব করতে পারেন না। এঁদের অবস্থা দেখলে একটা খারাপ কথা আমার মনে আসে— যদিও সেটা সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রের কথা। একজন রসিক-সুজন বলেছেন— কাব্যার্থ আস্বাদন করার সময় যাঁরা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁরা আসলে শৃঙ্গারকালে রমণীর আবরণ উন্মোচনের সময় কাপড়ের দাম নিয়ে ভাবেন—নীবীমোক্ষণকালে তু বস্ত্র-মৌল্য-বিচিন্তকাঃ।

নতুন কিছু করার মতো ব্যবসায়-সম্পন্ন তথা পাটোয়ারি-বুদ্ধি-সমন্বিত এই সব পণ্ডিত-ধূরন্ধরের বক্তব্য কখনওই অকাট্য নয়; তবে তা কাটার মতো উপযুক্ত ইচ্ছা আমার কখনওই হয় না। হয় না, কারণ, আমরা জানি মহাভারতের গল্প এতই জনপ্রিয় যে, সেই জনপ্রিয়তার সুযোগে কথক-ঠাকুরদের অনেক গল্প, ঋষি-মুনিদের অনেক তত্ত্বজ্ঞান, মানুষের অনেক হৃদয়-স্পন্দন মিশে গেছে ভারত-কথার প্রবাহে। ভারত-কথা হয়ে উঠেছে মহা-ভারত।

কথক ঠাকুর সে কথা জানেন। ভারত-কথার আরম্ভেই তিনি স্বীকার করেন, আমিই কিন্তু প্রথম লোক নই— যে এই কাহিনী শোনাচ্ছে। আমার আগেও কবিরা এই কথা বলেছেন, পরেও বলবেন— আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাস মিমং ভুবি। সেই প্রাচীন কাল থেকে যে কথা গঙ্গার জলধারার মতো আজও বয়ে চলেছে, সেই জল-ধারার মধ্যে কবে কখন কোন গল্পের নদী এসে মিলল, কবে কখন কোন তত্ত্বের প্রবাহ এসে প্রবেশ করল, কখন কোন স্বার্থে স্বার্থান্বেষীর নালার জল ইচ্ছে করে গঙ্গার জলে খাল কেটে বইয়ে দেওয়া হল—গবেষণা করলে সে সবই অনেকটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া যেতে পারে বটে, তবে সম্পূর্ণ জলধারার মধ্য থেকে সেই ছোট ছোট নদীর জল, নালার জল আর চেনা যাবে কি? সব রকমের জল-প্রবাহ যখন গঙ্গায় পড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, তখন গঙ্গা যেমন সব জলকেই নিজের পবিত্রতার মাহাত্ম্য দান করে, তেমনই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিও মহাভারতের বিশাল শরীরে সম্পূর্ণ আত্মীকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে স্পষ্ট করে তাদের যেমন আর চেনাও যায় না, তেমনই মহাভারতের প্রাপ্য মর্যাদা থেকেও সেই প্রক্ষিপ্তাংশগুলিকে বঞ্চিত করা যায় না।

বস্তুত বিরাট সুরধুনী-ধারার মধ্য থেকে দুই অঞ্জলি জল তুলে নিয়ে যেমন নির্দিষ্ট করে বলা যায় না— এটা অমুক শাখা-নদীর জল অথবা তমুক শাখা-নদীর, তেমনই মহাভারতের মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে আমাদের পরিশীলিত গবেষণার সূত্রে অনুমান-চিহ্নিত করা যায় মাত্র, তার বেশি কিছু করা যায় না। বলা যায় না— এটা অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত অথবা এইটাই মূলাংশ।

AMARBOI.COM

আমার ব্যক্তিগত মত হল, মহাভারত শুনতে হলে বা বুঝতে হলে অথবা আরও স্পষ্ট করে বলা ভাল— এই ভারতকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে মহাভারত যেমনটি আছে, তেমন ভাবেই তাকে ধরা ভাল। এরমধ্যে কোনটা ব্রাহ্মণ্য সংযোজন কোনটা ক্ষত্রিয়-সংযোজন— এইসব অপোদ্ধার পদ্ধতি নিয়ে যাঁরা বেশি মাথা ঘামান— জানতে ইচ্ছে করে— তাঁরা কি ভারতের জনজীবনেও রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়েও মাথা ঘামান?

মহাভারতের শরীর ব্যবচ্ছেদ করে, অথবা পরতে পরতে তার 'লেয়ার' তৈরি করে যাঁরা ঢাকাই পরোটায় পরিণত করেছেন, তাঁদের যত রাগ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের ওপর। বিশেষত যেখানে নারীর অধিকার খর্বিত, শূদ্রেরা নিন্দিত অথবা আচার-ব্রতের জয়গান— সেই সব জায়গা পরিশীলিত গবেষকের চোখে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মুশকিল হল— এগুলির কোন কোনটি যে পরবর্তীকালে সংযোজিত, আমিও মানি এবং এতদ্-দ্বারা নারী-শূদ্র এবং তথাকথিত নিম্নস্তরের জন-জাতির অধিকার যে বিপন্ন হয়েছে, তাও মানি, কিন্তু এগুলিকে শুধুই ব্রাহ্মণ্য সংযোজন বলে শুধু একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ওপর জনরোষ তৈরি করারও কোনও অর্থ আছে বলে আমার মনে হয় না। যাঁরা তা করছেন, তাঁরা পূর্বতন অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য অন্যতর আরও এক অন্যায়ের আশ্রয় নিচ্ছেন।

তাছাড়া মনে রাখা দরকার, মহাভারতের যে অংশগুলি আধুনিক সমাজে নিন্দিত এবং প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হচ্ছে, সেগুলি যদি তর্কের খাতিরে ব্রাহ্মণ্য সংযোজন বলেও মেনে নেওয়া যায়— সত্যি বলতে কি আমিও তাই মানি— তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, মহাভারতের মূল অংশ কি তাহলে ব্রাহ্মণেতর অন্য কোনও জাতির লেখা? ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের লেখা? বলতে দ্বিধা নেই—এ কথা বোধহয় গবেষণার শত সূত্রেও প্রমাণ করা যাবে না। তাহলে বলি— মহাকাব্যের প্রকৃষ্ট অংশটুকু যদি ব্রাহ্মণদের লেখা হয় এবং সংযোজনগুলিতেও যদি ব্রাহ্মণদেরই কর্তৃত্ব থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত হয়—সমাজে মহাকবি গোছের ভাল ব্রাহ্মণও যেমন ছিলেন আবার তেমনই অকবি, স্বেচ্ছাবিহারী, স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণেরাও ছিলেন। একই জাতির একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দোষে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতি গালাগালি খান কেন? মানব সমাজের মুক্তি যাঁদের কাছে কাম্য, তাঁদের কাছে নিবেদন— হয় এই বিভেদ সৃষ্টির খেলা বন্ধ করুন, নয়তো 'ব্রাহ্মণ্য সংযোজন'—এই শব্দটির সাধারণীকরণ বর্জন করে 'দুষ্ট ব্রাহ্মণ্য সংযোজন' বলুন। সাধারণভাবে বললে স্বীকার করতেই হবে যে, ব্রাহ্মণরা নারী-শূদ্র বা বহু জন-জাতির প্রতি অন্যায় আচরণ যেমন করেছে, তেমনই সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাল কাজও কিছু করেছে। তার উদাহরণ দিতে পারি ভূরি ভূরি।

www.boiRboi.com

থাক এসব কথা। উগ্রশ্রবা সৌতি যে মুহূর্তে মহাভারতের আখ্যান আরম্ভ করেছেন, সে মুহূর্তেই তিনি জানেন—তিনি যা বলছেন, সেই কথা-কাহিনী তাঁর পূর্বজরা হয়তো আরও একভাবে শুনেছেন এবং আরও অন্য কোনওভাবে বর্ণনাও করেছেন হয়তো— ব্যাচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ। তিনি জানেন— মহাভারতের কথা ভারতের মতোই বিচিত্র এবং ততোধিক বিচিত্র এক মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রতিফলন। তিনি জানেন—ভারতের তথাকথিত আর্য সম্প্রদায় কোনো ভাবেই রক্তের বিশুদ্ধতা টিকিয়ে রাখতে পারে না। শত কবির দর্শন মনন এবং কখনও বা স্থূল হস্তের অবলেপও ঘটেছে এখানে। একটি বিশাল জাতির ইতিহাস কখনও কোনও একক কবির মনন-সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না। জন-জাতির শরীরে মনে যখন যে প্রভাব এসেছে, কবিরাও তা ধরে রেখেছেন মহাকাব্য-ইতিহাসের 'প্যানোরমায়'।

হয়তো এই কারণেই—কথাটা ভেবে দেখবেন একটু—মহাভারত বিশালবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ব্যাসের লেখা হলেও, সে কাহিনী বৈশম্পায়নের মতো এক ব্রাহ্মণের মুখে প্রাথমিকভাবে উচ্চারিত হলেও আমরা যে কথক-ঠাকুরের মুখে মহাভারতের কথা শুনছি, তিনি কিন্তু একজন সংকরজন্মা কবি, তিনি সূত-জাতীয়। মহাভারতের বিচিত্র সংযোজন-পর্বের নিরিখে যে সাঙ্কর্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সাঙ্কর্য এই সূতজাতীয় কথক ঠাকুরের মধ্যেও আছে। হয়তো সেই কারণেই কোনও ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, কিংবা বৈশ্যও নয়, একজন সূত-জাতীয় ব্যক্তিই মহাভারতের বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন।

সূত কাকে বলে জানেন? প্রাচীন নৃতত্ত্বের সূত্রে দুভাবে 'সূত'-শব্দটির ব্যাখ্যা করা যায়। যদি মনু মহারাজকে আমরা প্রাচীন নৃতত্ত্ব অথবা জাতিতত্ত্বের প্রধান ভাষ্যকার বলে মেনে নিই, তাহলে 'সূত' শব্দের প্রধান ব্যাখ্যা হল—ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষ যদি ব্রাহ্মণী বিয়ে করে বসতেন তবে তাঁদের ছেলেদের জাতিগত উপাধি হত সূত— ক্ষত্রিয়াদ্‌ বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ। মহাভারতের বক্তা সূত লোমহর্ষণকে অথবা সৌতি উগ্রশ্রবাকে যদি এই ব্যাখ্যায় বিচার করি, তাহলে বোধহয় ঠিক হবে না।

বস্তুত মহাভারত বা পুরাণের যুগে সূত বলে একটা আলাদা 'ক্লাস'ই ছিল। পুরাণগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে যেদিন আমরা প্রথম রাজা পেয়েছি, সেদিন থেকে আমরা 'সূত'কেও পেয়েছি। পুরাণ মতে এই পৃথিবীর প্রথম সার্থক রাজা হলেন পৃথু—যাঁর নামে এই পৃথ্বী বা পৃথিবী। তা পৃথু যেদিন জন্মালেন, সেইদিনই পিতামহ ব্রহ্মা সোমযজ্ঞের আহুতি-ভূমিতে সূত এবং মাগধদের সৃষ্টি করলেন। সমাগত মুনি-ঋষিরা সূত-মাগধদের অনুরোধ করলেন মহান পৃথুর স্তব করতে।

সেই যে প্রথম সূত-মাগধেরা পৃথুর স্তব করেছিলেন, তার পর থেকেই এঁরা চিহ্নিত হয়ে গেলেন রাজবংশের কীর্তি-গায়ক হিসেবে। বিভিন্ন রাজবংশের কীর্তিখ্যাতি, মুনি-ঋষিদের আশ্চর্য সব তপশ্চর্যা— সব এই সূতেরা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন বলেই সূতেরাই ছিলেন সে যুগের ঐতিহাসিক, যাকে তৎকালীন পুরাণের ভাষায় বলা হয় 'পৌরাণিক'— সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ।

মহাভারতে দেখবেন প্রথমেই বলা হচ্ছে লোমহর্ষণ সূতের ছেলে 'পৌরাণিক' উগ্রশ্রবা এসেছেন শৌনকের আশ্রমে— লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে। প্রাচীন সমাজের মুনি-ঋষিরা সূতদের যথেষ্ট সম্মান করতেন, কারণ তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি পড়াশুনো ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মতোই গভীর—পুরাণের ভাষায়—অমলপ্রজ্ঞাঃ। যদি ধরে নিই—মনুর বিধান মতো ক্ষত্রিয়-পুরুষ আর ব্রাহ্মণী সুন্দরীর মিলনে যে সূত-জাতি তৈরি হয়েছিল, কালক্রমে তাঁরাই 'পৌরাণিক', ঐতিহাসিক হয়ে গেলেন, তাহলেও বলতে হবে— রাজবংশ এবং মুনিবংশের ইতিহাসই শুধু নয়, মহাভারতের মতো বিশাল এই ইতিহাস শোনানোর জন্যও নয়, কালে কালে মহাভারতের বিভিন্ন সংযোজন-পর্ব শোনাবার পক্ষে তাঁরাই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক— যাঁদের ভাষ্য দেওয়ার ক্ষমতা পৃথুরাজের সময় থেকেই চিহ্নিত এবং যাঁরা জন্মগতভাবে সংকর।

সংকর বলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের এমন বিচিত্র সংকর মহাভারতের ইতিহাস বলার ভার সূতেরই ওপর। সংকর বলেই কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন সংযোজন তাঁর কাছে অচ্ছুৎ নয়, তাঁরা সব মিলিয়ে দিতে পারেন। মহাভারতের প্রত্যেক ঘটনার ওপর,

AMARBOI.COM

প্রত্যেক আগন্তুক তত্ত্ব এবং তথ্যের ওপর সূতের মায়া আছে। আর মায়া আছে তাঁদের ওপর—যাঁরা পূর্বে তাঁদেরই মতো করে মহাভারতের কথা শুনিয়েছেন। সহমর্মিতা আছে তাঁদের ওপর— যাঁরা তাঁর সম-সময়ে মহাভারতের আখ্যান বলে যাচ্ছেন। শুভেচ্ছা আছে তাঁদের জন্য— যাঁরা ভবিষ্যতে ভারত-কথার মর্যাদাতেই মহাভারত শোনাবেন— আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি। আমার গর্ব— আমি সেই সংকরজন্মা সূতের আশীর্বাদ-ভাগী —যে আজও মহাভারতের কাহিনী সূতের আশ্রয় নিয়ে বোঝাতে চায়। পাঠকেরা আমাকে কিছু কাল সহ্য করুন— যাতে উগ্রশ্রবা সৌতির বিচিত্র-কাহিনী আজকের দিনের মানসিকতায় আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

একটি কথা মহাভারতের কবির সমান হৃদয় নিয়ে বোঝা দরকার যে, মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে ব্রাহ্মণের সংযোজন যাই থাকুক, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের স্পর্শদোষে মহাভারতের সার্বত্রিকতা নষ্ট হয়ে যায় না। সহানুভূতি নিয়ে স্মরণ করুন মহাপ্রস্থান পর্বের সেই আশ্রিত অস্পৃশ্য কুকুরের কাহিনী। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাকে ধর্মরূপী বুঝে সঙ্গে নিয়ে যাননি, ঘৃণিত কুকুরত্বের মর্যাদা বা অমর্যাদাতেই যে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়-সরসতা ভোগ করেছিল। মহাভারতের শেষ, মহাপ্রস্থানের পথে একটি কুকুরেরও যে মর্যাদা বা সম্মান আছে, মহাভারতের আদিতেও তাই।

আমরা পণ্ডিত-অধ্যাপকদের কাছে শুনেছি যে, প্রাচীন কবি-নাট্যকারদের লেখার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা নাকি যে ঘটনা দিয়ে কাব্যারম্ভ করেন, কাব্য-বা নাটকের শেষেও নাকি সেই ঘটনা অথবা অনুরূপ ঘটনার সূচনা থাকে। অথবা কাব্য-নাটকের প্রথম ভাগটা যদি সমস্যা দিয়ে শুরু হয়, তবে শেষ হয় সমাধান দিয়ে। যেমন ধরুন কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে কণ্বমুনির আশ্রমে আমরা প্রথম শকুন্তলা-দুষ্যন্তকে মিলিত হতে দেখেছি। তারপর অনেক বাধা, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার পর নাটক-শেষের সপ্তম অঙ্কে মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে। সেখানে আবার আমরা শকুন্তলা-দুষ্যন্তকে মিলিত হতে দেখছি। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে যে প্রণয়-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছিল, মহর্ষি মারীচের আশ্রমে সেই প্রণয়-কুসুম ত্যাগের মাহাত্ম্যে সুমধুর ফলে পরিণত হল। অন্য ক্ষেত্রে যদি ভগবদ্‌ গীতার মতো একটা দার্শনিক গ্রন্থের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি, তাহলে দেখবেন—গীতার আরম্ভ হচ্ছে অর্জুনের বিষাদ এবং মোহে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভাই-বেরাদরকে দেখে অর্জুন একই সঙ্গে কৃপাবিষ্ট এবং মোহগ্রস্ত। তারপর অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে দার্শনিক তত্ত্ব এবং তাত্ত্বিক বিবৃতি। অধ্যায়ের শেষে দেখা যাচ্ছে— আবার সেই মোহের কথা ফিরে এসেছে। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন এখন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। সমস্যা যা ছিল তার সমাধান হয়ে গেছে। উপদেশদীপ্ত অর্জুনের মুখে তখন সদর্প ঘোষণা শোনা যাচ্ছে—আর আমার কোনও মোহ নেই, কৃষ্ণ! আমি আবার স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত—নষ্টো মোহঃ স্মৃতি র্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।

মহাভারত মহাকাব্যখানিকেও এই নিরিখে দেখা যায়। এখানেও মহাকাব্যের শেষে আমরা যেমন এক অধম কুকুরের কাহিনী দিয়ে মহাপ্রস্থানের শেষ সূচনা দেখতে পাচ্ছি, তেমনই ভারতকথার আরম্ভেও উগ্রশ্রবা সৌতি এক কুকুরের কাহিনী দিয়েই শুরু করেছেন। মহাভারতের মূল আরম্ভে অধ্যায়-সূত্র ছাড়াও আরও দু-চারখানা গল্প আছে বটে, তবে মহাভারতে যেহেতু কৌরব-পাণ্ডবের বংশ বিস্তার এবং তাঁদের যুদ্ধই প্রাধান্য পেয়েছে, তাই পাণ্ডবের শেষ বংশধর জনমেজয়ের কথা না বলে মহাভারতের কথায় প্রবেশই করা যায় না।

জনমেজয়ই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর সর্পযজ্ঞে ব্যাসদেবের কাছে মহাভারতের কথা শুনতে চান। অতএব মহাভারতের ঘটনা-সূচি বর্ণনা করেই সৌতি উগ্রশ্রবা জনমেজয়ের প্রসঙ্গে এসেছেন এবং জনমেজয়ের প্রসঙ্গ-মাত্রেই এসেছে একটি কুকুরের কাহিনী।

মনে রাখতে হবে— একটি প্রাণী হিসেবে কুকুর যতই প্রভুভক্ত এবং মহনীয় হোক, কুকুর নিয়ে প্রাচীনদের কিছু শুচিবাইও ছিল। অবশ্য কুকুরদের দোষও কম ছিল না। কোনও জায়গায় হয়তো ঋষিরা মন দিয়ে যজ্ঞ করছেন। কোত্থেকে একটা কুকুর এসে যজ্ঞের ঘি খানিকটা চেটে দিয়ে গেল, অথবা মুখে করে নিয়ে গেল খানিকটা পুরোডাশ। চপলমতি কুকুরের এই অবিমৃশ্যকারিতায় ঋষিরা এতটাই পীড়িত বোধ করতেন যে, কুকুরের চেটে দেওয়া ঘি তাঁরা অপবিত্রবোধে যজ্ঞে ব্যবহার করতেন না। স্বয়ং মনু মহারাজ আবার এতটাই শঙ্কাপ্রবণ ছিলেন যে, তিনি বলেছেন—দেশ যদি অরাজক হয়, তবে সেই অরাজকতার জন্য এতটাই অমঙ্গল দেখা দিতে পারে যে, কুকুরও যজ্ঞের ঘি চেটে দেবে, কাকও যজ্ঞের পুরোডাশ নিয়ে উড়ে পালাবে— অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ হবিস্তথা। কুকুরের এই হবির্লেহন-প্রবৃত্তি, এবং সেই কারণেই তাদের ওপর ব্রাহ্মণ-সমাজের বিরক্তি—এই দুটিই প্রাচীনকালে প্রায় প্রাবাদিক স্তরে পৌঁছেছিল— এই কথাটি মনে রেখেই আমরা জনমেজয়ের প্রসঙ্গে আসছি।

পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় ভাইদের সঙ্গে মিলে এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। জনমেজয়ের ভাইরা হলেন— শ্রুতসেন, উগ্রসেন এবং ভীমসেন। তাঁদের যজ্ঞ চলার সময় একটি কুকুর সেখানে উপস্থিত হল। জনমেজয়ের ভাইরা যজ্ঞস্থলে কুকুর দেখে সেটিকে যথেষ্ট মারধর করে তাড়িয়ে দিলেন। কুকুরটি কাঁদতে কাঁদতে কুকুর-মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। তার মা ছেলেকে চেটে আদর করে বলল, কাঁদছিস কেন? কে তোকে মেরেছে? সে বলল, রাজা জনমেজয়ের ভাইরা আমাকে খুব মেরেছে মা। মা-কুকুর বলল, তুই নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছিস, নইলে শুধু শুধু তারা তোকে মারবে কেন? ছেলে কুকুর বলল, না গো মা। আমি কিচ্ছুটি করিনি। আমি যজ্ঞের ঘিয়ের দিকে ফিরেও তাকাইনি, চাটিওনি সেই ঘি—নাপরাধ্যামি কিঞ্চিৎ, নাবেক্ষে হবীংষি নাবলিহে ইতি। বস্তুত এই বাচ্চা কুকুরটিও জানে অথবা কুকুর-মায়ের কাছে সে প্রশিক্ষণ পেয়েছে যে, যজ্ঞের ঘি চাটতে নেই, দেবতার অগ্রভাগ লোভের দৃষ্টিতে দেখতে নেই।

কুকুর-মা ছেলের অভিযোগ শুনে রাজা জনমেজয়ের কাছে যজ্ঞস্থলেই উপস্থিত হল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সে রাজাকে বলল, এই আমার ছেলে। একটা কোনও অপরাধ করেনি সে, না চেটেছে ঘি, না ফিরেও সেদিকে চেয়ে দেখেছে; তো কেন তাকে মারা হল? জনমেজয় সামান্যা কুকুরীর কথার জবাব দিতে পারলেন না। লজ্জায় তাঁর ভায়েরা মাথা নিচু করলেন। কুকুর-মা বলল, যেহেতু কোনও অন্যায় না করেও আমার ছেলে শুধু শুধু মার খেল, তার ফল ভুগতে হবে এই রাজাকে। দেখবে, এমন কোনও ভয় তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে, যা তোমরা ভাবতেও পারছ না—যস্মাদভিহতো'নপকারী তস্মাদদৃষ্টং ত্বাং ভয়মাগমিষ্যতি।

এখানে দুটি-তিনটি জিনিস ভাবার আছে। এখনকার দিনে—অন্যায় না করে যদি মার খেতেন, তাহলে সেটাই হত স্বাভাবিকতা। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে তখনই, যদি নিরপরাধে মার খাওয়ার পরেও আপনি যদি ন্যায়বিচার চাইতে যান। উকিলে ছুঁলে তো ছত্রিশ ঘা, আর যদি সোজাসুজি পুলিশের কাছে যান, তবে আরও মার খাওয়ার ভয়, আর যদি গণতন্ত্রের রাজদ্বারে যান, তবে শুনবেন, এমন তো হয়েই থাকে, কী আর করা যাবে। কিন্তু সে

যুগে একটি সামান্য কুকুরও কিন্তু স্বয়ং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে খোদ রাজার বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানিয়েছে। বলতেই পারেন— কুকুরের কথাটা রূপকমাত্র, কুকুর কী আর কথা বলে? অভিযোগ জানায়? আমাদের বক্তব্য, রূপক বলেই এই ঘটনার সামাজিক মূল্য আরও বেশি। অর্থাৎ একজন সামান্য প্রাণী-মাত্রেরও রাজার দরবারে যাওয়া এবং স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনার ক্ষমতা ছিল, আজকের এই সোনার গণতন্ত্রে যা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, যে সমাজের স্বার্থান্বেষীরা বিধান দিয়েছিলেন—শকুনের অভিশাপে গরু মরে না— এ সমাজ তার থেকে প্রগতিশীল। পরবর্তীকালে যে সময়ে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা নিজেরা সৎ আচরণ না করে অন্যকে অভিশাপের ভয় দেখাতেন, সেই সমাজে নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা যদি অতিষ্ঠ হয়ে উচ্চতরের প্রতি অপশব্দ উচ্চারণ করতেন, তবে শুনতে হত— শকুনের অভিশাপে গরু মরে না। কিন্তু এখানে দেখছি—শকুন না হোক, কুকুরের অভিশাপে রাজা লজ্জিত, চিন্তিত, ব্যতিব্যস্ত—ভৃশং সন্ত্রাস্তো বিষণ্ণশ্চাসীৎ। যজ্ঞ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা হস্তিনানগরীতে ফিরে এসেছেন এবং ভীষণভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। তিনি একজন উপযুক্ত পুরোহিতের খোঁজে বেরিয়েছেন, যিনি কুকুরীর ওই অভিশাপ নিরস্ত করতে পারেন। এমনি খুঁজে পুরোহিত পাওয়া যায়নি। শেষে একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি মুনির আশ্রম চোখে পড়ে রাজার। মুনির নাম শ্রুতশ্রবা। তাঁর উপযুক্ত পুত্র সোমশ্রবাকে পৌরোহিত্যে বরণ করে নিয়ে আসেন জনমেজয়।

ঋষির পৌরোহিত্যে কুকুরীর শাপ কতটা কেটে গিয়েছিল মহাভারতের কবি তা বলেননি, কিন্তু একজন রাজা সামান্যা কুকুরীর অভিযোগ এবং আক্ষেপে কতটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, সেটা এযুগেও ভাবার মতো। আমাদের কাছে এই কুকুরীর বিবরণ তৃতীয় এক কারণে মূল্যবান। মহাভারতের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ্য-সংযোজনের চিহ্নে আতঙ্কিত হন, তাঁদের কাছে আমার নিবেদন— মহাশয়! এই কুকুরীর মর্যাদা-রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় রাজার দুশ্চিন্তা এবং লজ্জাবোধও কিন্তু ব্রাহ্মণদেরই সংযোজন। আমি অবশ্য এটাকে সংযোজন মনে করি না। আমি এটাকে মহাভারতের উপক্রমণিকা মনে করি। অপিচ আমি এটাকে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনও মনে করি না, আমি এটাকে কবিওয়ালার গৌরচন্দ্রিকা মনে করি। যদি তাই হয়, তবে এটি সৌতি উগ্রশ্রবার সংযোজন অর্থাৎ অব্রাহ্মণের সংযোজন।

কথাটা অবশ্য এখানেও নয়, কথাটা হল— যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে। মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক কুকুরের কাহিনী দিয়ে তাঁর ভারতবংশের ইতিহাস শেষ করেছেন, সৌতি উগ্রশ্রবাও তাই আরম্ভ করেছেন এক কুকুরের কাহিনী দিয়ে। সারা মহাভারত জুড়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ওপরে যে আপাত পক্ষপাত নিয়ে নব্য গবেষকেরা আহত বোধ করেন, তাঁরা যেন এই মহাকাব্যের আদি এবং অন্তে সামান্য কুকুরের চরিত্র দেখে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করেন। তথাকথিত অধম প্রাণীর প্রতি করুণার চিহ্নে যে মহাভারতের আদি এবং অন্ত চিহ্নিত, তার সমস্ত মধ্যভাগ জুড়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতি নিরঙ্কুশ পক্ষপাতই যে শুধু থাকবে না— সে কথা আমি শুরুতেই জানিয়ে রাখলাম।

আজকের দিনে 'ফিল্মের' ভাষায় আপনারা যাকে ফ্ল্যাশ-ব্যাক বলেন, সেই 'ফ্ল্যাশ্‌-ব্যাকে'র কায়দাতেই মহাভারতের কাহিনীর আরম্ভ। কুরু-পাণ্ডবের বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে মহারাজ যুধিষ্ঠির খুব বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মহারাজ দুর্যোধন

যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—সারা জীবনে যা পাবার আমি পেয়েছি। ভোগ ও লাভ করেছি ইচ্ছামতো। কিন্তু সমস্ত জ্ঞাতি-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে তুমি কোথায় রাজত্ব করবে, যুধিষ্ঠির? তোমার রাজ্যের বাসিন্দা হবেন কতগুলি বিধবা আর কতগুলি সন্তানহীন মাতা।

কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেননি দুর্যোধন। রাজ-সিংহাসনে বসে যুধিষ্ঠির মোটেই সুখ পাননি। মাত্র ছত্রিশ বছর— সে কালের দিনের আন্দাজে সময়টা কিছুই নয়; মাত্র ছত্রিশ বছর রাজত্ব করে, পাণ্ডব-কৌরবের একমাত্র সন্তান-বীজ পরীক্ষিতকে সিংহাসনে বসিয়ে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানের যাত্রা শুরু করেছেন। যখন সিংহাসনে বসেছেন পরীক্ষিতের বয়সও তখন ছত্রিশ। কারণ, পাণ্ডব-কৌরবের মহাযুদ্ধের শেষেই তাঁর জন্ম। তাঁরও রাজত্বকাল অতি অল্প। মাত্র চব্বিশ বছর। তিনি অকালে মারা গেলেন তক্ষক সাপের দংশনে। রাজা হয়ে বসলেন তাঁর পুত্র জনমেজয়।

জনমেজয় পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সর্প-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সেই সর্প-যজ্ঞেই মহাভারত-কথার সূচনা। আস্তীক মুনি এসে জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের ছেদ টানলেন। যজ্ঞ স্তব্ধ হল এবং মহাভারতের কথা আরম্ভ হল। সর্পযজ্ঞে যোগদান করেছিলেন যত রাজ্যের মুনি-ঋষিরা। আর উপস্থিত ছিলেন মহামুনি ব্যাস। কুরু-পাণ্ডবের বংশধারায় ব্যাসের নিজের রক্ত আছে, মমত্ব আছে। ফলে বাণপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পরেই তিনি মহাভারত রচনা করেন। রচনা করেন কৌরব-পাণ্ডববংশের পূর্ব এবং উত্তর ইতিহাস। গোটা মহাভারতটা লিখতে তাঁর তিন বচ্ছর সময় লেগেছিল। হয়তো হাতে-কলমে লেখা যাকে বলে সেভাবে তিনি মহাভারত লেখেননি, কিন্তু মহাভারতের পুরো বয়ানটা মনে মনে পুরো ছকে নিতে তাঁর সময় লেগেছিল তিন বচ্ছর— ত্রিভির্বর্ষৈর্মহাভাগঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। মহাভারত কীভাবে শব্দ-ছন্দ-অলংকারের পরিসরে বাঁধা পড়ল—সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু দুটি ভিন্নতর পরিস্থিতিতে মহাভারতের কথা কী ভাবে আরম্ভ হচ্ছে— সেটা আগে বুঝে নিতে হবে।

মনে রাখা দরকার—উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারতের কথা বলছেন নৈমিষারণ্যে বসে। এখানে তিনি বক্তা। কিন্তু তিনিই আবার শ্রোতা হিসেবে ছিলেন মহারাজ জনমেজয়ের সভায়। সেখানে বক্তা ছিলেন ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন। খেয়াল করে দেখবেন— মূল মহাভারত বলার আগে নৈমিষারণ্যে বসে উগ্রশ্রবা সৌতি মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি সূত্রাকারে বলে গেছেন। এতে সমবেত ঋষিদের মনে বিস্তারিত কাহিনী শোনবার স্পৃহা জেগেছে। অন্যদিকে জনমেজয়ের সভায় বৈশম্পায়নও প্রথমে একই ভাবে সূত্রাকারেই মহাভারতের কথা বলেছেন এবং তাতে জনমেজয়ের বক্তব্য— আপনি বিস্তারিতভাবে সব কাহিনী বলুন মহর্ষি! আমার পূর্বজ মহান পাণ্ডব-কৌরবদের কীর্তিকলাপ এত অল্প শুনে মোটেই তৃপ্তি হচ্ছে না আমার— ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ। বৈশম্পায়ন বিস্তারিতভাবে কাহিনী আরম্ভ করলেন।

amarboi.com

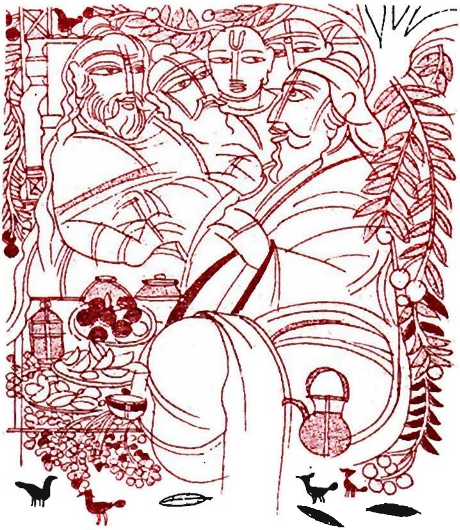

তিন

জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের সভা এবং নৈমিষারণ্য—এই দুয়ের মধ্যে যে ভৌগোলিক দূরত্ব আছে, তার সঙ্গে আছে সময়ের দূরত্ব। ব্যাস যে কাহিনী রচনা করেছিলেন, তার শেষে ছিল ধৃতরাষ্ট্র—বিদুরের জীবন-শেষের পর্ব আর ছিল যদুবংশের ধ্বংস এবং যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান। বৈশম্পায়ন এই পর্যন্তই মহাভারত জানেন। কিন্তু উগ্রশ্রবা সৌতি যখন মহাভারত বলছেন, তখন ক্ষীয়মাণ পাণ্ডব-বংশের অঙ্কুর পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়ে গেছে। আর সেই প্রতিশোধে যে সর্পযজ্ঞ হয়েছিল, সেই যজ্ঞসভায় সৌতি উপস্থিত ছিলেন। ফলত পরীক্ষিতের মৃত্যু এবং জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের বিবরণ আমাদের শুনতে হবে নতুন এই কবিওয়ালার কাছে। তিনি উগ্রশ্রবা সৌতি।

মুশকিল হল— উগ্রশ্রবা সৌতি নতুন কবিওয়ালা। তিনি কেমন বলেন, কেমন তাঁর কথকতা, সে সম্বন্ধে সমবেত ঋষিদের ধারণা নেই। সৌতি অবশ্য এসে ইস্তক থেমে থাকেননি। তিনি ঋষিদের কাছে এ কাহিনী সে কাহিনী বলে যাচ্ছেন। নৈমিষারণ্যের কুলপতি শৌনক অভিজ্ঞ লোক। তিনি নতুন কবিওয়ালাকে স্বাগত জানিয়েছেন বটে, বসতে দিয়েছেন, ফল-মূল সেবা করতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু মূল মহাভারতের কথকতার ব্যাপারে শৌনক এই নতুন কবিওয়ালাকে আগেই তত পাত্তা দেননি। তিনি সৌতিকে বসিয়ে রেখেই চলে গেছেন অগ্নিশরণ গৃহে— যেখানে তাঁর বারো বছরের যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ চলছে।

সৌতি উগ্রশ্রবা অবশ্য থেমে থাকেননি। তিনি তাঁর কথকতার ক্ষমতা দেখিয়ে যাচ্ছেন। দু-চারটে উট্‌কো কাহিনী তিনি বলে যাচ্ছেন নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে। যদিও খাপছাড়া হলেও এগুলি অর্থহীন নয়। তিনি একবার মহাভারতের সংক্ষেপ-সূত্রগুলি বলে যাচ্ছেন, একবার জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথা বলছেন, একবার পরীক্ষিতের মৃত্যুর কথাও বলছেন। আবার

কখনও বা সাপের কথায়, জনমেজয়ের কথার সূত্র ধরে উপমন্যুর কাহিনী, উতঙ্কের কাহিনী, রুরু-প্রমদ্বরার কাহিনীও বলে যাচ্ছেন। পণ্ডিতেরা মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে বেমিল দেখে এই সব কাহিনীর মধ্যে প্রক্ষেপের গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কাহিনীগুলির মধ্যে নতুন কথক-ঠাকুরের আত্মঘোষণা দেখতে পাই। সে-কালের কবিওয়ালাকে ইতিহাস-পুরাণের তত্ত্ব-কাহিনী, লোক-কথা ভাল করে জানতে হত। একইভাবে সেকালের কথক-ঠাকুরদেরও বেদ-উপনিষদের মর্মকথাও জানতে হত। তাঁদের সময়েই যেহেতু ইতিহাস-পুরাণের কথকতা আরম্ভ হয়েছে, অতএব পূর্ববর্তী বেদ-উপনিষদের কল্প-কাহিনীগুলি বলে তাঁরা কথকতার নমুনা দেখাতেন।

মহাভারতের মূল কাহিনী আরম্ভ করার আগে উগ্রশ্রবা সৌতি দেখাতে চাইছেন— তিনি পারবেন। বেদ-উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁর জানা আছে। জানা আছে, পূর্ববর্তী কালের কাহিনীগুলিও। খেয়াল করে দেখবেন— মহাভারতের মূল কাহিনী সবিস্তারে বলার আগে তিনি যতগুলি গল্প বলেছেন তার মধ্যে উপমন্যু, আরুণি ইত্যাদি ঔপনিষদিক কাহিনী যেমন আছে, তেমনই আছে ইন্দ্রস্তুতি, অশ্বিনীকুমারের স্তুতি এবং সূর্য-বিষ্ণুর একাত্মতা। তার মানে মহাভারতের ঠিক আগের যুগের বৈদিক এবং উপনিষদীয় পরিমণ্ডলের সঙ্গে আমাদের কথক-ঠাকুর পরিচিত। কাহিনী বর্ণনার এই পরম্পরার মাধ্যমে উগ্রশ্রবা সৌতি বেদ-উপনিষদের সঙ্গে মহাভারতের কাহিনীর পরম্পরা তৈরি করছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক পালাবদলের টাটকা খবরও তাঁর কাছে পাওয়া যাচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, এ সব কথা তিনি বলছেন যজ্ঞ থেকে অবসর লাভ-করা ঋষিদের কাছে। মহাভারতের মূল কাহিনী তিনি আরম্ভ করতে পারছেন না, কারণ কুলপতি শৌনক তখনও এসে পৌঁছোননি। তিনি সে সময় অগ্নিশরণ-গৃহে। অগত্যা তিনি শুধু জনমেজয়ের কাহিনী বলে যাচ্ছেন। জনমেজয়কে তিনি দেখেছেন। তিনি তাঁর সর্পযজ্ঞে গেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা— সেখানে তিনি মহাভারত শুনেছেন। পুরুবংশের শেষ পুরুষের সঙ্গে তাঁর একটা পরিচয় আছে— এই মর্যাদাতেই তিনি এখন শুধু জনমেজয়ের কথা বলছেন। বলতে পারেন, আমরা মহাভারত শুনতে বসেছি, ওসব জনমেজয়ের গল্প শুনব কেন? আমরা বলব, একটা বিয়ে করতে গেলে— মশাই আপনার মাতুল অমুক চন্দ্র অমুকের মেয়ের সঙ্গে আমার শালার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, আপনার বন্ধুর পিতৃদেব আমার পিসেমশাই হন— ইত্যাদি সম্পর্ক খুঁজে কথা জমাবার চেষ্টা করেন। আর এখানে মহাভারতের মতো একটা মহাকাব্য শুনবেন, অথচ জনমেজয়ের কথা শুনবেন না, তাঁর দুঃখ-সুখের কথা শুনবেন না, তা কি হয়? তাছাড়া ভারতে সমাজ-সম্বন্ধ অনেক। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমাজ আমাদের আদর্শ নয়। আমাদের আদর্শ গোষ্ঠীতন্ত্র, গুষ্টিসুখ। এখানে একজনের পরিচয় জানতে গেলে, তাঁর বাবার কথা শুনতে হয়, গুরুস্থানের কথা শুনতে হয়, এমনকি সেই গুরুর অন্য শিষ্যদের কথাও শুনতে হয়। তবে বোঝা যায় যাঁর কথা বলছি, তিনি লোকটা কী রকম? সৌতি উগ্রশ্রবাও তাই জনমেজয়ের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। যতক্ষণ কুলপতি শৌনক অগ্নিশরণ-গৃহ থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে ফিরে না আসেন, ততক্ষণ আমরাও একটু জনমেজয়কে বুঝে নিই।

সৌতি উগ্রশ্রবা সর্পযজ্ঞের কথা বলতে বলেছিলেন— এই আমি উতঙ্কের চরিত্র কীর্তন করলাম। জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের অন্য কারণ এই উতঙ্ক— ময়া উতঙ্কস্য চরিতমশেষমুক্তং, জনমেজয়স্য সর্পসত্রে নিমিত্তান্তরমিদমপি। উতঙ্কের কথাটা আমরাও বলতে উদ্‌যুক্ত হয়েছি

এই কারণে যে, মহারাজ জনমেজয়ের তিনি গুরুভাই। অবশ্য এখনকার দিনে শাক্ত বৈষ্ণব সমাজে যেমন গুরুভাই দেখি, তেমন গুরুভাই তিনি নন। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।

উতঙ্কের গুরুর নাম বেদ। গৃহস্থ, ব্রহ্মর্ষি, মহা পণ্ডিত। জনমেজয় এই বেদকে এক সময় নিজের উপাধ্যায় হিসেবে বরণ করেন। উপাধ্যায় হিসেবে বেদ ছিলেন ভারি ভাল মানুষ। সেকালের দিনে বিদ্যা লাভ করার জন্য শিষ্যদের অসম্ভব কষ্ট করতে হত। সংযমের শিক্ষা এবং নির্বিচারে গুরুবাক্য পালন করার মধ্যে এতটাই কাঠিন্য ছিল যে, তাঁদের গুরুগৃহ-বাসের সময়গুলি গল্পে পরিণত হয়েছে। মহর্ষি বেদের অন্য দুই গুরু-ভাই আরুণি এবং উপমন্যুর গুরু-সেবার স্তরগুলি আমাদের কাছে কল্প-কাহিনীর মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেদ যখন গুরুগৃহে ছিলেন তখন তাঁকেও ভার বইতে হত গোরুর মতো। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বালাই নেই। সমস্ত সময়টা শুধু গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করা। এমনিভাবে চলতে চলতে গুরু একদিন প্রসন্ন হলেন, বেদকে বিদ্যা দান করলেন। গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়িতে এসে বেদ বিয়ে করে গৃহস্থ হলেন।

মানুষ যখন ছাত্র থাকে, তখন সে যে যে কষ্ট পায়, যেভাবে কষ্ট পায়—বড় হয়ে তা দূর করার চেষ্টা করে। মহর্ষি বেদ এখন গুরুর আসনে বসেছেন। তবু ছাত্রাবস্থায় গুরুর আশ্রমের দিনগুলি তাঁর স্মরণে আসে। তিনি শিষ্যদের দিয়ে কোনও কষ্ট করাতে চান না, তাঁদের খাটিয়ে নিতে চান না, এমনকি গুরুশুশ্রূষাও করতে বলেন না— স শিষ্যান্ন কিঞ্চিদুবাচ কর্ম বা ক্রিয়তাং গুরুশুশ্রূষা বেতি। গুরুগৃহবাসের দুঃখ তিনি জানেন, অতএব তিনি সেই কষ্ট শিষ্যদের দিতে চান না।

মহর্ষি বেদের তিন শিষ্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন উতঙ্ক। উতঙ্ক ব্রহ্মচারী গুরুগৃহবাসী। বেদের অন্য দুই শিষ্য দুই ক্ষত্রিয় রাজা— একজন তো জনমেজয়, অন্যজন রাজা পৌষ্য।

উতঙ্ক যখন গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাস করছেন, তখন এক সময় মহর্ষি বেদের প্রয়োজন হল অন্য জায়গায় যাওয়ার। সেকালের দিনে বেদের মতো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিজের পড়া এবং অন্যকে পড়ানো নিয়েই দিন কাটাতেন। এর মধ্যে তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে অন্যের যজ্ঞ করার নিমন্ত্রণ আসত। তাঁরা যেতেন, যজমান ধনী হলে দক্ষিণাও পেতেন ভাল। দুধেলা গোরুও মিলত। এই দক্ষিণার টাকা আর গোরুর দুধ খেয়ে অন্য সময় তাঁদের কষ্টে-সৃষ্টে চলে যেত। এর মধ্যে বাড়িতে যে দু-চারজন শিষ্য থাকতেন, তাঁদের ভরণ-পোষণও চলত।

ব্রহ্মচারী উতঙ্কও, এইভাবেই ছিলেন গুরুর বাড়িতে। যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পেয়ে গুরু বেদ শিষ্যকে বললেন, বাড়িতে তুমি রইলে। যদি কোনও অসুবিধে হয় একটু দেখো। যদি কোনও ঝামেলাও হয় সামাল দিও। বেদ চলে গেলেন। বাড়িতে থাকলেন তাঁর যুবতী স্ত্রী এবং ব্রহ্মচারী উতঙ্ক। ইতিমধ্যে বেদের পত্নী ঋতুমতী হলেন। সেকালে স্ত্রীলোকের ঋতুরক্ষার একটা ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। অর্থাৎ স্ত্রী ঋতুমতী হলে ঋতুস্নানের পর যে কোনও উপায়েই তাঁর সঙ্গমের ব্যবস্থা করতেই হবে। হয়তো সমাজে এই নিয়ম যখন চালু হয়েছিল, তখন স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অল্প এবং সন্তানের চাহিদা ছিল বেশি। তাছাড়া কামশাস্ত্রের মতে এই সময়টাতে নাকি স্ত্রীলোকের আসঙ্গলিপ্সা প্রবল হয় এবং সন্তান ধারণের পক্ষেও নাকি সময়টা যথেষ্ট উপযোগী এবং উর্বর। ফলে যেনতেন প্রকারেণ ঋতুস্নাতা স্ত্রীলোকের সঙ্গমেচ্ছা পূরণ করাটা তখন ধর্মের তাৎপর্যে গ্রহণ করা হত।

মহর্ষি বেদের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর বান্ধবীরা এসে উতঙ্ককে জানাল, তোমার

AMARBOI.COM

অধ্যাপকের স্ত্রী ঋতুমতী হয়েছেন। এদিকে তোমার অধ্যাপক বিদেশে। তুমি এমন ব্যবস্থা কর যাতে এঁর ঋতুকাল নিষ্ফল না হয়। তাছাড়া এই কারণে তোমার অধ্যাপক-পত্নীও যথেষ্ট বিষণ্ণ হয়ে আছেন— এষা বিষীদতি ইতি। একেবারে শেষ বাক্যে অধ্যাপকের স্ত্রীর যে পুরুষান্তর-সংসর্গে আপত্তি নেই সেটাও জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু উতঙ্ক সংসর্গকামিনী এই রমণীর ইচ্ছা একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন।

হয়তো দীর্ঘদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে বেদ-পত্নীর মন এই যুবক পুরুষটির প্রতি সরস হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সরসতার সুযোগ উতঙ্ক নেননি। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে, সেকালের সমাজে যাঁরা একটা সময়ে গুরু হয়ে বসতেন, তাঁদের জীবনের বহুলাংশ কেটে যেত বিদ্যালাভে। ফলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে তাঁদের দেরি হয়ে যেত। বিয়ে করার পক্ষে বয়স বেশি হয়ে গেলেও বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ্যের কারণে অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে পেতেও তাঁদের অসুবিধে হত না। তাছাড়া বয়স বেশি হলেও ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ঋষি-মুনিদের সরসতা কম ছিল না। বড় ঘরের মেয়ে, রাজার ঘরের সুন্দরী মেয়েদের তাঁরা মন দিতে ভালবাসতেন। কবি যতই বলুন—

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক-রুক্ষ মুনির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে—

আমরা জানি ঋষি-মুনির হৃদয় মোটেই জ্যামিতি আর বীজগণিতের তত্ত্বের মতো ছিল না। ভাগবত পুরাণের সৌভরি মুনি, অথবা রামায়ণ-মহাভারতের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, পরাশর-ভরদ্বাজ—কেউই স্ত্রীলোকের মন নিয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করেননি। সময়কালে সে সব কথা আসবে।

আমি যা বলছিলাম সেটা একটা সমস্যার কথা। প্রৌঢ়-বৃদ্ধ মুনি-ঋষিরা যে সব মেয়েকে বিয়ে করে আনতেন, তাঁদের বয়স যেহেতু কম হত, তাই তাঁদের নিয়ে সমস্যাও কিছু ছিল। এঁদের মধ্যে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ জানি না— এমন সতী-সাধ্বী মহিলা যথেষ্টই ছিলেন। কিন্তু সেকালের কতগুলি সাবধান-বাণী থেকে কতগুলি সমস্যাও সঠিক ধরা যায়। যেমন রামায়ণ, মহাভারত বা মনু সংহিতার মতো প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে গুরুগৃহবাসী শিষ্যদের বারবার শাসন করা হয়েছে যে, তাঁরা যেন গুরুপত্নীর সঙ্গে বেশি মেশামিশি না করে। মনু মহারাজ তো একেবারে চোখ রাঙিয়ে বলে দিয়েছেন যে, দেখ বাপু। শিষ্য যদি বিশ বছরের যুবক হন— আর গুরুর গিন্নিটি যদি হন যুবতী, তাহলে গুরু সেবার নাম করে গুরুমার গায়ে তেল মাখানো, কি স্নান করানো, কি ঝামা দিয়ে পিঠ ঘষে দেওয়া— এ সব তো বারণই, এমনকি প্রণাম করার ছুতো করে গুরুপত্নীর পা ছোঁয়াও একেবারে বারণ।

এই বারণ-সাবধান থেকে যে কথাটা বেরিয়ে আসে, তা হল গুরুগৃহে যুবক শিষ্য এবং যুবতী গুরুপত্নীর অধিকরণ-সামীপ্য। দূরত্বটা বহির্বাটী এবং অন্তর্বাটীর হলেও ইনিও আছেন, উনিও আছেন। এখন সমস্যাটা হল— প্রৌঢ় অথবা অতিরিক্ত বিদ্যাব্যসনী স্বামীর ঘর করতে করতে কখনও কোনও বসন্তের উতলা হাওয়ায় কোনও যুবতী গুরুপত্নী যদি একটি সমান-বয়সী শিষ্যের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, তবে সেটা অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। অন্যদিকে গুরুপত্নী-গমনের জন্য গুরুগৃহবাসী শিষ্যের অনন্ত নরকবাস নির্দিষ্ট থাকলেও যুবক শিষ্য বয়সের ধর্মে ব্রহ্মচর্য ভেঙে রমণে প্রবৃত্ত হতেন। ছোট-খাটোদের কথা

AMARBOI.COM

ছেড়েই দিন, দেবতা বলে পরিচিত ইন্দ্র গৌতম পত্নী অহল্যার রূপ-মুগ্ধ হয়ে গুরু গৌতমের সাজ নিয়েই অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন। আর রামায়ণের কবি সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, অহল্যা তাঁর স্বামীর শিষ্যটিকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তবু যে তিনি ইন্দ্রের বাহুবন্ধনে শয্যাশায়িনী হয়েছিলেন, তার কারণ নাকি— দেবরাজ ইন্দ্রের রমণ কেমনতর, তাই দেখবার জন্য— দেবরাজ-কুতূহলাৎ। আর প্রসিদ্ধ পাণ্ডব-কৌরব বংশের উৎপত্তিই যে হয়েছিল গুরুপত্নী-গমনের ফলে— সে কথায় আমি পরে আসব।

তাই বলছিলাম— যুবক শিষ্য এবং যুবতী গুরুপত্নীর সমানাধিকরণ যদি প্রৌঢ়-বৃদ্ধ গুরুগৃহটি হয়, তবে তাঁদের পারস্পরিক সরসতা অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক ছিল না সেকালে এবং তার সামাজিক কারণ তো ছিলই। গুরুর অনুপস্থিতিতে এবং গুরুপত্নীর বান্ধবীদের তাড়নায় বেদ-শিষ্য উতঙ্ক তো রীতিমতো এক ধর্মীয় সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ঋতু-রক্ষার কাজটা যতই ধর্মীয় হোক, উতঙ্ক রাজি হলেন না। গুরু-পত্নীর বান্ধবীদের তিনি বললেন— তোমাদের মতো মেয়েদের কথায় আমি মোটেই নাচতে রাজি নই। আমার গুরুমশাই আমাকে নানা কাজের কথা বলে তাঁর ঘর সামলাতে বলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমায় তিনি এটা বলে যাননি যে, দরকার হলে আমার স্ত্রীর ঋতুরক্ষার মতো অকাজটাও তুমি করে দিও— ন হ্যহমুপাধ্যায়েন সন্দিষ্টঃ অকার্য্যমপি ত্বয়া কার্য্যমিতি।

উতঙ্ক রাজি হলেন না। গুরুপত্নীর বান্ধবীরাও সলজ্জে চলে গেল। মহর্ষি বেদ ফিরে এলেন প্রবাস থেকে। বাড়িতে এসে সব কথা শুনে উতঙ্কের ওপর ভারি খুশি হলেন তিনি। ঋতু-রক্ষার ছুতোয় উতঙ্ক যে তাঁর প্রিয়া পত্নীকে ধর্ষণ করেননি— এই স্বস্তিটুকু তাঁকে আরও সুখী করে তুলল। উতঙ্ককে তিনি সমস্ত বিদ্যায় অধিকার দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পাওয়াটা যে কোনও ক্লিষ্ট ছাত্রের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু যাওয়ার আগে উতঙ্কের মনে হল যে, তিনি গুরুর কাছে পেয়েছেন অনেক, দেননি কিছুই। একে তো মহর্ষি বেদ শিষ্যদের পরিশ্রম বেশি করান না, অন্যদিকে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করায় উতঙ্ককে তিনি অন্যদের থেকে তাড়াতাড়ি বিদ্যায় অধিকার দিয়েছেন। সব কিছু মিলে উতঙ্কের মনে হল—প্রতিদান না হোক, অন্তত কৃতজ্ঞতা হিসেবে তাঁর কিছু গুরুদক্ষিণা দেওয়া উচিত গুরুকে। উতঙ্ক বললেন, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি আপনাকে কিছু গুরুদক্ষিণা দিয়ে ধন্য হই।

মহর্ষি বেদ এতই খুশি ছিলেন উতঙ্কের ওপর যে, একবারও তিনি চাননি যে, তাঁর শিষ্য কোনওভাবে গুরুদক্ষিণার জন্য কোথাও বিড়ম্বনা লাভ করেন। কারণ সেকালে অনেক গুরুই বিদ্যাদানের শেষ কল্পে এমন সব অকল্পনীয় গুরুদক্ষিণা চাইতেন যে, শিষ্যদের পক্ষে তা জোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। বস্তুত যে ছাত্র গুরুগৃহে স্নাতক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল অথবা কঠিন কোনও বিদ্যা লাভ করল গুরুর কাছ থেকে, তার দক্ষিণা দেওয়ার ক্ষমতা ছাত্রদের হত না। তাদের টাকা-পয়সা, ঐশ্বর্য-বিত্ত এমন কিছু থাকত না যে, তাই দিয়ে গুরুদক্ষিণা মেটানো যায়। স্নাতক বা বিদ্যাবান ছাত্রেরা গুরুদক্ষিণার জন্য প্রায় সব সময়েই রাজা বা অন্যান্য বিত্তশালী লোকের দ্বারস্থ হতেন এবং বিত্তশালী লোকেরা যেহেতু প্রায় সব সময়েই বিদ্যোৎসাহী হতেন, অতএব উপায় থাকলে গুরুদক্ষিশার ব্যাপারে তাঁরা কখনও নিরাশ করতেন না। আমরা রঘুবংশের রঘু, হরিশ্চন্দ্র এবং আরও অনেক রাজার নাম করতে পারি, যাঁরা গুরুদক্ষিণার ব্যাপারে অশেষ উদারতা দেখিয়েছেন। সেই তুলনায় মহর্ষি বেদের দক্ষিণা-কামিতা সামান্যই।

উতঙ্কের মুখে গুরুদক্ষিণার প্রস্তাব শুনে মহর্ষি বেদ প্রথমে বলেছিলেন, বৎস উতঙ্ক! আরও কিছুদিন থাকো এখানে, পরে যা হোক বলব। কিছু দিন গেল। উতঙ্ক আবার বললেন, আপনি আদেশ করুন। কী প্রিয়কার্য করব আপনার জন্য। বেদ একটু রেগেই গেলেন। বললেন, সেদিন থেকে বার বার তুমি এই 'গুরুদক্ষিণা-গুরুদক্ষিণা' করে আমায় বিরক্ত করছ। তুমি তোমার গুরুপত্নীকে জিজ্ঞসা করো— তিনি যা বলবেন, তাই এনে দাও— এষা যদ্ ব্রবীতি তদুপহরস্ব ইতি।

ব্রাহ্মণ-গুরু মহর্ষি বেদের কথা ভেবে আশ্চর্য হই। নিজেকে গুরুগৃহে কষ্ট করতে হয়েছে বলে কোনওদিন তিনি কোনও শিষ্যকে গুরুসেবার কষ্ট দেননি। অন্যদিকে আপন পরিবারের জন্য তাঁর কত মমতা। দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ কোনওদিন পূরণ করতে পারেননি। শিষ্য পড়িয়ে আর সাংসারিক দু-এক বারের যজমানিতে তাঁর এমন কিছু সাচ্ছল্যের উদয় হত না, যা দিয়ে তিনি পত্নীর জাগতিক সাধ আহ্লাদ পূরণ করবেন। তাই আজকে উতঙ্ক বারবার গুরুদক্ষিণা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, সেই সুযোগে তিনি স্বাধিকার ত্যাগ করে আপন প্রিয়া পত্নীর কাছেই তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন— তদ্‌গচ্ছ এনাং প্রবিশ্য উপাধ্যায়ানীং পৃচ্ছ।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের পত্নীর স্বপ্নই বা কতটুকু? তিনি বললেন, পৌষ্য রাজার ক্ষত্রিয়া পত্নী কানে যে কুণ্ডল-দুটি পরে থাকেন, সেই কুণ্ডল-দুটি তুমি রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এস। উতঙ্ক চললেন পৌষ্য রাজার কাছে। মনে রাখবেন— এই পৌষ্য রাজা কিন্তু সম্পর্কে উতঙ্কের গুরুভাই। কারণ মহর্ষি বেদের অন্য দুই শিষ্য হলেন পৌষ্য এবং জনমেজয়। হয়তো পৌষ্য রাজা কোনওদিন সস্ত্রীক এসেছিলেন গুরুদর্শন করতে, আর বেদপত্নী হয়তো সেই অবসরে রাজরানির রত্নখচিত কানের দুল-দুটি দেখেছিলেন,— বড় ভাল লেগেছিল, কানের দুটি কুণ্ডল মাত্র এক রমণীকে এত রমনীয় করে তোলে! গরিব ব্রাহ্মণীর সেই থেকে বড় শখ ছিল— এমন দুটি কুণ্ডল যদি তিনি পেতেন? ব্রাহ্মণ-গুরু মহর্ষি বেদকে এ কথা তিনি কোনওদিন বলতে পারেননি। বলা কি যায়? যাঁর সম্বল একটি দুগ্ধবতী গাভী আর কতগুলি শিষ্য, তিনি কোথা থেকে এই সোনার কুণ্ডল এনে দেবেন তাঁকে? কিন্তু বেদ বোধহয় এই শখের কথা জানতেন এবং জানতেন বলেই উতঙ্কের কাছে নিজে কিচ্ছুটি না চেয়ে প্রিয়া পত্নীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পৌষ্য রাজার বাড়ির পথ খুব সুখের হয়নি উতঙ্কের কাছে। যাই হোক নানা ঝামেলা পুইয়ে শেষ পর্যন্ত রাজার বাড়ি পৌঁছলেন তিনি। পৌষ্য ব্রাহ্মণ স্নাতক দেখামাত্রই দান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। উতঙ্ক বললেন,— আপনার স্ত্রী যে কুণ্ডল দুটি পরেন, আমি সেই দুটি চাই গুরুদক্ষিণার জন্য। পৌষ্য বললেন,— তাহলে আমি কেন, আপনি আমার স্ত্রীর কাছেই কুণ্ডল দুটি প্রার্থনা করুন—প্রবিশ্যান্তঃপুরং ক্ষত্রিয়া যাচ্যতাম্। যাঁরা ভাবেন সেকালে স্ত্রীলোকের কোনও অধিকারই ছিল না, তাঁদের জানাই— অন্তত স্ত্রীলোকের গয়না-গাঁটির ওপরে তাঁর নিজস্ব আইনসঙ্গত অধিকার ছিল। একে বলা হত স্ত্রী-ধন। মনুসংহিতাই বলুন অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—এঁরা কেউই পুরুষকে স্ত্রীধন ব্যবহারের অনুমতি দেননি। রাজা পৌষ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন— পত্নীর কানের দুল দান করার অধিকার তাঁর নেই। তিনি নিজেও সে কথা স্ত্রীকে বলতে পারবেন না। কাজেই স্ত্রীর কানের দুল নিতে হলে উতঙ্ককে তাঁর কাছেই যাচনা করে নিতে হবে।

উতঙ্ক পৌষ্য-পত্নীর কাছে গেলেন। প্রথমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে বিলম্ব হলেও

amarboi.com

পৌষ্য-রাজার ক্ষত্রিয়া পত্নী উতঙ্কের কথা শোনামাত্র তাঁর কানের কুণ্ডল দুটি খুলে তাঁর হাতে দিলেন। কিন্তু কুণ্ডল দুটি দেওয়ার সময় পৌষ্য-পত্নী উতঙ্ককে সাবধান করে দিয়ে বললেন,—দেখুন এই দুল-দুটির ওপর নাগরাজ তক্ষকের খুব লোভ আছে। কাজেই মহর্ষি বেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার সময় আপনি সাবধানে যাবেন। উতঙ্ক বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেবী! নাগরাজ তক্ষক আমার কিছুই করতে পারবে না।

নাগরাজ তক্ষকের কথায় আমি পরে আসছি। তার আগে পৌষ্য রাজার সঙ্গে উতঙ্কের কিছু উতোর-চাপান আছে, সেটা সেরে নিই। রাজমহিষীর কাছ থেকে কুণ্ডল দুটি নিয়ে উতঙ্ক পৌষ্য রাজার কাছে এসে বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি পৌষ্য, কুণ্ডল দুটি আমি পেয়েছি। পৌষ্য বললেন, এতকাল পরে এমন সৎপাত্র পেলাম, এমন গুণবান অতিথি পেলাম, তো একটু অন্ন-জল মুখে দিয়ে যাবেন না? একটু বসুন আপনি। রাজার আগ্রহ দেখে উতঙ্ক বললেন, ঠিক আছে বসছি। কিন্তু আপনার ঘরে খাবার-দাবার যা কিছু যে অবস্থায় আছে, তেমনই দেবেন। আমার তাড়া আছে খুব—শীঘ্রমিচ্ছামি যথোপপন্নম্ অন্নমুপস্কৃতং ভবতা। পৌষ্য বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে যেমনটি আপনি চান। এই কথা বলে তাঁর ঘরে অন্ন-পান যেমনটি যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই নিয়ে এলেন উতঙ্কের কাছে।

রাজামশাই বলে কথা। তিনি তো আর রান্নাঘরের খবর রাখেন না। ব্রাহ্মণ স্নাতক ঘরে উপস্থিত, তিনি তাড়াহুড়ো করছেন, অতএব বিনা দ্বিধায় ভাত-ডাল যেমনটি পেয়েছেন, তেমনটিই এক অনুপযুক্ত দাসীকে দিয়ে উপস্থিত করেছেন উতঙ্কের সামনে। কিছুই ভাল করে দেখেননি, আর উতঙ্ক দেখতে বলেনওনি। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল একেবারে এবং সেই ভাতের মধ্যে একটি চুলও পড়ে ছিল। রাজা পৌষ্য একটুও খেয়াল করেননি সেদিকে।

খাবারের পাত্রখানি দেখেই উতঙ্কের খুব খারাপ লাগল। চুল দেখে হয়তো ঘেন্নাও। রাগ করে বললেন, তুমি আমাকে এই রকম অপবিত্র খাবার খেতে দিলে? তুমি অন্ধ হবে জেনো—অশুচ্যন্নং দদাসি, তস্মাদন্ধো ভবিষ্যসি। আসলে উতঙ্ক ভেবেছেন— রাজা ভাতের ওপর চুলটি দেখেও অন্ধের মতো তাই খেতে দিয়েছেন, অতএব অন্ধ হওয়ার অভিশাপ। রাজা ভাবলেন—আচ্ছা বিপদ। উতঙ্ক নিজের তাড়াহুড়ো আছে বলে ভাত-ডাল যেমন রাঁধা আছে, তেমনই চাইলেন। আর এখন তাঁকেই অভিশাপ দিচ্ছেন? পৌষ্য রাজাও কিছু কম নন। তিনিও মহর্ষি বেদের শিষ্য। সৎ জীবন যাপন করেন, আপন কর্তব্যে স্থির। উতঙ্কের অন্যায় অভিশাপ শুনে তিনিও প্রতিশাপ উচ্চারণ করলেন উতঙ্কের উদ্দেশে— আমার নির্দোষ অন্ন-পানে তুমিও যখন অন্যায়ভাবে দোষারোপ করছ, তখন তুমিও নির্বংশ হবে।

AMARBOI.COM

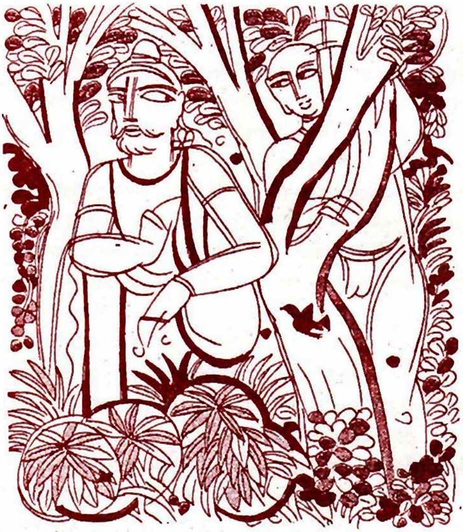

চার

কত সাধারণ ঘটনা থেকে কত অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল। উতঙ্কের ভাবটা আমরা বুঝি। তুমি খেতে বলছ আগ্রহ করে, কিন্তু আমারও তাড়া আছে। কিন্তু তাড়া আছে বলেই তুই চুল-পড়া ঠাণ্ডা ভাত অতিথিকে খেতে দিবি? পেটে সয় না বলে নেমন্তন্ন-বাড়িতে যদি বলি— ঠিক আছে, একটা রসগোল্লা দিন, তাহলে সেই একটাই দিবি? পাত্র ভরে না দিলে যে অবহেলার মতো মনে হয়। তুই পাত্র সাজিয়ে দে, আমিও একটাই তুলে নেব। তোরও ভদ্রতা থাকল, আমারও ভদ্রতা থাকল। উতঙ্কেরও এই দশা। যেমনটি আছে দিতে বলেছেন বলে, তেমনটিই দিতে হবে! এত দূর পথ বেয়ে এসেছেন, খিদের মুখে একটু গরম ভাত, ঝরঝরে পরিষ্কার করে খেতে দিয়ে পৌষ্য যদি বলতেন, সামান্য দেরি হল, ঠাকুর! সজ্জন অতিথি ব্রাহ্মণকে ঠাণ্ডা ভাত দিই কী করে— তাহলে কি উতঙ্ক মেনে নিতেন না?

আবার রাজার দিক থেকেও ব্যাপারটা দেখুন। ব্রাহ্মণ-অতিথি তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন, কারণ মহর্ষি বেদের পত্নী উতঙ্কের ফিরে আসার সময়-সীমা বেঁধে দিয়েছেন আগেই। উতঙ্কও যথেষ্ট তাড়াহুড়ো করছেন এবং যেমন ঘরে আছে তেমন খাবার প্রস্তাব তিনিই দিয়েছেন। যেখানে শীঘ্রতাই প্রধান গুরুত্বের বিষয়, সেখানে দেরি করলেও তো অভিশাপ জোটার কথা। কিন্তু রাজার কপাল এমনই অভিশাপ জুটেই গেল। কিন্তু তিনি যেহেতু উতঙ্ক যেমন বলেছেন, তেমনই করেছেন তাই জোরটা তাঁর দিক থেকে বেশি। সেইজন্য প্রতিশাপ দিতে তাঁর দেরি হয়নি। উতঙ্কও সেটা বুঝেছেন; আর বুঝেছেন বলেই তিনি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আপনি যে উলটে আমাকে শাপ দিলেন, এটা বোধহয় ঠিক নয়। আপনি যে খাবারটা আমাকে দিলেন, একটু ভাল করে দেখুন সেটা। রাজা পৌষ্য দেখলেন এবং বুঝলেন। যে দাসী এই অন্ন নিয়ে এসেছিল, সে রাজবাড়িতে কাজের অবসরে চুল খুলে বসে ছিল। রাজার তাড়া

দেখে খোলা চুলেই সে অন্ন নিয়ে ছুটেছিল। মাথার ঝাঁকুনি অথবা হাওয়ায় চুল উড়ে এসে পড়েছিল উতঙ্কের খাবারে। রাজা অন্ন দেখেই নিজের অন্যায় স্বীকার করে উতঙ্ককে খুশি করার চেষ্টা করলেন। বললেন, না জেনে অন্যায় করেছি, আপনি অভিশাপ-মুক্ত করুন আমাকে। আমি যেন অন্ধ না হই।

উতঙ্ক বললেন, আমি তো মিথ্যা কথা বলি না। তবে আপনি একবার অন্ধ হয়েই আবার চোখ ফিরে পাবেন। তবে আপনিও একটু ভাবুন—আপনি যে আমায় নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দিলেন— সেটাও আর খাটবে না তো? রাজা বললেন, আপনার করুণার কথা শুনে আমার ভাল লাগল। কিন্তু আমি আমার শাপ ফিরিয়ে নিতে পারব না। সে ক্ষমতাই আমার নেই। কারণ আমার রাগ এখনও যায়নি। উতঙ্ক ভাবলেন—এ তো বেশ মজা! তিনি শাপটি প্রত্যাহার করে নিলেন, আর রাজার অভিশাপটা রয়েই গেল? রাজা পৌষ্য বললেন, দেখুন ঠাকুর! আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, দয়ার শরীর। আপনাদের মুখের কথার ধার খুব বেশি, কিন্তু হৃদয়টা ননীর মতো। একেবারে গলে যায়— নবনীতং হৃদয়ং ব্রাহ্মণস্য বাচি ক্ষুরো নিহিতস্তীক্ষ্ণধারঃ। আর আমরা হলাম ক্ষত্রিয়— আপনাদের উল্‌টো জাত। আমাদের মুখের কথা খুব মিষ্টি একেবারে ননী ঝরছে মুখে, গলে গলে যাচ্ছে—ক্ষত্রিয়স্য বাঙ্‌-নবনীতম্। কিন্তু হৃদয়টা ক্ষুরের মতো ধারালো, তীক্ষ্ণ-কঠিন।

নাগরাজ তক্ষকের কাহিনীর আগেই উগ্রশ্রবা সৌতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই যে সামান্য চরিত্র-বিচারটুকু করে নিলেন, তার কারণ মহাভারতের তাবৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে এই হৃদয়বৃত্তিগুলি আমরা দেখতে পাব। ইতিহাস-পুরাণ জুড়ে ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষির সম্বন্ধে যে সামাজিক আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছে পরবর্তীকালে, তার পেছনে ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদা বা সুবিধাভোগ যতবড় কারণ, তার চেয়েও বড় কারণ এই আপাত-কঠিন স্বভাব। অন্যায়, অভব্যতা দেখামাত্র, শোনামাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছনো এবং তা থেকে অভিশাপ পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়া। কুত্রাপি এমনও দেখা যাবে, যেমন এই উতঙ্ক-পৌষ্যের কাহিনীতেও দেখা গেল যে, অপরাধ তত না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের অনুমানমাত্রেই অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে ব্রাহ্মণের মুখে। লৌকিক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের আপাতিক এই দুঃস্বভাব অত্যন্ত কঠিন মনে হলেও লোক-ব্যবহারে এর তাৎপর্য আছে। অন্য উদাহরণ টেনে এনে কথা বাড়াব না, তাৎপর্যটা এই উতঙ্ক-পৌষ্যের কাহিনী থেকেই একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক জায়গায়— পিতাকে দেবতার মতো দেখো, মাকে দেবতার মতো দেখো, আচার্যকে দেবতার মতো সম্মান করো ইত্যাদি বাণী পড়তে হত। ছোটবেলায় এগুলো বাণীর মতোই লাগত, এখন সেটা খানিকটা উপলব্ধিতে আসে। তৈত্তিরীয়ের এই একই প্রসঙ্গে বলা আছে— কাউকে যদি কিছু দাও, তো সাহংকারে দিও না, মনে বিনয় রেখে সলজ্জে দিও। যদি দিতে হয়, তো তার মধ্যে মধ্যে যেন শ্রী থাকে সৌন্দর্য থাকে, ছিছিক্কার করে ছুঁড়ে-মুড়ে দিও না, দেওয়ার মধ্যে যে শ্রী অর্থাৎ 'ছিরি' থাকে— হ্রিয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। এর পরে আছে মোক্ষম কথাটা। তৈত্তিরীয় বলেছে— যদি দিতে শ্রদ্ধা হয়, তবেই দিও। আর দিতে যদি ইচ্ছা না হয়, যদি শ্রদ্ধা না হয়, তবে দিও না বরং, তাও ভাল— শ্রদ্ধায় দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।

এই যে শেষে নেতিবাচক কথাটা শুধু শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে বলা হল অর্থাৎ শ্রদ্ধা না থাকলে দিও না, এই নেতিবাচক ভাবটুকু অন্যত্রও প্রযোজ্য অর্থাৎ দেওয়ার মধ্যে 'ছিরি' না থাকলে দিও না,

অবিনয় থাকলে দিও না। রাজা পৌষ্য ব্রাহ্মণ স্নাতককে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেই খেতে দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর খেতে দেওয়ার মধ্যে সেই শ্রী, সেই পরিচ্ছন্নতা ছিল না। অন্ন শীতল, কেশযুক্ত। শুধুমাত্র এই নিরীক্ষণী শ্রীর অভাবেই উতঙ্ক আজ দুঃখিত। তবে রাজা ভুল স্বীকার করে নিতেই উতঙ্ক তাঁকে শাপমুক্ত করেছেন এবং রাজাকে বুঝিয়ে গেছেন যে, শাপ প্রত্যাহারের ক্ষমতা তাঁর না থাকলেও রাজাই যেহেতু দোষী, অতএব তাঁর শাপ উতঙ্কের গায়ে লাগবে না। যাই হোক পৌষ্য-পত্নীর কানের দুল দুটি নিয়ে উতঙ্ক পথ চলতে আরম্ভ করলেন। রাজমহিষীর কথায় নাগরাজ তক্ষক সম্বন্ধে মনে তাঁর সাবধানতা আছে ঠিকই, তবে তত ভীত তিনি নন, যতখানি রাজমহিষী তাঁকে বলেছেন।

এখানে একটা কথা আমায় বলে নিতে হবে। পণ্ডিতেরা উতঙ্ক পৌষ্যের কাহিনীকে মহাভারতের মৌলাংশে স্থান দেবেন না। অর্থাৎ তাঁদের মতে এটা প্রক্ষেপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে—ইতিহাসের দিক থেকে এ কাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। মহাভারতের কথকঠাকুর সৌতি উগ্রশ্রবা যখন এ কাহিনী বলছেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের হাওয়া এসে গেছে ভালরকম। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বৌদ্ধধর্মের প্রভাব রুখবার জন্য সবরকম ভাবে চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় বৌদ্ধ-ক্ষপণকদের চোর সাজিয়ে নিন্দা করে উগ্রশ্রবা সৌতি তাঁর নিজের কালের হাওয়া লাগিয়ে দিয়েছেন মহাভারতের গায়ে। এবারে আসল ঘটনায় আসি।

উতঙ্ক পথে নেমেই দেখতে পেলেন— একজন উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর পিছন পিছন আসছেন। তাঁকে কখনও দেখা যাচ্ছে আবার কখনও সে লুকিয়ে পড়ছে উতঙ্কের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে। এইভাবে একসময় উতঙ্ক তাঁকে দেখতে পেলেন না এবং নিশ্চিন্তে কুণ্ডল দুটি একটি পুকুরের পাড়ে রেখে জলে নেমে স্নান-আহ্নিক সেরে নেবার ইচ্ছা করলেন। উতঙ্ক পুকুরে নেমেছেন—এই অবসরে সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে রাজরানির কানের দুল-দুটি নিয়ে পালালেন। উতঙ্ক সন্ধ্যা-বন্দনা কোনওরকমে সেরে পুকুর থেকে উঠে দেখলেন—সন্ন্যাসী পালাচ্ছেন। উতঙ্ক তাঁর পিছু নিলেন।

এই যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল, ইনিই কিন্তু নাগরাজ তক্ষক। তিনিই নগ্ন ক্ষপণকের বেশ ধরে রাজরানির কুণ্ডল চুরি করেছেন। বস্তুত এই চুরির দায়টা সোজাসুজি তক্ষকের ওপর চাপালেই হত। কিন্তু তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধরা কত খারাপ, চুরি-তস্করতার মতো হীন কাজ তারা কী রকম নির্দ্বিধায় করে— ধর্মের বৌদ্ধিক স্তরে এটা প্রমাণ করা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পক্ষে জরুরি ছিল। সৌতি উগ্রশ্রবা সমাজের এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মহাভারতের কথা বলছেন। অতএব বৌদ্ধ ক্ষপণকের ভণ্ড বেশ তিনি কাজে লাগিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই প্রক্ষেপ তাই ভয়ঙ্কর রকমের গুরুত্বপূর্ণ।

উতঙ্ক ছুটতে ছুটতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে ধরে ফেললেন। সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে আপন বেশ ত্যাগ করে নাগরাজ তক্ষকে পরিণত হল এবং তাঁকে ধরার সাধ্য হল না উতঙ্কের। সামনে একটি গর্ত দেখেই সর্পরাজ সেখানে ঢুকে পড়লেন এবং সেই গর্তের ভিতর দিয়েই সোজা চলে গেলেন পাতালে, একেবারে সটান নিজের বাড়িতে। যেন সাপ বলেই তাঁর এত সুবিধে হল, আর মানুষ বলে উতঙ্ক আর তাঁকে ধরতে পারলেন না। বুঝতে পারছি এখানে আরও দুটো কথা আমায় বলতে হবে।

দেখুন, আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, আরে মশাই! কী যে আপনারা বলেন? তক্ষকের

দংশনে নাকি পাণ্ডব-কুলের কনিষ্ঠ পুরুষ পরীক্ষিতের মৃত্যু হল। বলি, সাপের ব্যাপারে খবর রাখেন কিছু? এই যে তক্ষক সাপ বলছেন, সর্পতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তক্ষকের কোনও বিষই নেই বলে রায় দিয়েছেন। আর আপনারা মহাভারত খুলে, ভাগবত পুরাণ খুলে বারবার বলতে থাকবেন— তারপর সেই ফলের ভিতরে থাকা তক্ষক সাপের বিষের জ্বালায় পরীক্ষিত মরলেন। এটা কী কোনও যুক্তি হল?

আমরা বলি, আপনারা হাজার হাজার বছর আগের লেখা পুরাণ কথা শুনছেন, মহাভারত শুনছেন। সেটাকে কি ওইভাবে বিচার করলে চলবে? পৌরাণিকদের কথাবার্তা, ভাব-মর্ম শুধু কি এক জায়গা থেকে বুঝলেই হবে? পূর্বাপর বিচার করতে হবে না? তার ওপরে কাহিনীর খোলস আছে, আছে পৌরাণিকদের নানা আবরণ। এই তো এই উতঙ্কের কাহিনীতে এখনই শুনবেন— তক্ষক গর্তে ঢুকে পড়ার পর উতঙ্ক লাঠি-খোন্তা দিয়ে গর্তটাকে বড় করার চেষ্টা করলেন। নিজে পারলেন না, তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্র ফাটিয়ে সেই গর্তটাকে বড় করলেন। আর সেই বিস্তৃত গর্তপথে প্রবেশ করে উতঙ্ক যখন পাতালে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর চক্ষু ছানা-বড়া হয়ে গেল। তিনি দেখলেন— নাগলোকের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে মন্দির আছে, রাজভবন আছে, বড় বড় বিল্ডিং আছে, চিলে কোঠা আছে, এবং নাগেদের বড় বড় বাড়িতে নানারকমের 'হুক্' পর্যন্ত সাঁটা আছে, এমনকি খেলার মাঠও আছে—অনেকবিধ-প্রাসাদ-হর্ম্য-বলভী-নির্যূহ-শত-সঙ্কুলম্ উচ্চাবচ-ক্রীড়াশ্চর্য- স্থানাবকীর্ণমপশ্যৎ।

তক্ষকের বিষে আপনার বিশ্বাস নাই থাকতে পারে, কিন্তু সর্পরাজ্যে যে রকম ঘর-বাড়ি আর প্রাসাদ-হর্ম্য-বলভী দেখলাম— তক্ষককে সাপের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলিও তাহলে বিশ্বাস করা যায় না। তাই বলছিলাম, পুরাণকারদের কথা-বার্তা, ভাবনা-চিন্তা অত হঠাৎ সিদ্ধান্তের জিনিস নয়। তার পিছনে আমাদেরও একটু ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। যে কথাটা প্রথমেই মনে রাখা দরকার, সেটা হল— দেবতা, অসুর, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব-কিন্নর, হনুমান, জাম্ববান অথবা সর্পনাগ—এঁদের অন্তরীক্ষ লোকের কোনও বাসিন্দা ভাবার কোনও কারণ নেই। আমি অবশ্যই পরম ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্মা সম্বন্ধে কোনও কথা বলছি না। কিন্তু মহাভারত-পুরাণ এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র থেকেও দেবতা-রাক্ষস অথবা নাগ-সর্পদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা যাবে। এঁদের ঠিকানার জন্য অলৌকিক কোনও স্বর্গ অথবা পৃথিবীর গভীরে কোনও পাতাল-প্রবেশের দরকার নেই— এঁরা সবাই এই সুন্দরী পৃথিবীর চিরকালের বাসিন্দা। স্বর্গ, নরক, গন্ধর্বলোক, নাগলোক— এগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, পরে সময়মতো নির্ণয় করে দেখাব। কিন্তু এখন জেনে নিন তক্ষক এবং অন্যান্য নাগের কথা।

আর্যায়ণের প্রথম কল্পে যাদের আমরা দেবতাদের বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পেয়েছি। ঋগ্-বেদে তাঁদের নাম দাস বা দস্যু। মহাকাব্যের পূর্ব যুগ থেকেই এই বিরোধী গোষ্ঠীকে আমরা অসুর-রাক্ষস নাম দিয়েছি এবং দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের চিরন্তনী শত্রুতা সর্বজনবিদিত। মহাকাব্যের যুগে প্রধানত মহাভারতের যুগেই অসুর-রাক্ষসদের আর তত দেখতে পাবেন না, আস্তে আস্তে চতুবর্ণ-বিভাগে তাঁরা স্থান করে নিতে পেরেছেন। আর্যরা যখন সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের উত্তরখণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে থাকলেন, তখন এই নাগদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। নাগেরা অবশ্যই আরণ্যক গোষ্ঠী, বনে-জঙ্গলেই তাঁদের বাস ছিল, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদার মতো নদীর ধারেও তাঁদের বসতি দেখা যাচ্ছে।

প্রথম দিকে নাগ জন-জাতিরা তাঁদের এই নতুন শত্রুদের তত আমল দেননি, কিন্তু আর্যরা

যখন শহর গড়ার দিকে মন দিলেন, তখন এঁদের বসতির ওপর আর্যদের হাত পড়ল, আর সেই থেকেই শত্রুতার শুরু। মহাভারত আলোচনার পরবর্তী সময়ে দেখবেন— অর্জুন যখন পাণ্ডবদের রাজধানী বানানোর জন্য খাণ্ডব-বন পুড়িয়ে দিলেন, তখন সেখান থেকে তক্ষক-নাগকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। এই তক্ষক আর কেউ নয়, কোনও সাপ তো নয়ই, প্রাচীন নাগগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান। পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলি— ওই যে হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, তক্ষশিলার নাম শোনেন—কুরু-পাণ্ডবদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের রমরমা হওয়ার আগে এইসব জায়গায় নাগ-জন-জাতিরই রাজত্ব ছিল। যমুনার মধ্যে বিষধর কালীয়-নাগের মাথায় কৃষ্ণের নর্তন-কূর্দন নাগ-জনজাতির পরাজয় যতটুকু সূচনা করে, তার চেয়ে অনেক বেশি সূচনা করে তার পূর্বাধিপত্য।

ভাগবত পুরাণ অথবা ২য়/৩য় শতাব্দীর বিখ্যাত ভাসের নাটক— যাই খুলুন, দেখবেন— যমুনার জল কেউ স্পর্শ করে না, তাতে নাকি কালীয়-নাগের বিষ মেশানো আছে। আসলে এখানে যমুনা বলতে আমরা যমুনা নদী বুঝি না, যমুনার উপকূলবর্তী অঞ্চল বুঝি। ঠিক যেমন 'আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকি' বললে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির বোঝায় না, তার কাছাকাছি অঞ্চল বোঝায়, তেমনই এইসব জায়গাতেও মুখ্যার্থের বাধা হয়। আসলে কালীয় কিংবা বাসুকি কেউই যমুনার জলে বা সাগরের জলে থাকেন না; তাঁদের জায়গা পণ্ডিতদের মতে জলা জায়গা, বন-জঙ্গল অরণ্যভূমি। কৃষ্ণ কালীয়কে তাড়িয়ে দিয়ে যমুনার জলকে বিষমুক্ত করেছিলেন বলে যে মাহাত্ম্য আছে, তা আসলে নাগ জন-জাতির আরেক প্রধানকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা।

এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতামত ব্যক্ত করে আরও দশ পাতা লেখা যায়, কিন্তু তাতে মূল ঘটনার খেই হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। এখানে শুধু এইটুকু মাথায় রাখতে হবে যে, খাণ্ডব-দাহের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের সঙ্গে তক্ষকের শত্রুতা শুরু হয়। এবং 'পরিক্ষীণ' পাণ্ডব-বংশের শেষ পুরুষ পরীক্ষিতের ওপর প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে এই পালার শেষ সূচনা হয়। ধাতু-প্রত্যয় নিষ্পন্ন করে বাননটা 'পরীক্ষিত', 'পরীক্ষিত' অনেক রকম হয়। আমরা চালু বানান পরীক্ষিতই বলব।

AMARBOI.COM

তক্ষক কি কালীয়, বাসুকি কি অনন্ত—এঁদের ঘরবাড়ি মানুষের মতোই, ভাষাও যথেষ্ট সংস্কৃত এবং আর্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এঁদের ওঠাবসা বিয়ে-থাও যথেষ্ট হয়েছে। আপাতত তক্ষক আর উতঙ্কের বৃত্তান্তে দেখব— উতঙ্ক বড় বড় নাগগোষ্ঠীর প্রধানদের মনোরম-স্তুতি রচনা করেছেন এবং নাগরাজ তক্ষক পৌষ্য-পত্নীর দুল দুটি ফিরিয়েও দিয়েছেন। উতঙ্ক গুরুপত্নীর কাছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর আশীর্বাদও পেয়েছেন। কিন্তু তক্ষক তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে এবং তাঁকে যে পরিমাণ হেনস্তা করেছে, তাতে তাঁর ক্রোধ চূড়ান্ত হয় এবং তিনি তাঁর গুরুভাই হস্তিনাপুরের রাজা জনমেজয়ের কাছে উপস্থিত হয়েছেন তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ তুলতে— ক্রুদ্ধঃ তক্ষকং প্রতিচিকীর্ষমাণো হস্তিনাপুরং প্রতস্থে। অন্য রাজা বাদ দিয়ে জনমেজয়ের কাছে তাঁর যাওয়ার কারণও ছিল। কারণ একটাই। জনমেজয়ও তক্ষকের শত্রু। তক্ষক তাঁর পিতা পরীক্ষিতকে মেরেছেন।

উতঙ্ক হস্তিনাপুরের রাজসভায় পৌঁছনোর আগে আগেই জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করে ফিরে এসেছেন। গবেষকরা এমনও মনে করেন যে, জনমেজয়ের তক্ষশিলা-অভিযানও নাগ-জাতীয় জন-জাতিকে পর্যুদস্ত করার জন্য। কারণ ইতিহাস-মতে এই অঞ্চলে নাগদের

প্রভুত্ব এবং ক্ষমতা দুই ছিল। 'তক্ষক' শব্দের সঙ্গে তক্ষশিলার মিল এবং সেখানে বৌদ্ধ-প্রভাবের অনুষঙ্গে তক্ষকের নগ্ন ক্ষপণকের বেশ ধারণও এই নিরিখে ব্যাখ্যা করা। যাই হোক এত তর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা আপাতত উতঙ্কের আক্রোশ লক্ষ্য করব। উতঙ্ক বললেন, যে কাজ আপনার করা উচিত ছিল, মহারাজ সেই কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

ইঙ্গিতটা অবশ্যই তক্ষশিলা-বিজয়ের দিকে। তক্ষশীলার নাগজাতীয়দের অনেকেই জনমেজয়ের হাতে পর্যুদস্ত হলেও তক্ষকের এখনও কিছুই হয়নি। উতঙ্ক তাই বললেন, সেই তক্ষক নাগ আপনার বাবাকে মেরেছে—তক্ষকেশ মহীন্দ্রেন্দ্র যেন তে হিংসিতঃ পিতা— আপনি তাঁকে মারার কথা ভাবুন, আপনি বালকের মতো অন্য কাজ করে যাচ্ছেন—বাল্যাদিবান্যদেব ত্বং কুরুতে নৃপসত্তম। উতঙ্ক জনমেজয়কে চেতিয়ে দিয়ে বললেন,তক্ষক বিনা অপরাধে আপনার বাবা পরীক্ষিতকে দংশন করেছে। শুধু কি তাই? আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য মহামুনি কাশ্যপ আসছিলেন, তক্ষক তাঁকেও কায়দা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। অতএব এই অবস্থায় অন্য কিছু নয়, আপনি সর্প-যজ্ঞ করুন যাতে তক্ষককে পুড়িয়ে মারা যায়। উতঙ্ক এবার রাজাকে জানালেন— তক্ষক তাঁকে হেনস্তা করেছে। সব শুনে জনমেজয় একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, মহাভারতের উপমায় সেটা—আগুনে ঘি—দীপ্তোঽগ্নি ইবিষা যথা।

পাঁচ

কাহিনী জমে উঠেছে। উগ্রশ্রবা সৌতির গল্পে সমবেত মুনি-ঋষিরা এখন রীতিমতো 'সাসপেনস' নিয়ে বসে আছেন। উতঙ্ক জনমেজয়কে ক্ষেপিয়ে তোলার পর তিনি কী করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সৌতি কিন্তু কিছু বললেন না, সাসপেনসটা ধরে রাখলেন। উতঙ্কও যে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের একটা কারণ—এইটুকু বলেই সৌতি বললেন, বলুন আর কী শুনতে চান? কীই বা আর বলব— কিং ভবন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছন্তি, কিমহং ব্রবাণি ইতি।

ঋষিরা অনেকক্ষণ গল্প শুনেছেন। কুলপতি শৌনক তখনও অগ্নিশরণগৃহে। ঋষিদের একটু লজ্জাই করল। এই বারো বছরের যজ্ঞ মহর্ষি শৌনকেরই ঘাড়ে। মূল দায়িত্ব তাঁর বলে ব্যস্ততাও তাঁর বেশি। ঋষিরা মজাসে গল্প শুনছেন, আর ওদিকে কুলপতি শৌনক—কোথায় যজ্ঞকাষ্ঠ, কোথায় সোম-রস, কোথায় কোন বৈদিক বসবেন—এ সব নিয়ে মরছেন। সমবেত ঋষিদের লজ্জা হল। তাঁরা বললেন—সৌতি! কুলপতি শৌনক আসুন এখানে। আমাদের তো অনেক কিছুই শুনতে ইচ্ছা। কিন্তু কী জান, দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব-মনুষ্য-নাগ—এঁদের খবর কুলপতি শৌনকও ভাল মতো রাখেন—মনুষ্যোরগ-গন্ধর্ব-কথা বেদ চ সর্বশঃ। কাজেই তিনি এলে আমাদের প্রশ্ন করারও যুত হবে।

অর্থাৎ সৌতি উগ্রশ্রবার ফাঁকি দেবার উপায় নেই। যাঁরা জানেন অল্প, তাঁদের কাছে গল্প ফাঁদা এক জিনিস, কিন্তু শৌনকের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান প্রাধ্যাপকের সামনে ফাঁকি চলবে না। কাহিনীকার এবং সহৃদয় রসিক শ্রোতা এক সঙ্গে বসবেন, তবেই না মহাকাব্যকথা আরম্ভ হবে। তা মহর্ষি শৌনক এসে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। তিনি কিন্তু এসেই আগে কিছু শুনতে চাইলেন না। নতুন কথক-ঠাকুর কেমন কতখানি জানেন তিনি, সেসব খোঁজ-ভাঁজ নিয়ে তবে তিনি আসল কথায় যাবেন। নতুন কথককে পরীক্ষা করার জন্য তিনি বললেন— তোমরা বাবা

রোমহর্ষণ ছিলেন পুরাণ-বিজ্ঞ মানুষ; স্বয়ং ব্যাসের কাছে তাঁকে মহাভারতের কাহিনী পড়তে হয়েছে। তা বাপু, তুমিও কি সেইরকম পড়াশুনা করে এসেছ—ক্বচিৎ ত্বমপি তৎ সর্বমধীষে লৌমহর্ষণে—নাকি ফাঁকি আছে তোমার বিদ্যায়? আচ্ছা বেশ, থাক এসব কথা—তুমি বরং একটু ভৃগু-বংশের কাহিনী বলো দেখি, শুনি—শ্রোতুমিচ্ছামি ভার্গবম্। সৌতি উগ্রশ্রবার পরীক্ষা আরম্ভ হল। আসলে শৌনক যে সব ছেড়ে ভৃগুবংশের কথাটাই প্রথম শুনতে চাইলেন, তার কারণ—তিনি নিজেও ভৃগুবংশীয়। আত্মবংশের সব কিছুই তাঁর জানা। সৌতি উগ্রশ্রবার তাই বড় পরীক্ষা সামনে।

ভৃগু-বংশের নাম শোনা মাত্রই পণ্ডিতরা কিন্তু টান-টান হয়ে বসেন। সুক্‌থঙ্কর থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য—অনেক পণ্ডিতেরই ধারণা যে, মহাভারত-রচনা, বিশেষত মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশে ভৃগুবংশীয়দের ভাল রকম হাত আছে। আমি সেই সব বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। মহাভারত যেমনটি আমাদের হাতে এসেছে, তাই নিয়েই আমাদের বিচার। তবে হ্যাঁ, পণ্ডিতরা যে সৌতি উগ্রশ্রবাকে মহাভারতের 'থার্ড এডিটর' বলেছেন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। প্রসঙ্গত বলি— তাঁদের মতে মহাভারতের প্রথম সম্পাদক ব্যাসদেব, দ্বিতীয় সম্পাদক ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন, যিনি জনমেজয়কে মহাভারত-কথা শুনিয়েছেন। আর আমাদের 'থার্ড এডিটর' সৌতি উগ্রশ্রবা—যেমনটি বৈশম্পায়ন এবং তাঁর পিতা রোমহর্ষণের কাছে পুরাণ-কথা, ভারতের ইতিহাস শিখেছেন,তেমনটি আমাদের বলেছেন। বেশির মধ্যে এই, তাঁর কাহিনীতে আছে তাঁর নিজের কালের হাওয়া, নিজের সময়ের সমস্যা এবং সংকট। সেও তো সামাজিক ইতিহাসই বটে, না হয় সেটা কিছু পরবর্তী সময়ের, তাতে আমাদের কী অসুবিধে? আমরা সেটাও জানতে চাই।

সৌতি উগ্রশ্রবা বলতে আরম্ভ করলেন। মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী ছিলেন পুলোমা। আগেই জানিয়ে দিই— প্রথম কল্পে ব্রহ্মা যাঁদের দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করেছিলেন, ভৃগু তাঁদের অন্যতম। ওদেশে যাঁকে আমরা 'অ্যাডাম' বলে ডেকেছি, আমাদের দেশে ওরকম 'অ্যাডাম' অন্তত দশজন আছেন। তাঁদের বলা হয় ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁদের মধ্যে জনা পাঁচেক ব্রহ্মবাদী হয়ে ব্রহ্মসাধনে মন দিলেন, আর অন্য পাঁচজন বিবাহাদি করে সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেন। আমাদের ভৃগু এই দ্বিতীয় দলের। তাঁর স্ত্রীর নাম পুলোমা। তিনি যথেষ্ট সুন্দরী, কিন্তু তাঁর স্বভাবটা ভৃগুর মতোই অর্থাৎ এঁর সঙ্গে ওঁর মত মিলত খুব— কথকঠাকুরের ভাষায়—সমশীলিনী। ঋষির সঙ্গে আনন্দে তাঁর দিন কাটছে, এরই মধ্যে ভৃগুর সন্তান এল পুলোমার গর্ভে।

মহর্ষি ভৃগু একদিন গর্ভবতী স্ত্রীকে আশ্রমে একা রেখে বেরিয়েছেন নদীতে স্নান করার জন্য। ব্রাহ্মণ মানুষ; স্নানে একটু সময় লাগে—সন্ধ্যা আহ্নিক, সূর্য-প্রণাম আর অবগাহন করতে যে সময় লাগে, সে সময় খুব কম নয়। এরই মধ্যে একটি রাক্ষস এসে পৌঁছলেন ভৃগুর আশ্রমে। ভৃগুর সুন্দরী স্ত্রীটিকে দেখে রাক্ষসের মন বড় পুলক হল, বেশ কামাবেশও হল। লক্ষণীয় ব্যাপার হল—এই রাক্ষসের নামও পুলোমা।

দুই পুলোমা—অর্থাৎ ভৃগুর স্ত্রী পুলোমা এবং রাক্ষস পুলোমা—এই দুজনের দেখা হওয়ার আগেই একটা জ্ঞানের কথা শোনাই। মনে রাখতে হবে— 'রাক্ষস' শব্দটা শোনামাত্রই আপনারা যাঁরা পুরুষ্টু গোঁফওয়ালা বিশাল দাঁতওয়ালা, হা-হা-ধ্বনিযুক্ত কতগুলি জীবের কল্পনা করেন, তাঁদের আমরা রীতিমতো নিরাশ করব। রাক্ষসেরা সকলেই দেবতাদের বৈমাত্রেয় ভাই এবং তাঁদের বাবা একজনই— মহর্ষি কাশ্যপ। পুরাণে-ইতিহাসে এবং দর্শনে যেমনটি আছে

amarboi.com

তার বিস্তৃত আলোচনায় গেলে আপনারা আবার আমাকে জ্ঞানদাতা ঠাকুরদাদাটি ভাববেন বলে তার মধ্যে যাচ্ছি না, যদিও গেলে ভাল হত। তবে জেনে রাখুন— তাঁরা ভাল রকম সংস্কৃত জানতেন, বেদ-বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের জ্ঞানও তাঁদের বেশ টনটনে। দেবতাদের থেকে তাঁদের গুণ কোথাও কোথাও বেশি। বস্তুত তাঁদের মতো ইঞ্জিনিয়ার এবং শিল্প-রসিক তো সে যুগে কমই ছিল। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা অথবা ময়-দানবের তৈরি ইন্দ্রপ্রস্থ অথবা ত্রিপুর দুর্গ স্মরণ করলেই রাক্ষসদের শিল্প-সত্তার পরিচয় পাবেন আপনারা। দেখতেও তাঁরা কেউ খারাপ নন, রীতিমতো সুপুরুষ।

এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও কতগুলি দোষই এঁদের একেবারে রাক্ষস করে ছেড়েছে। দোষের মধ্যে প্রধান হল ছয় রিপু, বিশেষত কাম-ক্রোধ তাঁদের এতই বেশি প্রবল, অপিচ নিজের ওপর তাঁদের সংযমও এতই কম যে, শুধু ষড়-রিপুই তাঁদের রাক্ষস বানিয়ে দিল। নইলে দেখুন, দেবতা-রাক্ষসে যতই শাশ্বতিক বিরোধ থাক, তাঁদের মধ্যে এমনিতে মিলটাই বেশি। বিয়ে-থাও কিছু কম চলত না। এই পুলোমা রাক্ষসের কথাই ধরুন। পুরাণে-ইতিহাসে 'পুলোমা' নামে কিন্তু দু-তিন জন রাক্ষস আছেন। রাক্ষসদের পুরো একটা গুষ্টিকেও তাঁদের মায়ের নামে পুলোমার গুষ্টি বলা হয়েছে মহাভারতে। পুলোমা আর কালকা—একজন দৈত্য-সুন্দরী অন্যজন অসুর-সুন্দরী— পুলোমা নাম দৈতেয়ী কালকা চ মহাসুরী। এঁরা দু'জনেই তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে নিজেদের ছেলেদের জন্য বর চেয়ে নিয়েছিলেন। এই পুলোমার ছেলেরাই পৌলোম-গুষ্টির রাক্ষস—পৌলোমৈশ্চ মহাসুরৈঃ।

পুলোমা নামে এই রাক্ষস-সুন্দরীর কথা বলে নিলাম এইজন্য যে, রাক্ষসদের মধ্যে পুলোমা নামটা মেয়েদেরও চলত, ছেলেদেরও চলত। এই রকমটা ব্রাহ্মণ-ঋষিদের মধ্যেও চলত, যেমন আস্তীক-মুনির পিতা জরৎকারু মুনির পত্নীও জরৎকারু, যদিও এই স্ত্রী-জরৎকারু নাগ-বংশের মেয়ে। সে কথা পরে। কারণ দেবরাজ ইন্দ্র যাঁকে সপ্রেমে বিয়ে করেছিলেন, সেই শচী-দেবী কিন্তু এক রাক্ষসেন্দ্র পুলোমার মেয়ে। শচীদেবীকে অনেকেই আদর করে পৌলোমী বলে ডাকেন। এখনকার অনেক মা'ও সাদরে কন্যার নাম দেন পৌলোমী। এমন রাক্ষুসে নাম শুনে দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমার বক্তব্য, দুটো আলাদা আলাদা উদাহরণ থেকে এটা কিন্তু বেশ প্রমাণ হল যে, পুলোমা নামটা রাক্ষস-দৈত্যদের মধ্যে বেশ চলত। আমার তো বেশ সন্দেহ হয়, মহর্ষি ভৃগু হয়তো এক রাক্ষসীকেই বিয়ে করেছিলেন, হয়তো রাক্ষস-ঘরেরই এক পরমা সুন্দরী কন্যা তিনি। এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ এই মুহূর্তে কিছু দিতে পারছি না বটে, তবে পুরাণে ইতিহাসে এ তাবৎ যত 'পুলোমা' পাওয়া গেছে, সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, তাঁরা সবাই রাক্ষস-ঘরের সন্তান। ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখলে ভৃগুর স্ত্রী পুলোমার সঙ্গে রাক্ষস পুলোমার পূর্ব-পরিচয় থাকাও অসম্ভব নয় এবং সত্যি বলতে কি পূর্ব-পরিচয় ছিলও।

যাই হোক, ভৃগু-মুনি স্নান করতে গেছেন, আর এই অবসরে রাক্ষস পুলোমা ঢুকে পড়লেন তাঁর আশ্রমে। তাঁর বেশ-বাস বা চেহারার মধ্যে কোনও রাক্ষুসেপনা ছিল না। কেননা সুন্দরী পুলোমা তাঁকে দেখে ভয়ও পাননি, লজ্জাও পাননি। বরং সেকালের আতিথ্যের আদর্শে থালায় করে বেশ কিছু ফল-মূল খেতে দিয়ে ঘরে নেমন্তন্ন করলেন রাক্ষসকে—ন্যমন্ত্রয়ত বন্যেন ফল-মূলাদিনা তদা। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও—অন্তত রাক্ষস ততটাই ভদ্র যে, বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও পুলোমার মনে কিন্তু ভৃগুপত্নীকে পাবার জন্য কামনা ছিল—হৃচ্ছয়েনাভিপীড়িতম্। রাক্ষস পুলোমা ভাবলেন—এই সুযোগ। বাড়িতে ভৃগু-মুনি নেই। এই

amarboi.com

অবস্থায় অসামান্যা রূপবতী ভৃগুপত্নীকে হরণ করে নিয়ে যাবেন তিনি। আজ থেকে ভৃগুপত্নীকে আপন বাহুর ডোরে পাবেন তিনি—এই চিন্তায় বড় খুশি হয়ে উঠলেন রাক্ষস পুলোমা—হৃষ্টমভূদ্ রাজন জিহীর্ষুস্তাম্ অনিন্দিতাম্।

মনে মনে তাঁর খুশি হওয়ার একটা কারণও ছিল। রাক্ষস পুলোমা দেবীকে আগেই চিনতেন। হয়তো সেই পুতুল-খেলার বয়স থেকে, হয়তো বা পৌগণ্ডের দিন-শেষে যেদিন যৌবনের উদ্ভেদ দেখা দিল পুলোমার শরীরে, সেদিনই জনান্তিকে রাক্ষস বরণ করেছিল এই অনুপমা সুন্দরীকে—সা হি পূর্বং বৃতা তেন পুলোম্না তু শুচিস্মিতা। সুন্দরী পুলোমা হয়তো সে কথা জানতেন। হয়তো বা জানতেন না। কিন্তু পুলোমার বাবা অন্তত জানতেন যে, রাক্ষস পুলোমা তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে রাক্ষসের এই মনন-বরণ পুলোমার বাবা পছন্দ করেননি।

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ যেভাবে এই দুই যুবক-যুবতীর হৃদয় ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বেশ বুঝতে পারি—অতিরিক্ত বেদাভ্যাসের ফলে তার বুদ্ধি হয়তো খানিকটা কালিদাসীয় পদ্ধতিতে জড় হয়ে গিয়েছিল—বেদাভ্যাসজড়ঃ। নইলে ভাবুন একবার, নীলকণ্ঠ যখন মহাভারতের শ্লোকে দেখলেন—পুলোমা রাক্ষস ভৃগুর সঙ্গে বিয়ের আগেই সুন্দরী পুলোমাকে চেয়েছিলেন এবং পুলোমার বাবা সেটা জেনেও মেয়েকে তাঁর হাতে দেননি, তখনই তিনি ব্যাখ্যা করলেন—ছোটবেলায় তাঁর মেয়ে পুলোমা যখন কেঁদে কেঁদে একসা হত, তখন তাঁর বাবা তাঁকে ভয় দেখিয়ে বলতেন—আয় তো রাক্ষস। ধরে নিয়ে যা, এক্ষুনি ধরে নিয়ে যা এই মেয়েটাকে—বাল্যে কিল রুদতীং কস্যাং রোদননিবৃত্ত্যর্থং ভীষয়িতুং পিত্রা উক্তং 'রে রে রক্ষ! এনাং গৃহাণেতি।' নীলকণ্ঠের ধারণা—এই রকম কোনও ভয় দেখানোর সময় পুলোমা রাক্ষস কথাগুলি শুনতে পায় এবং মেয়েটিকে মনে মনে বরণ করে।

বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আমার ভাবনা এতটা বাৎসল্যময়ী নয়। নির্দোষ তো নয়ই। আমি এই ঘটনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে পরিচিত দুই মুগ্ধ হৃদয়ের স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাই। সুন্দরী পুলোমার পিতা এই হৃৎ-স্পন্দন অস্বীকার করেছেন। তিনি এই যুবক-যুবতীকে মিলিত হতে দেননি। এবং তার কারণ দুটো হতে পারে। পুলোমা যদি রাক্ষস-ঘরের মেয়ে হন, তবে অধিকতর উৎকৃষ্ট পাত্রের জন্য তাঁর পিতার অপেক্ষা থাকতে পারে। আর পুলোমা যদি আর্যগোষ্ঠীরই মেয়ে হয়ে থাকেন, তবে তথাকথিত অনার্য রাক্ষসের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় তাঁর আর্যজনোচিত শুদ্ধতায় আঘাত লাগতে পারে।

যাই হোক, রাক্ষস পুলোমা এত-শত বোঝেন না। তিনি জানেন—তাঁর সঙ্গে বঞ্চনা করা হয়েছে। সুন্দরী পুলোমার বাবা লুকিয়ে ভৃগুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন মেয়ের। রাক্ষস তাতে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। এতদিন পরে তিনি তাঁর পুরাতনী নায়িকাকে খুঁজে পেয়েছেন। রাক্ষসের ঘরে জন্মে এমন শুচিবাইও তাঁর নেই, যাতে শুধু অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে পূর্ব-পরিচিতা অথবা যৌবন-মুখর দিনের প্রথম চাওয়া রমণীটিকে ছেড়ে দেবেন তিনি। রাক্ষস ভৃগুপত্নীকে অপহরণ করার মতলব করল।

ভৃগু যখন স্নানে গেছেন, তখনও তাঁর ঘরে পবিত্র হোমাগ্নি জ্বলছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে যজ্ঞের আগুন কখনও নির্বাপিত হয় না। ঘরের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে গার্হপত্য অগ্নি জ্বলছে, সেই আগুন থেকে আগুন নিয়েই ব্রাহ্মণের অন্য যজ্ঞ-প্রক্রিয়া চলে। ভৃগুপত্নীকে হরণ করার আগে সেই পবিত্র আগুনের দিকে রাক্ষসের চোখ পড়ল। আর্য-গোষ্ঠীর চরম বিশ্বাসের প্রতীক

এই আগুনকেই সাক্ষী মানলে রাক্ষস। বললেন,—সত্যি করে বলো তো তুমি, এই সুন্দরী পুলোমা কার বউ?

রাক্ষস রীতিমতো বৈদিক পদ্ধতিতে অগ্নিকে স্তুতি করে বললন—তোমাকে না সবাই দেবতাদের মুখ বলে ডাকে? তা সেই মুখে সত্যি করে বলতো— পুলোমা আসলে কার বউ? আমিই তো তাঁকে প্রথম আমার স্ত্রীরূপে বরণ করেছিলাম—ময়া হীয়ং বৃতা পূর্বং ভার্যার্থে বরবর্ণিনী? কিন্তু তারপর? এই রমণীর পিতা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাকে বঞ্চিত করে এঁকে ভৃগুর হাতে সম্প্রদান করেছেন। পুলোমা অগ্নিকে অনুনয় করে বললেন, আচ্ছা তুমিই বলো আগুন, কাজটা কি ঠিক হল? আচ্ছা, সে যদি বা লুকিয়ে চুরিয়ে কোনও চক্রান্তে ভৃগুর স্ত্রী হয়েও থাকে, সেয়ং যদি বরারোহা ভৃগোর্ভার্যা রহোগতা, তথাপি ন্যায়ত সে আমারই স্ত্রী কি না—তুমিই সত্যি করে বল। সেই যেদিন থেকে এঁর বাবা অন্যের হাতে দিয়ে দিয়েছেন আমারই বরণ করা বধূকে, সেদিন থেকে মনে আমার আগুন জ্বলছে—প্রদহন্নিব তিষ্ঠতি।

পুলোমা অগ্নিকে এবার তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত জানালেন। বললেন—সুন্দরী পুলোমা আমারই স্ত্রী হবেন বলে সম্পূর্ণ নির্ধারিত ছিল। সেখানে মাঝখান থেকে ভৃগু যে তাঁকে বিয়ে করে ফেলেছেন—এতে আমি নিশ্চয়ই খুব পুলকিত বোধ করছি না—অসম্মতমিদং মে'দ্য। তুমি জেনে রেখ, আগুন! আজ আর আমি ছাড়ব না, আজকে তাঁরই আশ্রম থেকে তাঁর স্ত্রীকে হরণ করব আমি।

ঠিক কথাটি বলবার জন্য অর্থাৎ সুন্দরী পুলোমা ন্যায়ত তাঁরই স্ত্রী, নাকি ভৃগুর—এই শঙ্কা নিবারণের জন্য রাক্ষস পুলোমা অগ্নিকে যেভাবে বলেছিলেন তাতে মহাভারত যদি বেদ হত, তাহলে এতক্ষণ আমরা একটি অগ্নিসূক্ত শুনতে পেতাম। বৈদিকরা অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বলেই কল্পনা করেছেন, কারণ মানুষের দেওয়া আহুতি-দ্রব্য দেবতারা অগ্নির মুখ দিয়েই গ্রহণ করেন—অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্—এবং রাক্ষস পুলোমাও তাই বলেছে। অগ্নি মানুষের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী, সর্বজ্ঞ এবং তিনি সমস্ত মানুষের প্রাণজ্যোতি—বৈদিকরা এই ভাবেই অগ্নির কল্পনা করেছেন যার শেষ পরিণতি—আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পুণ্য কর। রাক্ষস পুলোমার মুখে বৈদিক ঋষির অগ্নি-স্তুতি শুনে মহাভারতের মধ্যে যেমন বেদের প্রতিষ্ঠা দেখতে পেলাম, তেমনই রাক্ষসদের সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণাটাও বা কিছু ঠিক হল। অর্থাৎ বৈদিক রীতি-নীতি রাক্ষসদের কিছু অজানা ছিল না।

পুলোমা রাক্ষস যেভাবে অগ্নিকে সাক্ষী ঠাউরেছেন, তাতে এখন অগ্নি-দেবতাকে ভাবতে এবং দেখতে লাগছে ঠিক মানুষের মতোই। মহামতি যাস্ক, যিনি প্রথম বৈদিক অভিধানকার বলে চিহ্নিত, তিনি অবশ্য অনেকের মত সংকলন করে বলেছেন—দেবতাদের বুঝি বা মানুষের মতোই দেখতে—পুরুষবিধাঃ স্যুঃ। মানুষের হাত-পা, চোখ-মুখ, গায়ের রং—সবই বৈদিকরা দেবতাদের মধ্যেও দেখেছেন। এখানে তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নয় শুধু, আমরা অগ্নিকে রাক্ষস পুলোমার দুঃখে দুঃখিতও হতে দেখছি—তস্যৈতদ্ বচনং শ্রুত্বা সপ্তার্চির্দুঃখিতো ভৃশম্। রাক্ষস পুলোমা যে বঞ্চিত হয়েছেন, সে কথা অগ্নি মনে মনে মানেন ঠিকই, কিন্তু এই যে ভৃগুমুনি—আগুন থেকেই যাঁর জন্ম এবং যিনি স্বয়ং ভগবানের বুকেও পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন—সত্যি কথা বললে তাঁর ক্রোধ থেকে নিস্তার পাবেন কী করে?

এদিকে মিথ্যা কথা বলার ভয়, অন্যদিকে ভৃগুর অভিশাপের ভয়—অতএব দুই দিক রক্ষা করেই অগ্নি বললেন—দানব! তুমিই যে আগে এই সুন্দরী পুলোমাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ

AMARBOI.COM

করেছিলে, সে কথা আমি জানি; কিন্তু বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে তুমি তো এই মেয়েকে বিয়ে করনি—কিং ত্বিয়ং বিধিনা পূর্বং মন্ত্রবন্ন বৃতা ত্বয়া। অন্যদিকে এই কন্যার পিতা পুলোমাকে বৈদিক বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে ভৃগুর হাতে সম্প্রদান করেছেন। হ্যাঁ, জানি, পুলোমার পিতার এখানে স্বার্থ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন—মেয়েকে ভৃগুর হাতে দিয়ে তিনি ভৃগুর কাছ থেকে বর-লাভ করবেন এবং সেই আশাতেই তোমার হাতে তিনি মেয়ে দেননি—দদাতি ন পিতা তুভ্যং বরলোভান্মহাযশাঃ।

জেনে রাখা ভাল, ভারতে বিবাহের বিধি চিরকাল, একরকম থাকেনি। পরবর্তী কালের স্মৃতিশাস্ত্রেও এই নিয়ে ঘোর বিবাদ আছে। কেউ বলেন—সম্প্রদান-মন্ত্রেই বিবাহ সম্পন্ন হয়, কেউ বলেন, পাণি গ্রহণ হলে তবেই বিবাহ সম্পন্ন হবে, আবার কেউ বা সপ্তপদী-গমনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এখানে সেই তর্ক তোলার প্রয়োজন নেই। এবং তর্ক বাদ দিয়েও এটা বোঝা যাচ্ছে—পুলোমা সেকালের দিনের এক অতীব প্রার্থনীয়া রমণী। একদিকে এক রাক্ষস তাঁকে মনে মনে বরণ করেছেন, আর এক দিকে এক ঋষি-চূড়ামণি এই রমণীকে লাভ করার জন্য কন্যার পিতাকে বর দিতে চেয়েছেন। পুলোমার পিতা কী বর পেয়েছিলেন মহাভারতের কবি তা স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু রাক্ষস পুলোমা অগ্নির কথায় তাঁর আপন বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া মাত্রই ভৃগুপত্নীকে তুলে নিয়ে গেলেন আশ্রম থেকে। অপহরণ, পরের স্ত্রীকে নিজের ভেবেই অপহরণ করলেন।

ভৃগুপত্নী পুলোমা গর্ভবতী ছিলেন। রাক্ষসের দ্রুতত্বা এবং নিজের ভয়—এই দুয়ে মিলে পথের মধ্যেই তাঁর গর্ভচ্যুত হল। গর্ভচ্যুত হয়ে জন্মাবার ফলেই তাঁর পুত্রের নাম হল চ্যবন। রাক্ষস পুলোমা চ্যবনের অদ্ভুত তেজে ভস্মীভূত হলেন—এই অলৌকিক কথা আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন—সেটা মহাভারত-কথার বড় কোনও অঙ্গ নয়। এমনকি ভৃগুপত্নী সপুত্রক বাড়ি ফিরে এলে ভৃগুমুনি সব শুনে অগ্নিকে 'সর্বভুক' হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন— সেটাও খুব বড় কথা নয়। বড় কথা হল—উগ্রশ্রবা সৌতি এর পর চ্যবন মুনির নাতি রুরুর যে কাহিনী বলবেন—তার মধ্যেও সেই সাপে কাটার ঘটনা আছে। রুরু এবং প্রমদ্বরার প্রেম-কাহিনী নিয়ে সুবোধ ঘোষ মশাই *ভারত-প্রেমকথায়* অমর চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে সর্পদংশনের ব্যাপারটা ঐতিহাসিক কোনও গুরুত্ব লাভ করেনি। কিন্তু তারও একটা গুরুত্ব আছে। সে কথায় পরে আসছি।

মহাভারতে দেখা যাবে—রুরু-প্রমদ্বরার কাহিনীর শেষে নৈমিষারণ্যের কুলপতি শৌনক এবার সোজাসুজি রাজা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের কাহিনী শুনতে চাইলেন। কিন্তু তার আগে ভৃগুবংশের কাহিনী শুনতে চেয়ে শৌনক যে শুধু সৌতি উগ্রশ্রবার বাচন-ক্ষমতা যাচাই করে নিলেন—তাই শুধু নয়, এর পিছনে অন্যতর এক উদ্দেশ্যও ছিল। জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিতের সর্প-দংশনে মৃত্যু হয়েছে—এই কথার প্রসঙ্গেই তিনি ভৃগুবংশের কথা শুনতে চেয়েছেন এবং তার কারণ ভৃগুবংশের অধস্তনদের মধ্যেও এই সর্প-দংশনের ঝামেলা গেছে। সর্পদ্রষ্টা প্রিয়া পত্নীকে নিজের অর্ধেক আয়ু দিয়ে ফিরে পাবার পরেও রুরুর ক্রোধ শান্ত হয়নি। তিনি যেখানেই সাপ দেখতেন, মেরে ফেলতেন। তাঁর এই সর্পহত্যার আক্রোশ অবশেষে এক মুনির প্রযত্নে শান্ত হয়। জনমেজয়ের আক্রোশও শান্ত হয় আস্তীক-মুনির প্রযত্নে। ঘটনার এই সমতার জন্যই শৌনক ভৃগুবংশের পুরাতন আক্রোশ এবং দুঃখকে জনমেজয় রাজার সঙ্গে একাত্মতায় স্মরণ করেছেন।

কুলপতি শৌনক এই অনুরূপ ঘটনা পুনরায় স্মরণ করতে চেয়েছেন; তার কারণ, তিনি নিজে ভৃগুবংশের জাতক এবং অনেক পুরাণ-মতেই তিনি স্বয়ং রুরুর পৌত্র। রুরুর ছেলের নাম শুনক। তাঁর ছেলে শৌনক। পণ্ডিতেরা মহাভারত-কথার মৌলাংশের পূর্বেই ভৃগুবংশের এই বিরাট আখ্যান-আখ্যাপনের মধ্যেই ভার্গবদের প্রক্ষেপের অভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছেন এবং হয়তো কোনও কোনও জায়গায়, তাঁদের গবেষণা মিথ্যা নয়। শুধু ভারত-কথা কেন, ভারতের অন্য যে মহাকাব্য, সেই রামায়ণ-রচনার পেছনেও ভার্গবদের অবদান আছে।

যাঁরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছেন, তাঁরা সেই বিখ্যাত গল্পটির প্রথম পয়ারটা খেয়াল করবেন—

চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।।

একটু আগেই আপনারা শুনেছেন চ্যবন মুনি ভৃগুর পুত্র। তাঁর পুত্র রত্নাকর বাল্মীকি—পুত্র না হলেও শিষ্য তো বটে। কৃত্তিবাস বাল্মীকির দস্যুস্বভাব এবং অনার্য প্রকৃতির খোঁজ পেয়েছেন স্কন্দ-পুরাণের বর্ণনা থেকে। কিন্তু অন্য কোনও প্রাদেশিক রামায়ণ যেখানে বাল্মীকিকে চ্যবন-মুনির পুত্র বলেনি, সেখানে কৃত্তিবাসের এই বক্তব্য বড় একটা 'পয়েন্টার'। আরও আশ্চর্য সেই প্রথম/দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের কবি অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত নাটকে লিখেছেন যে, চ্যবন-মুনিই নাকি রামায়ণ রচনার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। ফলে বাল্মীকির হাতেই প্রথম জন্ম নিল রামায়ণের কাব্য-কথা—বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং/জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।

এত কথা বললাম এই কারণে যে, মহাকাব্য সংকলন বা রচনার ব্যাপারে ভার্গব-বংশীয়দের বিলক্ষণ হাত ছিল, তাতে বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু যেখানে সেখানে প্রক্ষেপের ধুয়া তুলে তাঁদের কালের মৃদু-মন্দ স্বাদ-গন্ধটুকু বাদ দেওয়ায় আমাদের ভীষণ আপত্তি আছে। আমরা মহাভারতকে পূর্ণ প্রাণে পেতে চাই, বিশেষত সেই পূর্ণতা যখন ব্যাখ্যাযোগ্যও বটে।

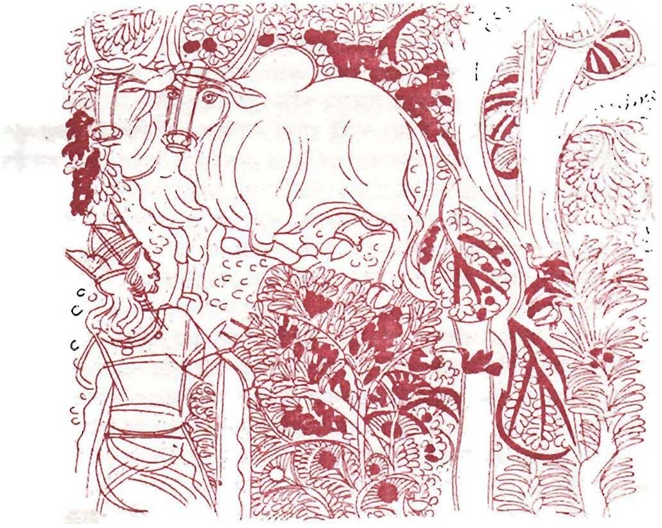

ছয়

সেকালের ব্রাহ্মণ-বংশগুলি এবং ক্ষত্রিয় বংশগুলির মোটামুটি বোঝাপড়াটা একরকম ছিল। হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেলে পরীক্ষিত যেমন নাগবংশীয়দের অত্যাচার এড়াতে পারেননি, তেমনই ব্রাহ্মণ উতঙ্কও নাগদের অসভ্যতায় ক্ষুব্ধ। ভৃগুবংশীয়দের কাহিনী, বিশেষত রুরু-প্রমদ্বরার কাহিনী শুনতে চেয়ে মহর্ষি শৌনক শুধু আগুনে ঘি দিলেন। অর্থাৎ ভাবটা এই—এদের বড় বাড় বেড়েছে, উগ্রশ্রবা। আমাদের পূর্ববংশীয়রাও এদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাননি। শৌনকের এই ভাবটা যদি বা থেকেও থাকে, কিন্তু নিরপেক্ষ কথক-ঠাকুর সে কথায় তত আমল দেননি। জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের আগে যত কাহিনী এসেছে, সবই নাগ-বংশীয়দেরই কাহিনী। কদ্রু, বিনতা, জরৎকারু, আস্তীক-মুনি—সকলেই নাগবংশের সঙ্গেই জড়িত। সত্যিই তো মহাভারতের মূল পর্বে যাবার আগে নাগবংশীয়দের এত কথা শুনব কেন? স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তি হয় বলতে—এগুলি সব প্রক্ষেপ। পণ্ডিতেরা অবশ্য তাইই বলেছেন। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয় এই কাহিনীগুলির একটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্বও আছে।

রাজনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্বটা এক কথায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—নিম্নবর্গীয় একটি জাতি-গোষ্ঠী কিভাবে চরম শত্রুতা থেকে আর্যগোষ্ঠীর বন্ধুতে পরিণত হল এবং আর্যগোষ্ঠীর দিক থেকেও নবাগত এবং বশ্যতাপ্রাপ্ত বন্ধুকে কিভাবে উপাস্যতা দান করা হল—মহাভারতের মূল পর্বের প্রথমে সেই সামাজিক ইতিহাসটুকুই ধরা আছে।

তবে এই সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস ধরবার জন্য আমরা মহাভারতের উপাখ্যান অংশকে আগেই ব্যাহত করব না। বরং উপাখ্যানের হাত ধরেই আমরা ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছব। কথা হল, হস্তিনাপুরের বর্তমান রাজা জনমেজয় পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে

সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। কাজেই সর্পযজ্ঞের আগে আসে পরীক্ষিতের মৃত্যুর কথা।

পরীক্ষিত হলেন ক্ষীণ পাণ্ডব-বংশের প্রথম এবং শেষ অঙ্কুর। পুরাণের ভাষায়—সন্তানবীজং কুরু-পাণ্ডবানাম্। যুধিষ্ঠির মহারাজ মৃত অভিমন্যুর এই পুত্রটিকে সিংহাসনে বসিয়ে মহাপ্রস্থানে চলে গেলেন ভাইদের নিয়ে। ভালই রাজত্ব করছিলেন পরীক্ষিত। প্রজারা খুশি, ব্রাহ্মণরা নির্বিঘ্নে যাগ-যজ্ঞ করছেন, রাজকোষ পূর্ণ, সমস্ত দেশ আনত-সামন্ত। কিন্তু তবু তাঁর রাজত্বের দিনগুলোকে খুব মধুর বলা যাবে না। পৌরাণিকেরা খবর দিয়েছেন— পরীক্ষিতের আমলে দ্বাপর-যুগ শেষ হয়ে কলি-যুগ প্রবেশ করেছে। 'কলি' বলতে আপনারা যদি শুধু যুগের পরিমাণ ধরেন তাতে আমার আপত্তি আছে। কলি শব্দের এক অর্থ হল বিবাদ। অর্থাৎ পরীক্ষিতের আমলেই ঝগড়া-ঝাঁটি, বিবাদের আমদানি হয়ে গেল ভাল রকম। ঘটনাটা ধর্মের ভাষাতেও সুন্দর বলা যায়।

আমাদের শাস্ত্রে 'যুগের পরিমাণ' ব্যাপারটা এমনই বিশাল এক জিনিস যে, এখনকার 'ক্রিশ্চান ক্যালেন্ডারে'র নিয়মে সাল-তারিখ মেপে কখনওই বলা যাবে না যে—অমুক দিন কলিযুগ আরম্ভ হল। আসলে ঝগড়া-বিবাদ অথবা কলিযুগ পরীক্ষিতের রাজত্বের অনেক আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে। দ্বারকায় কৃষ্ণের জ্ঞাতি-গুষ্টিরা যখন আকণ্ঠ মদ গিলে নিজেরাই মারামারি করে মরলেন, তখনই যুধিষ্ঠির-অর্জুনের মতো লোকেরা বুঝে গেলেন—ধরাধামে সুস্থভাবে আর বাঁচা যাবে না। পুরাণ বলেছে—যুধিষ্ঠির দেখলেন—শুধু দ্বারকায় নয়, ঘরে বাইরে, নগরে রাষ্ট্রে—সর্বত্র বাদ-বিসংবাদ, লোভ, হিংসা, কুটিলতা একেবারে ছেয়ে গেছে—পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি/বিভাব্য লোভানৃত-জিহ্ম-হিংসনাৎ। তিনি বুঝলেন—ঢুকে পড়েছে কলি, আর নয়—অভদ্রহেতুঃ কলিপ্রবর্তত। তিনি ভাইদের নিয়ে মহাপ্রস্থানে চলে গেলেন। সিংহাসনে বসলেন পরীক্ষিত।

সমস্ত পুরাণ, এমনকি মহাভারতের থেকেও ভাগবত পুরাণ ব্যাপারটা ধরেছে খুব ভাল। এখানে দেখা যাচ্ছে—পরীক্ষিত রাজা হয়েই খেয়াল করলেন যে, তাঁর রাজমণ্ডলের সর্বত্র কলি ঢুকে পড়েছে—যদা পরীক্ষিত কুরু-জাঙ্গলে বসন্/কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে। দেখুন, কলি একটা মানুষ নয় মোটেই, যে রাজ্যে ঢুকে পড়ল। কলি মানে সেই লোভ, হিংসা, মিথ্যা আর কুটিলতা। পুরাণকার সব অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরূপে কলিকে একটা মানুষের চেহারা দিয়েছেন। পরীক্ষিত যেই খবর পেলেন—কলি ঢুকে পড়েছে, অমনই তিনি ধনুক-বাণ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—কলিকে মারবার জন্য। পরীক্ষিতের দিগ্‌-বিজয় শুরু হল।

তারপর ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তর-কুরু—সব ঘুরে এসে পরীক্ষিত একটা আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করলেন। পরীক্ষিত দেখলেন—একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। তার তিনটে পা-ই ভাঙা আর তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটি গরু—এমন করুণ তার অবস্থা যেন সদ্য তার বাছুরটি মারা গেছে—বিবৎসামিব মাতরম্। ষণ্ড-বৃষ এবং গাভী দু'জনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

ভারতের ভাবনা-রাজ্যে রূপকের একটা বিশাল জায়গা আছে। আধুনিকেরা যাঁরা চলচ্চিত্রে, কবিতায়, স্থাপত্যে অথবা ছবিতে 'সিমবলিজ্‌ম্' নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করেন, আর অনেকটাই না বুঝে বিস্ময়মুকুলিত নেত্রে বক্তৃতা দেন, তাঁদের আগে নিজের দেশের 'সিমবলিজ্‌ম্'গুলো বুঝতে অনুরোধ করি, তারপর পিকাসো-রঁদা, কামু-কাফ্‌কা নিয়ে যা বলবেন, শুনব। এই যে ষণ্ড-বৃষটিকে এইমাত্র দেখলেন পরীক্ষিত, ইনি আসলে ধর্ম। দেবদেব মহাদেবকে যে আপনারা বৃষ-বাহন দেখেন, তিনি আসলে ধর্মবাহন, জ্ঞান-বাহন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, এই চার যুগ ষাঁড়ের চার পা। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর—সত্যযুগে ধর্মের

AMARBOI.COM

রমরমা অতএব ষাঁড়ের চার-পা'ও ঠিক-ঠাক। ত্রেতাতে ষাঁড়ের এক পা ভেঙে গেছে, সে তিনপায়ে দাঁড়িয়ে। দ্বাপরে অন্যায়-অধর্ম বেড়ে গেল। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে রইল ষাঁড়। আর কলিতে তার তিন পা'ই ভেঙে গেছে, এক পায়ে নড়বড়ে হয়ে কোনওমতে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে বলি ধর্মের ষাঁড়।

আর ওই যে গাভীটিকে দেখলেন পরীক্ষিত, উনি হলেন পৃথিবী। গাভীকে আমরা দোহন করে দুগ্ধ বার করি, তেমনই পৃথিবীকেও আমরা দোহন করে শস্য বার করি, খনিজ-পদার্থ বার করি। সেইজন্য গাভী পৃথিবীর প্রতিরূপ। পরীক্ষিত দেখলেন বৃষরূপী ধর্ম আর গাভীরূপিণী পৃথিবীর মধ্যে নানা সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে। কৃষ্ণ যখন বেঁচেছিলেন, পাণ্ডবরা যখন রাজ্য শাসন করছিলেন, তখন কত সুসময় ছিল আর এখন কলি এসে কী দুরবস্থা করেছে—এই সব তারতম্যের আলোচনা চলছে। পরীক্ষিত দেখলেন; কিন্তু ওই গোমিথুনকে তিনি ধর্ম আর পৃথিবী বলে তখনও বোঝেননি।

তৃতীয় আরও একটি সত্তার উপস্থিতিও পরীক্ষিতের নজর এড়াল না। পরীক্ষিত দেখলেন—একটি লোক—লোকটির আচার-আচরণ বর্বরের মতো—সে একবার নিস্তেজ ষণ্ডটিকে লাথি মারছে, আরেকবার গাভীটিকে লাথি মারছে। তার হাতে একটা লাঠি এবং সেই লাঠি দিয়ে দু'টি প্রাণীকে সে মেরে ফেলার ভয়ও দেখাচ্ছে। ধর্মরূপী বৃষটি নিরুপায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে এবং লোকটির বিভীষিকায় সে প্রস্রাব করে ফেলেছে—মেহন্তমিব বিভ্যতম্। লোকটার ভাব-সাব রাজার মতো, আচরণ নির্ভীক, এবং তাকে দেখতে যেমনই হোক, সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, তার জামা-কাপড় আসল সোনার জরি দিয়ে মোড়ানো। পরীক্ষিত এই কম্পমান গোমিথুন এবং এই জঘন্য লোকটিকে দেখে তাদের সামনে রথ থামালেন। লোকটিকে বললেন, কে হে তুমি, আমার রাজত্বে বাস করে দুর্বল পশু দু'টির ওপর জোর খাটাচ্ছ? দেখতে তো বেশ রাজার মতো, গায়ে এমন সোনার পিরান, অথচ কাজটা যে করছ—সেটা রাজোচিতও নয় ব্রাহ্মণোচিতও নয়—নরদেবো'সি বেশেন নটবৎ কর্মণা'দ্বিজঃ।

পরীক্ষিত বেশ রেগেই গেলেন। বললেন, কী ভেবেছ তুমি? আজকে কৃষ্ণ ধরাধামে নেই বলে, গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন নেই বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে? নিরপরাধ প্রাণীকে তুমি এইভাবে লুকিয়ে-লুকিয়ে পীড়ন করবে? আজ তোমার নিস্তার নেই, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনো। পরীক্ষিত এবার ধর্মরূপী বৃষ এবং গোরূপা পৃথিবীকেও চিনে ফেললেন এবং তাঁদের অবস্থা দেখে কলিকেও চিনতে তাঁর দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে শাণিত খড়্গ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলিকে মারার জন্য—নিশাতমাদদে খড়্গং কলয়ে'ধর্মহেতবে। কলি দেখল— মহা-বিপদ। প্রাণে মারা যাবার চেয়ে রাজার পায়ে পড়া ভাল। কলি রাজার পা জড়িয়ে ধরল।

পরীক্ষিত বললেন, ঠিক আছে, তুমি প্রাণে বাঁচলে বটে, কিন্তু আমার রাজ্যে তোমার জায়গা হবে না এক রত্তি। —ন বর্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন/ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্মবন্ধু। পরীক্ষিত পায়ে-পড়া কলিকে তাঁর অকরুণার কারণ দেখিয়ে বললেন, তোমার মতো অধর্মের বন্ধু যদি আমার রাজ্যে থাকে, তাহলে আমাদের প্রজাদের মধ্যে হিংসা, লোভ, দম্ভ-অহঙ্কার, খুন, রাহাজানি, চুরি-বদমাশি—সবই অত্যন্ত বেড়ে যাবে।

এই যে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন পরীক্ষিত, এইগুলোই কলির স্বরূপ। কবিরা দম্ভ-অহংকার আর নানা অসদ্ গুণের রূপ কল্পনা করে তার নাম দিয়েছেন কলি। পরীক্ষিত বললেন, তোমার সাহস তো কম নয় বাপু। এই ব্রহ্মাবর্ত কত পবিত্র স্থান! সরস্বতী আর দৃষদ্বতী নদীর মাঝখানের এই জায়গাটুকুতে ব্রাহ্মণ সমাজের কত পবিত্রতার স্মৃতি! ব্রাহ্মণরা এখানে

AMARBOI.COM

কত মন্ত্রে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে আবাহন করেন—যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞ-বিতানবিজ্ঞাঃ। আর তুমি কিনা সেইখানে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণদের সমস্ত আন্তর ধর্মের প্রতীক একটি গোমিথুনকে মারতে চাইছ? বেরও, বেরিয়ে যাও তুমি আমার রাজ্য থেকে।

পরীক্ষিত রাজার ক্রোধাবেশ দেখে কলি ভয়ে কাঁপতে থাকল বটে, তবে হাল ছাড়ল না। বলল, আপনি আমাদের সার্বভৌম রাজা বটে। আমাকে তাড়িয়ে দিলে তো হবে না, থাকার জন্য আমাকেও একটা জায়গা দিতে হবে। তা আপনিই বলে দিন—কোথায় আমি থাকব—স্থানং নির্দেষ্টুমর্হসি। পরীক্ষিত বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে কোনও ভাল জায়গায় তুমি থাকতে পাবে না। তোমার আবাস হোক—তাস-পাশার জুয়োচুরিতে, শুঁড়িখানায়, স্ত্রীলোকের সুখসঙ্গে, আর থাক প্রাণীহত্যা, খুন, রাহাজানির মতো কুকর্মের মধ্যে। এই চার জায়গায় যত অধর্ম। তুমি থাকো এই অধর্মের মধ্যে, কিন্তু খবরদার! এই সব সৎ-সাধনের জায়গায় তোমায় যেন না দেখি।

কলি বলল, এই চার জায়গায় মাত্র স্থান দিলেন, মহারাজ? আর একটু কৃপা হবে না? রাজা বললেন, যাও, যাও সোনা-চাঁদির জায়গাটাও না হয় তোমায় ছেড়ে দিলাম—পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ। কলিকে পরীক্ষিত যেভাবে স্বীকৃতি দিলেন—তার ফলটা কী দাঁড়াল? জুয়োচুরির মধ্যে যে মিথ্যার বেসাতি আছে, পানশালায় যে হাম-বড়া ভাব আসে মনে, স্ত্রী-সঙ্গের মধ্যে যে কামনার প্রশ্রয় আছে, অকারণ প্রাণীহত্যার মধ্যে যে ক্রূরতা আছে, আর টাকা-পয়সা নিয়ে যে শত্রুতা তৈরি হয়—এইসব জায়গাতে কলির স্থান একেবারে পাকা হয়ে গেল।

পুরাণ থেকে এই উপাখ্যানটুকু যে স্মরণ করতে হল, তার কারণ আছে। পরীক্ষিত মহারাজের আমলে কলি ঢুকে পড়ল—এই ধর্মীয় তথ্যের মধ্যে প্রধান ইঙ্গিত হল—তাঁর আমলে আর সেই সুখ-শান্তি, সেই সত্য এবং ধর্মবোধ আর রইল না, যা তাঁর পিতা-পিতামহের আমলে ছিল। নীতি এবং ধর্মবোধ যে কতটা চলে গেছে পরীক্ষিত মহারাজের আপন উদাহরণই তার জন্য যথেষ্ট। সরস্বতীর তীরে দণ্ডপাণি কলির পদাঘাতে ক্লিষ্ট গোমিথুনকে দেখে কলির ওপরে তাঁর যতই রাগ হোক, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধস্তন পুরুষ হয়ে তিনি নিজে যে কাণ্ড করে বসলেন, তাতে বোঝা যায়—অন্যায় এবং অভব্যতা কী চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আসলে তাঁর রাজত্বকালে কলি-প্রবেশের প্রধান তাৎপর্যই হল—লোভ, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য এবং দম্ভ সর্বত্র এমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যে, পরীক্ষিতের পক্ষে তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। বরং অন্যায়ের প্রতিরূপ কলি তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করেছে, তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। যেখানেই হোক, যে পর্যায়েই হোক অন্যায়-অনীতি এবং অভব্যতাকে পরীক্ষিত মহারাজ প্রায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছেন—কলিকে তিনি 'স্যাংশন' দিয়েছেন।

এই যে স্বীকৃতি, কলির প্রতি পরীক্ষিতের এই যে বিবশ আচরণ—এর কারণ দু'ধরনের সমাজিক পরিস্থিতি থেকে তৈরি হয়ে থাকতে পারে। এক, তিনি সব জেনে বুঝে অন্যায্য কলিকে মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর নিজের মানসিকতাও খানিকটা ওইরকমই ছিল। দুই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যেহেতু কোনও অসামান্য ব্যক্তিত্বই আর জীবিত ছিলেন না এবং পরীক্ষিত—যাঁকে মহাভারতের কবিই ক্ষীয়মাণ কুরুবংশের শেষ অঙ্কুর বলে চিহ্নিত করেছেন—সেই পরীক্ষিতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই তাঁর রাজত্বে অন্যায়-অসভ্যতা, হিংসা-দ্বেষ এমন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, পরীক্ষিতের পক্ষে কলিকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় ছিল না।

আমরা দ্বিতীয় কল্পটাকেই মেনে নিতে চাই, কারণ পরীক্ষিত তাঁর স্বীকৃতিতে কলির আবাস নির্দিষ্ট কতগুলি স্থানে বেঁধে দিতে চাইছেন। তাঁর রাজত্বে কলি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে,

AMARBOI.COM

অতএব তাকে সর্বত্র ছড়াতে না দিয়ে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছেন তিনি। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পৌরাণিকেরা যে শক্তিমত্তার আভাসটুকু দেখেছেন, সেটা যে তেমন কোনও সত্য নয়—সেটাও পৌরাণিকেরা জানেন এবং জানেন বলেই পরীক্ষিতের পরবর্তী ব্যবহার তাঁরা উল্লেখ করতে ভোলেননি। অর্থাৎ পরীক্ষিত অন্যায়-অসত্যকে যতই নিয়ন্ত্রিত করুন, সেগুলি তাঁর সময়ে সহজ হয়ে উঠেছিল, এবং সহজ বলেই দেশের রাজা হওয়া সত্ত্বেও, জনগণের ভাগ্য-নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও অন্যায় আচরণ করতে তাঁরও বাধেনি। ঘটনাটা পরিষ্কার করে জানাই।

মহারাজ পরীক্ষিতের মধ্যে তাঁর প্রপিতামহ পাণ্ডুর কিছু গুণ ছিল। মহারাজ পাণ্ডু শিকার করতে বড় ভালবাসতেন। এটাকে যদি আজকের ভাষায় 'হবি' বলা যায়, তবে সেকালের ভাষায় এই 'হবি'র নাম হল মৃগয়া। মৃগয়াতে অকারণে পশুবধ করা হয় বলে পুরাতনেরা ব্যাপারটা বড় পছন্দ করতেন না। আরও পছন্দ করতেন না—মৃগয়া যখন 'হবি'র পর্যায়ে চলে যেত। পুরাতনেরা বলতেন, মৃগয়া হল এক ধরনের ব্যসন, কামজ ব্যসন, যা রাজাদের চারিত্রিক দোষ তৈরি করে। রাজারা পশুবধ করতে করতে প্রমত্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের আর সময়-অসময়, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান থাকে না। পুরাতনেরা এই প্রমত্ততার জন্যই মৃগয়াকে কামজ-ব্যসনের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং তাঁরা রাজাদের সব সময় সাবধান করেছেন যেন এই প্রমত্ততা তাঁদের গ্রাস না করে।

পুরাতনেরা যাই ভাবুন, রাজারা রাজার মতোই চলেন। প্রপিতামহের দৃষ্টান্তে পরীক্ষিত মহারাজেরও মৃগয়ায় যাওয়াটা বেশ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। তিনি মৃগয়ায় বেরিয়ে বন্য শূকর, মহিষ, বাঘ মারতে মারতে চলেছেন। এমন সময় একটি সুন্দর হরিণ পরীক্ষিতের চোখে পড়ল। রাজা বাণ ছুড়লেন ঠিকই, কিন্তু বাণটি ভাল করে তার গায়ে বিদ্ধ হল না। বাণের আগায় বক্র ফলক ছিল, ফলে বাণটি হরিণের শরীরে লেগে ঝুলে রইল এবং বাণবিদ্ধ অবস্থাতেই হরিণ দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করল। পরীক্ষিত হরিণের পিছনে ধাওয়া করলেন। গভীর বনের মধ্যে ধাবমান হরিণ এক সময় রাজার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। পরীক্ষিত তার পেছনে ছুটতে ছুটতে বনরাজির প্রান্তে এক মুক্ত তৃণভূমির মধ্যে এসে পৌঁছলেন।

এটি একটি গো-চারণ ক্ষেত্র। অনেক গরু একসঙ্গে ঘাস খাচ্ছে, গোবৎসেরা রোমন্থায়মান গাভীর দুগ্ধ পান করে মুখে ফেনা উঠিয়ে ফেলেছে। বড় শান্ত, বড় অলস পরিবেশ। রাজা দেখলেন—এই মুক্ত তৃণভূমির বিজন প্রান্তে এক মুনি পদ্মাসনে বসে আছেন—ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি। ভাবগত পুরাণ পরীক্ষিতকে যথাসম্ভব বাঁচানোর জন্য তাঁকে অতিশয় ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষিত যত না ক্লান্ত ছিলেন,—কারণ মহাভারতেও তাঁর ক্লান্তি এবং পিপাসার কথা বলা আছে, কিন্তু সেই পিপাসার চেয়েও পরীক্ষিত বেশি ছিলেন মৃগয়া-ব্যসনী। ভাগবতে পরীক্ষিত মুনির কাছে বার বার পিপাসার জল চেয়ে সদুত্তর পাননি। কিন্তু মহাভারতে পরীক্ষিত-মহারাজ ধ্যানরত মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত। আমি একটি হরিণকে বাণ-বিদ্ধ করেছি। কিন্তু হরিণটা কোনওরকমে পালিয়েছে। আপনি কি হরিণটাকে দেখেছেন—ময়া বিদ্ধো মৃগো নষ্টঃ কচ্চিত্ত্বং দৃষ্টবানসি?

পরীক্ষিতের ভাব-ভঙ্গি ভাল ছিল না। তপস্যারত একটি মুনিকে দেখা মাত্রই ধনুক-বাণ নামিয়ে রেখে জুতো খুলে অতি বিনীতবেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা—বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম—তাঁর পূর্বজরাও চিরকাল তাই করেছেন। কিন্তু

AMARBOI.COM

রাজা ধনুকবাণ তো ত্যাগ করেনইনি, বরং সেগুলি উদ্যত ছিল—লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া মাত্রই যাতে লক্ষ্য ভেদ করা যায়। এইভাবে ধনুক উঁচিয়ে একজন অহিংস ব্যক্তির সামনে প্রায় সহিংস আচরণ এবং পুনরায় তাঁর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার মধ্যেও এমন কোনও ভণিতা ছিল না—যা তখনকার দিনের প্রচলিত শিষ্টাচারের সঙ্গে মেলে—অপৃচ্ছদ্ধনুরুদ্যম্য তং মুনিং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ।

ধ্যানরত মুনির সঙ্গে দেখা হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার শিষ্টাচার ছিল এইরকম—আপনার তপস্যার কুশল তো—অপি তপো বর্ধতে! অথবা তাঁকে যদি বিরক্ত করছি বলে মনে হয় তাহলে ভাষাটা হওয়া উচিত—আপনার তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করছি না তো? মুনিবর প্রণাম। কিন্তু পরীক্ষিতকে দেখতে পাচ্ছি—তিনি মুনি দেখামাত্রই প্রশ্ন করলেন, এই যে ঠাকুর! আমি অভিমন্যুর ছেলে রাজা পরীক্ষিত.... আমার বাণ-বিদ্ধ মৃগটিকে দেখেছেন— ভো ভো ব্রহ্মণ্ অহং রাজা পরীক্ষিদভিমন্যুজঃ। শান্ত আশ্রমপদে—এই যে ঠাকুর! অহং রাজা—এই ভাবটুকু কোনও বিনীত শিষ্টাচারের পরিচয় দেয় না—যা অভিমন্যু, অর্জুন বা তাঁর প্রপিতামহ পাণ্ডুরও পরিচয় বহন করে।

মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। পরীক্ষিতের কথার কোনও উত্তর তিনি দিলেন না। হয়তো উত্তর দিতে ভালও লাগেনি। হয়তো মৌনতাও সেইজন্যই। রাজা পরীক্ষিত অপেক্ষা করেননি, সামান্য শিষ্টাচারে প্রণাম পর্যন্ত করলেন না। উপরন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে কাছে পড়ে থাকা একটা মরা সাপ তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। তাও হাত দিয়ে নয়, ধনুকের প্রান্তভাগ দিয়ে সাপটি মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি তাচ্ছিল্যভরে চলে গেলেন—সমুৎক্ষিপ্য ধনুষ্কোট্যা স চৈনং সমুপৈক্ষত। পরিষ্কার বোঝা যায়—মরা যে সাপটি তিনি নিজের হাতে তুলতে ঘৃণাবোধ করেছেন, সেই সাপটি মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিতে তাঁর কোনও দ্বিধা হল না। ঘটনাটা ঘটানোর পর পরীক্ষিতের ক্রোধ শান্ত হল বটে, গলায় সাপ ঝুলানো মুনিকে দেখে তাঁর একটু খারাপও লাগল বটে, কিন্তু সাপটি গলা থেকে নামিয়ে দেওয়ারও কোনও প্রয়াস তিনি নিলেন না। তিনি চলে গেলেন নিজের নগরে। বিস্তীর্ণ আরণ্যক পরিবেশে উন্মুক্ত গোচারণ-ভূমিতে মৃত সাপ গলায় নিয়ে মুনি বসে রইলেন তেমনই—নিরপেক্ষ, উদাসীন।

AMARBOI.COM

এবারে সেই প্রশ্নটা আবার তুলি। পরীক্ষিতের রাজত্বকালে কলি-প্রবেশের তাৎপর্য এইখানেই। দেশের রাজা নিজেই যেখানে সদাচার-বিরোধী ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি অসদাচার প্রতিরোধ করবেন কী করে? মহাভারতের কবি ওজর দিয়ে বলেছেন—পরীক্ষিত মুনিকে ততখানি ধার্মিক বলে বুঝতে পারেননি—ন হি তং রাজশার্দূলস্তথা ধর্ম পরায়ণম্—অতএব সেইজন্যই তিনি এই অশালীন আচরণ করে ফেলেছেন। আমরা বলি—তপস্বী যদি ভণ্ডও হতেন, তবু দেশের রাজা, যিনি প্রখ্যাত যাদব-বৃষ্ণিকুল এবং কৌরব-কুলের পবিত্র শোণিত বহন করছেন আপন শরীরে, তাঁর এই ব্যবহার কি শোভা পায়?

এই ক্রুর আচরণের প্রত্যুত্তরে মুনি কিন্তু কোনও শাপ দিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিত রাজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-বংশের ধুরন্ধর পুরুষ। হরিণ হারিয়ে কিছু ক্রোধাবেশ হয়ে থাকবে তাঁর অথবা লক্ষ্যবস্তুতে যে কোনও রাজার এই আবেশই থাকা দরকার—এইরকম ভেবে রাজার দোষটুকুও গুণপক্ষে আরোপ করে মুনি তাঁকে মনে মনে মুক্তি দিলেন। যেমন তিনি বসে ছিলেন, তেমনই বসে রইলেন—ঋষিস্তু অসীৎ তথৈব সঃ। রাজার ক্রোধ অথবা মৃত সর্পের ঘৃণা শরীরে বহন করেও মুনির মনের প্রশান্তি নষ্ট হবে কেন—হয়তো এইরকম কোনও আধ্যাত্মিক তর্কেই মুনি যেমন ছিলেন, তেমনই বসে রইলেন। রাজা তখন হস্তিনানগরে।

সাত

যে মুনির গলায় মহারাজ পরীক্ষিত মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে এলেন, এখনও আমরা তাঁর নাম জানি না। মুনির নাম শমীক। শান্ত সমাহিত চিত্ত। পরীক্ষিত তাঁকে যে এত বড় অপমান করে গেলেন—তা তিনি মনেও রাখলেন না। কিন্তু শমীক মুনির একটি অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। তাঁর নাম শৃঙ্গী। যেমন তিনি তেজস্বী তেমনই তাঁর তপোবল। এই অল্প বয়স্ক মুনি বালক আপন সংযম এবং তপস্যার বলে ইতোমধ্যেই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেছেন। কিন্তু তপোবল বা ইন্দ্রিয়-সংযম তাঁর যথেষ্ট থাকলেও বালকের স্বভাবে কিছু ক্রোধ ছিল। সে ক্রোধ এতটাই যে, তিনি একবার ক্রুদ্ধ হলে তাঁকে প্রসন্ন করা খুব কঠিন হত—শৃঙ্গী নাম মহাক্রোধো দুষ্প্রসাদো মহাব্রতঃ!

শমীক মুনির গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে পরীক্ষিত যখন চলে গেছেন, শৃঙ্গী তখন সদ্য বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ি ফেরার পরই তাঁর এক বন্ধু—কৃশ তাঁর নাম— তিনিও ঋষিকুমার, তাঁর সঙ্গে শৃঙ্গীর দেখা হল। বন্ধুর পিতা শমীককে দেখে কৃশর খারাপ লাগছিল। কাজেই শৃঙ্গীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, ভাই! তুমি তো জপে তপে খুব তেজস্বী হয়েছ বলে শুনি। তোমার বাবাও যথেষ্ট তপস্বী এবং তেজস্বী। কিন্তু এরপর থেকে আমরা ঋষি বালকেরা যখন কথা বলব, তখন তুমি আর তেজ বেশি দেখিও না, বেশি কথাও যেন বোলো না— মাস্ম কিঞ্চিদ্ বচো বদ। এত তুমি ব্রহ্মর্ষির পৌরুষ দেখাও, এত বড় বড় কথা তুমি বল। তা আর একটু পরেই তুমি দেখতে পাবে—তোমার মৌনী পিতা কেমন একটি শব গলায় ঝুলিয়ে বসে আছেন।

শৃঙ্গী রাগে জ্বলে উঠলেন। কী! আমার পিতা শব ধারণ করে আছেন—শৃঙ্গী জ্বলে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে সম্ভব হল এই ঘটনা— অপৃচ্ছত্তং কথং তাতঃ স মে'দ্য

মৃতধারকঃ? কৃশ বললেন, কেমন করে আবার? মহারাজ পরীক্ষিত হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে হরিণ না পেয়ে তোমার বাবাকে সেই হরিণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। আর তিনিও মৌনী হয়ে আছেন বলে কোনও জবাব দিলেন না। ব্যস্ যা হবার তাই হল। পরীক্ষিত ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে কোথা থেকে একটি মরা সাপ তুলে নিয়ে এসে ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। সেই অবধি তোমার পিতা সেই সর্প-শব ধারণ করেই বসে আছেন আর মহারাজ পরীক্ষিত এখন হস্তিনাপুরে বসে আছেন।

শৃঙ্গী মুনির চোখ দুটি রাগে লাল হয়ে উঠল, শরীর জ্বলে গেল ক্রোধে— কোপ-সংরক্তনয়নঃ প্রজ্বলন্নিব মন্যুনা। অসংবৃত ক্রোধে এক মুহূর্তে তিনি আচমন-শুদ্ধ অভিশাপের জল তুলে নিলেন হাতে। অভিশাপ দিলেন— যে পাপিষ্ঠ আমার ব্রতক্লিষ্ট পিতার গলায় মৃত সর্প প্রদান করেছে, আজ থেকে সাতদিনের মাথায় তীক্ষ্ণবিষ তক্ষক আমার কথায় কুরুকুলের গ্লানি ওই পাপিষ্ঠ রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করবে।

মহাভারতের অনুসরণে এই যে শেষ অনুচ্ছেদটি লিখে ফেললাম এর মধ্যে অন্তত দুটি জিনিস আছে লক্ষ্য করার মতো। এক, আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, এই যে আপনাদের ঋষি-মুনিরা আছেন, কী রকম লোক এঁরা? অ্যাঁঃ! কথায় কথায় এত রাগ? পান থেকে চুন খসলেই অভিশাপ? সবটাই যেন এঁদের খেয়াল খুশি!

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনই দেব না। আরও দু-একটা জব্বর জব্বর অভিশাপের ঘটনা জমে উঠুক, কারণে নয় অকারণে দু-একবার ক্রোধাবেশ হোক মুনি ঋষিদের, তখন এর উত্তর দেব। বরং কথা প্রসঙ্গে এখন দ্বিতীয় বিষয়টাই বেশি করে মাথায় রাখা ভাল। সে বিষয়টা কিন্তু পুরনো—সেই নাগরাজ তক্ষকের বিষ। শৃঙ্গী মুনি রাগের মাথায় যে অভিশাপটা দিলেন তার ভাষাটা খেয়াল করেছেন কি? শৃঙ্গী বলেছেন, আমার কথায় চালিত হয়ে নাগরাজ তক্ষক ব্রাহ্মণকুলের অপমানকারী কুরুকুলের কলঙ্ক সেই পাপিষ্ঠ রাজাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে— মদ্‌বাক্য-বলচোদিতঃ/ সপ্তরাত্রাদিতো নেতা যমস্য সদনং প্রতি।

AMARBOI.COM

আগেই বলেছি— নাগজাতীয়রা কেউ সাপ টাপ নন। তাঁরা রীতিমতো মানুষ এবং এই মানুষদের সঙ্গে তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজের বনিবনাও দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। নইলে নাগরাজ তক্ষক, যিনি অবশ্যই নাগ গোষ্ঠীর এক প্রধান নেতা, তিনি ব্রাহ্মণের কথায় চালিত হবেন কেন? লক্ষণীয় বিষয় হল—আমরা এর আগে ব্রাহ্মণ উতঙ্ককে দেখেছি। তিনি তক্ষকের ওপরে ভীষণ ক্রুদ্ধ। জনমেজয়কে তিনি তক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তেজিতও করেছেন। আবার ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যাংশকেও এখন আমরা লক্ষ্য করছি। তাঁরা ক্ষত্রিয় রাজার ওপরে বিরক্ত হয়ে নাগ-জন-জাতির পাশাপাশি দাঁড়াচ্ছেন। স্বয়ং নাগরাজ তক্ষক তাঁদের শাসনে চলেন। ব্যাপারটার মধ্যে যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক চোরাবালি কিছু লুকিয়ে আছে— সেটা একটু বুঝে নিতেই হবে।

শৃঙ্গী-মুনি পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে পিতা শমীকের কাছে গেলেন। তিনি তখনও সেই অবস্থায় মরা সাপ গলায় নিয়ে বসে আছেন, যেমনটি তিনি আগে ছিলেন শৃঙ্গী রাগে কেঁদে ফেললেন। পিতার মৌনতা বিঘ্নিত হল। শৃঙ্গী সদর্পে বললেন, যে দুরাত্মা আপনার এই অবস্থা করেছে তার খবর শোনামাত্র আমি তাকে অভিশাপ দিয়েছি, বাবা। —শ্রুত্বেমাং ধর্ষণাং তাত তব তেন দুরাত্মনা। আজ থেকে সাত দিনের মাথায় নাগরাজ তক্ষক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

শান্ত মহর্ষি শমীক পুত্রের অভিশাপ উচ্চারণে খুশি হলেন না। তিনি বললেন, কাজটা তুমি ভাল করনি, পুত্র! এতে আমার তো সুখ তো কিছু হলই না বরং তুমি তোমার তপস্বীর ধর্ম

থেকে বিচ্যুত হলে— ন মে প্রিয়ং কৃতং তাত নৈষ ধর্মস্তপস্বিনাম্। শমীক পুত্রকে বুঝিয়ে বললেন, পরীক্ষিত মহারাজ আমাদের রাজা বটে। সমস্ত সময় তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের তিনি রক্ষা করেন। আর তুমি তাঁর এই বিপদ ঘটালে? ভাল করনি, পুত্র! ভাল কাজ করনি।

পিতা-পুত্র, দুই মুনির ভাব চরিত্র দেখলেন নিশ্চয়। দু'জনে দু'রকম। একজন রাজাকে অভিশাপে ধ্বংস করতে চাইছেন, অন্যজন তাঁকে রক্ষা করতে চাইছেন। শমীক পুত্রকে রীতিমতো তিরস্কার করে বললেন, তুমি সত্যব্রত। তোমার অভিশাপ মিথ্যা হবে না জানি। কিন্তু পুত্র যাতে গুণবান যশস্বী হয়ে ওঠে তার জন্য বয়স্ক পুত্রকেও পিতা শাসন করেন—পিত্রা পুত্রো বয়স্থো'পি সততং বাচ্য এব তু। আমি তাই করছি। তুমি যে অভিশাপই দিয়ে থাক, আমি কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে তোমার এই আকস্মিক ক্রোধের খবর জানাব। আমি জানাব, যে আপনি আমাকে অপমান করেছেন জেনে আমার বদরাগী বুদ্ধিহীন, অশিক্ষিত ছেলে আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। —মম পুত্রেণ শপ্তো'সি বালেনাকৃতবুদ্ধিনা।

মহর্ষি শমীক পুত্রকে সম্পূর্ণ লজ্জা দিয়ে পরীক্ষিতকে সব জানানোর জন্য তাঁর প্রিয় শিষ্য গৌরমুখ মুনিকে পাঠালেন, পরীক্ষিতের কাছে। শমীকের উদ্দেশ্য ছিল একটাই —দেশের রাজা, যিনি এতকাল ধরে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের প্রতিপালন করে এসেছেন, সেই তিনি যেন না ভাবেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁর বিপক্ষে চলে গেছেন। অপিচ ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে যে আকস্মিক অভিশাপ নেমে এসেছে তাঁর ওপর সে অভিশাপ যেন তাঁর অজ্ঞাত না থাকে। অন্তত অভিশাপের সম্মুখীন হবার মতো মানসিক প্রস্তুতি যেন পরীক্ষিতের থাকে। —শমীক সেই আশ্বস্ততাটুকু দিতে চেয়েছেন রাজাকে। এর মধ্যে যে অপমানটুকু রাজার পক্ষ থেকে মৃত সর্পের আকার নিয়ে এসেছিল তার কার্যকারণসূত্র শমীক তাঁর অসীম ক্ষমায় ব্যাখ্যা করে নিতে পেরেছেন, কিন্তু সে ব্যাখ্যা তাঁর পুত্রের কাছে অবোধ্য থেকে গেছে। মনে রাখতে হবে পরীক্ষিতের রাজত্বকালে কলিপ্রবেশ ঘটে গিয়েছিল। তার শেষ পরিণতিতে পরীক্ষিত স্বয়ং এক সচ্চরিত্র সজ্জন মুনিকে অপমান করে বসেছেন, সেই কলির প্রকোপ কিন্তু অন্যত্রও বেড়ে গিয়ে থাকবে। অর্থাৎ তাঁর শাসনের মধ্যে সেই শক্তি বা সেই বাঁধন ছিল না, যা সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে ধরে রাখতে সক্ষম ছিল। শমীক নিজগুণে পরীক্ষিতের অপরাধ ক্ষমা করেছেন বটে, কিন্তু অন্যেরা তা পারছেন না। আর সেই সুযোগে অন্য জাতি-গোষ্ঠী যারা রাজার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না অথবা পরীক্ষিতের দুর্বল শাসনে যারা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে তারা এই বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে পরীক্ষিতকে সিংহাসন থেকে চ্যুত করার জন্য।

AMARBOI.COM

চলে আসুন এবার তক্ষকের কথায়। নাগরাজ তক্ষক নাগকুলের অন্যতম বিধ্বংসী ব্যক্তিত্ব। বিধ্বংসী তিনি একাই নন, আরও অনেকে আছেন তাঁর সঙ্গে মহর্ষি শৌনক আমাদের মতোই জিজ্ঞাসা নিয়ে বসেছিলেন। নাগগোষ্ঠীর নানা কাহিনী শুনে আমাদের মতোই তাঁর প্রশ্ন জেগেছে। কথক-ঠাকুর সৌতি উগ্রশ্রবার কাছে তিনি অনুযোগের সুরে বলেছেন, তুমি অনেক সর্প-কাহিনী শোনালে বটে, তবে তুমি কিছুতেই সর্পদের নাম বলছ না — পন্নগানাং তু নামানি ন কীর্তয়সি সূতজ। সাধারণদের কথা নাই বা বললে, অন্তত সর্প প্রধানদের নামগুলো বল তুমি। সৌতি বলতে আরম্ভ করলেন। সর্প প্রধানদের মধ্যে প্রথম নাম হল শেষ নাগের , দ্বিতীয় নাম বাসুকির। তারপর ঐরাবত, তক্ষক, কালিয় ধনঞ্জয়, মণিনাগ, এলাপত্র , নহুষ, কৌরব্য, হস্তিপিণ্ড, ধৃতরাষ্ট্র , কুঞ্জর, হলিক ইত্যাদি।

সৌতি যত নাম করেছেন আমি তত করলাম না। আমার স্বার্থে আমি কতগুলি সর্প-নাম বেছে নিয়েছি —যাঁদের সঙ্গে কুরু-পাণ্ডব বংশের অনেক রাজ-নামের মিল আছে। পণ্ডিতেরা

অনুমান করেন, যে ধৃতরাষ্ট্র-ধনঞ্জয় অথবা কৌরব্য-নহুষ—এই নামগুলি নাগ-গোষ্ঠীর প্রধানদেরই নাম বটে, কিন্তু এই নামগুলি এতটাই জনপ্রিয় বা সম্মানিত ছিল যে, কুরুকুলের অনেকেই সেই নামগুলি সচেতনভাবে এবং সসম্মানে গ্রহণ করেছেন। কথাটা একটু খুলেই বলি।

অসভ্যতা হলেও আপনি যদি এখনও কোনও বীরেন বা শশধর নাগকে তাঁর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বীরেনবাবু উত্তর দেবেন আমরা কায়স্থ; আর শশধরবাবু তাঁর জাতির ইতিহাসটুকু আরও পূর্বে নিয়ে গিয়ে আপন পিতৃবংশের মাহাত্ম্য সূচনা করে বলবেন, আমরা বহু পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, তবে এই শ্যাম বঙ্গ-দেশে আমরা কায়স্থ বলেই পরিচিত হয়েছি। বস্তুত বীরেন নাগ কি শশধর নাগ 'শুদ্ধ-কৌলিক' কায়স্থ, নাকি 'বাহাত্তুরে কায়স্থ' — তা নিয়ে নানা বিবাদ বিসংবাদ আছে। এমনকি কায়স্থরা ক্ষত্রিয় জাতির অধস্তন কি না—তা নিয়েও এক সময় বিশ্বকোষ রচয়িতা নগেন্দ্র নাথ বসু এবং বৈদ্য-কায়স্থ মোহমুদ্গরের লেখক উমেশচন্দ্র গুপ্তের উতোর চাপান বেশ ভাল রকম জমেছিল। আমি অবশ্য পরম সম্মানিত এই কায়স্থ জাতির মূল নিয়ে কোনও তর্কেই যাব না। কারণ আমি শুধু নাগ-বাবুদের নিয়ে চিন্তিত।

বঙ্গজ নাগরা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় যাই হোন না কেন, প্রাচীন ভারতের উত্তর, পশ্চিম এমনকি দক্ষিণেও নাগরা কিন্তু নিজেদের বংশ-মূল হিসেবে মহাভারতীয় বিখ্যাত নাগদের পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। দিল্লির একটি লৌহ স্তম্ভ লিপিতে চন্দ্র নামে এক নাগ রাজার নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর পুরো নাম হয়তো চন্দ্রাংশ। পৌরাণিকেরা এই নাগদের বংশ পরিচয় দেবার সময় বড় গর্বভরে বলেছেন বিদিশার ভাবী নাগ-বংশের রাজাদের কথা শুনুন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন চন্দ্রাংশ। তিনি শেষ নাগের পুত্র—শেষস্য নাগরাজস্য পুত্রঃ পর-পুরঞ্জয়ঃ।

যদি বলেন, পুরাণের কথায় বিশ্বাস করি না, ঐতিহাসিকরা তার থেকে ভাল। তাহলে বলতে হবে—বিদিশা অর্থাৎ এখনকার ভিলসার কাছাকাছি বেশনগর, পদ্মাবতী (পদম পাওয়া), কান্তিপুরি আর মথুরায় নাগেরাই ছিলেন রাজা। কুষাণ রাজত্বের পরের দিকে তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নাগরা উত্তর ভারত এবং মধ্য-ভারতে ভাল রকম জাঁকিয়ে বসেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত থেকে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত সবারই অনেক সময় গেছে এই নাগদের দাবিয়ে রাখতে। আর আমাদের বিখ্যাত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—ইতিহাসের গৌরব যিনি বিক্রমাদিত্য বলে বিখ্যাত—তিনি বড় বুদ্ধিমান মানুষ। দাবিয়ে রাখার ঝামেলার থেকে এক নাগকন্যাকে বিবাহ করাটা তাঁর কাছে অনেক বেশি শ্রেয় মনে হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ চাইলে সময় মতো দেওয়া যাবে।

আমাদের জিজ্ঞাসা— ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক বাহক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই বুদ্ধি হল কোত্থেকে? আমরা বলব তাঁর সামনে উদাহরণ ছিল অনেক। অর্জুন যে নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করেছিলেন —এই উদাহরণই শুধু নয়। আর্যসভ্যতার প্রথম কল্প থেকে নাগরা যে আর্যদের শত্রু অথবা আর্যদের শত্রুপক্ষকে যে অনেক সময়ই সর্পের কল্পনায় দেখা হত— এ কথা বিক্রমাদিত্য জানতেন। বেদের মধ্যে বৃত্র থেকে আরম্ভ করে অনেক শত্রুকেই 'অহি'বা সর্পরূপেই কল্পনা করা হয়েছে। এঁদের সঙ্গে যুঝতে হলে হয় তাঁদের মারতে হবে, নয়তো তাঁদের সঙ্গে রফায় আসতে হবে। আর্যায়ণের প্রথম দিকে এই শত্রুতা বেশি ছিল, পরের দিকে মিল মিশ বিবাহ—সবই হয়েছে। অর্থাৎ রফা।

নাগদের মধ্যে দু'রকমের বৃত্তি দেখা যাবে ইতিহাস-পুরাণে। কোথাও তারা ভাল, কোথাও মন্দ। মহাভারতের কদ্রু আর বিনতার গল্পে এই ভাল মন্দর খবরটুকু দেওয়া আছে, কিন্তু সেই কাহিনীতে যেতে হলে সমুদ্র-মন্থনের কথা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আমি পরে আসছি সে

কথায়। আগে জানাই—কদ্রুর ছেলেরা হলেন সাপ, আর বিনতার ছেলে হলেন গরুড়। এঁদের পিতা কিন্তু একজনই —মহর্ষি কাশ্যপ। অর্থাৎ এঁদের বংশমূলে সাপ বা পাখির কোনও গন্ধ নেই। একই মুনির দুই পুত্র— এক পক্ষে সর্পকুল, অন্যপক্ষে পক্ষী সুপর্ণ। হাইনরিখ জিমারের রূপকের ভাষায় একটা হল —darker aspects of God's essence, আর অন্য দিকে রয়েছে তার conquering principle —গরুড়, সুপর্ণ।

ব্যাপারটা ইতিহাসেও একই রকম। পণ্ডিতরা বলেন কুরু পাণ্ডবদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল কেন্দ্র, যাকে আমরা হস্তিনাপুর বলি, সেই হস্তিনাপুরে আগে নাগদের বাসা ছিল। হস্তিনাপুরকে আগে নাগ পুরই বলা হত। মহাভারতের মহারাজ পাণ্ডুর বিশেষণ হল নাগপুর-সিংহ। বলতে পারেন—নাগ-মানে তো হাতিও বটে; বিশেষত হস্তিনাপুর গজসাহবয় —এইসব নাম থেকে হস্তিনাপুরের সঙ্গে হাতির সাযুজ্যটাই আসে বেশি অতএব সর্প নাগ নয়, হস্তি-নাগ থেকেই হস্তিনাপুরের উৎপত্তি। আমরা কিন্তু এখানে সৌতির বলা সেই সর্পনামগুলি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে নামের সঙ্গে হাতির নাম মিশে গেছে। অর্থাৎ সেই ঐরাবত, হস্তিপদ, হস্তিপিণ্ড, কুঞ্জর ইত্যাদি। সর্প-নাগদের সঙ্গে হস্তি নাগের ভিন্নতা এইভাবেই নষ্ট হয়ে গেছে। নাগপুর হয়ে গেছে হস্তিনাপুর। পণ্ডিতেরাও এসব কথার উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন Later when the distinction between the Naga and serpent clans was forgotten, the elephant was also associated with them.ধরে নিতে পারি— পাণ্ডু রাজার নাগ-পুরে সর্প নাগরাই থাকতেন।

AMARBOI.COM

আমি অবশ্য ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে দিতে চাই। মহাভারত বলেছে— যেসব শত্রু আগে কুরুরাষ্ট্র দখল করে রেখেছিল, আর কুরুদের ধন-সম্পদ হরণ করেছিল, মহারাজ পাণ্ডু সেই সব দেশ পুনরায় অধিকার করে সেগুলিকে করদ রাজ্যে পরিণত করলেন—তে নাগপুর-সিংহেন পাণ্ডুনা করদীকৃতাঃ। এই যাঁদের রাজ্য পুনরায় দখল করলেন পাণ্ডু, আমাদের ধারণা—তাঁরা সকলেই নাগ-গোষ্ঠীর রাজা। তাঁদের জয় করেছিলেন বলেই তিনি নাগপুর-সিংহ। পাণ্ডু থেকে আরম্ভ করে একেবারে যুধিষ্ঠিরের সময় পর্যন্ত নাগ রাজারা বেশ স্তিমিত হয়েই ছিলেন খাণ্ডব-বন দহনের সময় স্বয়ং নাগরাজ তক্ষককে নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হয়। যদিও তিনি প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলেও দুর্যোধন বা যুধিষ্ঠিরের দর্পিত এবং সংযত রাজত্বকালে তিনি মাথা উঁচু করেননি মোটেই। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পৃথিবী বীরশূন্যা হয়ে গেল। পরীক্ষিত রাজা হয়ে বসলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুর্বল রাজত্বের সুযোগ নিয়ে একদিকে যেমন (রূপকাকারে কল্পিত) কলির প্রবেশ ঘটল, তেমনই ঘটল নাগদের অভ্যুত্থান। নাগরাজ তক্ষক সেই অভ্যুত্থানের প্রতীক।

লক্ষণীয় বিষয় হল— আমরা যে শেষ নাগ বা বাসুকি নাগের কথা বলেছি, এঁরা কিন্তু আপন নাগ-গোষ্ঠী ত্যাগ করে আর্য গোষ্ঠীতে যোগদান করেছিলেন। শেষ নাগ পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুর অনন্তশয্যা। আর্যগোষ্ঠীর কাছে তিনি পরম সম্মানিত। স্বয়ং কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ বলরাম শেষাবতার রূপে চিহ্নিত। আর বাসুকি হলেন সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব, যিনি রাজা হয়ে আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে নাগ গোষ্ঠীর মিলন সেতু রচনা করেছিলেন এবং তিনিই সমস্ত নাগ গোষ্ঠীকে আর্যগোষ্ঠীর প্রকোপ থেকে মুক্ত করে আসন্ন উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সে কথায় পরে আসছি। আপাতত শমীক পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ নিজের কানে শুনে মহারাজ পরীক্ষিতের কী অবস্থা হল একটু দেখে নিই।

আট

শমীক-মুনির সংবাদ নিয়ে তাঁর শিষ্য গৌরমুখ হস্তিনায় এসে পৌঁছলেন পরীক্ষিতের কাছে। পরীক্ষিত শমীককেও চেনেন না, তাঁর পুত্র শৃঙ্গীকেও চেনেন না, গৌরমুখকেও তাঁর চেনার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি যখন ভয়ংকর অভিশাপ বাক্যটি শোনাল, তখন অনুতাপে তাঁর হৃদয় জর্জরিত হল। শমীক যে মৌনব্রত নিয়ে বসেছিলেন, সেইজন্য যে তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের কথায় উত্তর দিতে পারেননি—এই অসম্ভব ভুলটুকু পরীক্ষিতকে পীড়িত করে তুলল— ভূয় এবাভবদ্রাজা শোকসন্তপ্তমানসঃ।

হাজার হলেও কুরুকুলের অধস্তন পুরুষ। অন্যায় একবার করে ফেলেছেন বটে, কিন্তু সে অন্যায় অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে মর্মচ্ছেদী অনুতাপ তাঁকে যত দগ্ধ করতে লাগল, তাঁর মৃত্যুর অভিশাপ সেই অনুপাতে তাঁর কাছে অনেক বেশি সহনীয় ছিল—ন হি মৃত্যুং তথা রাজা শ্রুত্বা বৈ সোন্বতপ্যত। শমীক মুনি উপদেশ পাঠিয়েছিলেন রাজা যেন আত্ম-রক্ষার যথাযথ উপায় অবলম্বন করেন। রাজা পরীক্ষিত সেই উপদেশ মাথায় রেখে মন্ত্রীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে নিজের জন্য নিশ্ছিদ্র সুরক্ষার ব্যবস্থা নিলেন। একটি মাত্র স্তম্ভের ওপর একটি বাড়ি বানিয়ে চতুর্দিকে সর্প চিকিৎসক নিযুক্ত করে, চারদিকে বিষ-নাশক ওষুধ ছড়িয়ে, সর্পমন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের ওপর তদারকির ভার দিয়ে পরীক্ষিত মহারাজ সুরক্ষিত হয়ে রইলেন। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে না, লোক জনের যাতায়াত বন্ধ, সর্বব্যাপ্ত বায়ুরও যেন সে বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। এমনই এক নিশ্ছিদ্র ঘেরা-টোপের মাঝখান থেকে পরীক্ষিতের রাজকার্য চলতে থাকল।

রাজা রাজার মতো সুরক্ষায় ঘেরা থাকলেন, ওদিকে নাগ-রাজ তক্ষকও তাঁর সময় সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। শৃঙ্গী-মুনির চরম ঘোষণার দিনটি, অর্থাৎ ছ দিন পেরিয়ে সপ্তম দিনটি এসে

গেল। বিষ-বৈদ্য অথবা সাপের ওঝা —এগুলির মধ্যে সত্যতা যতটুকু আছে, তা রূপকথার রসিকদের আনন্দ দিতে থাকুক, কিন্তু পরীক্ষিতের মৃত্যু যেভাবে ঘটল, তাঁর মধ্যে ইতিহাসের রসটুকুও রীতিমতো ব্যাখ্যাযোগ্য। নাগরাজ তক্ষক পরীক্ষিতের আত্মগুপ্তির সমস্ত উপায় এবং সম্ভাবনাগুলি পূর্বাহ্ণেই জেনে গিয়েছিলেন। আমাদের অনুমান—সপ্তম দিন পর্যন্ত তিনি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করে দেখেছেন—কারা পরীক্ষিতের কাছাকাছি ঘেঁষতে পারছেন, আর কারা পারছেন না। এই নিবিষ্ট পরীক্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সোজা পথে পরীক্ষিতকে মারা যাবে না, চোরা-গোপ্তা বাঁকা পথে পরীক্ষিতকে শেষ করে দেবেন তিনি। মহাভারতের কবি লিখেছেন—তক্ষক লোকমুখে শুনেছেন যে অনেক লোক বিষহর মন্ত্রে পরীক্ষিতকে রক্ষা করে চলেছেন অর্থাৎ জোরদার পাহারা চলছে সেখানে। অবস্থা বুঝে তক্ষক ঠিক করলেন—ছল করেই ঠকাতে হবে পরীক্ষিতকে, তাঁকে মারতেও হবে ছল করেই—ময়া বঞ্চয়িতব্যো'সৌ .... মায়াযোগেন পার্থিবঃ।

মনে রাখতে হবে—নাগ জনজাতির মানুষেরা কৌরব-পাণ্ডব বংশের হাতে নানাভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পালাতে বাধ্য হলেও তাঁদের শত্রুতার মধ্যে অসুর-রাক্ষসদের শক্তিমত্তা ছিল না। তাঁদের সামরিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ায় সম্মুখ-যুদ্ধে তাঁরা সব সময়েই খুব সহজভাবে আর্যগোষ্ঠীর নায়কদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু নিজেদের জায়গা জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অপমান এবং পরাজয়ের গ্লানিটুকু তাঁদের মনের মধ্যে এতই দৃঢ়—নিবদ্ধ ছিল যে, শত্রুতার সুযোগ পেলেই তাঁর শত্রুতা করতেন। কিন্তু সেই শত্রুতার মাধ্যম ছিল চোরাগোপ্তা আক্রমণ, পণ্ডিতদের ভাষায়—Yet they were very acute in accomplishing the wargild and often stabbed their enemy in the back.

পরীক্ষিতের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও এই 'ব্যাক-স্ট্যাবিং' বা ছলনাটাই হয়েছে। মহাভারতে পরীক্ষিতের মৃত্যুকালীন অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের সময়টুকু যদি বিচার করে দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করে দেখবেন, শেষের দিনে পরীক্ষিত অনেক ভারমুক্ত। তাঁর নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা -ব্যবস্থার মধ্যে খানিকটা শিথিলতাও এসেছে বলে মনে হচ্ছে। দিনের পর দিন লক্ষ্য করে নাগরাজ তক্ষক বুঝেছেন যে, একমাত্র তপস্বী মুনি-ঋষিরাই পরীক্ষিতের দরবারে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছেন। কারণটা খুব পরিষ্কার। পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ নির্ধারিত হয়ে গেছে, অতএব তিনি যতটা পারেন মোক্ষ-সাধন সম্পন্ন পুণ্যশ্লোক ঋষি-মুনিদের সৎসঙ্গে ভগবৎ কথা শ্রবণ করে পুণ্যলাভের চেষ্টা করছেন। পুরাণ থেকে জানা যায় যে, ব্যাস-পুত্র শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের মতো কৃষ্ণ-কথাশ্রয়ী মহাপুরাণ ওই সাতদিনের মধ্যেই পরীক্ষিতের কাছে কীর্তন করেন। ভাগবতের আপন বর্ণনা অনুযায়ী পরীক্ষিতের ভাগবত-সভায় ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষির অভাব ছিল না।

সে যাই হোক, নাগরাজ তক্ষক যখন দেখলেন যে, পরীক্ষিতের সামনে পৌঁছনোর সবচেয়ে সোজা উপায় সাধুর বেশ ধারণ করা, তখন তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নাগ- অনুচরদের তপস্বীর ছদ্মবেশে ফুল-ফল, কুশ এবং জল উপহার নিয়ে পরীক্ষিতের কাছে যেতে বললেন। তারা আদেশ পালন করল এবং মহাভারতের লোকাত্তর বর্ণনা অনুযায়ী তক্ষক এই সময় একটি কৃমি কীটের আকার গ্রহণ করে লুকিয়ে রইলেন সুমিষ্ট ফলের অন্তর্দেশে। পরীক্ষিত বিচার করলেন না একটুও। সাধু-সজ্জনের উপহার দেওয়া আপাত নির্দোষ সেই ফলটিতে কামড় লাগাতেই একটি সামান্য কীটমাত্র দেখা গেল। কীটের চেহারা মহাকাব্যের বর্ণনার খাতিরে ছোট এবং রোগা—অণুঃ হ্রস্বকঃ। কিন্তু এই বর্ণনায় আরও দুটো শব্দ আছে। ছোট হলেও তার গায়ের রঙ

তামাটে আর তার চোখ দুটি ঘন কালো। আর্যগোষ্ঠীর সঙ্গে নাগ-জনজাতির শত্রুতা, সৌহার্দ্য এবং বৈবাহিক মিশ্রণ দুই-ই এত বেশি গাঢ় ছিল, যে, এই চেহারায় ইঙ্গিতটুকু নৃতত্ত্বের সরসতায় ব্যাখ্যা করা মোটেই অসম্ভব নয়।

পরীক্ষিত কিন্তু বেশ 'রিলাক্সড্ মুডে' বসে আছেন। অভিশাপের শেষ সপ্তম দিনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পরীক্ষিতের মৃত্যুভয় অনেকটাই কেটে গেছে, তাঁর বিষাদ অনেকটাই মন্দীভূত— অস্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদশ্চ ন মে ভয়ম্। বেশ লঘু চপল ভঙ্গিতে তিনি ফলের ভিতরে থাকা কীটটাকে হাত দিয়ে ধরলেন এবং সেটিকে গলার ওপর রেখে বলতে লাগলেন— আমি শমীক মুনির কাছে অপরাধ করেছি, সেই অপরাধের স্খালন হোক এবার। এই কীট তক্ষক হয়ে দংশন করুক আমাকে।

এই কথার মধ্যে অপরাধ স্খালনের অনুতাপ যত ছিল, তার চেয়ে লঘুতা ছিল অনেক বেশি। পরীক্ষিত হাসছিলেন, নিজের গলার ওপরে কৃমি-কীট এদিক ওদিক করে ফেলে তিনি হাসছিলেন। মহাভারত মন্তব্য করেছে—রাজার বোধ-বুদ্ধি, কর্তব্য -অকর্তব্যের অনুতাপ তত ক্রিয়া করছিল না। মরণোন্মুখ ব্যক্তির এই বোধ থাকে না, রাজারও এই সময় তা নেই। তাই তিনি হাসছিলেন— কৃমিকং প্রাহসত্তূর্ণং মুমূর্ষু র্নষ্টচেতনঃ। মহাভারতে দেখা যাচ্ছে —তক্ষক রাজার ওই হাস্যরত অবস্থাতেই স্বমূর্তি ধারণ করে দংশন করে এবং রাজা মারা যান।

বস্তুত নাগ-তপস্বীদের দেওয়া ফলের মধ্যে তক্ষক কৃমিকীট হয়ে লুকিয়ে ছিলেন— এ কথা তত আদরণীয় নয়। ঘটনার গতি প্রকৃতি দেখে অনুমান হয়—তপস্বী মুনি-ঋষির ভেকধারী অন্য অনুচর নাগদের মধ্যেই স্বয়ং তক্ষকই লুকিয়ে ছিলেন। একুট সুমিষ্ট ফলের বাইরের আকার দেখে ফলান্তগত কীটের যেমন সন্ধান পাওয়া যায় না, তেমনই সজ্জন সাধুর বেশধারী নাগ মুনি-ঋষিদের আপাত শান্ত আকৃতির মধ্যেও তক্ষককে মোটেই চেনা যাচ্ছিল না। দিনের শেষবেলায় পরীক্ষিত উত্তেজিত; কিন্তু হয়নি, কেউ তাঁকে কিছু করতে পারেনি তাই তিনি হাসছেন—মৃত্যুর লক্ষণাঙ্কিত বোধ-বুদ্ধিহীন হাসি। মহাভারতের বর্ণনায় রূপক থেকে পুরাণকারেরা, বিশেষত ভাগবত-পুরাণের কবি আসল ঘটনাটা ঠিক ঠিক বার করে এনেছেন। সুমিষ্ট ফল অথবা ফলান্তর্গত কীটের কথা কবি উল্লেখও করেননি। তিনি একটি মাত্র দৃঢ় নিবদ্ধ পংক্তিতে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—শৃঙ্গী মুনি তক্ষককে লাগিয়েছিলেন পরীক্ষিতকে মেরে ফেলার জন্য এবং তক্ষক সোজা ব্রাহ্মণ ঋষি মুনির ছদ্মবেশ ধারণ করে পরীক্ষিতের সামনে এসে তাঁকে দংশন করলেন—

তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজ-সুনুনা।
দ্বিজরূপ প্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপো'দশন্নৃপম্।।

এটা দংশন, না আকস্মিক অস্ত্রাঘাত, তা সুধীজনেরা বিচার করুন তবে আমার মত ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বের বিশ্বাসে এটাকে অস্ত্রাঘাত বলেই মনে করে। মনে রাখবেন—ভারতের চিরন্তন নীতিশাস্ত্রে সর্পের সব সময় খল জনের তুলনা দেওয়া হয়েছে। সর্পঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ —এ সব সাধারণ নীতি উপদেশের কথা ছেড়েই দিলাম, এখানে অন্তত পনেরো থেকে কুড়িটা সংস্কৃত সূক্তি—রত্ন আমি সাজিয়ে দিতে পারি যেখানে খলজনের সাজাত্যে সর্পের তুলনা এসেছে। তক্ষকও এই রকম এক খল প্রকৃতির ক্রূর মানুষ। পাণ্ডব বংশের ওপর তার ক্রোধ ছিল বহুদিনের। সেই যেদিন খাণ্ডব বন দহন করে অর্জুন তাঁকে স্থান -ভ্রষ্ট করেছিলেন, ততদিনের ক্রোধ। যদিও অর্জুন বেঁচে থাকতে তিনি কিছুই করতে পারেননি, কিন্তু অর্জুন

মহাপ্রস্থানে যেতেই, তিনি তাঁর সময় সুযোগ খুঁজছিলেন। এই অবসরে শৃঙ্গী মুনির পিতার কাছে কোনও কারণে পরীক্ষিতের অপরাধ ঘটে যাওয়ায় তক্ষক সেই সুযোগ পান।

শৃঙ্গী নিশ্চয় তক্ষকের সঞ্চিত ক্রোধের কথা জানতেন এবং তিনি সোজাসুজি তাঁকে নিযুক্ত করেন পরীক্ষিতকে মেরে ফেলার জন্য। নইলে মহাভারতের অন্যত্রও আমরা অনেক অভিশাপ শুনতে পাব। তাতে দেখবেন—তুই এই করেছিস, তোর এই. হবে, সেই হবে ইত্যাদি—এইরকমই অভিশাপের নমুনা। কিন্তু এখানে শৃঙ্গী মুনির কথা কত পরিষ্কার, সে কথার কত জোর—আজ থেকে সাতদিনের মাথায়. তক্ষক সেই রাজাকে যমের বাড়ি নিয়ে যাবে এবং তা আমার বাক্যে, আমার কথায় প্ররোচিত হয়ে— মদ্‌বাক্যবলচোদিতঃ। পুরাণ কথায় ভাগবতে, তো শৃঙ্গী মুনির কাজটা আরও পরিষ্কার। ক্রুদ্ধ মুনির দ্বারা প্রেরিত হয়ে তক্ষক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এলেন পরীক্ষিতকে দংশন করতে— প্রহিতো দ্বিজসূনুনা। আরে ! ব্রাহ্মণ কি আর দংশন করে? খল এবং ক্রুরপ্রকৃতির লোকই সাধু সেজে এসে পেছন থেকে ছুরি মেরেছে পরীক্ষিতকে। আজকের দিনে, নিজে যে পারে না, সে যেমন মাস্তান দিয়ে মার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে, 'মার্ডারের ব্যবস্থা করে, তেমনই এখানেও নাগরাজ তক্ষক তাঁর 'পুরনো হিস্যা' মিটিয়ে নিলেন, যদিও তার নিমিত্ত হয়ে রইলেন শৃঙ্গী মুনি।

শৃঙ্গীর পিতা শমীক পাণ্ডব বংশের রাজত্বের অনুগামী। তিনি একদিকে পুত্রের অভিশাপের অনিবার্যতা স্বীকার করছেন। (—কারণ তক্ষক তখন কাজে লেগে গেছেন—) আবার অন্যদিকে পরীক্ষিতের কাছে শিষ্য পাঠিয়ে তাঁকে সাবধান করছেন; খল সর্পের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য তাঁকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে বলছেন। অভিশাপ যদি অনিবার্য হয়, তবে আত্মরক্ষার উপায় বৃথা, অন্তত তৎকালীন দিনের অভিশাপের মনস্তত্ত্ব তাই বলে। অথচ শমীক পরীক্ষিতকে আত্মরক্ষা করতে বলছেন। তার মানে, পুত্রের অভিশাপের অনিবার্যতার থেকেও তক্ষকের চোরা-গোপ্তা আক্রমণের বাস্তবটুকু এখানে বেশি বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ। শৃঙ্গী-পিতা শমীক-মুনির পরস্পরবিরোধী কথা দুটি এবং পরীক্ষিতের দিক থেকে আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা —এই দুটি ব্যবহারই বিপরীত দিক থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, নাগ জনজাতির অন্যতম নায়ক ব্রাহ্মণ-সমাজের একাংশের অনুমোদন লাভ করে নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন মাত্র। রূপক-প্রিয় মহাকবি পরীক্ষিতের অপরাধ, ব্রাহ্মণের অভিশাপ আর বিষবাহী তক্ষক -দংশনের উপন্যাসে যে অসাধারণ গল্পটি লিখেছেন, তার মধ্যে ঐতিহাসিকের টিপ্পনি শুধু এক জায়গাতেই। তা হল—এই মাত্র পরীক্ষিতের এক স্তম্ভলম্বী রাজসভায় যে রাজনৈতিক খুনটি হয়ে গেল, তাতে অর্জুনের একান্ত আত্মবংশ পরীক্ষিত মারা গেলেন, এবং তাতে নাগরাজ তক্ষকের ব্যক্তিগত ক্রোধও কিছুটা শান্ত হল বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে নাগ-গোষ্ঠী বা জনজাতির ওপর এই খুনের প্রভাব পড়ল অন্যরকমভাবে। রক্তের বদলে রক্ত— আর্যগোষ্ঠী রক্তের বদলায় মেতে উঠলেন।

পরীক্ষিত মারা যেতেই ব্রাহ্মণেরা পরীক্ষিতের মন্ত্রী এবং পুরবাসীদের সঙ্গে একজোট হয়ে তাঁর উপযুক্ত পুত্র জনমেজয়কে সিংহাসন বসালেন। জনমেজয় যখন পিতার সিংহাসনে বসেন, তখন তাঁর বয়স অল্প। যদিও মহাভারতের কবি তাঁকে একেবারেই শিশু বলেছেন, তবে নিতান্ত শিশুটিই তিনি ছিলেন না। সিংহাসনে বসার কিছুকালের মধ্যেই তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম বপুষ্টমা। জনমেজয়ের এই অতীব স্পৃহণীয়া হৃদয়হারিণী পত্নীর সম্বন্ধে এখনই কোনও কথা বলছি না। যদি প্রসঙ্গ আসে, তবে সে আলোচনা পরে আসবে। আপাতত এইটুকুই

জানাই—সিংহাসনে বসার সময়ে পিতার আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে তত সচেতন ছিলেন না এবং উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রী-ব্রাহ্মণেরাও তাঁকে তেমন করে কিছুই অবহিত করেননি। তাই বলে মন্ত্রীরা পরীক্ষিত-হন্তা তক্ষকের কথা ভুলে বসেছিলেন, তা নয়। আমরা জানি যে, জনমেজয় রাজা হয়ে এক সময় তক্ষশিলা জয় করতে গিয়েছিলেন এবং তারও আগে-পাঠক স্মরণ করুন সেই কুকুরীর অভিশাপের কথা। কুকুরীর অভিশাপ মোচনের জন্য জনমেজয় যাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন, সেই সোমশ্রবা ব্রাহ্মণ ঋষি শ্রুতশ্রবার ঔরস পুত্র বটে তবে তাঁর মা ছিলেন নাগ জাতীয়া। জনমেজয় তক্ষক নাগের হাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে থাকবেন। তাই কুকুরী যখন অভিশাপ দিল— তোমারও ওপর ভয় নেমে আসবে অতর্কিতে— তখন জনমেজয় আবারও সর্পাঘাতের কথাই ভেবেছেন হয়তো। অন্তত পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে নাগ জনজাতির সঙ্গে যে রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শত্রুতা আরম্ভ হয়েছিল তারই নিরিখে জনমেজয় এমন একজনকে চিরন্তন পৌরোহিত্যে নিয়োগ করলেন, যাঁর ঘনিষ্ঠ মেলা মেশা আছে নাগ জনজাতির সঙ্গে।

সোমশ্রবা এক সর্পীর পুত্র। জনমেজয় সোমশ্রবাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে ভাইদের বলেন তাঁর আজ্ঞাবহ হতে। আর ঠিক সোমশ্রবাকে নিযুক্ত করেই যে তিনি তক্ষশিলা জয় করতে বেরলেন তার পেছনে সোমশ্রবার পরামর্শ ছিল বলে আমরা অনুমান করি। হয়তো তিনিই বলেছিলেন যে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর কারণ তক্ষককে সেইখানেই পাওয়া যাবে। তক্ষশিলা আর তক্ষক —এই 'তক্ষ' নামের সাদৃশ্যটা খুব বড় কথা নয়, তক্ষক যে ওইখানেই থাকতেন, তার একটা বড় প্রমাণ মহাভারতের বনপর্বে। সেখানে দেখা যাবে— পাণ্ডব মধ্যম অর্জুন অমোঘ অস্ত্র লাভ করার জন্য শিবের তপস্যা করতে গেছেন আর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আর অন্য ভাইদের নিয়ে বিমনা হয়ে বসে আছেন। এই অবস্থায় দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। নারদ তাঁকে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়াবার উপদেশ দিলেন। বেড়ানোও হবে, পুণ্যও হবে, সময় ও কেটে যাবে স্বচ্ছন্দে। এই নানা তীর্থের নাম এবং তাঁর মাহাত্ম্যের মধ্যে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের কথা এল। শোনা গেল— কাশ্মীরে বিতস্তা নদীর জল-ধোয়া কোনও এক অঞ্চলে নাগরাজ তক্ষকের বাসভূমি —কাশ্মীরেম্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ। বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতং সর্বপাপ-প্রমোচনম্।

সেকালে এমন ছিল। শুধু আর্যগোষ্ঠীর আর ব্রাহ্মণ্যের কেন্দ্রগুলিই শুধু তীর্থ হিসেবে পরিগণিত হত না। কোনও স্থানকে আপন তপস্যায় এবং মাহাত্ম্যে তীর্থীকরণের ক্ষমতা আর্যদের যেমন ছিল, আর্য-বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীরও তেমন ছিল। বলতে পারেন এই কাশ্মীরদেশি নাগ ভবনের মালিক তক্ষক আর পরীক্ষিত-হন্তা তক্ষক একই ব্যক্তি কিনা? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এমন হতে পারে—খাণ্ডব দাহের সময় অর্জুনের তাড়া খেয়ে তক্ষক কাশ্মীরের প্রত্যন্ত দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে—তক্ষক একটি বিখ্যাত নাগবংশের উপাধিমাত্র। কাশ্মীরে বিতস্তা নদীর তীরভূমিতে তক্ষক নাগবংশ এতটাই বিখ্যাত ছিল যে তাঁদের আবাসভূমি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। যে কোনও কারণে এই বিখ্যাত বংশের সঙ্গে পাণ্ডবদের শত্রুতা হয় এবং মহারাজ পরীক্ষিত তার বলি হন।

জনমেজয় তক্ষশিলা, জয় করে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু তক্ষককে তিনি সেখানে পাননি— মহাভারতে দেখবেন —এই তক্ষশিলা জয়ের পর-পরই মহর্ষি বেদের শিষ্য উতঙ্ক উপস্থিত হন হস্তিনাপুরে জনমেজয়ের রাজসভায় এবং তিনি তক্ষকের সম্বন্ধে জনমেজয়কে উত্তেজিত করেন। ঠিক এইবার জনমেজয় পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে প্রাচীন মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা

করেন এবং মন্ত্রীরাও আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জনমেজয়ের কাছে নিবেদন করেন। সে সব ঘটনা আমরা আগে বলেছি।

জনমেজয়ের রাজসভায় জরুরি বৈঠক বসল। মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সবার মত চেয়ে জনমেজয় বললেন, উতঙ্কের হেনস্থা এবং পিতার মৃত্যু— এই দুয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি তক্ষককেও পুড়িয়ে মারতে চাই। মন্ত্রী পুরোহিতেরা একযোগে সর্পযজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। যাজ্ঞিকেরা আভিচারিক বৃত্তির প্রতীক কালো কাপড় পরে ধূমাকুলিতনেত্রে আগুনে আহুতি দিতে থাকলেন আর সাপেরা যে যেখানে ছিল, সব এসে পড়তে লাগল যজ্ঞের আগুনে।

আসল কথা হল— জনমেজয় তক্ষকের ওপর রাগে সমস্ত নাগ-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সর্পযজ্ঞ একটা রূপকমাত্র। আমি পরে মহাভারত থেকে দেখাব— বিশাল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকেও বেশ কয়েকবার যজ্ঞের রূপকে বেঁধে দিয়েছেন কবি। জনমেজয়ের সর্পসত্রে সেই রূপকটুকু পরিষ্কার করা নেই, যাতে বোঝা যায় জনমেজয় সমগ্র নাগ-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই তাঁর জেহাদ ঘোষণা করলেন! পণ্ডিতের ভাষায় —janamejaya .....chalked out a plan for a wholesale massacre of their race.

লক্ষণীয় বিষয় হল-- নাগ-গোষ্ঠীর মধ্যে সকলেই একরকমের লোক নন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁদের সঙ্গে আর্য-ব্রাহ্মণ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মহর্ষি কাশ্যপের দুই স্ত্রী কদ্রু এবং বিনতার কাহিনী আমি এখানে বিস্তারিতভাবে বলছি না। কিন্তু কশ্যপের এই দুই স্ত্রীর মধ্যে দাসিবৃত্তির শপথ নিয়ে একটা বাজি ধরার ব্যাপার ছিল। সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবার ল্যাজটি কালো না সাদা, এই নিয়ে দুই সতীনে বাজি ধরলেন। কদ্রু বললেন— উচ্চৈঃশ্রবার ল্যাজটি কালো, বিনতা বললেন সাদা। বাজি জিতবার জন্য কদ্রু তাঁর সর্প-পুত্রদের আদেশ দিলেন উচ্চৈঃশ্রবার ল্যাজে গিয়ে আটকে থাকার জন্য। সর্পপুত্রদের বেশিরভাগই এই শঠতায় রাজি হলেন, কিন্তু অনেকে আবার রাজি হলেনও না, তাঁরা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে বেরিয়ে এলেন।

amarboi.com

মা কদ্রু এই সাপদের অভিশাপ দিলেন বটে, কিন্তু সেই অভিশাপ শুনেও নাগ-জাতির মধ্যে সব থেকে প্রভাবশালী শেষনাগ চলে গেলেন তপস্যা করতে। কঠিন নিয়ম আর ব্রত আচরণে তাঁর শরীরের চামড়া শিরা-শুকিয়ে গেল এবং স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁকে একজন খাঁটি মুনির মতোই সম্মান দিলেন—তপ্যমানং তপো ঘোরং...জটাচীরধরং মুনিম্। শেষনাগ ধার্মিক -মুনির সম্মানে ভূষিত হয়ে ব্রহ্মার বর লাভ করলেন। এটাই বড় কথা নয়, ব্রহ্মার ইচ্ছায় তিনি সমস্ত পৃথিবীকে আপন ফণাগ্রে ধারণ করে রইলেন। অর্থাৎ নাগ হওয়া সত্ত্বেও আর্যগোষ্ঠীর নিয়ম আচার পালন করে তিনি আর্য-অনার্য সকলের মধ্যেই পূজ্য-পদবি লাভ করলেন। পৃথিবীর স্থিতিশীলতার জন্য সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

শেষ বা অনন্ত নাগের মতোই আরেক পুণ্যবান ধার্মিক হলেন নাগরাজ বাসুকি। সমুদ্র মন্থনের সময় দেবাসুর দুই পক্ষের মর্যাদা লাভ করে তিনি মন্থন-রজ্জুর ভূমিকা গ্রহণ করে অমৃত-লাভে সহায়তা করেছিলেন। প্রধানত তাঁরই করুণায় এবং পরামর্শে সমস্ত নাগগোষ্ঠী জনমেজয়ের ক্রোধ থেকে মুক্তি পায়। বাসুকির বোন হলেন জরৎকারু। তপস্বী মুনি জরৎকারুর সঙ্গে নাগিনী জরৎকারুর মিলনে মহামুনি আস্তীকের জন্ম হয় এবং এই আস্তীকের হস্তক্ষেপেই জনমেজয়ের সর্পসত্র বা wholesale massacre বন্ধ হয়ে যায়।

আগে যেমন ব্রাহ্মণী পুলোমা এবং রাক্ষস পুলোমার কথা বলেছি, তেমনই ব্রাহ্মণ ঋষি জরৎকারুর সঙ্গে নাগ-বংশীয় জরৎকারুর মিলন হল। এঁদের নাম-সাম্যেই বোঝা যায় যে, একদিকে আর্য এবং নাগ গোষ্ঠীর শ্রেণীগত মিলন এবং সংমিশ্রণ যেমন ঘটেছিল, তেমনই এঁদের পারস্পরিক কৃষ্টির সংমিশ্রণও ঘটেছিল। বাসুকি নাগ যে ব্রাহ্মণ জরৎকারুর সঙ্গে তাঁর ভগিনী জরৎকারুর বিয়ে দিলেন তার পেছনে তাঁর গোষ্ঠীস্বার্থের ব্যাপার ছিল পুরোপুরি। মহাভারতে এই স্বার্থের কথাটা বলা আছে ভবিষ্যদবাণীর মতো করে। বাসুকি-ভগিনী জরৎকারু যখন গর্ভবতী হয়ে বাসুকির কাছে ফিরে এলেন, তখন বাসুকি বলেছিলেন, তোমার গর্ভে যে পুত্র হবে, সেই নাগকুলের মঙ্গল বয়ে আনবে, জনমেজয়ের সর্পসত্র থেকে সেই আমাদের আমাদের বাঁচাবে —

পন্নগানাং হিতার্থায় পুত্রস্তে স্যাৎ ততো যদি।
স সর্পসত্রাৎ কিল নো মোক্ষয়িষ্যতি বীর্যবান্।।

বাসুকি-ভগিনী দাদাকে স্বামীর আশ্বাস শুনিয়ে বলেছেন —নাগদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি নিয়ে তুমি চিন্তা কোর না। সে আমার গর্ভে এসে গেছে।

বলা বাহুল্য—এটা ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়। নাগদের মঙ্গল ঘটেছিল নাগিনীর মুনিপুত্র আস্তীকের মাধ্যমে। নাগিনীর গর্ভজাত হলেও ব্রাহ্মণের জাতি পেতে তাঁর অসুবিধা হয়নি, কারণ মহর্ষি জরৎকারু তাঁকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিলেন। আস্তীকও নাগভবনে থেকেই তাঁর ব্রাহ্মণ্যের তপশ্চর্যা চালিয়ে গেছেন— গৃহে পন্নগরাজস্য প্রযত্নাৎ পরিরক্ষিতঃ। জনমেজয় যখন তক্ষকের কারণে সর্পকুলের ওপর তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রতিজ্ঞা নিলেন, তখন মাতুল বাসুকির পরামর্শে এগিয়ে এলেন সেই আস্তীক, যাঁর পিতার ঔরস সংস্কার ব্রাহ্মণ্য আর মাতার শোণিত -সংস্কার নাগজাতীয়। ব্রাহ্মণ্য এবং আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এই নাগিনীপুত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলেই দেশের রাজার ওপরে তিনি সেই ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন, যাতে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অন্যদিকে তক্ষককে দেখুন। জনমেজয় তাঁকে তক্ষশিলায় পাননি। পাবেন কী করে? পরীক্ষিতকে হত্যা করার পর জনমেজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাঁকে পালাতেই হয়নি শুধু, তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এমন এক দেবতার কাছে যিনি আর্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রধান প্রতিভূ। তিনি ইন্দ্র । দেবরাজ ইন্দ্র অন্তরীক্ষে অথবা স্বর্গে, যেখানেই তিনি থাকুন, তক্ষককে আশ্রয় দিতে তাঁর বাধেনি। এতটাই তাঁকে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে বরদানের মতো এই শব্দগুলি বেরিয়েছিল —তুমি আমার ঘরে চুপটি করে বসে থাক তো দেখি। আমি দেখব—কোন সর্পসত্রের আগুন তোমায় কী করে— বসেহ ত্বং মৎসকাশে সুগুপ্তো/ ন পাবকস্ত্বাং প্রদহিষ্যতীতি।

মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা আর্য সংস্কৃতির দ্বিতীয় স্তর। কেন না প্রথম স্তরে আছেন দেবতারা। আর ইনিও যে সে দেবতা নন। ঋকবেদে সর্বাপেক্ষা অধিক স্তব-স্তুতি যাঁর উদ্দেশ্যে, নিবেদিত, সেই ইন্দ্র হলেন তক্ষকের বন্ধু- প্রতিম। তার মানে তক্ষক ছোড়্ টা ছেড়ে বড়-ডারে ধরেছেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপাস্য বর্গের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে। তিনি ইন্দ্রের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু মজা হল, উপাস্য যিনি, তাঁর সমস্ত শক্তিমত্তা এবং জনপ্রিয়তাই উপাসক-নির্ভর। তক্ষক যখন কিছুতেই আসছেন না, তখন মুনিরা মন্ত্রের জোরে ইন্দ্রের সিংহাসন ধরেই টান দিলেন। যাতে কান টানলে মাথা আসে, ইন্দ্রের সঙ্গে তক্ষকও আসেন।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মনস্তত্ত্ব এই—যাঁকে এতকাল ধরে এত মন্ত্র পড়ে, এত ঘি পুড়িয়ে তুষ্ট করলাম, তিনি কিনা আমাদের রাজহন্তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আশ্রয় দিতে চাও দাও, কিন্তু মনে রেখ— তুমি আমাদের উপাস্য হলেও আমাদের স্বার্থ-বিরোধী জনকে আশ্রয় দিয়েছ বলে, তোমাকেও আমরা ছাড়ব না, তোমাকেও একসঙ্গে আগুনে পোড়াব— তমিন্দ্রেণৈব সহিতং পাতয়ধ্বং বিভাবসৌ।

ইষ্ট অনুগত ভক্তের আস্থা হারালে দেবতা যে আর উপাস্য থাকবেন না, তা দেবতারাও জানেন। মহাভারত বলেছে— ঋষিদের যজ্ঞের ক্ষমতা দেখে ইন্দ্রও ভয় পেয়ে তক্ষককেও ছেড়ে পালালেন— হিত্বা তু তক্ষকং ত্রস্তঃ স্বমেব ভবনং যযৌ। এ হল এখনকার দিনের রাজমন্ত্রীর ব্যবহার। কুখ্যাত মাস্তানকে রাজনৈতিক বুদ্ধিতে আশ্রয় দিয়েছেন হয়তো, কিন্তু যখন দেখা গেল জনগণ বেঁকে বসল, পার্টি ভাল চোখে দেখছে না, তখনই আর নেতা তাকে চিনতে পারেন না— জনগণ চায় না, অতএব আমি তোমায় চিনি কী করে? ইন্দ্র তক্ষককে ত্যাগ করে নিজের ঘরে ঢুকলেন। তক্ষক মারা পড়েন আর কী।

ঠিক এই অবস্থায় এসেছে আস্তীক-মুনির মধ্যস্থতা। পিতৃকুলের লোকের সঙ্গে মাতৃকুলের গোলমাল। তিনি জনমেজয়ের সভায় দাঁড়িয়ে দিব্য ভাষায় জনমেজয়ের যজ্ঞ-প্রশংসা করে জনমেজয়ের মন ভিজিয়ে দিলেন এবং নিজের ব্যক্তিত্বে সামরিক-শক্তিহীন নাগকুলের সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তক্ষক তো বাঁচলেনই জনমেজয়ের রাজরোষ থেকে বাঁচল সমস্ত সর্পকুল। নিশ্চিন্ত হলেন বাসুকি, যিনি পূর্বাহ্ণেই আর্য-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত তথা নিজগোষ্ঠীর হঠকারিতায় সাময়িকভাবে বিব্রত, চিন্তিত।

মহাভারত জানিয়েছে—যে সমস্ত সাপের বিষ খুব বেশি ছিল, তারাই মারা পড়েছিল জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে। দগ্ধাস্তত্র মহাসর্পা... দীপ্তানল-বিষোল্বণাঃ। আসল কথা—নাগ-গোষ্ঠীর যে সমস্ত ব্যক্তি তৎকালীন আর্য-ক্ষত্রিয় শক্তির বিরোধিতায় নেমেছিলেন, জনমেজয় তাঁদেরই মূলোৎপাটন করে ছেড়েছিলেন। বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আগে থেকেই আর্যগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, বাদবাকি অন্যেরা আস্তীক-মুনির মধ্যস্থতায় আর্য-সংস্কৃতিতে আত্মীকৃত হলেন। এর ফলে প্রাচীনতর তথা সমসাময়িক নাগ-জনজাতির সঙ্গে জনমেজয়ের আর কোনও শত্রুতা রইল না। আস্তীকের ব্যক্তিত্ব এবং তর্কযুক্তি জনমেজয়ই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। জনমেজয়ের সভাস্থ অন্য ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতেরা সকলেই একসময় বুঝেছেন যে, সর্পবংশবিনাশী ওই প্রধ্বংসী যজ্ঞ আর চলা উচিত নয়। তাঁরা সকলে মিলে পরামর্শ দিয়েছেন —যজ্ঞ বন্ধ হোক, আস্তীক বর লাভ করুন—

তেতো বেদবিদস্তাত সদস্যাঃ সর্ব এব তু।
রাজানমূচুঃ সহিতা লভতাং ব্রাহ্মণো বরম্।।

রাজা জনমেজয় মেনে নিলেন মন্ত্রী পুরোহিতের কথা। বললেন, আপনারা যেমন চাইছেন, আস্তীক যেমন চাইছেন, তেমনটিই হোক। যজ্ঞ বন্ধ হোক, সর্পকুলের ওপর সমস্ত উপদ্রব বন্ধ হোক—সমাপ্যতামিদং কর্ম পন্নগাঃ সন্তু অনাময়াঃ। সভাস্থলে আনন্দের কোলাহল উঠল। ব্রাহ্মণ সজ্জন যাঁরা যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন, অতিথি, শিল্পী, কর্মকার যাঁরা উপস্থিত—তাঁরা সবাই জনমেজয়ের দান-মান পেয়ে জনমেজয়কে আশীর্বাদ শুভেচ্ছা জানালেন। এই দান মানের প্রাপকদের মধ্যে আমার কাছে একজন বড় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সূত-জাতীয় পুরাণবক্তা।

তিনি গল্প বলেন। মহাভারতের কবি এই সূত জাতীয় ব্যক্তিটির নাম স্বকণ্ঠে বলেননি। তবে আমাদের অনুমান—তিনিই লোমহর্ষণ, আমাদের বর্তমান কথক ঠাকুর সৌতি উগ্রশ্রবার পিতা। মিলনের আনন্দে দান-মানের প্রগ্রহ যখন মুক্ত হয়েছিল, তখন এই সূত জাতীয় কথক-ঠাকুরটিও জনমেজয়ের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হননি— তেভ্যশ্চ প্রদদৌ বিত্তং শতশো'থ সহস্রশঃ। লোহিতাক্ষায় সূতায়......। নাম না বললেও পণ্ডিতেরা অর্থ করেছেন— সূতায় লোমহর্ষণায়। সৌতি উগ্রশ্রবা যাঁর কাছে মহাভারতের পাঠ নিয়েছেন, সেই লোমহর্ষণ কিন্তু একটু পরেই জনমেজয়ের এই সভাতেই সুযোগ পাবেন মহাভারত শোনার।

নয়

জনমেজয়ের রাজসভায় আস্তীক মুনির মধ্যস্থতায় যেভাবে নাগদের সঙ্গে শাসক ক্ষত্রিয়ের মিলন ঘটল, তাতে আমরা এখনই মহাভারতের মূল কাহিনীতে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু সেই পথে আমাদের বাধা হলেন স্বয়ং আমাদের কথক ঠাকুর সৌতি উগ্রশ্রবা। আমি আগে বলেছি—মহাভারতের তৃতীয় সম্পাদক হিসেবে উগ্রশ্রবাসৌতি আগে তাঁর নিজস্ব কালের হাওয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমি বলেছি—নাগদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে —কীভাবে তারা শত্রু থেকে বন্ধু, এমনকি উপাস্যতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন —সেটা দেখানো সৌতি উগ্রশ্রবার ভাবনার মধ্যে ছিল। এখন বলছি শুধু নাগ নয়, মানুষের মর্ত্যভূমিতে যাঁদের আমরা দেবতা বলি, রাক্ষস বলি অসুর বলি— তাঁদের প্রাথমিক পরিচয় উন্মোচন করাটাও সৌতির 'মেথডোলজি'র মধ্যে পড়ে।

মনে রাখতে হবে —এর পরে মহাভারতে আমরা প্রধান প্রধান অনেক দেবতাকেই দেখতে পাব যাঁরা মনুষ্য রমণীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হবেন। দেখতে পাব— শুধু প্রেম কেন মনুষ্য রমণীর গর্ভে দু-একটি পুত্র কন্যা লাভ করতেও তাঁরা বেশ আগ্রহী। দেবতারা অলৌকিক শক্তি বশে মনুষ্য সমাজের ওপর এই অলৌকিক অধিকার বিস্তার করেছেন— ধর্মের যুক্তিতে একথা আদরণীয় মনে হলেও আমি যে সে পথে এতক্ষণ হাঁটিনি, তা বোধ করি বিলক্ষণ বুঝেছেন। আর আমাদের সৌতি উগ্রশ্রবার আধুনিক মননশীলতাও তো কিছু ভোলবার নয়। তিনি মূলত গল্প বলা কথক ঠাকুর হলেও তিনি মহাভারতের ইতিহাস শোনাতে বসেছেন, কাজেই গল্প বলা অথবা কথকতার অন্তরে তিনি তৎকালীন দিনের সামাজিক ইতিহাসটুকুও যে ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

কদ্রু বিনতা এবং অন্যান্য নাগদের পরিচয় দিতে দিতেই তিনি অমৃত মন্থনের প্রসঙ্গে চলে

গেলেন। এর পিছনে অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য আছে। হঠাৎ করে এক গল্পের খেই হারিয়ে তিনি অন্যগল্পে যাননি। নাগদের প্রসঙ্গে দেবতা আর অসুরদের পারস্পরিক স্থিতি মহাভারতের আরম্ভেই তাঁর জানানোর প্রয়োজন আছে এবং তা জানানোর সবচেয়ে সহজ এবং বড় উপায় হল সমুদ্র-মন্থনের উপাখ্যান। সৌতি উগ্রশ্রবা স্বকণ্ঠে এই উপাখ্যানের তাৎপর্য বলবেন না, কারণ তিনি মোহময়ী কথকতায় আবিষ্ট। বিশেষত এই তাৎপর্য জানাতে হলে তাঁকে পুরাণ কথাও বলতে হত বিস্তর, তাতে আধুনিক প্রক্ষেপবাদীদের আরও পোয়া বারো হত। কিন্তু সৌতি বলেননি বলেই আমাদের দায় আসে তাঁর কথা ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বলার।

দেখুন সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী এতটাই পুরনো এবং এতটাই তা গভীর যে ভারতের পুরাণগুলির অধিকাংশের মধ্যেই এই কাহিনীর আলাপ এবং বিস্তার শোনা যাবে। আর পুরাণ গুলি যেহেতু আমাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক ইতিহাস অতএব সৌতি উগ্রশ্রবার মহাভারতকে বুঝতে হলে পুরাণ কথা দিয়েই মহাভারতকে বুঝতে হবে, কারণ সেই প্রথমে আমরা উগ্রশ্রবার পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর বিশেষণ দিয়েছি— 'লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতিঃ পৌরাণিকঃ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই 'পৌরাণিক' যখন ভারত আখ্যান শোনাচ্ছেন তখন তো আর তিনি পুরাণের কথা বলবেন না, আখ্যানের অন্তরে তিনি শুধু ইঙ্গিত করবেন। সে ইঙ্গিত আমাদের বুঝতে হবে সমান হৃদয় দিয়ে পৌরাণিকের সমব্যথা নিয়ে।

জানি, এখনই বলবেন— এই তো আবার আরম্ভ করলো ভ্যাজর -ভ্যাজর। যে রকম প্রস্তুতি হয়েছিল তাতে এখনই বেশ পাণ্ডব-কৌরব আর চন্দ্রবংশের পরম্পরা শোনা যেত। তা না, যত সব উটকো প্রক্ষিপ্ত কাহিনী নিয়ে তোমার মাথা-ব্যথা। আমি বলব— মাথা ব্যথা শুধু আমার নয়, আপনাদেরও মাথাতেও সেই ব্যথা আমি খানিকটা ধরিয়ে দিতে চাই। কেন না ব্যথা না থাকলে—আইনস্টাইন-স্টিফেন হকিংও জলভাত, ব্যাস-বাল্মীকিও জলভাত। সেই জলভাতী বিদ্যায় ওপর-চালাকি করার সুবিধে হতে পারে, কাজের কাজ কিছু হয় না। তবু আপনাদের আকাঙ্ক্ষা মতো আমি আগেই ঘটনার তাৎপর্যে প্রবেশ করব না, বরং ঘটনাটার সঙ্গে সঙ্গে মাথা -ব্যথার টিপ্পনিগুলি দিয়ে যাব।

সমুদ্র-মন্থনের উপাখ্যানে মহাভারতে কোনও ভণিতা নেই। সৌতি উগ্রশ্রবা বললেন, সুমেরু নামে একটি মহাপর্বত আছে। সে পর্বতের আকার যেমন সুন্দর, তেমনই তার চাকচিক্য। সোনার মতো সে পাহাড়ের রং আর সেখানে বিচরণ করেন শুধু দেবতারা আর গন্ধর্বরা—কনকাভরণং চিত্রং দেবগন্ধর্বসেবিতম্। এত উঁচু সেই পাহাড় যেন স্বর্গকেও আবরণ করে দেয়— নাকমাবৃত্য তিষ্ঠতি। সেই সুমেরু পর্বতের সবচেয়ে উঁচু শিখরে উঠে স্বর্গবাসী দেবতারা অমৃত আহরণ করার জন্য আলোচনা আরম্ভ করলেন। দেবতাদের অমৃত মন্ত্রণা আরম্ভ হতেই ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন, দেবতারা অসুরদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র মন্থন করুক, তাতেই অমৃত পাওয়া যাবে— দেবৈ রসুরসঙ্ঘৈশ্চ মথ্যতাং কলশোদধিঃ। উদধি মানে সমুদ্র আর কলশ মানে কলসী।

ছোটবেলায় যদি রূপক কর্মধারয় সমাস পড়ে থাকেন, তাহলে কলশ রূপ সমুদ্র বুঝতে কোনও অসুবিধেই নেই। সমুদ্র যার বৃহৎ রূপ, কলশ তারই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। সেই সমুদ্র-কলশ মন্থন করে অমৃত তুলতে হবে। কিন্তু কেন , কী কারণ ঘটল অমৃত মন্থন করার ? মহাভারত তা বলেনি, কারণ অন্যান্য পুরাণে তা বলা আছে। সমুদ্র মন্থনের কারণ নিয়ে পুরাণে পুরাণে মতভেদ আছে। কিন্তু ভেদ যাই থাকুক, কারণ একটা ছিলই। একটি পুরাণে অমৃত লাভ করা বা

অমৃত পান করার পূর্বাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে দেবতাদের অবস্থা খুবই খারাপ। অসুর-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরা মোটেই পেরে উঠছেন না। মাঝে মাঝে তাঁদের অস্ত্রাঘাত এমন কঠিন হয়ে বাধছে দেবতাদের বুকে যে, তাঁদের অনেকেই মারা যেতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি রইল না —

তদা যুদ্ধে সুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতায়ুধৈঃ।
গতাসবো নিপতিতা নোত্তিষ্ঠেরন্ স্ম ভূরিশঃ।।

ধরে নিই, এই অবস্থায় তাঁরা সুমেরু পর্বতের সু-উচ্চ শিখরে উঠে সমুদ্র মন্থন করার কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন।

অন্যতর আরও একটি বিখ্যাত পুরাণে সমুদ্র-মন্থনের কারণ একেবারেই ভিন্নতর। সেখানে দেখা যাচ্ছে— খ্যাপা মুনি দুর্বাসা পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন —চচার পৃথিবীমিমাম্। ভ্রাম্যমাণ মুনির সঙ্গে এক বিদ্যাধর বধূর দেখা হয়ে গেল এক মুক্ত বনস্থলীর মধ্যে, একান্ত আকস্মিকভাবে। কোনও পুরাণ মতে ইনি হলেন অপ্সরা সুন্দরী মেনকা। যাই হোক মেনকাই হোন, আর বিদ্যাধরীই হোন তাঁর হাতে জড়ানো ছিল গন্ধে উন্মাদ করে দেওয়া একটি মালা। মালাটি স্বর্গের সন্তানক পুষ্প দিয়ে তৈরি। এমন তার গন্ধ যে সমস্ত বন সেই গন্ধে ম'ম করছিল; সেই বনের পথ বেয়ে যারা আসছিল তারা সবাই আকৃষ্ট হচ্ছিল এই উন্মাদিনী মালার গন্ধে। ওই বনের পথে সেই বিদ্যাধরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল খ্যাপা দুর্বাসার।

পুরাণকার এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে উন্মত্ত শব্দটি ব্যবহার করেছেন অন্তত পাঁচ পাঁচ বার। প্রথমত দুর্বাসার চেহারা ছিল 'উন্মত্ত' পাগলের মতো —উন্মত্তরূপধৃক্। তিনি যে ব্রত পালন করেছিলেন তা এতই দুষ্কর যে, তার কষ্টে মানুষ পাগল হয়ে যায়— উন্মত্তব্রতধৃগ বিপ্রঃ। সেই দুর্বাসা বনভূমির মধ্যে বিদ্যাধরীর হাতে জড়ানো সন্তানক-পুষ্পের উন্মদ গন্ধ পেয়ে তাঁর কাছে মালাখানি চেয়েই বসলেন। খ্যাপা মুনিকে দেখে বিদ্যাধর বধূ দ্বিতীয় কোনও চিন্তা না করে সাদরে সপ্রণিপাতে সন্তানক-মালা দিলেন মুনির হাতে। মুনি অধিকতর মর্যাদায় সেই মালা জড়িয়ে নিলেন নিজের মাথায়। ফুলের গন্ধে মাতাল মৌমাছিরা উড়ে এসে বসতে থাকল দুর্বাসার মাথায় জড়ানো মালায়। শুষ্ক ব্রতক্লিষ্ট চেহারার মধ্যে রুক্ষ জটাজুটে কোমল মধুর মালা জড়িয়ে উন্মত্তের মতো মুনি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—তামাদায়াত্মনো মূর্ধ্নি ... পরিবভ্রাম মেদিনীম্।

ঠিক এই রকমভাবে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে। মদমত্ত ঐরাবতে চড়ে তিনি হেলে-দুলে আসছেন। না, দুর্বাসা তাতে কোনও রাগ করেননি। মদোন্মত্ত হাতি, দুলে দুলেই তো আসবে। কিন্তু বহু পরিভ্রমণের পর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখে এতই আনন্দিত হলেন যে, তিনি তাঁর মস্তকলগ্নী 'উন্মত্ত-ষট্পদা' মালাখানি উন্মত্তের মতো ছুড়ে দিলেন দেবরাজের দিকে। দেবরাজ মালাটি ধরে নিলেন বটে, কিন্তু আধুনিক সভায় সভাপতির মতো তিনি মালাখানি নিজে না পরে তা দুলিয়ে দিলেন গজরাজ ঐরাবতের মাথায়। দেখে মনে হল যেন কৈলাস-শিখর থেকে গঙ্গা নামছেন ভুঁয়ে।

যে মালা দুর্বাসার মাথায় ছিল সেই মালা সম্মান করে নিজের মস্তকে স্থাপন না করে ইন্দ্র যে হাতির মাথায় দুলিয়ে দিলেন, তাতেও দুর্বাসা ক্রোধ করেননি। কিন্তু সন্তানক-পুষ্পের উন্মাদ গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঐরাবত হাতি তার শুঁড় দিয়ে টেনে নিল মালাটি। তারপর হাতির যেমন বুদ্ধি হয়। মালাটি শুঁড় দিয়ে খুব খানিকটা আঘ্রাণ করে সেটা পায়ের তলায় পিষে ফেলল গজরাজ

amarboi.com

ঐরাবত। ব্যস্। আর যায় কোথা। ব্রতক্লিষ্ট মুনি হয়েও যে দুর্বাসা বিদ্যাধরসুন্দরীর কাছ থেকে আগ্রহভরে চেয়ে নিয়েছেন, যে মালা একমাত্র দেবরাজের ইন্দ্রের হঠকারিতায় ভূমিতে নিষ্পিষ্ট হল—এই অমর্যাদা এবং অপরাধ দুর্বাসা সইতে পারলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজকে অভিশাপ দিলেন—ওরে বদমাশ তুই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পেয়ে এতই গর্বিত এবং মত্ত হয়ে গিয়েছিস যে, আমার দেওয়া চিরলক্ষ্মীর প্রতীক সেই মালাটা তোর পছন্দ হল না। কোথায় মালাটা হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকাবি, কোথায় আমার পায়ে পেন্নাম করে বলবি—আমি আপনার প্রসাদ লাভ করে ধন্য হলাম, মুনিবর! তা না, মালাটা ফেলে দিলি মাটিতে—প্রসাদ ইতি নোক্তুন্তে.... ন চাপি শিরসা ধৃতা।

দুর্বাসা যথেষ্টই রেগে গেছেন। ক্রোধ এবং পরুষ ব্যবহার করার ব্যাপারে তিনি যে অন্য সহৃদয় মুনি-ঋষিদের সঙ্গে তুলনীয় নন, এ বিষয়ে তিনি নিজেও অত্যন্ত সচেতন। দেবরাজের অবমাননায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন, তুই যখন লক্ষ্মীমতী মালাটাকে মাটিতে ফেলে দিলি তখন আজ থেকে তোর স্বর্গরাজ্য লক্ষ্মীহীন হয়ে যাবে—তস্মাৎ প্রণষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি। অভিশাপ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র হুড়মুড়িয়ে নামলেন ঐরাবতের গজ আসন থেকে। মুনিকে প্রণাম করে তখন দেবরাজ ইন্দ্র অনুনয় বিনয় আরম্ভ করলেন, যাতে অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন তাড়াতাড়ি। কিছুতেই কিছু হল না। দুর্বাসা বললেন, আমার দয়া-টয়া অত নেই বাছা— নাহং কৃপালু হৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা। ওই সব দয়া-করুণা যাঁদের আছে, সেই গৌতম বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিদের চিৎকৃত স্তবেই তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমি হলাম গিয়ে দুর্বাসা। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, আমার এই জটজূটধারী ভ্রূকুটি-কুটিল মুখখানি দেখে ভয় না পায়। আর তাছাড়া তুমি যে এই বারবার তখন থেকে অনুরোধ-উপরোধ করে যাচ্ছ, তার কোনও ফল হবে না। আমি ক্ষমা করব না— নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো।

দুর্বাসা দুর্বার গতিতে চলে গেলেন। আহত মনে নানা আশঙ্কা নিয়ে দেবরাজও চলে গেলেন অমরাবতীতে। গিয়ে দেখলেন—সমস্ত স্বর্গভূমি তার নিসর্গ সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। গাছে পাতা নেই, ওষধি ফুল অপধ্বস্ত, শীর্ণ লতা-বল্লরী শীর্ণতরা —ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবন-ত্রয়ম্। স্বর্গভূমির দেবতারা সব বিমনা হয়ে রইলেন, ঋষিদের মনে যজ্ঞে মন নেই, তপস্বীরা তপস্যা করেন না, মানুষেরা দান-ধ্যানে ভুলে গেল।

তৎকালীন দিনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যজ্ঞ-দান-তপস্যার বহুতর বিঘ্ন ঘটেছে মানেই অবস্থা যথেষ্ট সংকটময়। কিন্তু আমার প্রস্তাব এবং প্রকরণের জন্য যে সমস্যাটা দরকার, সেই সমস্যাটার কথা এইবার আসবে। পুরাণকার বললেন— স্বর্গের এই বিধ্বস্ত অবস্থায় সমস্ত লোক লোভে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠল যে, সবাই ছোট-খাট জিনিস নিয়েও ঝগড়া করতে লাগল—লোভাদ্যুপহতোন্দ্রিয়াঃ। স্বল্পে' পি হি বভূবুস্তে স্বাভিলাষা দ্বিজোত্তম। সমস্ত জগৎ নিঃশ্রীক। এবং সত্ত্ব গুণ বিরহিত হওয়ার ফলে দৈত্য-দানবেরা এবার দেবতাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করা আরম্ভ করলেন। দেবতাদের শক্তি হল সত্ত্বগুণ আর সত্ত্বহীনতাই দৈত্য দানবের শক্তি। ফলে এই সময়ে অসুর-দানবদের তেজোবৃদ্ধি ঘটায় তাঁরা এবার দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং বলহীন দেবতাদের হারিয়ে দিলেন— দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দৈতেয়-দানবাঃ। বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈঃ...।।

অসহায় বিপন্ন দেবতারা চিন্তিত মনে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের

সবাইকে নিয়ে উপস্থিত হলেন তিন ভুবনের পালক ভগবান বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু দেবতাদের করুণ অবস্থা অনুভব করে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্য করব, তোমরা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত লাভ করার ব্যবস্থা করো—মথ্যতাম অমৃতং দেবাঃ সহায়ে ময্যবস্থিতে।

আমরা এতক্ষণে সেই প্রতিপাদ্য বিন্দুতে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে পুরাণগুলি এবং মহাভারত একই কথা বলছে— দেবগণ তোমার অমৃত মন্থন করো। কিন্তু পুরাণগুলি ঘেঁটে মর্মকথা যেটা বেরিয়ে এল, সেটা হল—সমুদ্র মন্থনের কারণ, অর্থাৎ দেবভূমি স্বর্গরাজ্য নিঃশ্রীক, সৌন্দর্যহীন, বৃক্ষলতাহীন হয়ে গিয়েছিল, দেবতাদের কিছুই করণীয় ছিল না এবং অসুর দানবেরা স্বর্গরাজ্য দখল করে নিয়েছিল। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় মহাভারতের বর্ণনায় আমরা দেবতাদের সুমেরু পর্বতে আরোহণ করতে দেখেছি বস্তুত আমরাও একই সঙ্গে সেই সুমেরুর উচ্চ চূড়ে আরোহণ করে দেখতে পারতাম যে, জায়গাটা কেমন? কিন্তু সেই ভৌগোলিক বিবরণের আগে প্রয়োজনের প্রশ্নটা আছে—এই দেবতারা কারা? অসুর-দানবেরা কারা? অথবা আগে মানুষই বা কারা? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেবতাদের সমুদ্র-মন্থনের আগে আরও একবার আমাদের মহাভারত এবং পুরাণ সমুদ্র মন্থন করতে হবে। আরও একটা কথা হল সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান এমনই এক বিষয় যা শুধু উপাখ্যান বা আখ্যায়িকামাত্র নয়, সমুদ্র-মন্থনে যেহেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সহ সমস্ত অসুর-দানব নাগ এবং স্বর্গরাজ্যের দেবতা সকলেই 'ইনভলভড্' সেই হেতু দেবতা, অসুর এবং অন্যান্যদের পরিচয় দেওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমরা চাই, এই আবশ্যিক কাজটা মহাভারতের সমুদ্র-মন্থনের সূত্র ধরেই আসুক। তাতে দেবতা এবং অসুরেরা অপিচ পরমেশ্বর বিষ্ণুও ঠিক কী 'পোজিশনে' দাঁড়িয়ে আছেন—সেটা বোঝা যাবে। তার পরে আরম্ভ হবে পরিচয় করিয়ে দেবার কাজ—দেবতা, অসুর, মানুষ—সবার।

মহাভারতে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলেছেন—দেবতা এবং অসুরেরা সবাই মিলে সমুদ্র মন্থন করুক, তাতেই অমৃত পাওয়া যাবে —দেবৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ মথ্যতাং কলশোদধিঃ। ভগবান বিষ্ণুর আদেশটা যথেষ্টই পরিষ্কার। কিন্তু এই আদেশের মধ্যে যে গুপ্ত কথাটা আছে, সেটা বলতে মহাভারতের কবির রুচিতে বেধেছে। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিক পুরাণকারেরা সেই গুপ্ত কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। আমরা এর আগে বলেছি— যে স্বর্গভূমি তার সৌন্দর্য হারিয়েছিল এবং দৈত্য দানবেরা দেবতাদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বর্গভূমি থেকে। তাঁদের যে লাভ খুব একটা হয়েছিল তা নয়, কারণ ধন-সম্পদহীন একটি গজভুক্ত কপিত্থবৎ ভূখণ্ড লাভ করে তাঁদের আর শ্রী বাড়বে কতটুকু। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের চিরন্তন বিরোধিতার একটা মনস্তত্ত্ব এর মধ্যে আছে। একটি ভাঙা বাড়ি অথবা অনুর্বর ভূমি নিয়েও যদি জ্ঞাতিশত্রুতা বাধে, তবে জয়ী হলে সেই ভাঙা বাড়ি অথবা নিষ্ফলা ভূমির অধিকার বোধই কিন্তু পরম তৃপ্তি দেয়। হয়তো অসুরদেরও সেই তৃপ্তি হয়েছিল।

ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে—অমৃত মন্থনের প্রস্তাব করেই প্রভু নারায়ণ দেবতাদের পরামর্শ দিলেন—যাও তোমরা আপাতত শুক্রাচার্যের শিষ্য অসুরদের সঙ্গে সমস্ত ঝগড়া মিটমাট করে নাও। মিটমাট করে ততদিন সামলে থাক, যতদিন না অমৃত ওঠে-যাও—দানব-দৈতেয়ৈঃ তাবৎ সন্ধি বিধীয়তাম্। যারা মেরে-কেটে পালিয়ে গেল, তাদের সঙ্গে সন্ধি? দেবতাদের মনে লজ্জা দ্বিধা দুই-ই হল। প্রভু নারায়ণ দেবতাদের অন্তর বুঝে বললেন বাপু হে! দরকার পড়লে শত্রুর সঙ্গেও মিটমাট করে কাজ গুছিয়ে নিতে হয়—অরয়োঽপি সন্ধেয়াঃ

সতি কার্যার্থে গৌরবে। তারপর? তারপর সাপ আর ইঁদুরের গল্প। একই আধারে এক বস্তার মধ্যে সাপ আর ইঁদুর আটকা পড়েছে। এবার সেই আবদ্ধ স্থান থেকে পথ বার করবার জন্য সাপ প্রথমে ইঁদুরের সঙ্গে সন্ধি করে। তারপর যখন পথ তৈরি হয়ে যায়, তখন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। সময়ে মূষিক সাপের পেটে যায়— অহি মূষিকবদদেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ। অর্থাৎ অমৃত ওঠা পর্যন্ত ভাব করবে অসুরদের সঙ্গে। তারপর দেখা যাবে।

বিষ্ণু পুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণ এসব কথা না বললেও সমুদ্র মন্থনে অসুরদের প্রয়োজনটা বুঝিয়ে দিয়েছে। প্রভু নারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন—সমুদ্র মন্থন করতে যে অসম্ভব শক্তি লাগবে সেই অসম্ভব শক্তির জোগান দেওয়া একা দেবতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নারায়ণ তাই বলেছিলেন—তোমরা সাহায্যের জন্য অসুরদের কাছে যাও, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলবে মিষ্টি করে। বলবে— সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উঠলে আমরা-তোমরা দু'পক্ষই সমান ভাগ পাব। অমৃত পান করে তোমরাও যেমন বলশালী হবে, তেমনই আমরাও বল লাভ করব— তৎপানাৎ বলিনো যূয়মমরাশ্চ ভবিষ্যথ। নারায়ণ এবার পরিষ্কার করেই বলে দিলেন যে, দেব-দানবের দ্বৈত সাধনায় শেষ পর্যন্ত অমৃত যখন উঠবে, তখন তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন—তথা চাহং করিষ্যামি—যাতে দেবদ্বেষী অসুরেরা অমৃতের ভাগ একটুও না পায় এবং দেবতারাই পান সবটা। ভাগবত পুরাণ নারায়ণের জবানীতে বলেছে—শুধু কষ্ট করবে দৈত্যেরা, কিন্তু ফল পাবে তোমরা—ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ।

এইরকম মারাত্মক এক পরিকল্পনার পর স্বাভাবিকভাবেই দৈত্য-দানবদের সঙ্গে দেবতাদের সাময়িক সন্ধি হল। কিন্তু সন্ধির প্রস্তাবটা কোন দৈত্যরাজ মেনে নিলেন, সে প্রসঙ্গে মহাভারত যেমন নীরব, অধিকাংশ পুরাণও তেমনই নীরব। শুধু মৎস্য পুরাণ, ভাগবত পুরাণের মতো দু-একটি পুরাণ এব্যাপারে ঐতিহাসিকের কর্তব্য সেরে বলছে যে —দেবতারা পুরুষোত্তম বিষ্ণুর সঙ্গে পরামর্শ সেরেই চলে গেলেন দৈত্যরাজ বলির কাছে— উপেয়ুর্বলিং সুরাঃ। মৎস্য পুরাণে এতটাই বলা হয়েছে যে, দেবতারা যেন অন্তত কিছুকাল দৈত্যরাজ বলিকেই নিজেদের প্রভু বা স্বামী বলে মানেন—দানবেন্দ্রো বলিঃ স্বামী স্তোককালং নিবেশ্যতাম্। অসুর দৈত্যদের তখন এমনই দেব বিদ্বেষ ছিল যে, দেবতাদের দেখলেই তাঁরা যুদ্ধোদ্যোগ শুরু করে দিতেন । অতএব হঠাৎ করে অনেকগুলি দেবতাকে একসঙ্গে আসতে দেখেই তারা অস্ত্র হাতে সজ্জিত হলেন। দেবতাদের হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না, অতএব নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করাটা যে নিতান্ত অন্যায় হবে, সে সম্বন্ধে আর কেউ না হোক, অন্তত দৈত্যরাজ বলি অবহিত ছিলেন।

মহারাজ বলি খুব কম লোক নন। বলির জন্ম এমনই এক বিখ্যাত বংশে, যে বংশে পরপর কয়েকজন অসুর রাজা পরম বিখ্যাত হয়েছেন এবং তা এতটাই যে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অন্তত দু-তিনটি অবতার গ্রহণ করতে হয় অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে। তাছাড়া বলি মহারাজের ঠাকুরদাদা হলেন স্বয়ং প্রহ্লাদ।

আমাদের ধারণা— দৈত্যকুলে এই প্রহ্লাদের পর থেকেই অসুরদের মধ্যে অন্তত অসুর রাজাদের মধ্যে অন্য ধরনের কিছু মূল্যবোধ তৈরি হয়। ফলে অসুরেরা দেবতাদের দেখে অস্ত্র হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যরাজ বলি তাঁদের নিষেধ করেন— ন্যষেধদ্ দৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ। নিষেধ করেন, কেন না তিনি অশেষ কীর্তিমান (পুরাণের ভাষায় 'শ্লোক্যঃ') এবং কখন কার সঙ্গে সন্ধি করতে হবে অথবা কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, সেটা তিনি

www.amarboi.com

ভালমতই জানেন। অন্তত এখন এই অসহায় নিরস্ত্র দেবতাদের ওপর অস্ত্রক্ষেপণ যে তাঁর মতো বড় মানুষকে মানায় না —এটা তিনি বোঝেন।

মৎস্য পুরাণ যেমন বলছে, তাতে দেবতারাও দৈত্যরাজ বলির কাছে কাছে প্রার্থনা জানাবার সময় যথেষ্ট নত হয়েই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন —আমরা তোমার সঙ্গে কোনও বিরোধ চাই না, দৈত্যেরাজ। আমরা তোমার কথাতেই চলব আমরা তোমার ভৃত্য—অলং বিরোধেন বয়ং ভৃত্যাস্তব বলে'ধুনা। চল, আমরা এই মহাসমুদ্র মন্থন করে অমৃত লাভ করি। বস্তুত তোমার দয়াতেই এই অমৃত লাভ সম্ভব হবে— ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ। হাজার হলেও প্রহ্লাদের নাতি। বলি সঙ্গে সঙ্গে রাজিই শুধু হলেন না, দেবতাদের আপাত স্তুতি স্তাবকতায় তিনি এতই খুশি হলেন যে তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন— আমি একাই এই সমুদ্র মন্থন করে তোমাদের অমৃত এনে দিতে পারতাম—শক্তো'হমেক এবাত্র মথিতুং ক্ষীরবারিধিম্। আরে! দূর থেকে এসে যদি শত্রুও প্রণত হয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করে, তবে তার ব্যবস্থা না করলে পরলোকে যে আমার ঠাঁই হবে না কোনও। তা যাক্ গে, তোমরা যা বলছ, আমি তোমাদের প্রতি স্নেহবশত নিশ্চয়ই তা পালন করব —পালয়িষ্যামি তৎ সর্বান্ অধুনা স্নেহমাস্থিতঃ।

ভাগবত পুরাণের আরও একটা সংবাদ এই প্রসঙ্গে আমাদের দরকার।

ভাগবত বলেছে — দেবতাদের কথা বলি যেমন মেনে নিলেন, তেমনই মেনে নিলেন অন্য দৈত্য-দানবেরাও শম্বর, অরিষ্টনেমি ইত্যাদি দৈত্য নায়কেরাও —যাঁরা সকলেই ত্রিপুরাবাসী —শম্বরো' রিষ্টনেমিশ্চ যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ। এই 'ত্রিপুর' নামের এই জায়গাটাকে আমাদের খুব নিবিষ্ট হয়ে মনে রাখতে হবে। আর সেখানকার অধিবাসী দৈত্যরাজ বলির সাঙ্গোপাঙ্গ অসুর পার্ষদদেরও মনে রাখতে হবে, কারণ একটু পরেই আমরা এই 'ত্রিপুরে'র কথায় আসব।

ওদিকে সমুদ্র মন্থনের জোগাড় যন্ত্র আরম্ভ হয়ে গেল। সোজা কথা তো নয়। সমুদ্র মন্থনের মন্থন দণ্ড নির্বাচিত হল মন্দর পর্বত। সে পর্বতকে সমূলে উপড়ে নিয়ে আসা হল সমুদ্রের ওপর। নাগরাজ বাসুকি নাগদের পক্ষ থেকে দেব-দানব— দুই দলেরই উপকারে শামিল হলেন। তিনি হলেন মন্থন রজ্জু। স্বয়ং বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করে স্থির কঠিন পৃষ্ঠের অবলম্বন দিলেন সমুদ্রের তলায়, যাতে মন্দর পর্বতের মন্থন দণ্ডটি স্থান-ভ্রষ্ট না হয়। দেবতারা বিষ্ণুকে নিয়ে, আর দানবেরা বলি রাজাকে নিয়ে সদলবলে এসে পৌঁছলেন ক্ষীর সাগরের তীরে।

দশ

সেই যখন ভগবান বিষ্ণু সমুদ্র মন্থনের প্রস্তাব নিয়ে দেবতাদের বললেন, দৈত্যরাজ বলির কাছে যেতে, তখন তাঁদের তিনি বলেছিলেন, দৈত্য-দানবেরা যা চায় তাই মেনে নিও— যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ। সমুদ্র থেকে মহামূল্য বস্তু কিছু উঠলে, তা নিয়ে যেন 'এটা চাই সেটা চাই' বলে লোভ কোরো না। অথবা জিনিসটা না পেলে ক্রোধবশে কিছু করে বোসো না। দেবতারা বিষ্ণুর পরামর্শ শুনেছিলেন। দেব-দানব সকলেই যখন সমুদ্র মন্থনে উদ্‌যুক্ত হলেন, তখন স্বয়ং বিষ্ণু, দেবতাদের নিজ বুদ্ধি খাটাবার কোনও সুযোগ না দিয়ে— কারণ বুদ্ধি খাটালে হয়তো দেবতারা বোকামিই করতেন—অতএব সেই ভয়েই বিষ্ণু নিজে এসে প্রথমে নাগরাজ বাসুকির মুখের দিকটা ধরলেন। যদিও মহাভারত কিংবা মৎস্যপুরাণের মতে ইনি নাগরাজ বাসুকি নন, ইনি অনন্ত বা শেষ নাগ। ইনি অনন্তই হোন অথবা বাসুকি, বিষ্ণু তাঁর মুখের দিকটা ধরতেই তাঁকে অনুসরণ করে দেবতারাও সবাই বিষ্ণুর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বিষ্ণুর বুদ্ধিটা ছিল সেই অভিজ্ঞা জননীটির মতো। জননীর দুই বালক পুত্র পিঠোপিঠি ভাই। তারা মাছের টুকরো বড় না ছোট— তাই নিয়ে প্রতিদিন ঝগড়া করে। ছোট জন প্রতিদিন জেদের বশে বড় টুকরোটি চায় এবং পুরো খেতে পারে না, শেষ পর্যন্ত ফেলে দেয়। অথচ বড় জনের পাতে বড় টুকরোটি দেখলেই ক্ষোভে অভিমানে সে কেঁদেকেটে একসা করে এবং অবশ্যই ক্রন্দনের অস্ত্রে বড় টুকরোটি ছিনিয়ে নিতে সফল হয়। অভিজ্ঞা জননী শেষে ছোট মাছটাই প্রথমে দিতে আরম্ভ করলেন বড় ছেলের পাতে। ছোট জন নিজস্ব ধারণায় আগের মতোই দাদার থালা থেকে মাছ-ভাজা ছিনিয়ে নিত এবং জননী আপন অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় বড় ছেলেকে বলতেন, দে বাবা দিয়ে দে। তুই না বড়। ছোট ভাই হয় না? ওই না হয় বড় টুকরোটা খাক। ছোটজন ছোট টুকরো বড় ভেবে পরমানন্দে মাছ ভাজা খায়। তিনজনেই

আপন আপন নিয়মে খুশি হয়ে থাকলেন।

বিষ্ণুর ব্যাপারটাও প্রায় এইরকম। যেই না তিনি বাসুকি নাগের মুখের দিকটা গিয়ে ধরলেন অমনি দানব রাজা বলি সপার্ষদ এসে বিষ্ণুকে বললেন, আমরা কি এতই হেয়? অত্যন্ত অমঙ্গলের চিহ্ন, সাপের এই পুচ্ছদেশ আমরা ধরব কেন, আমরা কি এতই ফেলনা? দেখুন, নিত্য বেদপাঠ কি যাগযজ্ঞ আমরা সেগুলো যথেষ্ট করি। তাছাড়া কতবড় বংশে আমাদের জন্ম।— স্বাধ্যায় -শ্রুত সম্পন্নাঃ প্রখ্যাতা জন্মকর্মভিঃ। আমরা কি লেজের দিকটা ধরতে পারি, না সেটা আমাদের মানায়? বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে দেবতাদের পেছনে নিয়ে বাসুকির পুচ্ছভাগ স্পর্শ করে দাঁড়ালেন— স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ।

স্থান বিভাগ অর্থাৎ কে কোনদিকে দাঁড়াবেন ঠিক ঠাক হয়ে গেল। দেবতা এবং দানব— দুই পক্ষই আপন আপন নেতাদের জয়ঘোষ উচ্চারণ করে বাসুকির রজ্জু দিয়ে মন্দর পর্বতকে ঘোরাতে লাগলেন। অসুরদের দেহে শক্তি অনেক বেশি; স্বয়ং বলিরাজ বাঁ হাতে নাগরাজের মাথাটি ধরলেন আর ডান হাতে টান দিলেন তাঁর অগ্রশরীরে। বিষ-ভীত দেবতারা টান দিলেন পুচ্ছ দেশে। সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হল।

ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার হল—মহাভারত থেকে অধিকাংশ পুরাণ—সর্বত্রই দেখা যাবে যে, ভগবান বিষ্ণু সমস্ত দেবতাকে বলেছেন— তোমরা সমস্ত রকমের ওষধি আর লতা সমুদ্রের মধ্যে ফেলো, তারপর সমুদ্র মন্থন করো। দেব-দানবেরা সকলেই অতঃপর বহুতর বৃক্ষ-লতা ওষধি সমুদ্রে ফেলেছিলেন, তাছাড়া মন্দর পর্বতের গাছ গাছড়া, শিকড়ও প্রচুর পড়েছিল সমুদ্রে। সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান যেভাবে আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে, তার সঙ্গে এই গাছ-গাছড়া শিকড় বাকড়ের সম্পর্ক কী, সে কথা পরে আসবে, আপাতত শুধু এই ঘটনাটির উল্লেখ করে রাখলাম।

সমুদ্র মন্থন করে কখন কী উঠল, কোনটা প্রথম পাওয়া গেল, তা নিয়ে মহাভারত পুরাণে, পুরাণে পুরাণে নানা ভেদ বিকল্প আছে। মহাভারত বলেছে— নানা বৃক্ষের নির্যাস আর মথিত লতার রসের সঙ্গে কিছু সোনা মিশে যাওয়ায় যে তরল মিশ্রণ তৈরি হল, তাতে নাকি লবণ সমুদ্র ক্ষীর সমুদ্রে পরিণত হল। সেই দুগ্ধ -সাগর থেকে প্রথম পাওয়া গেল ঘৃত যা মানুষের আয়ুবর্ধক এক অতি উৎকৃষ্ট বস্তু বলে আমাদের মধ্যে পরিচিত— রসোত্তমৈ-বিমিশ্রঞ্চ ততঃ ক্ষীরাদভূদ্ ঘৃতম্। টীকাকার নীলকণ্ঠ টিপ্পনি কেটে বলেছেন— এতে আজগুবি ভাবার কিছু নেই বাপু। আমাদের চিরকালের দেখা গরুগুলি কখনও এমনি জলও খায়। আবার নুন-জলও খায়। গরু সেই জলের সঙ্গে ঘাস পাতা আর অন্যান্য বর্জ্য বস্তু ভক্ষণ করেও উত্তম দুগ্ধই প্রসব করে, তাহলে বৃক্ষ লতার সমন্বয়ে লবণোদধি মন্থন করেই বা ঘি উঠবে না কেন— যথা ক্ষারম্ অক্ষারং বা জলং গবি তৃণাদিরসং প্রাপ্য ক্ষীরং ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ। আমাদের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কিন্তু আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একে অলীক কল্পনা বলার কিছু নেই— নালীকম্ ইদং সম্ভাবয়িতুং শক্যতে। আসলে সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর জীবৎকালেই 'ডালডা' কিংবা ভেষজ বনস্পতি ঘৃতের আগমনী শুনতে পেয়েছেন। অতএব তাঁর বক্তব্য—কেন বাবা আজকে ভেষজ বিজ্ঞানীরাও তো তৃণ বনস্পতি থেকে ঘি বানাচ্ছেন, অতএব এটাই বা অলীক হবে কেন— বৈজ্ঞানিকাশ্চ তৃণাদ্ ঘৃতমুৎপাদয়ন্তীতি নালীকমিদং সম্ভাবয়িতুং শক্যতে।

যাই হোক, সমুদ্র-মন্থন করে উৎকৃষ্ট ঘৃতই উঠুক আর ভেষজ বনস্পতিই উঠুক, সেটা বড়

কথা নয়, বড় কথা হল ওই প্রাপ্তিটুকু অথবা আবিষ্কার। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন আর্যরা তাঁদের পূর্বভূমি থেকে এদিকে আসতে আসতে যত নতুন জিনিস দেখতে পেয়েছেন, সবই তাঁরা সমুদ্র মন্থনের ফল বলে বর্ণনা করেছেন। সে যাই হোক, সমুদ্র থেকে ঘি ওঠার পরেই কিন্তু দেব-দানব সবারই দম ফুরিয়ে গেল। সামনে সমাসীন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দেবতারা আর্জি জানালেন, কতকাল ধরে এই সমুদ্র মন্থন করে যাচ্ছি, অমৃত যে ওঠেই না প্রভু। একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া দেব-দানব সবাই যে বড় ক্লান্ত হয়ে গেলেন— ঋতে নারায়ণং দেবং সর্বেঽন্যে দেবদানবাঃ। সবার অবস্থা দেখে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন, আপনি সবাইকে বল দিন, ভগবান! সবাই যে ক্লান্ত হয়ে গেল।

বিষ্ণু বললেন, আমি সবাইকে শক্তি দিচ্ছি, তোমরা সমুদ্র মন্থন চালিয়ে যাও। এই শক্তি কোনও অলৌকিক ঐশ্বর্য কিনা জানি না, তবে বিষ্ণু হয়তো কর্মরত সমস্ত দেব-দানবকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন, যাতে আবার সবাই সমুদ্র মন্থনে লেগে পড়েন। সেই মন্থনের ফলে এবার পাওয়া গেল চাঁদকে। পূর্ব-দিগ্‌বধূর মুখ-চুম্বন করে চাঁদ উঠল আকাশে। পুরাণ-ইতিহাসের উদাসীন অকিঞ্চন বৈরাগী শিব সেই চাঁদকে চেয়ে নিলেন আপন জটাকলাপের আভূষণ হিসেবে—যযাচে শঙ্করো দেবো জটাভূষণকৃন্মম। এ খবর আমরা অবশ্য মহাভারতে পাইনি, মহাদেবের এই শশাঙ্ক-প্রার্থনার সংবাদ দিয়েছে পদ্মপুরাণ। স্বয়ং মহাদেব যেহেতু আহ্লাদ করে চন্দ্রকে যাচনা করে নিয়েছেন, তাই দেব-দানব কেউ সে ব্যাপারে কথা বললেন না।

www.amarboi.com

মহাভারতের সমুদ্রমন্থন বর্ণনায় এবারে যাঁকে পাওয়া গেল, তিনি হলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে নিয়ে দেব-দানবদের মধ্যে যে একটা বিশাল গণ্ডগোল পেকে গিয়েছিল, তার সম্বন্ধে মহাভারতের কবি একটি দুর্দান্ত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন পরে। কিন্তু লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সময় কবি একেবারে নিশ্চুপ। ভাগবত পুরাণ কিম্বা পদ্ম পুরাণ কিন্তু জানিয়েছে যে, লক্ষ্মী লাভের জন্য দেবতা দানব সবার মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। দানব দৈত্যরা অবশ্য বেশি কিছু করেননি। তাঁরা শুধু একবার লোলদৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তা সে দেবতারাও তাকিয়েছিলেন। আর না তাকানোর মতো অহেতুক কিছু ছিল না। পৌরাণিক বর্ণনায় লক্ষ্মী যেভাবে সবার মধ্যে সলজ্জ হাসিতে, পায়ে নূপুরের ধ্বনি তুলে হাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন—ততস্ততো নূপুরবল্গু শিঞ্জিতৈ / র্বিসপতী হেমলতেব সাবভৌ —তাতে দেব দানব সবারই দৃষ্টি পড়তে বাধ্য। যাই হোক, লক্ষ্মীর নিজের পছন্দটি কিন্তু একেবারে সপ্তম সুরে বাঁধা। দেব-দানব তাঁর দিকে তাকিয়েই রইলেন শুধু, আর তিনি সাবহেলে বিসর্পিণী স্বর্ণলতার মতো আস্তে আস্তে গিয়ে ত্রিভুবনপতি ভগবান শ্রীহরির বুকে মুখ লুকোলেন— পশ্যতাং সর্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ। কিছু কিছু পুরাণ অবশ্য বলেছে যে, লক্ষ্মীকে দেখে দেব-দানবের সোচ্ছ্বাস অগ্রসর-ভাব পিতামহ ব্রহ্মাকে একটু চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি তাই দেব-সংসারে সবচেয়ে বুড়ো অভিভাবকের মতো লক্ষ্মীকে নারায়ণের হাতে তুলে দিলেন।

সমুদ্র মন্থন আবারও আরম্ভ হল। মহাভারতে কালকূট বিষ উঠেছে সবার শেষে। কিন্তু পৌরাণিকেরা অমৃত-মন্থনের উপাখ্যানে নাটকীয়তা সৃষ্টি করার জন্য বাসুকির মুখ দিয়ে বিষোদগার দেখতে পেয়েছেন আগেই। ভাগবত এবং অগ্নিপুরাণের মতো আবার প্রথমেই বিষ সৃষ্টি। বিষ্ণুপুরাণ এবং পদ্ম-পুরাণে দেখা যাচ্ছে 'সুরভি'র মতো আকুল মনমাতানো গন্ধ পাওয়া গেল আগে। অন্য মতে এই সুরভি হল স্বর্গের কামধেনুটি আর স্বর্গের সুগন্ধ বয়ে

এনেছিল পারিজাত ফুল। সুরভির পরেই মন্থনের মুখে উঠে এসেছে উৎকৃষ্ট বারুণী মদ্য। মহাভারতে এই সুরার নামমাত্র উল্লেখ থাকলেও পদ্মপুরাণ এই সুরা-দেবীকে নায়িকার প্রতিরূপে চিহ্নিত করেছে। সে মদঘূর্ণিতলোচনা, স্খলিতপদা এবং টলটলে কাপড় পরা—দেবতারা নাকি ত্যাগ করেছিল তাকে, আর ঠিক সেই কারণেই অসুরেরা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের মৎস্য পুরাণ অবশ্য বারুণী মদ্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বাস্তব তথ্যটি দিয়েছেন। একথা কিছুই অবোধ্য নয় যে, এতক্ষণ মন্দর-দণ্ড ঘুরিয়ে সমুদ্র মন্থন করে দেব-দানব-দু'পক্ষেরই যা পরিশ্রম হয়েছিল, তাতে তাদের শক্তি উদ্রিক্ত করবার প্রয়োজন ছিল। মৎস্য পুরাণ তাই বলেছে— নানা ওষধি আর জীব জন্তুর বসা মেদে তৈরি হল উৎকৃষ্ট বারুণী মদ—তদম্বুমেদ-সোৎসর্গাদ্‌বারুণী সমপদ্যত। বারুণীর গন্ধে দেব-দানব সাবই আকুল হলেন এবং অন্য পুরাণগুলি দেবতাদের সম্মান রক্ষার জন্য যতই বলুন —তাঁরা মদ্য স্পর্শ করেননি, আমরা জানি— দেব দানবেরা সবাই খানিকটা করে বারুণী পান করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে নিলেন— তদাস্বাদেন বলিনো দেবদৈত্যাদয়ো'ভবন্‌। দ্বিগুণ শক্তিতে পুনরায় মন্দর পরিবর্তন আরম্ভ হল।

দেব দানব সকলের মিলিত শক্তিতে সমুদ্র থেকে অনেক কিছুই উঠেছিল। ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, নন্দনের মন্দার মঞ্জরী— এগুলি তো মন্থনের সাধারণ ফল। বিষ যা উঠেছিল মহাদেব তা পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। পৌরাণিকদের অনেক কাহিনী এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরম্পরায় অনেকের মধ্যে এইরকম ধারণা আছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী অমৃতের পাত্র হাতে উঠেছিলেন সমুদ্রের গভীর থেকে। কিন্তু আমাদের মহাভারত এবং অধিকাংশ পুরাণে যা পাই তাতে দেখা যায় অমৃতের ভাণ্ড হাতে নিয়ে যিনি সমুদ্র থেকে উঠলেন, তিনি হলেন দেব বৈদ্য ধন্বন্তরী। শুভ্র কমণ্ডলুর মধ্যে অমৃত ধারণ করে ধন্বন্তরী দাঁড়ালেন দেব-দানবে সবার সামনে—শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদ্‌ অমৃতং যত্র তিষ্ঠতি।

যে বস্তুর জন্য এত অপেক্ষা এত পরিশ্রম, এমনকি যার জন্য দেব-দানবের চিরন্তন বিরোধ পর্যন্ত সাময়িকভাবে মিটে গেছে, সেই অমৃত উঠেছে—এবারে কিন্তু প্রথমে দৈত্য-দানবের মধ্যে একেবারে শোরগোল পড়ে গেল। সবাই বলে —আমি নেব অমৃত। এ বলে, আমি খাব ও বলে, আমি খাব —অমৃতার্থে মহান্নাদো মমেদমিতি জল্পতাম্‌। মহাভারত, কী পুরাণ এতক্ষণ যেমন দেখেছেন, তাতে সম্পূর্ণ সমুদ্র মন্থনকালে অসুর দানবেরা সবাই একেবারে নীরব ছিলেন। দেবতারা যেভাবে কথাটা বলেছিলেন, অর্থাৎ অমৃত পাওয়া গেলে সমান ভাগে ভাগ করে নেব আমরা, সেই কথাটায় অসুরেরা এত বিশ্বাস করেছিলেন যে, অন্য কোনও পদার্থ—হাতি ঘোড়া পারিজাত ফুল,কৌস্তভ মণি— কিচ্ছুটি তাঁরা চাননি। একটি একটি করে ভাল জিনিস উঠেছে, সবই দেবতারা ভাগ করে নিয়েছেন—যতো দেবাস্ততো জগ্মুরাদিত্যপথমাশ্রিতাঃ। তারপর তিন ভুবনের ধনৈশ্বর্যবিধায়িনী লক্ষ্মীও যখন ভগবান নারায়ণের বক্ষঃলগ্না হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের একমাত্র ভরসা ধন্বন্তরীর হাতে রাখা অমৃত পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন—

ততস্তে জগৃহু দৈত্যা ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্‌।
কমণ্ডলুং মহাবীর্যা যত্রাস্তে তদ্‌ দ্বিজামৃতম্‌।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও অমৃত লাভ করা সম্ভব হল না দৈত্যদের পক্ষে। ভগবান নারায়ণ

AMARBOI.COM

দেবতাদের আগেই কথা দিয়েছিলেন অতএব সেই মতো তিনি অপূর্ব মোহিনী মূর্তি ধারণ করে দাঁড়ালেন দৈত্যদের সামনে। মোহিনী রমণীর রূপ দেখে অসুরেরা এতটাই মোহিত হলেন যে, তাঁরা পরম বিশ্বাসে ধন্বন্তরীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই অমৃতের কমণ্ডলু দিয়ে দিলেন রমণীর হাতে। রমণী মায়াবিনী— সমস্ত দৈত্যকে তিনি পংক্তি ভোজনে বসিয়ে দিলেন, কিন্তু অমৃতের ভাগ তিনি দিলেন না। দৈত্যরা শুধু চেয়ে চেয়ে রমণীর ললিত-গতি, উচ্চাবচ শরীর বিভঙ্গ দেখে মেতে রইল।

ভারি আশ্চর্য, লোকের ধারণা— কালো মেয়ে নাকি (সৌন্দর্যের) কোনও 'কনসেপ্টের' মধ্যে আসে না, কিন্তু মহাভারতের কবি যেহেতু পরেও বিশেষত দ্রৌপদীর মধ্যে কালো মেয়ের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করবেন, অতএব এই মোহিনী মূর্তির মধ্যেও আমরা সেই কালো রূপের মর্যাদা দেখতে পাব। মহাভারতের কবি যেহেতু অতি সংক্ষেপে এই বর্ণনা সেরেছেন, অতএব এখানে না পেলেও আমরা ভাগবত পুরাণে খবর পেয়েছি যে, বিষ্ণুর সেই মোহিনী মায়া মূর্তি ছিল নিকষ কালো—প্রেক্ষনীয়োৎপলশ্যামাং সর্বাবয়ব-সুন্দরম্। নবীন বয়সী রমণীর কাঞ্চী দামে উদ্বেলিত হাঁটা চলায় তথা 'স্তনভারকৃশোদরী' মোহিনীর উদ্দাম কটাক্ষে বশীভূত দৈত্য দানবদের মনে জেগে উঠল কামনার আগুন— দৈত্য-যূথপ চেতঃসু কামম্ উদ্দীপয়ন্ মুহুঃ। যারা এতক্ষণ, অমৃত পানের জন্য 'অহং পূর্বং অহং পূর্বং'— আমি আগে আমি আগে —করছিলেন, তাঁরা স্তব্ধ হয়ে বসে শুধু রমণীর কটাক্ষ ভিক্ষা করছিলেন।

আর এই মোহিনীও তো যে সে নয়, স্বয়ং বিষ্ণু দৈত্যদের প্রতারণা করার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই মোহিনী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তাছাড়া মনোহরণ শরীর বিভঙ্গেই শুধু নয়, পদ্মপুরাণ বলেছে— মোহিনী দৈত্যদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন —আমি তোমাদের, তোমাদের ঘরেই আমি থাকব— যুস্মাকং বশগা ভূত্বা স্থাস্যামি ভবতাং গৃহে। বিলুব্ধ দৈত্যরা রমণীকে লাভ করার বিশ্বাসে তাঁরই হাতে অমৃতের পাত্র ন্যস্ত করলেন। আর তখনই তাঁরা দেখতে পেলেন—মোহিনী সেই অমৃত দেবতাদের পান করিয়ে দিলেন তাঁদেরই সামনে, আর এক একটি লোল অপাঙ্গ-পাতে দৈত্যদের থামিয়ে রাখলেন শুধুই।

AMARBOI.COM

সময় বেশি লাগেনি। দৈত্য-দানবেরা খানিক পরেই বুঝলেন—সব মায়া; বিষ্ণুর মোহিনী মায়ায় তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। দেবতা এবং দানবদের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এরই মাঝখানে অমৃত বিন্দু লাভ করে রাহু কেতুর কী অবস্থা হল, সে ঘটনা আর বলছি না। কারণ সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ এই রাহু-কেতুর রূপক আবরণে বাঁধা আছে। আমাদের বক্তব্য— সেই দেবাসুর যুদ্ধে অসুরদের শেষ পর্যন্ত পরাজয় ঘটেছিল, কারণ দেবতারা পূর্বাহ্নেই অমৃত পানে বলীয়ান হয়েছিলেন।

অমৃত জিনিসটা যে কী, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে রীতিমতো মতভেদ আছে। কেউ বলেন—সোমরস, কেউ বলেন—সোম অর্থাৎ চাঁদের জ্যোৎস্নাই অমৃত আবার কেউ বলেন— অমৃত অমৃতই, সোম বা চাঁদ হলেন সেই অমৃত ধারণ করার পাত্র-মাত্র। এ বিষয়ে আমাদের একটা নিজস্ব প্রস্তাব আছে। সহৃদয় পাঠকুল সে প্রস্তাব মানতেও পারেন আবার উপযুক্ততর প্রমাণ দিয়ে সে প্রস্তাব অমূলক প্রতিপন্ন করতে পারেন। বস্তুত অমৃত বস্তুটা কী —তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি আগে অন্যান্য পুরাণের প্রমাণে জানিয়েছি যে, অমৃত মন্থনের আগে দেবতারা কোনওভাবেই অসুরদের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। তাঁরা বারংবার অসুরদের হাতে প্রহার

লাভ করছিলেন এবং অনেকে মারাও পড়ছিলেন। এখন যেহেতু সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উঠে এসেছে, অতএব কথাটা আরও একটু অন্যভাবে বলতে চাই। আপনারা মৎস্য পুরাণের মতো প্রধান এবং প্রাচীন পুরাণে দেখবেন—সেকালে দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ আরম্ভ হলে বেশি সংখ্যায় মারা পড়তেন দেবতারাই—পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে হতাসবঃ সুরাঃ। কিন্তু দানব-দৈত্যরা যদি ভীষণভাবে আহত হয়ে মরণোন্মুখও হতেন, তবে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী মন্ত্রে বাঁচিয়ে তুলতেন তাঁদের। শুধুই মন্ত্র কিনা জানি না, কিন্তু দৈত্যগুরু মন্ত্রের সঙ্গে এমন ওষুধ দিতেন তাঁর শিষ্য দৈত্যদের যাতে ক্ষত নিরাময় তো হতই, তাঁরা মৃত্যুর মুখ থেকে জেগে উঠতেন সুপ্তোত্থিতের মতো— জীবাপয়তি দৈত্যেন্দ্রান্ যথা সুপ্তোত্থিতানিব। এই মৃত সঞ্জীবনের মন্ত্র নাকি শুক্র শিখেছিলেন দেবদেব মহেশ্বরের কাছ থেকে। একমাত্র শুক্র ছাড়া যেহেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু, সুর নর দানব কেউই এই মাহেশ্বরী বিদ্যা জানতেন না, অতএব সর্বত্র শুক্রাচার্যের মর্যাদা ছিল আলাদা, তাঁর মেজাজও ছিল আলাদা। এই প্রসঙ্গেই কচ-দেবযানীর কথাই পরে আসবে, তবে সে কথা পরেই হবে। আপাতত জানাই —শুক্রাচার্য যেহেতু অসুরপক্ষপাতী ছিলেন, তাই এই বিদ্যার প্রভাবে অসুরদের সবটাই ছিল সুবিধা আর অন্যদিকে দেবতাদের অসহায় মৃত্যু। তবে আমার মতে এই বিদ্যা যতটা মন্ত্রময়ী তার থেকেও বেশি ওষধিময়ী। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় অসুরদের বাড়বাড়ন্ত দেখে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতি এবং অন্যান্য দেবতা একেবারে হতাশ হয়ে সমুদ্র মন্থনের কথা ভাবতে আরম্ভ করেন।

হাতি ঘোড়া , পারিজাত অথবা কৌস্তভ মণি, কি লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র মন্থনের গৌণ ফল মাত্র। কিন্তু মুখ্য ফল যে অমৃত, তার শক্তি যে দেবতাদের সুস্থ করে তোলার কাজেই নিযুক্ত হবে, সেটা অসুরদের মৃতসঞ্জীবনীর প্রতি তুলনা থেকেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয় কথা হল—সমুদ্র মন্থনের সময় যত বৃক্ষ লতা, ওষধিকে সমুদ্রে এনে ফেলতে বলা হচ্ছে বারবার। এটা একটা 'পয়েণ্টার' মন্থনের ফলে যা উঠেছে— হাতিঘোড়া বাদ দিয়ে তার ক্রমিক পর্যায়টি লক্ষ করুন। মৎস্য পুরাণ বলেছে— বিশাল বিস্তার মন্দর পর্বত ঘুরতে থাকলে অমৃত লক্ষ শ্বাপদ এবং ফল সমন্বিত বৃক্ষের সারাংশে পুষ্ট ওষধির রসে দুগ্ধসাগর দধিসাগরে পরিণত হল। তারপর সহস্র জীব শ্বাপদের বসামেদে দধিসাগর সুরায় পরিণত হল।

দেখুন, এখানে দুগ্ধ দধি অথবা ঘৃত সুরা এগুলি কিন্তু বড় কথা নয়। বড় হল —ক্রমিক পর্যায়গুলি। পুষ্পৌষধি বা বসা-মাংসের মিশ্রণে কী তৈরি হতে পারে— তা নিয়ে পৌরাণিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে কিন্তু যে সমস্ত পৌরাণিকের বিভ্রান্তি নেই, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে যথেষ্টই ঋজু। মহাভারতের পরিশিষ্ট বলে পরিচিত হরিবংশ পুরাণে এই ঋজুতা দেখতে পাই। পৌরাণিক বলেছেন—

সমস্ত দেবতা এবং অসুর লবণ সমুদ্রের জলে মন্দর পর্বতকে মন্থন-দণ্ড বানিয়ে সমুদ্র মন্থন করলেন। সমুদ্রের জলে ছিল হাজারো রকমের ওষধি—বীরুধো হিমবদরসম্। সম্পূর্ণ হাজার বছর ধরে মন্থন করার ফলে সমস্ত ওষধি দুগ্ধে পরিণত হল এবং তা থেকেই উঠে এল অমৃত—

সমাঃ সহস্রং মথিতং জলম্ ওষধিভিঃ সহ।
ক্ষীরভূতং সমাযোগাদ্ অমৃতং প্রত্যপদ্যত।।

হরিবংশের এই ঋজু কথাগুলি কবি থেকে আরম্ভ করে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক সবাই

মেনে নিতে পারে। দেবতাদের প্রয়োজন ছিল ওষধিজাত এমন এক মৃত্যুঞ্জয়ী প্রলেপ যা তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবে, যা তাঁদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলবে অবলীলায়। এবারে মহাভারতে লক্ষ্য করে দেখুন—এই অমৃতের ঔষধ হাতে নিয়ে উঠে এলেন যিনি, তিনি কিন্তু আর কেউ নন, তিনি দেব-বৈদ্য ধন্বন্তরি। দেবকুলে তিনি আয়ুর্বেদের চিকিৎসক বলে বিখ্যাত। গরুড় পুরাণ ধন্বন্তরির হাতে ধরা অমৃতকে ঔষধের মর্যাদা দিয়েই সমুদ্র মন্থনের কাহিনী শেষ করেছে। পৌরাণিক বলেছেন— ভগবান শ্রীহরি ক্ষীরসাগর মন্থনের সময় ধন্বন্তরির অবতার গ্রহণ করেছিলেন। অমৃতের কমণ্ডলু হাতে নিয়ে তিনি ক্ষীর সাগর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর তারপর? তারপর দেব-দানবের যুদ্ধ যতই লাগুক, ভগবান ধন্বন্তরি তাঁর অমৃত বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য সুশ্রুতকে—

ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরি র্হ্যভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণম্ অমৃতেন সমুত্থিতঃ।।
আয়ুর্বেদমষ্টাঙ্গং সুশ্রুতায় স উক্তবান্।।

দুগ্ধ, ঘৃত, ওষধি, 'ফার্মেন্টেশন'— সুরা, অমৃত, ধন্বন্তরি এবং সুশ্রুত —এক পংক্তিতে এগুলি যদি পর পর ঋজুভাবে সাজিয়ে দিই তবে অমৃতের অর্থ গিয়ে দাঁড়াবে সেই অশেষ রোগহর নিরাময়কারী ঔষধ, যা দেব দানবের যুক্ত পরিশ্রমের আবিষ্কার এবং যা হয়তো শুক্রাচার্যের মৃত-সঞ্জীবনীর তুলনায় আরও বেশি ফলপ্রদ, আরও বেশি আকাঙ্ক্ষিত। তাই ছলে-বলে দেবতারাই সেই অমৃত অধিকার করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন, আর অসুরেরা বাদ পড়েছিলেন মোহিনী মায়ায়। আমার মূল বক্তব্য কিন্তু বাকি রয়েই গেল। কারণ সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠল, সেই অমৃতটুকু কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য নয়, আমার প্রতিপাদ্য হল সেই বিষয়টুকু —সে বিষ, যা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে দেবতারা জেতেন, সেই ছলনা, যাতে অসুরেরা পরাজিত হন।

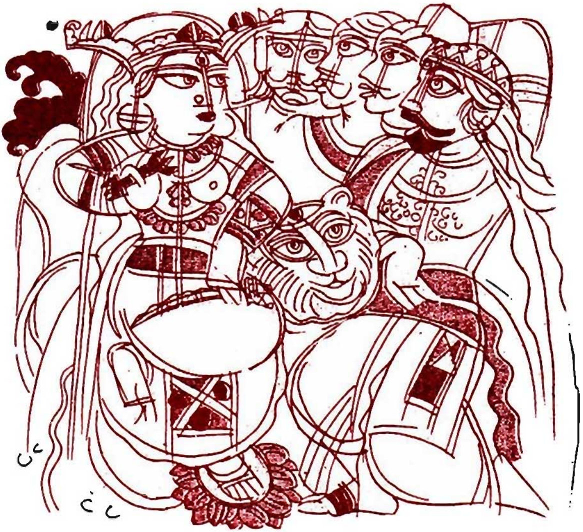

এগার

অসুর-দানবেরা শত পরিশ্রম করেও অমৃতের অধিকার লাভ করতে পারলেন না, অন্যদিকে দেবতারা—মানুষ যাঁদের উদ্দেশে স্তুতি গান করেছে, মানুষ যাঁদের কাছে সহায়হীন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে—সেই দেবতারা অসুরদের সঙ্গে ছলনা করলেন। নিরপেক্ষ জনে ভাবতে আরম্ভ করল—দেবত্বের মধ্যে যদি সত্য, সত্ত্ব, সমদর্শিতা না থাকল, তাহলে কীসের দেবত্ব? কী হবে মনুষ্যত্বকে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে? বস্তুত অমৃত নিয়ে চিরকালীন এক কপট- নাটকের এই যে প্রস্তাবনা হল—তার নিন্দা সইতে হয়েছে দেবতাদেরই। লক্ষ্মী আর অমৃত—অন্য কিছু নয়, মহাভারতের মতে শুধু লক্ষ্মী আর অমৃতের অধিকার নিয়েই দেবতা আর অসুরদের বিরোধ শাশ্বতিক রূপ ধারণ করল—অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থে মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ।

এই ঘটনার পর দেবতার প্রতি মানুষের নম্র নেত্রপাত, ধূপের ধোঁয়া আর সুমঙ্গলী স্তুতির নিরিখে দেবতাদের দেখতে চাই না, দেখতে চাই দেবতার বিরুদ্ধ পক্ষ অসুরদের অনুভব আর তর্ক-যুক্তিতে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দলের বিপরীত পক্ষে থেকে যে রাজনৈতিক দল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, সেই বিষময় শব্দরাশির মধ্যে আতিশয্য থাকলেও কখনও যেমন সত্যও থাকে, ঠিক তেমনই অসুরদের চরম আক্ষেপের মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছু থাকলেও সত্যও আছে কিছু। বিশেষ করে অমৃত না পাওয়ার যন্ত্রণায় অসুরদের যে সব কথাবার্তা পৌরাণিকেরা লিপিবদ্ধ করেছেন, সে সব কথা মহাভারতের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলা না থাকলেও সৌতি উগ্রশ্রবা অমৃত-মন্থনের কাহিনী বলে দেবতা, অসুর এবং অবশ্যই মানুষের পারস্পরিক স্থিতিটি নির্ণয় করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী,

পুরাণকারের কথা বুঝলেই মহাভারতের মধ্যে অমৃত-মন্থনের কাহিনীটিও যথাযোগ্য হয়ে পড়বে।

দেবী-ভাগবত পুরাণের বর্ণনা মতো তখন দৈত্যদের অধিপতি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ। তাঁর রাজত্বকালে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য একবার তপস্যা করতে গেলে দেবতারা দেবগুরু বৃহস্পতিকে পাঠালেন দৈত্যদের সঙ্গে ছলনা করতে। দেবগুরু শুক্রাচার্যের রূপ ধরে দৈত্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করে নিলেন প্রথমে। তারপর তাঁদের নানা ভুল শিক্ষা দিলেন বছরের পর বছর। তপস্যা সেরে স্বয়ং শুক্রাচার্য যখন ফিরে এলেন তখন দৈত্যরা তাঁকে মানতেই চাইলেন না। যা হোক, শেষ পর্যন্ত শুক্রাচার্য নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন এবং দৈত্যরা সেই জোরে আবারও লিপ্ত হল সংগ্রামে। পৌরাণিক সংখ্যায় এই যুদ্ধ হয়েছিল সম্পূর্ণ একশো বছর ধরে এবং প্রহ্লাদ প্রথমে ভেবেছিলেন—যুদ্ধে আর জেতা যাবে না। কিন্তু দৈত্য-প্রধানেরা সাহস দিয়ে বললেন, দেখুন মহারাজ, জয়-পরাজয় অদৃষ্টের খেলা। অদৃষ্ট কেউ দেখেনি, কে সেই অদৃষ্ট নির্মাণ করে তাও জানি না—কেন দৃষ্টং ক্ব বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্মিতম্। কাজেই আরও একবার যুদ্ধে যাব—যা হবার তা হোক।

একশো বছর নাই হোক, শত সংখ্যার গৌরবে অন্তত কয়েক বছর যুদ্ধ তো হয়েইছিল এবং শেষমেশ প্রহ্লাদের দল শুক্রাচার্যের কল্যাণে জিতে নিলেন দেবতাদের। ভীত সন্ত্রস্ত দেবতারা তখন আশ্রয় নিলেন মহামায়া চণ্ডিকার কাছে। তাঁকে স্তব করে তুষ্ট করলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। সিংহবাহিনী দেবী দেবতাদের আর্ত প্রার্থনা শুনে দেখা দিলেন এবং বললেন, ভয় পেয়ো না তোমরা। এই আমি যাচ্ছি, তোমাদের যাতে শুভ হয়, আমি সেই চেষ্টাই করব—ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ শং বিধাস্যে কিলাধুনা। দেবতাদের আশ্বাস দিয়েই 'সিংহারূঢ়াতি সুন্দরী' দেবী প্রহ্লাদ এবং তাঁর দৈত্য সেনাপতিদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। প্রহ্লাদ এবং তাঁর দল-বল সবাই একটু ভয়ই পেলেন। তবুও মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে প্রহ্লাদ বললেন, পালিয়ে যাবার কোনও কারণ নেই। দরকার হলে যুদ্ধ করব। ইনি অবশ্যই উপস্থিত হয়েছেন দেবতাদের রক্ষা করার জন্য। কিন্তু তবু আমরা পালাব না—যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায্য দানবোত্তমাঃ। তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি এখন এই ত্রিভুবন-পূজ্যা মহামায়ার স্তুতি করব, কারণ তিনি সবার জননী এবং ভক্তদের তিনি সব সময় দেখেন—সর্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্।

খানিকক্ষণ স্তব করেই প্রহ্লাদ কিন্তু দেবীর কাছে দৈত্য-দানবদের চিরকালের সমস্যাগুলি অত্যন্ত সযৌক্তিকভাবে নিবেদন করতে আরম্ভ করলেন। বললেন, শত কোটি প্রণাম জানিয়েই তোমাকে বলছি মা। দেবতা কি দানব—তাতে তোমার কী যায় আসে মা? ছেলেরা ভালই হোক আর মন্দ, তুমি মা হয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে তাদের দেখবে কী করে—মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদো' প্যশুভেষু শুভেষু চ? দেবতারা যেমন তোমার ছেলে, আমরাও তো তেমনই। তুমি না বিশ্বজননী! তা তুমি যদি বল—তোরা অসুরেরা বড় স্বার্থপর, নিজেরটা ছাড়া কারোরটা বুঝিস না, তাহলে বলি মা, আমরা যেমন স্বার্থপর, দেবতারাও তেমনই স্বার্থপর—তে'পি স্বার্থপরা নূনং তথৈব বয়মপ্যুত। যদি বল—তোরা দিন-রাত ভোগ-সুখ আর কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে আছিস, তাহলে বলব—দেবতারাও ওই নিয়েই আছে। তারাও বৈষয়িক সুখ-ভোগে মত্ত আছে, আমরাও আছি। তাহলেই দেখ—দেবতা আর অসুরে আদতে কোনও ভেদই নেই, তবুও যে তোমরা এরকম একটা ভেবে যাচ্ছ—ওরা ভাল, এরা খারাপ—এই ধারণাটা একেবারে ভুল গো জননী, এই ভেদটা তোমাদের মোহ—নান্তরং দৈত্য-সুরয়োর্ভেদো'য়ং মোহসম্ভবঃ।

amarboi.com

বিশ্বজননী চণ্ডিকার কাছে প্রহ্লাদ আজকে আর কিছু লুকোতে চান না। প্রহ্লাদ জানেন—স্বার্থপর, দোষী, ভোগী—এই কথাগুলি নিতান্তই সাধারণীকরণের মাত্রা। এতে কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। তবু এই পদ্ধতিতেই তিনি সমস্ত ব্যাপারটা আরও একটু 'ফিলসফাইজ্' করে দিলেন—কারণ পরমেশ্বরী চণ্ডিকা পূর্বাহ্নেই দেবতাদের আর্তি শুনে এসেছেন, তাঁর মনটাও এখনও দেবতাদের ব্যাপারে করুণাঘন হয়ে আছে। অতএব সাধারণীকরণের পদ্ধতিই আপাতত যুক্তিযুক্ত।

তার মধ্যে প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত, বেদ-বেদান্ত, দর্শন তাঁর ভালই জানা আছে। তিনি তাই একেবারে দার্শনিক যুক্তি সাজিয়ে বললেন, দেখ মা! দেবতারাও প্রজাপতি কাশ্যপের বংশধর, দৈত্য-দানবেরাও তাই। আমাদের মধ্যে তো কোনও বিরোধই থাকবার কথা নয়! তবে আমাদের ওপরেই কেন এই বিরুদ্ধ ভাব, মা জননী! তুমি অসুর আর দেবতাদের মধ্যে সাম্যভাব দেখাও, বিশ্বজননীকে সেটাই যে মানায়। দেখ মা, সত্ত্ব, রজঃ আর তমোগুণের ইতরবিশেষে দেবতা, অসুর—সবারই জন্ম হয়েছে, দেহধারী জীব মাত্রেই কাম, ক্রোধ, লোভ আছে, থাকবে। সেখানে তুমি দেবতাদের মধ্যেই শুধু গুণ দেখতে পাবে—এ কথাটা কেমন হল মা—গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেবভৃতোঽমরাঃ?

প্রহ্লাদ এবার অভিমান করে বললেন, আমার তো মনে হয়, মা—যুদ্ধ দেখতে তোমার ভাল লাগে, তাই তুমি তোমার কৌতুকের সাধ পূরণ করার জন্য আমাদের মধ্যে এমন বিরোধ বাধিয়ে রেখেছ—ত্বয়া মিথো বিরোধোঽয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ। বাস্তবিক তোমার যদি ঝগড়া দেখতে ভাল না লাগত, তাহলে ভাইতে-ভাইতে এমন বিরোধ লেগে থাকবে কেন? তোমার ইচ্ছেতেই এমনটি ঘটছে। প্রহ্লাদ এবার চরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেবীকে বললেন, ধর্মের তত্ত্ব আমার কিছু জানা আছে মা—জানামি ধর্মং ধর্মজ্ঞে—আর ইন্দ্রকেও আমি ভালমতো জানি। কিন্তু শুধু বিষয়-আশয় নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে রয়েছে সব সময়। তা এই তিন ভুবনের ভার তো মা তোমার হাতে, তুমি সবাইকেই শাসন করতে পার। কিন্তু বিষয়-লালসার সওয়াল যেখানে, সেখানে কোন পণ্ডিত কথা রাখে, তুমিই বল মা?

প্রহ্লাদ ধাপে ধাপে উঠছেন। বিশ্বজননীর যুক্তি এবং নীতিবোধের কাছে তাঁর প্রতিবেদন। প্রহ্লাদ দার্শনিকতার সঙ্গে পুত্রের অভিমান মিশিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সাধারণীকরণের যুক্তিতে কথা বলেছেন এতক্ষণ। এবার তিনি দেবতাদের অন্যায় এবং স্বার্থপরতাগুলি একে একে দৃষ্টান্তের মতো উপস্থিত করছেন বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননীর সামনে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অংশটুকুর জন্যই আমি এই পুরাণ কথার অবতারণা করেছি, কারণ সমুদ্র-মন্থন নিয়ে অসুরদের মধ্যে, বিশেষত মহামতি প্রহ্লাদের মনেও কত বিরূপ সমালোচনা অবদমিত হয়েছিল, তা এই অংশে প্রকট হয়ে উঠবে।

প্রহ্লাদ দেবতা এবং অসুরদের বিষয়-লালসার সাজাত্য দেখিয়ে এবারে দেবতাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। বললেন, এই যে এত বড় সমুদ্র মন্থন হয়ে গেল, দেবতা-অসুর সমানভাবেই কত পরিশ্রম করল, কিন্তু তার ফল কী? অমৃত বণ্টনের ছলে ভগবান বিষ্ণুই তো দেবতা আর অসুরদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করলেন। আর বিষ্ণু! তিনি তো এই তিন ভুবন পালন-পোষণ করেন বলে জানি। তিনি নিজে কী করলেন? আপন লোভ চরিতার্থ করার জন্য তিনি নিজে স্বর্গসুন্দরী লক্ষ্মীকে আত্মসাৎ করলেন। তাও বুঝতাম—তিনি একটা বস্তু গ্রহণ করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ মদত পেয়ে ইন্দ্র তো সবই হস্তগত করল—অশ্বরাজ

উচ্চৈঃশ্রবা, গজরাজ ঐরাবত অথবা সুরভির মতো একটি কামধেনু সবই বিষ্ণুর ইচ্ছায় ইন্দ্রের ভাগে গেল—সুরৈঃ সর্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া। এত বড় বড় সব অন্যায় করেও দেবতারা তবু সাধু বলে নাম কিনলেন—অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ। আর আমরা হলাম যত খারাপ।

প্রহ্লাদ এবার দেবতাদের সম্বন্ধে নিজের মত পরিষ্কার করে জানালেন। সমুদ্র-মন্থনের সময় দেবতাদের নানান স্বার্থপরতা উল্লেখ করে প্রহ্লাদ বললেন, তুমি যাই ভাব—দেবতারাই যত অন্যায় অনীতির মূল, অন্তত ধর্মনীতির দিক দিয়ে দেখলে তাঁদের দুর্নীতি-পরায়ণ বলে স্বীকার করতেই হবে—অন্যায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য ত্বং ধর্মলক্ষণম্। নীতি-ধর্মের কথা যখন উঠলই, তখন বিষ্ণুর দিকেই তাকাও না। ভগবান বিষ্ণু দরকার পড়লেই দেবতাদের ঠিক নিজের নিজের জায়গায় বসিয়ে দেন, আর আমাদের তিনি দেন শুধু পরাজয়ের যন্ত্রণা। বিষ্ণুর দিক থেকে এটা কি অন্যায় নয়? অন্তত ধর্মনীতি তো তাই বলে যে, এটা অন্যায়।

প্রহ্লাদ ধর্মের প্রশ্ন তুলে পূর্ব মীমাংসা, যুক্তিবাদ, বেদ, ব্রাহ্মণ, ধর্ম মীমাংসা—সবই ছুঁয়ে গেলেন, তারপরেই অনবদ্য তার্কিক যুক্তি সাজিয়ে সমুদ্র-মন্থনে দেবতাদের স্বার্থপরতার কথা শেষ করে তাঁদের কামবশতার কথাও তুললেন, কারণ কামনা-বাসনার ব্যাপারে লোকে শুধু এককভাবে অসুরদেরই দায়ী করে, দেবতাদের নয়।

প্রহ্লাদ তাই রীতিমতো হতাশার ভাব ফুটিয়ে বললেন, কোথায় ধর্ম, কেমন ধর্ম, সাধুতাই বা কোথায়—আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও। এই সংসারে স্পৃহাহীন বৈরাগী কে আছেন অথবা কোনওদিন সেই বৈরাগীকে আমরা দেখতে পাব কি—নিঃস্পৃহঃ কোঽপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি। এই যে চন্দ্র, দেবসমাজে তো তাঁর যথেষ্ট বড় জায়গা। তিনি তাঁর পূজনীয় আচার্য-পত্নীকে জেনে-শুনে জোর করে হরণ করে নিলেন। আর দেবরাজ ইন্দ্র? ধর্মের সিদ্ধান্ত কি তিনি জানেন না? তিনিও তো গৌতম-গুরুর প্রিয়া পত্নীকে ধর্ষণ করলেন। আবার যদি দেবগুরু বৃহস্পতির কথাই ধর, তিনি তাঁর অনুজ-পত্নীকে গর্ভবতী অবস্থায় ধর্ষণ করলেন এবং গর্ভচ্যুত তাঁর শিশু-পুত্রটিকে অভিশাপ দিয়ে অন্ধ করলেন।

প্রহ্লাদ যতগুলি ঘটনার উল্লেখ করলেন, এগুলি পুরাণ-কথায় প্রত্যেকটিই দেবতাদের মানসিক বিচ্যুতির ঘটনা। কিন্তু সব কথা বলে প্রহ্লাদ আবারও এলেন বিষ্ণুর কথায়। তিনি নিজে বিষ্ণুভক্ত, অতএব বিষ্ণুর দিক থেকে কোনও অন্যায় ঘটলে তাঁর সবচেয়ে বেশি বুকে বাজে। সমুদ্র-মন্থনে অমৃত লাভ করার পর তিনি যে বঞ্চনা করেছেন এবং আপন পৌত্র বলি-রাজার সঙ্গেও যে অন্যায় করেছেন বিষ্ণু, তাতে তাঁর ক্ষোভ আছে যথেষ্টই। প্রহ্লাদ বললেন—সমুদ্র মন্থনের পর আমাদের রাহু যে লুকিয়ে একটু অমৃত পান করেছিল, তাতে কী এমন অপরাধ ঘটেছিল? ভগবান বিষ্ণু এত বড় সত্ত্বগুণের আধার হয়ে তিনি কিনা রাহুর মাথাটাই কেটে নিলেন—অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতান্বিকে?

সবার শেষে প্রহ্লাদের নিজের বাড়ির ঘটনা এল। প্রহ্লাদ একেবারে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। জগজ্জননী চণ্ডিকার কাছে নালিশ জানিয়ে বললেন, অমন যে আমার ধার্মিক নাতিটি, তাঁর কী হল? ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ বলে জগতে যাঁদের সুনাম আছে, আমার নাতি বলিরাজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর দান-ধ্যানের সীমা নেই। শান্ত, বিনয়ী, বেদবিহিত যজ্ঞ-কর্মে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত—যজ্বা দানপতিঃ শান্তঃ সত্যজ্ঞঃ সর্বপূজকঃ। এমন যে ধর্মপরায়ণ আমার নাতিটি, ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করে ছলনা করলেন। শুধু কি তাই? তাঁর রাজ্য হরণ করে তাঁকে

amarboi.com

নিঃশেষ করে দিলেন একেবারে! অথচ দেখ মা, তবু মনীষী সজ্জনেরা দেবতাদেরই শুধু ধার্মিক বলে। আসলে কী জান, ধর্ম-টর্ম জগতে এখন কিছু নেই, এ জগতে যারা চাটুকার তারাই জেতে, ধর্ম এখন চুলোয় গেছে—জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।

প্রহ্লাদ তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন একেবারে অভিজ্ঞ যুক্তিবাদী আধুনিক বৃদ্ধটির মতো। এত যুক্তি জগজ্জননী চণ্ডিকার পক্ষে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়নি। দেবতাদের স্বার্থপরতা এবং ত্রুটিগুলি তিনি স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে অসুরদের তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতও হতে দেননি। তাঁদের 'বাবা-বাছা' করে পাঠিয়ে দিয়েছেন পাতালে।

এতক্ষণ ধরে দেবী-ভাগবত পুরাণ থেকে অসুরদের জবানীতে এই যে দেব-সমালোচনা শোনালাম, তার কারণ এই নয় যে, এই পুরাণখানিকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে মনে করি। দেবী-ভাগবত পুরাণে দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্যই প্রথম এবং শেষ কথা, ফলত স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু পর্যন্ত এখানে এক বিষ্ণুভক্তের মুখেই সমালোচনার পাত্র। কিন্তু তবুও দেবী-ভাগবতের এই অংশটুকু স্মরণ করলাম এই কারণে যে, দেবতা এবং অসুরদের পারস্পরিক স্থিতিটা এই সমালোচনা থেকে বুঝতে সুবিধা হবে। মহাভারতের অমৃত-মন্থন-পর্বে দেবতা এবং অসুরদের ন্যায়-অন্যায়ের বাহ্যিক একটা ইঙ্গিত আছে, সেই ইঙ্গিতটা পুরাণগুলির মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দেবী-ভাগবত পুরাণে যেহেতু আলোচনার সঙ্গে সমালোচনাটাও বাড়তি পাওয়া গেল, তাই সেটা উল্লেখ করে আমি আমার অন্য উদ্দেশ্যগুলিও সাধন করতে চাইছি, যদিও সেই সাধনায় অন্যান্য পুরাণ তথা ভারতীয় দর্শনগুলিও আমাদের সাহায্য করবে।

বস্তুত ছলনা, হিংসা, অসংযম, স্বার্থপরতা, দর্প—এই অন্যায় আচরণগুলিকে আমরা সব সময় অসুর-রাক্ষসদের ক্রিয়া-কাণ্ড বলেই এতকাল ভেবে এসেছি। এমনকি মনুষ্য-সমাজের মধ্যেও যাদের মধ্যে আমরা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য তথা কাম-ক্রোধ-হিংসা বেশি দেখতে পাই, আমরা আর তাদের মানুষ বলি না। অসুরদের সম্বন্ধে কোনও ধারণা না থাকলেও আমরা সংযমহীন, অনিয়ন্ত্রিত মানুষের মধ্যে অসুরের চিহ্ন দেখতে পাই। একটি মানুষের গায়ে অসম্ভব শক্তি থাকলে আমরা তার মধ্যে আসুরিক শক্তি লক্ষ্য করি; এমনকি একটি মানুষ অতিরিক্ত ভোজন করলেও তাকে আমরা তুলনা দিই রাক্ষসের সঙ্গে এবং এর মধ্যে যদি কারও অতিরিক্ত খিদে থাকে, তো সেই খিদে রাক্ষুসে খিদে না হয়ে যায় না।

অন্যদিকে, এর বিপরীত কোটিতে যে সমস্ত মানুষের মধ্যে পবিত্রতা, সততা অথবা সত্ত্বগুণ বেশি লক্ষ্য করা যায়, আমরা তাঁদের দেবতা বলে সম্বোধন করি। যাঁদের মধ্যে দয়া এবং সহৃদয়তার মাত্রা সমধিক, তাঁরা দেবতুল্য মানুষ বলে প্রতিনিয়ত তাঁদের কাছে আমরা নত হই। সংযতেন্দ্রিয়, নিঃস্বার্থ, নীতিযুক্ত মানুষ আমাদের কাছে দেবতার সম্মানেই সম্মানিত। মানুষই যখন এই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন, সেখানে দেবতা মানেই তো তিনি পবিত্রতা, সততা অথবা নীতি-ধর্মের প্রতিমূর্তি।

বাস্তবে কিন্তু ঘটনাগুলি এত সাধারণ বা বৈচিত্র্যহীন নয়। পুরাণ ইতিহাসে দেবতাদের চরিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনুষ্য-সমাজকে যদি বাদ দিয়ে পুরোপুরি আলাদা করেও ফেলা যায়, তবে দেবতাদের মধ্যেও প্রচুর আসুরিক গুণ দেখা যাবে, আবার বহু অসুরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাবে পবিত্র দেব-গুণ। আর মানুষের গুণ? সে তো দেবতা এবং অসুর—দুই পক্ষেরই সাধারণ ধর্ম। এই নিরিখে দেখতে গেলে একমাত্র মানুষই আমার কাছে শেষ পর্যন্ত দেবতা কিংবা রাক্ষসে পরিণত হবেন। সত্যি কথা বলতে কি—দেবতা কিংবা অসুর—এঁরা মানুষই

কিনা সেটা প্রমাণ করতে হলে আমাকে বেগ পেতে হবে রীতিমতো।

এই বেগের আগেও অবশ্য আবেগের একটা ব্যাপার আছে। মনে রাখতে হবে—ভারতীয় দর্শনে 'ঈশ্বর' বলে একটা কথা আছে। অনেকেই ঈশ্বর বা পরমেশ্বরের সঙ্গে দেবতাকে এক করে ফেলেন। বেদ-উপনিষৎ-পুরাণের মধ্যে ভারতীয় দেবতার যে বিবর্তন পাওয়া যায়, তাতে বেদের যুগ শেষ হতে না হতেই নূতন এক পরম তত্ত্বের অন্বেষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। পুরাণ-ইতিহাসের বর্ণনায় সমুদ্র-মন্থনে নিযুক্ত যে সমস্ত দেবতাকে দেখলেন অথবা যে সমস্ত দেবতার সমালোচনা শুনলেন বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের কাছে, সেই ইন্দ্রাদি দেবতারা কিন্তু বেদের বর্ণনায় অসীম শক্তিধর। তবে কিনা বেদে ইন্দ্র, বায়ু, সোম, সূর্য ইত্যাদি যে যে দেবতার স্তুতি যখন যখন রচিত হয়েছে, তখন সেই সেই স্তুতি-সূক্তের মধ্যে কিন্তু সেই ব্যক্তি দেবতাই চরম মাহাত্ম্যে ধরা দিয়েছেন। অর্থাৎ বৈদিক ঋষি যখন ইন্দ্র-সম্বন্ধীয় সূক্ত রচনা করছেন, তখন অন্য দেবতারা গৌণ, ইন্দ্রই প্রথম এবং শেষ কথা। আবার যখন সূর্য-সূক্ত রচনা করছেন ঋষি, তখন সূর্যই সব, তিনিই মুখ্যতম, অন্যেরা অপ্রধান।

পণ্ডিতেরা বলেন, এইরকম বহু-দেবতার ব্যক্তি স্তুতির চরম পর্বে ক্লান্ত ঋষির হৃদয়ে এক এবং অদ্বৈত তত্ত্বের অন্বেষণ জেগেছে। দিনের পর দিন শত-সহস্র যজ্ঞে বৈদিক দেবতার ব্যক্তি-স্তুতি রচনা করতে করতে বৈদিক ঋষির মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত হতাশা ধ্বনিত হয়েছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ—এত ঘি পুড়িয়ে হব্য-কব্য নিবেদন করে কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে আর আহুতি দেব আমরা? পণ্ডিতেরা বলেন, এই হতাশা থেকেই অদ্বৈত তত্ত্বের অন্বেষণ আরম্ভ হয়—যার চরম পরিণতি উপনিষদ আর বেদান্ত দর্শনের মধ্যে। উপনিষদের মধ্যে দেখা যাবে ইন্দ্র-বায়ু-সূর্যের মতো দেবতাদের স্থান নিতান্তই গৌণ, প্রায় মানুষের মতোই তাঁদের স্থিতি এবং অবস্থান। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল—উপনিষদের তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানবার জন্য আমরা যাঁদের আগ্রহান্বিত দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের মধ্যে দেবতা, অসুর এবং মানুষদের জায়গাটা একেবারেই সমান, একস্তর।

অবশ্য উপনিষদ বা বেদান্ত-দর্শনের চরম উপাস্য তত্ত্ব যে ব্রহ্ম, সেই তিনিও কিন্তু বেশিদিন তাঁর কাঠিন্য বজায় রাখতে পারেননি। উপনিষদের জ্ঞান সাধনার ধারা এতই কঠিন, এতই তা গভীর এবং সূক্ষ্ম যে সেই পথে—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া/দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—সাধারণ জনের ঈশ্বর বিষয়িনী তৃষ্ণা একটুও নিবারিত হয়নি। উপনিষদের পূর্ব যুগের ইন্দ্রাদি দেবতার মূর্ত কল্পনা তখনও মানুষের মনে অম্লান, এবং বেদের প্রামাণ্য অবিসংবাদিতভাবে চিরন্তন। অন্যদিকে উপনিষদ বা বেদান্ত দর্শনের চরম দার্শনিক তত্ত্বগুলিও মানুষকে গভীরতা দেয়, তার দার্শনিক জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করে, তাকে মুক্ত পুরুষের মাহাত্ম্য দেয়। ঠিক এই রকম একটা অবস্থা থেকেই মানুষ-দার্শনিক এমন একটি দেবতাকে কামনা করে বসল—যাঁর রূপ-রস এবং আঙ্গিক হবে বৈদিক দেবতার মতো, আর তাঁর অন্তরে থাকবে উপনিষদের সেই পরম তত্ত্ব-জ্যোতি। অর্থাৎ যিনি মানুষের প্রার্থনায় এবং ভালবাসায় ধরা দেবেন অথচ তাঁর তত্ত্বটি হবে গভীর এবং জ্ঞানগম্য। আমাদের আলোচ্য মহাভারতে যেহেতু এইরকমই এক পরম দেবতার সন্ধান পাব আমরা, তাই আগেভাগেই আমরা তাঁর আগমনী রচনা করছি।

মহাভারতের আখ্যান-উপাখ্যান মুলতুবি রেখে এই পরম দেবতার প্রতিষ্ঠা আমার সহৃদয় পাঠক-মণ্ডলীর কাছে যে হৃদয়গ্রাহী হবে না, তা জানি। আর আমি আনুষ্ঠানিক বা দার্শনিকভাবে

সে প্রতিষ্ঠার বিস্তারে যাবও না। তার কারণ কৃষ্ণ যে কী করে আস্তে আস্তে ভগবান হয়ে গেলেন—মহাভারতের প্রক্ষেপবাদীদের কাছে তা যত আশ্চর্যের ঘটনাই হোক, আমার পক্ষে মহাভারতের প্রমাণ দিয়েই সেটা দেখানো কিছু অসম্ভব নয়। আরও অসম্ভব নয় এই জন্য যে, তিনি এক ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু কৃষ্ণকে নিয়ে আমি একটুও চিন্তিত নই, কারণ মহাভারতে তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। আমি শুধু চিন্তিত সেই পরম ঈশ্বর নিয়ে—যাকে কচিৎ আমরা কৃষ্ণ বলে ডেকেছি, শিব বলে ডেকেছি অথবা দুর্গা বলেও ডেকেছি—সেই পরম ঈশ্বর তত্ত্বকে যেন দেবতা বলে গুলিয়ে না ফেলি। আবারও বলছি, পরম ঈশ্বর বা ভগবান নয়, আপাতত আমার আলোচ্য শুধু দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য। এই তিনটি প্রাণীকে বুঝে নিয়েই আমরা সৌতি উগ্রশ্রবার আসর ছেড়ে একেবারে মহারাজ জনমেজয়ের রাজসভায় উপস্থিত হব। কারণ নাগ, অসুর অথবা দেবতাদের কাহিনী বলে সৌতি উগ্রশ্রবা ততক্ষণে আমাদের মহাভারত-কথার মূল আসরে বসার যোগ্যতা তৈরি করে দেবেন।

বার

ওঁরা বলেছেন, মনে বড় আনন্দ হয়। এমন আনন্দ, যা লাভ করলে পৃথিবীর সমস্ত সুখ এবং আনন্দ তার কাছে লঘু হয়ে যায়—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। শম-দমের সাধন, 'এখানেও কিছু চাই না, মরে যাবার পরেও কিছু চাই না'—এমন একটা নিঃস্বার্থ ভাব, আর মুক্তির জন্য উদগ্র একটা ইচ্ছে—এই সব দুর্লভ যোগ্যতা যাঁর আছে, তিনিই—একমাত্র তিনিই হলেন ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী।

বেশ তো, ব্রহ্মবিদ্যার ছাত্র কী রকম হবে—সেটা তো বোঝা গেল, তা এই বিদ্যায় কার দেখা মিলবে? কী পাব? দেখা মিলবে সেই অমৃত জ্যোতির, পাবে পরম আনন্দ। তিনি কোথায় থাকেন? কোথাও না, কিন্তু সর্বত্র—তিনি অণুর থেকেও ছোট, সব চেয়ে বড়র থেকেও তিনি বড়।

এ তো কিছুই বুঝলাম না। ভীষণ কঠিন। হ্যাঁ কঠিন। ব্রহ্মতত্ত্ব বড় কঠিনই বটে। সহজ কিছু চাও তো ভগবানকে ডাক। তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ। তাঁকে কেমন দেখতে? ভারি সুন্দর। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর। থাকেন কোথায়? গোলোকে, বৈকুণ্ঠে। হ্যাঁ, এই চেহারাটা বেশ পছন্দ হয়েছে। তা একে পেতে হলে কী কী যোগ্যতা থাকার দরকার? ভক্তি, শরণাগতি, ভালবাসা। বাঃ এ তো বেশ সহজ, আমি পারব, আমি এঁকেই চাই।

দুটো পরম উপাস্য তত্ত্বের পার্থক্য দেখলেন? প্রথমটা বুঝতেই পারছি না। কিন্তু দ্বিতীয়টা বেশ বুঝতে পারছি। কেন বুঝতে পারছি জানেন? পরম উপাস্য তত্ত্ব হলেও তাঁর একটা চেহারা আছে, তাঁর কিছু ক্রিয়াকলাপ আছে, এবং থাকবার একটা ঠিকানা আছে। অর্থাৎ আমরা ভারতের মানুষেরা অদ্বৈত, দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত—এমনই হাজার কিসিমের সূক্ষ্ম আলোচনা সেরে নিয়ে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে পরম ঈশ্বরের চেহারা, ঠিকানা এবং

সারা জীবনের 'অ্যাক্টিভিটি' ভাল রকম বিচার না করে তাঁকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা ভগবান বলে মানতে রাজি হইনি।

আমার বক্তব্য—স্বয়ং ভগবানেরই যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ দেবতাদের কথা আর কী বলব? তাঁদের ঠিকানা, তাঁদের রূপ, ক্রিয়া-কলাপ, ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি, লোভ, হিংসা, ভালবাসা—সবই আমরা দেখতে পেয়েছি ইতিহাসে পুরাণে। বলতে পারেন—পৌরাণিক কথক ঠাকুরের কল্পনা আর আমাদের অফুরান বিশ্বাস—এই দুয়ের যোগফল হল আমাদের দেবতা।

বলতেই পারেন। অনেকে অনেক কথাই বলছেন, তো আপনারা বললে আর ক্ষতি কী! তবে কিনা, এই আধুনিক যুগে বসে মহাভারতের অমৃত-কথা আরম্ভ করেছি, তাই পৌরাণিকের কথার ভিতরে কোথায় ইতিহাসের অভিসন্ধি মেশানো আছে, সেটুকু আমরা অসীম সমব্যথায় দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, না হলে, আমার মহাকবির হৃদয়টাই যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে উত্তরাধিকারী কি কখনও পূর্বপুরুষের সঙ্গে কৃতঘ্নতা করে? অতএব শুনুন মহাশয়! স্বর্গ নামে একটা জায়গা আছে।

ঠাকুমা-দিদিমা, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের বর্ণনায় স্বর্গের কথা শুনেছি কত। বড় মনোরম সে জায়গা। সেখানে দেবতারা থাকেন। গন্ধর্ব-কিন্নরেরা সেখানে নাচে, গান গায়। স্বর্গসুন্দরী অপ্সরারা বিলোভনী নৃত্যভঙ্গিতে সবার মনোরঞ্জন করে, রূপে-রসে মন ভোলায়। মানুষ বেঁচে থাকতে সেখানে যেতে পারে না। মানুষ যদি অনেক পুণ্য করে, ইহলোকে যদি ভাল ভাল কাজকর্ম করে, তবে নাকি মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। আমাদের বেদ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রও তাই বলে। এমনভাবে বলে যাতে মনে হয়—স্বর্গ যেন পৃথিবীর ওপর, অন্তরীক্ষ-লোকের ওপর এক দুর্লভ জায়গা। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোনও কল্পনার জগৎ।

'কল্পনার জগৎ' কথাটা ঠিকই আছে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কি না সেটাই শুধু বোঝবার। ভারি আশ্চর্য লাগে শুনতে, যখন মহাভারতেই দেখতে পাই—পৃথিবীবাসী কত রাজা স্বর্গে গেছেন দেবরাজ ইন্দ্রকে রণক্ষেত্রে সাহায্য করতে। রামায়ণের দশরথ গেছেন, পাণ্ডব-কৌরবের পূর্বপুরুষ পুরূরবা গেছেন, দুষ্মন্ত গেছেন, আরও কত মানী রাজা, তাঁদের নাম করতে চাই না। কালিদাসের কুমার রঘু তো স্বর্গরাজ্য আক্রমণই করেছিলেন। অপরদিকে মানুষের এই কর্মভূমি পৃথিবীতে দেবরাজ ইন্দ্রের গতায়াতও কিছু কম ছিল না। মানুষের মানসিক উন্নতি হলে, অথবা মর্ত্য রাজা যদি শতবার অশ্বমেধ করতেন তো ইন্দ্রের ভয় হত—তাঁর ইন্দ্রত্বই চলে যাবে হয়তো। আরও একটা কথা, এই পৃথিবীর মানবী রমণীরাও দেবতাদের কম প্রিয় ছিলেন না—মহাভারতের অন্যতম প্রসঙ্গে সে সব কথা পরে জানাব। এখন শুধু একটা গল্প বলব—সোমদেব-ভট্টের কথাসরিৎসাগর থেকে।

গল্পটা বলব, কেননা, স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যভূমির যোগাযোগ কত গভীর, কত সহজ হতে পারে, সেটা বোঝা যাবে এই কাহিনী থেকে। আরও বলব এই কারণে যে, গল্পটা পাণ্ডব-বংশেরই উত্তরপুরুষ জনমেজয়ের ছেলেকে নিয়ে। অবশ্য গল্প শোনার আগে মনে রাখবেন—কথাসরিৎসাগরের কবির পক্ষে মহাভারত-পুরাণ বা ভারতের ঐতিহ্যবিরোধী কোনও কথা বলা সম্ভব নয়। তাই কথাসরিতের কাহিনীকে শুধুই গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন না। গল্পের অন্তরে যে বিশ্বাসটুকু আছে, সেই বিশ্বাস যে সাধারণ বিশ্বাস, সেটা মনে রেখেই গল্পটা শুনবেন।

AMARBOI.COM

গল্পের পটভূমি—ইতিহাস-বিখ্যাত সেই বৎস-দেশ। এমন সুন্দর সে দেশ যে মনে হয়—বিধাতা যেন স্বর্গভূমির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য প্রতিযোদ্ধার মতো তৈরি করেছিলেন এই দেশ—স্বর্গস্য নির্মিতো ধাত্রা প্রতিমল্ল ইব ক্ষিতৌ। এই বৎস দেশের মধ্যে আবার কৌশাম্বী নগরী, যেন পদ্মফুলের হলুদ-বরণ হৃদয়খানি। এই কৌশাম্বীতেই থাকতেন রাজা শতানীক, জনমেজয়ের ছেলে পরীক্ষিতের নাতি। অসীম তাঁর প্রতাপ, প্রবল তাঁর ক্ষমতা। রাজার স্ত্রীর নাম বিষ্ণুমতী। রাজার ঘরে এত ঐশ্বর্য, এত সম্পত্তি কিন্তু তাঁর ছেলে নেই। মনের দুঃখে রাজা মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন এবং হঠাৎ করে শাণ্ডিল্য মুনির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়। মুনি যাগ-যজ্ঞ করে মন্ত্রপূত পায়েস খাইয়ে দিলেন রানিকে। যথাসময়ে রানির ছেলে হল, তাঁর নাম হল সহস্রানীক। ছেলে বড় হতে তাঁকে যুবরাজ করে দিয়ে রাজা শতানীক ভাবলেন কিঞ্চিৎ ভোগ-বিলাস করবেন এবার। ছেলে বড় হয়ে গেছে, আর কত রাজকর্ম করবেন তিনি।

কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ঘরে আরাম বেশিদিন সয় না। ভোগ করব ভাবলেই ভোগ করা যায় না। রাজা সুখেই আছেন, তাঁর মধ্যে স্বর্গরাজ্য থেকে ইন্দ্রের দূত মাতলি এসে পৌঁছলেন শতানীকের কাছে—দূতস্তস্মৈ বিসৃষ্টো'ভূদ্ রাজ্ঞে শক্রেণ মাতলিঃ। কী? না, স্বর্গে বড় বিপদ চলছে, অসুরদের সঙ্গে লড়াই লেগেছে দেবতাদের। অতএব এই বিপন্ন অবস্থায় ইন্দ্র শতানীককে স্মরণ করেছেন সাহায্য করার জন্য—সাহায়কেচ্ছয়া। রাজা শতানীক সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী-সেনাপতি আর প্রিয় পুত্রের হাতে রাজ্যের ভার সঁপে দিয়ে মাতলির রথে চড়ে গিয়ে পৌঁছলেন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের কাছে। যুদ্ধের ভার বুঝে নিয়ে তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রণাঙ্গনে নেমে পড়লেন।

পাণ্ডবকুলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটির ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ হল তাঁর। যম-দংস্ট্রা নামে এক অসুর-দলের অনেককেই তিনি মেরেও ফেললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বয়ং ইন্দ্র দেখছেন এই অবস্থায় অসুরদের সঙ্গে লড়াইতে তিনি মৃত্যু-বরণ করলেন। এই অবস্থায় ইন্দ্র কী করেন? একে তো লড়াই তখনও চলছে, এদিকে মর্ত্য-বন্ধুর মৃত্যু ঘটল। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিজের প্রিয় সারথি মাতলিকে পাঠিয়ে দিলেন কৌশাম্বীতে। মাতলি অশেষ শ্রদ্ধায় রথে করে বয়ে নিয়ে চললেন রাজা শতানীকের মৃতদেহ—মাতল্যানীতদেহম্।

কৌশাম্বীতে যখন রাজার মরদেহ এসে পৌঁছল, তখন হাহাকার পড়ল রাজবাড়িতে। রানি বিষ্ণুমতী শতানীকের অনুগামিনী হলেন চিতাগ্নিতে। রাজলক্ষ্মী আশ্রয় লাভ করলেন শতানীকের পুত্র সহস্রানীকের কাছে।

ঘটনাটা খুব সামান্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল—কৌশাম্বী থেকে কতদূর এই স্বর্গ-রাজ্য, যেখান থেকে ইন্দ্রের বার্তাবহ দূত এসে পৌঁছয় মর্ত্য রাজার কাছে? কতদূর এই স্বর্গরাজ্য, যেখান থেকে কোনও অলৌকিক পদ্ধতিতে নয়, বায়ুপথে নয়, একেবারে রথে করে সংগ্রাম-ভূমি থেকে মরদেহ বয়ে আনা যায় কৌশাম্বীতে?

গল্পটা আরও একটু বলি। শতানীকের মৃত্যুর পর নবীন রাজা সহস্রানীক রাজ্য চালাতে আরম্ভ করেছেন। ওদিকে কোনও মতে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও হটিয়ে দিয়েছেন অসুরদের। স্বর্গে বিজয় মহোৎসব আরম্ভ হল আর এই আনন্দ-বিজয়ের দিনে ইন্দ্রের মনে পড়ে গেল এই মর্ত্যসখার কথা। তাঁর দুঃখের দিনে মর্ত্য থেকে শতানীক এসেছিলেন তাঁরই হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি মারা গেছেন তাঁরই জন্য। ইন্দ্র আবারও মাতলিকে পাঠালেন কৌশাম্বীতে, যাতে

AMARBOI.COM

বন্ধুপুত্র সহস্রানীক তাঁর এই বিজয়োৎসবে যোগ দেন—

ততঃ শক্রঃ সুহৃৎপুত্রং বিপক্ষ-বিজয়োৎসবে।
স্বর্গং সহস্রানীকং তং নিনায় প্রেষ্য মাতলিম্।।

আমার কাছে এটা খুব বড় কথা নয় যে, সহস্রানীক স্বর্গের বিজয় মহোৎসবে অবশ্য যোগ দিয়েছিলেন। বড় কথা নয় এটাও যে, মর্ত্যের রাজাকে স্বর্গসুন্দরী তিলোত্তমা ডেকেছিলেন ক্ষণিক ভালবাসার জন্য। এত সব কাহিনীর বিস্তারে আমি আর যাব না। কারণ, আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে সেই একটাই—কৌশাম্বী থেকে কত দূর সেই স্বর্গভূমি, যেখানে পৃথিবী রাজা সহস্রানীক নন্দন-বনের অন্তরালে দেব-পুরুষদের রমণী-বিলাসে মত্ত দেখেছিলেন? কোথায়, কত দূর সেই স্বর্গভূমি যেখান থেকে ফেরবার সময় মাতলির রথ-ঘর্ঘরে ডুবে গিয়েছিল তিলোত্তমার প্রেমের আহ্বান? আমরা সেই স্বর্গের ঠিকানা চাই।

আচ্ছা, গল্প শুনে মনটা যখন হালকাই আছে, তবে স্বর্গভূমির দার্শনিক চর্চা করে প্রাথমিকভাবে বিষয়টাকে একটু গভীর করে নেওয়াই ভাল। বস্তুত স্বর্গ ব্যাপারটা একটা স্থান-বিশেষ, নাকি এই জায়গাটা একটা কল্পিত সুখের 'অ্যাবস্ট্রাক্‌শন'—তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। বেদান্ত দর্শনের পণ্ডিতেরা বলেন—বেদের মন্ত্রে, উপনিষদের নানা তথ্যে এবং পুরাণ-ইতিহাসের মধ্যে যেহেতু দেবলোক বা স্বর্গলোকের নানা বর্ণনা আছে, অতএব এ রকম একটা স্বতন্ত্র সুখভোগের স্থান অবশ্যই আছে, যেখানে দেবদেহ লাভ করে স্বর্গসুখ ভোগ করা যাবে। বেদান্তীদের যুক্তি খুব সোজা। তাঁরা বলেন—ধর, তুমি একটি শুয়োর। সারাক্ষণ নোংরা-কাদায় শুয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করা সেই শুয়োরের দেহ ধারণ করে অথবা শুয়োরের ভাবনা-চিন্তা মাথায় নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো স্বর্গসুখ ভোগ করবে, তা কি হয়—বিড়্-বরাহাদি-দেহেন ন হ্যৈন্দ্রং ভুজ্যতে ফলম্? স্বর্গসুখ চাইলে বাপু বেদ-বিহিত কর্ম করো, চিত্ত শুদ্ধ করো, তাহলে মরণান্তে দেবদেহ লাভ হবে, ভোগ করবে অনন্ত স্বর্গসুখ।

একই ভাবে খারাপ ভাবে জীবন চালিয়ে হাজারো অন্যায় করার পর নরক ভোগ করার জন্যও যে অন্য কোনও স্বতন্ত্র দেহ লাগবে, সেটাও মেনে নিয়েছেন দার্শনিকেরা। বাচস্পতি মিশ্রের মতো সর্বদর্শনস্বতন্ত্র পণ্ডিত পর্যন্ত বলেছেন—ধর, তোমার অন্যায়-অভব্যতার নিরিখে বহু বহু বছর নরক-যন্ত্রণা নির্দিষ্ট হল। তো তোমার আয়ু যদি ষাট, সত্তর কি আশি হয়, তাহলে তো আর এই মানবদেহে শতবর্ষের শাস্তি-যন্ত্রণা ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই নরক-ভোগ করার জন্যও স্বতন্ত্র দেহ চাই। দেহ যেমন চাই, তেমনই নরক নামে আলাদা কোনও জায়গাও আছে, তার প্রমাণ—কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার কথোপকথনের জায়গাটা, অথবা ঋগ্‌বেদে বর্ণিত—বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং/যমং রাজানমিহ তর্পয়ধ্বম্—এই রকম একটা জায়গা।

বেদান্ত-দর্শনের পণ্ডিত যাঁরা, তাঁদের কাছে স্বর্গের যে ঠিকানা পেলাম, তা অবশ্যই পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত বায়ু-মণ্ডলের ওপরে কোনও জায়গা। আমাদের এই পৃথিবীতে নূতন দেহধারী নানা জীবকুলে আকীর্ণ এমন একটা জায়গা খুঁজে বার করা মুশকিল। বরং এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের আচার্যরা অনেক বেশি বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ওঁরা বলেন, স্বর্গ বলতে আলাদা কোনও জায়গা, অথবা বিশেষ কোনও লোক বোঝায় না। স্বর্গ মানেই সুখ অথবা প্রীতি। এমন সুখ, যার মধ্যে দুঃখের স্পর্শমাত্র নেই এবং নিজের ইচ্ছামতো যেখানে সুখের বস্তু লাভ করা যায়—সেটাই স্বর্গ। তাহলে কি স্বর্গ বলে আলাদা কোনও জায়গা নেই? দুঃখস্পর্শহীন সুখই কি তাহলে স্বর্গ—কিং লোকবিশেষঃ স্বর্গঃ? উত সুখমাত্রম্?

amarboi.com

পণ্ডিতেরা বলেন—মীমাংসক আচার্যদের চিন্তাভাবনা ভাল করে বিচার করলে দেখা যাবে—স্বর্গ বা নরকের জন্য আলাদা কোনও জায়গা স্বীকার করার কোনও প্রয়োজনই নেই। বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ নামের একখানি গ্রন্থে বেদান্তীরা মীমাংসকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন—ওঁদের মতে স্বর্গই বল আর নরকই বল—সে সবই এইখানে, এই মাটির পৃথিবীর ভোগসুখের মধ্যে—ইহৈব নরকস্বর্গাবিতি মাতঃ প্রচক্ষতে। জানি না, এই শ্লোক থেকেই ছোটবেলায় সেই কবিতা তৈরি হয়েছিল কি না—কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর? মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক.... ইত্যাদি ইত্যাদি। ওঁদের মতে—মানুষ যদি মনে সুখ পায়, তাহলে স্বর্গ সেইখানেই। আর যদি সুখের বদলে যন্ত্রণাটাই প্রবল আকারে মনকে আচ্ছন্ন করে, তবে নরক-যন্ত্রণা সেইটাই—মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরক-স্তদ্-বিপর্যয়ঃ।

মীমাংসকদের কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন—অখণ্ড এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ অনুভব করার জন্য এমন একটা জায়গা চাই যেখানে শীত-উষ্ণ, এসবের দ্বন্দ্ব নেই—যা প্রীতিঃ নিরতিশয়া অনুভবিতব্যা, সা চ উষ্ণ-শীতাদি-দ্বন্দ্ব-রহিতে দেশে শক্যা অনুভবিতুম্। আর আমাদের এই দেশটা এমনই যেখানে জীবনের একটা মুহূর্তও বুঝি কাটে না যেখানে এই দ্বন্দ্ব নেই—অস্মিংশ্চ দেশে মুহূর্তশতভাগো'পি দ্বন্দ্বৈর্ন মুচ্যতে।

বুঝেছি, বেশ ঝামেলার কথা বলে ফেলেছি আমি। আসলে 'দ্বন্দ্ব' শব্দের দ্বন্দ্বটা ঘুচলেই সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। এই যে দার্শনিক বললেন—'শীত-উষ্ণ এসবের দ্বন্দ্ব'—এই দ্বন্দ্ব মানে জোড়া, আর এই জোড়াটা শুধু শীত-উষ্ণ বা ঠান্ডা-গরমের নয়, দুঃখ-সুখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়—এই সবই দ্বন্দ্ব। ভগবদ্গীতায় দেখবেন—প্রথম দিকেই কৃষ্ণ বলেছেন—বাপু! নির্দ্বন্দ্ব হতে হবে, দ্বন্দ্বাতীত হতে হবে—শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। মীমাংসক সেই কথাটাই বলেছেন অন্যভাবে, দুঃখ করে—জগতে এমন একটা জায়গা নেই, যেখানে এক মুহূর্তও দ্বন্দ্বহীন নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটবে। অতএব নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য একটা আলাদা জায়গা থাকবেই, আর সেটাই দেবলোক, মানে স্বর্গ।

মুশকিল হল—যে দার্শনিক-মীমাংসক এই মত ব্যক্ত করেছেন, তিনি এমনই বড় মানুষ যে তাঁকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না মোটেই। আর ঠিক সেই জন্যই আর এক মীমাংসক-ধুরন্ধর দুদিক বাঁচিয়ে বললেন—শ্রুতি-স্মৃতি, ইতিহাস-পুরাণে স্বর্গ শব্দের দ্বারা যে অখণ্ড সুখের কথা বোঝানো হয়, সেই সুখ মর্ত্য-লোকে সম্ভব নয়—এমন কথা বলে যদি স্বর্গভূমির মতো সুখের উপযোগী তেমন কোনও বিশেষ স্থান কল্পনাও করে নেওয়া যায়, তবুও কিন্তু এটা অপ্রমাণ হয় না যে—নিরতিশয় সুখই আসলে স্বর্গ। অর্থাৎ মীমাংসক মতে স্বর্গ বলে একটা নির্দিষ্ট সুখ-স্থানের কল্পনা করার প্রয়োজন কিছু নেই, সুখ কিংবা প্রীতিই স্বর্গ বলে মীমাংসকদের সাধারণ সিদ্ধান্ত।

আমরা যে পথে স্বর্গের ঠিকানা দেখাতে চাইছি, তাতে মীমাংসকদের বলা—মনের প্রীতিকর স্থানই স্বর্গ এবং সেটা এই পৃথিবীতেই—অত্রৈব নরক-স্বর্গৌ—এই কথাটা আমার কাছে বড়ই জরুরি। তবে এই কল্পনার সুখস্থানের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট জায়গাও পুরাণ-ইতিহাসের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় কি না সেটাই এখন দেখবার। পরলোক দেব-দেহ লাভ করে স্বর্গসুখ ভোগ করার কথাটা নাই বা মিলল, কিন্তু হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো দেবস্থান বা স্বর্গ বলে এই পৃথিবীতেই কিছু ছিল কি না, সেটা পুরাণকারদের বর্ণনার আনুকূল্য থেকে বোঝাও যেতে পারে হয়তো।

মনে রাখতে হবে—মানুষের যেমন ঘরবাড়ি আছে, দেবতাদেরও তেমনই ঘরবাড়ি আছে। তবে হ্যাঁ, দেবতা বলে কথা, তাঁদের ঘরবাড়ি কি আর সাধারণ খড়ের চালায় কুঁড়ে-ঘরের মতো হবে? বরং ইন্দ্রাদি দেবতার বাসস্থান প্রাচীন কালের রাজা-মহারাজাদের রাজবাড়ির সঙ্গে খানিকটা তুলনীয় হতে পারে।

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র যেখানে থাকেন, সেই সুবিশাল জায়গাটার নাম অমরাবতী—স্বর্গের মধ্যে আরেক স্বর্গ। সেই অমরাবতীর মধ্যে আবার যে প্রাসাদ তার নাম বৈজয়ন্ত প্রাসাদ। তার একপাশে আছে নন্দন-কানন, যেখানে পারিজাত ফুলের সমারোহ। সেই প্রাসাদের মধ্যে ইন্দ্র-সভার বর্ণনা খোদ মহাভারতেই পাওয়া যাবে, যদিও সে বর্ণনা কোনও কল্পিত স্বর্গের ছবি নয়, তার মধ্যে বাস্তবতাও আছে যথেষ্ট।

ইন্দ্রসভার স্থপতি স্বয়ং বিশ্বকর্মা। অনেক জায়গা নিয়ে যে এই সভা তৈরি হয়েছে, কিংবা এটির চূড়া যে হবে খুব উঁচু, সেটা খুব বড় কথা নয়। বড় কথা হল—সভার দুপাশে অনেক ঘর এবং সভায় আসন আছে প্রচুর—বেশ্মাসনবতী রম্যা। এই সভার সু-উচ্চ আসনে ইন্দ্রের পাশে যে ইন্দ্রাণী শচী বসে থাকবেন, সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। বড় কথা হল—এই সভার সভাসদদের মধ্যে আমরা সেইসব মানুষ, মুনি-ঋষিদের দেখছি, মর্ত্যলোকে যাঁদের সব সময় দেখি। পরাশর, পর্বত, দুর্বাসা, যাজ্ঞবল্ক্য—এ রকম বিশিষ্ট মুনির নাম দিয়েই মহাভারতের কবি ইন্দ্রসভার অধ্যায় প্রায় শেষ করে দিয়েছেন। মাঝখানে ক্ষণিকের অতিথির মতো কতগুলি অপ্সরা-গন্ধর্ব আর গায়েন কিন্নরদের কথা এসেছে এবং তা এসেছে নিতান্তই গৌণভাবে। মর্ত্য মুনি-ঋষিদের নামগুলি যেখানে সংখ্যায় এবং ভাস্বরতায় এতই বেশি উজ্জ্বল যে মহাভারতের কবির আশয়টা বেশ খায়। বোঝা যায়, তিনি কোনও অতিলৌকিক বর্ণনা করছেন না, ইন্দ্রসভার মাহাত্ম্যে দিব্যভাব থাকতে পারে, কিন্তু মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে তার বেশ যোগ আছে।

ইন্দ্রসভার পর মহাভারতে যম-সভার বর্ণনা এবং তার বৈশিষ্ট্য হল প্রখ্যাতকীর্তি মর্ত্যের রাজারা, যাঁরা মৃত্যুর পর যম-সভার সদস্য হয়েছেন। যম যেহেতু মৃত্যুলোকের অধিপতি, অতএব তাঁর রূপ-কল্পনা হয়েছে সেইভাবেই; কিন্তু মনুষ্যলোকের বেশিরভাগ রাজাদেরই সেই সভায় দেখতে পাচ্ছি বলে এটাকেও আমি অতিলোক বলে কিছু ভাবছি না। যম-সভার পরেই বরুণ-সভা এবং সবকিছু ছাপিয়ে এই সভার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে নদী-নামের মধ্যে। সিন্ধু, কাবেরী, গঙ্গা-সরস্বতীই শুধু নয়, ভারতের তাবৎ চেনা নদীগুলিকে যদি বরুণ-সভায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন—এমন দেখতে পাই, তবে আমি অন্তত সে সভাকে পৃথিবীর বাইরে কোনও স্থান বলে মানতে রাজি নই।

এরপর আছে কুবের সভা। ধনেশ্বর কুবেরের বাসস্থান কল্পনা করা হয় হিমালয়ে, কৈলাস পর্বতের পাশে। শিব তাঁর সখা। শিবের জটালগ্ন চন্দ্র-শকলের জ্যোৎস্না-ছায়া পড়ে তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণে। কুবের-সভার বৈশিষ্ট্য হল সেখানকার লোকগুলি। সমভূমির মানুষের মতো তাঁদের চেহারা নয়। কবি তাঁদের যক্ষ বলেছেন, রাক্ষস বলেছেন—বলুন। কিন্তু ওই নামগুলি! হেমনেত্রঃ—যদি বলি কটা চোখ! পিঙ্গলকঃ—যদি বলি হলদেটে লালচে গায়ের রঙ। শোনিতোদঃ প্রবালকঃ—যাঁদের গায়ের রঙ কিছু লালচে। পাহাড়ি এলাকার লোক, অতএব মহাভারতের বর্ণনায়—শঙ্কুকর্ণ-মুখাঃ সর্বে। কান, মুখ সব পেরেকের মতো। উপমাটা পেরেকের চেহারায় নয়; সমভূমির মানুষের মতো নয় বলেই এই উপমা।

কিন্তু যক্ষনামের মধ্যে—বৃক্ষবাসী, অনিকেতঃ চীরবাসা—এগুলো কি কোনও নাম? নাকি

AMARBOI.COM

ধনেশ্বর কুবেরের পার্ষদ হয়েও পাহাড়িয়াদের দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে এখানে—গাছের কোটরে থাকে, বাড়ি-ঘর ভাল করে বানাতে পারে না এবং গাছের বাকল পরে। পাহাড়ে চলতে হয় বলেই এদের হাত-পা চলে তাড়াতাড়ি, নিরলস—বাতৈরিব মহাজবৈঃ। আবার আবহাওয়ার কারণে শরীর গরম রাখতে হয় বলেই কুবের-পার্ষদের উপাধি জুটেছে—ক্রব্যাদ, পিশাচ, রাক্ষস এবং এরা ভীষণ রকমের মাংসাশী—মেদোমাংসাশনৈরুগ্রৈঃ উগ্রধন্বা মহাবলঃ। বস্তুত আমি কুবেরের সভাতেও কোনও অলৌকিকতা দেখিনি। তার ওপরে হিমালয়, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, মহেন্দ্র আর কৈলাস পর্বত—যেখানে কুবেরের উপাসনা করছে, সেই কুবের-সভা আমার কাছে খুব অপরিচিত নয়, অতিলৌকিক তো নয়ই।

সবার শেষে নারদের মুখে ব্রহ্মা-সভার বর্ণনা। সমস্ত দেবতা, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর পিতামহ ব্রহ্মার সভায় গতায়াত করছেন—সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা—সেই চেনা-পরিচিত ঋষি মুনি আর নারদের শেষ কথাটি। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, তেমন সুন্দরসভা আমি কোথাও দেখিনি। লোক-দুর্লভ সেই সভা। কিন্তু একটাই তার উপমা আছে। এই তোমার সভাটি যেমন, ঠিক তেমনই সেই ব্রহ্ম-সভা—সভেয়ং রাজশার্দূল মনুষ্যেষু যথা তব। এই শেষ কথার পর ধরে নিতে পারি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ—যিনি যত বড় দেবতাই হোন না কেন, তাঁদের বাড়ি-ঘর রাজসভা সব মানুষের আদলেই তৈরি হয়েছে, কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাটিই একেবারে ব্রহ্মসভার মতো—মনুষ্যেষু যথা তব।

তের

রাগ করবেন অনেকেই। এমন কি রাগ করার সঙ্গত কারণও আছে। এতদিন বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে রয়েছি—ইন্দ্র, যম, বরুণ, ব্রহ্মা—এত বড় বড় সব দেবতা। আর তাঁদের বাড়ি-ঘর নাকি সব আমাদের মতো। এসব অলক্ষুণে কথা বললে কার না রাগ হয়? রেগে গিয়ে বলতেই পারেন—এতক্ষণ বাড়িঘর দেখালে, এবার বলবে—দেবতাদের চেহারাও বুঝি বা আমাদের মতোই।

বলব, হয়তো এই কথাই বলব। কিন্তু আপনারা যে সব গ্রন্থ বা সাহিত্যকে শাস্ত্রের মূল্য দিয়ে থাকেন, তার প্রমাণ দিয়েই বলব। তবে কিনা রাগ আপনাদের হতেই পারে। আজকেই তো নয় শুধু, ব্যাস, বাল্মীকি আর যত পৌরাণিকের দল তাঁদেরও তো দেবতাদের ওপর শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছু কম ছিল না, কিন্তু হাজার শ্রদ্ধা নিয়েও তাঁরা দেবতাদের চেহারা, চরিত্র, ছলনা এমন কি চরিত্রহীনতাও যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা কি কোনওভাবেই মনুষ্য-চরিত্রের বাইরে? আপনারা দেবতাদের করুণায় বিশ্বাস করবেন, তাঁদের অঘটন-ঘটন- পটীয়সী শক্তিতে বিশ্বাস করবেন, তাঁদের ভক্তবশ্যতা স্বীকার করবেন—অথচ তাঁদের মনুষ্যোচিত চেহারা, ভাব-ভঙ্গি অথবা অন্য কোনও রসাবেশ স্বীকার করবেন না—এ কেমন একগুঁয়ে কথা!

তবে ব্যাস-বাল্মীকির ভাগ্য ভাল, তাঁরা এ দেশে জন্মেছেন। আরও ভাগ্য কেন না, হিন্দু-ধর্মের মতো এক বিরাট-বিশাল সর্বংসহ ধর্মের তাঁরা প্রাণদাতা। আমাদের দেশে ব্যাস-বাল্মীকির প্রামাণ্য এবং শ্রদ্ধেয়তা এতই বেশি যে, যাঁরা তাঁদের ধর্ম বা ঈশ্বরানুসন্ধান মানেন না, তাঁরাও কিন্তু এই দুই মহাপুরুষকে সমালোচনার আগে এবং পরে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন না। আমার ধারণা, এই দুই ঋষি যদি পৃথিবীর মধ্য-মরুভূমিতে জন্মাতেন, তবে তাঁরা জীবৎকালেই মহাভারতের আদিপর্ব এবং রামায়ণের বালকাণ্ড লিখেই অকালে যমদণ্ড লাভ

করতেন। আর যদি অন্য দুটি প্রাচীন দেশ গ্রিস কিংবা রোমে এঁদের জন্ম হত, তবে একেবারে প্রাণে না মারা পড়লেও এঁদের চড়-চাপাটি খেতে হত নির্ঘাত।

যদি বলেন—কী হলে কী হতে পারত—এসব কথা আমার প্রথমোক্ত দেশ সম্বন্ধে অনালোচ্য, তো ঠিক আছে, সেটা আলোচনার বাইরে থাকাই শ্রেয়। কারণ অনুমানযোগ্য। কিন্তু গ্রিস-দেশীয়দের সম্বন্ধে আমার অনুমান আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। এসব কথা আমি অন্যত্র কিছু লিখেছি, কিন্তু পাঠকের একাংশ আমাকে সাভিমানে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন—কোথায় কী লিখেছেন মশায়! ওসব 'রেফারেন্স' জানতে চাই না, পাঠক হিসেবে আমরা কী এইটুকু একসঙ্গে পেতে পারি না? অতএব আমি নাচার।

তাছাড়া গ্রিস-দেশীয় সেই দার্শনিকের কথা আমায় আরও একবার তুলতেই হত, কারণ তাঁর রাগও ঠিক আপনাদের মতোই। অর্থাৎ আপনাদের রাগ যে কারণে, তাঁরও রাগ সেই কারণেই। পৃথিবীর অনবদ্য আরেক মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসির নাম আপনাদের জানাই আছে। সেই মহাকাব্যের লেখক হোমার যেহেতু দেবতাদের চেহারা, চরিত্র, চরিত্রহীনতা, মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য এবং করুণা—সবই বর্ণনা করেছেন; অতএব দার্শনিকেরা অনেকেই তাঁর ওপরে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন—ওসব 'বক্‌বকানি, মক্‌মকানি তাও কবিত্বের ভাব-মাখা'; হোমার যা করেছেন, তার একমাত্র শাস্তি তাঁকে বেতিয়ে সোজা করা। আর শুধু হোমারই নয়, তাঁর ভাব-শিষ্য আর্চিলোকাস্‌কেও ধরে বেত মারা উচিত—Homer should be whipped and Archilochus likewise.

সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশে যাঁরা পরম উপাস্য তত্ত্বকে কোনও সাকার সবিশেষ বাঁধনে বাঁধতে চান না, তাঁরা পর্যন্ত কেউ ব্যাসদেবকে বেতিয়ে সোজা করার কথা বলেননি। এমন কি দার্শনিক স্থিতিতে যাঁরা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধবাদী, তেমন বৌদ্ধ দার্শনিকেরা পর্যন্ত মহাভারতের কবিকে এমন হেনস্থা করেননি। আর যদি শঙ্করাচার্যের মতো অদ্বৈতবাদী তার্কিক-ধুরন্ধরকে প্রশ্ন করেন, তবে তিনি হয়তো সেই পরম তত্ত্বকে নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ বলে প্রায় বৌদ্ধদের শূন্যের পর্যায়ে ফেলে দেবেন, কিন্তু কদাপি ব্যাস-বাদরায়ণকে পেটানোর প্রস্তাব দেবেন না। নিন্দুকেরা বলে—শঙ্কর নাকি একদিকে ব্রহ্মকে নিরাকার-নির্বিশেষ বলেছেন, আর আমজনতার সুখের জন্য ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা করে লুকিয়ে লুকিয়ে হরি-হর-ভবানীর অপূর্ব স্তোত্র রচনা করেছেন। অধিকতর পণ্ডিতেরা অবশ্য বলেন—শারীরিক ভাষ্যকার শঙ্কর এক লোক, আর স্তোত্রকার শঙ্কর আরেক লোক। এসব অবশ্য সেই প্রক্ষিপ্তবাদীদের জ্ঞান-প্রপঞ্চ, যাঁদের পড়তে হয়েছে অনেক, কিন্তু বুঝতে হয়েছে কম।

যাক এসব কথা, আমাদের দেশের ঠাকুর-দেবতার হাত-পা না থাকলে চলে না, ভাল করে মিষ্টি করে ডাকলে, তাঁদের বৈকুণ্ঠ কি স্বর্গ থেকে পড়ি-মরি করে ছুটে আসতে হয়। আর ভাব-ভালবাসার ক্ষেত্রে তো তাঁকে আমার যত প্রয়োজন, আমাকেও তাঁর ঠিক ততটাই প্রয়োজন। পঙ্কজ মল্লিকের সানুনাসিক অনবদ্য কণ্ঠ প্রসঙ্গত স্মরণীয়—তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে, তুমি তাই এসেছ নীচে ইত্যাদি। আমাদের দেশে চরম সাধনা করে কেউ যদি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে যাবার বর লাভ করেন, অথবা কেউ যদি ঈশ্বরের সমান আকৃতি লাভ করার বর লাভ করেন, তাহলে সেই বর অনেকে নিতে চান না, তা জানেন? তাঁরা বলেন, ধুচ্ছাই, মুক্তি দিয়ে আমি কী করব, ঠাকুরের সঙ্গে মিশে গিয়ে কী আনন্দটা হবে আমার?

AMARBOI.COM

মা গো! নির্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায়ে জল,
চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
তিনি খেতে ভালবাসি।

আমাদের ঠাকুর-দেবতা হলেন চিনি। স্পষ্ট গোটা গোটা পরিষ্কার চেহারা, রূপ আছে, রঙ আছে, স্বাদ আছে। হাত-পা-ওয়ালা রূপী, গুণী, রসিক ঠাকুর চাই আমাদের। ঘরের মধ্যে যোগে বসে জ্যোতিঃস্বরূপকে জেনে যাঁরা মুক্তি লাভ করছেন, করুন,—কিন্তু সে মুক্তি রামপ্রসাদ চান না—দেখলেনই তো। আবার বৈষ্ণবদের কথা বলুন, তাঁরা আরও কড়া। চৈতন্যপন্থীরা হেসে বলেন, আমাদের ঠাকুর আমাদের যদি সেধেও মুক্তির বর-দান করেন, তবে আমরা নিই না, আমরা ওই ধরনের বর সাধারণত প্রত্যাখ্যান করে থাকি। স্বয়ং ভগবানও এটা জানেন, তাই তিনি নাকি নিজেই ভাগবত পুরাণে কবুল করেছেন যে—ওদের মুক্তি দিতে চাইলেও ওরা নেবে না, কী সাংঘাতিক! ওরা খালি আমাকে চায়। আমাকে দেখতে চায়, আমাকে কাছে পেতে চায়, আর কাজ-কর্ম করে দিতে চায়—দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

শাক্ত গেল, বৈষ্ণব গেল, এবার শৈবের কথা শুনবেন? তাহলে একটা শ্লোক বলতে গিয়ে আমাকে রীতিমতো একটা ছোট্ট গল্প বলতে হবে—শ্লোকের গল্প। এই শ্লোকটি আছে মোটামুটি কঠিন একটি সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থে। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ আলংকারিক মম্মটাচার্য তাঁর কাব্যপ্রকাশের মধ্যে একটি অলংকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে এক শৈব-ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। শ্লোকটি বলার আগে জানাই—এই শিব-ভক্ত সাধুটি স্বাভাবিক কারণেই রুদ্রাক্ষমালা পরেন গলায়। গায়ে ভস্ম মাখেন, আর তাঁর আরাধ্য দেবতা শিব যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেই শিব-মন্দিরের সিঁড়িগুলি তিনি সযত্নে মুছে দেন প্রতিদিন।

কিন্তু একদিন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। আশুতোষ শিব তাঁর ভক্তের সেবা-পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুক্তির-বর দান করে বসলেন। শিব সোজা-সরল ভোলেভালা মানুষ, তিনি জানেন—মোক্ষের জন্যই লোকে এত সাধ্যি-সাধনা, উপাসনা করে। অতএব ভক্তটিকে তিনি কোনও প্রশ্ন-ট্রশ্ন না করে লোক-দুর্লভ মুক্তির বর দিয়ে পূর্বাহ্নেই আপ্লুত করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ভক্তটি সে-রকম নয়। মোক্ষ-লাভ করে সে পরমানন্দে 'শিবো'হং শিবো'হং' করে মোটেই জলদ-গম্ভীর স্বরে কথা কয়ে উঠল না। উলটে সে একটু রেগেই গেল। যদিও পরমারাধ্য দেবতা তাঁকে বর দিয়েছেন এবং বরও লৌকিক দৃষ্টিতে বড় সুলভ নয়, অতএব তাঁর ক্রোধ এবং ক্ষোভ অভিমানে পরিণত হল।

দেখা গেল—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর পূর্ব-পরিচিত উপাসনার সাধনগুলির সঙ্গে সে সাভিমানে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। গলার রুদ্রাক্ষ মালাটি—যা তাঁকে এতকাল শিব-সাধনার প্রেরণা জাগিয়েছে, সেই মালাটি সে খুলে ফেলেছে গলা থেকে। গায়ের যে ভস্মরাগ, সর্বাঙ্গে যে বিভূতি তাঁকে এতকাল বৈরাগ্যের অনুভূতি দিয়েছে, সেই অতি-পরিচিত অচেতন পদার্থটিকে সে বিদায় জানিয়ে বলে—ছাইভস্ম আমার! এতকাল কত ভক্তিতে প্রতিদিন তোমাকে গায়ে মেখেছি বৈরাগ্যের সাধন হিসেবে। কাল থেকে আর তোমার প্রয়োজন থাকবে না, বিদায় তোমাকে, চিরবিদায়। তোমার ভাল হোক। ভাই রুদ্রাক্ষ-মালা! এতকাল শিব-মন্ত্র জপ করার সময় কত শক্তি জুগিয়েছ তুমি, রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করার সঙ্গে

সঙ্গেই যেন শিবের উদ্ভাস জেগে উঠত মনে—বিদায় ভাই, আর তোমার কোনও প্রয়োজন নেই আমার কাছে। তোমার মঙ্গল হোক। আমি মোক্ষলাভ করেছি—ভস্ম, মালা—এসব এখন মূল্যহীন, বৃথা। —ভস্মোদ্ধূলন ভদ্রমস্তু ভবতে রুদ্রাক্ষমালে শুভম্।

সবার শেষে শিব-মন্দিরের শুভ্র-শীতল সোপানগুলি দেখে এই ভক্তের প্রাণ একেবারে কেঁদে উঠল। মনের গভীর থেকে তাঁর আর্তি বেরিয়ে এল—হা সোপান-পরম্পরাং গিরিসুতাকান্তালয়ালংকৃতিম্। কী রকম সে সোপান—যা নাকি হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর ভালবাসার ধন যে শিব, তাঁর বাস-গৃহের অলংকারের মতো। হায় সেই সোপানাবলি! বিদায়, আর সেই শিব-মন্দিরের সোপানগুলিকে পরিমার্জনা করার কোনও দায়ই রইল না আমার।

যদি সেই ভস্ম, সেই সোপান-পংক্তি আর রুদ্রাক্ষমালা একযোগে প্রশ্ন করে বলে—কেন বাপু! আজ থেকে তোমার এই নির্বিকার ভাব কেন? শিবভক্ত শৈব তাতে রেগে যায়, ক্ষোভে সে বলে—এই দেখ না। প্রভু কত খুশি হয়েছেন আমার আরাধনায়, উপাসনায়। তিনি বড় সুখী হয়ে আমাকে মোক্ষলাভের বর দিয়েছেন। কী রকম সে মোক্ষ? শৈব বলে—অন্যের কাছে তা যত বড়ই হোক আমার কাছে তা এক মহা অন্ধকারের নামান্তর। আরও এক মহামোহের প্রতিরূপ? আরও এক বিপন্ন বিস্ময়। কেন কেন? এমন বলছ কেন? মোক্ষকে কেউ কী অন্ধকার বলে? শৈব এবার আপন দুঃখের কথাটা বলে—হায়! যে শিবের সেবা করার জন্য আমি গায়ে ভস্ম মাখতাম, রুদ্রাক্ষ-মালা পরতাম, প্রতিদিন সযতনে মুছে দিতাম শ্বেত-শুভ্র মন্দিরের সোপান-পংক্তি, সেই তোমার সেবা করার আনন্দটুকু যে ছিন্নভিন্ন করে দিল এই মোক্ষের অন্ধকার—আমি এমনটি চাইনি। তুষ্ট হয়ে এ তুমি আমায় কী দিলে প্রভু—যুস্মৎ-সপর্যাসুখাল/লোকচ্ছেদিনি মোক্ষনামনি মহামোহে নিধীয়ামহে। এই শিবভক্তটি কী চায়, তা শুধু একটি পংক্তির ব্যঞ্জনায় এই কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সোপানপংক্তির বর্ণনায় সে বলেছিল— গিরিসুতাকান্তালয়ালংকৃতিম্—শৈলদুহিতা পার্বতীর ভালবাসার ধন যে শিব তাঁর মন্দির সোপান। অর্থাৎ এই শৈব শিব-পার্বতী ভালবাসাটা বোঝে। সে এই ভালবাসা না চাইলেও শিবের ভৃত্য হওয়ার সুখটুকু চায়। মোক্ষ-লাভে সেই শিব-পরিচর্যা-সুখের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শিবভক্ত এখন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত।

বৈষ্ণবদের কথা স্বল্পমাত্র বলেই আমি শেষ করছি, বস্তুত রসিক শেখর কৃষ্ণের নিত্যসেবার সুখ আর লীলা-মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য বৈষ্ণবদের যে আকুতি আছে, তার বিবরণ দিতে গেলে মহাভারত-কথার অর্ধেকই তাতে চলে যাবে। বরং শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের উদাহরণ দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইলাম, সেটা হল—সাধারণ দেবতার কথা ছেড়েই দিলাম, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের ক্ষেত্রেও মনুষ্যোচিত হাব-ভাব, রসবত্তা আমাদের প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে। আমাদের দেশে সর্বশক্তিমান দেবতাপুরুষেরও জন্ম আছে, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এমন কি মৃত্যুও আছে এবং এই মনুষ্যোচিত রূপকার কিন্তু ব্যাস-বাল্মীকি এবং পৌরাণিকেরাই।

উপনিষদের মধ্যে যে অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ আমরা জেনেছি, তাঁকে স্বরূপত সেই রকম জেনেও যে কোনও মুহূর্তে তাঁকে আমার রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, শিব কিংবা উমা হৈমবতীর সাকার রূপ দিতে আমাদের অসুবিধে হয়নি এবং তাঁদের জন্ম-মরণের কল্পনা করতেও আমাদের হৃদয় কম্পিত হয়নি। তার কারণ, আমরা যতখানি দার্শনিক, তার চেয়েও বেশি ভাবুক-রসিক। রসবত্তা আর দার্শনিকতা একই হৃদয়ে থাকার ফলেই বেদব্যাস কিংবা বাল্মীকিকে আমাদের অতি সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকেরাও কেউ চাবুক মারার সাহস দেখাননি। আবার অন্যদিকে মহাকাব্যের কবিকেও দার্শনিকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলতে হয়নি—বাপু হে!

AMARBOI.COM

তোমরা যা করছ, এ শুধুই তর্ক, শুধুই যুক্তি, হৃদয়ের কাছে এর কোনও আবেদন নেই। বলতে হয়নি এসব কথা। আর বলতে হবেই বা কেন? আমাদের কবিরা মূলত দার্শনিক, আবার দার্শনিকেরাও মূলত কবি। এই পারস্পরিক পরিপূরণ এমনি-এমনিই তাঁদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং তার কারণ, আমাদের চরম সূক্ষ্ম যে ব্রহ্মতত্ত্ব—তিনি একদিকে অদ্বৈত এবং বিজ্ঞানস্বরূপ অন্যদিকে তিনি রসস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। একদিকে তাঁকে বলতে হয়—'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' অন্যদিকে তাঁকে বলতে হয়—'এষ আত্মা সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ' ইত্যাদি। এ দেশে একদিকে আপনারা যেমন শঙ্করের মতো সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকের মুখে হরি-হর-ভবানীর স্তোত্র শুনবেন, অন্যদিকে দেবতার গল্প-বলা বেদব্যাসের মুখে অদ্ভুত এক কবিতা শুনবেন।

কবিতাটা মহাভারতে নেই, তবে বেদব্যাসের নামেই এ কবিতা চলে, যেমন চলে শঙ্করাচার্যের মুখে হরি-হর-ভবানীর স্তোত্র। ব্যাস বলছেন, ক্ষমা কোরো প্রভু! ক্ষমা কোরো আমাকে। আমি তিনটে বড় দোষের কাজ করে ফেলেছি, প্রভু! তুমি আমায় ক্ষমা করে দিয়ো—ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্-বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্। মুনি-কুলের তিলক বেদব্যাস, তিনি কী দোষ করেছেন এমন, যার জন্য শেষ জীবনে এসে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে তাঁকে? ব্যাস বলছেন, দোষ করেছি তিনটে। প্রথম দোষ—তুমি নীরূপ, নিরাকার। মানুষের আপন সৃষ্ট কোনও রূপের মধ্যে তোমাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু তবু আমি ধ্যানযোগে সেই অনন্ত-রূপ-নীরূপ ঈশ্বরের রূপ-কল্পনা করেছি—রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতঃ ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্। আমার দ্বিতীয় দোষ—তুমি সর্বব্যাপী, বিভু। কিন্তু নানা তীর্থস্থানের মধ্যে তুমি জাগ্রত আছ—এই রকম তীর্থ-মাহাত্ম্য কল্পনা করে আমি তোমার সেই বিভুত্ব, ব্যাপিত্ব নষ্ট করে দিয়েছি। যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে যিনি তৃণ-তরুময় স্থলেতে, সেই বিশাল-ব্যাপ্ত সত্তাকে আমি সীমিত করে ফেলেছি কতগুলি তীর্থস্থানের চতুঃসীমার মধ্যে। আর আমার শেষ এবং তৃতীয় দোষ—তুমি অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য-স্বরূপ। শব্দ-অর্থ-অলংকার, আর ভাষা ছন্দে তোমাকে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু পরম ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি রচনা করে শব্দের গৌরব-সীমায় তোমাকে যে আমি বেঁধে ফেলেছি, এতে তোমার অনির্বচনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমার এই তিনটে দোষ তুমি ক্ষমা করে দিও, প্রভু।

দেখুন, অরূপ, অব্যয়, অসীম, অনির্দেশ্য ব্রহ্ম-স্বরূপকে কৃষ্ণের রূপে, শিবের রূপে, দুর্গার রূপে বেঁধে ফেলার জন্য পৌরাণিক ব্যাসকে যেমন ক্ষমা চাইতে হচ্ছে, তেমনই শঙ্করাচার্যেরও এমনই ক্ষমা চাওয়ার কথা—তিনি ওই একই কাজ জেনেশুনে করেছেন বলে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ব্যাস এবং শঙ্কর পরস্পরের প্রতিপূরক। কারও সঙ্গে কোনও বিরোধই নেই। তবে ব্যাস যা করেছেন, বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে কৃষ্ণ, শিব, দুর্গার জন্ম-মরণ পর্যন্ত দেখিয়ে তিনি যা করেছেন, তাতে অন্য কোনও দেশে জন্মালেও তাঁর মহা-বিপদ হত।

প্রাক্-সক্রেটিস যুগের দার্শনিক জেনোফেনিস্ ছিলেন নিজের কালের মহান পণ্ডিত। ভগবানের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা প্রায় ঔপনিষদিক। ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাঁর অতি উচ্চ ধারণা ছিল এবং এই পৃথিবীর নানান সৃষ্টি-বিষয়ে ঈশ্বরের করুণা-স্পর্শ তাঁকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করত। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নির্ভরতা এতটাই যে, তিনি ভাবতেন—ভগবান যদি এই পৃথিবীতে মধু সৃষ্টি না করতেন, তাহলে লোকে ডুমুর গাছ কিংবা বটের ফলকেই অনেক বেশি মিষ্টি বলে ভাবত—If God had not made yellow honey, men would consider figs far sweeter. এ হেন জেনোফেনিস্ যখন দেখলেন—হোমার-হেসিয়ড অন্তরীক্ষ-লোকের দেবতাদের নানা কুকীর্তি, বঞ্চনা, ছলনার কথা লিখে মহাকাব্য রচনা করেছেন এবং সুধী-জনতা

সে লেখা পড়ে বিমলানন্দ লাভ করছেন, তখন তিনি আর থাকতে পারেননি। রাগে ক্ষোভে তিনি বলে উঠেছেন—এ কী অসভ্যতা? দেবতারা কি সব মানুষ নাকি? দেবতারা কি এতই ক্ষুদ্র-সত্ত্ব যে, মানুষের সমাজে যা লজ্জাকর এবং ঘৃণ্য—সেইসব চুরি-জোচ্চুরি, ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্য সব বৃত্তি দেবতাদের ওপর চাপিয়ে হোমার একটা মহাকাব্য লিখে ফেললেন। আর হেসিয়ড 'থিওগনি' লিখে খুব নাম কিনলেন?

জেনোফেনিস্ হোমার-হেসিয়ডকে নিতান্ত মূর্খের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়ে নাম না করে মন্তব্য করেছেন—সাধারণ লোকেরা ভাবে—দেবতাদের বুঝি জন্ম হয়, তাঁরা বুঝি মানুষের মতোই জামা-কাপড় পরেন, অথবা দেবতার আকৃতি বা মুখের ভাব বুঝি মানুষের মতোই হবে। মানুষেরা কেন নিজেদের মতো করে দেব-কল্পনা করে তার একটা যুতসই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন জেনোফেনিস্। তিনি বলেছেন—এই যে ইথিওপিয়ানরা বলে—তাদের দেবতারা নাকি নাক-খাঁদা আর তাঁদের চেহারা নাকি কালো-কোলো, তার কারণ ওরা নিজেরাই নাক খাঁদা আর কালো। আবার অন্যদিকে থ্রেসিয়ানরা যে বলে—তাদের দেবতাদের চক্ষু দুটি নাকি হালকা নীল আর চুলগুলি নাকি লাল—তার কারণ, ওদের নিজেদের চোখই নীল আর চুলগুলি লাল।

দুটি উদাহরণ দেওয়ার পর জেনোফেনিস্ ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করেছেন—তা ইথিওপিয়ান, আর থ্রেসিয়ানদের দোষ কী দেব? গোরুরা যদি আর্টিস্ট হত, আর মানুষ যা করে তা যদি গোরুরাও করতে পারত, তাহলে গোরুরা দেবতার ছবি আঁকত গোরুর আদলেই। আর যদি ঘোড়া বা সিংহের মনুষ্যোচিত ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঘোড়ারা দেবতার ছবি আঁকত ঘোড়ার আদলে, আর সিংহেরা সিংহের আদলে—But if cattle and horses or lions had hands, or were able to draw with their hands and do the works that men can do, horses would draw the forms of the Gods like horses and cattle like cattle, and they would make their bodies such as they each had themselves.

আর বাকি কী রাখলেন জেনোফেনিস্? হোমার-হেসিয়ডকেও তিনি নিশ্চয় ওই গোরু-ঘোড়ার পর্যায়েই ফেলে দিয়েছেন। আমার ভয়—আমাদের ব্যাস-বাল্মীকি যদি এই গ্রিক-দেশীয় কঠিন মানুষটির হাতে পড়তেন, তা হলে তাঁদের কী বেগতিকই না হত! সে যাই হোক, জেনোফেনিস্ যত কড়া মন্তব্যই করুন, অন্তত দার্শনিক সূক্ষ্মতার ক্ষেত্রে আমাদের সাংখ্য-বেদান্ত বৌদ্ধদের ধারেকাছে যে তিনি যেতে পারবেন না, সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। এই হলফ-নামা করার পর আমার দায়িত্ব আছে যৎ-সামান্য। আমি ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবানের কঠিন তত্ত্বের মধ্যে আর একটুও যাব না এবং এই তত্ত্বকে কী চোখে আমরা দেখি তা আগেই সামান্য বলেছি। আমরা এখন শুধু ইন্দ্র-বায়ু ইত্যাদি দেবতা এবং অসুর-রাক্ষসদের সামাজিক স্থিতিটা সংক্ষেপে বলে দিয়েই জনমেজয়ের সভায় বসে মহাভারতের কথা শুনব। এ কথা আগেই বলব, কারণ পরবর্তী সময়ে সূর্য, ইন্দ্র, বায়ুর মতো দেবতার ঔরস থেকেই আমরা পাণ্ডব-ধুরন্ধরদের জন্মলাভ করতে দেখব। আবার অসুর-রাক্ষসদের বিচারও একটু করব, কারণ আর্য-শক্তির গৌরবে ভীম-পুত্র ঘটোৎকচের জন্মটাও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। অতএব আর সামান্যতম ধৈর্য ধরলেই—উপাখ্যান আর ইতিহাসে ডুবে যাব আমরা।

চৌদ্দ

মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যাবে—দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে ইন্দ্রের দেখা হয়েছে। অবশ্য দেখাটা খুব সহজে হয়নি, অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর পরেই দেবতাদের রাজার সঙ্গে দৈত্যদের রাজার এই একান্ত শান্ত সাক্ষাৎকার ঘটেছে। দেবাসুরের যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, পরস্পর ধেয়ে যাওয়া নেই, একেবারে শান্ত সাক্ষাৎকার। তবে এই কথার আগে দু'টো কথা আছে। প্রথমেই জানাই, আবারও মনে রাখবেন—'ইন্দ্র' নামের মধ্যে যতখানি দেবত্ব আছে, তার থেকে বেশি আছে 'রাজত্ব'। অর্থাৎ ইন্দ্র একটা উপাধি মাত্র। ইহলৌকিক এবং প্রাক্তন পুণ্যবলেই 'ইন্দ্র' হওয়া যায়। অসুর-রাক্ষসও এই ইন্দ্র হতে পারেন, মানুষও হতে পারেন ইন্দ্র। তবে কিনা একবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলে তাঁর যেমন আর নাম থাকে না, শুধু 'পি এম' আসছেন, 'পি এম' বলছেন—এই রকম একটা ব্যাপার ঘটে যায়, অপিচ প্রধানমন্ত্রিত্ব চলে গেলেও যেমন তাঁর পুরনো তকমাটা যায় না, ইন্দ্রের ব্যাপারও খানিকটা সেইরকম। এই মুহূর্তে যে দৈত্যকুলতিলক বলি-রাজার সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের দেখা হবে, সেই বলি-রাজার বংশে অন্তত তিনজন ইন্দ্র আছে। পৌরাণিকেরা জানিয়েছেন—দৈত্য-কুলে পরপর তিন পুরুষ ধরে যাঁদের ইন্দ্রত্ব লাভ করার ইতিহাস আছে, সেই বংশে এই বলি-রাজার জন্ম।

সেই দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎকারের পটভূমিকা এইরকম। দেবরাজ ইন্দ্র শক্তি লাভ করে তখন সমস্ত দৈত্যকে স্বর্গ থেকে হটিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং দৈত্যরাজ বলি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। সিংহাসনে আসীন অবস্থায় বলির সঙ্গে দেবরাজের দু-একবার যে সাক্ষাৎ হয়নি, তা মোটেই নয়। কিন্তু দৈত্যরাজের ক্রিয়া-কর্ম, বৃত্তি তথা লোক-ব্যবহার সম্বন্ধে ইন্দ্রের যতটুকু বোঝা আছে, তার থেকে না-বোঝার অংশ বেশি এবং সেই কারণে বলির সম্বন্ধে কৌতূহলও তাঁর কম নয়। তা ইন্দ্রের এখন সুখের সময়, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে

পৌঁছলেন, মনে ইচ্ছা—দু'দণ্ড গল্পও করবেন, স্বর্গজয়ের সুখ-সংবাদও দেবেন, আর দৈত্যরাজ বলির সম্বন্ধে দু'টো প্রশ্নও করবেন, কারণ, বলির সঙ্গে ব্রহ্মার যোগাযোগও কিছু কম ছিল না।

ইন্দ্র ব্রহ্মাকে বললেন, পিতামহ! এই দৈত্যরাজ বলিকে আমি ঠিক চিনতেও পারছি না, বুঝতেও পারছি না। ব্যাপারটা কী, একটু বুঝিয়ে বলুন তো—তং বলিং নাধিগচ্ছামি ব্রহ্মন্নাচক্ষব মে বলিম্। বলি এত দান-ধ্যান করত, এত তার সহায়-সম্পদ, অথচ এখন তার কী অবস্থা, তা কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।

আসলে ইন্দ্র তাঁর স্বর্গের সিংহাসন লাভ করার পরেও বলির প্রভাব ব্যাপ্ত দেখেছেন সর্বত্র। ব্রহ্মাকে তিনি বলেওছেন যে মনে হচ্ছে, বলিই যেন বায়ু হয়ে চারদিকে বইছেন, বলিই যেন বরুণ হয়ে জলে আছেন, সূর্য-চন্দ্রের প্রখর-মৃদুল কিরণমালায় তাঁরই জ্যোতি যেন ফুটে বেরচ্ছে—স বায়ুর্বরুণশ্চৈব স রবিঃ স চ চন্দ্রমা। এই যে অগ্নি, বায়ু, সূর্য-চন্দ্রের মধ্যে ইন্দ্র বলিকে দেখতে পেলেন এটাই দৈত্যরাজ বলির প্রভাব এবং ব্যাপ্তি। এই প্রভাব বলির সিংহাসন-চ্যুতির পরেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে—অধিকারী শাসক হিসেবে তিনি এতটাই বড়। ইন্দ্র তাই ব্রহ্মার কাছে ছুটে এসেছেন—বলির ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিন তো, পিতামহ। তিনি এখন কোথায় কীভাবে রয়েছেন?

ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন—বলির অবিচ্ছিন্ন প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যাপারে দেবরাজ ইন্দ্রের রীতিমতো ঈর্ষা আছে। উত্তর দেওয়ার সময় ইন্দ্রকে সে কথাটা না বুঝতে দিলেও ব্রহ্মা একটু কড়া করেই বলেন, কাজটা তুমি ভাল করলে না, দেবরাজ! বলি কোথায় কীভাবে রয়েছেন—সেটা জিজ্ঞাসা করে তুমি ভাল কাজ করলে না—নৈতত্তে সাধু মঘবন্ যদেনমনুপৃচ্ছসি। যাই হোক, জিজ্ঞাসা যখন করেছ, তখন মিথ্যা বলব না। একটি শূন্য গৃহ যেখানে কেউ থাকে না, এমন জায়গায় বলি রয়েছেন। কিন্তু তাঁর চেহারাটা আর দৈত্যরাজের মতো নেই। একটি খালি বাড়ির ভিতর তিনি উট, ষাঁড়, ঘোড়া অথবা গাধা—এদের যে কোনও একটির রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বলির করুণ অবস্থা শুনে ইন্দ্র বললেন, যদি কোনও রিক্ত-নির্জন বাড়িতে আমার সঙ্গে বলির দেখা হয়ে যায়, তবে আমি কি তাঁকে মেরে ফেলব পিতামহ? ব্রহ্মা এই আশঙ্কাই করছিলেন। তিনি বললেন, বলির ওপর একেবারেই কোনও হিংসা আচরণ কোরো না দেবরাজ! বলি কিন্তু হত্যার যোগ্য নন মোটেই—মাস্ম শক্র বলিং হিংসীর্ন বলির্বধমর্হতি। বরং যদি পার তো তাঁর কাছে ন্যায়-নীতির উপদেশ শুনতে চেয়ো কিছু।

ইন্দ্র রাজকীয় মর্যাদায় ঐরাবতে চড়ে বলিকে খুঁজতে চললেন পৃথিবীতে। এক জায়গায় তাঁর দেখাও মিলল, লোকপরিত্যক্ত এক শূন্য গৃহে বলি একটি গাধার রূপ ধারণ করে বাস করছেন। আমার মতে—এই গাধার ছদ্মবেশ কিছুই নয়। দৈত্যরাজ বলি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। অতএব দেবতাদের ফাঁকি দেবার জন্য অত্যন্ত দীন-হীন বেশে মূর্খের ভাব-বিকার দেখিয়ে একটি লোক পরিত্যক্ত গৃহে বাস করছিলেন বলি। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হল একান্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে।

ইন্দ্র খোঁটা দিলেন প্রথমেই। বললেন, দানবরাজ! আপনি যে পুরো গাধা হয়ে রয়েছেন, আর গাধারা যেমন তুষ খায়, আপনিও তো তেমন তুষই খাচ্ছেন। সত্যি করে বলুন তো, আপনার খারাপ লাগে না? কষ্ট হয় না—ইয়ং তে যোনিরধমা শোচস্যথ ন শোচসি? আর এ কী জঘন্য অবস্থা হয়েছে আপনার? কী দুরদৃষ্ট? শত্রুরা এখন আপনার মাথার ওপর।

AMARBOI.COM

রাজলক্ষ্মী অন্যের কণ্ঠলগ্না। বন্ধু-বান্ধব সহায় কেউ নেই। আপনার পরাক্রম এবং উৎসাহও কিছু দেখছি না।

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলেছিলেন—বলিকে হিংসা কোরো না। তাঁর কাছ থেকে বরং নীতিশাস্ত্রের উপদেশ শুনো। কিন্তু চিরকালের শত্রু যখন বিপদে পড়ে, তখন কি তাকে একটু কথা না শুনিয়ে পারা যায়, নাকি নিজের হর্ষোল্লাসই বা চেপে রাখা যায়! ইন্দ্রও তাই কথা শোনাচ্ছেন বলিকে। ইন্দ্র বললেন, এককালে আপনার আত্মীয়-স্বজনেরা হাতি-ঘোড়ায় চড়ত আর সব সময়েই আপনাকে ঘিরে রাখত। আপনি নিজের প্রতাপে সমস্ত লোককে অভিভূত করে রাখতেন, আর আমাদের তো গণনার মধ্যে আনতেন না—লোকান্ প্রতাপয়ন্ সর্বান্ যাস্যস্মান্ অবিতর্কয়ন্। এসব কি আপনার মনে পড়ে? দৈত্য-দানবরা এক সময়—আপনি কখন কী আজ্ঞা করেন, তা পালন করার জন্য মুখিয়ে থাকত। আপনার রাজ্য পালন করার মর্যাদাও তো কিছু কম ছিল না। এমনই আপনার মহিমা যে, হাল চাষ না করলেও জমিতে শস্য ফলত আপনার প্রভাবে। সে সব এখন কোথায়? এখন এই সমুদ্রের পূর্বতীরে পরিত্যক্ত শূন্যগৃহে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি তুষ খেয়ে যাচ্ছেন। আপনার কষ্ট হয় না বলিরাজ—শোচসি আহো ন শোচসি?

ইন্দ্র এবার 'দেবরাজ ইন্দ্রে'র প্রতি তুলনায় বলির মনে আঘাত দিয়ে বললেন, কী দিন ছিল আপনার! আপনি যখন আত্মীয়-স্বজনদের ধন দান করতেন, তারা যখন আপনাকে ধন্যধ্বনি দিত, তখন কেমন লাগত আপনার—তদাসীত্তে মনঃ কথম্? কেমন লাগত—যখন দারুণ সেজেগুজে স্বর্গের বিলাস-ভবনে গিয়ে বসতেন, আর শত শত স্বর্গসুন্দরীরা, সালংকারা দেবরমণীরা আপনার সামনে ঝুমুর নাচত—নৃত্যন্তু দেবযোষিতঃ—তখন কেমন লাগত আপনার? আচ্ছা, আপনার সেই সোনার ছাতাটাই বা কোথায় গেল, হিরা-পান্না খচিত সেই সোনার ছাতাটা, যেটা আপনার মাথার ওপর ধরা থাকত সব সময়? সেই সোনার পানপাত্র? ভৃঙ্গার-ভরা সুবাসিত বারি? সেই চামর দু'টি? স্বয়ং ব্রহ্মার দেওয়া সেই মালাটা? কিছুই তো দেখছি না, বলিরাজ—ব্রহ্মদত্তাঞ্চ তে মালাং ন পশ্যাম্যসুরাধিপ।

দানবরাজ বলি অনেকক্ষণ ধরে ইন্দ্রের পিত্তি-জ্বলানো কথাগুলি শুনলেন। সাময়িকভাবে একটু রাগও হল তাঁর। একটু রাগের নিঃশ্বাসও পড়ল। কিন্তু বলি ধৈর্য হারালেন না। বরং একটু মজা করেই বললেন, আমার পানপাত্র, সোনার ছাতা, চামর-দু'টি, এমনকি সেই ব্রহ্মদত্ত মালাটাও তুমি এখন দেখতে পাবে না, দেবরাজ। সব গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। সময় যখন আসবে, তখন টুক্-টুক্ করে সব বার করব, তখন দেখবে—যদা মে ভবিতা কালস্তদা ত্বং তানি দ্রক্ষ্যাসি। এখন আমার সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি সব গেছে, আর আপনার হয়েছে বাড়-বাড়ন্ত, কিন্তু তাই বলে আপনি যেমন হাম্‌বড়াই করছেন—এটা আপনার বংশ এবং যশ—কোনওটার সঙ্গেই খাপ খাচ্ছে না।

দানবরাজ বলি এবার তত্ত্বকথা বলতে আরম্ভ করলেন। সুখে স্পৃহা নেই, দুঃখে মন অনুদ্বিগ্ন, সমস্ত পার্থিব সুখেরই শেষ আছে—অতএব গাধার মতো জীবন যাপন করেও বলির মনে কোনও দুঃখ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুখ এবং দুঃখ—দু'য়েরই স্বরূপ তিনি জানেন। অতএব বলি দুঃখ পান না—যদেবমভিজানাসি কা ব্যথা মে বিজানতঃ। বলি বিরাট আলোচনা করলেন মহাকাল নিয়ে। মানুষের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সমৃদ্ধি-পতন, জয়-পরাজয়—সবই মহাকালের ছন্দে বাঁধা আছে। বলি বললেন, আজকে আমি গাধা হয়ে তুষ খাচ্ছি বলে আপনি পরিহাস করছেন, কিন্তু আপনিও বেশি পৌরুষ দেখাবেন না—মা কৃথাঃ শক্র পৌরুষম্।

আপনি যে আজকে ভাল অবস্থায় আছেন—এটা আপনি করেননি। আবার আমি যে এখানে গাধা হয়ে আছি—এটাও আমি করিনি—নৈতদস্মৎকৃতং শক্র নৈতচ্ছক্র ত্বয়া কৃতম্। যে করেছে, সে হল মহাকাল, তার হাত থেকে রেহাই নেই কোনও।

বলি এবার একটা লৌকিক উপমা দিলেন। বললেন, কত সুন্দরী সুলক্ষণা রমণীকে দেখি, কী খারাপ ভাগ্য তাদের, কী কষ্টেই না তারা থাকে। আবার কুৎসিত কুরূপা কত মহিলা পরম সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাও দেখি। মহাকালের কাজটাই এইরকম। সমস্ত চরাচরে প্রাণীরা যে গতি লাভ করে, সেই গতি আপনি এড়িয়ে যাবেন কোথায়—গতিং হি সর্বভূতানামগত্বা ক্ব গমিষ্যতি?

বৈরোচন বলি ইন্দ্রকে ভালরকম চেনেন। অমৃত-মন্থন থেকে আরম্ভ করে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রের দেখা হয়েছে। দুজনেই পৃথিবীকে দেখেছেন, চিনেছেন অনেক। কিন্তু ইন্দ্র যেভাবে যেচে বলিকে নানা কথায় পরিহাস করেছেন, বলি তার জবাব দিচ্ছেন একটু একটু করে। বলি বললেন, আগেও যেমন আপনার ছেলেমানুষি দেখেছি, এখনও দেখছি আপনি সেইরকমই ছেলেমানুষ আছেন—কৌমারমেব তে চিত্তং যথৈবাদ্য তথা পুরা। আরে, আমাকে তো আপনি এককালে দেখেছেন। দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নাগ, মানুষ, সকলেই আমার শাসনে ছিল। এমনকি আমি যে দিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম, শত্রুরা সে দিকটাকেই নমস্কার করে বলত—যে দিকে বৈরোচন বলি রয়েছেন, সেই দিককে নমস্কার—নমস্তস্যৈ দিশে'প্যস্তু যস্যাং বৈরোচনো বলিঃ।

বলি নিজের উদাহরণ দিয়ে ইন্দ্রকে বোঝালেন—আর আজকে আমার অবস্থা দেখছেন তো? বসে বসে তুষ খাচ্ছি। সেইরকম আপনিও যেমন আজকে রাজলক্ষ্মীর অধিকার লাভ করে ভাবছেন যে, তিনি আপনার কাছে আছেন—ও ধারণাটা মিথ্যে। সম্পূর্ণ মিথ্যে—স্থিতা ময়ীতি তন্মিথ্যা। বলি এবার কেটে কেটে বললেন, আরে! আপনার চেয়ে গুণী আরও হাজারটা ইন্দ্র আগে চলে গেছেন। এই রাজলক্ষ্মী তাঁদের কাছেও ছিলেন, তারপর আমার কাছেও ছিলেন, আবার এখন গেছেন আপনার কাছে, কাজেই মাথাটা বেশি গরম করবেন না, এত মেজাজও দেখাবেন না—মৈবং শক্র পুনঃ কার্ষীঃ শান্তো ভবিতুমর্হসি। শুধু মনে রাখবেন—আপনার আগে আপনার মতো আরও হাজারটা ইন্দ্রের জমানা চলে গেছে এবং তাঁরা কেউ শক্তি বা ক্ষমতায় আপনার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিলেন না—

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি সমতীতানি বাসব।
বলবীর্যোপপন্নানি যথৈব ত্বং শচীপতে।।

মহাভারতে বলি-বাসব-সংবাদ যেমনটি আছে, আলোচনা বেশ বড়, তত্ত্বও অনেক গভীর। সম্পূর্ণ অধ্যায়টিকে ছোট করে আমি আপনাদের একটা ধারণা দিতে চেয়েছি এবং তার উদ্দেশ্য একটাই। দানবরাজ বলির জবানিতে আমি শুধু দেখাতে চাইলাম যে, দেবতারা বিষ্ণু-স্বরূপিনী মোহিনীর নবীন-নবনীনিন্দিত হস্ত থেকে যতই অমৃত পান করে থাকুন, দেবতারা কেউ অমর নন। এমনকি এই প্রসঙ্গে অমর শব্দটার গূঢ়ার্থও কিছু বোঝা যেতে পারে। পৌরাণিকেরা কথান্তরে বলেছেন, আমাদের এই সংসার-যাত্রা কোনকালে আরম্ভ হয়েছে, তা যেহেতু জানি না, অতএব সংসারচক্রকে আমরা অনাদি বলি, কিন্তু দেহ আছে যাদের, তাদের দীর্ঘ জীবন কখনওই দেখি না—ন হ্যস্য জীবিতং দীর্ঘং দৃষ্টং দেহে তু কুত্রচিৎ। কেউ বালক বয়সেই মরে

AMARBOI.COM

যাচ্ছে, কেউ বা একশো বছর বেঁচেও থাকছে। কিন্তু একশো বছর যে বেঁচে আছে, তাকে যে লোকে 'অনন্ত'জীবী বলে, তা কিন্তু অল্পজীবীদের তুলনায়। আর একশো বছর বেঁচেও যে মরল না, যাকে দেখে মনে হয়—কী দীর্ঘ আয়ু! আহা এঁর বুঝি মরণ নেই, ইনি বেঁচেই থাকবেন, তাঁকেই লোকে 'অমর' বলে—জীবিতো ন ম্রিয়ত্যগ্রে তস্মাদ্ অমর উচ্যতে। এই নিরিখে দেবতারাও কেউ অমর নন। তাঁদের জন্ম-মৃত্যু সবই প্রায় মানুষের মতোই।

বলা যেতে পারে—এ তো মানুষের কথা হল। মানুষের মধ্যে যাঁরা দীর্ঘজীবী, তাঁদের কথাপ্রসঙ্গে আমরা অনেক সময় বলি—উনি অমর। স্বর্গের দেবতাদের কি ওরকম মানুষের মতো ভাবলে চলে? ধম্মে সইবে এসব কথা? তাহলে প্রশ্ন আসবে—দেবতাদের শরীর আছে কি না, অথবা তাঁদের আকৃতি-প্রকৃতিও বা মানুষের সঙ্গে মেলে কি না? যদি শরীর থাকে, আর মানুষের আচার-ব্যবহারের সঙ্গেও তাঁদের মিল থাকে, তবে তাঁদেরও জন্ম-মরণ থাকবে—তাতে আশ্চর্য কী?

দেবতাদের শরীর আছে কি না—এ তর্ক আজ থেকে নয়, এ তর্ক বেদের আমল, মানে ধরুন অন্তত তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে এই তর্ক চলছে। কথাটা আমাদের ধরতে হবে যাস্ক মুনির অভিধান নিরুক্ত থাকে। যাস্কই বোধ হয় প্রথম লোক যিনি চতুর্থ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ অর্থাৎ পাণিনিরও আগে শব্দের নিরুক্তি বিচার করে একটা অভিধান লিখেছিলেন। এই অভিধানের মধ্যে বৈদিক দেবতাদের নিয়ে একটা বড়সড় বিচার আছে। দেবতাদের শরীরের কথাটা আমাদের এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

দেবতাদের শরীর আছে, কি নেই—এই নিয়ে যাস্কের সময়েই দু'রকম মত ছিল। এক পক্ষ বলতেন, দেবতাদের দেখতে হয়তো মানুষের মতোই—পুরুষবিধাঃ সুরিত্যেকম্। আর অন্যরা বলেন, মোটেই তা নয়। দেবতাদের শরীর-টরীর কিছু নেই। তাঁরা সব আকাশস্থ অদৃষ্টিচর জীব। মানুষের মনোলোকেই তাঁর প্রতিমা। যাঁরা ভাবেন—দেবতার শরীর নেই, যাস্ক তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষপাতটা যেন শরীরবাদীদের দিকেই, যদিও শেষ পর্যন্ত অশরীরবাদীদের কথা বলে তিনি দুই মতই স্বীকার করে নিয়েছেন—অপি বা উভয়বিধাঃ স্যুঃ। বৈদিক দেবতাদের শরীর এবং ক্রিয়াকাণ্ড মানুষের মতো বলেই যাঁরা ভাবেন, তাঁদের কতগুলি যুক্তি আছে। যুক্তিগুলি যাস্ক যেভাবে সাজিয়েছেন আমি তা এক এক করে বলছি।

প্রথম কথা হল, ঋষিরা সমস্ত বেদের মন্ত্রবর্ণের মধ্যে দেবতাদের এমন ভাবে স্তুতি করেছেন, যাতে মনে হবে দেবতাদের মানুষের মতোই চেতনা আছে। আর চেতনা যাঁদের আছে, তাঁদের শরীর থাকবে না? এও কি কোনও কথা? বলতে পারেন—চেতনা তো গোরু-ঘোড়ারও আছে, তাহলে দেবতাদের গোরু-ঘোড়ার মতোও দেখতে হতে পারে। যাস্ক বললেন, বাবা! ওই জন্যই আগে বলেছি—দেবতাদের হয়তো মানুষের মতোই দেখতে হবে—পুরুষবিধাঃ স্যুরিতি। গোরু-ঘোড়ার তো আর হিতাহিত বোধ নেই, কাল কী হবে—বোধ নেই, কাজেই ওই রকম চেতনার কথা আমরা বলছিও না। মানুষের যেমন চেতনা, মানুষের যেমন কাজকর্ম দেবতাদেরও তেমনই হওয়া সম্ভব। নইলে দেবতাদের উদ্দেশে বেদের অর্ধেক স্তুতি-সূক্ত উন্মত্তের প্রলাপ বলে মনে হবে।

পরিচিত ব্যক্তি বাড়িতে এলে আমরা যেমন বলি—আসুন, বসুন, তামাক খান, তেমনই

AMARBOI.COM

ঋষিদের মুখে শোনা যাবে—ইন্দ্র! তুমি এস এস। এই কুশের আসনে বস, সোমরস তৈরিই আছে—পান কর—আ যাহি সুষমাহিত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম।। স্তুতির ভাষায় এই অভিবাদন-অভিনন্দনের মাত্রাটা চেতন মানুষের প্রতিরূপ কোনও চেতন শরীরী দেবতার উদ্দেশেই ব্যবহার করা যায়। নইলে বলতে হয়—যিনি এই অভিবাদন করছেন, তিনি পাগল। ঋগ্‌বেদের প্রায় প্রতিটি সূক্তেই ঋষিরা ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে—'এস', 'যাও', 'খাও', 'পান কর', 'আমাদের শত্রু জবাই কর', 'আমাদের এটা দাও, সেটা দাও'—ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত করে দেবতাদের চেতন সত্তা মেনে নিয়েছেন—চেতনাবদ্ভিঃ স্তুতয়ো ভবন্তি।

যাস্ক তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি সাজিয়েছেন দেবতাদের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে। তিনি বলেছেন, বেদের মন্ত্রের মধ্যে দেবতাদের হাত, পা, চোখ, মুখ, কান—সব কিছুরই বর্ণনা আছে মানুষের মতো করেই। ইন্দ্রের বলিষ্ঠ বাহুর ওপর নির্ভর করে স্তুতিকারী ঋষিরা নির্ভয়ে জীবন কাটাতে চেয়েছেন—ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা। একই শরীরে বেদ-বর্ণিত আদিত্য সূর্যের ভাস্বর মুখ, সবিতা-সূর্যের হিরণ্যহস্ত আর মিত্রের চক্ষুকে সন্নিবেশ করলে যে দেব-পুরুষের রূপ বৈদিকদের হৃদয়গোচর হয়েছিল, বস্তুত সেই রূপই পরবর্তী কালে পাণ্ডবজননী কুন্তীরও নয়নগোচর হয়েছিল। ইন্দ্রের বজ্রমুষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করাটাকে যদি একটা রূপকের মতো ধরে নিই—যদি ধরে নিই শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাঁর বজ্রমুষ্টির কথাটা কল্পনা করেছেন ঋষিরা, তাহলে ইন্দ্রের হনু-দু'টিকে নিশ্চয় শত্রুদমনে রূপক বলে ভাবা যাবে না। অথচ ইন্দ্রের মুষ্টির মতো তাঁর হনুর প্রশংসাও তো কিছু কম নেই বেদে—মৎস্বা সুশিপ্র হরিবস্তদীমহে ত্বে আ ভূষন্তি বেধসঃ। আর শুধু, ইন্দ্র অথবা সূর্যই নয়, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, বায়ু—এই সব দেবতারই নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা থাকায় দেবতার শরীরবাদীরা বলেছেন দেবতার চেহারা মানুষের মতোই হবে।

দেবতাদের যান-বাহন, বাড়ি-ঘর, দুর্গের কথাও বেদের মধ্যে অনেক পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে নানা ধরনের ক্রিয়া-কাণ্ড-খাওয়া, পান করা, যুদ্ধ করা, বধ করা, অশ্ব অথবা রথ-চালনা করা, বাঁশি বাজানো, গর্জন করা ইত্যাদি। এতগুলি মনুষ্যোচিত ক্রিয়া-কলাপ দেখে বৈদিকরা অনেকেই দেবতার শরীরে বিশ্বাস করেছেন।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার হল, শুধু বৈদিকদের একাংশমাত্রই নয়, দেবতাদের বিশিষ্ট শরীরের অস্তিত্ব নিয়ে বৈদান্তিকরাও কম মাথা ঘামাননি। স্বয়ং শঙ্করাচার্য, যিনি নিরাকার-নির্বিশেষ ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই মানেন না, তিনি পর্যন্ত বলেছেন, দেবতাদের রূপ আছে, শরীরও আছে। সেরকম না হলে আমরা একেকজন দেবতা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করতে পারতাম না—ন হি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়ঃ চেতসি আরোপয়িতুং শক্যন্তে। আমাদের কাছে যেটা বড় প্রয়োজন, সেটা হল—দার্শনিক শঙ্কর দেবতার শরীর স্বীকার করে নেওয়ার জন্য যে উদাহরণটি দিয়েছেন, সেটা মহাভারতের উদাহরণ। কন্যাবস্থায় কুন্তীর সানন্দ সপ্রেম আহ্বান লাভ করে সূর্য যে তাঁর বাহুপাশে ধরা দিয়েছিলেন, এই ঘটনাটাই দেবতার শরীর-প্রমাণে সাহায্য করেছে শঙ্করকে।

তবে মানুষের সঙ্গে দেবতাদের তুলনা দিতে গিয়ে শঙ্কর বলেছেন—দেবতারা মানুষের মতো জীবই বটে, তবে তাঁরা উন্নত শ্রেণীর জীব। ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে এবং ঐশ্বর্যে তাঁরা মানুষের চেয়ে অনেক বড়। ঠিক এই কথাটাই অন্যভাবে বলেছেন পৌরাণিকেরা। পৌরাণিক

AMARBOI.COM

বলেছেন—আমরা নিজেদের কথা বলছি না, তত্ত্বদর্শী ঋষিরাই এই কথা বলেন। তাঁরা বলেন, মানুষের শরীর, আকার অথবা চেহারা যেমন, দেবতাদেরও প্রায় তাই—

মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ।
তল্লক্ষণস্তু দেবানাম্ দৃশ্যতে তত্ত্বদর্শনাৎ।।

তবে কিনা মানুষের বুদ্ধি যত, দেবতাদের বুদ্ধি তার থেকে অনেক বেশি—বুদ্ধ্যতিশয়যুক্তস্তু দেবানাং কায়মুচ্যতে। লক্ষণীয় বিষয় হল, শুধু দেবতা নয়, বুদ্ধির আতিশয্য জিনিসটা অসুর-রাক্ষসদেরও যথেষ্ট পরিমাণ আছে এবং তা মানুষের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ অসুর-রাক্ষস-নাগরাও কিন্তু মানুষের চেয়ে উচ্চ স্তরের জীব। এই ধারাণাটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তা ঈশ্বরকৃষ্ণ। পরে আসছি সে কথায়।

পনেরো

ভবিষ্যতের কথা এখনই প্রসঙ্গত এসে গেল। পিতামহ ভীষ্ম তখনও শরশয্যায় শুয়ে আছেন। আর যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গে ঘিরে বসে আছেন। শরশয্যায় শুয়ে শুয়েই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। রাজনীতি, ধর্মনীতি, দেবতা, অসুর—কত কথাই না আসছে। প্রশ্নের পর যুধিষ্ঠির হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ঠাকুরদাদা! তুমি তো সব শাস্ত্রই জান। তো আমার একটা কথার উত্তর দাও। আমার প্রশ্ন—এ জগতে দৈবই বড়, না, পুরুষকার বড়?

পিতামহ ভীষ্ম কষ্ট-ক্লমহীন নীরোগ মানুষটির মতো বলে উঠলেন—আরে! ঠিক এই প্রশ্নই তো স্বয়ং বশিষ্ঠমুনি করেছিলেন পিতামহ ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। চতুর্বেদ তাঁর কণ্ঠভূষণ। সেখানে ব্রহ্মা যেমন করে প্রশ্নটার উত্তর দিয়েছিলেন, সেটাই তুমি শোনো। ব্রহ্মা বলেছিলেন—বীজ ছাড়া শস্য হয় না, বীজ ছাড়া ফলও হয় না। বীজ থেকেই বীজ। বীজ থেকেই ফল। একজন কৃষক ক্ষেতে যে ধরনের বীজ ছড়ায়, সেই রকমই শস্য পায়। খুব খানিকটা হাল চালিয়ে ক্ষেতটাকে বীজ ছড়ানোর উপযুক্ত করা হল, তারপর ধর, বীজটাই বপন করলাম না। তার ফল কী? জমিটা নিষ্ফলা যাবে। ঠিক তেমনই পুরুষকার ছাড়া দৈবও কিছু করতে পারে না। ক্ষেত হল দৈব, বীজ হল পুরুষকার।

ব্রহ্মা ক্ষেত্র-বীজের কথা বলেই মানুষের জীবনে চলে এলেন। বললেন—যেমন কর্ম তেমন ফল। ভাল কাজ করো, ভাল ফল পাবে। পুণ্যের কাজ করো সুখ পাবে। পাপের কাজ করো, দুঃখ পাবে। যে লোক কাজ করে, খাটে, সে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে না, ভাগ্য তাকে সহায়তা করবে না—এ হতেই পারে না—কৃতী সর্বত্র লভতে প্রতিষ্ঠাং ভাগ্যসংযুতাম্। তুমি কাজ করো, সৌভাগ্য তোমার হাতের মুঠোয়, শুধু দৈব নিয়ে বসে থাকলে হবে না। পুরুষকার প্রয়োগ

করো, ভোগ, সুখ স্বর্গ—তুমি যা চাও তাই পাবে—প্রাপ্যতে কর্মণা সর্বং ন দৈবাদকৃতত্মনা।

ব্রহ্মা জীবনের কথা ছেড়ে এবার বাস্তব উদাহরণে আসছেন। তিনি বললেন—এই যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, এত সব দেবতা, নাগ, যক্ষ—এরা সবাই মানুষ ছিলেন, কিন্তু শুধু পুরুষকারের দ্বারা এঁরা দেব-পদবি লাভ করেছেন—সর্বে পুরুষকারেণ মানুষ্যাদ্দেবতাং গতাঃ।

দেখুন, দৈব কিংবা পুরুষকারের যে বিতণ্ডা, তাতে আমি একটুও আগ্রহী নই। আমার আগ্রহ শুধু একটা কথা নিয়ে—সবাই মনুষ্যভাব থেকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন—মানুষ্যাদ্ দেবতাং গতাঃ—শুধু এই কথাটুকুই আমার দরকার। উপরের শ্লোকটিতে দেবতা, নাগ, যক্ষের কথা বলা আছে, কিন্তু দৈত্য-দানবের কথা বলা নেই। নেই যে, তার বড় কারণ কিছু নেই। আসলে দেবতা, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস নাগ—এঁরা সব এক পিতার পুত্র। মহাভারতের কবির বাঁধা কথাটা যেটা প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়, তা হল—

দেব-দানব-গন্ধর্বা দৈত্যাসুর-মহোরগাঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগাশ্চ পিশাচা মনুজা স্তথা।।

মহাভারতের কবি যে মোটামুটি একটা ক্রম দিলেন, এই ক্রমটাই পরবর্তীকালে দার্শনিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

সাংখ্য-দর্শনের প্রবক্তা ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখেছেন—দেব-শরীর আট রকমের—অষ্টবিকল্পো দৈবঃ। তাঁরা কারা? টীকাকার লিখলেন ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস এবং পিশাচ। পিশাচ থেকে ধরে একেবারে ব্রহ্মা পর্যন্ত—এঁরা পরপর উঁচু স্তরের জীব। এঁরা দেবযোনি, যেহেতু এঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণ বেশি। কিন্তু এই সত্ত্বগুণটাও পিশাচের চেয়ে রাক্ষসের মধ্যে বেশি, রাক্ষসদের থেকে নাগদের মধ্যে বেশি। এইভাবে ব্রহ্মা পর্যন্ত,—যেটাকে শঙ্করাচার্য বলেছেন—জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের প্রকাশটা এঁদের মধ্যে পরপর বেশি—পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি।

AMARBOI.COM

কঠিন কথা বলে আরম্ভ করেছি, তাই বলে কঠিনভাবেই চালিয়ে যাব না। আমাদের কথাটা হল—ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা তথা অসুর-রাক্ষস-নাগ-গন্ধর্বরা—এদের জন্ম-পদবি এক —এঁরা সকলেই দেবতা, দেবযোনি। এঁদের কেউ বেশি ভাল, কেউ একটু মন্দ। কিন্তু দেবতা হওয়া সত্ত্বেও এঁরা যে মনুষ্যধর্ম অতিক্রম করে গেছেন, তা মোটেই নয়, সাংখ্যের দার্শনিক লিখেছেন—জরা-মরণের কষ্ট দেবতাদেরও আছে। তবে তা একটু অন্যরকম। মানুষের যেমন—গায়ের রং পুড়ে গেল, দাঁত পড়ে গেল, লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারি না—ঠিক এমনটা না হলেও দেবতাদেরও বার্ধক্য কিংবা মরে যাবার কষ্ট আছে—স চ দেবভূমাবপি ভবতি।

আমরা বলি—সে আবার কী? সারা জীবন কত শুনেছি—এই মর্ত্যভূমিতে জন্মেই যত কষ্ট! সেই মাতৃগর্ভে জন্ম থেকে কষ্ট আরম্ভ হয়, তারপর কিছুদিন ভালয়-মন্দে যেতে না যেতেই বার্ধক্য শুরু হয়ে গেল, আরম্ভ হল রোগ-ভোগ, তারপর মৃত্যু তো আছেই। দার্শনিক বললেন—স্বর্গের দেবতাদের যত সুখ ভাবছ, তত সুখ মোটেই নয়। হ্যাঁ, জন্মের ব্যাপারটায় দেবতাদের অত কষ্ট নেই সত্যি, কারণ দেবতাদের জন্ম নাকি—তড়িদ্‌বিলসিতবৎ—চক্ষের নিমেষে তাঁরা জন্ম নিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে দেবভূমিতে রোগ-শোক নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই—এমনটি মোটেই নয়।

সাংখ্যের যুক্তিদীপিকার লেখক রীতিমতো বেদের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন—জানেন, এই যে ইন্দ্র, তাঁর একবার প্রচণ্ড অনিদ্রা রোগ হয়েছিল। দিনে-রাতে কখনই তাঁর ঘুম আসে না। তিনি

ভুবনে এমন বৈদ্য-চিকিৎসক ছিলেন না, যাঁরা ইন্দ্রের অনিদ্রা রোগ সারানোর জন্য চেষ্টা করেননি। দিন দিন তিনি রোগা হয়ে যেতে লাগলেন। শেষে ঋষিরা তাঁকে 'ত্বাষ্ট্রীয়' সামগান শোনাতে আরম্ভ করলেন। সামগানের মধুর শব্দের ইন্দ্রে অনিদ্রা রোগ সেরে গেল—ইন্দ্রং ক্ষামমপি ন সর্বভূত্যানি প্রস্বাপয়িতুং নাশক্লুবন্। তমেতেন সাম্না ত্বাষ্ট্রীয়েণ অস্বাপয়ৎ।

আমরা বলব—বেদের প্রমাণ তো আর অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু ওই একটা উদাহরণ থেকে কীই বা বোঝা যায়? সাংখ্য-কারিকার টীকাকার বলবেন—শুধু কি ইন্দ্র! স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল বায়ু-রোগে। আর চন্দ্র, তিন ভুবনকে স্নিগ্ধ আলোর জ্যোৎস্না-ধারায় স্নান করিয়ে দেন যিনি, তাঁর যে কঠিন যক্ষ্মা হয়েছিল—প্রজাপতে বায়ু-রক্ষয়ীৎ, দক্ষাভিশাপাচ্চ সোমস্য ক্ষয়ঃ।

কথাটা শুনেই অবহিত হয়ে বসতে হবে আমাদের। দু'দণ্ড পরেই মহাভারতে শান্তনু, ভীষ্ম অথবা কুরু-পাণ্ডবের কত কাহিনী শুনব। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের বংশের নামই যে চন্দ্র-বংশ। মহামান্য দেবতাদের অন্যতম যে চন্দ্র, তিনিই তো কুরু-পাণ্ডবের বংশ-মূল, তাঁর আবার যক্ষ্মা হল কবে? তিনি কি আমাদের মতো মানুষ নাকি, যে যক্ষ্মায় কাবু হবেন তিনি! দর্শনের টীকাকার বলবেন—আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না হলেও স্বর্গভূমিতে বসে তাঁর এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হয়নি। অর্থাৎ দেবতা হলেও রোগ-ভোগের কষ্ট থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, মানুষের তুলনায় তিনি কিছু বড়-মানুষ বটে, হ্যাঁ তাঁর, জ্ঞান-ঐশ্বর্য মানুষের থেকে বেশ খানিকটা উঁচু স্তরের বটে, কিন্তু রোগ-শোক, জরা-মরণ তাঁরও আছে।

আমরা চমকিত হয়ে বলব—কুরু-পাণ্ডব বংশের প্রথম জনক মহান চন্দ্র দেবতার এই গুরুতর অস্পৃশ্য অসুখের কথা কি মহাভারতের মধ্যে পাব? তাহলে তো আগে-ভাগে সেই অসুখের খবরটাই নেওয়া দরকার। একটি রোগগ্রস্ত অসুস্থ দেবতার খবর মহাভারতের মধ্যে পেলে একদিকে যেমন দেবতার মনুষ্য-ধর্মিতা জরা-মরণশীলতা আমাদের কাছে ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে উঠবে, তেমনই অন্যদিকে কুরু-পাণ্ডব বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কিছু সমবেদনাও জানানো সম্ভব হবে এই সুযোগে। ঘটনাটা ছিল এইরকম।

প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি মেয়ে ছিল। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা—ইত্যাদি নামে যে সাতাশটি নক্ষত্রের নাম আমরা জানি, দক্ষের মেয়েরা হলেন এই সাতাশ নক্ষত্র-সুন্দরী। দক্ষ এই সাতাশটি মেয়েকে এক সঙ্গে চন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করলেন—যা সপ্তবিংশতিং কন্যাং দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ। দক্ষের সাতাশ মেয়ে সাতাশ জন নক্ষত্র সুন্দরী—রূপে-গুণে তাঁরা কেউ কম নন। কিন্তু এঁদের মধ্যে রোহিণী ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী—অত্যরিচ্যত তাসান্তু রোহিণী রূপ-সম্পদা। সে সৌন্দর্য এমনই অপ্রতিম যে, চন্দ্র তাঁর রূপের মোহে তাঁর অন্য স্ত্রীদের অবহেলা করতে লাগলেন। সব সময় তিনি রোহিণীর ঘরেই পড়ে থাকেন, রোহিণীকেই ভালবাসেন, রোহিণী ছাড়া তিনি আর দ্বিতীয় কিছু জানেন না। চন্দ্রের এই আচরণে অন্য নক্ষত্র সুন্দরীরা সবাই ভীষণ রেগে গেলেন। নিজেদের সহোদরা বোনটি হলে কী হয়, স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে কার ভাল লাগে!

ছাব্বিশ নক্ষত্র-সুন্দরী স্বামীর ওপর অভিমান করে এক সঙ্গে দল বেঁধে বাপের বাড়ি চলে এলেন। পিতা দক্ষের কাছে সকলে মিলে নালিশ করলেন—দেখ বাবা এত তোড়জোড় করে তুমি চন্দ্রের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিলে, কিন্তু স্বামী আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাঁরা

AMARBOI.COM

যত সোহাগ সব ওই তোমার আদরের মেয়ে রূপেশ্বরী রোহিণীর ওপর। সব সময় তাঁর আঁচল ধরে ঘুরছে—সোমা বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা। দক্ষের ছাব্বিশটি মেয়ে বাপের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল—কী হবে আর ওই স্বামীর বাড়ি থেকে। আমরা আজ থেকে এখানেই থাকব, নুন-ভাত যা জোটে খাব, দেখব—কবে তাঁর সময় হয়—বৎস্যামো নিয়তাহারা স্তপশ্চরণতৎপরাঃ।

দক্ষ মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। এত গুলি মেয়ে একসঙ্গে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, এবং এসেছে তাদেরই এক ভগিনীর প্রতি নির্মম ঈর্ষায়। দক্ষ সোজা জামাই-বাড়ি গিয়ে চন্দ্রকে বললেন—এ তোমার কেমন ব্যবহার? আমার সাতাশটি মেয়েকে তুমি এক সঙ্গে বিয়ে করেছ অথচ সবার দিকে তুমি একরকম করে তাকাও না। এ তোমার কেমন ব্যবহার? সবাইকে তুমি সমানভাবে দেখ। সাতাশটি স্ত্রীর মধ্যে শুধু একতমার প্রতি এই নিদারুণ পক্ষপাত কি ধর্মে সইবে বলে মনে কর—সমং বর্তস্ব ভার্যাসু মা ত্বাধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ। স্নেহময় পিতা ফিরে এসে মেয়েদের বললেন—এবার স্বামীর বাড়ি যাও, মা-জননীরা। আমি জামাইকে খুব শাসন করে এসেছি। সে এখন সবাইকে সমান দেখবে।

বাবার কথা শুনে দক্ষ-কন্যারা আবার হই-হই করে চন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হল। কিন্তু কোথায় কী! চন্দ্র যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। সেই রোহিণী। সেই রোহিণী। তাঁকেই তিনি ভালবাসেন, তাঁকে নিয়েই তাঁর দিন-রাত কাটে। দক্ষ-কন্যারা আবার ফিরে এলেন বাপের বাড়ি। এবারে আর নতুন অভিমানে তাঁরা কেঁদে বুক ভাসালেন না। বরং ঠান্ডা মাথায় তাঁরা পিতা দক্ষকে বললেন—বাবা, তোমারও তো বয়স হয়েছে। জীবনের যে কটা দিন আছে, আমরা তোমার সেবা শুশ্রূষা করে কাটিয়ে দিতে চাই। আমরা এখানেই থাকব, বাবা—তব শুশ্রূষণে যুক্তা বৎস্যামো হি তবাশ্রমে। দক্ষ-কন্যারা এবার নিরুত্তেজিতভাবে বাবা দক্ষকে জানালেন—তুমি তো সেই এত করে বলে এলে। সে তোমার কথা শুনলে তো? সে যা হোক, আমরা আর ফিরে যাচ্ছি না।

মেয়েরা যাই বলুক। দক্ষের আত্মাভিমানে লাগল এসব কথা। তিনি আবারও গেলেন জামাই-বাড়ি এবং অভিশাপের ভয় দেখিয়ে সব মেয়েকে সমদৃষ্টিতে দেখার শাসন জারি করে ফিরে এলেন বাড়িতে। মেয়েরা তাঁর কথায় আবার স্বামীর বাড়ি গেল এবং পুনরায় তাঁর একই অপব্যবহার দেখে বাপের বাড়ি ফিরে এল। তাদের এবার রাগও হল খুব—স্বামীর ওপরে তো বটেই, বাবার ওপরেও খানিকটা। বারবার স্বামীর ভালবাসা ভিক্ষা করে, বাপকে দিয়ে সালিশি করিয়ে এবং তাতেও বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে কোন রমণীর ভাল লাগে! দক্ষ-কন্যারা এবার পিতাকে বললেন—তোমার সোনার চাঁদ জামাই এখনও রোহিণীর ঘরেই বসে আছেন। তোমার কথা শুনতে তার বয়ে গেছে, আমাদের ভালবাসার কোনও দায়ই তার নেই—ন তদ্‌বচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি। তা তোমার যদি আমাদের বাঁচানোর এতই তাগিদ থাকে, তবে সেই ব্যবস্থা করো, যাতে আমাদের স্বামী আমাদের ভালবাসে।

দক্ষ রাগে দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে পুনরায় জামাতার ঘরে এলেন এবং মুখে কঠিন অভিশাপ উচ্চারণ করলেন তাঁর উদ্দেশে। মহাভারত বলেছে—চন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য দক্ষ ভয়ঙ্কর যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি করলেন এবং যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল।

চন্দ্রের যক্ষ্মা রোগের কাহিনী এইটুকুই। হয়তো এই কাহিনীর মধ্যে অন্যতর দুটি বিশ্বাস লুকোনো আছে এবং সেই বিশ্বাসই প্রতিপন্ন হয়েছে রোগগ্রস্ত চন্দ্রমার কাহিনীতে। প্রাচীনরা

AMARBOI.COM

বিশ্বাস করতেন—অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্ভোগের ফলে যক্ষ্মা হয় এবং এই ধারণা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও চালু ছিল। আমাদের ধারণা, এই চিরন্তনী ধারণাই উপাখ্যানের আশ্রয় নিয়েছে রোহিণী-চন্দ্রের নিবিড় সম্ভোগে। আরও একটা বিশ্বাস যা আছে, তা শুধু বিশ্বাস নয়, মাহাত্ম্য-খ্যাপন। চন্দ্র এই সাংঘাতিক রোগ থেকে পূর্ণ মুক্তি পাননি, কিন্তু খানিকটা যে তিনি সেরে উঠেছিলেন, তা শুধু সরস্বতীর তীরে প্রভাস তীর্থে স্নান করে।

আমাদের পূর্ব প্রস্তাব অনুসারে চন্দ্রের যক্ষ্মা রোগটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল—দেবতাদেরও মানুষের মতোই রোগ-শোক আছে, এমনকি রোগ যে সারে না, তাও দেখা গেল ওই চন্দ্রের ক্ষেত্রে। অমাবস্যা থেকে চন্দ্রের যে একেকটি কলা বৃদ্ধি হতে থাকে, তার কারণ সরস্বতী-প্রভাসে অমাবস্যার দিন নাকি চন্দ্র তাঁর রোগ মুক্তির জন্য স্নান করেছিলেন এবং সেইদিন থেকে পনেরো দিন তিনি ভাল থাকেন, তাঁর শরীরটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ণিমার দিন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গেলেও আবার তাঁর শরীর শুকোতে থাকে। ফলে পরের অমাবস্যায় আবার তাঁকে তীর্থ-স্নান করতে হয়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি—সরস্বতীর তীর্থে স্নান করে চন্দ্র তাঁর শরীরে দীপ্তি অর্থাৎ প্রভা ফিরে পেয়ে জগৎ আলো করেছিলেন বলেই ওই তীর্থের নাম প্রভাস।

যাই হোক, চন্দ্রের পুরো রোগ মুক্তি হল না। সাংখ্যকারিকার টীকাকার মন্তব্য করলেন—নৈনং যক্ষ্মাদমুঞ্চৎ—যক্ষ্মা চন্দ্রকে ছাড়েনি। ইন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা, চন্দ্র—এই সমস্ত মহান দেবতা যেখানে সামান্য রোগ-শোকই এড়াতে পারছেন না, সেখানে মরণ যে তাঁদের হবেই সে কথা আর বেশি করে বলার কী আছে। দেবতাদের মরণকাল ঘনিয়ে এলে তাঁদের শরীরে কী কী দুর্লক্ষণ দেখা যায়—সাংখ্য দার্শনিকেরা তার একটা তালিকাও দিয়েছেন। বস্তুত, বিভিন্ন পুরাণেও আমরা দেখেছি যে, দেবলোক থেকে চ্যুত হওয়ার সময় দেবতাদের দিন বড় দুঃখে কাটে, এবং এই শেষের দিনটির কথা ভেবে তাঁরা রীতিমতো ভয়ও পান।

দেবতাদের জরা-মরণ নিয়ে আর কোনও গভীর তত্ত্ব আমরা শোনাব না। কারণ আমাদের মতে তাঁরা মানুষেরই নামান্তর। তবে একই সঙ্গে জানাই অসুর-রাক্ষস অথবা দৈত্য-দানবেরা কিন্তু দেবতাদেরই জাত ভাই। তাঁরা একই বাপের ছেলে। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যেমন ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি, মামলা চলে, দেবতা আর অসুরদের মধ্যে সম্বন্ধটাই ওই একইরকম। স্বর্গের সম্পত্তি নিয়ে দুই বৈমাত্রেয় ভাইদের ঝগড়া। মামলার দরকার হলে দুই পক্ষই ব্রহ্মাকে সাক্ষী মানতেন। এঁদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। হার-জিৎ দুই পক্ষেই প্রায় সমান। আর যদি 'কালচারে'র কথা তোলেন, তো বলি—সে জিনিসটা অসুর-রাক্ষসদের বড় কম ছিল না। এঁরা প্রত্যেকে ভাল রকম সংস্কৃত জানতেন। সমুদ্রমন্থনের সময় বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরবার প্রস্তাবে দৈত্যরাজ বলির প্রতিক্রিয়া স্মরণ করুন। অপিচ বাল্মীকি রামায়ণে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণের সংস্কৃত এবং বেদে অধিকার লক্ষ্য করুন ভাল করে।

তবে মুশকিল একটা ছিল। প্রজাপতি কশ্যপের এই দৈত্য-রাক্ষস পুত্রেরা যেহেতু স্বর্গের অধিকার ভাল করে কোনও দিনই পাননি, তাই হঠাৎ হঠাৎ লুটপাট, নরহত্যা, নারীহরণ, ধর্ষণ—এইসব বদগুণ তাঁদের মধ্যে বেশি এসে গিয়েছিল। মহামতি গিরীন্দ্রশেখর বসু তাই কুত্রাপি অসুর রাক্ষসদের 'গুণ্ডা' বা 'ডাকাত' বলে সম্বোধন করেছেন। আজকাল রাষ্ট্রীয় নেতারা যেমন অনেক অসামাজিক কাজ নিজে করতে পারেন না বলে গুণ্ডা লাগান, সেকালেও তেমন ছিল। স্বয়ং বিশ্বামিত্র মুনি রাক্ষস লাগিয়ে ব্যাস পিতা পরাশরের বাবা শক্তিকে হত্যা

www.amarboi.com

করিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হবে মহাভারত এবং পুরাণে অতি উৎকৃষ্ট গুণের অসুর-রাক্ষসেরও অভাব নেই কোনও।

অসুর-রাক্ষসেরা অবশ্য আগে মোটেই খারাপ ছিলেন না। প্রথম প্রথম এক বাপের দুই ছেলের যেমন ভাব-ভালবাসা থাকে, তেমনটি দেবতা এবং অসুরদের মধ্যেও ছিল—অসুরা যে পুরা হ্যাসন্ তেষাং দায়াদ-বান্ধবাঃ। তবে সমস্ত গোলমালের মূলে কিন্তু ওই পৃথিবীর অধিকার নিয়ে দুই পক্ষের বনিবনা না হওয়া। এমনকি অনেকে বলেন, অসুর-রাক্ষসেরা আগে দেবতাদের চেয়েও ভাল মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা খারাপ হয়েছেন দেবতাদের জন্যই। অবশ্য তারও কারণ কিন্তু সেই ভূমির অধিকার।

প্রায় বৈদিক যুগের অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণ, যেটিকে সকলে বেদ বলেই মানেন, সেই গ্রন্থে অসুর আর দেবতাদের সম্বন্ধে খুব প্রামাণিক একটা কথা পাওয়া যাবে। শতপথ বলছেন—প্রজাপতি যেমন দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন, তেমনই অসুরদেরও সৃষ্টি করেছেন তিনিই—উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ। তা এক সময় অসুররাই সমস্ত পৃথিবী দখল করে নিয়েছিলেন। অধিকার সম্পূর্ণ হবার পর অসুরেরা নিজেদের মধ্যে পৃথিবীটা ভাগাভাগি করে নেওয়ার কথাও ভাবলেন। নেতারা আপন আপন অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য মাপ-জোকও আরম্ভ করে দিলেন। বিতাড়িত দেবতারা আরও বিপন্ন হয়ে উপস্থিত হলেন যজ্ঞপতি বিষ্ণুর কাছে। তাঁরা ঠিক করলেন—ভাগাভাগির সময়েই অসুরদের ধরতে হবে। নইলে একবার নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে আর কিছুই মিলবে না। দেবতারা বিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে অসুরদের কাছে গিয়ে দেখলেন—মাপজোক, নকশা চলছে জমির অধিকার নিয়ে। দেবতারা বললেন—সব যে নিজেরাই ভাগ করে নিচ্ছ, আমাদের কী হবে? আমরা কি কিছুই পাব না? আমাদের ধারণা—অসুররা যদি দেবতাদের কাছে এসে বলতেন—আমাদের কী হবে, তবে তাঁরা বধির হয়ে থাকতেন।

AMARBOI.COM

কিন্তু অসুরেরা কত ভাল মানুষ দেখুন। তাঁরা বললেন—তাই তো তোমাদেরও কিছু পাওয়া উচিত বটে। তা বাপু, সবাইকে তো আর দিতে পারব না। বরং, তোমাদের নেতা ওই বিষ্ণুর শুতে যতটুকু জায়গা লাগে, সেটা দেব তোমাদের—যাব দেবৈষ বিষ্ণুরভিশেতে, তাবদ্‌বো দদ্ম ইতি। এরপরের কাহিনী পুরাণে বলি-রাজার উপাখ্যানে কীর্তিত হয়েছে। বিষ্ণু শুলেন। কিন্তু শুয়ে, ফুলে, ফেঁপে তিনি সমগ্র পৃথিবী দখল করে নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন দেবতাদের।

এমন ঘটনা একবার নয়। বারবার ঘটেছে। অমৃত লাভের ক্ষেত্রেও ওই একই ঈর্ষা এবং ছলনা কাজ করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। একটি পুরাণে আমরা অতি অদ্ভুত ব্যাপারও একটা দেখেছি। সেখানে বলা হয়েছে—অসুরেরা ধন্বন্তরির হাত থেকে অমৃত-কলস ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু দেবতাদের প্রাপ্য ভাগ তাঁরা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও অমৃত পান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার আগেই মোহিনী মায়ার জালে আবদ্ধ হয়েছেন অসুরেরা। মহাভারতের কথায় এই প্রসঙ্গে আগে আমি বলেছি যে, অমৃত এবং লক্ষ্মী—এই দুটি বিষয় নিয়েই দেবতা আর অসুরদের দ্বন্দ্ব চিরতরে শাশ্বতিক এক রূপ নিল—অমৃতার্থে চ লক্ষ্ম্যর্থে মহান্তং বৈরমাশ্রিতাঃ।

তবে অমৃত আর লক্ষ্মীরও আগে যেটা, সেটা হল—ভূমির অধিকার। স্বর্গের অধিকার। আমাদের জিজ্ঞাসা—সেই স্বর্গভূমি কোথায়? আমরা সেই স্বর্গের ঠিকানা চাই।

ষোল

খুব সামান্য কথা। দেবতাদের শরীর মানুষের মতোই। তাঁদের আচার-ব্যবহার ভাব-ভঙ্গিও মানুষের মতো। তাঁদের বাড়ি-ঘর, বাগান, দুর্গ, রাজসভাও মানুষের মতো। সব কিছুই যখন মানুষের মতো, সেখানে তাঁদের বাসস্থান স্বর্গভূমিও যে মানুষের থাকবার মতোই একটা জায়গা হবে, সেটা খানিকটা অনুমানযোগ্য।

দেখুন, আমরা এর আগে দার্শনিক তথ্য দিয়ে জানিয়েছিলাম যে, স্বর্গ বলে একটা জায়গার কল্পনা করা হয়েছে বটে, তবে অনেকের মতে মনের প্রীতিকর জায়গাটাই হল স্বর্গ আর তার বিপরীত হল নরক। এ বিষয়ে মহাভারতও একমত হয়েছে। স্বয়ং ভৃগুমুনি সেখানে সদুপদেশ দিয়ে বলেছেন—দেখ, শারীরিক, মানসিক কোনও দুঃখই যেখানে নেই, সেই জিনিসটাকে বলে সুখ। আর সেই সুখ শুধু স্বর্গেই আছে, অন্যত্র নেই—নিত্যমেব সুখং স্বর্গঃ। উপদেশকামী ভরদ্বাজ বললেন, আমরা তো জানি—সেই রকম সুখ-স্বর্গ লাভ করতে হলে তো পরলোকে যেতে হবে। এখানে সেই পরলোক পাব কোথায়? সে পরলোকের কথা যে কেবল শুনেইছি, চোখে তো দেখিনি—অস্মাল্লোকাৎ পরো লোকঃ শ্রূয়তে ন তু দৃশ্যতে।

ভৃগুমুনি এবার জিজ্ঞাসু সুজনকে পরলোকের ঠিকানা বলছেন। তিনি বললেন—আছে, আছে। হিমালয় ছেড়ে আরও উত্তরে যাও, সেইখানে সেই পরলোকের সন্ধান পাবে—

উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে।
পুণ্যঃ ক্ষেম্যশ্চ কাম্যশ্চ স পরো লোক উচ্যতে।।

মুনি বললেন—সেখানে পাপী লোকের জায়গা নেই, লোভ নেই কারও, রোগ-শোক-ব্যাধির বালাই নেই এবং সেখানে থাকেন যাঁরা তাঁরাও কিন্তু মানুষই—মানবা নিরুপদ্রবাঃ। স স্বর্গসদৃশো দেশ স্তত্র হ্যক্তা শুভা গুণাঃ।

উত্তরে হিমাবৎপার্শ্বে—এই জায়গাটার সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষি-মুনি-পৌরাণিকদের একটা 'নস্টালজিয়া' আছে। মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেকেই এই জায়গাটাকে মাঝে মাঝেই স্মরণে এনেছেন এবং তার কারণ 'নস্টালজিয়া'। আমরা যখন এরপরে মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রলাভের প্রসঙ্গে পৌঁছব, তখন দেখব—পাণ্ডু অন্য পুরুষের সম্প্রয়োগে কুন্তীর গর্ভে পুত্রলাভ করতে চাইছেন। কুন্তী মানছেন না, পাণ্ডু তখন উদাহরণ দিয়ে বলছেন—উত্তর-কুরু দেশে এখনও এই নিয়ম আছে—উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষু অদ্যাপি পূজ্যতে।

পণ্ডিতেরা বলেন—মধ্য এশিয়ার পামির বা পূর্ব তুর্কিস্থানের মহাভারতীয় নাম হল ইলাবৃত-বর্ষ। এই উত্তর-কুরু সেই ইলাবৃত-বর্ষের আরও উত্তরে। গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখেছেন—উত্তর-কুরু দেশেই ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক। ঋক্‌বেদে বিষ্ণুকে 'উন্নত' অর্থাৎ উত্তরদেশবাসী বলা হয়েছে এবং সেই রাজ্যে প্রচুর শৃঙ্গী হরিণ পাওয়া যায়—ভূরিশৃঙ্গা গাবঃ। গিরীন্দ্রশেখরের নিজের ভাষায়—"পৌরাণিক নির্দেশ অনুসারে মনে হয় বিষ্ণুর রাজ্য ক্যাসপিয়ন সাগরের উত্তরে ছিল। হিন্দু তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ক্যাসপিয়ন সাগরের তীরে যাইতেন তাহার প্রমাণ আছে। (দ্রষ্টব্য : 'বাকুতে হিন্দুমন্দির' নামক প্রবন্ধ : নূতন পত্রিকা, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)। উত্তর কুরু সাইবেরিয়া বা রাশিয়ার কোনও স্থান বলিয়া মনে হয়। উপনিষদে ব্রহ্মলোক যাইবার পথে 'আর' হ্রদ ও বিজরা নদীর উল্লেখ আছে। আর হ্রদ ও Lake Aral বোধহয় একই। বিজরা ও আধুনিক Pachora একই বলিয়া মনে হয়।"

ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকের সামান্য একটা হদিশ পাওয়া গেল। এবারে স্বর্গ লোকের কথা বলি। বর্ষ মানে স্থান, জায়গা; যেমন ভারতবর্ষ—ভরত-বংশীয়দের জায়গা। এই রকমভাবে ভরত বংশীয়দেরও অতি-পূর্ব পুরুষ হলেন 'ইল'। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটি স্থান—যার নাম ইলাবৃত-বর্ষ। গিরীন্দ্রশেখর এই ইলাবৃত-বর্ষকেই স্বর্গভূমি বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সে জায়গাটা 'মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। সম্ভবত পামির বা পূর্ব তুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত।' গিরীন্দ্রশেখরের ধারণা—এই জায়গার নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে এই ইলাবৃত-বর্ষের সভ্যতা লুপ্ত হয় এবং নিতান্ত জলাভাবের জন্যই ইলাবৃত-বর্ষ থেকে ভারতের দিকে তাঁরা আসতে থাকেন। কালবশে তাঁরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তখন একদলের নাম হয় দেব অন্য দলের নাম অসুর।

অসুর শব্দটা যথেষ্ট পুরনো। এক সময় 'অসুর' শব্দে লোকে দেবতাও বুঝত। ঋগ্‌বেদে বহু জায়গায় দেবতাদের অসুর বলা হয়েছে। অসুরদের মধ্যে যে অদেবত্ব কিছু ছিল না, তার সবচেয়ে বড় ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ আবেস্তার 'আহুর' শব্দে। ভাষাতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন—সংস্কৃত 'অসুর' শব্দই আবেস্তার 'আহুর'। এবং জেন্দ আবেস্তাতে আহুর মানেই দেবতা—যেমন 'আহুরা মাজদা'। তাই ধরেই নেওয়া যায় যে, সুরাসুরে দ্বন্দ্ব যতই থাকুক, তাতে কারুরই মান্যতা নষ্ট হত না এবং পূর্বে তাঁদের ঠিকানাও ছিল এক—সেই ইলাবৃত-বর্ষ।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত। হিমালয়ের উত্তরে এবং হেমকূট পর্বতমালার দক্ষিণে হল কিম্পুরুষ-বর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের সীমা নিষধ পর্বত পর্যন্ত। আর ওই নিষধ পর্বতের উত্তরেই ইলাবৃত-বর্ষ। এটাই যে স্বর্গ তার কী প্রমাণ আছে? এবারে গিরীন্দ্রশেখর যা বলেননি, সে প্রমাণও দাখিল করছি। এক তো হল মহাভারতের সেই 'উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে'র সেই সুখস্থানটি যাকে মহাভারত বলেছে—স স্বর্গসদৃশো দেশঃ। দ্বিতীয় প্রমাণ আছে পুরাণে। পুরাণ বলেছে—ইলাবৃত-বর্ষ জায়গাটা কী

রকম? না, সেখানে দৈত্যরাজ বলির মহান যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল—যে যজ্ঞে বিষ্ণু বামন হয়ে পৃথিবী ভিক্ষা করে বলির রাজ্যাধিকার নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন—সেটাই ইলাবৃত-বর্ষ। আমাদের পূর্বকথিত ত্রিপুর দুর্গও এইখানেই। জিজ্ঞাসা করতে পারি—জায়গাটার আর কোনও বিশেষত্ব আছে কি? আছে। দেবতারা যেখানে জন্মেছিলেন, দেবতারা যেখানে বিবাহাদি করেন, যেখানে দেবতাদের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ—সব কাজ হয়, এমন কি কন্যা সম্প্রদান করতে গেলেও দেবতাদের যে জায়গাটা ব্যবহার করতে হয়—সেই জায়গাটাই হল ইলাবৃত বর্ষ—

দেবানাং জন্মভূমি র্যা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।
বিবাহাঃ ক্রতবশ্চৈব জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।

এবারে মহামতি গিরীন্দ্রশেখরের অনুমানটা জানাই—দেবতারা ইলাবৃত-বর্ষ অর্থাৎ আধুনিক তুর্কিস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে প্রথম ভারতে আসেন। তাঁরা কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাব থেকে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত আস্তে আস্তে অধিকার করে নেন। তারপর বিন্ধ্যের দক্ষিণেও রাজ্যবিস্তার করেন। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বসবাস শুরু করেন বলেই অন্তরীক্ষের অন্য নাম পিতৃলোক। অন্তরীক্ষ মানে মধ্যবর্তী দেশ। দেবলোক, পিতৃলোক এবং মর্ত্যলোক যথাক্রমে ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর এবং উত্তর ভারত।

গিরীন্দ্রশেখরের আরও বক্তব্য হল—দেবতারা যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। স্বর্গ বা ইলাবৃত বর্ষের অধিপতির সাধারণ নাম ইন্দ্র। ভারতে তখন রাজা বলে কেউ ছিল না। ভারতে নেমে আসার পর দেবতারা মানব নামে পরিচিত হন কারণ ইন্দ্রের প্রতিভূ হলেন প্রজাপতি মনু—যাঁর নামে এই মানব জাতি। ইলাবৃত-বর্ষ ভারতীয়দের আদি বাসস্থান বলেই অতি পবিত্র তীর্থ বলে গণ্য হত। যুধিষ্ঠিরের সময়েও লোকে স্বর্গে তীর্থ করতে যেত। ক্রমে স্বর্গের পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। কাশ্মীর থেকে তুর্কিস্থান যাওয়ার যে বণিকপথ এখনও আছে, সেটাই স্বর্গে যাওয়ার আদিপথ বা দেবযান-পথ বলে মনে হয়। উত্তরপ্রদেশের উচ্চ ভূমি এবং পর্বতও পরবর্তী কালে স্বর্গ নাম লাভ করেছিল।

স্বর্গারোহণের কথাটা এখন এমনই শুনতে লাগে, যেন সে স্বর্গ বুঝি মৃত পুণ্যাত্মাদের মরণোত্তর আশ্রয়ভূমি। আমাদের দেশে এই সেদিনও লোকে বুড়ো হয়ে গেলে জীবনের শেষ কদিন বিশ্বেশ্বরের সান্নিধ্যে কাটানোর জন্য কাশী যেতেন। আমরা পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকেও মৃত্যুর ঠিক আগে নিজের জায়গা ছেড়ে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখেছি। যদিও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ এবং তাঁরও পূর্বে ইলাবৃত-বর্ষের স্বর্গ একেবারেই আলাদা। কিন্তু এই যে পুরাণে-ইতিহাসে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কথাটা শোনেন, সেটা ছিল ওই মৃত্যুর পূর্বে কাশী যাওয়ার মতো।

স্বর্গ বলে যে জায়গাটা ছিল, সেখানে যেতে হলে পাহাড়-নদী পেরিয়ে বন্ধুর পথ বেয়ে ওপরে উঠতে হত। সেই জন্যেই স্বর্গে যাওয়াটা যাত্রামাত্র নয়, সে ছিল স্বর্গারোহণ। সেইজন্যই উত্তর আরও উত্তর দেশের উচ্চ ভূমি বা পর্বতই ছিল স্বর্গ। আর্যরা যতদিন ইলাবৃত-বর্ষে ছিলেন তখন সেটাই ছিল স্বর্গ। কিন্তু কাশ্মীর হয়ে তাঁরা যখন আরও নীচে উত্তর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন, তখন ইলাবৃত-বর্ষের পথ তাঁদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরকে তাই বদরীনারায়ণ এবং মানস সরোবরের পথে স্বর্গারোহণ করতে হয়েছে। ইলাবৃত-বর্ষ যে দেবতাদের বাসভূমি সে তো আমরা পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে বলেইছি। গিরীন্দ্রশেখরের ধারণা—ইলাবৃত-বর্ষের মধ্যে যে মেরু-পর্বত (এই মেরু পৃথিবীর অক্ষপ্রান্ত মেরু নয়)

সেইখানেই দেবতাদের বাস ছিল। বায়ুপুরাণে আছে—বেদ-বেদাঙ্গ জানা পণ্ডিতেরা নাকপৃষ্ঠ, দিব, স্বর্গ ইত্যাদি পর্যায়বাচক শব্দে মেরুমহিমা কীর্তন করেন। এই গিরিতেই দেবলোক বিরাজিত বলে সমস্ত শ্রুতি বা বেদে বলা আছে—দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্বশ্রুতিষু গীয়তে।

ঠিক এই জায়গাটা থেকেই আবারও আমরা মহাভারতের অমৃত-মন্থনের প্রস্তাবে ফিরে যাব। আপনাদের মনে আছে কি—আমি সেই বলেছিলাম—অথবা আমার কথা মনে রাখার দরকার কী, আপনারা অমৃত-মন্থনের পূর্বে মহাভারতের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন। সেই মেরুগিরি, যা উজ্জ্বল সুবর্ণপ্রভ, দেবতা-গন্ধর্বদের আনাগোনা যেখানে সব সময়। অধার্মিক লোকেরা যেখানে যেতে পারে না এবং যা নিজের উচ্চতায় স্বর্গকেও আবৃত করে রেখেছে—নাকমাবৃত্য তিষ্ঠতি। দেবতারা সেই মেরুপর্বতের শৃঙ্গে উঠে অমৃত আহরণ করার মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন—তস্য শৃঙ্গমুপারুহ্য...তত্রাসীনা দিবৌকসঃ।

এখানে এই পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করার মধ্যে একটা রহস্য আছে বলে আমাদের ধারণা। আগেকার দিনে দূরস্থান নির্ণয় করার জন্য লোকে গাছে উঠে দেখত। পাহাড়ে উঠেও দেখত। যদি বিশ্বাস করি—দেবতাদের স্বর্গে খাদ্য-পানীয়ের অকুলান হলে, নদ-নদী শুকিয়ে গেলে তাঁরা নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রয়োজনে মেরুপর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করে মন্ত্রণা আরম্ভ করেছিলেন—তে মন্ত্রিতুমারব্ধাস্তত্রাসীনা দিবৌকসঃ—তাহলে ব্যাপারটা সুধীজনের কাছে সমর্থনযোগ্য যতটাই হোক, বিশ্বাসযোগ্য হয় বটেই। অমৃত-মন্থনের শ্রেষ্ঠ ফল যদি শুক্রাচার্যের মৃতসঞ্জীবনীর মতো কোনও পরম ঔষধ হয়, তাহলে হস্তী, অশ্ব, সুরভি ইত্যাদি গৌণ ফল আর্যদের নূতন দেশ আবিষ্কারের সূত্রেই এসেছে। অমৃত-মন্থনের বাস্তব তাৎপর্য সেইখানেই। নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়া, গাছের ফল শেষ হয়ে যাওয়া অথবা স্থায়ী আবাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আর্যদের যে নতুন করে দেশ খুঁজতে বেরতে হয়েছে—সে কথা পুরাণগুলি থেকে যথোপযুক্ত স্থানে প্রমাণ দেব। হয়তো এই প্রবন্ধে নয়, অন্যত্র।

দেবতা, অসুর, রাক্ষস—এঁদের পারস্পরিক স্থিতি নিয়ে বহু আলোচনার অবসর আছে। আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু মনে রাখুন—মানুষের সঙ্গে এঁদের বড় তফাত নেই। পুরাণ-কথা এবং দর্শন গ্রন্থগুলি থেকে এঁদের পারস্পরিক স্থিতি বোঝাতে গেলে যে সময় এবং জায়গা লাগবে তাতে আপাতত আমাদের মহাভারত-কথার ছন্দ নষ্ট হতে পারে। আপাতত তাই বিরতি।

অমৃত-মন্থনই যখন হয়ে গেল, তখনই আমাদের দায় আসল সৌতি উগ্রশ্রবার কাছে ফিরে যাওয়ার। অমৃত-মন্থনের কাহিনী বলে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন—দেবতাদের মধ্যেও মানুষের মতোই লোভ, তৃষ্ণা, ছলনা এবং হিংসার বৃত্তিগুলিও আছে। বৈরোচন বলি এবং দেবরাজের কথোপকথনের অংশমাত্র দেখিয়ে দেবতাদের নশ্বরতার কথাও যে আমরা খানিকটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, তার কারণ আর কিছুই নয়, এতে প্রমাণ হবে—দেবতারা কেউই মনুষ্যবৃত্তির উর্ধ্বে নন—আকারে ইঙ্গিতে এবং ব্যবহারে এই কথাটাও অমৃত-মন্থন কাহিনীর অন্যতম উদ্দেশ্য বলে আমরা মনে করি।

সৌতি উগ্রশ্রবার মুখে অমৃত-মন্থনের কাহিনী এসেছিল নাগদের প্রসঙ্গ থেকে। আরও স্পষ্ট করে বলা ভাল—তক্ষকের প্রসঙ্গ থেকে। নাগরা রক্ষা পেলেন তাঁদেরই পরমাত্মীয় আস্তীক মুনির করুণায় এবং মধ্যস্থতায়। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ শেষ হয়ে গেল নাগ জন-জাতির সঙ্গে

AMARBOI.COM

তৎকালীন ক্ষত্রিয়দের মিলন-যজ্ঞে।

একই সঙ্গে সৌতি উগ্রশ্রবার কাজও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এবার জনমেজয়ের রাজসভার কাহিনীতে চলে যাবেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সানন্দ সমাপনে সভাস্থলে আনন্দের কলতান উঠল। সমবেত ঋষি-মুনি থেকে আরম্ভ করে শিল্পী-স্থপতি, সূত-মাগধ কেউ জনমেজয়ের দান-মান থেকে বঞ্চিত রইলেন না। এই দান-গ্রহীতার তালিকায় আরও একটি নামের কথা আমি পূর্বে বলেছিলাম। তিনি হলেন এই সৌতি উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণ। জনমেজয়ের সভায় ব্যাস-বৈশম্পায়নের সান্নিধ্যে মহাভারত শুনে লোমহর্ষণ মহাভারতে কথক-ঠাকুর হয়ে উঠবেন পরে।

লোমহর্ষণ অবশ্য তখনও লোমহর্ষণ হননি, কারণ মহাভারত তখনও বলা হয়নি। এই যে জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞ মিটে গেল, সভাস্থ সকলের মন ভরে উঠল আনন্দে, তখনই সূচনা হল মহাভারত-কথার। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের আরম্ভেই মহামতি ব্যাস এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

জনমেজয়ের বড় ইচ্ছা ছিল—অতিবৃদ্ধ এই প্রপিতামহের কাছে নিজের পূর্বজদের রাজকাহিনী শুনবেন। কিন্তু সর্প-যজ্ঞের ব্যস্ততা আর প্রতিহিংসার তাড়নার মধ্যে সে কাহিনী শোনার অবসর হয়নি। আজ যখন মিলন আর সংহতির সূচনা করে যজ্ঞ শেষ হল, তখন অপার আনন্দে জনমেজয় অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের জন্য সোনার আসন তৈরি করালেন রাজসভায়। জনমেজয়ের তৈরি সেই আসন আজও আছে মানুষের মনে। আজও ভাগবত-পাঠের আসরে যে মান্য ব্যক্তিটি বক্তার আসনে বসেন, সেই আসনটির নাম ব্যাসাসন।

ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ব্যাসের কাছে জনমেজয় হাত জোড় করে অনুরোধ জানালেন—পাণ্ডব-কৌরবের সমস্ত ঘটনাই আপনি সামনে থেকে দেখেছেন—ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্—আপনি আমাদের কাছে তাঁদের সমস্ত ঘটনা এবং তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করুন। শুধু তাই নয়, এই যে বিরাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে গেল, সেই যুদ্ধ কেন ঘটল, কেনই বা এত প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল—আপনি শোনান আমাদের।

জনমেজয়ের প্রশ্নের মধ্যে কুরু-পাণ্ডবের রাজনৈতিক ইতিহাসের জিজ্ঞাসাই শুধু ছিল না, তার মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক রাজনীতির জিজ্ঞাসা ছিল। জনমেজয় শুধু কুরু-পাণ্ডবের জ্ঞাতিবিরোধটুকুই জেনে ক্ষান্ত হতে চান না, এই বিরাট যুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধ কত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল, যাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেন দুই পক্ষে এবং মারা গেলেন—জনমেজয় এই রাজনৈতিক বৃত্তান্ত আমূলান্ত জানতে চান—তচ্চ যুদ্ধং কথং বৃত্তং ভূতান্তকরণং মহৎ?

হায়! যে বালক এই মুহূর্তে ঠাকুরদাদার কাছে নাতিটির মতো প্রশ্ন করে বসল—পাণ্ডব-কৌরবের গল্প বলুন—সেই পাণ্ডব-কৌরবের গল্প বলা কি অতই সহজ! ব্যাসের বয়স এবং সম্বন্ধের তুলনায় জনমেজয় একটি বালকমাত্র। জনমেজয় অর্জুনের নাতি। অতএব তার কাছে পাণ্ডব-বীর অর্জুন অথবা ভীমের বীরত্ব কিংবা যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণের বিশাল ব্যক্তিত্বময় কাহিনীটুকুই সব চাইতে বড়। কিন্তু ব্যাস! তিনি যে স্বয়ং এই পাণ্ডব-কৌরব বংশের জন্মদাতা। এই বংশের ওপর যে তাঁর অশেষ মায়া। সেই মহান বংশের জাতকেরা পরস্পর হানাহানি করে মরল—এক পক্ষ জিতল, এক পক্ষ হারল—এসব কথা কেমন করে নিজ মুখে বলবেন ব্যাস। তিনিও যে পাণ্ডব-কৌরবের পিতামহ। বলতে পারেন—মুনি-ঋষিদের আবার অত মায়া কী?

তাঁরা তো সুখ-দুঃখে, লাভালাভে সমান দৃষ্টি। তাঁদের আবার কীসের মায়া? আমি বলি—মুনি-ঋষি হলেও তাঁরা আগে মানুষ। মহাভারতের পরবর্তী অংশে আমি মাঝে-মাঝেই দেখাব—এই নিষ্কাম সমাধি-লগ্ন মানুষটি কোন মায়ায়, কোন সুতোর টানে পাণ্ডব-কৌরবের মর্ম-কথায় জড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আজ এই বালক জনমেজয়ের সামনে সেই মায়া, সেই একান্ত মনুষ্যোচিত ব্যক্তিসত্তার প্রথম উন্মোচন ঘটল।

ব্যাস ব্যাসাসনে বসেও নিজ মুখে মহাভারতের কাহিনী বলতে পারলেন না। নিজে বললে নানা কথায়, বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপক্রমে তাঁর পক্ষপাত—একতরের প্রতি পক্ষপাত, অন্যতরের প্রতি দোষদৃষ্টি প্রকাশ পেতে পারে। অতএব যে নৈর্ব্যক্তিকতায় কবি তাঁর মর্মশায়ী ঘটনা বিবৃত করেন, যে রসবত্তায় এক প্রেমিক তাঁর না-পাওয়া প্রেমিকার সঙ্গে aesthetic distance বজায় রেখেও তাঁকে ভালবেসে যান, তাঁর গল্প বলেন, ঠিক সেই নৈর্ব্যক্তিকতায় সেই রসবত্তায় মহামতি ব্যাস মহাভারতের কাহিনী লিখে রেখেছেন। কিন্তু সে কাহিনী তিনি নিজে বলতে পারছেন না। তাই আপন বংশের জাতক বালক জনমেজয়ের মুখে পাণ্ডব-কৌরবের গল্প বলার অনুরোধ শুনেই তিনি তাঁর প্রিয়-শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করলেন তাঁর স্বলিখিত মহাভারতের কাহিনী শোনানোর জন্য—শশাশ শিষ্যমাসীনং বৈশম্পায়নমন্তিকে। ব্যাস বললেন—কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ কেমন করে ঘটেছিল, তা যেমনটি তুমি আমার কাছে শুনেছ সব খুলে বল—তদস্মৈ সর্বমাচক্ষ্ব যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি। বৈশম্পায়ন গুরুর আদেশ পেয়ে মহাভারতের অমৃত-কথা আরম্ভ করলেন—বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৈশম্পায়ন। কথক ঠাকুরদের মধ্যে তাঁর মতো বক্তা আর নেই। স্বয়ং ব্যাস নিজের হাতে তাঁকে তৈরি করেছেন বিচিত্র মহাভারত-কথা জনসমক্ষে শোনানোর জন্য। অন্য কথক-ঠাকুরদের মতো তিনি সূত-জাতীয় নন। তিনি ব্রাহ্মণ। গুরুর আদেশ পাওয়া মাত্র তাঁর যেটা কর্তব্য অথবা ইচ্ছে ছিল তা কিন্তু তিনি করতে পারলেন না। এবং এইখানেই তাঁর বুদ্ধি। যে গুরুদেব তাঁকে হাতে ধরে মহাভারত কথা শিখিয়েছেন, যিনি নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করতে পারবেন না—এই ভয়ে নিজে মহাভারতের কথা বললেন না, বৈশম্পায়নের ইচ্ছে ছিল সেই গুরুর প্রসঙ্গটাই আগে তোলার। কিন্তু বুদ্ধিশালী এই কথক-ঠাকুর রাজা জনমেজয়ের আগ্রহটা কোথায়—তা খেয়াল করেছেন। রাজা চান—তাঁর পিতৃ-পিতামহের বীরত্ব-কাহিনী শুনতে। আর বৈশম্পায়ন চান—বিদ্যাদায়ী গুরুর মহিমা কীর্তন করতে। কিন্তু দুয়ের দ্বৈরথে শ্রোতার আগ্রহই যেহেতু বড় কথা, তাই বুদ্ধিশালী বৈশম্পায়ন আগে গোটা মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার শুনিয়ে দিলেন রাজা জনমেজয়কে। এতে রাজার জিজ্ঞাসা শান্ত হল বটে, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাঁর আগ্রহ হয়ে উঠল দ্বিগুণ। বৈশম্পায়ন এইটাই চাইছিলেন। এরপর রাজা যেই বিস্তারিত কাহিনী শুনতে চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৈশম্পায়ন আপন গুরু বেদব্যাসের জীবন-কথা শুনিয়েছেন জনমেজয়কে কিন্তু তাও বড় সংক্ষেপে। আমার কথা হল—জনমেজয়ের আগ্রহ সত্ত্বেও মহাভারতের কথক-ঠাকুর যেমন শেষ পর্যন্ত নিজের মতো করেই মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তেমনই আজকের দিনে মহাভারত-কথা শোনাতে হলে তার জটিল জায়গাগুলি আমাকে যে যথাসম্ভব সহজ পদ্ধতিতে বলতে হবে, সেই অঙ্গীকার নিয়েই আমাদের উপাখ্যান-ভাগ আরম্ভ হবে আগামীতে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

সতেরো

চন্দ্রবংশ। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশ। কৌরব, পাণ্ডব, ভীষ্ম, শান্তনু যে বংশের অধস্তন গৌরব-মূর্তি, সে বংশের প্রথম পুরুষ হলেন চন্দ্র। আমরা বংশমূল থেকেই মহাভারত-কথা আরম্ভ করব। তার কারণ, মহাভারত-কথা পাণ্ডব-কৌরবের যুদ্ধকাহিনীই শুধু নয়, সে শুধু একটামাত্র বংশের ইতিহাসও নয়, ভারতের ইতিহাস। আরও মনে রাখতে হবে— মহাভারত-কথায় আমরা শুধু অতি সংক্ষিপ্তভাবে অর্জুন-কর্ণ, ভীম-দুর্যোধন অথবা ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের বীরত্ব, সাহস এবং মর্যাদায় মোহিত হই। কিন্তু এই বংশে এত বড় বড় সব রাজপুরুষ আছেন, যে, তাঁদের শৌর্য-বীর্য অথবা মহানুভবতা তাঁদের অধস্তনদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। অপিচ তাঁদের কীর্তি-কলাপ এবং বংশধারাগুলি পরিষ্কার ভাবে জানলে পরে দেখা যাবে—মহাভারতের যুদ্ধ মোটেই কুরু-পাণ্ডবের গৃহ-বিবাদমাত্র নয়, এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু আগেকার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত বিবাদও। আমরা তাই প্রথম থেকে আরম্ভ করছি।

প্রথমে চন্দ্র। সেকালের দিনে অনেক প্রসিদ্ধ বংশেরই মূল পুরুষকে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীকে কল্পনা করা হত। প্রাচীন চীন-দেশেও এই রীতি ছিল। আমাদের দেশেও চন্দ্র-সূর্যের প্রতীকে দুটি বিখ্যাত বংশধারার কল্পনা। রাম-রঘু ইক্ষ্বাকু বংশের মূলে আছেন সূর্য আর পাণ্ডব-কৌরব, ভীষ্ম-শান্তনুর মূল পুরুষ হলেন চন্দ্র।

আদি মানব-মানবী বলতে ওদেশে যেমন শুধু অ্যাডাম এবং ইভ, আমাদের দেশে তেমন 'প্রোজেনিটর' অন্তত দশজন আছেন। মহাভারত-পুরাণের মতে ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে অন্তত দশটি পুত্র উৎপাদন করেন এবং সেই দশজনকেই তিনি পুত্র-সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত করেন। এঁদের বলা হয় প্রজাপতি। এই প্রজাপতিদের অন্যতম হলেন মহর্ষি অত্রি।

ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে মহর্ষি অত্রি পুত্র-সৃষ্টির তপস্যায় বসলেন। পরম আনন্দ-স্বরূপ

ব্রহ্ম-জ্যোতিকে তিনি তাঁর দুই নয়নের মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন। ঠিক এই সময়ে দেবদেব শঙ্কর প্রিয়া পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন অত্রির সামনে। তাঁদের দেখে তপস্যারত অত্রির নয়ন বেয়ে এক বিন্দু আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল; আর সেই আনন্দের অশ্রুবিন্দু থেকেই জন্ম হল শিশু চন্দ্রের—তস্মাৎ সোমো' ভবচ্ছিন্নঃ তাঁর স্নিগ্ধ আলোয় তিন ভুবন আলোয় আলো হয়ে গেল। দিগ্‌বধূরা শিশু-চন্দ্রকে ধারণ করলেন আপন গর্ভে।

বস্তুত, আকাশে চাঁদ ওঠে বলেই দিগবধূর কল্পনা। দিগ্‌বধূদের গর্ভস্থ সন্তানকে ব্রহ্মা এক মনোহর যুবা-পুরুষে পরিণত করেন এবং সমস্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি তাঁকে বৈদিক সোম-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করলেন। বেদে সোমরস কোনও ওষধির নির্যাসই হোক, অথবা লতার নির্যাস, ঋষিরা সোমের উদ্দেশে বহু স্তুতি-সূক্ত রচনা করেছেন। তাঁকে রাজা বলেও সম্বোধন করেছেন সোমং রাজানং হবামহে...ইত্যাদি। বেদে সোমের এই রাজকল্পনা থেকেই পুরাণে সোমকে দেবতা, পিতৃগণ এবং ওষধির আধিপত্য দেওয়া হয়েছে। ঋষিমুনিদের অহরহ স্তুতিতে তাঁর শরীর আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল—স্তূয়মানস্য তস্যাভূদ্ অধিকো ধামসম্ভবঃ।

যুবা-পুরুষ চন্দ্রের চেহারাটি এমনই সুন্দর এবং কমনীয় হল যে অন্য আরেক প্রজাপতি দক্ষ তাঁর সমস্ত নক্ষত্র-কন্যাকে সম্প্রদান করলেন চন্দ্রের হাতে। নক্ষত্রসুন্দরী রোহিণী এবং চন্দ্রের গভীর অনুরাগের কথা আমরা আগে বলেছি এবং সেই অনুরাগের ফলে দক্ষ-প্রজাপতির অন্য কন্যাগুলির কী দুরবস্থা হয়েছিল, তাও আমরা সবিশেষ কীর্তন করেছি। চন্দ্রের যক্ষ্মা-রোগের কাহিনীও আমরা মহাভারত থেকে শুনিয়েছি। শুধু যেটা বলিনি—সেটা হল চন্দ্রের একগুঁয়ে প্রকৃতির কথা, যদিও দক্ষ-প্রজাপতির সনির্বন্ধ অনুরোধ-উপরোধ প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা থেকে চন্দ্রের স্ত্রৈণতা এবং একগুঁয়েমি—দুটোই বেশ ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করি।

মুশকিল হল—চন্দ্রের জীবন-কাহিনীর সব অংশ মহাভারতে নেই। কোথাও বা অনেক বড় কাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডব-কৌরব-বংশের মূল পুরুষকে আমরা এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি না। তাই প্রচুর-পুষ্পামোদী মধুকরের মতো অনেক কাহিনীই আমাকে বিভিন্ন পুরাণ থেকে সংগ্রহ করে এনে এই ভারত-কথার মধুকোষে সঞ্চয় করতে হচ্ছে।

মহাভারতের কবি একেবারে অন্যপ্রসঙ্গে বনপর্বে একবার বলেছিলেন—দেবগুরু বৃহস্পতির যিনি স্ত্রী ছিলেন, তাঁকে চন্দ্রের স্ত্রীও বলা যায়—বৃহস্পতেশ্চান্দ্রমসী ভার্যাসীদ্ যা যশস্বিনী। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, সে ব্যঞ্জনা আর ভাষার স্থূলতায় ব্যক্ত করেননি কবি। হয়তো সে প্রসঙ্গও আসেনি। অথবা হয়তো সেই গভীর কথাটা তাঁরও মনে ছিল—যা তিনি মহামতি বিদুরের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন উদ্যোগ-পর্বে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—মহা-মহা-ঋষি-মুনি আর বড় বড় কীর্তিশালী বংশের মূল খুঁজতে যেও না কখনও—কুলানাঞ্চ মহাত্মনাং... প্রভবো নাধিগন্তব্যঃ।

এই সাবধান-বাণী এই জন্য যে, মহৎ বংশের গায়ে কলঙ্কের চিহ্ন থাকলে অল্পসত্ত্ব লোকের মুখ বড় মুখর হয়ে ওঠে। যাদের ধারণ ক্ষমতা কম, তারা ওইটুকু দিয়েই বিশিষ্ট জনের বিচার করতে শুরু করে। মহাভারতের কবি তাই কুরু-পাণ্ডব বংশের মূল ব্যক্তিটির চরিত্র-চর্চার মধ্যে যাননি। আমরা অবশ্য সেই চর্চায় যাচ্ছি। যাচ্ছি পৌরাণিকদের হাত ধরে, যদিও খলস্বভাব দুর্মতিদের জন্য আমার দুর্ভাবনা এবং করুণা—দুইই রয়ে গেল।

পুরাণ বলেছে—দক্ষ-কন্যাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পন্ন হওয়ার পর চন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা আরম্ভ করলেন। উগ্র তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু যখন বর দিতে চাইলেন—তখন চন্দ্র

বললেন—আমি যেন ইন্দ্রলোক জয় করতে পারি—ততো বব্রে বরাণ্ সোমঃ শক্রলোকং জয়ামহ্যম্। সমস্ত দেবতাকে আমি যেন আমার গৃহে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। তার মানে, আমরা যারা এতদিন ইন্দ্রকেই দেবরাজ্যের অন্যতম নায়ক ভাবতাম, তা কিন্তু ঠিক নয়। চন্দ্র ইন্দ্রলোকের অধিকার চান এবং দেবতাদেরও তিনি স্বভবনে চোখের সামনে দেখতে চান। তিনি চান—দেবতারা তাঁর বাড়িতে নিত্য আহার করেন—প্রত্যক্ষমেব ভোক্তারো ভবন্তু মম মন্দিরে। এ ভাব যেন সেই নতুন এবং উঠতি বড়লোকের মতো—তিনি বড় একটি এস্টেট্ চান এবং চান—বড় বড় লোকেরা তাঁর বাড়িতে খানাপিনা করুন—এতে তিনি নিজে মর্যাদাসম্পন্ন বোধ করেন। অর্থাৎ চন্দ্র তাঁর মহান পুণ্যবলে জনার্দন বিষ্ণুর বরে স্বর্গলোকের অধিকার পেতে চলেছেন, এবং দেবতা বলে কথিত মহামানবদের সঙ্গে এখন থেকে তাঁর নিত্য ওঠা-বসা চলবে।

শুধু এইটুকুই নয়। ভগবান বিষ্ণুকে তিনি বলেছেন—একটি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাই আমি, এবং সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কাজ করবেন স্বয়ং দেবতারা, আর শূলী শম্ভু সদা নিযুক্ত থাকবেন আমার রক্ষাকার্যে। ভগবান বিষ্ণু চন্দ্রের সমস্ত প্রার্থনা পূরণ করলেন। তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে সামগান করলেন স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা। অন্যান্য দেবতা সমস্ত যজ্ঞকার্য সমাধা করলেন সানন্দে। রাজসূয় যজ্ঞের পর কমনীয়, সুন্দর চন্দ্র আপন উজ্জ্বলতায় কমনীয়তর, সুন্দরতর হলেন।

অভাবনীয় ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল ঠিক এর পর থেকেই। স্বর্গের অধিকার, দেবতাদের পৌরোহিত্য, রাজসূয় যজ্ঞ—এই সব কিছু মিলে চন্দ্রের শারীরিক উজ্জ্বলতা শুধু নয়, এসব তাঁর মান-মর্যাদা এবং রাজকীয়তাও অনেক বাড়িয়ে তুলল। পুরাণ বলেছে—চন্দ্রের এই অলোক সামান্য মাহাত্ম্য লক্ষ করে দেব-রমণীরা চন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হতে লাগলেন, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে। অন্তত ন'জন সুন্দরী দেব-স্ত্রী, যাঁদের নাম শুনলে অবাক হতে হবে—তাঁরা তাঁদের স্বামী ছেড়ে চন্দ্রের সেবা করতে চাইলেন দাসীর মতো—কামবাণাভিতপ্তাঙ্গ্যো নব দেব্যঃ সিষেবিরে। এঁদের সবাইকে সাধারণ জনে চিনবেন না—যেমন প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী সিনীবালী, কিংবা বিভাবসুর স্ত্রী দ্যুতি, অথবা জয়ন্তের স্ত্রী কীর্তি। এঁরা না হয় অচেনা, অথবা এঁদের নামের মধ্যে হয়তো রূপকের প্রশ্রয় আছে, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মীও তাঁর স্বামীকে ছেড়ে চন্দ্রের প্রেমে পড়লেন—লক্ষ্মী নারায়ণং ত্যক্ত্বা সিনীবালী চ কর্দমম্। সব চেয়ে বড় কথা—এঁরা না হয় স্বামী ছেড়ে চলে এলেন, কিন্তু চন্দ্র? চন্দ্রও সেই দেব-রমণীদের সঙ্গে আপন স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করতে লাগলেন—স্বকীয়া ইব সোমো'পি কাময়ামাস তাস্তদা।

ধরে নিতে পারি—এই নয় জন দেবপত্নীর কথাটা পৌরাণিকের অতিশয়োক্তি। কেননা, দ্যুতি, কীর্তি, প্রভা, এমনকি লক্ষ্মী—এই স্ত্রীলিঙ্গ-নামগুলি পরিচিত দেবপত্নীদের নাম হিসেবে খুব যুৎসই নয়। প্রধানত চন্দ্রের শারীরিক সৌন্দর্য এবং দেবসমাজেও তাঁর অতুল প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে—সোমঃ প্রাপ্যাথ দুষ্প্রাপ্যম্ ঐশ্বর্যমৃষিসংস্কৃতম্—এবং তা করা হয়েছে একটু পরেই আসল সত্য ঘটনাটি বলার জন্য। রাজার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মী নারায়ণকে ছেড়ে কৃতী রাজার আশ্রয় নিয়েছেন—এই রূপক পুরাণে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সহস্রবার লক্ষ্য করা গেছে।

লক্ষ্মী শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য। রাজা ঐশ্বর্য এবং প্রতিপত্তিশালী হলেই কবিরা এই উৎপ্রেক্ষা করে, কবিত্ব করে বলেছেন যে, লক্ষ্মী নারায়ণকে ছেড়ে রাজার আশ্রয় নিয়েছেন। কাজেই

দ্যুতি, কীর্তি, প্রভা, লক্ষ্মীর মতো স্ত্রীরা চন্দ্রের সাহচর্য পাওয়ার জন্য অভিভূত হলেন—এ কথাটা খুব বড় কথা নয়। আসলে চন্দ্র যে আপন প্রভাবে রমণী-সমাজে কতটা কাম্য হয়ে উঠেছিলেন, এটা যেমন এই ঘটনায় প্রমাণিত হল, তেমনই স্ত্রৈণতার ব্যাপারে চন্দ্রেরও যে খুব গুরু-লঘু বোধ ছিল না, সেটাও একাধারে বলে দেওয়া গেল। মূল সত্যি ঘটনাটা কিন্তু এর পরে আসছে—যে ঘটনায় সাক্ষী শুধু পুরাণগুলি নয়, সাক্ষী আছে মহাভারতের সেই সংক্ষিপ্ত পংক্তিটি—বৃহস্পতির যিনি স্ত্রী, তিনি আসলে চন্দ্রেরই স্ত্রী—বৃহস্পতেশ্চান্দ্রমসী ভার্যাসীদ্ যা যশস্বিনী। ঘটনাটি এবার বলি।

চন্দ্রের তখন বিশাল ঐশ্বর্য, অগাধ প্রতিপত্তি। ত্রিভুবন তাঁর কাছে খুবই ছোট কথা, সপ্ত লোকের আধিপত্য তাঁর করতলগত—সপ্তলোকৈকনাথত্বম্ অবাপ তপসা সদা। এই রকমই এক স্বাধিকার আর সুখের সময়ে চন্দ্র তাঁর ভবন-সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে পাদচারে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎই সেখানে দেখতে পেলেন এক সুন্দরী রমণী। উদ্যানের ফুলের আভরণ তাঁর গায়ে। স্তন-জঘনের সৌন্দর্যে পরম আকর্ষণীয়া। কোমল শরীর, যেন ফুল ছিঁড়তে গেলেও তাঁর আঙুলে ব্যথা লাগবে—পুষ্পস্য ভঙ্গে' প্যতিদুর্বলাঙ্গীম্।

চন্দ্রে বিলাস-উদ্যানে যে রমণীটিকে এইমাত্র দেখা গেল ইনি দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী—তারা। নিসর্গ-সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্যের আধারভূতা এই রমণীটিকে দেখে চন্দ্র মনের আবেগ রুদ্ধ করতে পারলেন না। নির্জন উদ্যানভূমির সমতলে দাঁড়িয়ে তিনি তারাকে আলিঙ্গন করলেন। তারার গ্রন্থিবদ্ধ কেশরাশি আলুলায়িত হল—কেশেষু জগ্রাহ বিবিক্তভূমৌ। বোঝা গেল, স্বয়ং দেবগুরুর পরিণীতা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা চন্দ্রের রূপে এবং প্রতিপত্তিতে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন—তদ্-রূপকান্ত্যা হৃতমানসেন—যে, এই বলাৎকারী রসিককে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, তিনি শরীরে ও মনে খুশি হলেন। অনেক দিন সেই উদ্যান-ভূমির মধ্যেই কেটে গেল রসে-রমণে। চন্দ্রের সঙ্গে তারার সাহচর্য ঘনীভূত হল।

বৃহস্পতির পত্নী বাড়ি ফেরার নামও করলেন না। উদ্যান-বিলাসের দিন শেষ হলে চন্দ্র তারাকে একেবারে নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললেন। সুন্দরী তারার সাহচর্য-সুখ এমনই যে চন্দ্রের তৃপ্তি কখনও শান্তির পর্যায়ে আসে না—বিধুগৃহীত্বা স্বগৃহং ততো'পি/ন তৃপ্তিরাসীচ্চ গৃহে'পি তস্য।

অন্য একটি পুরাণে দেখা যায়—চন্দ্রের বিলাসোদ্যানে তারার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। এখানে বৃহস্পতি স্বয়ং নিজের কপাল নিজে পুড়িয়েছিলেন। বৃহস্পতি দেবগুরু, ফলে দেবতারা সকলেই তাঁর যজমান। চন্দ্রও তাই। কোনও কারণে সেদিন বৃহস্পতির স্ত্রী তারা যজমান-শিষ্যের বাড়িতে এসেছিলেন—গতৈকদা বিধোর্ধাম যজমানস্য ভামিনী। সেই প্রথম চারিচক্ষুর মিলন হল এবং দুজনেই দুজনকে দেখে রসাবিষ্ট হলেন। তারা আর শিষ্যবাড়ি থেকে ফিরে যাননি। চন্দ্রও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ করেননি। এদিকে নিজের বাড়িতে বসে দিনরাত তারার চিন্তায় বৃহস্পতির দিন কাটতে লাগল। তিনি কিছু বলতেও পারছেন না, কিছু করতেও পারছেন না। ভাবলেন—বামুন-ঘরের বউ, কিছুদিন গেলেই সুমতি হবে, তারা ফিরে আসবেন। কিন্তু বৃহস্পতির গণনা মিথ্যা হল, তারা ফিরলেন না।

অনেক দিন চলে গেল। বৃহস্পতি এবার এক শিষ্যকে চন্দ্রের বাড়িতে পাঠালেন তারাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তারা ফিরলেন না, চন্দ্রও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার নামও করলেন না। একবার নয়, বৃহস্পতির শিষ্য বারবার গেলেন চন্দ্রের বাড়িতে বার্তাবহ হয়ে। বারবার

amarboi.com

বিফলতায় ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহস্পতি নিজেই এবার উপস্থিত হলেন শিষ্যবাড়িতে। চন্দ্রের বাড়িতে। হুংকার দিয়ে চন্দ্রের উদ্দেশে বললেন—ব্যাপারটা কী হচ্ছে? আমার সুন্দরী স্ত্রীটিকে তুমি নিজের ঘরে আটকে রেখেছ? তুমি কি জান না—আমি দেবগুরু, আর তুমি আমার শিষ্য, যজমান?

প্রথমে একটু ভালভাবেই বলেছিলেন বৃহস্পতি। একটু রেখে ঢেকে। কিন্তু চন্দ্রের মুখে অবহেলার হাসি দেখে বৃহস্পতি বললেন—লজ্জা করে না তোর? গুরুর স্ত্রীকে ভোগ করে যাচ্ছিস? তাঁকে আটকে রেখেছিস বাড়িতে? গুরুপত্নীগামী পুরুষ যে কত বড় মহাপাতকী—সে কি তুই জানিস না? তুই যদি সত্যিসত্যিই তাঁকে ভোগ করে থাকিস, তাহলে তুই এই দেবস্থানে থাকার যোগ্য নোস একটুও—ন দেবসদনার্হোঽসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা। বৃহস্পতি এবার আসল কথাটা বললেন। বললেন—কালো চোখের সুন্দরী আমার বউটি। আহা! তাঁকে তুই এই মুহূর্তে ছেড়ে দে, নইলে অভিশাপ দেব এবার। বৃহস্পতি বোঝাতে চাইলেন—তাঁর স্ত্রীর কোনও দোষই নেই, যত দোষ তাঁর শিষ্যের।

চন্দ্রের মাথা রাজার মতোই ঠান্ডা। বৃহস্পতির অনুযোগ একটুও গ্রাহ্য না করে তিনি ঠান্ডা মাথায় বলতে আরম্ভ করলেন—বামুন মানুষের অত কি রাগ করলে চলে, ঠাকুর! ক্রোধের মতো একটা রিপু থাকলে মানুষ কি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারে সেই ব্রাহ্মণ-গুরুকে—ক্রোধান্তে তু দুরারাধ্যা ব্রাহ্মণা ক্রোধবর্জিতাঃ। সামান্য দুটো কথা বলার পরেই চন্দ্র এবার বৃহস্পতির তর্ক-যুক্তিতে এলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতি যে এতক্ষণ—'আটকে রেখেছিস', 'ভোগ করেছিস', 'ছেড়ে দে'—এসব কথা বলে বোঝাতে চাইছেন—তাঁর স্ত্রীর কোনও দোষ নেই, চন্দ্রই জোর করে তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অনর্থ ঘটিয়েছেন—সেই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে চন্দ্র এবার আইনি কায়দায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। চন্দ্র বললেন—সময় হলে তিনি নিজেই ফিরে যাবেন আপনার বাড়ি। এখানে ক'দিন সুখে আছেন, ভালই আছেন, তাতে আপনার কী ক্ষতিটা হল শুনি—কা তে হানিরিহানঘ? আর আমি কি তাঁকে জোর করে আটকে রেখেছি নাকি? এখানে তিনি নিজের ইচ্ছেয় আছেন এবং এখানে থাকতে ভালও লাগছে তাঁর—ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র সুখকামার্থিনী হি সা।

চন্দ্র একেবারে আধুনিক মতে ধর্ষণের দায় এড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়, বরং স্বেচ্ছায় তিনি সুখে আছেন। তাঁর ভাল লাগছে—সুখকামার্থিনী হি সা। সবার শেষে গুরুকে তিনি আশ্বস্তও করে দিলেন—এই তো, আর কিছুদিন থেকে তিনি হয়তো স্বেচ্ছাতেই আপনার বাড়ি যাবেন—দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা, স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি। ভাবটা এই—'মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ'—ইচ্ছা না হলে কিন্তু যাবেন না।

ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ বৃহস্পতি বাড়ি ফিরলেন। পৌরাণিক বলেছেন—শুধু দুর্ভাবনায় চিন্তাতুর হয়ে নয়, কামাতুর হয়েও ফিরলেন বৃহস্পতি—জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টো স্মরাতুরঃ। পৌরাণিক বৃহস্পতির মনস্তত্ত্ব বুঝেই এই মন্তব্য করেছেন। ঘরে থাকতে দৈনন্দিন দাম্পত্য অবহেলায় যে স্ত্রীকে বৃহস্পতি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করেননি, সেই স্ত্রীকেই পুরুষান্তরের শৃঙ্গার-সংসর্গ-লিপ্ত অবস্থায় কল্পনা করে বৃহস্পতি হয়তো কামাতুর হলেন। ঘরে ফিরে বেশিদিন তাঁর থাকা হল না। আবার এলেন চন্দ্রের বাড়িতে। এবারে বাড়ির দ্বারোয়ানরাই তাঁকে বাধা দিল। দ্বারপালেরাও প্রভুর ইচ্ছা বোঝে। বৃহস্পতি বাইরে থেকেই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন। বললেন—দেবতারা অধম! ঘরে শুয়ে আছিস কী করতে—কিং শেষে ভবনে মন্দ পাপাচার

সুরাধম? ভাল চাস তো আমার বউ আমায় ফিরিয়ে দে, নইলে তোর কপালে আমার অভিশাপ নাচছে—দেহি মে কামিনীং শীঘ্র নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্।

চন্দ্র বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। বিজয়ীর হাসি। পরের বউ স্বেচ্ছায় তাঁর বাড়িতে এসে রয়েছে। বাড়ি যাচ্ছে না। তাই বিজয়ীর হাসি হেসে চন্দ্র বাড়ির বাইরে এসে বললেন—মেলা বকছেন কেন, ঠাকুর—কিমিদং বহু ভাষসে? যে অসামান্যা রূপসীটিকে আপনি 'বউ-বউ' বলে স্বাধিকার ব্যক্ত করছেন, সে অন্তত আপনার উপযুক্ত নয়। আপনার যদি একান্তই স্ত্রীলাভের এত ইচ্ছা থাকে, তবে নিজের মতো চেহারার একটি খেঁদি-পেঁচি জোগাড় করে আনুন না, কে আটকাচ্ছে—কুরূপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণান্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ। টাকা নেই, পয়সা নেই, বউকে ভাল করে আরামে রাখার মুরোদ নেই; আপনার মতো ভিখারির ঘরে কি আর এত সুন্দরী একটি রমণীর মন টেকে—ভিক্ষুকস্য গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী। মেয়েরা নিজের সমান যোগ্য পুরুষকেই পছন্দ করে—এই সরল সত্যটা সম্বন্ধে যদি আপনার একটুও বোধ থাকত তা হলেও হত। চন্দ্র এবার শেষ এবং চরম কথাটা শুনিয়ে দিলেন। বললেন—আপনি এখন যেতে পারেন, গুরুঠাকুর! তারাকে আমি ফিরিয়ে দেব না। আপনার যা ইচ্ছে এবং যা পারেন করুন—যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী।

দেবগুরু বৃহস্পতি মহা বিপদে পড়লেন। শাপ দিয়ে ভস্ম করে দেবেন তারও উপায় নেই কোনও। অভিশাপ মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়েই আসছিল—কিন্তু চন্দ্র সে অভিশাপের ভয় পাচ্ছেন না একটুও। একে তো তিনি পূর্ব তপস্যার বলে বলীয়ান; দ্বিতীয়ত বৃহস্পতির স্ত্রী স্বয়ং তাঁর অনুরক্তা। এই অবস্থায় বৃহস্পতি বারংবার তাঁর স্ত্রীর অধিকার চাওয়ায় চন্দ্র তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছেন—আপনি নিজেই কামার্ত গুরুদেব, নইলে পালিয়ে যাওয়া একটি স্ত্রীলোকের জন্য কেউ আপনার মতো এরকম করে না, কামার্তস্য চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হসি—অতএব আপনার শাপে আমার কিছুই হবে না।

বৃহস্পতি কোনও শাপ উচ্চারণ করতে পারলেন না। তাঁর নিজের স্ত্রী তাঁর সঙ্গে বঞ্চনা করেছে, চন্দ্রকে অভিশাপ দিয়ে কী লাভ হবে তাঁর। রাগে কাঁপতে কাঁপতে এবার তিনি আর নিজের বাড়ি ফিরে এলেন না। সোজা উপস্থিত হলেন ইন্দ্রালয়ে, ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্রের কাছে নালিশ জানিয়ে বৃহস্পতি বললেন—আমার সুন্দরী স্ত্রীটিকে চন্দ্র হরণ করেছে। বারবার তাকে বলছি, কিন্তু সে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে এ ব্যাপারে?

ইন্দ্র দেবতাদের রাজার মতোই বৃহস্পতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আমি অবশ্যই আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনব আপনার কাছে। দরকার হলে যুদ্ধ করব। ইন্দ্র প্রথমে একটি দূত পাঠালেন চন্দ্রের কাছে। দূত গিয়ে প্রথমে ইন্দ্রের সদুপদেশ অনেক শোনাল—পরের স্ত্রী, বিশেষত গুরুপত্নীকে কি তোমার মতো নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ভোগ করা শোভা পায়? তাছাড়া ঘরে কি তোমার ভোগ্যা স্ত্রীর অভাব আছে? দক্ষের কন্যারা সকলেই তোমার স্ত্রী। এত নক্ষত্র-সুন্দরী থাকতে তোমার আবার গুরুপত্নীকে সম্ভোগ করার ইচ্ছে হল কেন—গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে?

ইন্দ্র দূতের মুখে এইটুকু জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। সুধাকর চন্দ্রের তৃপ্তির জন্য তিনি আরও কিছু ভাবনা-চিন্তাও করেছেন। দূতমুখে ইন্দ্র জানালেন—বেশ তো, তোমার নক্ষত্র-সুন্দরীদের যদি একান্তই ভাল না লাগে, তবে মনোহর এই স্বর্গভূমিতে সম্ভোগ-তৃপ্তির ব্যবস্থা কি কিছু কম

আছে? অপ্সরা সুন্দরী মেনকা আছেন, রম্ভা আছেন, উর্বশী আছেন। তুমি ভোগ করো। কে না করেছে? গুরুপত্নী তারাকে তুমি ছেড়ে দাও বাপু—ভুঙ্‌ক্ষ্ব তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি। তাছাড়া এই নিয়ে দেবতাদের মধ্যে অকারণ একটা ঝগড়াঝাটি পাকিয়ে উঠবে, সেটাও তো বাঞ্ছনীয় নয়। ইন্দ্র বোধহয় সামান্য যুদ্ধের ইঙ্গিত করলেন।

চন্দ্র অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে দূতের মুখে ইন্দ্রের কথা শুনলেন। এবার তাঁর জবাব দেবার পালা। চন্দ্রের জবাবের মধ্যে গুরুর প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রকাশ পেল না; কেঁচো খুঁড়তে সাপের মতো দেবগুরুর ব্যক্তিগত পূর্ব জীবনের এমন কতগুলি ঘটনা চন্দ্রের মুখে উচ্চারিত হল, যা ইন্দ্র-দূতের কাছে তো বটেই, বৃহস্পতির কাছেও বড় শ্রুতিমধুর ছিল না। আসলে বৃহস্পতি নিজের জালে নিজেই ধরা পড়েছিলেন, অথবা বলা উচিত নিজের কপাল নিজেই পুড়িয়েছিলেন। কেমন করে তা বলি?

আঠারো

ইন্দ্রের দূতকে শুনিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রের উদ্দেশেই কথাটা বললেন চন্দ্র। চন্দ্র বললেন—যেমন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ঠাকুরটি, ঠিক তেমনই তাঁর গুরুদেব এই বৃহস্পতি ঠাকুর। দুজনের বুদ্ধিই ঠিক এক রকম—পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ। আরে, পরকে উপদেশ দেওয়ার সময় সবাই মস্ত বড় পণ্ডিত, কিন্তু কাজের বেলায় পণ্ডিতেরা নিজের উপদেশ নিজেই খেয়াল করতে পারেন না—পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ। এই যে বাক্যবাগীশ বৃহস্পতি, তোমাদের গুরু-ঠাকুর! তিনি না মানব-জাতির হিতের জন্য বিরাট শাস্ত্র লিখে ফেলেছেন! তো তাঁর শাস্ত্রের বচন এখন কেমন লাগছে?

মনে রাখা দরকার সেকালের দিনে গুরু হয়ে বসাটা অত সহজ কাজ ছিল না। শুধু ব্রাহ্মণ্য নয়; বিদ্যা, শিক্ষা এবং তপস্যা—সব দিক দিয়েই গুরুদেবদের যথেষ্ট এলেম থাকার দরকার ছিল। বিশেষত যাঁরা সম্পূর্ণ একটি সমাজের গুরু হতেন, অথবা বড় বড় রাজবংশের গুরু হতেন, তাঁদের রাজনীতির বোধও ছিল অতি উচ্চ মার্গের। বৃহস্পতি সমস্ত দেব-সমাজের গুরু। রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতি নিয়ে তিনি যে রীতিমতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ লিখে ফেলেছিলেন—সে প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে বারংবার আছে। সেকালের দিনে রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খুললেই সেটা বোঝা যায়। স্বয়ং কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের মধ্যে দেব-সমাজের নীতিনির্ধারক বৃহস্পতি এবং অসুর-সমাজের নীতিকার শুক্রাচার্যের নানা মন্তব্য উদ্ধার করেছেন রাষ্ট্র এবং সমাজ-নীতির বিষয়গুলি পরিষ্কার করার জন্য।

এতে কোনও সন্দেহই নেই যে, বৃহস্পতির নীতি-নিয়মগুলি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী অর্থাৎ কৌটিল্যের আবির্ভাবের আগেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। মহাভারতীয় চরিত্রগুলির

মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী-গুণী এবং পণ্ডিত বলে পরিচিত, তাঁরা বৃহস্পতির রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন জানতেন, ঠিক তেমনই জানতেন শুক্রনীতি। আসল কথা, বৃহস্পতির শাস্ত্রের সঙ্গে শুক্রাচার্যের নীতি নিয়মের পার্থক্য ছিল। ভাল পড়ুয়ারা দুটোই জেনে ক্ষেত্রবিশেষে নিজের মত ব্যক্ত করতেন। মহাভারতে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন পিতামহ ভীষ্ম। তিনি বৃহস্পতি এবং শুক্র—দুজনের লেখা অর্থশাস্ত্রই খুব ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন।

কিন্তু অনেকেই আবার এমন ছিলেন, যাঁরা রাষ্ট্রের মঙ্গল বিধানে বৃহস্পতি অথবা শুক্র—একজনের মত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব—পাঞ্চাল-যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন বৃহস্পতি-নীতির পাঠ দিতেন অধ্যাপক, তখন সেই পাঠ শুনে-শুনেই বৃহস্পতির শাস্ত্র অধিগত করেছিলেন পাণ্ডব-ঘরণী দ্রৌপদী। রাষ্ট্র-বিষয়ক সেই সব চিন্তা সমস্ত জীবনে দ্রৌপদীর কত যে কাজে লেগেছে, সে সব আমরা পরে দেখব। এখন দেখতে হবে—বৃহস্পতি নিজে বই লিখে নিজের কী ক্ষতি করেছেন? কারণ, চন্দ্র বলেছেন—পরকে উপদেশ দেওয়ার সময় সবাই খুব দড়, কিন্তু নিজের বেলায় সে উপদেশ খাটে না মোটেই। অতএব সামান্য হলেও আমাদের জানতে হবে—কী সেই উপদেশ, যা পরকে দেওয়ার সময় বৃহস্পতির সমস্যা হয়নি, এবং যা কার্যক্ষেত্রে তাঁর সমস্যা বাড়িয়েছে।

বস্তুত, রাষ্ট্র এবং সামাজিক নীতি নির্ধারণে বৃহস্পতির নির্দেশ খুব অল্প নয়। যুদ্ধের উদ্যোগ করা উচিত কিনা, অথবা যুদ্ধ আরম্ভ হলে কীভাবে কোন ব্যূহ অনুসারে সৈন্য সাজিয়ে রাজা যুদ্ধ করবেন—এইসব কূটনৈতিক বিষয়ে যেমন বৃহস্পতির সুস্পষ্ট মত আছে, তেমনই সামাজিক তর্কযুক্তির ক্ষেত্রেও বৃহস্পতির বহুতর বক্তব্য আছে এবং সেই বক্তব্যগুলিই এই মুহূর্তে চন্দ্রের অনুকূলে এসেছে।

স্বর্গের মতো একটা রাজ্যে, দেবতাদের মতো ভোগী সমাজে গুরু হয়ে বসার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে বৃহস্পতির অভিজ্ঞতা কিছু কম ছিল না। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে বিধান দিয়েছিলেন যে, কোনও রমণী যদি স্বেচ্ছায় পুরুষের সম্ভোগবাসনায় সম্মতি দেয়, তবে তাকে ভোগ করায় পুরুষের তত দোষ লাগে না। চন্দ্র বললেন—আমি তো তাই করছি। গুরুর পত্নী স্বয়ং আমার আসঙ্গ-লিপ্সা করছেন, আমি তাঁর বাসনা পূরণ করছি তাঁরই সম্মতিক্রমে। তবে এই নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে আমার বিরোধের কোনও কারণই ঘটতে পারে না—কো বিরোধো'ত্র দেবেশ কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্। তারা বৃহস্পতির ধর্মপত্নী হতে পারেন, কিন্তু তিনি ভালবাসেন আমাকে, বৃহস্পতিকে তিনি ভালবাসেন না একটুও। তো বৃহস্পতি নিজের লেখা ধর্ম-নীতি অনুসারে কী করে এই অনুরক্তা রমণীটিকে আমি জেনে-বুঝে তাঁর কাছে যেতে দিই—অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধর্মতো ন্যায়তস্তথা।

ইন্দ্রের দূত কথাপ্রসঙ্গে একসময় একটু যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিল। চন্দ্র সেকথা ছাড়েননি। নিজের দাপট দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন—যান, যান। বড় বড় কথা না বলাই ভাল। নিজের স্ত্রী, পরের স্ত্রী—এত উপদেশের কিছু দরকার নেই। আমার ক্ষমতা আছে আমি ভোগ করছি। যার ক্ষমতা আছে, সব কিছুই তার নিজের—স্বকীয়ং বলিনাং সর্বং দুর্বলানাং ন কিঞ্চন—দুর্বল লোকের কিছুই নিজের নয়। চন্দ্র এবার দেবগুরুর উদ্দেশে বড় কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন এবং সে কথাটার মধ্যে বৃহস্পতির নিজস্ব ব্যর্থতার কথাও বড় প্রকট হয়ে উঠল। চন্দ্র বললেন—অনুরাগিণী স্ত্রীর সঙ্গেই লোকে ঘর বাঁধে, নতুন জীবন শুরু করে। কিন্তু স্ত্রী যদি একজনকে ভালই না বাসতে পারেন, তাঁর সঙ্গে তবে থাকবেন কী করে? তারা বৃহস্পতির ঘরে

এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যেদিন তিনি দেখলেন যে তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সঙ্গে শৃঙ্গার-রমণে মত্ত হচ্ছেন, সেদিন থেকেই সুন্দরী তারা আর বৃহস্পতিকে ভালবাসেন না। তিনি বিরক্ত হয়ে গেছেন বৃহস্পতির ওপর—বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমে'নুজকামিনীম্। অতএব যাও দূত! তারাকে আমি ফেরত দেব না। ইন্দ্রর যা ইচ্ছে হয় করতে পারেন।

এই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। অবধারিতভাবে প্রশ্ন আসে—বৃহস্পতির অনুজ ভ্রাতাটি কে? তাঁর সঙ্গে বৃহস্পতির সম্পর্কই বা কী? এই কথাগুলো অল্প হলেও বলতে হবে আমায়। যদিও মনে ভয় আছে—আপনারা ভাবতে পারেন—মহাভারতের কথারম্ভেই এসব কী আরম্ভ হল? এর বউ পালাচ্ছে! তার বউ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রেমলিপ্সু। এসব কী হচ্ছে? সবিনয়ে জানাই—এগুলি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কেন না প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে—বৃহস্পতি কিংবা চন্দ্র—এঁরা প্রত্যেকেই বিশাল ব্যক্তিত্ব। আমি একথা বলছি না যে, বিশাল ব্যক্তিত্ব মানেই সাত খুন মাপ। কিন্তু উলটো দিকে ভাবতে হবে—বিশাল ব্যক্তিত্ব হলে কিছু খুন তো মাপ হয় বটেই।

মনু রাজধর্মাধ্যায়ে বলেছিলেন—অন্যায়কারী ব্যক্তির শক্তি এবং বিদ্যা ভালমতো বিচার করে যতটুকু শাস্তি তার প্রাপ্য রাজা সেইটুকু দণ্ডই দেবেন—তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ। আজ যদি মহামান্য সুনীতি চ্যাটার্জি এবং আমি চুরির দায়ে ধরা পড়ি, তাহলে একই অভিযোগে আমার যা শাস্তি হবার কথা, সুনীতিবাবুরও তাই হবার কথা। কিন্তু শাস্তি দেবার সময় সুনীতিবাবুর মহতী বিদ্যাবত্তা তথা সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর মহান অবদানের কথা বিচার করে আদালত তাঁকে আমার চাইতে কম শাস্তি দেবেন, অথবা শাস্তি নাও দিতে পারেন। শুধু মৃদু তিরস্কার করেও ছেড়ে দিতে পারেন। একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জী বা মনমোহন সিং যদি আমার সঙ্গে একই অপরাধে অভিযুক্ত হন, তবে তাঁদের যা শাস্তি হওয়া উচিত, আমারও তাই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখবেন, একই শাস্তি হচ্ছে না। তার কারণ, এতদিন তাঁরা যে জনপ্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁদের পিছনে যে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন আছে, সেটা আদালতের বিচার-চর্যার মধ্যে আসবে এবং স্বভাবতই তখন তাঁর শাস্তি আমার তুলনায় অনেক হালকা হয়ে যাবে। ইচ্ছা করলে কিছুদিন পূর্বেই অযোধ্যাকাণ্ডের মামলায় বি জে পি নেতা কল্যাণ সিংহের সামান্য শাস্তির কথা স্মরণ করতে পারেন।

বলতে পারেন—এও কি কোনও গণতান্ত্রিক বিচার হল? নাকি এটার মধ্যে বিচারব্যবস্থার কোনও সমদৃষ্টি লক্ষিত হল? আমি বলব—যে গণতান্ত্রিকতায় আমার বুদ্ধি এবং সুনীতিবাবুর বুদ্ধিকে এক মাত্রায় ফেলে বিচার করা হবে অথবা যে বিচারব্যবস্থায় আমাকে এবং জ্যোতি বসু-নরসিমা রাও-এর শক্তিকে সমদৃষ্টিতে দেখা হবে—সেই গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল, তাতে সমাজের বিপদ বাড়বে। বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি, নিপুণতা তাতে ধুলোয় মিশে যাবে। মনে রাখতে হবে—মানুষের চারিত্রিক এবং ইন্দ্রিয়জ ত্রুটিগুলি একান্তই মনুষ্যোচিত। তার জন্য জন-সমাজে একজন বিরাট পুরুষের অবদান তুচ্ছ হয়ে যায় না। আদালতের ন্যায়াধীশও সেই বিচারটা মাথায় রাখতে পারেন বলেই তিনি ন্যায়াধীশ। বিচার-ব্যবস্থা আমার-আপনার হাতে থাকলে উত্তম-অধমের তুল্যমূল্যতা হত এবং ঠিক সেই কারণেই আমি-আপনি বিচারপতি হবার উপযুক্ত নই।

আমি যে বেশ বড়-সড়ো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম তার কারণ একটাই, বৃহস্পতি কিংবা চন্দ্রকে আমরা যেন আমাদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে পরিমাপ না করি। তাছাড়া

AMARBOI.COM

সমাজের বিধি-ব্যবস্থা তখন কেবল নতুন তৈরি হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের শিথিলতাকে মানুষ তখন কেবল সংযমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছে। ফলত আমাদের আধুনিক পরিশীলিত বুদ্ধি দিয়ে যদি মহাভারতীয় চরিত্রগুলির বিচার করতে আরম্ভ করি, তাহলে সেটা সমীচীন তো হবেই না, বরং অন্যায় হবে।

মহাভারতে দেখবেন—দেবগুরু বৃহস্পতি 'চিত্রশিখণ্ডী'র শিষ্য। সৃষ্টির প্রথম কল্পে ব্রহ্মা যে মানস-পুত্রদের জন্ম দেন তাঁদের মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই সপ্তর্ষি 'চিত্রশিখণ্ডী' নামে বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে চন্দ্র অত্রির পুত্র। বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র। সমাজের ন্যায়-নীতি এবং রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন প্রথম তৈরি করেন ওই 'চিত্রশিখণ্ডী' নামে পরিচিত সাতজন ঋষিই—আস্যৈঃ সপ্তভিরুদ্‌গীর্ণং লোকধর্মমনুত্তমম্। এই সাত মুনির নিয়ম-কানুন এবং মনু মহারাজের ধর্মশাস্ত্র—যাঁরা প্রথম অধিগত করেন তাঁরা হলেন বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য। এক্ষেত্রে বৃহস্পতি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়সমাজে বৃহস্পতির মাধ্যমেই রাষ্ট্র এবং লোকধর্মের নীতিগুলি প্রথম প্রচারিত হয়—বৃহস্পতিসকাশাদ্ বৈ প্রাপ্স্যতে দ্বিজসত্তমাঃ। বৃহস্পতি তাঁর সমস্ত বিদ্যা-শিক্ষা চেদি বংশের রাজা উপরিচর বসুকে দান করেন, কিন্তু সে কথা পরে।

আমার বক্তব্য—বৃহস্পতি খুব কম লোক ছিলেন না। সমস্ত দেব সমাজের গুরু তো বটেই। এত বড় মর্যাদার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোনও কারণেই, বৃহস্পতির চারিত্রিক শিথিলতা কিছু ছিল। তবে চন্দ্র যেমন বললেন—বৃহস্পতি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেটা মহাভারতে তেমন করে পাই না। বরং উলটো কথা পাই যে, তিনি কোনও এক সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের (কোনও মতে উশিজ) পত্নী মমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শারীরিক সংসর্গেও লিপ্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার গতির ওপর বৃহস্পতির নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তিনি যেভাবে যা চেয়েছিলেন, ঘটনা সেভাবে ঘটেনি। বৃহস্পতির সেই চরিত্র-স্খলনের ফল ঋষি ভরদ্বাজ, এবং এঁর কথাও পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে আমাদের কাছে।

কনিষ্ঠের স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হওয়ার যে অবক্ষেপ আমরা চন্দ্রের মুখে শুনেছি, সে ব্যাপারে মহাভারত স্পষ্টভাবে কিছু না বললেও, কনিষ্ঠের সঙ্গে বৃহস্পতির সদ্ভাব ছিল না মোটেই। বৃহস্পতির ছোট ভাই হলেন সংবর্ত। তিনিও ব্রাহ্মণ-প্রবর ঋষি ছিলেন, কিন্তু বৃহস্পতির সঙ্গে তাঁর দুঃসম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তার পক্ষে বাড়িতে থাকাই সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, রাগে অভিমানে তিনি একদিন পরনের জামা-কাপড় পর্যন্ত খুলে রেখে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছিল, আমরা তা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

একটি সম্পন্ন পরিবারে প্রায় সকলেই বিদ্যা-বলশালী হলেও যদি তাঁদের মধ্যে কেউ চরম সম্মানের পদবী লাভ করেন, তাহলে তাঁর ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও কিছু চড়া হয়। বৃহস্পতিকে দেবতারা তাঁদের গুরু হিসেবে বরণ করে নেওয়ার পর, আমাদের ধারণা—তাঁর মধ্যেও এক ধরনের স্ফীতবোধ কাজ করছিল। কারণ, ইন্দ্র অসুরদের হারিয়ে দেওয়ার পর নিজে বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছেন—ইন্দ্রত্বং প্রাপ্য লোকেষু ততো বব্রে বৃহস্পতিম্।

মহাভারতে দেখছি—কুরু-পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ মরুত্ত রাজা একবার এক বিশাল যজ্ঞের

আয়োজন করেছিলেন। সেখানে কথা আরম্ভ হয়েছে বৃহস্পতি আর সংবর্তকে নিয়েই। দুজনেই মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, তেজে-তপস্যায় দুজনেই পিতার তুল্য—পিতুস্তুল্যৌ বভূবতুঃ। দুজনের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আধুনিক পরিবারের দুরবস্থার মতোই তাঁদের ভাতের হাঁড়ি আলাদা হল—তাবতি স্পর্ধিনৌ রাজন্ পৃথগাস্তাং পরস্পরম্। কিন্তু হাঁড়ি আলাদা হলেই সব সময় পারিবারিক শান্তি সর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বৃহস্পতির তখন বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে। পৃথগান্ন হয়েও তিনি ছোটভাই সংবর্তকে যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন করতে থাকলেন। মানসিক অত্যাচার শেষ বিন্দুতে পৌঁছোলে সংবর্ত পৈত্রিক এবং নিজের ধন-সম্পত্তি সব ছেড়ে-ছুড়ে—আমাদের মতো এক কাপড়েও নয়—একেবারে উলঙ্গ হয়ে বনে চলে গেলেন—

স বাধ্যমানঃ সততং ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন ভারত।
অর্থানুৎসৃজ্য দিগ্‌বাসা বনবাসমরোচয়ৎ।।

এর মধ্যে বৃহস্পতির অবস্থার আরও উন্নতি হল। দেবগুরুর পদ পেলেন তিনি। ওদিকে মরুত্ত রাজার সঙ্গে স্বর্গের ইন্দ্রের তত ভাব-ভালবাসা ছিল না। ইন্দ্রের সঙ্গে স্পর্ধা করেই তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞের পুরোহিত হবার জন্য তিনি বৃহস্পতিকেই গিয়ে ধরলেন। দেবরাজ মরুত্তের অভিসন্ধি পূর্বাহ্নেই বুঝেছিলেন এবং বৃহস্পতিকে তিনি আগেই সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন—দেখুন ব্রাহ্মণ! আমি দেবরাজ আর আপনি হলেন সেই দেবরাজের পুরোহিত। যে হাতে আপনি দেবরাজের যজ্ঞে আহুতি দেন, সেই হাতে যেন কোনও মর্ত্যরাজার যজ্ঞে আহুতি দেবেন না। ইন্দ্র এবার পরিষ্কার জানালেন—দেখুন, রাজা মরুত্ত এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনি যেন কোনওভাবেই তাঁর পৌরোহিত্য করবেন না—বৃহস্পতে মরুত্তস্য মা স্ম কার্ষীঃ কথঞ্চন। এবার চরম সাবধানবাণী, হ্যাঁ, আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, আপনার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে—তবে যদি মরুত্তের পৌরোহিত্য করতে হয় করুন; কিন্তু আমাকে বাদ দিতে হবে তাহলে। হয় আপনি মরুত্তকে স্বীকার করুন, নয় আমাকে, যে কোনও একটা—পরিত্যজ্য মরুত্তং বা যথাযোষং ভজস্ব মাম্।

বৃহস্পতি কেমন যেন একটু থমকে গেলেন। একটু চুপ করেও গেলেন। ভেবে দেখলেন নিশ্চয়ই যে, দেবতাদের সামাজিক স্থিতি এবং আভিজাত্য মানুষের থেকে অনেক বড়। দেবতাদের সঙ্গে মিলে-মিশে চললে তাঁরও মর্যাদা অনেক বাড়বে। আরও বুঝলেন যে, ব্রাহ্মণোচিত স্বাধীনতায় আজ যদি ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করার হঠকারিতা করেন, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁকে মনুষ্যলোকের এ-রাজা-সে রাজার পৌরোহিত্য কুড়িয়ে দিন কাটাতে হবে। তার থেকে এই চিরকালের বাঁধা কাজ বৃহস্পতির মর্যাদা এবং সম্পত্তি—দুইই বাড়বে। ইন্দ্রকে তিনি সোজা বলেই দিলেন—আরে! কত অসুর-রাক্ষস বধ করে তুমি এই তিন ভুবনের অধিপতি হয়েছ, সমস্ত লোক তোমার ওপরেই নির্ভর করে আছে, সেই তোমার মতো বড় মানুষের পৌরোহিত্য করে আমি কি আর মানুষের পৌরোহিত্য করতে পারি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক দেবরাজ; যে-আমি একবার দেবযজ্ঞে আহুতি দেওয়ার সময় ঘিয়ের হাতা ধরেছি, সেই আমি কখনও মানুষের যজ্ঞে ঘিয়ের হাতা ধরব না—

সমাশ্বসিহি দেবেন্দ্র নাহং মর্তস্য কর্হিচিং।
গ্রহীষ্যামি স্রুবং যজ্ঞে শৃণু চেদং বচো মম।।

এদিকে মরুত্ত-রাজা বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করে পুরোহিত-বরণের জন্য বৃহস্পতির

কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন—আপনাকে আগে যে যজ্ঞের কথা বলেছিলাম, সেই যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনি আমাদের কুলগুরু। অতএব চলুন, সেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। বৃহস্পতি বললেন—আমার পক্ষে এই পৌরোহিত্য করা সম্ভব নয় রাজা। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছেন। আমিও তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করেছি। কাজেই এ কাজ সম্ভব নয়।

পদবিতে উঠলে যা হয়। এখনকার দিনের বড় মানুষের মুখে যেমন শুনি—সম্ভব নয়, আমার সময়-টময় নেই, তাছাড়া ওই সময়টায় সি এম-এর একটা প্রোজেক্ট প্ল্যান আমাকে দিতে হবে—বৃহস্পতির অবস্থাও একই রকম। মরুত্ত রাজা কত করে বললেন—সে কি ঠাকুর? আমি আপনার কতকালের যজমান। সেই বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে আপনি আমাদের ক্রিয়া-কর্ম সবই করছেন। আমাকে অস্বীকার করলে চলে কী করে? বৃহস্পতি বড় মানুষের মতোই বলে দিলেন—সম্ভব নয়। মরণহীন দেবতাদের যাজন করে দিন কাটছে আমার। আমি কীভাবে তোমার মতো মরণশীল মানুষের যাজন করি—অমর্ত্যং যাজয়িত্বাহং যাজয়িষ্যে কথং নরম্?

মরুত্ত ফিরে এলেন। পথে বিপত্তারণ নারদের সঙ্গে দেখা। রাজা সব ঘটনা তাঁকে আনুপূর্বিক জানালেন। নারদ বৃহস্পতিকেও চেনেন, তাঁর ছোট ভাই সংবর্তকেও চেনেন। কলহের মনস্তত্ত্ব ভাল জানা থাকায় নারদ এও বুঝতে পারলেন যে একমাত্র সংবর্তকে পৌরোহিত্যে বরণ করলেই বৃহস্পতি যেমন জব্দ হবেন তেমনই তাঁর রাগ হবে। নারদ বললেন—মহারাজ আপনার চিন্তার কোনও কারণই নেই। আপনি সোজা চলে যান মহর্ষি অঙ্গিরারই অন্য পুত্র সংবর্তের কাছে। তিনি বৃহস্পতির ছোট ভাই। তিনিই আপনার যজ্ঞ-কর্ম সম্পন্ন করবেন। নারদ সংবর্তের ঠিকানাও দিলেন মরুত্ত-রাজাকে। রাজা কাশীতে গিয়ে সংবর্তের দেখা পেলেন এবং যথাবিধি তাঁকে যজ্ঞের আমন্ত্রণও জানালেন।

সংবর্ত এই বিশাল যজ্ঞ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। বৃহস্পতির উৎপীড়নে তিনি ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিগম্বর হয়ে কাশীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রাজার কাছে তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা লুকোলেন না। বললেন—দেখুন রাজা! মানসিক-শারীরিক নানা জ্বালা-যন্ত্রণায় আমার বায়ুরোগ ধরে গেছে, আর আমি চলি-ফিরিও নিজের ইচ্ছামতো—বাতপ্রধানেন ময়া স্বচিত্তবশবর্তিনা—স্বভাবটাও আমার বিকারগ্রস্ত। এ অবস্থায় আপনি আমায় যজ্ঞ সম্পাদনের ভার দিয়ে ঠিক কাজ করছেন না বোধহয়। সংবর্ত এবার রাজাকে এড়ানোর জন্য তাঁকে বৃহস্পতির ঠিকানা দিয়ে বললেন—আমার দাদা হলেন বৃহস্পতি। এ সমস্ত বড় বড় যজ্ঞ তিনিই খুব ভাল করে করতে পারবেন। তাছাড়া তিনি স্বয়ং দেবরাজের পুরোহিত। তাঁকে দিয়ে আপনার কাজ হবে ভাল—বর্ততে যাজনে চৈব তেন কর্মাণি কারয়।

বৃহস্পতিকে যজ্ঞ করানোর প্রস্তাব করার পর সংবর্ত কিন্তু নিজের ক্ষোভটুকু আর চেপে রাখতে পারলেন না। বলে ফেললেন—বৃহস্পতি আমার বড় ভাই হলে কী হয়, তিনি আমার ঘর-সংসার, গৃহস্থধর্ম সব নষ্ট করেছেন। আমার যজমান যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আমার দাদার চাপে কেউ আর আমাকে পৌরোহিত্যে বরণ করে না। এমন কি, জানেন—আমার ঘরের ঠাকুর-বিগ্রহগুলি পর্যন্ত আমার দাদা নিয়ে নিয়েছেন। তিনি আমার সব বরবাদ করে শুধু এই শরীরটা মাত্র ছেড়ে দিয়েছেন—পূর্বজেন মমাক্ষিপ্তং শরীরং বর্জিতং ত্বিদম্। সংবর্ত আরও জানালেন—এখন যদি দাদা বৃহস্পতির অনুমতি ছাড়াই আমি আপনার যজ্ঞ করি, তাহলে আর

দেখতে হবে না। আপনি মহারাজ আগে তাঁর কাছে যান। মরুত্ত পূর্বের ঘটনা বিবৃত করলেন এবং বৃহস্পতির প্রত্যাখ্যানের খবরও তাঁকে জানালেন।

বৃহস্পতি এবং সংবর্তের দ্বন্দ্বের শেষ হয়নি। তবে এই উপাখ্যানের পরম্পরায় জানাই সংবর্ত মরুত্ত রাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন এবং বৃহস্পতির অনিচ্ছা, বিদ্বেষ এবং বাধা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকে মন্ত্রে বশীভূত করে মরুত্ত রাজার যজ্ঞে সোমপান করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু আপাতত এই উপাখ্যানের পরম্পরা আমাদের কাছে তত জরুরি নয়। জরুরি শুধু সংবর্তের ক্ষোভটুকু। তিনি বলেছিলেন—আমার বড় ভাই হয়েও তিনি আমার ঘর-সংসার, গার্হস্থ্য ধর্ম ছারখার করে দিয়েছেন, আমার যজমান নষ্ট করেছেন, ঘরের দেবতাও তিনি নিয়ে নিয়েছেন—গার্হস্থ্যঞ্চৈব যাজ্যাশ্চ সর্বা গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়—কী এমন ঘটেছিল, যাতে এই ব্রাহ্মণ ঋষির সোনার সংসার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল? কী এমন ঘটেছিল, যাতে তাঁকে পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল—উন্মত্তবেশং বিভ্রৎ স চংক্রমীতি যথাসুখম্। ঠিক এই সময়ে আমাদের চন্দ্রের কথা স্মরণ করতে হবে। চন্দ্র ইন্দ্রের দূতকে বলেছিলেন—যান আর কথা বাড়াবেন না। সুন্দরী তারা সেইদিন থেকেই তাঁর স্বামী বৃহস্পতির ওপর বিরক্ত হয়ে গেছেন, যেদিন তিনি দেখেছিলেন—তাঁর ভালবাসার স্বামী তাঁর নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত— বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমে'নুজকামিনীম্।

এই জন্যই কি সংবর্তের ঘর-সংসার গার্হস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল? যাকে নিয়ে গৃহস্থ-ধর্ম, সেই স্ত্রীই যদি অন্য পুরুষের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে তবে তাঁকে সব ছেড়ে-ছুড়ে বিবাগী হয়েই বেরোতে হবে উন্মত্তের বেশে। চন্দ্র সংবর্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পরিষ্কার বলে দিলেন—সুন্দরী তারাকে আমি ফিরে পাঠাব না। সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে আমাকে, আর আমিও তাকে ভালবাসি। তুমি ইন্দ্র আর বৃহস্পতি, দুজনকেই বোলো—যদি ঘর বাঁধতে হয় তো ভালবাসার রমণীটিকে নিয়েই ঘর বাঁধা ভাল, অপছন্দের বউকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না—গৃহারম্ভস্তু রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ। যাও তুমি দূত! গিয়ে বলো তোমার ইন্দ্রকে—তাঁর তো অনেক ক্ষমতা, তিনি যা ইচ্ছে করুন। আমি তারাকে ফেরত পাঠাব না—ন দাস্যে'হং বরারোহাং গচ্ছ দূত বদ স্বয়ম্।

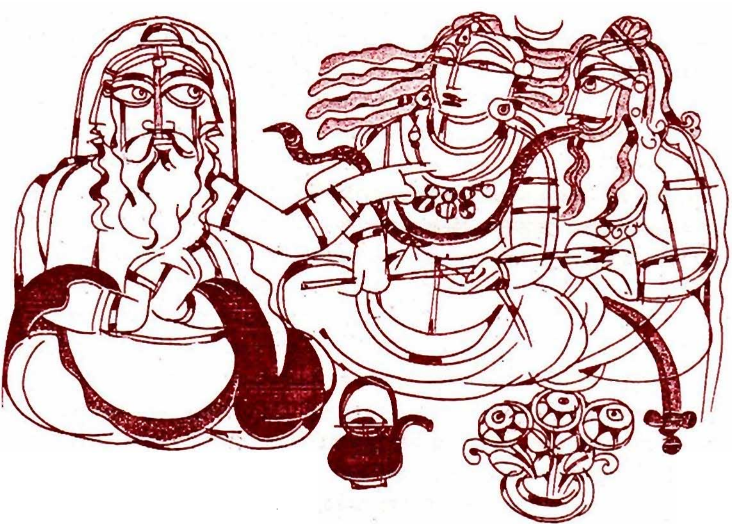

উনিশ

বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে বৃহস্পতির কাছে ফিরিয়ে দিলেন না চন্দ্র। ইন্দ্রের দূত ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন। দেবসমাজে এই ঘটনা নিয়ে দারুণ হই-হই পড়ে গেল। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরুর অবমাননায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর নিজেরও অপমান কিছু কম হয়নি। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন চন্দ্র। অতএব আর সহ্য করা যায় না। ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির সম্মানে যুদ্ধের উদ্যোগ নিলেন। দেবসৈন্যদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

বড় বড় যুদ্ধে যা হয়। কে কোন পক্ষ সমর্থন করবেন, কে কার পক্ষে যোগ দেবেন—এসব সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। দেবতাদের যুদ্ধোদ্যোগ দেখামাত্র অসুর-গুরু শুক্রাচার্য চন্দ্রের কাছে এলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে তাঁর চির শত্রুতা। সেই শত্রুতাবশতই যেন ব্যাপারটা অন্যায় হলেও তিনি চন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে তাঁকে বললেন—বৃহস্পতির বউকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও দরকার নেই তোমার—মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি—আমি তোমাকে সাহায্য করব। দেবদেব শঙ্কর শুক্রাচার্যকে চন্দ্রের পক্ষপাতী দেখে ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দিলেন। তিনি তাঁর মস্ত আজগব ধনুক দিয়ে চন্দ্রকে শায়েস্তা করবেন বলে ঠিক করলেন। বৃহস্পতির স্ত্রীর সঙ্গে চন্দ্রের আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। রুদ্র-শিব যেহেতু এক সময়ে বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন,—স হি শিষ্যো মহাতেজাঃ পিতুঃ পূর্বো বৃহস্পতেঃ—অতএব বৃহস্পতিকে সমর্থন করলেন স্বয়ং মহাদেব। দৈত্য-দানবেরা শুক্রাচার্যের নেতৃত্বে চন্দ্রের পক্ষে যোগ দিলেন।

বিশাল যুদ্ধ পাকিয়ে উঠল। মহাদেব 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র ছুড়ে দৈত্য-দানবদের অনেককে মেরে ফেললেন বটে, তবে চন্দ্রকে তিনি কিচ্ছু করতে পারলেন না। চন্দ্র বিষ্ণুর বর-পুষ্ট। অতএব দেবপক্ষেরও ক্ষয়ক্ষতি কিছু কম হল না। অনেক দেবতাও চন্দ্রের হাতে মারা গেলেন এবং

বাকি যাঁরা থাকলেন, তত্র শিষ্টাস্তু যে দেবাঃ—তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আর্জি জানালেন—এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ব্রহ্মা এসে ইন্দ্র-পক্ষের রুদ্র-শিবকে এবং চন্দ্র-পক্ষের শুক্রাচার্যকে যুদ্ধের প্ররোচনা ছড়াতে নিষেধ করলেন—ততো নিবার্য্যোশনসং রুদ্রং জ্যেষ্ঠঞ্চ শঙ্করম্। শুক্রাচার্যকে তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন—তোমার কি সঙ্গদোষে এমন অপকর্মে দুর্মতি হল—কিমন্যায়ে মতির্জাতা সঙ্গদোষান্মহামতে। আর চন্দ্রকে বললেন—গুরুর স্ত্রীকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দাও, চন্দ্র! নইলে স্বয়ং বিষ্ণুকে ডেকে এনে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়ব আমি—নো চেদ্ বিষ্ণুং সমাহূয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্।

অবস্থা বুঝে চন্দ্রের পক্ষপাতী শুক্রাচার্য পর্যন্ত চন্দ্রের পিতা মহর্ষি অত্রির নাম করে বললেন—আজকেই ছেড়ে দাও গুরুপত্নীকে। তোমার পিতারও এই ইচ্ছে জেনো—মুঞ্চ ভার্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেষিতস্তব। ব্রহ্মা এবং শুক্রাচার্য—দুজনের কথায় চন্দ্র শেষ পর্যন্ত গুরুপত্নী তারাকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে তারা গর্ভবতী হয়েছেন। তারা বৃহস্পতিকে পছন্দ করেন না, তবু বৃহস্পতি তাঁর অধিমাত্র লাভেই পরম আনন্দে ফিরলেন। দেব, দানব, ব্রহ্মা, শিবও—সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেলেন। সর্বত্র শান্তি ফিরে এল।

এইভাবে বেশ কিছুদিন গেল। গর্ভবতী তারা সযত্নে গর্ভ রক্ষা করলেন, এবং শুভদিনে শুভ নক্ষত্রে এক অসাধারণ পুত্র প্রসব করলেন। পুত্রের আকৃতি-প্রকৃতি চন্দ্রের মতো, জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রের সমস্ত সুলক্ষণ সেই পুত্রের সর্বাঙ্গে। বৃহস্পতি পুত্রমুখ দেখে বড় খুশি হলেন এবং শাস্ত্র-বিধি অনুসারে পুত্রের জাতকর্মাদি ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করলেন—জাতকর্মাদিকং সর্বং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। চন্দ্রের কাছে তারার পুত্র জন্মের সংবাদ এসে পৌঁছল লোকপরম্পরায়। সব শুনে চন্দ্র লোক পাঠালেন বৃহস্পতির কাছে। সে গিয়ে চন্দ্রের নাম করে বৃহস্পতিকে বলল—এত জাঁকজমক করে যে ছেলের জাতকর্মাদি ক্রিয়া করছ, সে মোটেই তোমার ছেলে নয়। সে আমার ছেলে। বৃহস্পতি জোর দিয়ে বললেন—এ ছেলে চন্দ্রের হতে যাবে কেন, এ আমারই ছেলে। দেখতেও তো হয়েছে আমারই মতো—উবাচ মম পুত্র মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ।

AMARBOI.COM

আবার চন্দ্র আর বৃহস্পতির ঝগড়া-ঝাঁটি আরম্ভ হল। আবারও যুদ্ধ লাগে আর কি। দেবসমাজে যুদ্ধের 'স্ট্র্যাটিজি' নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল, নানা 'মিটিং' চলল ঘন-ঘন—যুদ্ধার্থমাগতাস্তেষাং সমাজঃ সমজায়ত। প্রজাপতি ব্রহ্মা সব খবর শুনে আবারও এসে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ প্রায় লেগে গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা আগে দেব-দানব সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তারার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমিই মা সত্যি করে বল তো—পুত্রটি কার? চন্দ্রের না বৃহস্পতির? তুমি সত্যি করে বললেই এই সাংঘাতিক যুদ্ধ আর লাগে না—সত্যং বদ বরারোহে যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি।

বস্তুত এ প্রশ্ন দেবতারা আগেই করেছিলেন তারাকে। অন্তত মহাভারতের পরিশিষ্ট-রূপী হরিবংশ তাই বলেছে। কিন্তু তারা এই প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি। আমাদের ধারণা—দেবতারা বৃহস্পতির পক্ষ হয়ে পূর্বে চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই চন্দ্রের অনুরাগিণী তারা হ্যাঁ বা না—কোনও জবাবই দেননি—পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নাহ সা সাধ্বসাধু বা। কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন আসন্ন যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি-রক্ষার তাগিদে তারাকে ওই একই প্রশ্ন করলেন, তখন আর উত্তর না দিয়ে উপায় থাকল না তারার। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন—বল মা! এ ছেলে কার—কস্যায়ং তনয়ঃ শুভে? শান্তির দূত পিতামহ ব্রহ্মার সামনে লজ্জায় মাথা

নিচু করে তারা বললেন—এ পুত্র চন্দ্রের। বলেই তারা দ্রুত ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন—চন্দ্রস্যেতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী। বিবাহিত স্বামীর ঘরে বসে অন্য পুরুষের পুত্র গর্ভে ধারণ করেছি—এ কথা বলতে কোন রমণীই বা লজ্জা না পাবে। তারাও তাই কথাটা বলেই লজ্জায় ঘরে ঢুকে পড়লেন তাড়াতাড়ি।

হরিবংশে দেখছি—তারার কথা শোনামাত্রই প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই নবজাতকের মস্তক আঘ্রাণ করে তার নাম রেখেছেন বুধ। অন্য মতে তারার কথাটা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্র বৃহস্পতির বাড়ি থেকে তাঁর পুত্রটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তার নাম রাখেন বুধ।

যা দেখা গেল, তাতে চন্দ্রবংশে আরও একটি নক্ষত্রের জন্ম হল। বুধের জন্মলগ্নে চাঁদ, তারা বা বৃহস্পতির—ইত্যাদি নক্ষত্র-তারকার কলঙ্ক যাই থাকুক, এখনও পর্যন্ত এই বংশের জাতকের মধ্যে খুব একটা মানুষ-মানুষ ভাব দেখলাম না। দেখলাম, কেমন যেন একটা দৈবভাব। তবে তা শুধু দেবতাদের ঘটনা বলেই এই দৈবীভাব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আনাগোনায় দেবতা, অতিদেবতা, দেবগুরুর ত্র্যহস্পর্শে ঘটনা যতই গম্ভীর হয়ে উঠুক, তবু কিন্তু এই ঘটনার বিন্যাসে মানুষের জীবনের স্পর্শ আছে। অর্থাৎ মানুষের জীবনেই এরকম ঘটে থাকে, ঘটে এবং ঘটবেও। কিন্তু যেহেতু চন্দ্র, তারা, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি শব্দে নক্ষত্রলোকের অভিসন্ধি মেশানো আছে, অতএব মহাভারতের কবি তাঁদের জীবন-বিস্তারে মন দেননি। নক্ষত্রলোকের প্রতীকে ধরা এইসব জীবনের কাহিনী আমাদের শুনতে হয়েছে পুরাণ থেকে, হরিবংশ থেকে।

কিন্তু যে মুহূর্তে কুরু-পাণ্ডবের বংশমূলে মানুষের শব্দ-স্পর্শ যোগ হয়েছে সেই মুহূর্তে মহাভারতে মনুর কথা এসেছে। মনু থেকেই এই মানব-জাতি, মহাভারত যাকে বলেছে—মনোর্বংশে মানবানাং তত্রৈবায়ং প্রথিতো'ভবৎ। বস্তুত মহাভারতের আদিপর্বে দুই জায়গায় কুরু-পাণ্ডবের পূর্বতন বংশ-পরম্পরা বর্ণিত আছে। এই দুই জায়গাতেই চন্দ্র, বৃহস্পতি কিংবা তারার কোনও হদিশ নেই। এমনকি বুধেরও জন্মের কোনও খবর ভাল করে পাওয়া যায় না। মহাভারতের এই দুই লিস্টিতেই বৈবস্বত মনু থেকে মানব-জাতির উৎপত্তি। মনুর নয়টি পুত্র এবং একটি কন্যা। এই কন্যাটি সত্যিই কন্যা না পুত্র, তা নিয়ে পৌরাণিকদের মধ্যে বিবাদ আছে এবং সে কথায় আমি পরে আসছি।

আপাতত জেনে রাখতে হবে যে—মনুর নয় পুত্রের মধ্যে অন্তত চার জন বড় গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্তত চারটি বিখ্যাত রাজবংশের মূল হলেন এই চারজন মনুপুত্র। অযোধ্যায় যে বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার অধস্তন হলেন স্বয়ং নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র, সেই ইক্ষ্বাকু মনুর এক পুত্র। ইক্ষ্বাকুর অন্যতম এক পুত্র থেকেই বৈদেহ-বংশের প্রতিষ্ঠা এবং এই বংশের অধস্তন হলেন সীতাপতি জনক, অর্থাৎ রামের শ্বশুর। অর্থাৎ বৈদেহ জনকও সূর্যবংশেরই বটে।

মনুর আরেক পুত্র নাভানেদিষ্ঠ। তিনি রাজত্ব করতেন বৈশালীতে। প্রমতি এবং সুমতি এই বংশের নামী পুরুষ এবং তাঁরা ছিলেন ইক্ষ্বাকু-বংশজ দশরথের সমসাময়িক। মহারাজ শর্যাতি মনুর আরেক কীর্তিমান পুত্র। সম্ভবত তিনি রাজত্ব করতেন কুশস্থলীতে যা পরবর্তী কালের দ্বারকা বলা যায়। চতুর্থ মনুপুত্র নাভাগও যথেষ্ট বিখ্যাত তবে তিনি ঠিক কোথায় রাজত্ব করতেন বলা মুশকিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেন মহারাজ অম্বরীষ যিনি নানা কারণে

AMARBOI.COM

কীর্তিশালী হয়েছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—মনুপুত্রদের প্রত্যেককেই একভাবে সূর্যবংশীয় বলা যায়; কেননা, বৈবস্বত মনুর পিতা হলেন বিবস্বান্-সূর্য। কিন্তু অযোধ্যার সম্রাট ইক্ষ্বাকু এতটাই বিখ্যাত হয়েছিলেন যে সূর্যবংশের সমস্ত সুনামটুকু যেন তাঁর ওপরেই বর্তেছিল। ফলত একমাত্র ইক্ষ্বাকুর বংশই সূর্যবংশ বলে বিখ্যাত হয়েছে। এবারে সেই মেয়েটির কথায় আসি, যাঁর নাম ইলা এবং যাঁর থেকে চন্দ্রবংশের পরম্পরা।

বেশির ভাগ পুরাণেই দেখা যাবে ইলা মেয়ে ছিলেন না, পুরুষই ছিলেন এবং তাঁর নাম ইলা নয়, তাঁর নাম ইল। একটি পুরাণ তো এমন কথাও বলেছে যে, মনু মহারাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলকে রাজপদে অভিষিক্ত করে তপস্যা করার জন্য নন্দন বনে চলে গিয়েছিলেন—

অভিষিচ্য মনুঃ পুত্রমিলং জ্যেষ্ঠং চ ধার্মিকঃ।
জগাম তপসে ভূয়ঃ স মহেন্দ্রবনালয়ম্।।

কিন্তু অন্যান্য পুরাণে ইল নামটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মজার উপাখ্যান। ইল নাকি রাজা হয়েই দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। পৃথিবীর নানা দেশ জয় করার পথে এক সময় তাঁর অশ্বটি একটি বনে প্রবেশ করে। কোনও পুরাণে এই বনের নাম শরবন, কোথাও বা কুমারবন, আবার কোনও পুরাণে এটি উমাবন। যাই হোক এই বনে মহাদেবের আবাস ছিল এবং এই বনে প্রবেশের ব্যাপারে পূর্বেই একটি নিয়ম চালু হয়েছিল। অবশ্য সেই নিয়মের ব্যাপারেও অন্য একটি গল্প আছে। কথিত আছে—এক সময় সনক-সনন্দ প্রমুখ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ মহাদেবের দর্শন লালসায় এই অসাধারণ বনভূমিতে প্রবেশ করেন। সেই সময় দেবদেব শঙ্কর পার্বতীর সঙ্গে ক্রীড়াসক্ত ছিলেন এবং শৈলদুহিতার বসন-ভূষণও কথঞ্চিৎ অসম্বৃত ছিল। এই অবস্থায় ব্রহ্মবাদী ঋষিদের দেখে পার্বতী বড় লজ্জা পেলেন এবং কোনও মতে বস্ত্র সম্বরণ করে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে থাকলেন—লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী।

ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। তাঁদের মনে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ, রমণ-মৈথুন বড় একটা ক্রিয়া করে না। দেবদেব শঙ্করের উদাসীন ক্রীড়াকৌতুক এবং পার্বতীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখামাত্রই ব্রহ্মর্ষিরা স্থান ত্যাগ করে নর-নারায়ণ আশ্রমের দিকে রওনা দিয়েছেন। কিন্তু পার্বতীকে তখনও সংকুচিত আর অভিমানিনী দেখে ভগবান শিব নিয়ম করে দিলেন—যে পুরুষ এরপর ওই বিহার-বনে ঢুকবে সেই মেয়ে হয়ে যাবে। যারা এই নিয়মের কথা জানত, তারা সকলেই বনভূমির বহিঃসীমা অতিক্রম করত না। কিন্তু দিগ্বিজয়ে ভ্রাম্যমান ঘোড়াটি অথবা তার মালিক ইল রাজা—তাঁদের কারুরই এই শিবের নিয়ম জানা ছিল না। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ইল এক সুন্দরী নারীতে পরিণত হলেন, এমনকি তাঁর ঘোড়াটিও ঘোটকীতে পরিণত হল। স্ত্রী স্বরূপে 'ইল'র নাম হল ইলা।

স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত শরীরে স্তন-জঘনাদির স্ত্রী লক্ষণগুলিও প্রকাশিত হল। তাঁর গলার স্বর থেকে আরম্ভ করে গতি-স্মিত-কটাক্ষেও এল রমণীয় পরিবর্তন। বনের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে স্ত্রী রূপিণী ইলের মনে একটু উদাসীন ভাবও দেখা গেল। তিনি ভাবলেন—ছিলাম রাজপুরুষ, হলাম এক রমণী। এখন কেই বা আমার বাবা আর কেই বা মা। কার সঙ্গেই বা আমার বিয়ে হবে, কে জানে? হয়তো এইভাবে বিমনা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি সেই শিবের বিহারভূমির বাইরে চলে এলেন। ঠিক এই সময়ে চন্দ্র-পুত্র বুধ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই বনের বহিঃপ্রান্তে। ইলাকে তিনি দেখতে পেলেন এবং তাঁর মনোহরণ রূপে

একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি শুধু উপায় খুঁজতে লাগলেন—কীভাবে এই রমণীকে আত্মসাৎ করা যায়—বুধস্তদাপ্তয়ে যত্নমকরোৎ কামপীড়িতঃ।

চন্দ্রপুত্র বুধ ইলাকে লাভ করার আশায় ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করলেন। ইলাকে তিনি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করেছেন এবং বুঝেছেন—এই রমণীর পূর্ব-স্মৃতি যথাযথ নেই। বুধ এও বুঝেছেন—ব্রাহ্মণের বাক্য জনসমাজে মান্যতা লাভ করে, অতএব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে বেশ নাটকীয়ভাবে যদি ইলাকে প্রার্থনা করা যায়, তবে তাঁর বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বুধ হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করে বিশ্বসনীয় ব্রাহ্মণ-উপাধ্যায়ের মতো একখানি পুঁথিও ধরে রাখলেন নিজের হাতে। কতিপয় ব্রাহ্মণ-বালক ফুল-জল, সমিৎকাঠ নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করল এবং বুধের ব্রাহ্মণত্ব আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল।

বুধ দূর থেকে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সেই শিব-বিহার-ভূমির বহিঃপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন, যেখানে বিহ্বল-বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন ইলা। বুধ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ইলাকে কয়েকটা কথা বললেন। বললেন এমনভাবে যেন ইলা তাঁর কতকালের বিবাহিতা স্ত্রী। বুধ বললেন—এ কী হল? তুমি হঠাৎ করে বাড়ি ছেড়ে চলে এলে কেন? আমার অগ্নিহোত্রের কাজকর্ম সব ফেলে দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছ তুমি—অগ্নিহোত্রশুশ্রূষাং ক গতা মন্দিরাৎ মম? একটু বকার মতো করে কথা কয়টি বলেই বুধ কিন্তু সুর পালটালেন। বললেন—আমাদের বিহার-বেলাও যে শেষ হতে চলল সুন্দরী! কেন এমন সময়ে এমন সন্ত্রস্ত হয়ে আছ? এমন একটি সন্ধ্যা কি নষ্ট করা চলে? ঘরে চলো। ঘর-দোর মুছে ফুলের সাজে আমাদের মিলন-গৃহ সুসজ্জিত করো—কৃত্বোপলেপনং পুষ্পৈরলঙ্কুরু গৃহং মম।

ইলা বললেন—মহর্ষি! কারণ ব্রাহ্মণের সাজে বুধকে তিনি মহর্ষিই ভেবেছিলেন—ইলা বললেন—মহর্ষি! আমার কিচ্ছু মনে নেই। আমি কে, আপনি কে, আমি কোথায় জন্মেছি—কিচ্ছুটি মনে নেই আমার। বুধ বললেন—কেন? তোমার নাম তো ইলা। আর আমি তো সেই বুধ, আমার পিতা মহামান্য এক ব্রাহ্মণ—পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ। কথাটার মধ্যে খুব একটা মিথ্যাও নেই। কারণ জননী তারা এবং বৃহস্পতির সম্বন্ধে নিজেকে ব্রাহ্মণের পুত্র বলে পরিচয় দিতে কোনও অসুবিধাই ছিল না বুধের।

ইলা বুধের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তথাকথিত স্বামীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন এবং থাকতে লাগলেন বিশ্বস্তা বিবাহিতা বধূটির মতোই। অনেক পুরাণই বলেছে—ইলার এই স্ত্রীত্ব ছিল সাময়িক এবং মহাদেবের কাছে তিনি নাকি বর পেয়েছিলেন—একমাস তিনি স্ত্রী হয়ে থাকবেন এবং একমাস থাকবেন পুরুষ হয়ে। পুরুষ অবস্থায় তাঁর নাম হবে সুদ্যুম্ন আর স্ত্রী অবস্থায় তাঁর নাম হবে ইলা। মহাভারতের কবি যে একবারও এই ইলা-সুদ্যুম্নের কথা বলেননি, তা নয়। তবে তিনি অন্য পুরাণকারদের মতো এমন গল্প করে বলেননি। মহাভারতের প্রায় অন্তকালে অনুশাসনপর্বে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে একবার বলা আছে—বৈবস্বত মনুর বংশজ হলেন ইলা-সুদ্যুম্ন—মনোশ্চ বংশজ ইলা সুদ্যুম্নশ্চ ভবিষ্যতি। কবির এক-পংক্তির উক্তি থেকেই মোটেই বোঝা যায় না যে, যিনি ইলা তিনি সুদ্যুম্ন।

এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে আমার যা মনে হয় নিবেদন করি। অধিকাংশ পৌরাণিকেরা বলেছেন যে স্ত্রী অবস্থায় ইলার সঙ্গে বুধের মিলনে পুরূরবার জন্ম হয় এবং বুধ যেহেতু চন্দ্রের পুত্র, তাই চন্দ্রের পুত্র-পরম্পরা চালু হয়ে গেল পুরূরবার জন্ম থেকেই। পুরূরবার জন্মের কথা বলেই পৌরাণিকেরা বলেছেন ইলার পুরুষাবস্থায় সুদ্যুম্নের পুত্র হলেন উৎকল এবং গয়—

amarboi.com

পৌরাণিকেরা যে যাই বলুন, আমাদের ধারণা সুদ্যুম্ন ইলার এক স্বামী এবং অন্য স্বামী হলেন বুধ। আসল কথা বৃহস্পতি এবং চন্দ্র—দুজনেই যদি তারার স্বামী হতে পারেন, তবে সুদ্যুম্ন এবং বুধ—এই দুজনেও ইলার দুই স্বামী হতে পারেন। আমার ধারণা যে মিথ্যা নয়, কিংবা একেবারে অবাস্তব নয় সেটা অন্যান্য পুরাণের প্রমাণ দিয়েই বলি।

বায়ু পুরাণ বলেছে—প্রথম মানব মনুর নিজের সমান গুণের নয়টি পুত্র ছিল—মনোঃ প্রথমজস্যাসন্নব পুত্রাস্তু তৎসমাঃ। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই নয় পুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকুই হলেন জ্যেষ্ঠ এবং এই লিস্টিতে 'ইল' বলে কোনও পুত্রের নাম নেই। জ্যেষ্ঠও তিনি নন, রাজাও তিনি নন। বায়ু পুরাণে স্পষ্ট বলা আছে—ইক্ষ্বাকু ইত্যাটি ন'টি পুত্রের জন্মের পর ব্রহ্মার আদেশে মনু পুত্রকাম হয়ে একটি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে তিনি মিত্রাবরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেই যজ্ঞবেদি থেকে 'দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা' ইড়াদেবীর সৃষ্টি হল। মনু সেই রমণীকে ইলা বলে সম্বোধন করলেন। 'ইড়া' নামে বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে একটি শব্দ পাওয়া যাবে। সেই শব্দের সঙ্গে এই 'ইড়ার' কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা সে আলোচনায় যাওয়ার কোনও কারণই নেই এই মুহূর্তে। আমার যেটুকু বলার তা হল—মনু ইলা নামে একটি কন্যাই লাভ করেছিলেন, পুত্র নয়।

জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলা মনুকে বললেন—আমি মিত্রাবরুণের অংশে জন্মেছি, অতএব তাঁর কাছেই আমায় যেতে হবে। অর্থাৎ ইলা নিজেকে মোটেই মনুর কন্যা ভাবছেন না, মিত্রাবরুণের কন্যা হিসাবেই তিনি পরিচিতা হতে চান। স্বয়ং মিত্রাবরুণও ইলাকে বলেছেন—তুমি আমাদের কন্যা—আবয়োস্ত্বং মহাভাগে খ্যাতিং কন্যা গমিষ্যসি। বায়ু পুরাণ আরও বলেছে—ইলা যখন মিত্রাবরুণের আশীর্বাদ নিয়ে মনুর কাছে ফিরে আসছেন, সেই প্রত্যাবর্তন-কালীন সময়ে মাঝপথে চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়—বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনায়োপমন্ত্রিতা।

কথাটা বিশ্বাস করতে অসুবিধা নেই কোনও। মিত্রাবরুণ এক যুগল বৈদিক দেবতা। আমি পূর্বেই জানিয়েছি দেবতাদের আকৃতি-প্রকৃতি মানুষের মতোই। যে কোনও কারণেই হোক দেব-পিতার গৃহ থেকে তিনি মনু-পিতার গৃহে ফিরছিলেন। পথে নির্জন অরণ্যভূমিতে—পুরাণকারেরা অবৈধ কলঙ্ক এড়ানোর জন্য যে বনকে মহাদেবের বিহারভূমিরূপে কীর্তন করেছেন, সেই বনস্থলীর মধ্যেই বুধের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং কোনও ওজর ছাড়াই সাধারণভাবেই সে মিলন সম্পূর্ণ হয় এবং জন্ম হয় পুরূরবার। বায়ু পুরাণ বলেছে—পুরূরবার জন্ম দিয়েই ইলা পুনরায় সুদ্যুম্নের কাছে ফিরে আসেন—বুধাৎ সা জনয়িত্বা তু সুদ্যুম্নং পুনরাগতা। সংস্কৃতে যাঁদের সাধারণ জ্ঞান আছে তাঁরা উপরিউক্ত সংস্কৃত পংক্তিটির অর্থ করবেন আমাদের মতো—অর্থাৎ ইলা সুদ্যুম্নের কাছে ফিরে আসেন—সুদ্যুম্নং পুনরাগতা।

বায়ু পুরাণ সত্য কথাটা একবার মাত্র বলে ফেলেছে। কিন্তু মজা হল, ইলাকে নিয়ে যে কল্পকাহিনী পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে, তা বায়ু পুরাণের কথকঠাকুরদের পক্ষে এড়ানো অসম্ভব ছিল। তাই বায়ু পুরাণ পূর্বে বলে নিয়েছে—ইলাই পরে মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হন। অর্থাৎ সেই বাঁধা গত্—ইলা মেয়েও ছিলেন আবার ছেলেও ছিলেন। কিন্তু শুধু বায়ু পুরাণ কেন, অধিকাংশ পুরাণই একই কথা বলেছে। এর মধ্যে শুধু দেবীভাগবত পুরাণ মনু বংশের সব কথা বাদ দিয়ে চন্দ্র-তারা-বৃহস্পতির উপাখ্যানের পরম্পরায় পরের অধ্যায় আরম্ভ করেছে এইভাবে—সুদ্যুম্ন নামে এক অতীব যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করতে

করতে সেই মহাদেবের বিহারভূমিতে ঢুকলেন আর স্ত্রীতে পরিণত হলেন। বস্তুত, সুদ্যুম্ন বলে সম্পূর্ণ পৃথক একটি পুরুষ মানুষের কথা অন্য কোনও পুরাণ বলেনি। দেবীভাগবতের প্রমাণে আমরা সুদ্যুম্ন নামে একটি পৃথক পুরুষকেই শুধু চিহ্নিত করতে চেয়েছি।

ইলা অথবা সুদ্যুম্ন—কে আগে মেয়ে ছিলেন, কে পুরুষ ছিলেন, এই তর্কে আমরা যাচ্ছি না। পৌরাণিকদের এই কল্পনা আমার কাছে তত আদরণীয়ও নয়। বরং আমি যেটা বিশ্বাস করি, তারই পরম্পরা ধরে বলি—হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণের মতো নামী পুরাণগুলি থেকে জানা যায়—প্রথমজন্মা মনুর নয় মহান পুত্রের কেউই যখন জন্মাননি, তখনই মিত্রাবরুণের যজ্ঞ থেকে ইলা জন্মেছিলেন—অনুৎপন্নেষু নবসু পুত্রেষ্বেতেষু ভারত। অর্থাৎ মনু যতই পুত্র কামনা করে যজ্ঞ করে থাকুন, তাঁর প্রথম সন্তানটি কিন্তু পুত্র নয়, কন্যাই। তবে কন্যা হলেও তাঁর মূল্য কম ছিল না। হয়তো সুদ্যুম্ন নামে কোনও রাজার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ বা মিলন কিছু হয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কোনও ভাবে তিনি সুদ্যুম্নকে ভুলেই ছিলেন। কেননা চন্দ্রপুত্র বুধের আকর্ষণ তাঁর কাছে এতই বেশি ছিল যে, সুদ্যুম্নকে ভোলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই মিলন সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্ম হল, তারপরেই হয়তো পূর্বতন স্বামীর সম্বন্ধটুকু তাঁর মনে পড়েছে এবং তিনি ফিরেও এসেছেন সুদ্যুম্নের কাছে। এই প্রত্যাবর্তনের কথা যে যে পুরাণে আছে, সেই সেই পুরাণে এটা যে ভাবেই থাকুক, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে সেই বায়ু পুরাণের কথা—সুদ্যুম্নং পুনরাগতা—অর্থাৎ তিনি আবার সুদ্যুম্নের কাছে ফিরে এলেন।

কুড়ি

পৌরাণিকেরা বলেছেন—একমাস পুরুষ আর একমাস স্ত্রী হয়ে থাকার ফলে সুদ্যুম্নের পক্ষে বেশিদিন রাজত্ব করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ এই নয় যে, তিনি রাজা হিসাবে অকৃতকার্য ছিলেন। আসলে পুংস্ত্ব এবং স্ত্রীত্বের বিপরিবর্তনে যেভাবে রাজ্য শাসন চলছিল তাতে প্রজারা সুদ্যুম্নের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না এবং তারা তাঁকে তেমন করে আর অভিনন্দনও করত না—প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যনন্দন্ মহীপতিম্।

আমি পূর্বে বলেছি—ইলা ছিলেন মনুর প্রথম কন্যা সন্তান। মনুপুত্রদের পরিচয় দেবার সময় মহাভারতও তাঁকে কন্যা বলেই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে এবং বিশেষণে চিহ্নিত করেছে—তথা চৈবাষ্টমীম্ ইলা। অর্থাৎ মহাভারতের মতে ইলা মনুর অষ্টম সন্তান এবং তিনি কন্যা। আগেই বলেছি, সম্ভবত সুদ্যুম্ন নামে এক রাজার সঙ্গে তাঁর প্রথম মিলন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে সানন্দ মিলনে পুরূরবার জন্ম দেওয়ার পর আবারও যখন তিনি সুদ্যুম্নের কাছে ফিরে এলেন—সুদ্যুম্নং পুনরাগতা—তখন হয়তো রাজার বিষয়ে প্রজাদের অসন্তোষ ঘটে থাকবে। হয়তো সেই কারণেই প্রজারা রাজাকে আর অভিনন্দন করত না। সুদ্যুম্ন কিন্তু বুধের পুত্র পুরূরবাকে পুত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রজাদের অসন্তোষ ঘটলে সুদ্যুম্ন কিন্তু নিজ-ভুক্ত রাজ্যখানিও পুত্র পুরূরবাকে দিয়ে যেতে পারেননি। চন্দ্রবংশাবতংশ বুধের পুত্র পুরূরবাকে তিনি নিজের ঘরে রেখে যতই যত্ন-আত্তি করুন, সুদ্যুম্ন ওরফে ইল রাজা কিন্তু তাঁকে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারলেন না। কারণ হয়তো সেই প্রজাদের অসন্তোষ। প্রাচীন পুরাণ বলেছে—পুরুষাবস্থায় ইল রাজা (অর্থাৎ সুদ্যুম্ন) পুরূরবাকে প্রতিষ্ঠান নামে এক নতুন রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন—প্রতিষ্ঠানেঽভিষিচ্যাথ স পুরূরবসং সুতম্।

আমরা এতক্ষণ ধরে ইল রাজা বা ইলার কাহিনী শোনালাম শুধু এই তথ্যটুকুর জন্য। কারণ এই প্রতিষ্ঠানেই কুরু-পাণ্ডব বংশের পূর্ববর্তী রাজারা সকলেই রাজত্ব করতেন। নতুন নগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলেই হয়তো এই নগরের নাম প্রতিষ্ঠান এবং এই সুযোগে জানানো দরকার যে এই প্রতিষ্ঠান হল এখনকার ইলাহাবাদের নিকটবর্তী একটি জনস্থান। পৌরাণিকেরা বলেছেন—পুরূরবাকে প্রতিষ্ঠান রাজ্যে বসিয়ে দিয়ে সুদ্যুম্ন রাজা ইলাবৃতবর্ষে চলে গেলেন—জগামেলাবৃতং ভোক্তুং বর্ষং দিব্যফলাশনম্। কী রকম ইলাবৃতবর্ষ? না, যেখানে দেবতাদের উপযুক্ত ভোগ লাভ করা যায়।

আমি পূর্বে বলেছি—ইলাবৃতবর্ষই মোটামুটি স্বর্গরাজ্যের ঠিকানা এবং আরও বলেছি ভারতবর্ষে মনুই হলেন দেবতাদের প্রথম প্রতিভূ। হরিবংশে দেখবেন—মনু লোকান্তরিত হয়ে সূর্যলোক প্রাপ্ত হবার পর তাঁর দশ পুত্র পৃথিবী ভাগ করে নিলেন—দশধা তদ্দধৎ ক্ষত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্। অথচ প্রথমে মনুপুত্রদের কথা বলতে গিয়ে পৌরাণিক কিন্তু মনুর ন'টি পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তাহলে দশম পুত্রটি কে? আমরা বলব—তিনি ইলা এবং তিনি পুত্র নন। কন্যা। অপিচ তিনিই মনুর প্রথম সন্তান।

মহাভারতে যেখানে প্রথমবার কৌরব-পাণ্ডবদের বংশ-পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, সেখানে পিতার নাম না করে পরিষ্কার বলা হয়েছে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন ইলার গর্ভে—পুরূরবাস্ততো বিদ্বান্ ইলায়াং সম্পদ্যত। এই কিছুদিন আগেও একটি বিবাহিতা রমণীর জীবনে একাধিক পুরুষের আনাগোনা ঘটলে তিনি আর স্বামীদের পদবি ব্যবহার না করে 'দেবী' শব্দটি ব্যবহার করতেন। একইভাবে ইলার জীবনেও সম্ভবত দুটি পুরুষের রতি-আসক্তি থাকায় পুরূরবা আর পিতার নামে বিখ্যাত হননি, মায়ের নামে তিনি 'ঐল পুরূরবা', ঠিক যেমন বৈদিক যুগে মামতেয় দীর্ঘতমা, জাবাল সত্যকাম। গর্ভধারণ এবং পালন একসঙ্গে চালিয়ে ইলাই তাঁর মা এবং বাবা দুইই, মহাভারতের ভাষায়—সা বৈ তস্যাভবন্মাতা পিতা চৈবেতি নঃ শ্রুতম্।

মহাভারত ইলাকে একসঙ্গে পুরূরবার বাবা এবং মা বলায় পরবর্তীকালে পৌরাণিকদের মহাদেবের অভিশাপ নামিয়ে এনে তাঁকে একবার পুরুষ একবার স্ত্রীতে রূপান্তরিত করতে হয়েছে। পুত্রের জন্ম দিয়েই বুধ যে-স্বর্গেই চলে যান না কেন, ইলার অন্যতর স্বামী বুধের ঔরসজাত পুত্রের রাজ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে হয়তো ইলাকে নিয়েই চলে গিয়েছিলেন সেই পরম রম্য স্থানে, যার নাম ইলার নামসাজাত্যে ইলাবৃতবর্ষ।

মৎস্য পুরাণ বলেছে—সূর্য বংশ এবং চন্দ্রবংশের আদিতে মনুর প্রথম পুত্র ইলই ছিলেন প্রথম রাজা—সোমার্কবংশয়োরাদাবিলো'ভূন্—মনুনন্দনঃ। আমার মতে ইল নয়, মনুর প্রথম কন্যা সন্তান ইলাই ছিলেন নামত রাজা এবং কার্যত তাঁর প্রথম স্বামী সুদ্যুম্ন এই রাজ্য চালাতেন। তারপর এর মধ্যে ইলার গর্ভজাত পুত্রের পিতৃত্ব চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে প্রজাদের অসন্তোষে সুদ্যুম্ন রাজ্যচ্যুত হন এবং মূল সূর্যবংশ বা মনুবংশের পরম্পরা চলতে থাকে মনুর প্রথম পুত্র সন্তান ইক্ষ্বাকুর নামে। আর বুধপুত্র ঐল পুরূরবা ঠাকুরদাদা চন্দ্রের নাম নিয়ে রাজ্য আরম্ভ করলেন প্রতিষ্ঠানপুরে ইলাহাবাদের কাছে। হরিবংশ মন্তব্য করেছে—মনুর বংশ পরম্পরায় ইক্ষ্বাকু যেমন সুন্দর একটি রাজ্য পেলেন শাসন করার জন্য, সুদ্যুম্ন তা পেলেন না—সুদ্যুম্নো নৈনং গুণমবাপ্তবান্। আমাদের কল্পনায়—চন্দ্রবংশের সূত্রপাতেই এই যে প্রাপ্য রাজ্য না পাওয়ার ঘটনাটুকু ঘটে গেল, এই না পাওয়ার রাজনীতি নিয়তির মতো স্পর্শ করে রইল সেই পাণ্ডব-বংশ পর্যন্ত। কারণ ঐল পুরূরবার রাজধানী

AMARBOI.COM

প্রতিষ্ঠানপুরই পরে হস্তিনাপুরে পরিণত হয়েছে এবং পাণ্ডবরা সেই রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। পরের কথা পরে আসবে, আমরা চন্দ্রবংশের পরম্পরায় এবার পুরূরবার কথা বলি।

শুধু পুরূরবা নয়, ঐল পুরূরবা, ইলার ছেলে পুরূরবা। চন্দ্রের নাতি পুরূরবা। বৈবস্বত মনুর সঙ্গে তাঁর বংশ-পরম্পরা সংসৃষ্ট হলেও মূল পরম্পরা নেমে এল চন্দ্র থেকে। চন্দ্র, বুধ, পুরূরবা। এই প্রথম একটা নাম পেলাম যাঁর মধ্যে তথাকথিত দেবতার তেজটুকু পেলাম, বুধ-নক্ষত্রের আলোটুকু পেলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিপূর্ণ মানুষও পেলাম—ঐল পুরূরবা, স্ত্রী-পুরুষের একাকার মানস থেকে জাত ইলার ছেলে পুরূরবা।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই একটি রাজনাম, যাঁর মধ্যে বৈদিক যুগের শেষ স্বাক্ষরটুকু রয়েছে, আর মহাভারত পুরাণের আরম্ভও তাঁকে দিয়েই। তখনও স্বর্গবাসী দেবগণের সঙ্গে মনুষ্যলোকের গভীর যাতায়াত ছিল। বেদে আছে পুরূরবা যখন জন্মেছিলেন তখন নাকি স্বর্গমোহিনী অপ্সরারা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁর জন্মোৎসবে নৃত্য করেছিলেন—সমস্মিন্ জায়মান আসত গ্না উতেমবর্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্তাঃ। কে জানত এক মোহিনী অপ্সরার সঙ্গেই তাঁর সমস্ত জীবন বাঁধা হয়ে যাবে! ঘটনাটা আনুপূর্বিক জানাই।

পৌরাণিকেরা জানিয়েছেন—পুরূরবা জন্ম লাভ করার পর তাঁর জন্মদাতা পিতা বুধ তাঁকে মায়ের কাছে রেখে স্বর্গের পথে ফিরে গিয়েছিলেন। ঠিক যে জায়গাটায় পুরূরবা জন্মেছিলেন সে জায়গাটা অবশ্যই অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চল। তীর্থযাত্রাধ্যায়ে মহাভারতের কথা যদি ঠিক হয়, তবে বলতে হবে পুরূরবার সেই জন্মস্থান পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছিল পুরু-পর্বত নামে—পর্বতশ্চ পুরুর্নাম যত্র জাতঃ পুরূরবাঃ। পিতৃবিরহিত পুরূরবাকে নিয়ে তাঁর মা ইলা মোটেই ভেঙে পড়েননি কারণ মানুষ নামে খ্যাত প্রথম পুরুষ মনুর তিনি বংশধর। তাঁর আকৃতি প্রকৃতি সাহস একটু আলাদা। পিতার কাছে তিনি রাজ্যের অধিকার চাননি। সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিত্বে এবং চেষ্টায়—সে চেষ্টার মধ্যে সুদ্যুম্ন নামে কোনও অভিমত বশংবদ পুরুষের স্বেচ্ছাবদান থাকুক আর নাই থাকুক—তিনি পুত্র পুরূরবাকে প্রতিষ্ঠান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এইজন্যই তিনি মহাভারতের শ্লোকে পুরূরবার মাতাও বটে পিতাও বটে। টীকাকারেরা প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—এ ব্যাপারে মা হয়েও তিনি পুরুষের স্বভাবে পুত্রকে রাজ্যদান করেছিলেন, সেই কারণেই তিনি একই দেহে পুরূরবার মাতা এবং পিতা দুইই—'মাতৈব লব্ধপুংভাবা রাজ্যদানাৎ পিতাপ্যভূৎ' মুখ্যঃ পিতা তু বুধ এব। সেই কারণে পুরূরবাও ঐল পুরূরবা।

মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি—প্রতিষ্ঠানে রাজধানী স্থাপন করে যে ক্ষুদ্র রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা হল, পুরূরবার রাজত্বকালে সেই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। পুরূরবা শুধু নবীন প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা রইলেন না। এই ভারতবর্ষ যে বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত সেই জম্বুদ্বীপের অন্তত তেরোখানি উপদ্বীপের ওপর পুরূরবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল—ত্রয়োদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ পুরূরবাঃ। এ কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি একটু-আধটু থাকতেই পারে। প্রাচীনকালের স্বর্ণপ্রস্থ কি চন্দ্রশুকের মতো উপদ্বীপ পুরূরবার অধিকারে নাই থাকুক, কিন্তু এই তেরো দ্বীপের ভুক্তি দেখিয়ে একথা অবশ্যই প্রমাণ করা গেল যে, পুরূরবার ক্ষমতা এবং মর্যাদা ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুরের আদলে দক্ষিণ-ভারতেও অন্য একটি রাজধানী তৈরি হয়েছিল। মহামান্য সাতবাহন বংশের

www.amarboi.com

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী এবং অন্যান্য রাজারা এইখানেই রাজত্ব করতেন।

দক্ষিণ-ভারতের প্রতিষ্ঠান-পুরী যে উত্তর-ভারতের আদলে অথবা নাম-সাম্যেই তৈরি হয়েছিল, তার একটা বড় প্রমাণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পতনের পরেই দাক্ষিণাত্যে যে সমস্ত রাজবংশ মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাদের অন্তত একটি ধারা দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান-পুরীকে মহিমান্বিত করে তোলে। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে আরও অনেক পরে। পুরাণমতে দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠানে সাতবাহন বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গৌতমীপুত্র পুলোমা, যাকে স্ট্রাবো বলেছেন 'P(t)olemaios of Baithan' অর্থাৎ স্ট্রাবোর 'বৈঠান' অথবা দেশীয় উচ্চারণে যেটা পৈঠান, সেটাই সংস্কৃত পুরাণ-মহাভারতের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু উত্তরভারতে পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠান, যেটাকে আমরা আধুনিক ইলাহাবাদের কাছে স্থান দিয়েছি, আধুনিক অপভ্রংশে সেই প্রতিষ্ঠান একখানি গ্রাম নামের মধ্যে টিকে আছে। তার নাম 'পিহান'। জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার অনেক যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্মৃতি ধরার চেষ্টা করেছেন 'পিহান' নামটির মধ্যে। অন্যদিকে কিছু পণ্ডিত মোটামুটিভাবে গঙ্গার তীরে প্রয়াগের কাছে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন, স্পষ্ট করে 'পিহান' নামটি আর তাঁরা উল্লেখ করেননি।

পুরূরবার প্রতিষ্ঠান 'পিহান'ই হোক অথবা অন্য কিছু, অন্তত এই প্রসঙ্গে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আর্যরা ততদিনে কাশ্মীর-পাঞ্জাবের বাসভূমি ত্যাগ করে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং রাজত্বের জন্য নতুন একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত পূর্বতন দেবভূমির সঙ্গে পুরূরবার যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। বরং বলা যায় দেবতা অথবা দেবকল্প ব্যক্তিরাই তখনও পুরূরবার সঙ্গী। মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি—পুরূরবা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সদা-সর্বদা দেবতা বা দেব-সদৃশ ব্যক্তিদের দ্বারাই পরিবৃত থাকতেন—অমানুষৈর্বৃতঃ সর্ত্ত্বৈর্মানুষঃ সন্ মহাযশাঃ। পরিষ্কার বোঝা যায়, আর্যায়ণের প্রথম কল্পে যাঁরা নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠায় পুরূরবার সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁরা কেউই তখনও চলে যাননি।

AMARBOI.COM

প্রতিষ্ঠান নগরীর রাজা হয়ে, জম্বুদ্বীপের অর্ন্তগত অন্তত তেরোটি বিশাল ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে পুরূরবার মান মর্যাদা যেমন বেড়ে গেল, তেমনই তাঁর মত্ততাও কিছু বেড়ে গেল। ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা অতিরিক্ত হয়ে গেলে অতি বিচক্ষণ এবং ধীমান ব্যক্তিরও স্খলন ঘটে, পুরূরবার মধ্যেও সেই স্খলন দেখা দিল। যে সমস্ত দেবপ্রতিম ব্যক্তি পুরূরবার সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাও এই স্খলন রোধ করেননি অথবা তাঁরা স্বার্থবশে পুরূরবার পতনের সঙ্গী হয়েছিলেন।

আমাকে দু-এক জনে বলেছেন—মহাভারতের মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি মহাভারতের বক্তার যেন পক্ষপাত আছে। পাণ্ডবদের সবই ভাল আর কৌরবদের সব খারাপ, এমন একটা ভাব যেন লক্ষ্য করা যায়। কথাটা আরও গাল-ভরা করে একই লোক বলেছিলেন—মহাভারতের কবি, বক্তা—এঁরা তো সব রয়্যাল প্যাট্রোনেজে দিন কাটাতেন, তাই চলমান রাজবংশের সুখ্যাতি তাঁদের করতেই হত। আমি বলি—এ সব ধারণা খানিকটা মহাভারত না পড়ার ফল, আর খানিকটা মহাভারতের গৌণ-গ্রন্থ পড়ার ফল। কতগুলি সাহেব এবং বাঙালি সাহেব আছেন, তাঁরা আবার নানা রকম 'ইজম্' মিশ্রিত মহাভারতের ওপর লেখা গৌণ গবেষণাগ্রন্থ পাঠ করে নানা সিদ্ধান্ত দেন।

দিতেই পারেন। মহাভারত এতই বড় ব্যাপার যে সেটিকে নানা দিক থেকে বিচার করা যেতেই পারে এবং নানা মতামতও দেওয়া যেতে পারে। আমার কাছে সে সকলই শিরোধার্য।

কিন্তু দুঃখ পাই, যা নয় তাই বললে। রাজা-রাজড়ার আনুগত্যে সূত-মাগধদের পক্ষপাত নিশ্চয়ই ধরা পড়ত কিন্তু তাই বলে তাঁরা ইতিহাস এড়িয়ে যেতেন না। পূর্বতন বংশধারায় কলঙ্ক থাকলে, হিংসা-অসূয়া থাকলে, তাও তাঁরা লুকোতেন না। কোনও না কোনও জায়গায় ঠিক তাঁরা বলে দিতেন। এই কথাটা পাণ্ডবদের মূল পুরুষ পুরূরবা সম্বন্ধেও খাটে বলে এখনই কথাটা তুললাম এবং পরেও এসব কথা আসবে।

বেদের মধ্যে পুরূরবার কীর্তি কাহিনী কিছু আছে। ঋগ্‌বেদের মূল পর্বের নিরিখে পুরূরবার প্রসঙ্গ যতই অর্বাচীন হোক—কিছু পণ্ডিত ঋগ্‌বেদে পুরূরবার কথাবস্তুকে অর্বাচীনই বলে থাকেন—তবু মনে রাখতে হবে সেই বিখ্যাত উক্তিটি—ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ—অর্থাৎ মহাভারত-পুরাণগুলি দিয়েই বেদের কথা পরিপূরণ করতে হবে, 'সাবস্‌টানসিয়েট' করতে হবে। আর এখানে সেই 'সাবস্‌টানসিয়েশন' খুব ভালভাবেই করা যায়।

দেখবেন—প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই মর্ত্যভূমির রাজা পুরূরবার সঙ্গে স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর মিলন-বিরহের কথা সবিস্তারে বলা আছে। কিছু আছে মহাভারতেও। ইতিহাস পুরাণের এই সবিস্তার কাহিনীর মূল উৎস কিন্তু বেদ। বেদের মধ্যে পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনীটি আছে কথোপকথনের আকারে, যাকে পরিভাষায় বলে সংবাদ-সূক্ত। দেবতা, যজ্ঞ, আহুতি আর প্রার্থনাই যেখানে বৈদিক সূক্তগুলির প্রধান অভিজ্ঞান—সেখানে উর্বশী-পুরূরবার এই কথোপকথনের অংশটুকু এতই মধুর এবং নাটকীয় যে, পণ্ডিতজনেরা অনেকেই এই সংবাদ-সূক্তটিকে পরবর্তী সংস্কৃত নাটকের বীজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। উর্বশী-পুরূরবার মিলন-বিরহের কথায় আমি পরে আসছি। আমার বক্তব্য আপাতত অন্য কিছু। বেদে উর্বশী-পুরূরবার কথোপকথন অংশের শেষে দেখা যাবে—উর্বশী পুরূরবাকে বলছেন—এই দেবতারা বলছেন পুরূরবা তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হবে, তোমার পুত্রেরা সকলেই হোমদ্রব্য দিয়ে দেবতাদের আহুতি রচনা করবে, তুমি স্বর্গে আমোদিত হবে—প্রজা তে দেবান্‌ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে।

বস্তুত সারা সংবাদ-সূক্তটিতে যাগ-যজ্ঞ দেবতাদের কথা কিছু নেই। একেবারে শেষ পংক্তিতে উর্বশীর এই হোম-যজ্ঞের উপদেশ পৌরাণিকদের ভাবিত করেছে। তাঁরা পুরূরবা-উর্বশী আখ্যানের শেষ পর্বে দেখিয়েছেন কীভাবে পুরূরবা বৈদিক অগ্নিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসছেন এবং কীভাবে শেষ পর্যন্ত অগ্নিসমিন্ধন করে পুরূরবা আপন অভিলাষ পূরণ করছেন।

আমি আসলে শেষ কথাটা আগে বলে ফেলেছি—পুরূরবা বৈদিক অগ্নিকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে যা মনে হয়, তা হল—প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা হবার পর তাঁর মর্যাদা যখন খুব বেড়ে গেল, তখন তাঁর মধ্যে ঐশ্বর্যের মত্ততাও কিছু জন্ম নিল। মহাভারত বলেছে—রাজা হবার পর পুরূরবা ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এর প্রথম ফল হল—তিনি রাজ্যের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ করলেন— বিপ্রৈঃ স বিগ্রহং চক্রে বীর্যোন্মত্তঃ পুরূরবাঃ। যজন-যাজন-অধ্যাপনে যতটুকু সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের লাভ হত, পুরূরবা তা সবই জোর করে নিয়ে নিতেন। ব্রাহ্মণরা কান্নাকাটি কম করতেন না। তাঁদের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ ঠেলে ফেলে দিয়ে পুরূরবা তাঁদের ধন-রত্ন কেড়ে নিতেন—জহার চ স বিপ্রাণাং রত্নান্যুৎক্রোশতামপি।

amarboi.com

ঠিক এই জায়গাটায় আমাদের টিপ্পনি দিতে হবে সামান্য।

মনে রাখতে হবে—পুরূরবা পিতৃপরম্পরায় কোনও বাঁধা রাজ্য পাননি। প্রধানত তাঁর মায়ের চেষ্টা অথবা তাঁর পালক পিতার চেষ্টায় তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে রাজ্য লাভ করেছিলেন। সে যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে বিভাগ ছিল, তা শুধুই বর্ণের তর-তম। ব্রাহ্মণরা সাধারণ যাগ-যজ্ঞ নিয়ে থাকলেও রাজ-দরবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিশেষত ক্ষত্রিয় রাজার পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে, তাঁদের যাগ-যজ্ঞের কাজও খানিকটা ব্যাহত হত। আবার পদে পদে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা না পেলে বা না মানলে ক্ষত্রিয় রাজাদেরও অসুবিধে হত।

আর্যায়ণের প্রথম কল্পে যখনই কোনও ক্ষত্রিয় রাজা অন্যত্র রাজ্য জয় করে তার অধিকার কায়েম করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও তাঁদের সঙ্গে আসতেন। বঙ্গদেশেও ব্রাহ্মণ্য অধিকার এইভাবে ঘটেছে, দাক্ষিণাত্যেও তাই ঘটেছে। ধরে নিতে পারি কাশ্মীর-পাঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশে আসার সময় গঙ্গার স্রোতধৌত ভূমিখণ্ডেও ব্রাহ্মণ অধিকার একইভাবে জন্মেছে। ইতিহাস-পুরাণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রায়ই এই দুই উচ্চ বর্ণের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। ক্বচিৎ কখনও যে গণ্ডগোল ঘটেছে—যেমন পরশুরাম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সময় (এবং এছাড়াও আরও কিছু উদাহরণ আছে), সেই 'ক্রাইসিস পিরিয়ড'গুলি ছাড়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা চিরকালই এক সুসংহত শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। যাঁরা নিম্নবর্ণের ওপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরাও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই মিলিত শক্তিকেই অত্যাচারের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু মুশকিল হল, আর্যায়ণের প্রথম কল্পে এই সংহতি অত সম্পূর্ণ ছিল না। স্মরণ করা যেতে পারে বেণ রাজার কথা। প্রায় প্রত্যেক পুরাণে এবং অবশ্যই মহাভারতেও বেণের উপাখ্যান পাওয়া যাবে পৃথু রাজার প্রসঙ্গে। পৌরাণিক শ্রুতি অনুসারে পৃথু হলেন এই পৃথিবীর প্রথম রাজা। মহারাজ পৃথুর নাম থেকেই আমাদের এই বাসভূমির নাম পৃথ্বী অথবা সংযুক্ত বর্ণ ভেঙে পৃথিবী। পৃথিবীতে প্রথম আইনের শাসন নিয়ে আসা অথবা পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার মর্যাদা দেওয়া হয় পৃথুকেই। কিন্তু যে পুরুষটি থেকে পৃথুর জন্ম হয়, সেই বেণই কিন্তু ছিলেন প্রথম রাজা। মহাভারতে যেখানে পুরূরবার কথা আছে, তার কিছু আগেই বেণের কথা আছে।

মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে দেখা যাবে—বেণ রাজা হবার পরেই দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের অস্বীকার করে বসেন। ঐশ্বর্যে মদমত্ত হয়ে তিনি প্রচার করতে থাকেন—দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের মান্য করার কিছু নেই, পুজো যদি করতেই হয় তো আমাকে করো। আমি রাজা, আমিই এই সংসারে একমাত্র পূজনীয় ব্যক্তি—অহমিজ্যশ্চ পূজশ্চ। বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে পড়লেন, কাউকেই তিনি আর মানেন না। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ-ঋষিরা সংঘবদ্ধ হলেন এবং মন্ত্রপূত কুশের আঘাতে তাঁকে মেরে ফেলেন। অত্যাচারী বেণের মৃত্যুর পর সমবেত ঋষি-ব্রাহ্মণ মৃত বেণের দক্ষিণ ঊরু মন্থন করতে আরম্ভ করলেন—মমন্থু দক্ষিণং চোরুম্ ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। সেই ঊরু-মন্থনের ফলে জন্ম নিল নিষাদেরা—দেখতে তারা হ্রস্বকায়, রক্তচক্ষু, কৃষ্ণকেশ। নিষাদেরা জন্মানো-মাত্রই ঋষিরা তাঁদের বললেন—ব্যাটারা বসে থাক চুপ করে—যার সংস্কৃত শব্দ হল 'নিষীদ'। এই 'নিষীদ' থেকেই নিষাদ শব্দ। নিষাদ— যাঁদের আমরা পরবর্তীকালে ম্লেচ্ছ বলে ডেকেছি, ব্যাধ বলে ডেকেছি অথবা অনার্য-অধম ক্রূর এক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছি, সেই নিষাদেরা অতঃপর বিন্ধ্য-পর্বতের প্রত্যন্তভূমিতে গিয়ে আশ্রয়

নিল—যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়া ম্লেচ্ছাঃ শতসহস্রশঃ।

নৃতত্ত্বের নিরিখে এই নিষাদ-ম্লেচ্ছদের কথা আমরা পরে ভাবব, আপাতত জানাই—ঋষিরা এরপর বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করা আরম্ভ করলেন এবং সেই মন্থনের ফলে জন্মালেন মহারাজ পৃথু—ইন্দ্রের মতো তাঁকে দেখতে, ইন্দ্রের মতোই তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি। পৃথিবীর সেই প্রথম রাজা জন্মগ্রহণ করেই বুঝলেন তাঁর মধ্যে রাজধর্মের শুদ্ধবুদ্ধিটুকু আছে। দেবতারা এবং ঋষিরা সমস্বরে তাঁকে বললেন—রাজা! তুমি তোমার নিজের পছন্দ-অপছন্দ বাদ দিয়ে সমস্ত মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি দাও—প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য সমঃ সর্বেষু জন্তুষু।

উপদেশ আরও অনেক আছে; পৃথু মহারাজ সে সবই মেনে নিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিজ্ঞা হল—ব্রাহ্মণরা সকলেই আমার প্রথম মান্য পুরুষ, আমি তাঁদের বিরুদ্ধে যাব না—ব্রাহ্মণাঃ মে মহাভাগাঃ নমস্যাঃ পুরুষর্ষভাঃ। আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞাটুকুই বড় কথা। মনে রাখতে হবে—আর্যায়ণের প্রথম কল্পে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ। তাঁরা সমাজের নীতি-নিয়ম যেমন তৈরি করতেন রাজনীতি, দণ্ডনীতিও তাঁদেরই তৈরি। বেণ সেই ব্রাহ্মণদের নীতি-নিয়ম অস্বীকার করে আপন বুদ্ধিতে বলশালী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সংঘবদ্ধ ব্রাহ্মণ্য-শক্তির সঙ্গে তিনি এঁটে উঠতে পারেননি। তাঁকে মরতে হয়েছে।

বেণও কিন্তু নিজে রাজা হননি। সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের অনুমতি ক্রমেই তিনি রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু যাগ-যজ্ঞ, দেবতা এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কথায় কথায় ব্রাহ্মণদের অনুজ্ঞা-উপদেশ তিনি মেনে নিতে পারেননি। বঙ্গীয় পণ্ডিত-জনের মতে বেণই প্রথম পুরুষ, যিনি এতকালের পরিচিত দেবতা-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের অধিকার অস্বীকার করেন। আমার ধারণা—ওই নিষাদ-ম্লেচ্ছদের কথা বললাম—আর্যায়ণের প্রথম পর্যায়ে দেশজ ওই ব্যক্তিরাই ব্রাহ্মণ্য-শক্তির বিরুদ্ধে বেণের সহচারী ছিলেন। বেণের মৃত্যুতে এবং দেব-ঋষি-মনোনীত পৃথুর রাজত্বে তাঁরা পিছু হঠে গিয়ে বিন্ধ্য-পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আর্য-সভ্যতার বিকাশের প্রথম পর্বে দেশজ ব্যক্তিদের দক্ষিণে তাড়িত হওয়ার যে কল্পনা ঐতিহাসিকেরা সচরাচর করে থাকেন, তার ছায়া এই বেণের বাহু-মন্থনের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় বলে আমাদের বিশ্বাস।

বেণের ঘটনার সঙ্গে আমি পুরূরবার জীবনের সাদৃশ্য দেখাতে চাইছি। পুরূরবার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর তীরে। আর্যায়ণের দ্বিতীয় পর্যায় সেটা। নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা মানেই রাজার সেখানে একক প্রতিষ্ঠা। এরই মধ্যে ঋষি-ব্রাহ্মণেরা এসে যখন 'এই করো, সেই করো' অথবা 'এটা ঠিক নয়, এটা অনুচিত' বলে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন, তখন সেই নীতি-নিয়মের শৃঙ্খল, আর আচার-বিচারের বিধি-নিষেধ কোনও এক-নায়ক রাজার মনোমত হয়? অতএব রাজা পুরূরবার দিক থেকে আরম্ভ হল সেই অত্যাচার উৎপীড়ন, ব্রাহ্মণ্যের মূল-উৎপাটনের সেই প্রচেষ্টা, যা আমরা বেণের আমলে দেখেছি। ব্রাহ্মণদের সঞ্চিত ধন-রত্ন লুণ্ঠিত হল, তাঁদের নীতি-নিয়মের বাক্য স্তব্ধ হল।

পুরূরবার রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যের এই অপমান-উৎপীড়নে ব্যথিত হয়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার ব্রহ্মলোক থেকে এলেন পুরূরবাকে বোঝাতে—সনৎকুমারস্তং রাজন্ ব্রহ্মলোকাদ্ উপেত্য হ। শ্রুতি-স্মৃতির নানা সদাচার উপদেশ করে সনৎকুমার পুরূরবাকে অনেক কথা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তাঁর সমস্ত অনুরোধ বৃথা হল। রাজা কানেই নিলেন না সে সব কথা—প্রত্যগৃহ্নান্ন চাপ্যসৌ। উৎপীড়ন, উৎপাটন, লুণ্ঠন আগের মতোই চলতে লাগল। ব্রাহ্মণ

ঋষি-মুনিরা আবার সংঘবদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মহর্ষিদের অভিশাপে রাজার রাজত্ব গেল। হিংসা লোভ আর শক্তিমত্তার জ্বালায় রাজার চেতনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মহর্ষিরা লোভী বলোন্মত্ত রাজাকে অভিশাপে বিনষ্ট করলেন—ততো মহর্ষিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ সদ্যঃ শপ্তো বিনশ্যত।

আশ্চর্য হল, এর পরেই মহাভারতের বর্ণনায় দেখছি রাজা পুরূরবা গন্ধর্বলোকবাসিনী উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপের জন্য তিনি পবিত্র অগ্নি বহন করে নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে—আনিনায় ক্রিয়ার্থে' গ্নীন যথাবদ্‌বিহিতাংস্ত্রিধা। এই অংশটাই বড় ভাবনার। তাহলে কি পুরূরবা মরেননি? ব্রাহ্মণরা কি অভিশাপ দিয়ে পুরূরবার জীবন বিনষ্ট করতে পারেননি?

একুশ

পুরূরবা মারা যাননি, ঠিক যেমন আমাদের ধারণা অত্যাচারী বেণও মারা যাননি। বেণের রাজত্ব এবং শাসন স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করে পৃথুর জন্ম হল— আধুনিক দৃষ্টিতে এই ভাষ্যও তত আদরণীয় নয়। 'মন্থন' শব্দটার মধ্যে একটা অন্বেষণের ইঙ্গিত থাকে সব সময়। 'শাস্ত্র মন্থন করা' অথবা মৌখিকভাবে আমরা যেমন বলি 'জায়গাটা মথে ফেলেছি'—অথবা সেই সমুদ্র-মন্থন- সর্বত্রই এই মন্থন বা মথে ফেলার মধ্যে একটা অন্বেষণের ব্যাপার থাকে। 'বাহু' জিনিসটা ক্ষাত্র-শক্তির প্রতীক। বেণকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁরই দক্ষিণ বাহু মন্থন করে যে পৃথু রাজাকে পাওয়া গেল, তা আসলে বেণেরই বংশধারায় কোনও বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয়কে খুঁজে বার করার ব্যাপার। 'দক্ষিণ মানে অবশ্যই 'ফেভারেবল'। বেণের বংশধারায় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি অনুগত ব্যক্তিটিই হলেন পৃথু। পৃথুকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত ব্রাহ্মণরা তাঁকে বলেছেন— মনে-প্রাণে প্রতিজ্ঞা করো, পৃথু! প্রতিজ্ঞামধিরোহস্ব— প্রতিজ্ঞা করো— 'আমি এই ভূলোকবাসী ব্রাহ্মণদের সযত্নে পালন করব। তাঁদের আমি দণ্ড দেব না কোনওদিন—অদণ্ড্যা মে দ্বিজাশ্চেতি প্রতিজানীহি হে বিভো। পৃথু স্বীকার করে নিয়েছেন ব্রাহ্মণদের কথা—এবমস্তু।

কথা হল— বেণের মতো চন্দ্রবংশীয় পুরূরবারও একটা রূপক-মৃত্যু আছে। মনে রাখতে হবে, মহাভারতে গন্ধর্বলোক থেকে পুরূরবা যে উর্বশীকে নিয়ে এলেন, সে ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে ব্রাহ্মণদের হাতে পুরূরবার ধ্বংসের পর।

পুরূরবার সিংহাসনে আরোহণ, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং তাঁর ধ্বংস নিয়ে যদি একটা ঘটনা-পরম্পরা সাজিয়ে তোলা যায়, তাহলে উর্বশীর সঙ্গে তাঁর মিলন, বিরহ এবং পুনর্মিলনের ঘটনা-পরম্পরা সাজিয়ে পুরূরবা কাহিনীতে দ্বিতীয় একটি স্তরও তৈরি করে

ফেলা যায়। যদিও এমনটি কখনও জোর করে বলা ঠিক হবে না যে, পুরূরবা জীবনের প্রথমাংশের মধ্যে উর্বশীর অস্তিত্ব নেই অথবা এমনও ঠিক নয় যে, পুরূরবা-উর্বশীর প্রেম-কাহিনীর মধ্যেও তাঁর ব্রাহ্মণ্য-বিরোধের অংশটুকু নেই। মনুষ্য-জীবন বাঁধা গত্‌ মেনে চলে না, অতএব পুরূরবার জীবনেও ব্রাহ্মণ-বিরোধের অংশ শেষ হয়েছে, তারপর উর্বশীর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে—এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই।

বায়ু-পুরাণে দেখতে পাচ্ছি—সমুদ্রমেখলা এই পৃথিবীর সমস্ত অধিকার ভোগ করেও পুরূরবার লোভ কিছু কমেনি। ধন-রত্নের তৃষ্ণাও কিছু কমেনি তাঁর—তুতোষ নৈব রত্নানাং লোভাদিতি হি নঃ শ্রুতম্‌। পুরূরবা যখন রাজত্ব করছেন সেই সময়েই নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা এক বিশাল যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেব-কারিগর বিশ্বকর্মা এই মহান যজ্ঞের জন্য সোনা দিয়ে যজ্ঞভূমি বাঁধিয়ে দেন। যজ্ঞ আরম্ভ হল। স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি এই যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ দেখার জন্য উপস্থিত হলেন।

এদিকে মহারাজ পুরূরবা শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত ভিড় করে চলল এবং সেটা খুব বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললেন স্বর্গসুন্দরী উর্বশী, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন পুরূরবার আসঙ্গলিপ্সায়—উর্বশী চকমে যজ্ঞং দেবহূতিপ্রণোদিতা। মৃগয়ায় বেরিয়ে এ দেশ সে দেশ ঘুরে পুরূরবা উপস্থিত হলেন নৈমিষারণ্যে—যেখানে সোনায় বাঁধানো যজ্ঞভূমিতে ঋষিদের যজ্ঞ চলছে পুরোদমে।

যজ্ঞস্থলীর পুণ্যমন্ত্র আর হবির্গন্ধে অতি-বড় অমানুষেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়, শ্রদ্ধায় চক্ষু নিমীলিত হয়। কিন্তু চন্দ্রবংশাবতংস বুধপুত্র ঐল পুরূরবার কানে মন্ত্র-গানের স্বরসঙ্গতি প্রবেশ করল না, তাঁর মন আকুলিত হল না হবির্গন্ধে। যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ পড়ল সুবর্ণময় যজ্ঞভূমির ওপর। লোভে তাঁর হৃদয় আলোড়িত হল, কার্যাকার্য জ্ঞান লুপ্ত হল। তাঁর ইচ্ছে হল সেই মুহূর্তে নৈমিষারণ্যের সুবর্ণময় যজ্ঞভূমি উৎখাত করে নিয়ে যান—লোভেন হতবিজ্ঞান স্তদাদাতুং প্রচক্রমে। ইচ্ছা এবং প্রক্রিয়া একই সঙ্গে শুরু হল। যজ্ঞযাজী ঋষি-ব্রাহ্মণদের ধৈর্য বেশিক্ষণ থাকল না। তাঁরা মন্ত্রপূত কুশের আঘাতে মেরে ফেললেন পুরূরবাকে। ঋষিদের কুশাঘাত বজ্র হয়ে নেমে এল পুরূরবার ওপর। রাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের আগেই মারা গেলেন পুরূরবা—ততো নিশান্তে... কুশবজ্রৈ র্নিষ্পিষ্টঃ স রাজা ব্যাহরত্তনুম্‌।

সেই একই কথা। বেণের যেমন হয়েছিল। ঋষিদের হাতে মারা গেলেন পুরূরবা। সবচেয়ে বড় কথা— পুরূরবার এই নৈমিষারণ্য অভিযানের সময়ে অর্থাৎ রাজা যখন সেই পুণ্যস্থানের সুবর্ণময় যজ্ঞভূমি লুণ্ঠনের চেষ্টা করছেন সেই সময়ে স্বর্গসুন্দরী উর্বশী কিন্তু পুরূরবার পাশেই আছেন— আজহার চ তৎসত্রং স্বর্বেশ্যাসহসঙ্গতঃ। তাহলে অন্তত বায়ুপুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী পুরূরবার জীবনে ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার অংশটুকু উর্বশীর সঙ্গ-গন্ধ-বিরহিত নয়।

আশ্চর্যের বিষয় হল— পৌরাণিকেরা যে সব সূত্র থেকে পুরূরবার জীবন কাহিনী বিবৃত করেছেন, সেইসব সূত্রের মধ্যে একমাত্র মহাভারত বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ছাড়া আর কোথাও এই ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার তথ্যটুকু তেমনভাবে ধরা নেই। উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবা মিলন-বিরহের অধ্যায়টুকু আমরা না হয় আলদাভাবে একটা নতুন স্তরেই সাজিয়ে নেব। কিন্তু পুরূরবার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা যে একটা হয়েছিল এবং পুরোপুরি মারা না গেলেও তাঁর যে সাময়িক রাজ্যচ্যুতি গোছের কিছু হয়েছিল, তা মহাভারতের অন্য অংশ থেকেও বোঝা যায়। না, স্পষ্ট করে রাজ্যচ্যুতির কথা কিছু বলা নেই মহাভারতে। কিন্তু যে ভাবেই হোক তেমন কোনও

বিপাকে তাঁকে অবশ্যই পড়তে হয়েছিল, তা বোঝা যায় মহাভারতের শান্তিপর্বে এসে। রাজ্যশাসন চালাতে গেলে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা যে কতটা জরুরি, অপিচ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সমন্বয় যে কতটা প্রয়োজনীয়, সে কথা পুরূরবার নানা প্রশ্নে সাতঙ্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে পুরূরবার সঙ্গে একজন দেবতা এবং একজন ঋষির কথোপকথন সংকলিত হয়েছে। দেবতা এবং ঋষি—দুজনের কাছেই পুরূরবার প্রশ্ন ছিল একটাই—কিসে বড় ব্রাহ্মণরা? এবং কেনই বা পদে পদে মানিয়ে চলতে হবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে? বেণের ক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী বংশজ পৃথু মহারাজকে ব্রাহ্মণেরা রাজা করেছিলেন; কারণ বেণ ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি কাউকে মানতেন না এবং তাঁর অত্যাচার ছিল প্রাবাদিক পর্যায়ের। পুরূরবার অত্যাচার ব্যাপারটা সে রকম নয় বোধ হয়। তাঁর নামে যে ব্রাহ্মণদের ধন-রত্ন লুণ্ঠনের দোষারোপ করা হয়েছে, আমাদের ধারণা—তার কারণ নিহিত আছে তাঁর রাজ্য শাসনের পদ্ধতিতে। প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা যেহেতু যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়েই থাকতেন তাই রাজারা তাঁদের ওপর কোনও করের বোঝা চাপাতেন না। এই সাধারণ নীতির কথাটা কালিদাস তাঁর নাটকের মধ্যেও বলে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। মহারাজ দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে প্রথমবার দেখে এসে বনের মধ্যে বিদূষকের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তখন তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ আচ্ছন্ন। শকুন্তলা ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতেই পারছেন না। আরও একটিবার যাতে শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করা যায়—তার জন্য যুক্তিবুদ্ধি, নানা ওজর এবং বাহানা তৈরি করতে লাগলেন। দুষ্যন্ত বললেন— তপস্বীরা যে আমাকে কেউ কেউ চিনেও ফেলেছে। এখন বলো তো কী করে আবার সেই কণ্ব-ঋষির আশ্রমে ঢুকি? বিদূষক বললেন—তুমি দেশের রাজা। তোমার আবার অত ছুতো বার করার প্রয়োজন কী? বললেই হল— নীবার-ধানের একের ছয় ভাগ দেওয়ার কথা তোমাদের, সেই জন্য আবার এসেছি। রাজা বললেন—তুমি একটি মূর্খ। অন্য জাতিবর্ণের লোকেরা আমাদের যে কর দেয় তা বড়ই নশ্বর। এঁদের রক্ষা করার জন্য আমরা অন্য জিনিস পেয়ে থাকি। ধনরত্নের চেয়ে তা অনেক বড়। ওঁরা ওঁদের তপস্যার এক ভাগ দেন রাজাকে। রাজার কাছে সেই তপস্যার পুণ্যধন অক্ষয়। অর্থাৎ করের কোনও প্রশ্নই নেই। ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে চরম ভাষায়। কিন্তু পুরূরবা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কর নিতেন। কী খাতে সেই কর সংগ্রহ করা হত, তা স্পষ্ট করে না জানা গেলেও মহামতি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের মধ্যে সেই খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই জানিয়ে দিয়েছেন—পুরূরবার সর্বনাশ হয়েছে চতুর্বর্ণের সব মানুষের ওপর 'ট্যাক্স্' চাপিয়ে—লোভাদ্ ঐলশ্চাতুর্বর্ণ্যম্ অত্যাহারয়মাণঃ।

আমাদের ধারণা এই কর গ্রহণের নীতিই সাময়িকভাবে পুরূরবার রাজ-সিংহাসন কণ্টকিত করে তুলেছিল এবং ঠিক এই পর্যায়ে তাঁর মনে অবধারিত প্রশ্ন জেগেছে—ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের চাইতে কিসে বড়—কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখাতুমর্হতি? বায়ুদেবতার সঙ্গে তাঁর এই কথোপকথনের প্রসঙ্গে আরও একটা বড় প্রশ্ন জেগেছে পুরূরবার মনে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—আপনি ঠিক করে বলুন তো আমাকে— শাসন করার জন্য এই যে পৃথিবী ক্ষত্রিয়দের অধিকারে আসে, সেই পৃথিবী আসলে কার প্রশাসনে থাকবে? যে রাজা বাহুবলে এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করেন, পৃথিবী কি সেই ক্ষত্রিয়ের ভোগ্য, নাকি ব্রাহ্মণের—দ্বিজস্য ক্ষত্রবন্ধো র্বা কস্যেয়ং পৃথিবী ভবেৎ?

বায়ু দেবতা জাতি-বর্ণের অণুক্রমে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব পুরূরবাকে বুঝিয়েছেন। ব্রাহ্মণ শুধু বর্ণ-শ্রেষ্ঠ নয়, বর্ণ-জ্যেষ্ঠও বটে। আর পৃথিবীর অধিকার? বায়ু উপমা দিয়ে বলেছেন— সে হল ঠিক স্বামী আর দেবরের মতো। সেকালের দিনে স্বামী মারা গেলে ক্বচিৎ কখনও স্বেচ্ছায় সহমরণের কথা শোনা যায় বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিধবা স্ত্রী স্বামীর ছোট ভাইকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতেন। ঋগ্‌বেদ থেকে আরম্ভ করে পুরাণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যাবে যে, অনেক স্ত্রীই স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরকে বিবাহ করেছেন। বায়ু এই উপমাটি স্মরণ করে পুরূরবাকে বললেন—দেখ, এই সমস্ত ভূমিখন্ডের স্বত্ব ব্রাহ্মণেরই বটে। কোনও রাজার অধীনে থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ যে ভূমির অধিকার ভোগ করেন, যে শস্য-সম্পদ তিনি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেন, সে সবই কিন্তু তাঁরই। অর্থাৎ তিনি কারও খাচ্ছেন-পরছেন না, তিনি নিজেরটাই নিজে ভোগ করছেন, নিজেরটাই খাচ্ছেন। এমন কি তিনি যদি কাউকে কিছু দেন—জমি-জায়গা যা কিছু— সেও তিনি নিজেরটাই দিচ্ছেন—স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।

অন্যদিকে কোনও ভূমিখণ্ডের শাসনকর্তা হিসেবে ক্ষত্রিয় যে রাজ্য ভোগ করছেন সেটা হল অনেকটা ওই মৃত-জ্যেষ্ঠের স্ত্রীর অধিকার-লাভের মতো। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তাঁর যজন-যাজনের বৃত্তিতে স্থিত থেকে রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করেন স্বেচ্ছায়। তিনি রাজ্য শাসন করেন না, অতএব তাঁর পরিত্যক্ত রাজ্য ভোগ এবং শাসন করেন ক্ষত্রিয়। পৃথিবী যেন এক বিবাহিতা রমণী; তিনি যেন জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ স্বামীর অভাবে ক্ষত্রিয়কেই অধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেছেন—আনন্তর্য্যাত্তথা ক্ষত্রং পৃথিবী কুরুতে পতিম্।

কথাটা আজকের সামাজিক পরিস্থিতিতে তেমন করে বোঝা যাবে না। ব্রাহ্মণরা ত্যাগ-বৈরাগ্য, পরোপকারের সমস্ত বৃত্তি আজই ভুলে গেছে, তা নয়। ব্রাহ্মণদের ভাঙন শুরু হয়েছে বহুকাল। খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতাব্দীতেই অপক্ষীণ ব্রাহ্মণ্য নিয়ে সজ্জনদের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। সে প্রমাণ অন্যত্র দেব। কিন্তু মহাভারতের যুগে বিদ্যাবত্তা, ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং পরোপকার বৃত্তি ব্রাহ্মণ-সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। লক্ষ্য করে দেখবেন—ব্রাহ্মণ ঋষি বাড়িতে এলে রাজারা শুধু আত্মনিবেদনই করতেন না, আপন ভোগ্য রাজ্যটিও তাঁরা বিনা দ্বিধায় ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিতেন। ব্রাহ্মণরা এই আদর স্বীকার করতেন, কিন্তু তাই বলে রাজ্যের দিকে হাত বাড়াতেন না। উপস্থিত ব্রাহ্মণকে এই রাজ্য-নিবেদনের কথা মহাভারতে বহু জায়গায় আছে। উদাহরণ হিসেবে আপনারা সেই মুহূর্তটুকু পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যখন দ্রোণাচার্যকে ভীষ্ম ডেকে এনেছিলেন বাড়ির বালকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ভীষ্ম তাঁকে বলেছিলেন— আপনি এসেছেন এই বড় অনুগ্রহ। কুরুদের যা আছে— বিত্ত বৈভব রাষ্ট্র সবই আপনার। আপনিই এখানকার রাজা, আমরা আপনার ভৃত্য— ত্বমেব পরমো রাজা সর্বে চ কুরব স্তব।

সেকালে উপযুক্ত ব্রাহ্মণদের প্রতি রাজা-মহারাজাদের এই ভাবটুকুই ছিল। তবে এই সমন্বয় আসতেও কিছু সময় লেগেছে বলে মনে হয়। আর্যায়ণের প্রথম কল্পে বেণকে যেমন আমরা দেখেছি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পুরূরবার ক্ষেত্রেও যা দেখলাম, তাতে মনে হয় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের পারস্পরিক বোঝাবুঝিতেও সময় লেগেছে কিছু। পুরূরবার প্রশ্ন থেকেই বোঝা গেছে ব্রাহ্মণদের সর্বময় কর্তৃত্বে তাঁর সংশয় ছিল, উপেক্ষা ছিল। বায়ুদেবতার মুখ দিয়ে যে উপদেশ শুনতে পাচ্ছি, তাতে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে পুরূরবার সংশয় এবং দ্বিধাটুকু পরিষ্কার বোঝা যায়। আরও বোঝা যায় কাশ্যপ মুনির সঙ্গে পুরূরবার কথোপকথনে।

www.amarboi.com

ঐল পুরূরবা কাশ্যপ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে ত্যাগ করে অথবা উল্‌টোটা যদি হয়, ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করে, তাহলে সাধারণ প্রজারা কাকে আশ্রয় করে, কার ওপরেই বা নির্ভর করে? কাশ্যপ বললেন— বিচক্ষণ লোকেরা জানেন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যদি নিজেরা নিজেরা বিবাদ-বিসংবাদ করে, তাহলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য থাকে না, রাজ্য চলে যায় দস্যুদের হাতে—ব্রাহ্ম-ক্ষত্রং যত্র বিরুধ্যতীহ/ অন্বগ্‌বলং দস্যবস্তদ্ ভজন্তে। এই প্রশ্নোত্তর থেকেই বোঝা যায় পুরূরবার জীবনে কী ঘটেছিল। আপন রাষ্ট্রে তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতোই হয়েছিল। হয়তো ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এই কথোপকথন তাঁকে তখনকার সমাজের প্রচলিত পথে চলতে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে এবং হয়তো বা তিনি নিজেকে খানিকটা শুধরেও নিয়েছিলেন।

কাশ্যপের উত্তরদানের মধ্যে বার বার একটা কথা উচ্চারিত হয়েছে—যদি ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করেন—যদা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াঃ সংত্যজন্তি। বার বার সেই একই আশঙ্কা, কেন না পুরূরবা সেই আশঙ্কা তৈরি করেছিলেন। মনে রাখা দরকার— এখনকার দৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মণ্য কিন্তু চাল-কলার ভিক্ষাসর্বস্ব পৌরোহিত্য নয়। এখানে ব্রাহ্মণ সেকালের সমস্ত বিদ্যাবত্তা এবং সংস্কৃতির প্রতীক আর রাজা বা ক্ষত্রিয় হলেন রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। অন্যথায় আজকের জাতি-ব্রাহ্মণ্য নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বরঞ্চ ঘৃণা আছে। বিদ্যা-শিক্ষাহীন ক্ষাত্রশক্তি বা শাসন কোন পর্যায়ে চলে যেতে পারে, এখনকার ভারতই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা যেমন বলি—রাজনীতিকরা সব লুটে-পুটে খাচ্ছে, ওঁরা সেটাকেই বলেন—অন্বগ্‌বলং দস্যবস্তদ্ ভজন্তে— বিদ্যা-ব্রাহ্মণ আর ক্ষাত্রশক্তির বিরোধিতার সুযোগে দস্যুরা তাদের অধিকার কায়েম করে। এখনকার রাজনীতিকদের স্বার্থসর্বস্ব দস্যু ছাড়া কীই বা আর বলব?

AMARBOI.COM

রাজধর্ম নিয়ে পুরূরবার সঙ্গে বায়ুদেবতা এবং কাশ্যপ মুনির সঙ্গে এই কথোপকথন আমরা পুরূরবার জীবনের একটা অধ্যায় বলে মনে করি। তবে সনৎকুমার যখন ব্রহ্মলোক থেকে তাঁকে বোঝাতে এসেছিলেন এই কথোপকথন সেই সময়ে হয়নি বলেই মনে হয়। আমাদের ধারণা, ব্রাহ্মণরা যখন কুশবজ্রে পুরূরবাকে ধ্বংস করলেন অথবা তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটালেন, এই কথোপকথন এসেছে সেই সময়ে। কারণ পুরূরবা এখন অনেক শান্ত এবং জিজ্ঞাসু। ঋষিরা, দেবতারা তাঁর সংশয় নিরসন করেছেন—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মিলনের সমাধান দিয়ে। পুরূরবা এই সমাধান স্বীকার করেছেন নিশ্চয়।

আমরা এই রকমই একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছি, কেন না বেদ থেকে আরম্ভ করে পুরাণ পর্যন্ত সর্বত্রই পুরূরবার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে ভূরি ভূরি। ব্রাহ্মণ্য-বিরোধের সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে পুরূরবা আবারও নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয় এবং তাঁর অসংযমের ইতিহাসটুকু বেদ-পুরাণ আর মনে রেখে দেয়নি। মহাভারত এবং মহাভারতের অনুসরণে আরও দু-একটি পুরাণ পুরূরবার জীবনের এই কলঙ্কিত অংশটুকু বর্ণনা করেছে বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পুরাতন গ্রন্থগুলি, যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ বা বেদ—এইসব জায়গায় পুরূরবার সঙ্গে স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর মিলন কীভাবে হল—তারই হার্দিক বর্ণনা আছে শুধু। ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার মতো গদ্যজাতীয় সাময়িক ইতিহাস নিয়ে এইসব গ্রন্থের লেখকরা বিব্রত হননি। কিন্তু মহাভারতের কবি যেহেতু ঐতিহাসিকের মতো বেশ বড়সড় একটা মন্তব্য করেছেন পুরূরবার ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতা নিয়ে, আমাদেরও তাই খানিকটা সময় দিতে হল ঐতিহাসিকদের

সূত্র বজায় রেখে। তবে এবার আমরা কাব্যে চলে যাব। কারণ স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর সঙ্গে মর্ত্য রাজা পুরূরবার মিলনের ইতিহাসটুকু স্বাভাবিক কারণেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতার অংশ থেকে মধুরতর এবং আমাদের কাছে তা অন্য কারণে গুরুতরও বটে।

উর্বশী-পুরূরবার মিলন-কাহিনী অতি প্রাচীন এবং জটিল। এই কাহিনীর উপাদান আছে খোদ ঋগবেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, মহাভারতে তো বটেই এবং আছে বিভিন্ন পুরাণে। কাহিনীটি বেদে যেমন আছে, তা যেন আদি-অন্তহীন একটা মাঝখানের সংলাপের মতো। তা থেকে আগুপিছু বোঝা যায় না কিছুই। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থ তাই বেদোক্ত এই সংবাদ-সূক্তের ভূমিকা রচনা করে দিয়েছে। অন্যদিকে প্রাচীন পুরাণগুলি উর্বশী-পুরূরবার মিলন কাহিনী গ্রন্থনা করেছে বেদ এবং শতপথ ব্রাহ্মণের উপাদান একত্রিত করে। বেদ-ব্রাহ্মণ এবং পুরাণের এই প্রিয় বিষয়টির জনপ্রিয়তা এতই বেশি ছিল মহাকবি কালিদাসও এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর আবেদন ঠেলে ফেলতে পারেননি। তিনি 'বিক্রমোর্বশীয়' নামে সেই বিখ্যাত নাটকটি লিখে আপন কালের কাছে ঋণমুক্ত হয়েছেন।

সবাই জানেন—উর্বশী স্বর্গের এক সুন্দরী অপ্সরা। পৌরাণিকেরা কেউ তাঁর উৎপত্তি ঘোষণা করেছেন সমুদ্রমন্থনের অন্যতম ফল হিসেবে, কেউ বা তাঁর উৎপত্তির কথা বলেনওনি। জন্ম-মরণের বাঁধা ছকে উর্বশীকে অনেকেই দেখতে চান না। তিনি শুধু সুন্দরী রূপসী— নহ মাতা নহ কন্যা গোছের। অনাদি অনন্ত কাল ধরে তিনি আছেন, শুধু যৌবনবতী উর্বশী। বেদের মধ্যে যেহেতু উর্বশীকে প্রথম পাই, তাই তাঁর নাম নিয়ে অর্থচর্চা আরম্ভ হয়েছে প্রায় বেদের আমল থেকেই। পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা যেহেতু বিভূতিযুক্ত সমস্ত মহাজনের মধ্যেই সূর্যের প্রতীক দেখতে পান, অতএব পুরূরবা তাঁদের কাছে Solar hero আর উর্বশী হলেন উষার প্রতীক। প্রভাতের আলো ফুটবার আগে উষার অরুণিমা চোখে দেখি মোহিনী মায়ার মতো। উর্বশী সেই উষা। ঋগবেদের সংবাদসূক্তে উর্বশীর সঙ্গে মিলনের জন্য পুরূরবার অনন্ত হাহাকার আছে। ক্ষণিকোদিতা উষার পেছন পেছন চলা সূর্যের মিলনেপ্সার মধ্যেই আছে একই হাহাকার-ধ্বনি। পুরূরবা-উর্বশীর মিলন-বিরহ তাই পাশ্চাত্য বৈদিকের কাছে সূর্য আর উষার মিলন-বিরহের সুরে বাঁধা। ম্যাক্‌স মুলার অতি সরল ভাষায় বেদের কথা বলবেন—Urvasi loves pururavas মানে আর কিছুই নয়—the sun rises, আবার Urvasi sees pururavas naked মানে the dawn is gone. অন্যদিকে Urvasi finds puruavas again অর্থাৎ the sun is setting.

কে বলে বৈদিক কবিরা 'ইনটেলেক্‌চুয়াল' ছিলেন না। এত প্রতীকী কবিতা যাঁরা খ্রিস্টজন্মের অন্তত হাজার বছর আগে লিখতে পেরেছেন, তাঁদের ভাবনা-চিন্তা যে যথেষ্ট আধুনিক—সে কথা সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন, এসব প্রতীকী বিবরণে এখনই আমরা মন দেব না, কারণ পুরূরবা কিম্বা উর্বশীকে আমরা কল্পলোকের অধিবাসীও মনে করি না, রূপকও মনে করি না। চন্দ্রবংশের তৃতীয় পুরুষেই যদি রূপক এসে যায়, তবে মহাভারতের ইতিহাস আরম্ভেই স্খালিত হবে। আমাদের মতে পুরূরবা রীতিমতো ঐতিহাসিক পুরুষ এবং আর্যায়ণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আর্যদের সভ্যতা যখন উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হল, তখনও পুরূরবার ব্যবহার ঐতিহাসকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এমন কি উর্বশীকেও এই সূত্রে বুঝে নেওয়া অসম্ভব নয়।

আমি আগেই জানিয়েছি—পুরূরবার পিতা বুধ পুত্রের জন্ম দিয়েই স্বর্গে ফিরে গেছেন,

এমন কি তাঁর পালক পিতা সুদ্যুম্নকেও আমরা ইলাবৃতবর্ষে ফিরে যেতে দেখেছি। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত স্বর্গভূমির সঙ্গে এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষের যোগাযোগ যথেষ্ট রয়েছে। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল—ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে পুরূরবাকে আমরা স্বয়ং মনুর সঙ্গে উল্লিখিত হতে দেখেছি এবং সেই একই ঋক্‌মন্ত্রে তিনি অগ্নিদেবের বন্ধু—ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ। এই ঋকের অর্থ হল— অগ্নি! রাজা পুরূরবা ভাল কাজ করলে তুমি তাকে বেশি ফল দিয়েছ। পরিষ্কার বোঝা যায়, পুরূরবা আগে ভাল কাজ করেননি। যখন করেছেন, তখন ভাল ফলও পেয়েছেন দেবতার কাছে।

পুরূরবা অগ্নিদেবের বন্ধু কী করে হলেন সে কথা পরে আসবে। কিন্তু পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার কথা মনে রেখেও ঋগ্‌বেদ তাঁকে উল্লেখ করেছে পরম উপকারী বলে 'সুকৃত' বলে। অন্যদিকে পুরাণগুলি খুললে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ওঠা-বসার কথা এতই প্রকট হয়ে উঠবে যে, উর্বশীর মতো স্বর্গসুন্দরীকে মর্ত্য মানুষ পুরূরবার স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করাটাও অলৌকিক ভাবনা বলে মনে হবে না।

উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা বলে পরিচিত। সাধারণভাবে অপ্সরারা জলের সঙ্গে জড়িত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সংস্কৃত 'অপ্' শব্দের অর্থ জল, আর 'সৃ' ধাতুর অর্থ হল সরে সরে যাওয়া। এই দৃষ্টিতে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় অপস্রিয়মান মেঘই হল অপ্সরা। আবারও বলি—ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই রূপকও আমাদের পছন্দ নয়। আমাদের ধারণা—সেকালের প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন নদ-নদী এবং পর্বতের সানুদেশে যে সমস্ত সুন্দরী রমণীর দেখা পাওয়া যেত, তাঁরাই অপ্সরা। ইতিহাস-পুরাণে অপ্সরারা প্রধানত নৃত্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বেদের ভাষায় তাঁরা 'দেবপত্নী'ও বটে।

'দেবপত্নী' শব্দটার মধ্যে যতই মর্যাদা থাকুক মূলত অপ্সরারা ছিলেন স্বর্গবেশ্যা। দেবতারা আপন রতিসুখ চরিতার্থ করতেন এঁদের দিয়েই এবং প্রয়োজনে এদের ব্যবহার করতেন তাঁদের ওপর, যাঁরা স্বর্গ অধিকার করে নিতে চান। অর্থাৎ দেবতা নামক উন্নতবুদ্ধির মানুষরা উন্নতিকামী ব্যক্তিকে অপ্সরার ভোগসুখে মত্ত রেখে নিজের অধিকার মজবুত রাখতে চেষ্টা করতেন। পুরুষের ব্যাপারে অপ্সরারা ছিলেন অত্যন্ত খোলামেলা এবং তাঁদের লাজ-লজ্জাও ছিল কম। ফলে শারীরিক সৌন্দর্য এবং দৈহিক আকর্ষণ— দুটিই তাঁরা প্রকটভাবে ব্যবহার করতেন উন্নতিকামী পুরুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য।

সেকালের দিনে গণিকারাই ছিলেন যথাসম্ভব শিক্ষিত এবং বিদগ্ধা রমণী। সেদিক দিয়ে স্বর্গবেশ্যা অপ্সরা-সুন্দরীরা আরো এক কাঠি ওপরে। আর উর্বশীর তো কথাই নেই। তিনি অপ্সরা সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা, নাগরিক বৃত্তির যোগ্যতম আধার। শুধুই স্বর্গবেশ্যামাত্র হলে স্বয়ং কবিগুরুর হাত দিয়ে অমন সুন্দর কবিতাটি উপহার পেতাম না, আর কবির কবি কালিদাসও তাঁকে তাঁর নাটকের নায়িকা হিসেবে নির্বাচন করতেন না। উর্বশীকে তাই একটু অন্য চোখে আমাদের দেখতে হবে এবং উর্বশীর সৃষ্টিও বড় সাধারণভাবে হয়নি।

AMARBOI.COM

বাইশ

বাবা যদি বলতেই হয় তবে ব্যাকরণ-সম্মতভাবে নির্ভুল নর-নারায়ণ—এই যুগল ঋষিকেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উর্বশীর বাবা বলে মেনে নিতে হবে। ঋষি নর-নারায়ণ এবং উর্বশী কেমন যেন বিপরীত শোনায়। মহাভারত পাঠের আগে একটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক উচ্চারণ করতে হয়। সেই শ্লোকের আরম্ভটা এইরকম—নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। ভগবান নারায়ণ আর নরশ্রেষ্ঠ নর নামক পুরুষকে নমস্কার করে মহাভারত পাঠের নিয়ম। নর-নারায়ণ এই যুগল দেবতা বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অংশ বলে পরিচিত। মহাভারতের পরবর্তী অংশে নর-নারায়ণকে অর্জুন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, নর-নারায়ণ নামে দুই যুগল ঋষির কল্পনাও আছে পুরাণে। তবে ঋষি হলেও পুরাণগুলিতে নর-নারায়ণ ঋষির মাহাত্ম্য বিষ্ণুর থেকে কোনও অংশে কম নয় এবং আপাতত তাঁদের ঋষি ধরে নিয়েই আমাদের কথা আরম্ভ করতে হবে; কারণ পুরূরবার প্রেয়সী উর্বশীর জনক এই যুগল ঋষির একজন।

নর-নারায়ণ হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মন দিলেন। অতি অদ্ভুত সেই তপস্যা। তাঁদের তপস্যার তেজে তিন ভুবন যেন তাপিত হয়ে উঠল। স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর ইন্দ্র প্রমাদ গণলেন। শেষপর্যন্ত হয়তো তাঁর ইন্দ্র-পদটাই চলে যাবে। ইন্দ্র ঠিক করলেন—যেভাবে হোক এই দুই মুনির তপস্যা নষ্ট করে দিতে হবে। তিনি নিজে ঐরাবতে চড়ে উপস্থিত হলেন ঋষিদের তপস্যা-ভূমিতে। ঋষিদের উদ্দেশে বললেন—আপনারা কী চান বলুন? আমি আপনাদের তপস্যা দেখে বড় খুশি হয়েছি। অতএব না দেওয়ার মতো জিনিস হলেও আপনারা চাইলে তা দেব—অদেয়মপি দাস্যামি তুষ্টোঽস্মি তপসা কিল।

ইন্দ্র অনেকবার একই কথা বললেন। কিন্তু মুনিরা এতই যোগযুক্ত হয়ে তপস্যায় ডুবে আছেন যে, ইন্দ্রের কথা তাঁরা কানে শুনতেই পেলেন না। উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা। ইন্দ্র

তখন ভয় দেখাতে আরম্ভ করলেন। দৈবী মায়া বিস্তার করে দুই ঋষিকে ভয় দেখানো শুরু করলেন। বাঘ-সিংহ থেকে আরম্ভ করে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত, আগুন লাগানো —কিছুই বাদ গেল না। ঋষিদের ধ্যান ভাঙল না, তপস্যা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করা গেল না তাঁদের।

ইন্দ্র এবার ভালবাসার দেবতা কামদেবকে স্মরণ করলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন ঋতুরাজ বসন্ত। যে কামদেবকে ইন্দ্র অন্য সময় খুব বেশি একটা আমল দেন না, প্রয়োজন বুঝে ইন্দ্র তাঁকে খুব তোয়াজ করলেন। বললেন— ভাই! তোমার মতো ক্ষমতাবান দেবতা আর কে আছে এই তিন ভুবনে? দেব, দানব, মানব—সবারই মন একেবারে উথাল-পাথাল করে দিতে পার তুমি। একমাত্র তুমি পারবে এই কাজটি করতে। বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা করছেন নর-নারায়ণ নামে দুই মুনি। ভালবাসার ঘায়ে মোহিত করে দিতে হবে তাঁদের মন, উচাটন করে দিতে হবে হৃদয়—বশীকুরু মহাভাগ মুনী ধর্মসুতাবপি।

ইন্দ্র দুই ঋষির অবিচল ভাবের কথাও কামদেবকে জানাতে ভুললেন না। তাঁদের যে তিনি বর দিয়ে মনস্কামনা পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন—তাও বললেন। বাঘ-সিংহের ভয় দেখানোর কথাও বললেন। সব বললেন। তারপর কামদেবকে খুব খানিকটা মাথায় উঠিয়ে দিয়ে বললেন—সমস্ত স্বর্গসুন্দরী গণিকা আমি তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। আমি জানি—একা তিলোত্তমা অথবা একা রম্ভা অথবা একা তুমিই এই সামান্য কাজ করে দিতে পার। সেখানে তোমরা যখন সকলে একসঙ্গে এই কাজে নেমেছ, সেখানে সাফল্যের প্রশ্নে আমার কোনও সন্দেহই নেই—ত্বমেবৈকঃ ক্ষমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্তু সংশয়ঃ। কামদেব ইন্দ্রের স্তুতিবাদে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সবরকমভাবে আশ্বস্ত করে মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমাদের নিয়ে বদরিকাশ্রমে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন—ঋষিদ্বয় দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন।

অকাল বসন্তের উদয় হল বদরিকাশ্রমে। বসন্তের ফুল ফুটল বন আলো করে। সময় বুঝে রম্ভা-তিলোত্তমারা বসন্ত রাগে গান ধরলেন সুরে সুরে তালে তালে নাচও শুরু হল তাঁদের। কোকিলের কুজন আর অপ্সরাদের নৃত্যগীতের ছন্দে নর-নারায়ণ দুই ঋষির তপোযোগ ভঙ্গ হল। ক্ষণিকের জন্য তাঁদের মন উচ্চকিত হল। আকালিক বসন্তের শোভায় তাঁদের মন ভরে গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা এই ঋতু পরিবর্তনের কারণও ভাবতে লাগলেন। নারায়ণ ঋষির মন অবশ্য এতই আপ্লুত ছিল যে তিনি সোচ্ছ্বাসে নর-ঋষিকে বসন্তের কাব্যও শুনিয়ে দিলেন খানিকক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত নৃত্যরতা অপ্সরাদের দিকে যখন নজর পড়ল, তখন দুই ঋষিই বুঝলেন—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র বিব্রত হয়ে তাঁদের ধ্যানভঙ্গের ব্যবস্থা করেছেন। তারপর রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, ঘৃতাচী—প্রমুখ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অপ্সরাদের সঙ্গে স্বয়ং কামদেবকে উপস্থিত দেখে তাঁদের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল। তাঁরা সাভিনয়ে নির্বিকার চিত্তে অপ্সরাদের গান শুনতে লাগলেন।

দুই ঋষির একতম নারায়ণের মনে কিন্তু একটু ক্ষোভের সঞ্চার হল। অপ্সরাদের সম্বোধন করে নারায়ণ ঋষি বললেন— হ্যাঁগো সুন্দরীরা। স্বর্গ থেকে এখানে অতিথি হয়ে এসেছ। তা বোসো আরাম করে। আমরা অতিথির যোগ্য সৎকার করব—আস্যতাং সুখমত্রৈব করোম্যাতিথ্যমদ্ভুতম্। নারায়ণ ঋষি মনে মনে ভাবলেন— ইন্দ্র যখন কাম-লোভহীন বৈরাগী ঋষিদের তপোবিঘ্ন করার জন্য এমন অসমীচীন পথ বেছে নিয়েছেন, অতএব তাঁকে একটু ক্ষমতা প্রদর্শন করা দরকার। নারায়ণ ঋষি সকৌতুকে নিজের উরুতে একটি চাঁটি মারলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উরু থেকেই জন্ম নিল এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী—করেণোদ্রুং প্রতাড্য বৈ। তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্বাঙ্গসুন্দরীম্। নারায়ণের উরু থেকে জন্ম হওয়ার ফলেই সেই রমণীর নাম হল উর্বশী। শুধু উর্বশীই নন, ইন্দ্রদেব যত অপ্সরা পাঠিয়েছিলেন, ঋষি নারায়ণ তত অপ্সরা সৃষ্টি করে ফেললেন চোখের নিমেষে।

ইন্দ্রের কাছ থেকে এসেছিলেন যাঁরা, কামদেব আর অপ্সররা—তাঁরা সবাই নারায়ণ-ঋষির তপঃপ্রভাব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন এবং নিজেদের দোষও স্বীকার করলেন। নর-নারায়ণ খুশি হলেন। ইন্দ্রের প্রতি অভিশাপ উচ্চারণ করে তাঁরা তাঁদের তপস্যার শক্তিও ক্ষয় করলেন না। শান্ত মনে তাঁরা অপ্সরাদের বললেন—দেবরাজ আমাদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য তোমাদের পাঠিয়েছিলেন এখানে, তার উত্তরে আমরা এই উর্বশীর মতো অসাধারণ সুন্দরীকে উপহার দিলাম দেবরাজকে। সে তোমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাক্ দেবরাজের প্রীতির জন্য— উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা।

সেই থেকে উর্বশী স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রসভার অলংকার। অপ্সরা-সমাজে তাঁর মতো বিদগ্ধা এবং লোক-মোহিনী আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্য অপ্সরাদের মতো তত সাধারণী নন উর্বশী। অপ্সরাদের বৃত্তি খানিকটা গণিকাবৃত্তির পর্যায়ভুক্ত হলেও, উর্বশী তত সহজলভ্য নন। এমনই তাঁর রূপ যে তাঁকে দেখামাত্র মানুষের মানসিক স্থিরতা নষ্ট হত, অতি বড় কঠিন তপস্বীরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত।

ভালই ছিলেন উর্বশী। ইন্দ্রের দেওয়া বাসভবনে অলস-শৃঙ্গার রচনা করে, বৈজয়ন্ত প্রাসাদের স্ফটিক-সভায় নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন করে, আর মাঝে-মধ্যে শুষ্ক-রুক্ষ মুনি-ঋষির হৃদয় বিভ্রান্ত করে উর্বশীর দিন কেটে যাচ্ছিল ভালই। এরই মধ্যে একদিন তিনি ধনপতি কুবেরের তলব পেয়ে কৈলাসে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো নৃত্যগীতের কোনও উৎসব-রঙ্গে নন্দনবাসিনী উর্বশীর উপস্থিতি প্রার্থিত ছিল কৈলাসনাথ কুবেরের। সেই নৃত্যগীত শেষ করে পুনরায় ইন্দ্রসভায় ফিরে আসছিলেন উর্বশী। তাঁর সঙ্গে স্বর্গসুন্দরী অন্য অপ্সরারাও ছিলেন। রম্ভা, মেনকা, সহজন্যা—এইসব স্বনামধন্যা স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর পথসঙ্গিনী ছিলেন এই দীর্ঘপথে, আর ছিলেন উর্বশীর প্রিয়সখী চিত্রলেখা।

কৈলাস থেকে ইন্দ্রসভার অর্ধেক পথ আসতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হিরণ্যপুরে থাকতেন দানব কেশী। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অত্যাচার এবং হঠাৎ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছিলেন বারেবারেই। মনোমোহিনী স্বর্গসুন্দরীদের ওপর যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়াটাও এই অত্যাচারের একটা অঙ্গ ছিল। কেশী দানব সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে হরণ করার। কুবের-সভা থেকে উর্বশী ফিরে আসছিলেন—এ খবর কেশীর জানা ছিল। সময়-মতো কেশী ঝাঁপিয়ে পড়লেন অপ্সরা-সুন্দরীদের ছোট্ট দলটির ওপরে। সবাইকে তিনি ধরলেন না। একমাত্র উর্বশী আর তাঁর প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে নিয়ে তিনি নিজের রথে উঠলেন এবং আকাশবাহী রথখানি চালিয়ে দিলেন সবেগে।

রম্ভা, মেনকা, সহজন্যা— যাঁরা উর্বশীর সহগামিনী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। সমস্বরে শব্দ শোনা গেল—বাঁচাও বাঁচাও। কে কোথায় আছ বাঁচাও। দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু যদি কেউ থাকেন এখানে, অথবা এমন কেউ যদি থাকেন যাঁর চলাফেরা আছে আকাশমার্গে, তাহলে তিনি দয়া করে শুনুন আমাদের কথা—পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং যঃ সুরপক্ষপাতী যস্য বাম্বরতলে গতিরস্তি।

AMARBOI.COM

অপ্সরাদের আর্ত ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেয়ে মর্ত্যভূমির এক রাজা রথ চালিয়ে এসে থামলেন অপ্সরাদের সামনে। তিনি সূর্যের উপাসনা সেরে, নাকি সূর্যদেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছিলেন নিজের রাজ্যে। রাজা অপ্সরাদের সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন— আমার নাম পুরূরবা। সূর্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই আমি ফিরছি। বলুন, কোন বিপদ থেকে আপনাদের বাঁচাতে হবে? সময় বুঝে কথা বলতে আরম্ভ করলেন রম্ভা। তিনি বললেন—অসুরের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, রাজা। অবাক হয়ে পুরূরবা বললেন—অসুররা আবার আপনাদের কী ক্ষতি করল? রম্ভা বললেন—সে অনেক কথা। আমরা সবাই ফিরছিলাম কুবের-ভবন থেকে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন উর্বশী। তাঁকে চেনেন তো মহারাজ? তিনি স্বর্গসভার অলংকার। তাঁর রূপে লক্ষ্মী পর্যন্ত লজ্জায় মুখ লুকোবেন। আর তপস্যার তেজে যাঁরা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেবার উপক্রম করেন, সেই তপস্বীদের উদ্দেশে প্রয়োগ করার জন্য আমাদের এই উর্বশী হলেন ইন্দ্রের সবচেয়ে কোমল মারণাস্ত্রটি—যা তপোবিশেষপরিশঙ্কিতস্য সুকুমারং প্রহরণং মহেন্দ্রস্য। সেই উর্বশীর সঙ্গে আমরা কুবের-ভবন থেকে ফিরছিলাম। এইসবে অর্ধেক পথ এসেছি। আর কোথা থেকে হঠাৎ সেই হিরণ্যপুরের দানবরাজ কেশী এসে তুলে নিয়ে গেল আমাদের উর্বশী আর চিত্রলেখাকে।

পুরূরবা বললেন—আচ্ছা, বলতে পারেন—কোন দিকটায় গেল সেই বদমাশ। অপ্সরা সহজন্যা বললেন—এই তো এই উত্তর-পুব্ বরাবর চলে গেল। রাজা বললেন— ঠিক আছে। একটু ঠান্ডা হয়ে বসুন, আমি চেষ্টা করছি। মহারাজ পুরূরবা অপ্সরাদের হেমকূট পর্বতের রম্যস্থানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলে রথ নিয়ে ছুটলেন আকাশের নীল ছিন্ন করে পূর্বোত্তর দিকে। রম্ভা-মেনকারা হেমকূট পর্বতের শিখরদেশ ছেড়ে সমভূমিতে এসে বসলেন উৎকণ্ঠিত চিত্তে। রম্ভা বললেন— রাজা কি পারবেন আমাদের মনের কষ্ট দূর করতে? পারবেন কি উর্বশীকে এনে দিতে? অপ্সরাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞা হলেন মেনকা। তিনি বললেন— রাজা ঠিক পারবেন। সন্দেহ করিসনে ভাই— হলা মা তে সংশয়ো ভবতু—ঠিক পারবেন তিনি। স্বর্গে যখন যুদ্ধ লাগে, তখন স্বয়ং ইন্দ্র কত মান্যি করে ভূলোক থেকে ডেকে আনেন এই রাজাকে। স্বর্গরাজ্যের সমস্ত বড় যোদ্ধাদের সামনে রাখেন তাঁকে—তমেব বিজয়সেনামুখে নিযুঙ্‌ক্তে।

AMARBOI.COM

বস্তুত সেকালে সূর্যবংশ কিংবা চন্দ্রবংশের রাজাদের এই সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল। মৎস্যপুরাণ জানিয়েছে— একবার দুবার নয় ইন্দ্রশত্রু দানব কেশী পুরূরবার হাতে বহুবার পরাজয় বরণ করেছেন—কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্যাঃ কোটিশো যেন দারিতাঃ। এই পুরাণের আরেকটা খবর হল—ভয়বিহ্বল অপ্সরাদের মুখে জানা নয়, রাজা পুরূরবা নিজেই কেশীকে দেখতে পেয়েছিলেন উর্বশী আর চিত্রলেখাকে হরণ করে নিয়ে যেতে—সার্ধমর্কেণ সো'পশ্যান্নীয়মানামথাম্বরে। রাজা প্রতিদিন রাজকর্মের শেষে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন— অহন্যহনি দেবেন্দ্রং দ্রষ্টুং যাতি স রাজরাট্ । সেই দেখা সেরে ফিরে আসবার সময়েই কেশীকে তিনি দেখতে পান এবং তাঁর পিছু নেন।

আমরা উপরিউক্ত নাটকীয় বর্ণনা করেছি কালিদাসের নাটক থেকে, কেননা মৎস্যপুরাণ তাঁর নাটকের অন্যতম উপাদান। আর এই বর্ণনা করলাম এইজন্য যে, আমার সহৃদয় পাঠকরা কালিদাসের রসসৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবেন কেন? বিশেষত সে বর্ণনা যখন মহাভারত বা পুরাণ-বিরোধী নয়।

রম্ভা-মেনকার শঙ্কা-বিশ্বাসের আন্দোলন শেষ হতে না হতেই রাজার রথের ধ্বজা দেখা

গেল। স্বয়ং চন্দ্রদেবের দেওয়া হরিণকেতন রথ আকাশমার্গে দেখতে পেলেন অপ্সরারা। একটু পরেই রথ যখন এসে থামল সেই হেমকূট পর্বতের সানুদেশে তখন দেখা গেল উর্বশী প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছেন চিত্রলেখার কোলে। দানবিক ভয়ে তাঁর শরীর বিহ্বল, চক্ষু নিমীলিত। চিত্রলেখা এবং রাজা পুরূরবা—দুজনেই উর্বশীকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। চিত্রলেখা খালি বলছেন— আর কোনও ভয় নেই ভাই , কোনও ভয় নেই। আর রাজার ভাবটা হল —শুন নলিনী খোল গো আঁখি, ঘুম এখনও ভাঙিল নাকি, দেখ তোমার দুয়ার পরে এসেছে তোমারই রবি—তদেতদ্ উন্মীলয় চক্ষুরায়তং/ মহোৎপলং প্রত্যুষসীব পদ্মিনী।

চিত্রলেখার উৎকণ্ঠা আর রাজার মধুর সান্ত্বনাবাক্যেই যেন উর্বশীর সংজ্ঞা ফিরে এল আস্তে আস্তে। চিত্রলেখা বললেন—আর ভয় নেই হতভাগা অসুরেরা পালিয়েছে। উর্বশী তখনও রাজাকে দেখতে পাননি। বললেন— কে তাদের তাড়াল রে? আমাদের ইন্দ্রদেব? চিত্রলেখা বললেন—হ্যাঁ, ইন্দ্রের মতোই তাঁর ক্ষমতা বটে, তবে তিনি ইন্দ্র নন, তিনি হলেন আমাদের মর্ত্যভূমির রাজা পুরূরবা। কথাটা শুনেই উর্বশী রাজার দিকে চাইলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁর মৌখিক প্রতিক্রিয়া শোনা গেল—তাহলে তো দানবরা আমার উপকার করছে, বল্—উপকৃতং খলু দানবৈঃ।

বোঝা গেল— পুরূরবাকে উর্বশী পূর্বে দেখেছেন। হয়তো ইন্দ্রসভায়ই ইন্দ্রের সঙ্গে অলস বিশ্রম্ভালাপে, হয়তো পূর্বে কতবার দেবসেনার অগ্রভাগে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত পুরূরবাকে দেখেছেন উর্বশী। মর্ত্যভূমির রাজাকে তাঁর ভালো লেগেছিল। মনে মনে তাঁর মুগ্ধতা ছিল প্রচ্ছন্ন, অপরিস্ফুট। মৎস্যপুরাণের বর্ণনায় পুরূরবা কেশী দানবের হাত থেকে উর্বশীকে উদ্ধার করে নিজে দিয়ে এসেছিলেন ইন্দ্রের কাছে ইন্দ্রলোকে। এই ঘটনায় সমস্ত দেবতার সঙ্গে পুরূরবার বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হয়েছিল। স্বয়ং ইন্দ্র মর্ত্য রাজার কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়ে রাজাকে সর্বলোকের প্রভুত্ব এবং যশ দান করেছিলেন।

কিন্তু কালিদাসের নাটকীয়তায় রাজা অত সহজে ধরা দেন না। সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ উর্বশীকে নিতে এসে রাজাকে স্বর্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে রাজার সময় থাকে না। উর্বশীর সঙ্গ সেচ্ছায় নিজের কাছে দুর্লভ করে দিয়ে রাজা বলেন— এখন অবসর নেই দেবরাজের সঙ্গে মিলিত হবার। সলজ্জে উর্বশী প্রিয়সখীকে জনান্তিকে জানান—ভাই! নিজমুখে তো আর রাজাকে যেতে বলতে পারি না আমার সঙ্গে। অন্তত তুই কিছু বল্ ভাই। চিত্রলেখা বলেন—আমার প্রিয়সখী উর্বশীকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি, তেমনই বহন করে নিয়ে যাচ্ছি আপনার যশ-কীর্তি—উর্বশীকে উদ্ধার করেছেন আপনি। রাজা, বিদায় দেন উর্বশীকে আর তখন উর্বশীর অবস্থা হল—'ছল করে তার বাঁধত আঁচল সহকারের ডালে' অথবা কাঁটা ফোটে পায়ে। ছল করেই স্বর্গ-লোকে যাবার পথে বিলম্ব ঘটান উর্বশী। উপোস করা চোখে রাজার দিকে তাকিয়ে থাকেন উর্বশী। তবু যেতেই হয়, ফিরে যেতেই হয় স্বর্গলোকে।

নাটকের নাটকীয়তা থাক। উর্বশী স্বর্গলোকে ফিরে এসেছেন, ঠিক তার পর-পরই দুটি ঘটনা ঘটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। শৌনকের বৃহদ্দেবতার মতো অতি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে মিত্রাবরুণ এসেছিলেন আদিত্যযজ্ঞে যোগ দিতে। মিত্রাবরুণ পূর্বোক্ত নর-নারায়ণের মতোই যুগল ঋষি। পূর্বে এঁরা দেবতা বলে পরিচিত ছিলেন। সেকালের বৃহৎ কোনও যজ্ঞে দেবর্ষি-মহর্ষিরা সব সময়েই আমন্ত্রিত হতেন যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ পরিদর্শন করার জন্য। সেই কারণেই

হয়তো মিত্রাবরুণের আগমন ঘটেছিল আদিত্যযজ্ঞে। অন্যদিকে স্বর্গসুন্দরী উর্বশীও উপস্থিত হয়েছিলেন ওই একই যজ্ঞে। হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, হয়তো বা অভিজাত রাজা বা দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য।

কিন্তু উর্বশীর চলনে-বলনে সেদিন এমন কোনও প্ররোচনা ছিল না, যাতে বলা যায় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও অন্যায় করেছেন। সুসূক্ষ্ম চীনাংশুকের আবরণ এমন ছিল না, যাতে বলা যায় শরীরে বিভঙ্গে তিনি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন কোনও। কথার মাত্রায় এমন কোনও মায়াবী স্পর্শ ছিল না যাতে বলা যায় তিনি সাগ্রহে মোহিত করছেন কাউকে। কিন্তু যে দোষে তিনি চরম দোষী হয়ে গেলেন, সে তাঁর স্বাভাবিক রূপ। তাঁর রূপের মধ্যেই সেই সাংঘাতিক আগুন ছিল যা মুহূর্তের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গ আকর্ষণ করে, কিন্তু তাতে আগুনের কী দোষ? বিধাতা তাঁকে যেহেতু শুধু শৃঙ্গাররসের উপাদান দিয়েই তৈরি করেছিলেন, তাই তিনি কিছু না করলেও পুরুষের স্নায়ুসূত্রের তন্তুগুলি সেখানে নিতান্তই বিবশ। যজ্ঞভূমির শান্ত নিস্তরঙ্গ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যতই বিষয়-ব্যাবৃত্ত হয়ে বসে থাকুন মিত্রাবরুণ দুই মুনি, তাঁদের চক্ষু আধার খুঁজে পেল উর্বশীর মধ্যে। না বুঝে আগুনে হাত দিলে যেমন আপনিই হাত পুড়ে যায়, তেমনই ঋষিদ্বয়ের দৃষ্টি উর্বশীর ওপর পড়ায় তাঁদের শরীর কাজ করল নিজের ছন্দে। তাঁদের তেজ স্খলিত হল—তয়োস্তু পতিতং বীর্য্যম্।

উর্বশীর রূপ এবং মিত্রাবরুণ যুগল ঋষির তেজ— এর ফল কিছু খারাপ হয়নি। ফল স্বয়ং বশিষ্ঠ মুনি। পৌরাণিকেরা এই ঘটনা যতই শারীরিক সংলাপে বেঁধে ফেলুন, সহজ সরল ঋগ্বেদও এখানে মনের প্রাধান্য দিয়েছে। ঋষি হলেও তাঁরাও তো মানুষ। অপ্সরা হলেও উর্বশী তো মানুষ। বেদের সরল কবি কেউও দোষ দেখেননি এতে। স্তুতি করার সময় তাঁরা বলেছেন— বশিষ্ঠ! তুমি মিত্রাবরুণের পুত্র। উর্বশীর মন থেকে তোমার জন্ম—উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মণ্ মনসোঽধি জাতঃ। আহা! সরল ভাষায় কত মধুর কথা—উর্বশীর মন থেকে তোমার জন্ম—উর্বশ্যা মনসোঽধিতজাত। আমরাও এই কথাটাই বিশ্বাস করি—স্বর্গের সাধারণী গণিকা বলে পরিচিত হলেও উর্বশীর একটা মন আছে— যে মন মিত্রাবরুণেরও আছে। বেদ বলেছে—বিদ্যুতের মতো নিজের জ্যোতি ত্যাগ করার সময় মিত্রাবরুণ তোমায় দেখেছিলেন, বশিষ্ঠ—বিদ্যুতো জ্যোতিঃ পরিসঞ্জিহানং মিত্রাবরুণো যদপশ্যতাং ত্বা।

বস্তুত এই জ্যোতি-ত্যাগের ঘটনাই পরবর্তী আখ্যানভাগে বীর্য-স্খলনে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু জ্যোতি-ত্যাগের সময় মনোজাত সেই পুত্রের রূপ দেখতে পাওয়া মানে তো আধুনিক অনুবাদে—তুই আমার ঠাকুরের সনে/ ছিলি পূজার সিংহাসনে। পৌরাণিকেরা কিন্তু বেদের সারল্য আরও বৃহত্তর সরসতায় ঢেকে দিয়েছেন। উর্বশীকে দেখে আপন শারীর-বৃত্তি স্খলিত হওয়ায় মিত্রাবরুণ ক্ষুব্ধ হলেন উর্বশীর উপরেই। রাগ করে বললেন—তোমার জন্য যখন আমাদের এই দুর্গতি হল, অতএব স্বর্গে তোমার ঠাঁই হবে না। যেতে হবে মর্ত্যলোকে, অনুভব করতে হবে মর্ত্যভূমির দুঃখ-কষ্ট, রাগ-অনুরাগ, বিরহ। এই শাপের মধ্যেই বর আছে। আসছি সে কথায়।

AMARBOI.COM

তেইশ

মহারাজ পুরূরবা উর্বশীকে কেশী দানবের হাত থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন—এই ঘটনা স্বর্গরাজ্যে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিল। ইন্দ্রসভায় উৎসবের আমেজ এসে গেল। স্বয়ং দেবরাজ নাট্যগুরু ভরত-মুনিকে খবর দিলেন নাটক পরিবেশন করার জন্য। নাট্যগুরু তাঁর নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে এসে গেলেন। তাঁর নাটকের নাম 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর'। সম্ভবত সমুদ্র-মন্থনের পর লক্ষ্মী যখন দেবী উঠে এলেন সমুদ্রের অন্তর থেকে, তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং সমস্ত দেবতাকে দেখে কাকে তিনি স্বামী হিসেবে বরণ করবেন— এই সব ঘটনা নিয়েই ভরত মুনি তাঁর নাটকের গ্রন্থনা করেছিলেন। এই নাটক আগেও ইন্দ্রসভায় অভিনীত হয়েছে এবং তাতে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন উর্বশী। রম্ভা-মেনকা প্রমুখ অপ্সরারাও বিভিন্ন ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন। আজ উর্বশীর প্রত্যাবর্তনের পর ভরতমুনি সেই নাটকটাই আবার অভিনয় করাবেন বলে ঠিক করলেন।

এদিকে উর্বশীর মনের অবস্থা খুব খারাপ। মর্ত্য রাজা যখন নিজের ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিলেন, সেই বিপন্ন মুহূর্ত থেকেই পুরূরবা উর্বশীর মনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। স্বর্গভূমিতে আর তাঁর মন টেকে না, ভাল লাগে না কোনও কাজ, এমনকি ইন্দ্রসভার নৃত্য-গীতের আসরও বিরস হয়ে গেছে তাঁর কাছে। প্রিয়সখী চিত্রলেখা তাঁর মনের কথা জানেন। বন্ধুর প্রতি সহমর্মিতায় তিনি পুরূরবার খোঁজও নিয়েছেন দু-একবার। এ প্রেম শুধুই তাঁর প্রিয়সখীর দিক থেকে একতরফা, নাকি মর্ত্য রাজা একেবারেই উদাসীন, সে খোঁজও চিত্রলেখা নিয়েছেন। একদিন তো স্বর্গীয় আকাশ-যানে চড়ে পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগরীর ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরিও করেছেন উর্বশীকে সঙ্গে নিয়ে। উর্বশী রাজার সঙ্গে দেখা করেননি বটে, তবে কথা শুনেছেন। চিত্রলেখা অবশ্য দেখাই করে এসেছেন রাজার সঙ্গে। রাজা বলেছেন—

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম একবার যে দেখেছে তার কি আর গঙ্গাপ্রাবহ-হীন যমুনা শুধু ভাল লাগে? তোমার সখী নেই তোমার সঙ্গে, একাকিনী তোমার সঙ্গ—যেন গঙ্গা ছাড়া যমুনা—সঙ্গমে পূর্বদৃষ্টেব যমুনা গঙ্গয়া বিনা। কথাটা উর্বশীর ভাল লেগেছে। কিন্তু মনের এই প্রেম-মেদুর দোলার মধ্যে লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নাটকের নামভূমিকায় লক্ষ্মীর অভিনয় করতে হবে তাঁকে। বুড়ো ভরত-মুনি যুবতীর মন বোঝেন না। তিনি ভাবেন বুঝি অপ্সরা মানেই দেবজনের মনোরঞ্জনের যন্ত্রমাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছ থেকে অপ্সরাদের তিনি চেয়েই নিয়েছিলেন অভিনয়ের জন্য। কিন্তু উর্বশী কি সেই সাধারণী অপ্সরাদের মতো? তাঁর যে মন আছে। কিন্তু উপায় কী? ভরত-মুনির নাট্য সম্প্রদায়ে উর্বশী প্রধানা নায়িকা। তাঁকে তো অভিনয় করতেই হবে।

নাটক আরম্ভ হল। লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্বশী নাটকের 'পার্ট' বলতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর প্রিয়বান্ধবী বারুণীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিজ্ঞা মেনকা। লক্ষ্মীবেশে উর্বশী যেন দেব-দানবের সমুদ্রমন্থন থেকে এখনই উঠে এসেছেন— আদিম বসন্তপ্রাতে, মন্থিত সাগরে। ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভান্ড লয়ে বাম করে। সমুদ্রের ধারে দেব-দানব এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে একতম স্বামী-রূপে কাকে লক্ষ্মী বরণ করবেন—এই ছিল বারুণী-মেনকার প্রশ্ন—সখি সমাগতা এতে ত্রৈলোক্য-সুপুরুষাঃ সকেশবাশ্চ লোকাপালাঃ। কতমেস্মিংস্তে ভাবাবিনিবেশঃ। ঠিক এইখানে লক্ষ্মীদেবীর দ্বিধাহীন উত্তর আসবার কথা —পুরুষোত্তম বিষ্ণুর প্রতিই আমার একমাত্র নিষ্ঠা। কিন্তু 'পুরুষোত্তম' শব্দটি আর লক্ষ্মীর মুখে উচ্চারিত হল না। লক্ষ্মীর মধ্যে থেকে কথা কয়ে উঠলেন উর্বশী এবং পুরুষোত্তমের জায়গায় লক্ষ্মী বলে উঠলেন আমি ভালবাসি পুরূরবাকে— ততস্তয়া পুরুষোত্তম ইতি ভণিতব্যে পুরূরবসি ইতি নির্গতা বাণী।

সভাভর্তি দেব-দর্শকদের সামনে 'পুরুষোত্তম' শব্দের পরিবর্তে ভুল 'পার্ট' বলে পুরূরবার নাম উচ্চরণ করার ফলে নাট্যগুরু ভরত মুনির রাগ হয়ে গেল খুব। তাঁর মুখ দিয়ে কঠিন অভিশাপ নেমে এল উর্বশীর ওপর—দেব স্থান স্বর্গভূমিতে তোমার স্থান হবে না কোনও, তোমায় যেতে হবে মর্ত্যভূমিতে। রবীন্দ্রনাথের কমলিকা-অরুণেশ্বরের কাহিনী যাদের মনে আছে, এই অভিশাপের মর্ম বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হবে না। ঠিক ছন্দপতন অপরাধের সঙ্গে না মিললেও স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর মর্ত্যভূমিতে অবতরণের মধ্যে— সেখানে দুঃখ পাবে দুঃখ দেবে—এই মর্মান্তিক সত্যটুকু অভিশাপের সমস্ত তীক্ষ্নতা নিয়ে উপস্থিত।

দুটি অভিশাপ। মিত্রাবরুণের অভিশাপ এবং ভরত মুনির অভিশাপ— দুটির তাৎপর্যই এক। কালিদাসের রসচেতনায় ভরত মুনির অভিশাপের কাঠিন্য দেবরাজ ইন্দ্রের করুণাধারায় কোমল হয়ে গেছে। দেবরাজ স্বর্গসুন্দরীর মনের খবর রাখেন। অতএব লক্ষ্মী-স্বয়ংবরের শেষ অঙ্কের যবনিকা-পাতের সঙ্গে সঙ্গে উর্বশী যখন নিজের ভ্রান্তিতে লজ্জায় আনত হলেন দেবরাজের সামনে, দেবরাজ তখন উত্তম বিদগ্ধ পুরুষের মতো উর্বশীকে বললেন—ভয় পেয়ো না, সুন্দরী! যাঁকে তুমি ভালবাস, তোমার হৃদয় যেখানে বাঁধা পড়েছে সেই সমর-বিজয়ী রাজর্ষির প্রিয়ত্ব সাধন করার এই তো সুযোগ। তুমি সেই পুরূরবার কাছে যাও। যতদিন তিনি তোমার কোল-আলো করে পুত্রমুখ না দেখেন, ততদিন অন্তত তুমি তাঁর সেবা করো—সা ত্বং যথাকামাং পুরূরবসমুপতিষ্ঠস্ব যাবৎ স ত্বয়ি দৃষ্টসন্তানো ভবেদিতি।

উর্বশীর মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কালিদাসের নাটক থেকে পুনরায় পুরাণের উপাখ্যানে উত্তরণ করব। বস্তুত পৌরাণিকদের জবানীতেও পুরূরবা-উর্বশীর

AMARBOI.COM

জীবন-বৃত্তান্ত বড় কম নাটকীয় নয়, আর সেই নাটকীয়তা নেমে আসছে একেবারে ঋগ্‌বেদ থেকে। তথাচ ঋগ্‌বেদের কাহিনী এবং শতপথ ব্রাহ্মণের প্রাচীন বর্ণনায় যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে বলেই মহাভারতের বক্তব্য এখানে একেবারেই সংক্ষিপ্ত। তবুও সব মিলিয়ে সে কাহিনীর একটা পুনর্গঠিত রূপ দেবার চেষ্টা করা যেতেই পারে।

ভাগবত পুরাণ লক্ষ্য করেছে— ইন্দ্রসভায় উর্বশী যখন অভিনয় করছিলেন, তখন তাঁর মনঃসংযোগের অভাব ঘটার একটা কারণও ছিল। দেবর্ষি নারদ—স্বর্গ থেকে মর্ত্য এবং মর্ত্য থেকে স্বর্গ পর্যন্ত যাঁর বীণা বাজিয়ে ঘোরার অভ্যাস, সেই নারদ ইন্দ্রসভায় এসে বীণার ঝংকারে শুধু পুরূরবার গুণগান করছিলেন। এই গানই উর্বশীর কাল হল। গানের সুরে কীর্তিশালী পুরূরবার নামমন্ত্র উর্বশীর কানে ঢুকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর নাম ভুলিয়ে দিল। তার পরেই নেমে এল ভরত-মুনির শাপ।

অভিশাপের শব্দ শুনে উর্বশীর প্রাণে ভয় হয়নি অন্যত্র যেমনটা হয়— শাপদাতা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পায়ে ধরে শাপমুক্তির উপায় ভিক্ষা—সেই ভিক্ষাও উর্বশী করেননি ভরতমুনির কাছে। দেবরাজের সান্ত্বনা শুধু নয়, তিনি জানতেন— মর্ত্যভূমিতে রাজা পুরূরবাই সেই উপযুক্ত বিদগ্ধ পুরুষ, যিনি স্বর্গসুন্দরী উর্বশীর মর্যাদা বুঝবেন। রাজা পুরূরবার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য এবং মানসিক উদারতা কোনওটাই কম নয় এবং পূর্বাহ্নেই উর্বশী সেই সব গুণের বশীভূত হয়েই ছিলেন। স্বর্গভূমি ছেড়ে এসে উর্বশী যেদিন রাজার সামনে এলেন, সেদিন পুরূরবার বিস্ময় কিছু কম ছিল না। স্বর্গসুন্দরী উর্বশীকে তিনি এত সহজে পাবেন, এ তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

উর্বশী স্বর্গভূমির উচ্চতা থেকে মাটিতে নেমে এলেন স্বর্গের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে, শ্রেষ্ঠতার অভিমান বিসর্জন দিয়ে—অপহায় মানমশেষম্ অপাস্য স্বর্গসুখাভিলাষম্। তাঁর শরীর-মন জুড়ে রইল শুধু মর্ত্য রাজা পুরূরবা। আর পুরূরবার অবস্থা কী হল? পুরূরবা এবার ভাল করে দেখলেন। দেখলেন—পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য যে চরম বিন্দুটি স্পর্শ করতে পারে উর্বশীর সৌন্দর্য তার চেয়েও বেশি কিছু—তব স্তনভার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা/অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা। সুকুমার লাবণ্যবিলাসের মধ্যে উর্বশীর মোহন হাসিটুকু ছিল এমনই যে, রাজা পুরূরবা সেই মুহূর্তেই উর্বশীর কাছে বিনা মূল্যে বিকিয়ে গেলেন— তদায়ত্তচিত্তবৃত্তি। রাজা বললেন-বোসো তুমি। বলো তোমার কী প্রিয় সাধন করব? তুমি আমার সঙ্গে চিরকাল থাকবে, চিরকাল আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসব—সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্ণৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

বিদগ্ধ সুন্দরী পুরুষের মধুর কথা দ্বিগুণ মধুরতায় ফিরিয়ে দিতে জানেন। উর্বশী বললেন— সুন্দর আমার। তোমাকে দেখার পরেও কোন রমণী চোখ ফিরিয়ে নেবে অন্য দিকে? কেই বা মন না দিয়ে থাকবে তোমাকে— কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর? পুরূরবা এবং উর্বশী—দুজনে দুজনের সামনে বসলেন। সেই মুহূর্তে তাঁদের একজনের আরেকজন ছাড়া অন্য কোনও বিষয় ছিল না চিন্তা করার মতো অন্য কোনও বিষয় ছিল না দৃষ্টি দেবার মতো। রাজা বললেন—আমি তোমাকে চাই, সুভ্রূ। তোমার প্রসন্নতা আর অনুরাগ আমার একমাত্র কাম্য। রাজার কথা শুনে উর্বশী লজ্জায় খণ্ডিত হয়ে বললেন—আমাদের মিলনে অন্য কোনও বাধাই নেই। কিন্তু আমার দিক থেকে কয়েকটি শর্ত আছে, মহারাজ।

উর্বশী বললেন—আমার সঙ্গে দুটি মেষ শিশু আছে। মেষ দুটিকে আমি পুত্রস্নেহে পালন

AMARBOI.COM

করি। সেই মেষ দুটি বাঁধা থাকবে আমার বিছানার পাশে। তুমি সে দুটিকে কখনও সরিয়ে নেবে না আমার কাছ থেকে—শয়ন-সমীপে মমোরণকদ্বয়ং পুত্রভূতং নাপনেয়ম্। এই আমার প্রথম শর্ত। আমার দ্বিতীয় শর্ত—আমি যেন তোমাকে উলঙ্গ না দেখি, মহারাজ। তৃতীয় শর্ত—আমি শুধু মাত্র ঘি খেয়ে থাকব—ঘৃতামাত্রঞ্চ মমাহার ইতি। রাজা পুরূরবা সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে বললেন—তাই হবে—এবমস্তু।

পুরূরবা-উর্বশী বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার আগে আমরা একটা জরুরি কথা সেরে নিই। এখুনি যে উর্বশীর মুখে প্রাক্ বিবাহের শর্তাবলী শুনলাম—এই শর্তগুলি সমস্ত পুরাণে একই রকম। কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন যে গ্রন্থটি থেকে এই শর্তাবলীর কথা পুরাণগুলিতে এসেছে তার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ, যা ঋগ্‌বেদের অব্যবহিত পরবর্তী কালেই রচিত। ঋগবেদে যে কাহিনীটুকু পাই তাতে মনে হয় উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার যেন পূর্বে মিলন হয়েছিল। সেই মিলনের পর উর্বশী রাজাকে ছেড়ে চলে গেছেন এবং কোনও ক্রমে আবারও দেখা হয়েছে অন্বিষ্যমান পুরূরবার সঙ্গে। পুরূরবা আকুল প্রেমিকের মতো তাঁকে ছেড়ে যেতে না করছেন এবং উর্বশী আপন তর্কযুক্তিতে রাজাকে নিরস্ত করে ফিরে যেতে বলছেন। এই হল ঋগ্‌বেদ।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন— পুরূরবা-উর্বশী কাহিনীর দুটি স্তর আছে। সবচেয়ে পুরাতন স্তরটি— যা ঋগ্‌বেদে দেখতে পাই, তা অবশ্যই বিয়োগান্ত। কোশাম্বী (D.D.Kosambi) নানা জার্মান পণ্ডিতের মত আলোচনা তুলে দিয়ে বলেছেন—Her mann Oldenberg's discussion postulates a lost prose shell for the Vedic hymn without attempting to explain its many intrinsic difficulties. The original suggestion was made by Windisch, on the model of Irish myth and legend. The argument is that the Satapatha Brahmana version is much more comprehensible than the bare Rgveda dialogue, hence some such explanatory padding must originally have existed.

ঠিক এই কারণেই আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণের পুরূরবা-উর্বশী সংক্রান্ত উপাখ্যানটি উল্লেখ করতে হবে। করতে হবে, কারণ মহাভারত-পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে শতপথের মিল সবচেয়ে বেশি। এমনকি গেল্‌ড্‌নারের মতো জার্মান পন্ডিত শতপথের কাহিনীটিকে বেশি গুরুত্ব না দিলেও পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছেন—the whole episode was just one more of many such itihasa-puranas.

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখছি—উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার যখন বিয়ে হয়, তখন উর্বশীর শর্তাবলীর মধ্যে মেষশিশু-দুটি রক্ষা করার শর্ত প্রথমেই ছিল না। শতপথের শর্তাবলীতে রীতিমতো আধুনিকা রমণীর পরিচ্ছন্নতা এবং বিদগ্ধতা আছে। উর্বশী বলেছেন—দিনের মধ্যে তিনবার তুমি আমার সঙ্গে আলিঙ্গন-রমণে মিলিত হতে পারবে রাজা! তবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যেন কখনও আমার শয্যায় এসো না। আরও একটা কথা, আমি যেন কখনও তোমায় নগ্ন না দেখি। আমাদের মতো মেয়েদের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করার এই নিয়ম—অকামা স্ম মা নিপদ্যাসৈ মো স্ম ত্বা নগ্নং দর্শমেষ বৈ ন স্ত্রীণামুপচার ইতি।

দেখুন, শতপথের বিবরণে প্রথমে মেষশিশুর শর্ত নেই কোথাও, তবে পরে মেষশিশুর প্রসঙ্গ এসেছে। আবার উর্বশীর ঘৃতাহারেরর প্রসঙ্গটি শতপথেও নেই, কিন্তু খোদ ঋগ্‌বেদেই তার উল্লেখ আছে যেহেতু, তাই পৌরাণিকেরা সেই সূত্র ধরেই একেবারে প্রথম মিলনের শর্তাবলীর মধ্যে ঘৃতাহারের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। পরের ঘটনাগুলি শতপথ ব্রাহ্মণ, পুরাণ

এবং ঋগ্‌বেদ মিলিয়ে এইরকম দাঁড়াবে—

শতপথ বলেছে— তারপর উর্বশী বহুকাল বাস করলেন পুরূরবার সঙ্গে এবং এতকালই রইলেন যে, তিনি গর্ভিণীও হলেন—সা হাস্মিঞ্জ্যোগুবাস। অপি হাস্মাদ্‌গর্ভিণ্যাস।

শতপথের ভাষা প্রায় বেদের ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের বোধগম্য নয় তত। কিন্তু পৌরাণিকেরা ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর মর্ত্যবাসে বহুকাল থাকারও অর্থ খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক স্বচ্ছতায়। স্বপ্নলোকের অভীষ্টতমা রমণীটিকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করে পুরূরবার মন আর ঘরে টিকল না। কত সুন্দর সুন্দর জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ালেন উর্বশীকে নিয়ে। এমন সব জায়গা—নিসর্গসৌন্দর্য যেখানে স্বর্গের আভাস দেয়, মনে হয় দেবতাদের বিলাসভূমি যেন ভূলোকে নামিত। নন্দনবন, চৈত্ররথনবন, অলকাপুরী—এই সমস্ত স্থানে উর্বশীর সঙ্গসুখে দিন কাটাতে লাগলেন পুরূরবা—রেমে সুর-বিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু। কতদিন কেটে গেল রাজার, উর্বশীর সুখামোদী মিলন-চুম্বনে।

ওদিকে নন্দনবাসিনীর অভাবে স্বর্গপুরী অন্ধকার। দেবরাজ ইন্দ্র দিনে দিনে বিষণ্ণ হয়ে উঠছেন। উর্বশীর পদছন্দোহীন নৃত্যগীত স্বর্গের ইন্দ্রসভায় আর তেমন জমে ওঠে না। নায়িকাশ্রেষ্ঠের অভাবে ভরত মুনির নাট্য সম্প্রদায় ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। নামভূমিকায় উর্বশীহীন রঙ্গমঞ্চ— সে যেন প্রাণহীন শবশরীরের উদ্‌বর্তন। দেবরাজ গন্ধর্বদের ডেকে বললেন— আর নয়, এবার উর্বশীকে স্বর্গে নিয়ে এসো পুনরায়। উর্বশী ছাড়া আমার এই দেবসভা নিতান্তই বেমানান—উর্বশী-রহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে।

শতপথ ব্রাহ্মণে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে গন্ধর্বদের কোনও মন্ত্রণা নেই। সেখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন স্বয়ং গন্ধর্বরা। তার কারণও আছে। খোদ বেদের মধ্যে অপ্সরারা সর্বত্রই প্রায় গন্ধর্বপত্নী—তাভ্যো গন্ধর্বপত্নীভ্যো'প্সরাভ্যো'করং নমঃ। বেদের মতো পুরাণে-ইতিহাসেও সর্বত্র অপ্সরাদের নাম উচ্চারিত হয় গন্ধর্বদের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে। ভাগবতে কৃষ্ণের রাসনৃত্যের সময়ও অপ্সরা এবং গন্ধর্বদের একসঙ্গে নৃত্যের তালে তালে নাচ-গান করতে দেখছি—জগু-র্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। তবু যে পৌরাণিকেরা উর্বশীর যন্ত্রণায় দেবরাজের মন্ত্রণসভা বসালেন গন্ধর্বদের সঙ্গে, তারও একটা তাৎপর্য আছে। বেদের মধ্যে অপ্সরারা প্রধানত গন্ধর্বপত্নী বলে পরিচিত হলেও দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের যে একটা ভোগ্যসম্বন্ধ আছে, সে কথাও বেদের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। কুত্রাপি যেমন তাঁদের 'দেবপত্নী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে— দেবপত্নীপ্সরাবধীতম্—তেমনই প্রকট হয়ে উঠেছে দেবতাদের সঙ্গে অপ্সরাদের প্রায় অবৈধ কোনও সম্পর্ক —অপ্সরাজারম্ উপসিস্মিয়াণা। দেবতারা অপ্সরাদের 'জার' অর্থাৎ উপপত্নি প্রেমিক। কাজেই উর্বশীর অভাবে গন্ধর্বরা যেমন চিন্তিত হতে পারেন, তেমনই বিচলিত হতে পারেন দেবতারা, এমনকি দেবরাজও।

যাই হোক, পুরূরবার ভালবাসায় উর্বশী যখন আরও বেশি ভালবেসে ফেলেছেন তাঁর মর্ত্যভূমির হৃদয়-রাজাকে এবং সেই ভালবাসায় যখন তিনি স্বর্গভূমির সুখস্মৃতিও ভুলতে বসেছেন—প্রতিদিন-প্রবর্ধমানানুরাগা অমরলোক-বাসে'পি ন স্পৃহাং চকার—ঠিক তখনই বুঝি মন্ত্রণা-সভা বসল গন্ধর্বলোকে অথবা একেবারে ইন্দ্রসভায়। উর্বশীকে মর্ত্যভূমি থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে উর্ধ্বলোকে। ঠিক এই জায়গায় শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা দুটি মেষ-শিশুর আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি—যে মেষ-শিশু দুটিকে গন্ধর্বরা এই এক্ষুনি গিয়ে অলক্ষিতে বেঁধে দিয়ে এলেন উর্বশীর শয্যার দুই পাশে—তস্যৈ হাবিদ্বর্যুরণা শয়ন উপবদ্ধাস। পুরাণের বর্ণনায় অবশ্য

amarboi.com

মেষ-দুটি বহু আগে থেকেই আছে।

প্রতিষ্ঠান-পুরের চারপাশে তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে উর্বশীর আলিঙ্গনসুখে মত্ত আছেন। আবরণ-বস্ত্রের মর্যাদা নেই সামান্যতম। ঠিক এই সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসু অন্য গন্ধর্বদের সঙ্গে নিয়ে উর্বশীর অলক্ষে হরণ করে নিলেন একটি মেষশিশু। মেষের ডাক শুনে উর্বশীর প্রেমাচ্ছন্ন নিদ্রাসুখ ভগ্ন হল। তিনি হাহাকারে কেঁদে উঠলেন—আমার বীর স্বামী বেঁচে নেই নিশ্চয়, অথবা সহায় নেই সমব্যথী কোনও মানুষ, নইলে পুত্রস্নেহে লালিত আমার এই মেষশিশুটিকে হরণ করল কে—শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায়-অবীর ইব বত মে'জন ইব পুত্রং হরন্তীতি। গন্ধর্বরা ততক্ষণে দ্বিতীয় মেষ-শিশুটিকেও হরণ করেছেন। উর্বশীর আর্তি শোনা গেল আবার একই ভাষায়—আমার স্বামী নেই, সহায় নেই—সা হ তথৈবোবাচ।

প্রথম মেষশিশুটি হৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা পুরূরবা টের পেয়েছেন। বিশেষত উর্বশীর আক্ষেপ-বচনও তাঁর কানে গেছে। তিনি শুধু ইতস্তত করছিলেন। মেষচোর খুঁজবার জন্য ক্ষীণ দীপবর্তিকাটি জ্বালালেও যে উর্বশী তাঁকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পাবেন। আর তেমন দেখলে তো উর্বশী আর দ্বিতীয়বার লজ্জিত বাসর-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ধরা দেবেন না পুরূরবার বাহুবন্ধনে। কিন্তু দ্বিতীয় মেষ শিশুটি হরণের পরে উর্বশীর ধিক্কার যেন রাজার হৃদয়ে শেল বিঁধিয়ে দিল। সুরশত্রু কেশী-দমন বীর রাজার পক্ষে এই অপবাদ সহ্য করা কঠিন হল। আর সত্যিই তো উর্বশী রাজার সম্বন্ধে মোটেই ভাল কথা বলেননি। শতপথ ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র দুটি কথা—'অবীর,' 'অজন'— পুরাণের শব্দে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—বীরের 'ব' নেই, নিজেই নিজেকে শুধু বীর মনে করে এমন একটা ক্লীব অসভ্য লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা। নইলে চোরে আমার ছেলে নিয়ে পালাচ্ছে আর উনি কিনা পুরুষ হয়েও মেয়েছেলের মতো দিনের বেলায় দরজা বন্ধ করে ভয়ে ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে আছেন—যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্।

যে উর্বশী পুরূরবার হৃদয়হারিণী বলে কথা, আকস্মিক তাঁর এই ভাব-পরিবর্তন রাজা পুরূরবাকে একবারে বিভ্রান্ত করে তুলল। তিনি যথাবৎ নগ্ন অবস্থাতেই উর্বশীর মেষ খুঁজতে যাবার উপক্রম করলেন। গন্ধর্বরা সময় বুঝে বিদ্যুতের জ্যোতির এক ঝলক সৃষ্টি করলেন নিমেষে। চল চপলার চকিত চমকে উর্বশী দেখলেন—রাজা উলঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্য রাজার এতদিনের ভালবাসা তুচ্ছ করে উর্বশী প্রতিষ্ঠান-পুরের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের মতো—তৎপ্রভয়া চোর্বশী রাজানম্ অপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত্তসময় তৎক্ষণাদেব অপক্রান্তা। যে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে রাজার প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হয়েছিল—আমাদের ভালবাসা হোক চিরন্তনী—রতি র্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ—এক মুহূর্তে সেই ভালবাসার বাঁধন ভেঙে দিলেন উর্বশী।

বিদগ্ধা স্ত্রীর কাছে আত্মগৌরব সাহংকারে প্রকাশ করার জন্য সেই মধ্যরাত্রেই রাজা নগ্ন অবস্থাতেই বেরলেন মেষ চোর ধরে আনতে। গন্ধর্বরা চকিত আলোর মায়া সৃষ্টি করেই বুঝেছেন—দেবকার্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁরা মেষ শাবক দুটি ফেলে রেখে পালিয়ে চলে গেলেন। রাজাও উর্বশী খুশি হবেন ভেবে সানন্দে মেষ দুটি হাতে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। দেখলেন শূন্য শয্যা। প্রিয়তমা পত্নী কোথায় চলে গেছেন। উর্বশীর প্রেমে উন্মত্ত রাজা সেই নগ্ন অবস্থাতেই তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন—তাঞ্চ অপশ্যান্ অপগতাম্বর এব উন্মত্তরূপো বভ্রাম। সেই নন্দনবন, চৈত্ররথ, অলকা, গন্ধমাদন—সর্বত্র ঘুরেও রাজা উর্বশীর খোঁজ পেলেন

না। বুঝলেন—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে গেছে। গান্ধর্বী মায়ার চকিত আলোকে উর্বশী তাঁকে নগ্ন দেখেই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। বুঝলেন—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।

হলফ করে বলতে পারি-রবিঠাকুর যখন উর্বশীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তখন তিনি উর্বশী-পুরূরবার সূর্যপর ব্যাখ্যাটুকু জানতেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্যমতে এবং খানিকটা বৈদিক যুক্তিতেও পুরূরবা সূর্যের প্রতীক এবং 'উর্বশী' উষার। তত্ত্বটুকু তাঁর জানা ছিল বলেই উর্বশী কবিতায় অসম্ভব নিপুণতায় কবি অন্তত তিনটি পংক্তি প্রয়োগ করেছেন— (১) উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা, (২) স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী, (৩) প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে। তবে এই সব তত্ত্বের ওপরেও বলতে হবে—'উর্বশী' কবিতায় তাঁর শব্দপ্রয়োগের সবচেয়ে বেশি সার্থকতা আছে 'ক্রন্দসী' শব্দটির মধ্যে—ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী। 'ক্রন্দসী' শব্দটি একেবারে পাক্কা বৈদিক প্রয়োগ, যার মানে টীকাকার সায়নাচার্য করেছেন 'দ্যাবাপৃথিবী'; আরও সহজ করলে দাঁড়ায় দ্যুলোক এবং ভূলোক। উর্বশী এমনই এক প্রার্থনীয়া রমনী যাঁর জন্য স্বর্গ-মর্ত্যে কান্নার রোল ওঠে। উর্বশী স্বর্গভূমি ছেড়ে চলে এসেছিলেন মর্ত্যরাজার প্রেমে, তখন দেবতা-গন্ধর্বদের মধ্যে তাঁকে পাবার জন্য যে হাহাকার উঠেছিল, আজ সেই হাহাকার সংক্রমিত হয়েছে পুরূরবার হৃদয়ে। উর্বশীর জন্য মর্ত্যভূমির হাহাকার ভেসে বেড়াচ্ছে বনে বনান্তরে। রাজা পুরূরবা নগ্ন হয়ে উন্মত্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন যদি প্রিয়তমা পত্নীকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পান—

ফিরিবে না, ফিরিবে না অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
তাই আজি ধরাতলে, বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে,
অয়ি অবন্ধনে।।

চব্বিশ

পুরূরবার প্রাণের ক্রন্দনে যে আশা জেগে ছিল, সে আশা পূরণ হল একবার এবং ঠিক সেইখানেই ঋগ্‌বেদে উর্বশী-পুরূরবার সংলাপ সূক্ত আরম্ভ হয়েছে। উর্বশীর অন্বেষণে বনে বনান্তরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মহাভারতের পূর্বকালের কুরুক্ষেত্রে এসে এক পদ্ম-সরোবরের মধ্যে অবগাহনরত উর্বশীকে দেখতে পেলেন রাজা— বিকশিত বিশ্ববাসনার/ অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার/ অতি লঘুভার। এই পদ্ম দিঘির নাম 'অন্যতঃপ্লক্ষা'। এ খবর আছে শতপথ ব্রাহ্মণে। স্বর্গসুন্দরী সেই শীতল দিঘির মধ্যে পা ভাসিয়ে স্নান করছিলেন অন্য অপ্সরাদের সঙ্গে। সরোবরের তীরে উদ্‌ভ্রান্ত পুরূরবাকে উর্বশী প্রথমে দেখতে পেয়েছেন। রাজাকে দেখা মাত্রই তিনি বন্ধুদের জানিয়েছেন—এই হলেন সেই মর্ত্য রাজা। যাঁর সঙ্গে আমি এতকাল সহবাস করেছি—অয়ং বৈ স মনুষ্যো যস্মিন্নহমবাৎসম্ ইতি।

অন্য অপ্সরা-সুন্দরীরা উর্বশীর কথা শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন পুরূরবার দিকে। প্রায় ঈর্ষাকাতর ভাষায় বললেন— ইচ্ছে হয় যেন আমরাও এই মর্ত্য রাজার সঙ্গ-সুখ লাভ করি। উর্বশীকে তাঁরা বললেন—চল, একবার দাঁড়াই গিয়ে রাজার সামনে—তা হোচতু স্তস্মৈ বা আবিরসামেতি। উর্বশী অপ্সরা সখীদের কথা শুনে রাজার দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরূরবা তাঁকে আবার বাহু-বন্ধনে বেঁধে ফেলেন আর কি! উর্বশী জানেন অথবা এতদিন পুরূরবার সহবাস-পরিচয়ের ফলে জেনেছেন যে, মর্ত্যের বন্ধন দেবতার চেয়েও অনেক বেশি, হয়তো মধুরতরও বটে। সে বন্ধনে একবার জড়ালে দেবতাকেও মায়া সৃষ্টি করতে হয় বন্ধন-মুক্তির জন্য। উর্বশী দাঁড়ালেন না। প্রিয়তম স্বামীকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তাঁর অলস-গমন শুরু হল। কিন্তু অলস-গমনা রমণীর সেই ললিত গতি পুরূরবার মনে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল পুনর্বার। কথাটা ঋগ্‌বেদের জবানীতে এইরকম—

পুরূরবা বললেন—এত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যেও না উর্বশী। তোমার হৃদয় কি এতই নিষ্ঠুর, আমাদের দু'জনের কিছু কথাবার্তা এখনই যে হওয়া উচিত—হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু। উর্বশী নিজের চারপাশে স্বর্গীয় উদাসীনতা সৃষ্টি করে বললেন—কী হবে তোমার সঙ্গে কথা বলে—কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং—আমি তো চলে এসেছি প্রথম উষার মতো। তুমি ফিরে যাও পুরূরবা। তুমি আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। হাওয়াকে যেমন হাত দিয়ে ধরা যায় না, তেমনই আমাকেও তুমি ধরে রাখতে পারবে না—দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি। পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গলাভের জন্য আকৃতি প্রকাশ করলেন। বললেন—এখন তুমি নেই, আর আমার তূণ থেকে বাণ নির্গত হয় না। তুমি আসার পর থেকে কোনও যুদ্ধে যাইনি। ললাটে অঙ্কিত হয়নি কোনও জয়টীকা। রাজকার্যে কোনও উৎসাহ নেই। আমার সৈন্যেরা পর্যন্ত সিংহনাদ করে না। পুরূরবা এইটুকু বলেই থামলেন না। স্মরণ করলেন পুরনো দিনের কথা। এমনকি দিনে-রাতে তাঁর সোচ্ছ্বাস সম্ভোগ-স্মৃতিও পুনরুক্ত হল—দিবানক্তং শ্নথিতা বৈতসেন।

স্বর্গসুন্দরী উর্বশী। কথা তিনি কিছু কম জানেন না। তিনি চলে এসেছেন, তাতে যে পুরূরবার কোনও দোষ ছিল না, রাজা যে তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদায় প্রেমে এবং আদরে রেখে ছিলেন, সে কথা তিনি সাবেগে স্বীকার করে নিলেন। বললেন—দিনের মধ্যে তিনবার তুমি আমায় আলিঙ্গন করতে রাজা। আমার কোনও সতীন আমার সমান আদর পায়নি তোমার কাছে, আমাকেই তুমি প্রতিনিয়ত সন্তুষ্ট করেছ। তুমি আমার রাজা , আমার বীর।

সন্দেহ নেই পুরূরবার স্ত্রী ছিলেন আরও কয়েকজন—সুজূর্নি, শ্রেণি, আপি, গ্রস্থিনী প্রমুখ। কিন্তু উর্বশী চলে আসার পর তাঁদের কারও সাহস হয়নি বিরহে আকুল রাজাকে সঙ্গ দেওয়ার। উর্বশী সে সব কথা জানেন। রাজাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—পৃথিবী পালনের জন্য আমার গর্ভে পুত্র লাভ করেছ তুমি। কিন্তু তুমি তো আমার কথা শোননি। আমি তো বারবার বলেছি, কী হলে আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি শোননি। এখন আর এত কথা বলে কী লাভ—অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্‌বদাসি।

উর্বশী পূর্বশর্তের কথা স্মরণ করিয়েও পুত্র জন্মের সান্ত্বনা দিয়ে পুরূরবার দগ্ধ হৃদয়ে সুখের কোমল প্রলেপ দিয়েছেন এবং শেষ কথা বলেছেন নির্দ্বিধায়—তুমি ঘরে ফিরে যাও। আর তুমি আমাকে পাবে না—পরে হ্যস্তং নহি মূঢ়মাপঃ। উর্বশীর কথা শুনে পুরূরবা মরতে চেয়েছেন। বলেছেন—তোমার প্রণয়ী দূর হয়ে যাক তোমার সামনে থেকে। সে যেন মরণের কোলে শয়ন করে, হিংস্র নেকড়েরা খেয়ে নিক তাকে—অধা শয়ীত নিয়তেরুপস্থে অধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ। উর্বশী সপ্রণয়ে বলেছেন—এমন করে মরতে চেয়ো না পুরূরবা, এমন করে নষ্ট কোরো না নিজেকে। তুমি কি জান না মেয়েদের মন কেমন কঠিন। স্ত্রীলোকের হৃদয় এবং নেকড়ের হৃদয় একই রকম, স্ত্রীলোকের ভালবাসা কি স্থায়ী হয় কখনও—ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতাঃ। পুরূরবা তবু বলেছেন—তুমি ফিরে এস উর্বশী। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার বিরহে—নিবর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে।

কবিগুরুর উর্বশী কল্পনায় উর্বশীর যতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে 'অবন্ধনা'—ভাবটুকু থাক বেদ-পুরাণ-মহাভারতের উর্বশী কিন্তু পুরূরবার প্রেমেই পড়েছিলেন। খোদ বেদে পুরূরবার প্রতি উর্বশীর শেষ পরামর্শ হল—দেবতারা বলছেন—তুমি তো এইভাবে মৃত্যুর দুয়ারে এসে পৌঁছেছ; তোমার পুত্র অবশ্যই দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করবে, আর তাতেই তুমি

amarboi.com

স্বর্গে গিয়ে পরমানন্দ লাভ করবে।

বেদের এই বিবরণের সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের কিছু তফাত আছে। শতপথের বিবরণ আরও মানবিক। শতপথ আর পুরাণগুলিতে দেখা যাবে— উর্বশী বলছেন—কেন এমন অবিবেক পাগলের মতো ব্যবহার করছ—অলম্ অনেন অবিবেকচেষ্টিতেন। আমি গর্ভবতী, আমার গর্ভে তোমারই পুত্র আছে। ঠিক এক বৎসর পরে আবার ফিরে এসো এইখানে। তোমার ছেলেকে দেব তোমারই হাতে। আর ঠিক এক রাত্রির জন্য তোমার সঙ্গে মিলন হবে আবার—অব্দান্তে ভবতা অত্র আগন্তব্যম। কুমারস্তে ভবিষ্যতি। একাঞ্চ নিশাং ত্বয়া সহ বৎস্যামি। বিষ্ণুপুরাণের এই গদ্যাংশের সঙ্গে ঋগ্‌বেদের অব্যবহিত পরবর্তী শতপথ ব্রাহ্মণের প্রায় কোনও তফাত নেই। শতপথে দেবতার কথা বলেননি উর্বশী। বলেছেন—গন্ধর্বরা তোমাকে বর দেবেন রাজা। তাঁদের তুমি বোলো— আমিও একজন গন্ধর্ব হতে চাই। পরের দিন সকাল বেলায় পুরূরবা গন্ধর্বদের কাছে গন্ধর্ব হবার বর চাইলেন—যুস্মাকমেবৈকো'সানীতি। কারণ গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের সম্বন্ধ চিরন্তনী। এরপর পুরূরবা গন্ধর্বদের কাছ থেকে যজ্ঞের অরণিকাষ্ঠ এবং অগ্নিস্থালী লাভ করলেন। দুটি অরণি মন্থন করে অগ্নি উৎপাদন করে পুরূরবা আহুতি দিলেন যজ্ঞে আর সেই থেকে তিনি গন্ধর্ব হয়ে গেলেন—তেনেষ্টা, গন্ধর্বাণামেক আস। আর গন্ধর্ব হয়ে যাওয়া মানেই চিরকাল উর্বশীর সঙ্গে প্রেমালাপ আর সহবাস। পুরূরবা এই চেয়েছিলেন— উর্বশীর সঙ্গে উর্বশী-লোকে চিরবাস।

পুরূরবার কাহিনী এখানেই বেশ শেষ করতে পারতাম। কিন্তু ওই যে বললাম— পুরূরবা একজন গন্ধর্ব হয়ে গেলেন—গন্ধর্বাণামেক আস— শতপথ ব্রাহ্মণের এই কথাটা অত সহজ নয়। অন্তত পণ্ডিতেরা কথাটাকে অত সহজে ছেড়ে দেননি। পুরাণে-ইতিহাসে দেবতা এবং অসুরদের সবারই স্বরূপ-লক্ষণ খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু সেখানে গন্ধর্বদের যেন ভাল করে চেনা যায় না। মোটামুটিভাবে নৃত্যগীতের সঙ্গে গন্ধর্বদের আমরা জড়িত দেখেছি এবং তার স্মারক হিসাবে আধুনিক ভারতে গন্ধর্ব পুরস্কার পর্যন্ত চালু হয়েছে।

চেহারার কথা যদি বলেন, তাহলে গন্ধর্ব—এই নামটা যতই সুন্দর হোক না কেন—গন্ধর্বরা আমাদের কিছুটা নিরাশ করবেন। বেদ-পুরাণ-পড়া সাহেব পণ্ডিতরা গন্ধর্বদের মানুষ আর পশুর মাঝামাঝি রাখতে চান—hasitating between the two. They are sometimes represented as half horse and half bird. কেউ বা আবার দার্শনিকভাবে গন্ধর্বদের জীবন-মৃত্যুর মধ্যম অবস্থায় রাখার কথাও চিন্তা করেছেন। এই দার্শনিকতার চরম বিন্দুতে আছেন জার্মান পণ্ডিত হিলেব্রানডট্ যিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের উদাহরণে গন্ধর্বদের 'prefoetal being' বলে চিহ্নিত করেছেন। ওলডেনবার্গ কিন্তু গন্ধর্বদের অত দুর্বল মনে করেন না, কেন না গন্ধর্ব বলতে ভ্রূণ-পূর্ব কোনও সত্তার কথা পৌরাণিক সাহিত্যের নিরিখে একেবারেই ধোপে টেকে না।

অন্যদিকে আমাদের কোশকারদের চিন্তাধারাটাও সাহেবদের কাছে বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে কেন না অভিধানকারেরা গন্ধর্বদের বলেছেন— 'অন্তরাভবসত্ত্ব'। টীকা করলে যার মানে দাঁড়ায় 'মরণ-জন্মনোরন্তরালে স্থিতঃ।' অর্থাৎ সেই এক কথা আবার—মৃত্যু এবং জীবনের মাঝামাঝি কোনও ব্যক্তিসত্তা। আমাদের পৌরাণিক দৃষ্টিতে মৃত্যু এবং জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থায় পিতৃলোকের কল্পনাটাই প্রধান হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তাই বলে বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থার কোনও প্রেত-জীব হিসাবেও গন্ধর্বদের কল্পনা করা কঠিন।

AMARBOI.COM

একজন ইংরেজ পন্ডিত এই মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন যে, অভিধানকারদের 'অন্তরাভবসত্ত্ব' শব্দটা কোনওভাবেই মানুষ বা পশুর মধ্যবর্তী অথবা মরণ-জীবনের অন্তরালবর্তী অবস্থাও কিছু নয় কেন না Gandharvas are not human beings statu nascendi, but beings intermediate between gods and men, of a higher order even than pitaras.

আমাদের সাংস্কারিক ধারণাটাও এই রকমই; গন্ধর্বদের আমরা আধা-দেবতা মনে করি এবং দেব-লোকের সঙ্গে তাঁদের দহরম-মহরম অনেক বেশি। গন্ধর্বদের সম্বন্ধে আরও খবর হল যে, গন্ধর্বরা অত্যন্ত স্ত্রী-প্রিয় একটি জনজাতি। আমদের প্রাচীন সমাজে অনেক আভিচারিক মন্ত্রও পাওয়া যাবে যেগুলি উচ্চারণ করে মেয়েদের ওপর গন্ধর্বদের আবেশ ছাড়ানো হত। ওলডেনবার্গ লিখেছেন—অনেক সময় নব বিবাহিত যুবক-যুবতীদের যৌন মিলনের প্রাথমিক দিনগুলিতে যজ্ঞভূমিতে রাখা একটি দন্ডের মতো বস্তু ন্যাকড়া বা সুতো দিয়ে প্যাঁচানো একটি ছোট্ট লাঠি নর-নারীর মাঝখানে রাখা হত। এই দন্ডটি নাকি গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর প্রতীক। পুরূরবা যে অরণিকাষ্ঠ লাভ করেছিলেন, তাতেও এই গন্ধর্বের প্রতীক-দণ্ডটিই অনুমান করেছেন পণ্ডিতেরা।

মহামতি কৌশাম্বী এই আলোচনা থেকে কিছু খোরাক পেয়েছেন মনে হয় এবং পুরূরবার গন্ধর্ব হয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে তিনি খুব বাস্তব-সম্মত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—What is the original meaning of 'became a Gandharva'? This could not have happened while Pururavas was alive, for the Gandharva at the time of the Brahmanas is recognised as a spirit who could possess women, say the spirit that caused their hysteria. কৌশাম্বীর বক্তব্য থেকে আমরাও কিছু ধারণা করতে পারি। বস্তুত আমরা আগেই বলেছি পুরূরবা মরেননি মোটেই। এই না-মরার কথাটাই আরেকভাবে আমরা বলতে চাই।

আমরা যেমন আজকের যুগেও বলি— ভূতে পেয়েছে, পেচোয় পেয়েছে, এও অনেকটা সেই রকম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ভুজ্যু লাহ্যায়নির কথা পড়েছি। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন—আমরা মদ্র-দেশীয় মানুষদের মধ্যে শিক্ষার্থী হয়ে ঘুরছিলাম। তারপর আমরা পতঞ্চল কাপ্যের বাড়িতে পৌঁছোলাম। তাঁর একটি মেয়ে আছে, তাকে গন্ধর্বয় পেয়েছে—তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নাম কী? সে বলল—আমার নাম সুধন্ব, অঙ্গিরাগোত্রীয় সুধন্ব।

ভাবুন একবার। ঠিক ভূতে পাওয়ার মতোই। 'প্ল্যাঞ্চেট্ করতে গেলে 'মিডিয়াম' কিন্তু নিজের নাম বলে না। জীবিত অবস্থায় প্রেত ব্যক্তির যে নাম ছিল অর্থাৎ যাকে আপনি ডাকছেন বা স্মরণ করছেন 'মিডিয়াম' তারই নাম লেখে। পতঞ্চল কাপ্যের মেয়ে একটি ব্রাহ্মণ-পুরুষের নাম করছে এবং উপনিষৎকার স্পষ্টতই বলছেন—মেয়েটাকে গন্ধর্বয় ধরেছে—গন্ধর্বগৃহীতা। পতঞ্চল কাপ্যের ভাগ্য মোটেই ভাল নয়। একটি মাত্র মেয়ে তাকে গন্ধর্বয় ধরেছে, আবার খানিক পরে ওই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই দেখতে পাচ্ছি তাঁর বিবাহিত পত্নীও গন্ধর্বাক্রান্ত। উদ্দালক আরুণি ওই মদ্রদেশের উল্লেখ করেই যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন—আমরা ওই মদ্রদেশেই যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্য পতঞ্চল কাপ্যের ঘরে কিছুদিন ছিলাম। দুঃখের বিষয় তাঁর স্ত্রীটিকে গন্ধর্বয় ধরেছে—তস্যাসীদ্ ভার্যা গন্ধর্বগৃহীতা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি? গন্ধর্ব উত্তর দিল— আমি অথর্বণের পুত্র। আমার নাম কবন্ধ।

ওই একই ব্যাপার। গন্ধর্বক্রান্ত একটি বিবাহিতা রমণী এবং একটি গন্ধর্বাক্রান্ত কন্যা—এই দুই অস্বাভাবিক রমণী নিয়ে কপিবংশীয় পতঞ্চলের সংসার। উপনিষদের ভুজ্যু লাহ্যায়নি এবং উদ্দালক আরুণি—এই দুই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষি উপরি-উক্ত দুই গন্ধর্বাক্রান্ত রমণীর কাছে ব্রহ্ম বিদ্যা শুনতে পেয়েছেন। কারণ গন্ধর্ব লোকাতীত জীব। তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি মানুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু পুরূরবার গন্ধর্ব হয়ে যাওয়ার মধ্যে পণ্ডিতেরা এই দুটি উদাহরণের অন্য তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। বৃহদারণ্যকের ভাষায় এ কথা যথেষ্টই পরিষ্কার যে, 'গন্ধর্বগৃহীতা রমণী' মানেই সেই রমণীর ওপর কোনও অমানুষ সত্ত্বের আবেশ ঘটেছে।

আধুনিক যুগে 'ভূতে পাওয়া', 'পেচোয় পাওয়া'র মতো 'গন্ধর্ব-গৃহীতা' শব্দটিকেও আমরা হয়তো বিশ্বাস করব না, কিন্তু কোশাম্বীর কথা মতো গন্ধর্ব ব্যাপারটাকে—the spirit that caused their hysteria অর্থাৎ গন্ধর্বকে 'হিস্টিরিয়ার' অধিদেব ভাবতে কোনও ক্ষতি নেই। কোশাম্বীর ভাষায়—Hence, though the Gandharvas posses a separate minor heaven of their own, a human being can attain it only as a spirit. শতপথ ব্রাহ্মণ, বায়ু পুরাণ এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিক প্রমণে থেকে কোশাম্বী বিশ্বাস করেন— অর্থলোভ এবং স্বর্ণগৃধ্নুতার জন্য পুরূরবা কোনও যজ্ঞভূমিতেই মারা যান অথবা তিনি 'স্পিরিট' হয়ে যান, যাকে শতপথ বলেছে— তিনি গন্ধর্ব হয়ে গেলেন।

আমদের বক্তব্য গন্ধর্ব শব্দের অর্থে 'হিস্টিরিয়ার' কাছাকাছি গিয়েও কেন শেষ রাখতে পারলেন না কোশাম্বী? বস্তুত গন্ধর্বের আবেশ এখানে উর্বশীর ওপরে নয়। বরং পুরূরবার ওপরেই। পুরূরবা গন্ধর্ব হয়ে গেলেন মানে তাঁকে হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো বিকারগ্রস্ত দেখা গেল। কালিদাসে উর্বশীর বিরহে পুরূরবার যা অবস্থা হয়েছে তা কাব্যিক দিক দিয়ে যথেষ্ট মূল্যবান হলেও বিকারের কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা বেদের মধ্যে দেখেছি পুরূরবা নিজেই বলছেন—আমিই যখন মানুষ হয়েও অমানুষী অপ্সরাদের আলিঙ্গন করেছিলাম, তখন তারা বস্ত্র উন্মোচন করে রেখে হরিণীর মতো, অশ্বের মতো আমার কাছ থেকে ছুটে পালাল— অপ স্ম মৎ তরসন্তি ন ভুজ্যুস্তা অত্রসান্ রথস্পৃশো নাশ্বাঃ।

অপ্সরাসুন্দরীদের পিছনে ছোটার এই বিকার পুরূরবার জীবনে পরিণত হয়েছে উর্বশীকে পাওয়ার পর। পুরূরবা উর্বশীর সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে তাঁকে বিবাহ করেছেন। পৃথিবীতে স্ত্রীকামী ব্যক্তির বিকারের ইতিহাস কিছু অপ্রাপ্য নয়। কিন্তু উর্বশীকে পাওয়ার পর রাজার চিরাভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় তাঁর রাজকার্য মাথায় উঠেছিল, এবং স্বর্গসুন্দরীর তোষণে-পোষণে তাঁর অর্থগৃধ্নুতাও বেড়ে গিয়েছিল। হয়তো এই সময়েই কোনও যজ্ঞভূমিতে তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা আক্রান্ত হন। আমরা জানি—উর্বশী রাজাকে ছেড়ে চলে যান এবং বেদ, শতপথ তথা অন্যান্য পুরাণের বিবরণ থেকে বোঝা যায় তাঁর বিকার প্রায় পাগলামিতে পরিণত হয়েছিল। বেদের বিবরণে পুরূরবার নিজ-মুখের স্বীকারোক্তি—আমার তূণীর থেকে আর বাণ নির্গত হয় না। রাজকার্য বীরশূন্য, তার কোনও শোভা নেই—অবীরে ক্রতৌ বি দবিদ্যুতন্নোরা।

আমাদের ধারণা হয়—উর্বশীকে নিয়ে রাজার যে এই অসহায় বিকারগ্রস্ত (hysteria) অবস্থা, এই অবস্থা থেকেই তাঁর অর্থগৃধ্নুতা এবং ব্রাহ্মণ বিরোধিতারও চরম বিন্দু স্পর্শ করে। ব্রাহ্মণরা অথবা আরও সাধারণভাবে বললে প্রজারা তাঁর এই বিকারগ্রস্ত অবস্থা মেনে নেননি। তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেছেন। আগে যেমন অত্যাচারী বেণের ব্যাপারে দেখেছি, তাঁর বাহুমন্থনের ফলে পৃথু জন্মালেন এবং পৃথুকে রাজপদে বসালেন ব্রাহ্মণেরা, এখানেও তেমনই

পুরূরবাকে রাজ্যচ্যুত করে তাঁর উর্বশীগর্ভজাত পুত্র আয়ুকে সিংহাসনে বসালেন ব্রাহ্মণেরা— উর্বশেয়ং ততস্তস্য পুত্রং চক্রুর্নৃপং ভুবি।

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণু পুরাণে আমরা দেখেছি—উর্বশী এক বছর পর এক রাত্রি পুরূরবার সঙ্গে মিলনে স্বীকৃত হন এবং ওই এক বছর পরেই উর্বশী তাঁর প্রথম পুত্রকে পুরূরবার হাতে দেবেন বলে প্রস্তাব করেন। বস্তুত উর্বশী পূর্বাহ্নেই গর্ভবতী ছিলেন। এর পরেই গন্ধর্বদের দেওয়া সেই অরণিকাষ্ঠ এবং অগ্নিস্থালী নিয়ে পুরূরবা স্বগৃহে আসেন। অরণিমন্থনে যে পবিত্র অগ্নি জন্মায়, সেই অগ্নিই পরবর্তী পুরাণগুলিতে বেদ-বিখ্যাত অগ্নির তিন স্বরূপ— গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি নামে বিখ্যাত হয়েছে। পুরূরবা এই অগ্নির প্রণেতা বলেই তিনি বেদে অগ্নিদেবের বন্ধু বলে প্রশংসিত হয়েছেন।

আমাদের বক্তব্য কিন্তু পুরূরবার অগ্নি আহরণের তাৎপর্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের ধারণা যে ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা পুরূরবার রাজ-জীবনে ভীষণ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, উর্বশীর পরামর্শে এবং গন্ধর্বদের অনুকম্পায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক অগ্নি আহরণ করে পুরূরবা সেই বিপর্যয় খানিকটা ঠেকাতে পেরেছেন। কাম-বিকারগ্রস্ত অর্থগৃধ্নু পুরূরবা সাময়িকভাবে রাজ্যচ্যুত হলেও ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতা ত্যাগ করে অগ্নি-উপাসনার পথে তৎকালীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গে আপস করে নেন। মহাভারতের কবি তাই উর্বশী-পুরূরবার প্রেম-কাহিনীর বর্ণনায় মন দেননি। তিনি পুরূরবার উৎকট ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার সামাজিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেই দুই পংক্তিতে বলেছেন— পুরূরবা তারপর উর্বশীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য গন্ধর্বলোক থেকে নিয়ে আসেন অগ্নিকে—যে অগ্নির তিন রূপ গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি এবং আহবনীয়।

স হি গন্ধর্বলোকস্থান্ উর্বশ্যা সহিতো বিরাট্। আনিনায় ক্রিয়ার্থেঽগ্নীন যথাবদ্ বিহিতাংস্ত্রিধা।। এই অগ্নি আনয়নের পথ ধরেই হয়তো ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে যাঁর বিবাদ-বিসংবাদ মিটে যায়, এবং সেই কারণেই তাঁর পুত্র আয়ুর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় বিনা বাধায়। আরও একটা কথা। উর্বশীর অন্তর্ধানের পর যেমন তাঁর কাম-বিকার শান্ত হয় একই সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতাও শেষ হয়। এরই ফলে হয়তো ঋগ্‌বেদে তিনি 'সুকৃতি' বলে আখ্যা লাভ করেছেন, পরিচিত হয়েছেন অগ্নিদেবের বন্ধু বলেও।

উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার প্রথম পুত্রের নাম আয়ু। এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম এবং রাজ্যাভিষেকের পরেও পুরূরবা হয়তো বেঁচেই ছিলেন নইলে 'অধিকাংশ পুরাণেই দেখা যাবে—পুরূরবা উর্বশীর গর্ভে ছটি পুত্র লাভ করেছিলেন। মহাভারতের বিবরণেও তাই। আয়ু, ধীমান, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু এবং শতায়ু—এই ছয় পুত্র। শেষ তিনটি নামের শেষে 'আয়ু' থাকায় পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলেছেন যে, it may be admitted that an 'Ayu' tribe derived their descent from Urvasi and Pururavas. নামের অন্তে আয়ু-শব্দের প্রয়োগে কোনও আয়ু-গোষ্ঠীর জন-জাতির উদ্ভব অনুমান করা যায় কিনা জানি না। তবে প্রতি বৎসর এক রাত্রির যে মিলন-বাসর রচিত হত উর্বশী-পুরূরবার জীবনে, তাতে যে রাজার আরও পাঁচটি পুত্র হয়েছিল, সে খবর পৌরাণিকেরাও স্বীকার করেন, মহাভারতের কবিও তা মেনে নিয়েছেন।

প্রধানত চন্দ্রবংশের ধারাটি বোঝানোর জন্য মহাভারতের কবি আপাতত পুরূরবার প্রথম পুত্র আয়ুর বংশধরদের কথাই বলে গেছেন: কিন্তু তাই বলে অন্যেরাও খুব সামান্য নন। যেমন

অমাবসুর বংশে স্বয়ং জহ্নু মুনির জন্ম হয়, যাঁর সাহচর্যে ভারতাত্মা জননী জাহ্নবী। পুরূরবার অন্য পুত্রদের ঔরসে বহুতর ব্রাহ্মণদের দেখা যাবে এবং এই ঘটনায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেকালের ক্ষত্রিয় বংশে অনেকেই এরকম ব্রাহ্মণ হয়ে যেতেন কারণ, জন্মের দ্বারা তখন ব্রাহ্মণ্য নির্ধারিত হত না। এ সব কথা পরে আসবে। আমরা আয়ুর কথা বলি।

ঐল পুরূরবার পুত্র আয়ু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পুরূরবার রাজত্বকালে যে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতা আমরা লক্ষ্য করেছি, আয়ুর আমলে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত। বায়ুপুরাণ জানিয়েছে—দ্বাদশ-বার্ষিক যে বিশাল যজ্ঞটি পুরূরবার রাজত্বকালে আরম্ভ হয়েছিল, পুরূরবার মৃত্যুর পর আয়ুর তত্ত্বাবধানে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। পুরূরবার ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর পুত্র আয়ু মুনি-ঋষি ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ বশংবদ হন। ব্রাহ্মণরাও পিতৃহারা আয়ুকে যথোচিত সান্ত্বনা প্রদান করে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে লক্ষণীয়, এই যজ্ঞে গন্ধর্বরাও দেবতা এবং পিতৃগণের সঙ্গে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে পূজিত হন—আর্নর্চুশ্চ যথাজাতি গন্ধর্বাদীন্ যথাবিধি। এ ব্যাপারটা পুরূরবার গন্ধর্ব হয়ে যাওয়ার একটা ফল কি না কে জানে? মর্যাদা লাভ করে গন্ধর্বরাও প্রতিদান দিয়েছেন তুল্যতায়। তাঁরা এই বিশাল যজ্ঞে সামগান করেন, নৃত্য পরিবেশন করেন অপ্সরারা— জগুঃ সামানি গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। অবশ্য সেকালের কোনও বিশাল যজ্ঞ ভূমিতে গন্ধর্বদের গান এবং অপ্সরাদের নাচ কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এবং তা থেকে কিছু প্রমাণও করা যায় না। কিন্তু প্রমাণ করার মতো বড় কিছু ঘটনা না হলেও গন্ধর্ব-অপ্সরাদের বিশেষ অংশগ্রহণ এখানে খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। অন্তত পুরূরবা-উর্বশীর জীবন-চর্চার নিরিখে বায়ুপুরাণে উল্লিখিত গন্ধর্ব-অপ্সরাদের মর্যাদা এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এখানে খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণই বটে।

পঁচিশ

কথায় বলে—নিজের নামে যে মানুষ জন-সমাজে পরিচিত, তিনিই সত্যিকারের কৃতী এবং উত্তম পুরুষ। যিনি পিতার নামে বিখ্যাত হন, তাঁকে মধ্যম আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে—স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামা তু মধ্যমঃ। মায়ের নামে যাঁর পরিচিতি, তাঁকে অধম বলেছেন নীতিশাস্ত্রকারেরা। চতুর্থ কোনও আখ্যা তাঁদের অভিধানে নেই, তবে ভাবে বুঝি—পুত্রের নামে যদি কেউ বিখ্যাত হন, তবে নীতিকারদের হাতে তাঁর বিশেষণ জুটত 'অধমাধম'।

নীতিকথার প্রসঙ্গ এল পুরূরবা-উর্বশীর পুত্র আয়ুর কথায়। আয়ু নিজে তেমন কোনও বিখ্যাত রাজা নন। পুরূরবার পুত্র হিসেবে তাঁকে বড় জোর মধ্যম মাপের পুরুষ বলা যেতে পারে। আর যদি তাঁর পুত্রের নাম করি তাহলে আয়ুকে এক্কেবারে 'অধমাধম' বলতে হবে। আয়ুর পুত্র নহুষ। মহাভারতের বিরাট পরিসরে নহুষ এতটাই বিখ্যাত রাজা যে তাঁর পরিচয়েই আয়ু খানিকটা বিখ্যাত হয়েছেন। আয়ুর পুত্র নহুষ বললে নহুষের মর্যাদা কিছু বাড়ে না। কিন্তু নহুষের পিতা আয়ু বললে নহুষের মর্যাদা নাই বাড়ুক, আয়ুর মর্যাদা তাতে বাড়ে। আয়ু রাজ্যে অভিষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্র এবং বল-বর্ণনা অন্য রাজার তুলনায় কিছুই হয়নি, উপরন্তু পৌরাণিকেরা আরম্ভেই বলেছেন— মুনিরা উর্বশীর সন্তান আয়ুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন এবং লোকে এই রাজাকে নহুষের বাবা বলে জানে— নহুষস্য মহাত্মানং পিতরং যং প্রচক্ষতে।

পৌরাণিক যেভাবে কথাটা বললেন তাতে আয়ুর মর্যাদা কিছু বাড়ল না, অর্থাৎ তাঁর অবস্থাটা প্রায় 'অধমাধম' গোছের হয়ে দাঁড়াল। এবারে উপরিউক্ত নীতিবাক্য এবং পৌরাণিকের কথার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতি-বক্তব্য পেশ করি। প্রথমেই বলি—সব মানুষই

বিখ্যাত হন না, হতে পারেন না। কিন্তু কীর্তিমান পুত্রের পিতা হওয়ার জন্য পিতার যে তপস্যা থাকে, যে প্রাণ থাকে সেই তপস্বী প্রাণটুকুকে অস্বীকার করি কী করে? শাস্ত্রে বলে উপযুক্ত এবং কৃতী সন্তানের জন্য পিতা-মাতাকে তপস্যা করতে হয়, ভাবনা করতে হয়। এই তপস্যা এবং ভাবনা শুরু হয় পুত্রজন্মের বহু পূর্ব থেকে এবং তা চলে সারা জীবন ধরে।

আমি যখন একেকটি বাবা-মাকে পরম আগ্রহে তাঁর সন্তানকে স্কুলে নিয়ে যেতে দেখি, পুত্র-কন্যার জন্য সারাদিন স্কুলবাড়ির আশে-পাশে বসে থাকতে দেখি, তাদের জন্য ভাবনা করতে দেখি, তখনই বুঝি সেই প্রাচীন তপস্যা চলছে। একশো জনের মধ্যে একটি সন্তান হয়তো ভবিষ্যতে কৃতী হবে, কিন্তু তার জন্য কল্যাণকামী পিতা-মাতার সম্ভাবনার পরম এবং চরম কষ্টকর তপস্যাকে অস্বীকার করি কী করে? কী করেই বা সেই অনামা পিতা-মাতাকে 'অধমাধম' বলি? মহামতি বিদ্যাসাগরের জন্য ঠাকুরদাস বা ভগবতী দেবী বিখ্যাত হয়েছেন হয়তো, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বীজ ছিল ওই জনক-জননীর তপস্যা, ভাবনা বা ইচ্ছার মধ্যে— ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে। এই জনক-জননীকে কোন যুক্তিতে আমরা 'অধমাধম' বলব?

আয়ুর মতো অনামা পিতার জন্য, আরও পরিষ্কার করে বলি— যে পিতা তাঁর অসাধারণ পুত্রের জন্যই শুধু বিখ্যাত, তাঁর জন্য কিছু সমব্যথা আছে আমার। নীতিশাস্ত্রকার একটি পুরুষকে কৃতী হওয়ার উদ্দীপনা জোগান দিতেই অমন নীতিবাক্য রচনা করেছেন, তা বেশ বুঝি, নইলে হাজারো অনামা জনক-জননীর তপস্যা থেকেই একটি বিবেকানন্দ, কি একটি বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। পুরূরবার পুত্র আয়ু এই রকমই অসহায় তপস্বী পিতার উদাহরণ। বস্তুত যে পৌরাণিক তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন—ওই যাঁকে নহুষের পিতা বলে লোকে বলে—এই উক্তির প্রতিবাদেই যেন অন্য এক পৌরাণিক আয়ুর কথা কিছু লিখেছেন। মহাভারত এবং অন্যান্য মহাপুরাণের উপেক্ষার জবাব দিতেই যেন আয়ুর এই কাহিনী। মুশকিল হল— ভাগ্যের এমনই চক্রান্ত যে, আয়ুর কথা সামান্য বলতে গেলেও আমাদের নহুষকে একবার ছুঁয়ে যেতে হবে।

তবে তারও আগে মনে রাখতে হবে—যে পুরাণ থেকে এই কাহিনী আমরা সংগ্রহ করেছি, তা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণ। দেখা যাচ্ছে—ত্রিলোকসুন্দরী পার্বতী একবার মহাদেবকে সপ্রেমে বলেছিলেন—আমাকে একবার নন্দন-কাননে নিয়ে যাবে? কাছে গিয়ে একবার দেখতে ইচ্ছে করে কেমন সে বন? মহাদেব তাঁর প্রমথগণ আর ভূতপ্রেতের বাহিনী সঙ্গে নিয়ে প্রেমানন্দে পার্বতীকে নন্দন-কাননে নিয়ে গেলেন। স্বর্গশোভার সার সেই অপূর্ব বনভূমি দেখে শিবপ্রিয়া পার্বতী একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। নন্দন-কাননের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হল মধ্যিখানে থাকা কল্পবৃক্ষটি। সে বৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। শিব বললেন—তোমার মনের যা অভিলাষ আছে, জানাও এই কল্পতরুর কাছে, তোমার বাসনা পূরণ হবে।

পার্বতী শিবের অনুমতি নিয়ে তরুরাজ কল্পদ্রুমের কাছে চেয়ে নেবেন বলে অসামান্য রূপবতী গুণবতী রমণীর ভাবনা করলেন মনে মনে। কল্পনামাত্রেই রূপে চারদিক আলো করে বেরিয়ে এল এক কন্যা। পার্বতীর ভাবনা আর কল্পতরুর ঋদ্ধি আত্মসাৎ করে সেই কন্যা এসে প্রণাম করল পার্বতীর পদ-দ্বন্দ্বে। পার্বতী বললেন—কল্পতরুর কাছে সত্যিই চেয়ে পাওয়া যায় কিনা— সে কৌতূহল আমার তৃপ্ত হল তোমাকে দেখে। তোমার নাম হবে অশোকসুন্দরী। জগতে তুমি আমার কন্যা বলে পরিচিত হবে—সর্বসৌভাগ্যসম্পন্না মম পুত্রী ন সংশয়ঃ।

পার্বতী কন্যাকে আশীর্বাদ করে বললেন— চন্দ্রবংশে ইন্দ্রতুল্য এক রাজা জন্মাবেন। তিনিই তোমার স্বামী হবেন—নহুষশ্চৈব রাজেন্দ্র স্তব নাথো ভবিষ্যতি।

রাম না জন্মাতেই রামায়ণ হয়ে গেল। নহুষের জন্মের কোনও লক্ষণই দেখিনি এতক্ষণ, কিন্তু জগজ্জননী তাঁর কল্পকন্যার স্বামী নির্ধারিত করে রাখলেন আগে থেকে। 'অশোকসুন্দরী' নামটার মধ্যে আধুনিকতা আছে বলেই বড় বেশি কাব্যগন্ধী। বস্তুত এই রকম একটা আধুনিক নাম মহাভারত কিংবা প্রাচীন পুরাণগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পদ্ম পুরাণ যেহেতু তুলনায় কিছু অর্বাচীন তাই নহুষের স্ত্রী হিসেবে অশোকসুন্দরীর নাম আমরা উপাখ্যানের তাড়নায় মেনে নিলাম। আরও একটা নাম গল্পের খাতিরেই আমাদের মেনে নিতে হবে। সেটি একটি পুরুষ-নাম। তাঁর নাম দৈত্যপতি হুণ্ড। পদ্ম পুরাণ এবং আরও দু-একটি পুরাণে হুণ্ড দৈত্যের মরণের কাহিনী বর্ণিত আছে। পণ্ডিতদের মতে হুণ্ড একটি ছোট উপজাতির নাম এবং হূণদের সঙ্গেও একে এক করে দেখা যেতে পারে। অনেকে আবার 'হুণ্ড' শব্দটাকে 'পৌণ্ড্র' শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করেন। পৌণ্ড্র অর্থ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের লোক, আর পুণ্ড্রবর্ধন মানে এখনকার বাংলাদেশের পাবনা-রাজশাহীর খানিকটা নিয়ে উত্তরবঙ্গ এলাকা। এই সব জায়গার লোককে সেকালের আর্য পুরুষেরা অসুর, রাক্ষস, বর্বরই বলতেন, যদিও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কম ছিল না। অতএব হুণ্ড কোনও বিজাতীয় লোক নন, অনার্য-জাতীয় কোনও প্রভাবশালী পুরুষ।

পদ্মপুরাণ বলেছে— হুণ্ড ছিলেন বিপ্রচিত্তির ছেলে। শিব-পার্বতীর কল্পকন্যা অশোকসুন্দরী যখন রূপের আলোয় নন্দন-কানন ভরিয়ে রেখেছেন, সেই সময় স্বেচ্ছাচারী হুণ্ড এসে প্রবেশ করলে সেই বনভূমিতে। অপরূপা রমণীরত্ন দেখে হুণ্ডের মাথাটাই ঘুরে গেল। অশোকসুন্দরীর কাছে আপন অন্তর্ভেদী কামনা প্রকাশের আগে সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—আমি বিপ্রচিত্তির ছেলে। শৌর্যে-বীর্যে এবং গুণে আমার মতো দ্বিতীয় কোনও সুলক্ষণ রাক্ষস নেই এই তিন ভুবনে। তোমাকে দেখেই আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত কামনায়। তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই এবং এ ব্যাপারে তোমার প্রসন্নতা চাই আমি—প্রসাদসুমুখী ভব। ভবস্ব বল্লভা ভার্যা মম প্রাণসমা প্রিয়া।

অশোকসুন্দরী শান্ত মনে হুণ্ড-দৈত্যকে নিজের অপার্থিব জন্মকথা শোনালেন। জানালেন শিব-পার্বতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। শেষ পর্যন্ত পার্বতীর নির্দেশ জানিয়ে অশোকসুন্দরী বললেন—আমার জন্মলগ্নেই জগজ্জননী পার্বতী আমার স্বামী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। চন্দ্রবংশে সর্বগুণসম্পন্ন রাজা নহুষ জন্মাবেন। তাঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, দৈত্যরাজ, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ, সে আসলে পরস্ত্রী। তুমি আর ভুল কোরো না, যাও এখান থেকে—অতঃ ত্বং সর্বথা হুণ্ড ত্যজ ভ্রান্তিমিতো ব্রজ।

দৈত্য বলল—যত সব গাঁজাখুরি কথা। যেমন তুমি, তেমনই তোমার দেবদেবীর কথা। চন্দ্রবংশে কবে নহুষ জন্মাবেন? আর কবে তুমি তার বউ হবে? বরের থেকে বউ বয়সে বড়—এ কি খুব ভাল কথা? মেয়েদের যতদিন যৌবন থাকবে, তারুণ্য থাকবে, ততদিনই তারা রূপবতী। তোমার এই রূপ-যৌবন একেবারে বৃথা যাবে। কবে মহারাজ আয়ুর পুত্র জন্মাবেন? কবে সে ছোট থেকে বড় হবে? আর কবে সে তোমাকে বিয়ে করার বয়সে পৌঁছবে—কদাসৌ যৌবনোপেতস্তব যোগ্যা ভবিষ্যতি। তার চেয়ে ওসব কল্পকথা, স্বপ্ন দেখা থাক। আমার সঙ্গে রসে-রমণে তোমার দিন কাটবে আরও ভাল— ময়া সহ বিশালাক্ষি রমস্ব ত্বং সুখেন বৈ। চলো তুমি।

AMARBOI.COM

একটা কথা এখনই বলে নেওয়া ভাল, কারণ পরেও এসব কথা আসবে। আমাদের বিশ্বাস—সেকালে যখন বয়সে বড় কোনও মেয়ের সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষের বিয়ে হত, তখনই এই ধরনের উপাখ্যান কিছু তৈরি হত। কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের বিয়ে হয়েছিল রেবতীর সঙ্গে এবং রেবতী বয়সে বড় ছিলেন। তাঁকে নিয়েও পুরাণ-ইতিহাসে অনুরূপ উত্তম উপাখ্যান রচিত হয়েছে, যার হাস্যরসাত্মক রূপ পরশুরামের লেখা "রেবতীর পতিলাভ"। যাই হোক, অশোকসুন্দরী নিজের পাতিব্রত্য প্রতিষ্ঠা করে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলেন হুণ্ডকে এবং অভিশাপের ভয়ও দেখালেন নাচার হয়ে। হুণ্ড আপাতত প্রস্থান করল বটে—কিন্তু ছলে, কৌশলে এবং মায়ায় সে অশোকসুন্দরীকে শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে এনে তুলল। অশোকসুন্দরী যখন বুঝলেন যে, তিনি অপহৃত হয়েছেন, তখন ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন—আমার স্বামীই তোকে মারবে। আরও বললেন—তোর মরার জন্য আমি তপস্যা করব। কথাটা বলেই অশোকসুন্দরী গঙ্গাস্নান করে গঙ্গার তীরে তপস্যায় বসে গেলেন আর অভিশপ্ত হয়ে হুণ্ড এসে মন্ত্রণায় বসল তার প্রধান মন্ত্রী কম্পনের সঙ্গে। সব কথা মন্ত্রীর কাছে খুলে বলতেই মন্ত্রী কম্পন বললেন—আয়ুর পুত্র নহুষকে আর জন্মাতে হবে না। হয় গর্ভিণী অবস্থায় আয়ুর স্ত্রীকে আমরা হরণ করব এবং ভয় দেখিয়ে তাঁর গর্ভপাত ঘটাব, নয়তো নহুষ জন্মালে তাকে তুলে এনে মেরে ফেলব। মন্ত্রী দৈত্যরাজকে অভয় দিয়ে নিজের কাজে নেমে পড়ল।

অশোকসুন্দরীর জন্মকথা থেকে আরম্ভ করে হুণ্ড-দৈত্যের কুমন্ত্রণা পর্যন্ত ঘটনা আমরা না বললেই পারতাম। কারণ, এ কাহিনী অর্বাচীন এবং হয়তো এসব ঘটনা ঘটেওনি। অপি চ নহুষের জন্মও হয়নি এখনও, কিন্তু কাহিনীটি এই জন্যই শুধু বলতে হচ্ছে যে, পুরূরবার পুত্র আয়ু তাঁর পুত্রজন্মের জন্য কী করেছিলেন? এ ঘটনাও মহাভারতে নেই; কিন্তু নহুষের কীর্তি-কাহিনী যেহেতু মহাভারতে বারবার বলা হয়েছে, তাই নহুষের জন্মের মধ্যে তাঁর পিতার তপস্যাটুকু আমরা শুনে নিতে চাই। আর শুনে নিতে চাই এইজন্য যে, পিতা-মাতার হাজারো সম্ভাবনা থাকলেও পুত্রের জীবন-চর্চা কত ভিন্নতর হয়, সেটা এই কাহিনী থেকে বোঝা যাবে।

আগেই বলেছি—পুরূরবার পুত্র আয়ু ছিলেন ধর্মাত্মা। দান-যজ্ঞ, ব্রত-হোমেই তাঁর দিন কেটে যেত। কিন্তু ধর্ম-কর্ম, রাজকার্যে অনেক ধ্যান দিয়েও তাঁর মন ভাল থাকে না। তিনি পুত্রহীন। যাঁকে তিনি বিবাহ করেছেন তিনি যথেষ্টই সুলক্ষণা রমণী এবং স্বামীর উপযুক্তা সহধর্মিণী। মহাভারতে তাঁর নাম স্বর্ভানবী। এটা ঠিক নাম নয়, এর মানে তিনি স্বর্ভানু রাজার কন্যা। পৌরাণিকেরা তাঁকে কেউ ইন্দুমতী বলে ডেকেছেন, কেউ বা ডেকেছেন প্রভা বলে। নাম যাই হোক, আয়ুপত্নী স্বর্ভানবীর কোলে ছেলে নেই—রাজা-রানির তাই বড় দুঃখে দিন কাটে। পুত্রলাভের জন্য নানা প্রযত্ন করেও যখন আয়ুর ছেলে হল না, সেই সময়ে একদিন তিনি দত্তাত্রেয় মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় অত্রির পুত্র এবং অনেক পুরাণেই তাঁকে ভগবানের অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেকালের মহর্ষি-দেবর্ষিদের মধ্যে অনেক সময়েই লোকাতীত মহিমা এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এবং তথাকথিত অসংযমের সংমিশ্রণ দেখা যেত। লোক-সংস্রব ত্যাগ করার জন্যই হোক অথবা স্বেচ্ছাকৃতই হোক, এই অশোভন অসংযম তাঁদের অন্তর বিচলিত

AMARBOI.COM

করত না। ভারতবর্ষে সাধু-মহাত্মাদের এই লোক-জুগুপ্সিত আচরণ অনেকভাবে দেখা যায়। যাঁর যেরকম দৃষ্টি। মহারাজ আয়ু ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি দত্তাত্রেয়র আশ্রমে এসে দেখলেন—তিনি স্ত্রী-পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। তাঁর চক্ষু দুটি মদিরারুণ। তিনি হাসছেন, গাইছেন মোদো-মাতাল লম্পটের মতো—গায়তে নৃত্যতে বিপ্রঃ সুরাঞ্চ পিবতে ভৃশম্। কাঁধে-ঝোলা যজ্ঞোপবীত খুলে পড়ে গেছে কখন, বেশ-ভূষাও মোটেই মুনিজনোচিত নয়। মহর্ষি দত্তাত্রেয়র এ কী রূপ?

রাজা আয়ু শ্রদ্ধা হারালেন না। তিনি সমাহিতচিত্তে মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনি রাজার সঙ্গে একটাও কথা বললেন না। সদাচার আতিথ্য সব যেন তিনি ভুলে গেছেন। দেশের রাজা এসেছেন তাঁর কাছে—এসব কথা গ্রাহ্য না করে, তাঁকে অনাদর করেই যেন তিনি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বিলাস ছেড়ে ধ্যানমগ্ন হলেন। রাজা কোনও কথা বলারই সুযোগ পেলেন না। রাজা বহুদিন সেই আশ্রমে বসে থাকলেন— কবে মুনির ধ্যান ভাঙবে সেই আশায়। বসেই রইলেন, বসেই রইলেন, মুনি তবু নির্বিকারচিত্ত, ধ্যানমগ্ন। বহুদিন পর দত্তাত্রেয় মুনির বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। তখনও রাজা তাঁর আশ্রমে বসে আছেন দেখে মুনি বললেন—মহারাজ! আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? ব্রাহ্মণের আচার আমি কিছুই পালন করি না। নারী-সঙ্গ, সুরাপান এবং মাংস-ভক্ষণ আমার অন্তরঙ্গ বিলাস। আপনাকে কোনও বর দেওয়ার শক্তিও আমার নেই। আপনি বরং উপযুক্ত অন্য কোনও মহৎ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করুন—বরদানে ন মে শক্তিরন্যং শুশ্রূষ ব্রাহ্মণম্।

www.amarboi.com

আয়ু বললেন—মুনিবর! আপনার থেকে শ্রেষ্ঠতর কোনও ব্রাহ্মণ আমার জানা নেই। আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে আমি মনে করি। দত্তাত্রেয় রাজার কথায় একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন—তাহলে আমার কথা শোনো—আমার এই নর-কপালের পাত্রে মদ এনে দাও, আর রান্না-করা মাংস নিয়ে এসো আমার জন্য—কপালে মে সুরাং দেহি পাচিতং মাংসভোজনম্। রাজা অসীম শ্রদ্ধায় কালবিলম্ব না করে মুনিকে সুরা-মাংস এনে দিলেন। দত্তাত্রেয় ভেবেছিলেন—অনাচার-কু-আচার করতে দেখলেই রাজার ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু স্থিরচিত্ত আয়ু সব কাজ সমাধা করলেন দ্বিধাহীনভাবে, সশ্রদ্ধে।

দত্তাত্রেয় খুশি হলেন এবার। বললেন—বর চাও, রাজা! তোমার যা মনে চায়, বলো। রাজা বললেন—আমার একটি পুত্র চাই, মুনিবর! সর্বজ্ঞ সর্বগুণান্বিত দেব-দানবের অজেয় একটি পুত্র চাই—পুত্রং দেহি গুণোপেতং সর্বজ্ঞং গুণসংযুতম্। মুনি রাজরানি ইন্দুমতীকে দেবার জন্য রাজার হাতে একটি ফল দিলেন আর বললেন—যেমন চেয়েছ, সেইরকম অমিত শক্তিধর পুত্র লাভ করবে তুমি। সে হবে ইন্দ্রের তুল্য সার্বভৌম রাজা।

মহারাজ আয়ু রাজপ্রাসাদে এসে মুনিদত্ত ফল খেতে দিলেন ইন্দুমতীকে। সময়ে তিনি গর্ভ ধারণ করলেন। পদ্মপুরাণের উপাখ্যানে এরপর রীতিমতো হিন্দি সিনেমার 'প্লট' আছে। নহুষের জন্ম হল ইন্দুমতীর গর্ভে। হুণ্ড-দৈত্যের নিজের মেয়ে ইন্দুমতীর বাড়ির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি দত্তাত্রেয়র আশীর্বাদ এবং ইন্দুমতীর গর্ভধারণের খবর শুনতে পেল। হুণ্ড নিজপুত্রীর মুখে ইন্দুমতীর গর্ভ-সঞ্চারের খবর শুনে বিশ্বস্ত লোক পাঠালেন গর্ভ নষ্ট করার জন্য। কিন্তু বহুকাল পুত্রহীন অবস্থায় থেকে পরিণত বয়সে পুত্রের সম্ভাবনা হলে পিতা-মাতা গর্ভ রক্ষায় যে যত্ন নেন, আয়ুও রাজবাড়িতে ইন্দুমতীর গর্ভরক্ষার কারণে তেমনই নিবিড় সুরক্ষা-ব্যবস্থা চালু করলেন। হুণ্ডের চক্রান্ত ব্যর্থ হল—বিফলো দানবো জাত উদ্যমশ্চ নিরর্থকঃ।

ইন্দুমতী রাত্রিকালে পুত্র প্রসব করলেন। শুভলক্ষণ পুত্র জন্মাল বটে, কিন্তু ছিদ্রান্বেষী দৈত্য তালে তালেই ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মঙ্গল-উচ্চারণকারিণী এক দুষ্টা দাসীর মাধ্যমে হুণ্ড-দৈত্য আয়ু-ইন্দুমতীর শিশুপুত্রটিকে হরণ করে নিয়ে এল। রাজবাড়িতে এনে হুণ্ড তার স্ত্রী বিপুলাকে বলল—এই শিশুটি আমার শত্রু। রাঁধুনে ঠাকুরকে বলো—এই বাচ্চাটিকে কেটে রান্না করে আমাকে পরিবেশন করতে। সুন্দর ছোট্ট শিশুটিকে দেখে দৈত্যরানি বিপুলার প্রথমে বেশ মায়াই হল। স্বামীকে সে একবার বললও— সে কী মহারাজ? এই দুধের বাছাকে চিবিয়ে খাবার ইচ্ছে হল কেন তোমার—পুনঃ পপ্রচ্ছ ভর্তারং কস্মাদ্ ভক্ষসি বালকম্? পরে যখন সে শুনল যে, এই শিশুপুত্রের মৃত্যু না হলে তাঁর স্বামীর মৃত্যু অনিবার্য, তখন সে গিয়ে তার চুল-বাঁধার দাসী মেকলাকে বলল—যা গিয়ে এই বাচ্চাটিকে দিয়ে আয় রাঁধুনে ঠাকুরের হাতে। একে কেটে সে যেন রান্না করে নিয়ে আসে, মহারাজ খাবেন—হুণ্ডভোজনহেতবে।

সৈরিন্ধ্রী মেকলা পাচকের হাতে শিশুপুত্র দিয়ে রাজাদেশ জানাল। পাচক কঠিন নিষ্ঠুর মানুষ, রাজার ভোজনের জন্য সে বহু প্রাণী জবাই করেছে নিজের হাতে। আয়ুপুত্র ছোট্ট শিশুটিকে কাটার জন্যও সে খড়্গ উঠিয়েছিল। কিন্তু খড়্গ উঁচু করতেই নিরীহ অবোধ শিশুর মুখে ভেসে উঠল মধুর এক ঝলক হাসি। শিশুর মুখে মিষ্টি হাসি দেখে পাচক-ঠাকুরের মন একেবারে গলে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সৈরিন্ধ্রী মেকলা। সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর আয়ুপুত্রের শিশু-মুখখানিতে ফুটফুটে অবোধ হাসির স্বচ্ছতা দেখে মেকলা-সৈরিন্ধ্রীর মন বিচলিত হল। সে পাচককে সাবেগে অনুরোধ জানাল—বাচ্চাটাকে মেরো না, ঠাকুর। না জানি এমন দিব্যলক্ষণসম্পন্ন ছেলে কার ঘরে জন্মেছে?

পাচক সৈরিন্ধ্রী মেকলার কথা শুনল এবং দুজনেই মায়াপরবশ হয়ে আয়ুর শিশুপুত্রটিকে রক্ষা করল সযত্নে। রাত্রি আঁধার হয়ে এল। হুণ্ড-দৈত্য রাতের খাবার খাবে। পাচক-ঠাকুর নিজে হাতে একটি হরিণ মেরে নিয়ে এল। সেই হরিণের মাংস রান্না করে হৃত শিশুর মাংস বলে হুণ্ড-দৈত্যকে খেতে দিল। এদিকে রাজ-অন্তঃপুরের সৈরিন্ধ্রী মেকলা শিশুটিকে কোলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পথ চলতে চলতে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে পৌঁছল। সমস্ত আশ্রম তখন শান্ত প্রসুপ্ত। মেকলা বশিষ্ঠ-মুনির কুটীর-দ্বারে শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে চলে এল নিজের বাড়িতে।

হরিণের মাংস খেয়ে হুণ্ড ভাবল— নহুষকে সে খেয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে বশিষ্ঠ মুনি কুটীর-দ্বারে পরিত্যক্ত নহুষকে পরম আদরে তুলে নিলেন মানুষ করার জন্য। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন— মহাত্মা আয়ুর পুত্র তাঁর আশ্রমে পরিত্যক্ত হয়েছেন। তিনিই আয়ুর শিশু-পুত্রের নাম রাখলেন নহুষ। তিনি বলেছিলেন—বালক অবস্থাতেও তোমাকে, 'হুষিত' করা যায়নি অর্থাৎ পরাভূত করা যায়নি বলেই তোমার নাম হল নহুষ —হুষিতো নৈব কেনাপি বালভাবে নরাধিপ। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে মানুষ হতে থাকলেন আয়ুপুত্র নহুষ। শুধু বেদবিদ্যাই নয়, অন্য সমস্ত শাস্ত্র এবং অস্ত্র-শস্ত্রের সমস্ত কৌশল শিখে নহুষ অদ্বিতীয় ধনুর্ধর হয়ে উঠলেন।

যেদিন আয়ুর বাড়ি থেকে নহুষ হারিয়ে গেলেন, সেদিন থেকেই নহুষের মা ইন্দুমতীর দিন আর কাটে না। এতদিন তিনি পুত্রহীনা ছিলেন, সেও এক রকম ছিল। কিন্তু পুত্রমুখ দেখার পর সে পুত্র হারিয়ে গেলে কোন জননী সইতে পারেন? রানি চোখের জল রাখতে পারেন না। দিন-রাত তিনি শুধু কাঁদেন আর ভাবেন কবে তাঁর ছেলে ফিরে আসবে। ওদিকে নহুষ মানুষ

www.amarboi.com

হচ্ছেন বশিষ্ঠের বাড়িতে। বহুকাল পরে ইন্দুমতীর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন দেবর্ষি নারদ। সেকালের দিনে সংবাদ পাওয়ার সবচেয়ে বড় উৎস ছিলেন মুনি-ঋষিরাই। তাঁরা যজ্ঞ-দান উপলক্ষে অন্য মুনি-ঋষিদের আশ্রমে যেতেন, আর যেতেন ভারতবর্ষের নানা তীর্থক্ষেত্রে। সংবাদ জোগাড় হয়ে যেত স্বাভাবিক ভাবেই। নারদ এসে ইন্দুমতীকে বললেন—তাঁর ছেলে বশিষ্ঠের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। তার জন্য কোনও চিন্তা নেই। নারদ আস্তে আস্তে অশোকসুন্দরীর প্রাণান্তকর তপস্যার কথা, হুণ্ড-দৈত্যের চক্রান্ত এবং নহুষের শক্তিধর হয়ে ওঠার সমস্ত বিবরণ দিলেন ইন্দুমতীকে। তিনি আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, তাঁর প্রিয় পুত্রটি আবার ফিরে আসবে—আগমিষ্যন্তমাজ্ঞায় নহুষং তনয়ং পুনঃ।

নহুষ বশিষ্ঠের আশ্রমে অস্ত্রশিক্ষা এবং বিদ্যাশিক্ষায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তিনি চন্দ্রবংশীয় মহারাজ আয়ুর পুত্র এবং ইন্দুমতী তাঁর জননী। একদিন বশিষ্ঠ নহুষকে আদেশ দিলেন—বাছা! বনে যাও তো একবার। ফলমূল যা পাও নিয়ে এসো । নহুষ গেলেন বনে। সেখানে গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন—কারা যেন বলছে—এই নহুষ হলেন আয়ুর ছেলে। এই ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে মরছেন এঁর জননী ইন্দুমতী। শিবসুতা অশোকসুন্দরী তপস্যা করছেন এই নহুষের জন্যই। সব শুনে নহুষ ফলমূল নিয়ে উপস্থিত হলেন বশিষ্ঠের আশ্রমে এবং সত্য যাচাই করে নিলেন মুনির কাছে। মুনি প্রথম থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন নহুষকে এবং তাঁকে প্ররোচিত করলেন— হুণ্ড-দৈত্যকে বধ করে তপস্বিনী অশোকসুন্দরীকে উদ্ধার করার জন্য।

নহুষ ইন্দ্রদত্ত রথে চড়ে রওনা দিলেন কার্যসিদ্ধির জন্য। অশোকসুন্দরীর সঙ্গেই তাঁর প্রথম দেখা হল। তারপর হুণ্ড-দৈত্যকে হত্যা করে নহুষ অশোকসুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন। সেই আশ্রমেই বিধিমতো তাঁদের বিয়ে-থা হয়ে গেল। নহুষ এবার নব বিবাহিতা বধূকে নিয়ে পৌঁছলেন বাবা-মায়ের কাছে। মহারাজ আয়ু এবং ইন্দুমতীর আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল স্নেহে, মানে, দানে। বীর পুত্রের সাহায্যে আয়ু তাঁর পিতৃদত্ত রাজ্য আরও সুদৃঢ় করে নিলেন। বয়স পরিপক্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দান-যজ্ঞ, ব্রত-নিয়মেই আয়ুর দিন কাটতে লাগল। তারপর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল আয়ু-ইন্দুমতীর জীবনে, তখন চন্দ্রবংশের অধস্তন নহুষই রাজা হলেন।

আরও একবার জানাই, নহুষের জন্মলগ্নেই লৌকিক-অলৌকিক নানা ঘটনার এই বিচিত্র উপন্যাস মহাভারতে নেই। বরং মহাভারতে চন্দ্রবংশের অধস্তন হিসেবে নহুষই বোধহয় প্রথম ব্যক্তিত্ব, যাঁর মধ্যে চন্দ্র কিংবা বুধের দেব-ধর্ম নেই, অতিলৌকিক জগতের সঙ্গে পুরূরবার যে মিলন-সাংকর্য, তাও নেই। ঐল পুরূরবার পুত্র আয়ু ধর্মাত্মা পুরুষ, নির্বিরোধী ব্যক্তিত্ব। রাজা হিসেবে তিনি বিরাট কিছু ছিলেনও না। কিন্তু নহুষ পরম বিক্রান্ত রাজা। এমন একজন রাজার জন্ম-বৃত্তান্ত একেবারে সামান্য এবং লঘু-জনোচিত হবে— এ কথা পুরাণকারেরা ভাল করে মানতে পারেননি। নহুষের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির নিরিখে আমরাও পৌরাণিকদের বৃত্তান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করলাম এবং তা করলাম এইজন্যে যে, এরমধ্যে নহুষের জন্মের মাহাত্ম্যের থেকেও ঐল পুরূরবার পুত্র আয়ুর সন্তানের তপস্যাটাই মূল্যবান। কৃতী সন্তানের জনক হিসেবে আয়ু যে মোটেই কোনও 'অধমাধম' ব্যক্তিত্ব নন, সেটা বোঝানোর জন্যই এই নহুষ-কাহিনীর অবতারণা।

AMARBOI.COM

ছাব্বিশ

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ভাইদের সঙ্গে বিশাখ-যূপ নামে একটি বনে বাস করছেন। এই কিছুদিন আগে অর্জুন মহাদেবকে তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র নিয়ে, ইন্দ্র-ভবন ঘুরে বাড়ি ফিরেছেন। সবার মনে তাই ভারি খুশি খুশি ভাব। মধ্যম পাণ্ডব ভীম তো আনন্দে শিকার করতেই বেরিয়ে পড়েছেন। সুস্থ এবং স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল উদ্দাম বালকের মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি থাকে, সেই প্রাণশক্তিই দুষ্টুমির আকার নেয়। সেই দুষ্টুমি যেমন কোনওভাবেই বালক চেপে রাখতে পারে না, ভীমের অতিলৌকিক শক্তিও তেমনই তাঁকে কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে দেয় না। তিনি এ বনে-সে বনে হরিণ-বরাহ মেরে, গাছ উপড়ে, ডাল ভেঙে সমস্ত বনভূমি যেন তোলপাড় করে তুললেন। হিমালয় সন্নিহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যুধিষ্ঠিরকে যেখানে আরও নিবিষ্ট করে রেখেছে, সেখানে ওই একই সৌন্দর্য ভীমকে আরও পাগল করে তুলেছে। বৃক্ষভঙ্গ, পশুমারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কখনও দৌড়ানো, কখনও দাঁড়ানো, কখনও হাততালি কখনও বা বিনা কারণে গর্জনও চলছে—ক্বচিৎ প্রধাবংস্তিষ্ঠংশ্চ ক্বচিচ্চোপবিশংস্তথা।

বনের পথে চলতে চলতে ভীম মহাবনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে গুহার মধ্যে দেখলেন এক বিশাল অজগর সাপ। বিশাল তার শরীর, বিচিত্রবর্ণ, মুখখানা বড় এবং তামাটে। ক্ষণিকের মধ্যে সেই অজগর ভীমকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ভীমের নড়বার শক্তিও রইল না। ভীম নিজের অসহায়তায় নিজেই অবাক হলেন। মহাসর্পকে বললেন—আপনি কোনও দেবতার বরলাভ করেছেন, নাকি কোনও বিদ্যা জানা আছে আপনার—কিন্নু বিদ্যাবলং কিম্নু বরদানমথো তব? নইলে রাক্ষস, পিশাচ, নাগ—কেউই আমার শক্তি সহ্য করতে পারে না। সেখানে আমি চেষ্টা করেও আপনাকে কিছুই করতে পারছি না।

সর্প বলল— ভাগ্যবশে আজ তুমি আমার আহার নির্দিষ্ট হয়েছ। তবে সত্যিই আমি

আসলে কোনও সাপ নই। ব্রাহ্মণের অভিশাপে আজ আমার এই অবস্থা। এবারে ভীমকে সম্পূর্ণ অবাক করে দিয়ে অজগর মনুষ্যকণ্ঠে বলল— আমি তোমারই পূর্বপুরুষ। রাজর্ষি নহুষের নাম তোমার কানে এসে থাকবে। আমি তোমার বহু পূর্বপুরুষ আয়ুর পুত্র নহুষ—তবৈব পূর্বঃ সর্বেষামায়োর্বংশধরঃ সুতঃ।

ভীম এই মহাসর্পের হাত থেকে মুক্তি পাননি এবং জীবন সম্বন্ধে এই সময়ে তাঁর মুখ দিয়ে রীতিমতো দার্শনিক কথাবার্তা বেরিয়েছে। ভীম ফিরছেন না দেখে যুধিষ্ঠিরকে ওই সর্পগুহায় উপস্থিত হতে হয়েছিল। রক্ষার উপায়-চেষ্টাহীন ভীমকে সর্পবেষ্টিত অবস্থায় দেখে যুধিষ্ঠিরের মনেও ওই একই প্রশ্ন উদয় হল—আপনি কি দেবতা, দৈত্য, নাকি সত্যিই এক মহাসর্প? অজগরের দিক থেকে আবারও সেই একই উত্তর—আমি নহুষ। তোমারই পূর্বপুরুষ। ভগবান চন্দ্র থেকে পঞ্চম পুরুষ আমি নহুষ, আয়ুর পুত্র—প্রথিতঃ পঞ্চমঃ সোমাদায়োঃ পুত্রো নরাধিপ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং আপন বিক্রমে এই তিন ভুবনের অধিকার লাভ করেছিলাম। তারপর ব্রাহ্মণের অভিশাপে আমার এই অবস্থা। তবে সাপই হই, আর যাই হই, আমার মাথাটা কিন্তু ঠিক আছে। পূর্বের স্মৃতি আমার কিছু নষ্ট হয়নি।

যুধিষ্ঠির বেশি বিস্তারের মধ্যে যাননি। কবে, কোথায়, কেন—এ সব প্রশ্নে তাঁর অভীষ্টসিদ্ধিতে বড় দেরি হয়ে যাবে। সর্প তার সর্পত্বের কারণ বলেছে সংক্ষেপে। যুধিষ্ঠির আর কিছু শুনতে চান না। প্রিয় ভাইটিকে তাঁর বাঁচাতে হবে এবং বাঁচানোর উপায় একটিই। সর্প বলেছে— যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবেই তোমার ভাই মুক্তি পাবে আমার হাত থেকে। যুধিষ্ঠির কালবিলম্ব না করে বলেছেন— ব্রূহি সর্প—আপনি বলুন। চেষ্টা করে দেখি, যদি আপনার প্রীতি হয় তাতে —অপি চেচ্ছক্নুয়াং প্রীতিমাহর্তুং তে ভুজঙ্গম।

কিন্তু এই মহাসর্পের প্রশ্ন বড় অদ্ভুত। তাঁর জিজ্ঞাসা— ব্রাহ্মণ কাকে বলে? যুধিষ্ঠির যখন পূর্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছেন অথবা এখন যে বনবাসে আছেন অথবা তাঁর জন্ম থেকে এই বনবাসের বয়স পর্যন্ত তিনি কম ব্রাহ্মণ দেখেননি। ব্রাহ্মণের চরিত্র, গুণ এবং হৃদয় কেমন হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর শাস্ত্রীয় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানও কিছু কম নেই। এখানে লক্ষণীয় বিষয় আছে আরও দুটি। যিনি প্রশ্ন করেছেন— ব্রাহ্মণ কাকে বলে—ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্—তিনি পূর্বসংস্কারে চন্দ্রবংশীয় রাজা হলেও এখন নাগ-জনজাতির একতম পুরুষ— প্রায় শূদ্রসংজ্ঞক। যাঁকে তিনি প্রশ্ন করছেন তিনি আগে রাজা ছিলেন এবং এখন তিনি বনবাসের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। উপরন্তু এখন তাঁর নাচার অবস্থা। তাঁর ভাইকে এই মহাসর্প আটকে রেখেছে। ভাইয়ের মুক্তিপণ এই প্রশ্ন—ব্রাহ্মণ কাকে বলে আগে বলুন।

একজন রাজা হিসেবে যুধিষ্ঠিরের সবচেয়ে বেশি সংস্রব ঘটেছে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একে অন্যতরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জাতি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের চেয়ে উচ্চবর্ণ বটে, কিন্তু মহাভারতের সময়ের রাজনীতি এবং সমাজের রীতিতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সব সময় ওঠা-বসা, বিবাহ, একে অপরের বৃত্তি গ্রহণ—সবই চলে। অতএব অন্য সময়ে যদি যুধিষ্ঠিরের কাছে এই প্রশ্ন আসত— তবে ব্রাহ্মণমাত্রেরই প্রশংসা বেরুত তাঁর মুখ দিয়ে। কিন্তু এখন তাঁর সময় ভাল নয়। তাঁর ভাই অসীম বলশালী বৃকোদর এই মহাসর্পের আক্রমণে নিষ্ক্রিয়। তাঁকে বাঁচাতে হবে—অতএব তাঁর অভিজ্ঞতায় এবং মননে সবচেয়ে নিরপেক্ষ উত্তরটি এই সময়েই বেরিয়ে আসবে।

আজকের দিনে সাধারণ সময়ে একজন মন্ত্রীর সচিবের মুখে মন্ত্রীর সম্বন্ধে কোনও

AMARBOI.COM

নিন্দাবাক্য শুনবেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি যদি বিপদে পড়েন, তাঁর যদি আত্মরক্ষা বা পরিবার-রক্ষার তাগিদ বড় হয়ে ওঠে, তখন তাঁর মুখে তাঁরই বিভাগীয় মন্ত্রী সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মন্তব্য শুনতে পাবেন। এখানেও সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্রবংশের মহান রাজা নহুষ সর্প হবার অভিশাপ লাভ করেছেন নিজের দোষে ব্রাহ্মণদের চটিয়ে। সে দোষ তিনি স্বীকারও করেন। কিন্তু কী এমন ঘটল, যাতে চিরকাল এই লোক-জুগুপ্সিত অবনমন বয়ে বেড়াতে হবে তাঁকে? যিনি প্রশ্ন করছেন, তিনি সোমবংশের পঞ্চম পুরুষ লুপ্তস্মৃতি পূর্বের নহুষই কিনা, সেকথা পরে। কিন্তু তিনি নিজে রাজা থাকার সময়ে ব্রাহ্মণদের কম লক্ষ্য করেননি এবং এখন অভিশপ্ত নাগ হয়েও তাঁর সততা এবং চরিত্রগুণ হয়তো ব্রাহ্মণের চেয়ে কিছু কম নয়। অতএব তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্রাহ্মণত্বের সংজ্ঞা জানতে চাইছেন। অবশ্য তার আগে আয়ুপুত্র নহুষ কী ছিলেন এবং কেনই বা এই অবস্থায় পতিত—সেটা আমাদের জেনে নিতে হবে।

মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী আয়ু এবং স্বর্ভানবীর প্রথম পুত্র নহুষই বটে, কিন্তু তিনিই একমাত্র পুত্র নন। নহুষের পরে আয়ুর আরও চারটি পুত্রের নাম আমরা মহাভারতে পাই। তাঁরা হলেন—বৃদ্ধশর্মা, রজি, গয় এবং অনেনা— স্বর্ভানবীসুতানেতান্ আয়োঃ পুত্রান্ প্রচক্ষতে। পুরাণগুলিতে নহুষ, রজি এবং অনেনার নাম নিয়ে কোনও গন্ডগোল নেই, কিন্তু বৃদ্ধশর্মা কোথাও ক্ষত্রবৃদ্ধ হয়েছেন, এবং গয় হয়েছেন রম্ভ। রম্ভের কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না। অনেনা এবং ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে বহু বিখ্যাত রাজা আছেন, মহা-মহা ঋষিও আছেন। আপাতত সেই বংশ-পরম্পরায় আমরা যাচ্ছি না। নহুষের কনিষ্ঠ রজিও পরম বিখ্যাত রাজা ছিলেন। দেবতা-অসুরদের যুদ্ধে তিনি কোন পক্ষে থাকবেন— এই নিয়ে এক সময়ে দুপক্ষেরই চরম দুর্ভাবনা গেছে। আমরা সেই উপাখ্যানের মধ্যেও যাচ্ছি না। আমরা নহুষের জন্ম-বৃত্তান্ত পুরাণ থেকে সংগ্রহ করে পূর্বেই উপস্থাপিত করেছি। এখন দেখতে হবে তাঁর রাজত্ব বিপন্ন হল কী করে?

AMARBOI.COM

পূর্বোক্ত পুরাণের ঘটনা যদি সঠিক হয়, তবে নহুষের রাজপদ লাভ করতে কিছু দেরি হয়ে থাকতে পারে। নহুষের অন্য ভাইদের মধ্যে অতি বিখ্যাত রজি এবং তাঁর পুত্রেরা (যাঁরা 'রাজেয়' বলে খ্যাত) হয়তো অন্য কোথাও রাজত্ব করতেন। কিন্তু নহুষ পিতার রাজ্যেই অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তবে নহুষের জীবনে তাঁর পিতৃদত্ত রাজ্যের অধিকার খুব বড় কথা নয়। বড় কথা হল-তাঁকে স্বর্গ রাজ্যের রাজা করা হয়েছিল। তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন এবং তা করেছিলেন কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত না ঘটিয়ে। তাঁকে ইন্দ্রত্বে বরণ করা হয়েছিল। মহাভারতের কবি যেখানে প্রথম নহুষের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন, সেখানে বলেছেন— আয়ুর পুত্র নহুষ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তাঁর প্রধান পরাক্রম ছিল তাঁর সত্যনিষ্ঠা। নহুষ তাঁর রাজকীয় বীরত্ব, ধর্মবুদ্ধি এবং সত্যনিষ্ঠার পরাক্রমেই এক বিশাল ভূমিখন্ড শাসন করতেন— রাজ্যং শশাস সুমহদ্ ধর্মেণ পৃথিবীপতে। পরবর্তী সময়ে নহুষ নিজেও যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন—যজ্ঞ, তপস্যা এবং দৈনন্দিন ব্রাহ্ম সংস্কার বেদপাঠ আমার জীবনের অঙ্গ ছিল। আদর্শ রাজার পক্ষে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের যতখানি প্রয়োজনীয়তার কথা পন্ডিতেরা বলেন, সেই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের বৃত্তি আমার স্বাভাবিক ছিল—ক্রতুভিস্তপসা চৈব স্বাধ্যায়েন দমেন চ।

এই সমস্ত সদ্গুণ এবং জিতেন্দ্রিয়তার কারণেই হয়তো নহুষের ডাক পড়েছিল স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রত্ব করার জন্য। স্বর্গের দেবতাদের ওপর রাজত্ব করার আহ্বান মর্ত্যভূমির রাজার কাছে সাধারণত আসে না, কিন্তু নহুষের অতিলৌকিক চরিত্রগুণেই হয়তো সেই আহ্বান নেমে

এসেছিল নহুষের কাছে। স্বর্গরাজ্যে তখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত তাঁর প্রিয় দেবভূমি শাসনের যোগ্যতা হারিয়েছিলেন; কিন্তু নহুষের মধ্যে সেই যোগ্যতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, যার জন্য তাঁকে বরণ করা হয়েছিল স্বর্গের রাজত্বে।

ইন্দ্রের চিরশত্রু বৃত্রাসুর তখন সবে মারা গেছেন। কিন্তু বৃত্রহত্যার মধ্যে এমন কিছু অন্যায় ছিল, যাতে ইন্দ্রের মনে মিথ্যাচারের অনুতাপ ছিল— অনৃতেনাভিভূতো' ভূচ্ছক্রঃ পরমদুর্মনাঃ। শুধু এই মিথ্যাচারই নয়, পূর্বকৃত অন্যায় আরও কিছু ছিল, যা দিন দিন ইন্দ্রের মনঃপীড়া বাড়িয়ে তুলল। তিনি স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন জগতের সীমার প্রান্তে, বাস করতে থাকলেন জলের মধ্যে সাপের মতো—প্রতিচ্ছন্নো' বসচ্চাপ্সু চেষ্টমান ইবোরগঃ।

উপমাটা খেয়াল করলেন নিশ্চয়—দেবলোক থেকে পতিত হয়ে ইন্দ্র বাস করছেন জলে, সাপের মতো। উপমাটা পরে আমাদের কাজে লাগবে স্বয়ং নহুষের পরিচয় বোঝানোর জন্য। ইন্দ্রের পলায়নে দেবরাজ্যে অরাজকতা দেখা দিল। অন্যান্য দেবতারা, মহর্ষিরা রীতিমতো ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলেন—দেবাশ্চাপি ভৃশং ত্রস্তাস্তথা সর্বে মহর্ষয়ঃ। বেশিদিন তো এইভাবে চলতে পারে না। নেতা না থাকার ফলে সবই বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। স্বর্গভূমি বিধ্বস্ত, বনভূমি শুষ্ক, নদীর স্রোত রুদ্ধ। রাজা না থাকলে প্রকৃতির রাজ্যে এই বিপর্যয় বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু সেকালের দিনে অরাজক অবস্থা হলেই কবিরা এইরকম বর্ণনা দিতেন। ভূমির্বিধ্বস্তসঙ্কাশা নির্বৃক্ষা শুষ্ককাননা। এই বর্ণনার কারণ একটাই। রাজা না থাকলে রাজকার্য এমনভাবেই স্তব্ধ হয়ে যায় যেন মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজনীয় স্ফূরণই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কবিরা আসলে প্রকৃতির স্তব্ধতা বর্ণনা করে জীবনের স্বাভাবিক স্ফূরণগুলির স্তব্ধতা নির্দেশ করেন।

স্বর্গরাজ্যে রাজার অভাবে সর্বত্র যে বিপর্যয় দেখা দিল, সেই বিপর্যয়, মাথায় নিয়েই এক জরুরি সভায় অলোচনায় বসলেন ঋষিরা, অন্য দেবতারা, স্বর্গপতি দেবোপম ব্যক্তিরা। প্রথম শ্রেণীর দেবতাদের মধ্যে যম, বরুণ, সূর্য—কেউই স্বর্গের রাজা হওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা কোনওটাই করলেন না— ন স্ম কশ্চন দেবানাং রাজ্যে বৈ কুরুতে মতিম্। দেবতারা, ঋষিরা সবাই মিলে ঠিক করলেন—স্বর্গের আধিপত্যে বরণ করা হোক মর্ত্যভূমির রাজা নহুষকে। তাঁর গৃহে রাজলক্ষ্মীর চিরাবাস। তিনি নিজে পরম ধার্মিকই শুধু নন, তিনি যেমন তেজস্বী, তেমনই যশস্বী। অতএব নহুষকেই বলা হোক স্বর্গরাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করার জন্য—অয়ং বৈ নহুষঃ শ্রীমান্ স্বর্গরাজ্যে'ভিষিচ্যতাম্।

দেবতারা, ঋষিরা সবাই মিলে নহুষের কাছে এলেন। বললেন— স্বর্গরাজ্য ছারখার হয়ে গেল। আপনি আমাদের রাজা হোন—রাজা নো ভব পার্থিব। নহুষ বিনীতভাবে বললেন—তাই কি হয়? আমি এই মর্ত্যভূমির রাজা। আমার মধ্যে সেই শক্তি নেই যাতে স্বর্গের দেবতা এবং দেবর্ষিদের প্রতিপালন করতে পারি— দুর্বলো'হং ন মে শক্তি র্ভবতাং পরিপালনে। ইন্দ্রের সেই শক্তি ছিল, তিনি পেরেছেন। কিন্তু তিনি যা পারেন, আমি কি তাই পারি? উপযাচক ঋষি-দেবতারা বললেন—আমাদের তপস্যার শক্তি আপনাকে দেব, রাজা! দেবতারা তাঁদের দৈবশক্তি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন আপনাকে। সবার তেজে তেজীয়ান হয়ে আপনি স্বর্গরাজ্যের রাজা হয়ে বসুন। আপনার কোনও ভয় নেই—পাহি রাজ্যং ত্রিপিষ্টপে।

আসলে এও এক ধরনের নির্বাচন-প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রে একজন সংসদ সদস্য যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের শক্তিতে নির্বাচন হন, আবার নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শক্তি হাতে নিয়ে যেমন একজন মুখ্য নেতার নির্বাচন হয়, নহুষের ক্ষেত্রেও তাই হল। সবাই

amarboi.com

বললেন—দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য এবং সমস্ত প্রাণীর তেজ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হবে। আপনি সেই তেজে তেজীয়ান হয়ে ধর্ম-সম্মতভাবে এই জগৎকে রক্ষা করুন। রক্ষা করুন দেবতাদের। রক্ষা করুন ঋষিদের—ধর্মং পুরস্কৃত্য সদা সর্বলোকাধিপো ভব।

সকলের মিলিত প্রার্থনায় নহুষ স্বর্গরাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন। মর্ত্য ভূমির অধিকার তো তাঁর থাকলই। এবার তিনি দেবতা, রাক্ষস—সবার তেজে বলীয়ান হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-তিন ভুবনের প্রতিপালক হলেন। ভালই চলছিল। যজ্ঞ-দান, তপো হোম, স্বাধ্যায় এবং সর্বোপরি তাঁর নিজের পরাক্রমে সমস্ত লোক তাঁর বশীভূত হল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দেবতা, রাক্ষস, গন্ধর্ব—সবাই তাঁর প্রজা—

পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ গন্ধর্বোরগরাক্ষসান্।
নহুষঃ পালয়ামাস ব্রহ্ম-ক্ষত্রমথো বিশঃ।।

তিন ভুবনের অধিপতি নহুষের শত্রুও কিছু কম ছিল না। অবশ্য তাঁদের জয় করতে কোনও বেগ পেতে হয়নি নহুষকে। সমস্ত রাজ্য যখন নিরুপদ্রব, নিষ্কন্টক—তখনই সেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। গণতন্ত্রের নির্বাচিত সংসদ-সদস্য মন্ত্রীদের যেমন ঘটে, তেমনটাই ঘটল নহুষের বেলায়। অধিকাংশ জনগণের নির্বাচনে শক্তি বৃদ্ধি ঘটার পর সংসদ সদস্য অথবা মন্ত্রীদের যেমন আর মানুষের সঙ্গে যোগ থাকে না, অথবা জনগণের প্রতি তাঁদের নিজস্ব কর্তব্যের কথাও মনে থাকে না, এখানেও তাই ঘটল।

নহুষের জীবনে বিলাসিতা আসল। ধর্ম-কর্ম, স্বাধ্যয় মাথায় উঠল। দিন রাত তিনি শুধু বিলাস-ব্যসনে দিন কাটান। স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাদের চারপাশে নিয়ে অপ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ দেবকন্যা-সমাবৃতঃ— তিনি কখনও দেবতাদের বাগানবাড়িতে, কখনও নন্দন-বনে, কখনও সমুদ্রের ধারে, কখনও বা নদীর কিনারায় বসে থাকেন। দেবর্ষিদের সামগান আর তাঁর ভাল লাগে না। নৃত্য-গীত আর ভাল বাজনা না হলে তাঁর মেহফিল জমে না—বাদিত্রাণি চ দিব্যানি গীতঞ্চ মধুরস্বরম্। ছয় ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে গন্ধর্ব-অপ্সরাদের নৃত্য-গীত ব্যসনে নহুষ ধর্মকার্য, রাজকার্য, সব ভুলে গেলেন। ধর্মাত্মা রাজা কামাত্মা হয়ে পড়লেন দিনে দিনে।

এইসময়ে নহুষ একদিন তাঁর অপ্সরা-সঙ্গিনীদের নিয়ে পথ চলেছেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে গেল ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী শচীদেবীর দিকে—সম্প্রাপ্তা দর্শনং দেবী শক্রস্য মহিষী প্রিয়া। ইন্দ্র তাঁর স্বর্গের ভদ্রাসন ত্যাগ করে কবেই চলে গেছেন কোথায়। আর রানির আসন থেকে নেমে শচী এখন অনাথা রমণীর মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্টা হলেও শচী এখনও পরমা রূপসী। রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করে গেলেও রূপলক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করেননি। শচীকে দেখেই নহুষ মুগ্ধ হলেন। কিন্তু যিনি এককালে ইন্দ্রের মতো স্বামীর সৌভাগ্য ভোগ করেছেন, তিনি অন্য পুরুষ দেখে মুগ্ধ হবেন কেন? তাছাড়া ইন্দ্রাণী শচীর মধ্যে ইন্দ্রের প্রতি সেই একনিষ্ঠতা ছিল, যাতে নহুষের অপাঙ্গ-লেহনে তিনি বিরক্ত হলেন।

কিন্তু নহুষ এসব বুঝবার পাত্র নন। প্রতিনিয়তই যেহেতু স্বর্গের কলাবতী রমণীরা নহুষের সঙ্গভিক্ষা করেন, অতএব নহুষকে দেখেও ইন্দ্রপত্নীর উদাসীন নিশ্চেষ্ট আচরণ নহুষকে একটু পীড়া দিল। পাত্র মিত্র-মোসাহেবদের ডেকে তিনি বললেন— ইন্দ্রাণী শচীর হলটা কী? আমাকে দেখেও তিনি একটু সেবা-টেবা না করেই চলে যাবেন—ইন্দ্রস্য মহিষী দেবী কস্মান্মাং

AMARBOI.COM

নোপতিষ্ঠতি? নহুষের মনের অবস্থা এমনই যে সাধারণ ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড়ের লজ্জাটুকুও তাঁর চলে গেছে। সবাইকে বললেন— আমি এখন এই জগতের অধীশ্বর এবং দেবতাদেরও আমি রাজা। ইন্দ্র তো এখন আমিই। তা শচীর আর কষ্ট করার দরকার কী? বরং শচীকে বলুন—দেরি না করে একেবারে আমার ঘরে চলে আসতে, নির্জনে কথা কওয়া যাবে—আগচ্ছতু শচী মহ্যং ক্ষিপ্রমেব নিবেশনম্।

সবাইকে বলার সময় নহুষ শচীকে শুনিয়েই কথাটা বলেছিলেন। শচী আর রাস্তায় দাঁড়াননি। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক বিপদ অনুভব করে শচী সটান উপস্থিত হলেন দেবগুরু বৃহস্পতির বাড়িতে। হাজার হলেও তিনি ব্রাহ্মণ মানুষ। আপদে বিপদে সব সময় তিনি দেবতাদের সৎপরামর্শ দিয়ে থাকেন। শচী তাঁর কাছেই গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন— আমাকে বাঁচান ঠাকুর! নহুষের হাত থেকে আমায় বাঁচান—রক্ষ মাং নহুষাদ্ ব্রহ্মণ্ ত্বামস্মি শরণংগতা। শচী নহুষের বাক্যে, চোখের চাউনিতে স্ত্রীলোকের অশ্লীল মরণ দেখেছেন। বৃহস্পতির পায়ে পড়ে তিনি বললেন— আপনিই একদিন বলেছিলেন ঠাকুর—আমি নাকি স্বাধ্বী, সুলক্ষণা, ভাগ্যবতী। তা, আজ আমার এ কী হল? বৃহস্পতি বললেন— আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে। আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলছি—নহুষের থেকে আপনার কোনও ভয় নেই—ন ভেতব্যঞ্চ নহুষাৎ সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে।

ইন্দ্রানী বিপন্না হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রয় নিয়েছেন—এ কথা নহুষের কানে গেল। তিনি যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হলেন—চুকোপ স নৃপস্তদা। রাজা-মহারাজাদের রাগ হলে যা হয়। চারদিক থেকে সবাই এসে স্তুতি-মানে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে। এখানেও দেবতারা, ঋষিরা সবাই এসে নহুষকে বললেন—আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, মহারাজ! আপনি রাগ করেছেন, তাই কারও মনে আজ শান্তি নেই। দেবতা, অসুর, নাগ—সকলেই শুধু ভয় পাচ্ছে। আপনার মতো একজন মহান রাজার কি এত রাগ করলে চলে—ন ক্রুধ্যন্তি ভবদ্‌বিধাঃ।

সবাই ভয় পাচ্ছে—এ কথা বললে রাগী লোকের ক্রোধ কিছু শান্ত হয়। নাকি আরও বাড়ে? যাইহোক দেবতারা-ঋষিরা ভাবলেন—স্তুতিমানে রাজার বুঝি বা কিছু ক্রোধশান্তি হয়েছে। সময় বুঝে তাঁরা বললেন—মহারাজ! শচীদেবী যে পরের স্ত্রী। পরের স্ত্রীকে জোর করে ভোগ করার মধ্যে মহত্ত্ব নেই কোনও, বরং পাপ আছে শত শত। শচী দেবীর ওপর থেকে মন তুলে নিন আপনি—নিবর্তয় মনঃ পাপাৎ পরদারাভিমর্ষণাৎ। ঋষিরা বললেন—এতেই আপনার মঙ্গল। দেবতাদের রাজা হয়েছেন আপনি, ধর্ম অনুসারে রাজ্য পালন করুন। পরস্ত্রীব্যসনে লিপ্ত হবেন না।

কামুক ব্যক্তিকে বেশি সদুপদেশ দিলে তার ক্রোধ হয়। তার কারণও আছে। মহামতি শঙ্করাচার্য এই মনস্তত্ত্বটা বুঝেছিলেন বলেই ভগবদ্‌গীতার টীকা করবার সময় লিখেছেন—কামনা যদি কোনওভাবে প্রতিহত হয়, তবে সেই প্রতিহত কামনাই ক্রোধের জন্ম দেয়—কাম এব প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে। নহুষের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। তিনি দেবতা-ঋষিদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিলেন—এবমুক্তো ন জগ্রাহ তদ্‌বচঃ কামমোহিতঃ। বুদ্ধিমান মানুষ যদি চারিত্রিক বিপাকে পড়েন, তবে তিনি অধম ব্যক্তির উপমা ব্যবহার করেন। একটি ভাল ছাত্র যদি পরীক্ষায় খারাপ করে, তবে সে অন্য কোনও ভাল ছেলের খারাপ হওয়ার উপমা খোঁজে। নহুষ দেবতাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বললেন—বেশি

AMARBOI.COM

জ্ঞান দেবেন না। আপনাদের আগের ইন্দ্র যখন গৌতম ঋষির জীবিত অবস্থাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর পত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন—অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বং ঋষিপত্নী যশস্বিনী—তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? একটুও তো বারণ করেননি তাঁকে—স চ কিং ন নিবারিতঃ? আর সেই ইন্দ্র কি একটা দুটো পাপ করেছেন? ছল, অন্যায়, নৃশংসতা কিছুই তো বাদ যায়নি! কই আপনারা তখন তো বারণ করেননি তাঁকে— স বঃ কস্মান্ন বারিতঃ?

নহুষ একটু দম নিলেন। উলটো চাপান্ দেওয়া শেষ হলে মাথা ঠান্ডা করে তিনি বললেন—সে যাকগে্। ইন্দ্রাণীকে বলুন, সে আমাকে একটু খুশি করে দিক, একটু সেবা করুক আমার। ব্যস আর ভাবতে হবে না। এতে তাঁরও ভাল হবে, আপনাদেরও ভাল হবে—উপতিষ্ঠতু দেবী মাম্ এতদস্যা হিতং পরম্। দেবতারা নহুষের কথা শুনে মাথা নিচু করলেন এবং নহুষের কাছে প্রার্থনা করলেন—তবু আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন, মহারাজ। আমরা কথা দিচ্ছি—ইন্দ্রাণীকে নিয়ে আসব আপনার কাছে—ইন্দ্রাণীম্ আনয়িষ্যামো যথেচ্ছসি দিবস্পতে—আপনার যেমন ইচ্ছে, তেমনই করব আমরা।

নহুষের দুর্নিবার সম্ভোগেচ্ছা পূরণ করার জন্য দেবতা এবং ঋষিরা সবাই মিলে এসে উপস্থিত হলেন বৃহস্পতির বাড়িতে—যেখানে শচী রয়েছেন। শচীকে নহুষের কাছে যেতে হবে— এই অমঙ্গলের সংবাদ দেওয়ার সময়েও তাঁদের মনের মধ্যে নহুষের ভয় কাজ করছিল। ফলত নহুষের কাছে যাওয়াটা ইন্দ্রাণীর পক্ষে কোনও অন্যায়ই নয়—এইরকম একটা তর্কযুক্তি সাজাতে আপাতত দেবতা এবং ঋষিদের সময় লাগল না। তাঁরা ভাবলেন—ভূতপূর্ব ইন্দ্রপত্নীকে নহুষের হাতে তুলে দিলে দেব-সমাজ এবং ঋষি-সমাজ নহুষের কোপ থেকে আপাতত বেঁচে যাবেন। অতএব বৃহস্পতির কাছে গিয়ে তাঁরা বললেন— আমরা জানি, ইন্দ্রপত্নী শচীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন—জানীমঃ শরণং প্রাপ্তামিন্দ্রাণীং তব বেশ্মনি। কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব এবং ঋষিদের সবারই মত হল—শচীদেবীকে নহুষের হাতেই দিয়ে দিন—নহুষায় প্রদীয়তাম্।

AMARBOI.COM

দেবতারা যুক্তি দিয়ে বললেন—দেখুন, নহুষ এখন দেবরাজ এবং ভূতপূর্ব ইন্দ্রের থেকে তিনি অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠতর—ইন্দ্রাদ্ বিশিষ্টো নহুষঃ। তা এইরকম একজন বড় মানুষকে ইন্দ্রাণী যদি স্বামিত্বে বরণ করেন, তাতে খারাপ কী আছে— বৃণোত্বিমং বরারোহা ভর্তৃত্বে বরবর্ণিনী। বৃহস্পতির গৃহের অন্তর্দ্বারে দাঁড়িয়ে দেবতা-ঋষিদের কাতর প্রার্থনা শচী দেবীর কানে যেতে কোনও অসুবিধে হল না। নিজের সতীত্ব এবং শালীনতা বিপন্ন বুঝে শচী ইন্দ্রাণী করুণভাবে কেঁদে উঠলেন। বৃহস্পতিকে সানুনয়ে বললেন—নহুষ যত বড় মানুষই হোন, এমনকি হোন না তিনি আমার স্বামী ইন্দ্রের থেকেও অনেক বড়, কিন্তু তবুও আমি নহুষকে আমার স্বামী ভাবতে পাচ্ছি না—নাহমিচ্ছামি নহুষং পতিং দেবর্ষিসত্তমঃ। আপনি আমাকে বাঁচান ঠাকুর, আমাকে বাঁচান—ত্রায়স্ব মহতো ভয়াৎ। বৃহস্পতি ইন্দ্রাণীকে অভয় দিয়ে বললেন—তুমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাক, ইন্দ্রাণী। তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করনি, আমিও আমার ধর্ম ত্যাগ করব না। তুমি আমার ওপর নির্ভর করেছ। এই বিপদের সময় আমারই শরণপ্রার্থিণী এক রমণীকে আমিও ছুড়ে ফেলে দিতে পারি না— শরণাগতং ন ত্যজেয়মিন্দ্রাণি মম নিশ্চয়ঃ।

সাতাশ

ইন্দ্রাণী শচীদেবীকে নিশ্চিন্তে থাকতে বললেন বৃহস্পতি। বললেন—এই দুঃসময়ে তোমাকে নহুষের হাতে ছেড়ে দেব না অন্তত—ন ত্যজে ত্বামনিন্দিতে। বৃহস্পতি দেবতা এবং ঋষিদের আর্জি নাকচ করে দিয়ে বললেন—কোন অবস্থায় কী ধর্ম পালন করা উচিত, আমি তা জানি। ইন্দ্রাণী আমার শরণাগত। লোকপিতামহ ব্রহ্মা শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করার দোষ কীর্তন করেছেন বারে বারে। তাছাড়া আমি একজন সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে এমন অধর্ম করি কী করে—নাকার্যং কর্তুমিচ্ছামি ব্রাহ্মণঃ সন্ বিশেষতঃ। তোমরা যাও এখান থেকে। আমি ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নীকে অন্তত নহুষের হাতে ছেড়ে দেব না—ন দাস্যামি শচীমিমাম্। তবে হ্যাঁ, নহুষ যেভাবে তোমাদের বলেছেন, যেভাবে ভয় দেখিয়েছেন, তাতে উপায় একটা বার করতেই হবে যাতে এঁরও ভাল হয়, আমারও ভাল হয়। তা সেই ভালর পরামর্শটাই আপনারা দিন, অবশ্য আপনাদের তরফ থেকে পরামর্শ যাই আসুক শচীকে কিন্তু আমি ফেরত দিচ্ছি না—ক্রিয়তাং তৎ সুরশ্রেষ্ঠা ন হি দাস্যাম্যহং শচীম্।

দেবতারা বৃহস্পতির দৃঢ় সিদ্ধান্ত শুনে তাঁকেই বললেন—তাহলে আপনিই বিচার করে বলুন কিসে সবারই ভাল হয়। বস্তুত সকলেই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে, নহুষের হাতে শচীকে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না, কিন্তু নহুষের ভয়েই তাঁরা বৃহস্পতির কাছে ওই প্রস্তাব করেছিলেন। এখন যখন দেবতারা বুঝলেন দেবগুরু স্বয়ং উপায় চিন্তা করছেন, তখন স্বয়ং তাঁর পরামর্শই তাঁদের কাছে গ্রহণীয় মনে হল। বৃহস্পতি অনেক ভাবনা করে দেবতাদের বললেন—ইন্দ্রাণীকে দিয়েই নহুষকে বলতে হবে যে, তিনি আপনার ইচ্ছার কথা শুনেছেন। তবে বুঝতেই তো পারছেন, এই সেদিন তাঁর স্বামী চলে গেছেন—মন তো দ্বিধাগ্রস্ত হয় বটেই। তিনি আপনার কাছে একটু সময় ভিক্ষা করছেন—নহুষঃ যাচতাং দেবী কিঞ্চিৎ কালান্তরং শুভা।

সময়। মানুষের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য—দুইই গড়ে দিতে পারে সময়। বৃহস্পতি যে বুদ্ধি দিলেন, সেটা আধুনিক মতে 'ওয়েট্ অ্যান্ড সি'। রামায়ণের রাবণের নীতি অনুযায়ী এটা 'অশুভস্য কালহরণম্' অর্থাৎ ঘটনা শুভ হলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, আর অশুভ হলে সময় নাও, শুধুই সময় নাও। আর দেবগুরু বৃহস্পতি এই সুযোগে দেবতাদের একটু জ্ঞানই দিয়ে দিলেন। বললেন—কাল বড় সাংঘাতিক জিনিস। যত সময় নেবে, ততই দেখবে নানা বাধা, ঝুট-ঝামেলা এসে কাজ পণ্ড করছে—বহুবিঘ্নঃ সুরাঃ কালঃ কালঃ কালং নয়িষ্যতি। সবার আশীর্বাদ আর তেজ লাভ করে নহুষ যতই অহংকারী হোন না কেন, এই কালই তাঁর 'কাল' হয়ে দাঁড়াবে।

দেব-শিষ্য আর তাঁদের গুরুতে মিলে সিদ্ধান্ত হল ঠিকই। তবে ইন্দ্রাণীকেই তো নিজে মুখে কথাটা বলতে হবে। দেবতারা যদি নহুষের কাছে গিয়ে ইন্দ্রাণীর মত ব্যক্ত করে বলেন—একটু দেরি হবে তাঁর। তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। ভাববেন, ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব দেবতারা ইন্দ্রাণীকে ধরে বললেন—আপনার সতীত্ব এবং সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহই নেই, তবে এই সময় চাইতে হবে আপনাকেই, নইলে সে মানবে কেন? ইন্দ্রাণী রাজি হলেন দেবতাদের প্রার্থনায়।

কাজ গোছাতে হবে। অতএব মন শক্ত করে একেবারে অভিসারিকার সাজে ইন্দ্রাণী চললেন নহুষের বাড়ি—ইন্দ্রাণী কার্যসিদ্ধয়ে। মুখে বেশ একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব ফুটিয়ে ইন্দ্রাণী নহুষের বাড়ি চললেন সাভিনয়ে। কিন্তু অভিনয় যতই করুন, যাঁর কাছে তিনি এসেছেন তিনি তো আর অভিনয় করছেন না। ইন্দ্রাণী তাঁর চোখের মধ্যে, তাঁর মুখমণ্ডলের মধ্যে কামুক পুরুষের নির্লজ্জ অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন। সুস্থ শালীন রমণীর কাছে সে অভিব্যক্তি ভয়ঙ্কর, ভীষণ—কবির ভাষায়—নহুষং ঘোরদর্শনম্। অন্যদিকে প্রার্থিতা রমণীকে স্বয়ং উপস্থিত হতে দেখে নহুষের কাম-ব্যাকুল চিত্ত নৃত্য করে উঠল। তাঁর চোখ বলল—এই তো রমণীর বয়স এবং রূপ—দুইই ঠিক আছে—দৃষ্ট্বা তাং নহুশ্চাপি বয়োরূপ-সমন্বিতাম্। দুষ্ট মন বলল—যা চেয়েছিলাম পেয়েছি—সমহৃষ্যত দুষ্টাত্মা কামোপহতচেতনঃ।

দৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্রাণী শচীর দেহ লেহন করতে করতেই নহুষ বললেন—তুমি তো জান, এখন আমিই তিন ভুবনের ইন্দ্র। অতএব আমাকেই এখন থেকে তুমি স্বামী মনে করবে—ভজস্ব মাং বরারোহে স্বামিত্বে বরবর্ণিনি। শচীর হৃদয় একেবারে কম্পিত হয়ে উঠল। অভিনয় করতে এসে যদি এখনই বিপাকে পড়েন? ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করে কোনও মতে শচী বললেন—আমাকে একটু সময় দিন, দেবরাজ। আমার স্বামী কোথায় গেছেন, কী করছেন, কিছুই তো জানি না। আমি তাঁর একটু খবর নিয়ে নিই। আর যদি তাঁর সংবাদ কিছু না পাই, তবে তো চিরকাল আপনারই সেবা করব আমি, ততো'হং ত্বামুপস্থাস্যে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।

নহুষ খুশি হলেন। ভাবলেন—ইন্দ্রাণী জালে জড়িয়ে গেছেন, এখন শুধু সামান্য সময়ের অপেক্ষা। দুর্দম পৌরুষের সঙ্গে কামুকতার সুর মেশালে যে শব্দরাশি তৈরি হয়, সেই ক্রূর-মধুর শব্দে নহুষ বললেন—সুনিতম্বে! তবে তাই হোক। তুমি ইন্দ্রের খবর নিয়ে তবেই এখানে এস। মনে রেখ, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ, সেই কথাটা রেখ কিন্তু। নহুষের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই শচীদেবী বৃহস্পতির বাড়িতে এসে ঢুকলেন আবারও। দেবতারা এবার সবাই মিলে বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করলেন। পরামর্শ এবং অভয়—দুইই জুটল। ইন্দ্রের পাপমুক্তির জন্য হোম-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নও চলল কিছুদিন। এমনকি ইন্দ্র এসে একবার দেখেও গেলেন নহুষের অবস্থা।

www.amarboi.com

দেখলেন—দেবতা-ঋষিদের বরের প্রভাবে তিনি এখনও দুর্ধর্ষ, তাঁকে কিছুই করা যাবে না—অকম্প্যং নহুষং স্থানাদ্ দৃষ্ট্বা বলনিষূদনঃ। ইন্দ্র আবারও চলে গেলেন সেই জলস্থানে, অপেক্ষা করতে লাগলেন, অনুকূল সময়ের জন্য।

ক্ষণিকের জন্য স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্র যে একবার এসেছিলেন, ইন্দ্রাণী তা দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যে ধরে রাখা গেল না, সেই দুঃখ তাঁর কাছে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াল। মহাভারত বলেছে—ইন্দ্রাণী তখন 'উপশ্রুতি' নামে এক রাত্রিদেবীর উপাসনা ক'রে, তাঁরই সহায়তায় ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তাঁর গোপন আস্তানায়। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণায় 'উপশ্রুতি' হয়তো তিনিই, যিনি সাধারণ খবর ছাড়াও আরো কিছু খবর রাখেন। সংস্কৃতে 'শ্রুত' বা শব্দ—খবর রাখা বা জানা থাকার অর্থ বোঝায়। 'বহুশ্রুত', 'অল্পশ্রুত' এই শব্দগুলির অর্থ লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় 'উপশ্রুতি' দেবী রাত্রির সমার্থক। অর্থাৎ আমাদের ধারণা—গোপন খবর জানেন এমন একজন রমণীর সঙ্গে রাতের আঁধারে ইন্দ্রাণী গিয়েছিলেন ইন্দ্রের আস্তানায়। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের দেখাও করতে হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম-রূপে—সূক্ষ্মরূপধরা দেবী বভূবোপশ্রুতিশ্চ সা। এই সূক্ষ্মরূপ গোপনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্দ্রও সূক্ষ্মরূপে আছেন, এঁরাও দেখা করছেন সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ অন্যে যাতে বুঝতে না পারে সেইরকম গূঢ়ভাবে শচী আর উপশ্রুতি দেখা করলেন লুকিয়ে থাকা ইন্দ্রের সঙ্গে।

ইন্দ্র আপন পত্নীকে এই অবস্থায় তাঁর কাছে আসতে দেখে খুশি হলেন না মোটেই। বললেন—তুমি কী জন্য এখানে এসেছ, আমি যে এখানে আছি তাই বা জানলে কী করে—কিমর্থমসি সম্প্রাপ্তা বিজ্ঞাতশ্চ কথং ত্বহম্। শচী আর উপশ্রুতির কথা বিশদে না বলে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা জানালেন। জানালেন—দুরাত্মা নহুষ লজ্জা-ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে বলেছেন তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করতে। আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার শেষ একটা সময়-সীমাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন—কালঞ্চ কৃতবান্ মম। এই অবস্থায় তুমি যদি এখন আমাকে তাঁর হাত থেকে রক্ষা না কর, তাহলে জোর করে সে আমাকে আত্মসাৎ করবে—যদি ন ত্রাস্যসি বিভো করিষ্যতি স মাং বশে। তুমি আক্রমণ করো নহুষকে।

amarboi.com

ইন্দ্র শচীর সব কথা ভাল করে শুনলেন। তারপর প্রকৃত সত্য স্বীকার করে মন্তব্য করলেন—এখনও নহুষকে আক্রমণ করার সময় হয়নি। আর আমার বীরত্ব দেখানোর সময়ও এটা নয়। কারণ নহুষ আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান—বিক্রমস্য ন কালো'য়ং নহুষো বলবত্তরঃ। ঋষিরা নহুষকে দেবতার সমাদর দেখিয়ে বাড়িয়ে তুলেছেন, এখন আর আমার কিছু করার নেই। ইন্দ্র আপন পত্নীকে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে শেষে বললেন—আমি একটা কৌশল করব। তুমি সেটা কাউকে বলবে না।

বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার আশায় শচী উৎকর্ণ হলেন। ইন্দ্র শচীকে বললেন—কেউ যখন নহুষের কাছে থাকবে না, সেই নির্জন মুহূর্তে তুমি নহুষের কাছে যাবে। তারপর বলবে...। তারপর যা বলতে হবে ইন্দ্র তা কানে কানে বলে দিলেন শচীদেবীকে। অলোকসামান্যা রূপসী শচী শৃঙ্গার-মধুর বেশভূষা করে ইন্দ্রের কথামতো নির্জনে দেখা করলেন নহুষের সঙ্গে। নহুষ তো শচীকে দেখে বিগলিত হয়ে বললেন—আরে ইন্দ্রাণী যে! রাস্তায় কোনও কষ্ট হয়নি তো? তা এই সময়ে তোমার চিরভক্তের কাছে তুমি এসেছ। বল কী চাও? যা চাও তাই দেব—ভক্তং মাং ভজ কল্যাণি কিমিচ্ছসি মনস্বিনি।

মধুর হেসে ইন্দ্রাণী বললেন—আপনি আমাকে যে মিলনের সময়-সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন,

তা আমি মেনে নিয়েছি। এর পরে আপনিই হবেন আমার স্বামী, আমার সব—ততস্ত্বমেব মে ভর্তা ভবিষ্যসি সুরাধিপ। তবে কী, মনে মনে আমার একটা অভিলাষ আছে। সেই অভিলাষ-বাক্যের মধ্যেই আছে আমার ভালবাসা—বাক্যং প্রণয়সংযুক্তম্।

আপনি যদি সত্যিই আমার কথা রাখেন, তবেই আমি আপনার চরণের দাসী হব।

নহুষ ভাবলেন—তিন ভুবনের অধিকার তাঁরই হাতে। কী এমন চাইবেন ইন্দ্রাণী যা তাঁর অদেয় হতে পারে? শচী নহুষের মনের ভাব বুঝে সাভিনয়ে নিজের স্বামীকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে বললেন—আমার আগের স্বামী ইন্দ্রের অনেক বাহন ছিল। হাতি, ঘোড়া, রথে আমি অনেক চড়েছি। কিন্তু হস্তিশ্রেষ্ঠ ঐরাবতও হাতি, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈশ্রবাও ঘোড়াই বটে। এসব বাহন আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে। আমি আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে এমন বাহনে সমাসীন দেখতে চাই, যে বাহন শিব, বিষ্ণু দেবতা-অসুর কারও নেই।

বিষ্ণুর বাহন গরুড়, কি শিবের বাহন ষাঁড়—এও যখন ভাবী-প্রিয়তমার পছন্দ নয়, অথবা দেবতাদের বাহনগুলি হংস-ঘোটক, মূষিক-ময়ূর—কিছুই যখন পছন্দ নয়, তবে হয়তো সিংহ-টিংহ পছন্দ হবে শচীর। নহুষ মনে মনে চিন্তা করলেন—শচী তাঁকে কতটা বড় ভাবেন। এতটাই বড় যে বিষ্ণু-শিবের সমাসনে পর্যন্ত তাঁকে বসাতে চান না। নহুষের আপন হৃদয়ের স্ফীত ভাবনাকে আরও প্রশ্রয় দিয়ে শচী বললেন—আমি চাই আমার প্রিয়তম আমাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য এমন একটি পাল্কি করে আসুন, সে পাল্কি বয়ে আনবেন দেবাসুরের পূজ্যতম মহর্ষিরা, দেবর্ষিরা—বহন্তু ত্বাং মহাভাগা ঋষয়ঃ সঙ্গতা বিভো।

বলদর্পিত, কামুক নহুষ যাতে পিছিয়ে না আসেন, তার জন্য যাকে ইংরেজিতে বলি 'ফেমিনিটি এক্সপ্লয়েট' করা, ঠিক সেই ভাবেই শচী তাঁর রমণীয়তা তীব্রতর করে বললেন—আপনাকে এই রকম করেই দেখতে চাই মহারাজ—এতদ্ধি মম রোচতে। আপনাকে লোকে দেবতা-অসুরদের সমান বলে ভাববে—এ আমার সইবে না, রাজা! দেবতা-অসুর যাঁর দিকে আপনি দৃষ্টিপাত করেন তাঁরই শক্তি আপনার মধ্যে সংক্রামিত হয়। আপনি তাঁদের অনেক ওপরে। ওঁরা কেউ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত থাকতে পারবে না। কিন্তু সেই মানুষটা অন্য দেবতাদের মতো চিরাচরিত পশুবাহনে সমাসীন হয়ে, বড় জোর রথে চড়ে আমার গলায় বরমাল্য দিতে আসবেন—এ আমি সইতে পারব না মহারাজ। আমার মাথা খাও, ওঁদের সঙ্গে তোমাকে আমি এক করে দেখতে পারব না—নাসুরেসু ন দেবেষু তুল্যো ভবিতুমর্হসি।

শচীর ভাবে, মাধুর্যে, কথায় নহুষ নিজেকে হারিয়ে ফেললেন একেবারে। বিগলিত হয়ে বললেন—বাঃ! তুমি নইলে এমন অপূর্ব এক বাহনের কথা কার মাথায় আসত—অপূর্বং বাহনমিদং ত্বয়োক্তং বরবর্ণিনি। তুমি যা বলেছ, আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে। বৃহৎ কোনও পশু নয়, রথ নয়, এমনকি সাধারণ মানুষও নয়। আমি হব ঋষি-বাহন। সাধারণ অল্পশক্তি কোনও রাজা কি আর ঋষিদের নিয়ে পাল্কি বওয়াতে পারে—নাল্পবীর্যো ভবতি যো বাহান্ কুরুতে মুনীন্?

নহুষ আত্মখ্যাপনে ব্যস্ত হলেন। শচীকে বললেন—আর সত্যিই তো, তুমি যেমন বলেছ—আমি তপস্বী এবং বলবান। আমার রাগ হলে তিন ভুবনে থরহরি কম্প লাগে। ঋষিরা এখন আমারই উদ্দেশে আহুতি দিচ্ছেন। তুমি ভেব না, ইন্দ্রাণী! যেমনটি তুমি বলেছ, তেমনটিই আমি করব। আমি যে তোমারই—তদ্‌বশোঽস্মি বরাননে। যেদিন মিলন-মুহূর্ত নির্ধারিত হবে, সেদিন সপ্তর্ষির সাত বেহারা সামনে এসে আমায় কাঁধে তুলে নেবে শিবিকার ভিতরে। পিছনে

www.amarboi.com

আসবেন ব্রহ্মর্ষিরা পায়ের তালে হুন-হুনার ঝঙ্কার তুলে—সপ্তর্ষয়ো মাং বক্ষ্যন্তি সর্বে ব্রহ্মর্ষয় স্তথা। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখবে আমার ক্ষমতা, আমার ঋদ্ধি—পশ্য মাহাত্ম্যম্ অস্মাকমৃদ্ধিঞ্চ বরবর্ণিনি।

শচীদেবী এতক্ষণ নহুষকে যেভাবে বললেন—তার মধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্রের কৌশল নিহিত ছিল। নহুষের অহঙ্কার স্ফীতভাব অনুমোদন করে শচীদেবী বৃহস্পতির বাড়িতে ফিরে এলেন। সময় আর বেশি নেই। সন্ধ্যাবেলায় নহুষ আসবেন ঋষি-বেহারার পাল্কি চড়ে। শচী বৃহস্পতিকে বললেন—আপনি ইন্দ্রের খোঁজ করুন। আর যে সময় নেই—সময়োঽল্পাবশেষো মে নহুষেণেহ যঃ কৃতঃ। বৃহস্পতি অগ্নিদেবের মাধ্যমে ইন্দ্রকে খবর পাঠালেন। ইন্দ্রও যম, বরুণ, চন্দ্রের মতো উচ্চকোটির দেবতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ আরম্ভ করলেন নহুষের সঙ্গে শেষ লড়াই করবার জন্য। ইন্দ্র যে নহুষের মুখোমুখি হতে খুব সাহস পাচ্ছেন, তা মোটেই নয়। বারবার তিনি তাঁর যোদ্ধা দেবতা-বন্ধুদের বলছেন—বর্তমান দেবরাজ নহুষ একেবারে সাংঘাতিক লোক, আপনারা যুদ্ধের সময়ে আমাকে সাহায্য করবেন কিন্তু—রাজা দেবানাং নহুষো ঘোররূপ। স্তত্র সাহ্যং দীয়তাং মে ভবদ্ভিঃ।

সৌভাগ্যের বিষয় ইন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হয়নি। সেই সন্ধ্যায় নহুষ যখন রায়বেশে পাল্কিতে উঠেছেন, তখন তাঁর পাল্কি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললেন সাত-বেহারা সপ্তর্ষি। আগে-পিছে চললেন মহর্ষিরা, ব্রহ্মর্ষিরা। ব্রহ্মর্ষি ঋষিদের সর্বত্র সমভাব, তাঁরা স্থিতধী। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ—সর্বত্র সমভাব—দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে বিগতস্পৃহ। তাঁরা যে অযোগ্য নহুষের শিবিকা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছেন, এতে তাঁরা কিছু মনেও করেননি, দুঃখও পাননি। দেশের রাজা চাইছেন তিনি ঋষিদের কাঁধে চড়ে প্রিয়মিলনে যাবেন, তাঁরাও সেটাকে রাজার নবতর বিলাস মনে করে তাঁকে সানন্দে কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

মজা হল, ঋষি-মুনিরা অন্যসময়ে দিনরাত স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন আর হোম-যজ্ঞ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে সাধারণ অবসরেও তাঁরা সাধারণ কথা বলতে পারেন না। রাজা নহুষকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে যেতে তাঁরা একটু ক্লান্তও হয়ে গিয়েছিলেন। একে অনভ্যাস তার ওপরে বৃথা সময় নষ্ট। হয়তো সেই কারণেই পথে সামান্য সময়ের জন্য শিবিকা নামিয়েছিলেন। সামান্য অবসর মানেই বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে ঋষিদের মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনা। আলোচনার বিষয় যজ্ঞকালে গো-প্রোক্ষণ। যজ্ঞের সময় গোবধের কতগুলি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ নিয়ে যাজ্ঞিকদের মধ্যে কিছু মতভেদও আছে। ঋষিরা সামনে নহুষকে পেয়েছেন। নহুষ জ্ঞানী ব্যক্তি। এককালে তিনি বহু যজ্ঞ করেছেন। ঋষিরা ঠিক করলেন গো-প্রোক্ষণের প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তাঁরা নহুষকেই সাক্ষী মানবেন।

ঋষিরা বললেন—মহারাজ! গো-প্রোক্ষণে ব্রহ্মা যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করার কথা বলেছেন, আপনি কি সেগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রাহ্য করেন? নহুষ বললেন—না, মোটেই না। আমি সেগুলিকে প্রমাণ বলে মানি না। ঋষিরা বললেন—আপনি না মানলেও ব্রহ্মার কথাকেই আমরা প্রমাণ বলে মনে করি এবং প্রাচীন মহর্ষিরাও তাই মনে করেন। নহুষ মানলেন না। লোক-পিতামহ ব্রহ্মার বিধানও আজ নহুষের কাছে হেয়।

ঋষিদের প্রশ্ন এবং সিদ্ধান্ত নহুষের ক্রোধ উদ্রেক করল। প্রশ্নকারী ঋষিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঋষি অগস্ত্য। মুনিদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে নহুষ অগস্ত্যের মাথায় কষে একটি লাথি মারলেন। ঋষিদের শিবিকা-বহন স্তব্ধ হল। অগস্ত্য ঘুরে দাঁড়ালেন। মন্ত্রপূত জল হাতে

AMARBOI.COM

নিয়ে অভিশাপ উচ্চারণ করলেন—তুমি সর্বজনপূজ্য ব্রহ্মার কথা মানছ না। ঋষিরা গোপ্রোক্ষণে যে মন্ত্র ব্যবহার করেন, সেই মন্ত্রানুষ্ঠান তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ। আজকে তোমার এমন অবস্থা যে, পূজ্যতম মহর্ষিদের দিয়ে তুমি পাল্কি বওয়াচ্ছ, আর তোমার দুঃসাহস কতদূর বেড়েছে যে, তুমি আমার মাথায় লাথি মারলে! এর ফলে আজই তুমি স্বর্গ থেকে পতিত হবে—ধ্বংস পাপ পরিভ্রষ্ট ক্ষীণপুণ্যো মহীতলে—আর বিশাল সর্পদেহ ধারণ করে তোমাকে বিচরণ করতে হবে পৃথিবীতে। সময় আসবে যখন তোমারই বংশোদ্ভূত যুধিষ্ঠির তোমাকে পাপ-মুক্ত করবেন।

ঋষিদের সঙ্গে নহুষের তর্কের বিষয় নিয়ে মতভেদ আছে। মহাভারত বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরের রচনা। ফলত তর্কের বিষয়ের মধ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য লাভ করেছে। পৌরাণিকেরা মনুষ্য-কল্পনার অনেক কাছাকাছি এসেছেন, তাই তাঁদের উপাখ্যানে কাহিনীর সরসতা বেশি। তাঁরা বলেন—ইন্দ্রাণী শচীর সঙ্গে মিলিত হবেন বলে নহুষের উৎকণ্ঠা এবং ব্যগ্রতা ছিল তুঙ্গে। শিবিকাবহনে অনভ্যস্ত ঋষিরা ঠিক তাল রেখে বহন করতে পারছিলেন না। তাঁদের সমবেত পদক্ষেপে কোনও ঐক্য ছিল না। শিবিকারোহী নহুষের তাতে কষ্ট বাড়ছিল এবং তার যেতে দেরিও হচ্ছিল। বাহনের অসুবিধে যখন চরমে উঠল, তখন নহুষ অগস্ত্যের মাথায় লাথি মেরে বলেন—'সর্প, সর্প'। সংস্কৃতে এই নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের অর্থ 'চল্ চল্'। আমাদের তাড়াতাড়ি থাকলে ট্যাক্সিওয়ালা বা রিকসাওয়ালাকে আমরা যেমন বলি—একটু তাড়াতাড়ি চল, জল্‌দি চল, ঠিক সেইরকমই নহুষের বক্তব্য। তবে নহুষ দর্পোদ্ধত রাজা হওয়ার ফলে তাঁর ভাষায় কটুতা তো ছিলই, উপরন্তু অগস্ত্যের মাথায় পদাঘাত। ফল যা হবার হল। অন্তত অভিশাপের বৃত্তান্ত সর্বত্র একই রকম। নহুষের মুখে 'সর্প সর্প' যতই শীঘ্রতা বোঝাক, সর্প শব্দটাই অভিশাপের ভাষায় ক্রিয়াপদ থেকে রূপান্তরিত হল বিশেষ্যপদে—যার অর্থ, তুমি সর্পগতি প্রাপ্ত হবে—দশবর্ষ-সহস্রাণি সর্পরূপধরো মহান্।

নহুষরূপী সর্পের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের মিলন কীভাবে হল, সে কথা পূর্বে আমরা জানিয়েছি। এখানে কৌতূহলের বিষয় একটাই—চন্দ্রবংশের পঞ্চম পুরুষ হাজার হাজার বছর ধরে শাপগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন কত বছর পরে তাঁর অধস্তন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা হবে বলে। সর্প হবার অভিশাপ কি সত্যই সর্পের রূপ, নাকি সর্পগতি। মহাভারতে এবং পুরাণগুলির মধ্যে দেখা যাবে—ব্রাহ্মণেরা যখন আপন স্বধর্ম স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন ত্যাগ করতেন, তাঁরা তখন শূদ্রসংজ্ঞা লাভ করতেন। একইভাবে ক্ষত্রিয়েরাও যখন তাঁদের রাজধর্ম, প্রজারক্ষণ ধর্ম ঠিক-ঠিক পালন করতেন না, তখন তাঁরাও শূদ্র বলে পরিগণিত হতেন। সোজাসুজিভাবে এসব কথার অর্থ হল—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা নিজের ধর্ম থেকে পতিত হল, আর তাঁরা আপন সমাজের মানুষজনের সঙ্গে ওঠাবসা করতে পারতেন না। সমাজের অধম স্তরে তাঁদের গতি হত। অন্যদিকে লক্ষণীয়—সমাজের নিম্নস্তরেও এক ধরনের গভীর স্বাজাত্যবোধ থাকে। আজ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য বা ক্ষাত্রধর্ম থেকে পতিত হয়ে শূদ্রসংজ্ঞা প্রাপ্ত হলেন, শূদ্রেরা যে তাঁকে আত্মীয়বৎ নিজের করে নেবে তা মোটেই নয়। দলে জায়গা না পাওয়া বাঘকে বেড়ালও আত্মীয় মনে করে না। ময়ূরপুচ্ছধারী হলে কাকও অন্য কাককে জায়গা দেয় না। লক্ষ্য করে দেখবেন, নহুষ অগস্ত্যের শাপে সর্পগতি প্রাপ্ত হয়ে সর্পজগতের মধ্যে বসতি স্থাপন করেননি। তিনি এক মহাবনে একাকী রয়েছেন গুহার মধ্যে।

সোজা কথা সোজা ভাষায় বলি। নহুষ স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়ে অধম গতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের উচ্চ শাসনাধিকার থেকে তাঁকে নেমে যেতে হয়েছে। অত্যাচার এবং অসভ্যতার চরম দণ্ড হিসেবে শুধু রাজ্যচ্যুতিই নয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সমাজেই তাঁর স্থান হয়নি, তিনি সর্পসংজ্ঞা লাভ করেছেন। সর্পকে যেমন গর্তে লুকিয়ে থাকতে হয়, নহুষেরও তেমনই আপন সমাজে মুখ দেখানোর উপায় নেই; তিনি গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছেন। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সেই ভূতপূর্ব ইন্দ্রের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যিনি আপন পাপ এবং অন্যায়ের জন্য সর্পের মতো লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জলা জায়গায়।

নহুষেরও তাই হয়েছে। মহাবনে থাকতে থাকতে হাজার বছর ধরে তাঁর নামেও এক নাগগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যে গোষ্ঠীর কোনও পরবর্তী বংশধর-পুরুষের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দেখা হয়েছে। তিনি পূর্বতন পুরুষের গৌরব অনুভব করেন, পাতিত্য ঘটা সত্ত্বেও চন্দ্রবংশের সঙ্গে একাত্মতায় তিনি পূর্ব গৌরব অতিক্রম করতে পারেন না এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্রবংশের উপযুক্ত বংশধরের সাহায্যেই তিনি মুক্তির উপায় খুঁজে পান। মনে রাখতে হবে—জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের পূর্বে যে সমস্ত বিখ্যাত নাগের নাম উগ্রশ্রবা সৌতির মুখে কীর্তিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নহুষ একজন—নিষ্ঠানকো হেমগুহো নহুষঃ পিঙ্গলস্তথা। বিখ্যাত নাগদের যে এক-একটা সম্পূর্ণ গোষ্ঠী ছিল, তার প্রমাণ পাবেন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে একেকটি নাগগোষ্ঠীর ধ্বংস থেকে। সেখানে বাসুকির বংশ, তক্ষকের বংশ অথবা ঐরাবত নাগের বংশে যত সর্প ছিল, সকলেই আগুনে প্রবেশ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য নহুষেরও একটা বংশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং সে বংশ যথেষ্ট পুরনো। পণ্ডিতেরা বলেন—'নহুষ' নামটির সমশব্দ পাওয়া যাবে প্রাচীন হিব্রু শব্দ 'নঘুস' বা 'নঘস' শব্দের মধ্যে এবং সে শব্দের অর্থই হল নাগ। অনেকে মনে করেন 'নঘস' শব্দটা থেকেই দ্রাবিড় ভাষায় নাগ শব্দটা এসেছে। বিশেষত দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে আর্যদের পূর্ববর্তী এবং প্যালেস্টাইনেও তারা সেমেটিক সভ্যতার পূর্বসূরি। কাঠিন্যের মধ্যে না গিয়ে, মহামতি কোশাম্বীর কথা উল্লেখ করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—মহাভারতের সময়ে অরণ্যবাসী অনার্য জনজাতির সঙ্গে নাগরা প্রায় সমীকৃত হয়ে গেছেন। এঁরা সর্পাকৃতি কোনও টোটেম ব্যবহার করতেন কিনা অথবা এঁরা সর্পের পূজা করতেন কিনা, সেটাও এখানে প্রায় অবান্তর। গাঙ্গেয় উপত্যকার বনভূমিতে নাগরা খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়াতেন, যেহেতু পাঞ্জাবের মরুপার্বত্য অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহের চেয়ে গাঙ্গেয় সমভূমিতে খাদ্য-সংগ্রহ করা অনেক সহজ ছিল। খাদ্য-সংগ্রহের এই উদাসীন বৃত্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোনও বিরোধও ছিল না। বেদের মধ্যেই এমন ব্রাহ্মণের পরিচয় আছে, যাঁরা এইভাবেই খাদ্য সংগ্রহ করতেন। গুরুকুলে পাঠরত ব্রহ্মচারীকেও অনেক সময় খাদ্য-সংগ্রহ করতে হত এইভাবে। নাগেরা তাই কখনও শূদ্র বা দাস-পর্যায়ভুক্ত হননি। কেন না শূদ্র বা দাসদের সঙ্গে চাষবাসের যোগ আছে। নাগমাতার পুত্র আস্তীক এবং সোমশ্রবার মুনির সম্মান দেখে একথা আরও পরিষ্কার বলা যায় যে—If the Brahmins who edited the overinflated epic could proclaim ancestry so far beyond the Aryan pale, without shame, the Nagas were in some way a very respectable people, not demons nor a low caste.

কোশাম্বী নাগ জনজাতিকে ভারতবর্ষে আর্যপূর্ব জনজাতিদের একতম মনে করেন, যাঁরা গাঙ্গেয় উপত্যকার গভীর অরণ্যভূমিতে ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহের বৃত্তি ত্যাগ করতে পারেননি। আমরাও আমাদের নহুষকে এক মহাবনের মধ্যে অবস্থিত দেখেছি। কাহিনীর অনুরোধে তাঁর

AMARBOI.COM

খাদ্যসংগ্রহের বৃত্তির মধ্যে ভীমের মতো এক খাদ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের ধারণা যুধিষ্ঠির-ভীমের সঙ্গে যে নহুষের দেখা হয়েছে, তিনি পূর্বতন চন্দ্রবংশের পঞ্চম পুরুষ যে নহুষ, তাঁর বংশধর কেউ হবেন। ঋগ্‌বেদে নহুষ তো একেবারে মনুর মতোই এক জনগোষ্ঠীর প্রতিভূর নাম। এই নহুষের সঙ্গে হয়তো বৈদিক নহুষের কোনও সম্পর্ক নেই; কিন্তু চন্দ্রবংশের পঞ্চম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও কোনও এক নহুষের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দেখা হওয়াটা কোনওভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না, যদি না তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে পতিত নহুষের নাগ-বংশধর কেউ না হন।

মনুসংহিতাতেও নহুষের যে বিবরণ পাই তাতেও নহুষের সর্পত্ব স্পষ্ট নয়। সেখানে নহুষের রাজ্যচ্যুতি এবং সমাজচ্যুতিই বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বেনো বিনষ্টো' বিনয়াৎ নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ। মনু বলেছেন—কাম এবং ক্রোধ থেকে যে সব ভ্রষ্টাচার মানুষের মধ্যে জন্মায়, রাজাদের তা পতিত করে। কামজ এবং ক্রোধজ ব্যসনের ফলে রাজারা তাঁদের রাজ্য হারান—বহবো বিনয়ান্নষ্টাঃ। মনু আবার বলেছেন—উপযুক্ত শিক্ষা এবং বিনয় যদি থাকে তবে রাজারা হারানো রাজ্যও ফিরে পান—বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। রাজ্য ফিরে পাওয়া এবং রাজ্য হারানো—এই দুটিই যেহেতু মনুর মতে বিনয়-শিক্ষা এবং অবিনয়ের ফলাফল, মনু তাই নাম জানিয়ে উদাহরণও দিয়েছেন সেই রাজাদের—যাঁরা অবিনয়ের ফলে রাজ্য হারিয়েছেন এবং যাঁরা বিনয়ের ফলে রাজ্য ফিরে পেয়েছেন। আমাদের এই নহুষও কাম এবং ক্রোধের ব্যসনে মত্ত হয়ে রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন ঋষিদের দ্বারা। তাঁর সর্পগতি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সমাজচ্যুতির প্রতিরূপমাত্র। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যে নহুষের দেখা হয়েছে, সে নহুষ রাজ্যচ্যুত, সমাজচ্যুত নহুষের বংশ-পরম্পরায় নেমে আসা নাগ-জনজাতির অন্যতম প্রধান পুরুষ। ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁর প্রাচীন পূর্বপুরুষ রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন বলেই যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর প্রশ্ন—মহারাজ ব্রাহ্মণ কাকে বলে—ব্রাহ্মণো কো ভবেদ্ রাজন্।

আঠাশ

চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম পুরুষ নহুষ পর্যন্ত যা দেখা গেল, তাতে পুরূরবার পুত্র আয়ু এবং চন্দ্রপুত্র বুধ ছাড়া আর তিনজন রাজার সঙ্গেই তদানীন্তন ব্রাহ্মণদের কিছু বিবাদ ঘটেছে। এই তালিকায় আছেন চন্দ্র স্বয়ং। দ্বিতীয় জন পুরূরবা এবং তৃতীয় নহুষ। ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজাদের এই বিবাদ-বিসংবাদের একটা সামাজিক তাৎপর্যও আছে। পরিষ্কার বোঝা যায়—একটা 'কনফিউশন', একটা সংশয় তখনও চলছিল। ব্রাহ্মণ-সমাজের অনুমোদন ছাড়া রাজা সিংহাসনে বসতে পারছেন না বটে, কিন্তু রাজাদের ওপর ব্রাহ্মণরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও খুঁজে পাচ্ছেন না। পুরূরবা রাজ্যচ্যুত হয়েছেন ব্রাহ্মণদের দ্বারা। নহুষও রাজ্যচ্যুত হয়েছেন ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

সন্দেহ নেই, যোদ্ধা রাজার ওপরে বেদ-যজ্ঞ নিয়ে থাকা দার্শনিক ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ যথেষ্টই জরুরি ছিল। দণ্ডধারী রাজার কাছে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এবং স্বেচ্ছাচারিতা এমনই লোভনীয় বস্তু, যা তাঁদের প্রমত্ত করে। এই প্রমত্ততা যখনই বেড়েছে, তখনই ব্রাহ্মণদের অভিশাপ নেমে এসেছে নিয়তির মতো। যুধিষ্ঠিরের কাছে নহুষ দুঃখ করে বলেছেন—আমার ক্ষমতা তো কিছু কম ছিল না, রাজা! অভিষেকের সময় ঋষিরা আমাকে বর দিয়েছিলেন—যাঁর দিকে আমি দৃষ্টিপাত করব, তাঁরই তেজ আমার মধ্যে সংক্রমিত হবে—তস্য তেজো হরাম্যাশু তদ্ধি দৃষ্টের্বলং মম। এককালে আমি স্বর্গীয় বিমানে চড়ে সমস্ত স্বর্গভূমিতেই ঘুরে বেড়িয়েছি। ব্রহ্মর্ষিদের হাজার বেহারা আমার পাল্কি বয়ে নিয়ে গেছেন—ব্রহ্মর্ষীণাং সহস্রং হি উবাহ শিবিকাং মম।

নহুষ জানেন—তাঁর পক্ষে ব্রহ্মর্ষিদের দিয়ে পাল্কি বওয়ানোতেও কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু স্বাধিকার-প্রমত্ততায় তাঁর মাথায় খুন চাপল। তিনি অগস্ত্যের মাথায় লাথি মেরে বসলেন।

একজন চরম শিক্ষিত লোকের এই চরম অবমাননায় হাজার জন ব্রহ্মর্ষি নিশ্চয় মুখ ফিরিয়ে ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন অগস্ত্যের পিছনে। শিক্ষিত জনতার রোষ নেমে এল অগস্ত্যের অভিশাপের রূপ ধরে। নহুষ রাজ্যচ্যুত হলেন। তিনি স্বীকার করেছেন—আমার আশ্চর্য লেগেছিল, যুধিষ্ঠির! আশ্চর্য লেগেছিল। সত্য, জিতেন্দ্রিয়তা, তপস্যা, অহিংসার এ কী শক্তি, যা এক দণ্ডধারী সর্বক্ষম রাজাকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। তাকে স্থানচ্যুত করে। তপস্যার এই শক্তি দেখে সত্যিই আমার বড় আশ্চর্য লেগেছিল—ততো মে বিস্ময়ো জাতস্তদ্ দৃষ্ট্বা তপসো ফলম্।

চন্দ্রবংশের সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী সব চেয়ে বড় রাজার এই ইন্দ্রপতন আজ শত শত বচ্ছর পরেও চিন্তার ব্যাপার রয়ে গেছে। যে গহন বনের মধ্যে নহুষের নাগবংশীয় অধস্তনেরা যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের কাছে এখনও সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে রয়েছে—মহারাজ!' ব্রাহ্মণ কাকে বলে? ভাবটা এই—জাতিটা তো বড় কথা নয়। আমরা নহুষ, আমরা রাজা ছিলাম। স্বর্গের দেবতাদের ওপর পর্যন্ত আমাদের পূর্বাধিকার বিস্তৃত ছিল। তবে কী এমন শক্তি এই ব্রাহ্মণ-নামক শব্দটির যা সব কিছুর ওপরে।

যুধিষ্ঠির বড় সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, চারিত্রিক বল, অনৃশংসতা, তপস্যা এবং দয়া—এই গুণগুলি যে ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যাবে, তিনিই আসলে ব্রাহ্মণ। নহুষরূপী নাগবংশীয় বললেন—সে কী কথা যুধিষ্ঠির। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই সামাজিক সংস্থানটা কি তুমি ভুলে মেরে দিলে! তুমি যেমন বলছ, তাতে তো একজন শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ বলে সম্মান করতে হবে। কেননা ওই যে এত সব গুণের কথা বললে—সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, দয়া—তা এসব গুণ তো একজন শূদ্রের মধ্যেও থাকতে পারে। তাহলে তো সেই শূদ্র ব্যাটাকেও গড় করতে হবে এখন থেকে—শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। তুমি হাসালে যুধিষ্ঠির।

AMARBOI.COM

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হলেন। উত্তর দিলেন নিরপেক্ষ ধর্মাধ্যক্ষের মতো। বললেন—আমি যেসব সদ্‌গুণের কথা বললাম, তা একজন শূদ্রের মধ্যে থাকতেই পারে। আবার বামুনের ঘরে জন্ম নিয়ে গলায় পৈতে ঝুলিয়েও একজন ব্রাহ্মণের মধ্যেও এসব গুণ না থাকতেই পারে—শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। যুধিষ্ঠির হেঁয়ালি করে বললেন—তাহলে সে শূদ্রও শূদ্র নয়, আবার সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়—ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ। কথাটা কেমন হল? সে শূদ্র, শূদ্র নয়। সে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। নহুষরূপী নাগবংশীয়র মাথাটা একেবারেই যেন ঘুরে গেল। চিরকাল তিনি শুনে আসছেন বামুনের ছেলেই বামুন, শূদ্রের ছেলেই শূদ্র। আর আজ এই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এ সব কী নতুন কথা শোনা যাচ্ছে?

নতুন কথাই বটে। এমনকি আজকের সমাজেও এটা নতুন কথা। আজকাল কতগুলি মহাপণ্ডিত দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা দেশীয় ধর্মবাদ, দর্শন কিছুই বোঝেন না, কিন্তু আরও নানারকম 'বাদ'-প্রতিবাদ ভাল বোঝেন। স্বীকার করে নেওয়া ভাল—মহাভারতে জাতি-ব্রাহ্মণ্যবাদ বা জাতিব্রাহ্মণ্যের সপক্ষে অনেক কথা আছে। কিন্তু প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা শুধু সেই ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির জায়গাগুলি উদ্ধার করে—আমাদের ধর্ম কত সংকীর্ণ, কত জঘন্য, কত গোঁড়া—এটা বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মাথায় যুধিষ্ঠির-নহুষের এই কথোপকথনটুকু মোটেই কাজ করে না। কাজ করে না এই কারণে যে, তাঁদের বক্তব্যে তাহলে আর নতুন কিছু থাকে না। তাঁরা যে নতুন কথাটা শোনাবেন—সে নতুন কথাটা যুধিষ্ঠির আগেই বলে ফেলায়

তাঁদের বড় অসুবিধে হয়। তাঁদের উদারপন্থী কথাবার্তা, নৃতত্ত্বের বড় বড় বুলির সঙ্গে মনুষ্যত্বের মশলা-মেশানো অত্যাধুনিক বচন যুধিষ্ঠিরের মুখে আগেই পরিবেশিত হওয়ায় এই অহংমানী পণ্ডিতদের বৈপ্লবিক উদারতা মূল্য হারিয়ে ফেলে। অতএব মহাভারতের অন্য কোথায় জাতি-ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা, কোথায় অনুশাসন পর্বে ব্রাহ্মণ্যের জয়-জয়কার—খোঁজ সে সব জায়গা। জনসাধারণকে দেখাও। কত সঙ্কীর্ণমনা এই লোকগুলি, ভারতবর্ষের কী ক্ষুদ্রতা! যেন অন্য কোথাও কোনও ক্ষুদ্রতা নেই। সব এই ভারতবর্ষে।

বস্তুত যুধিষ্ঠির যে কথা বলেছেন—তা যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সার কথা, তেমনই তা ভারতবর্ষের অন্য ধর্মেরও পরম্পরাগত বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত একটা ধারণা আছে এবং সে ধারণার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নাই থাক, তুলনামূলক বৈচিত্র্য কিছু আছে। মনে রাখতে হবে, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শনেও 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি বহুল প্রযুক্ত। একটি ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে কোন কোন সদ্‌গুণ থাকলে 'ব্রাহ্মণ' হওয়া যায়—এই তর্ক সেখানে নানা জায়গায় উপস্থিত। এটা কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ বুদ্ধ এই কথাই বলবেন যে, জন্মের দ্বারা মানুষ ব্রাহ্মণ হয় না, গোত্র-প্রবরের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হয় না, মাথায় তপস্বিসুলভ জটাজুট থাকলেও ব্রাহ্মণ হয় না—ন জাটাহি ন গোত্তেন। আশ্চর্যের বিষয় হল—মহাভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে সুপরিচিত যুধিষ্ঠিরের মতো রাজ-বর্ণের মুখে ওই একই রকম কথা এল কী করে?

অতি পণ্ডিতেরা বলবেন—ওসব কথা বৌদ্ধদের কাছ থেকে ধার করা। ঠিক যেমন তাঁরা রামায়ণের উপাখ্যানের সঙ্গে মিল দেখে দশরথ জাতকের পূর্বগামিতা প্রমাণ করেন, ঠিক সেইভাবেই এখানেও তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ করে। যুক্তি-তর্ক তাঁদের বড়ই সরল, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করলে আজকাল যেহেতু প্রগতিশীলতা বেশি প্রকাশ পায়, তাই এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের কাছে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অধমর্ণতা দেখানোর আশঙ্কা থাকে খুব বেশি। আমার নিজের ব্যক্তিগত মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং দর্শন তথা বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন—দুটিই পরস্পরের বিকাশে পরম পরিপূরক। যদি বৌদ্ধ দার্শনিকতা থেকেও যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ উদারতা ঘটে থাকে, আমাদের তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ধারণা—ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মধ্যেও এই উদার আকাশটুকু মাঝে মাঝে দেখতে পাব, যা একেবারেই আকস্মিক নয় এবং তারও একটা পরম্পরা আছে। যুধিষ্ঠিরের কথাও তাই নতুন কিছু নয় এবং নতুন নয় বলেই সেটা আমাদের পরম্পরাগত পুরাতন দর্শন, যার চরম অভিব্যক্তি ভগবদ্‌গীতার মধ্যে—আমি গুণ এবং কর্মের নিরিখেই চতুর্বর্ণের বিভাগ রচনা করেছি, জন্ম-কুল দেখে নয়—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে দিলেন—কথাটা বোঝ ভাল করে। মানুষের সদ্‌গুণটাই আসল। যদি দেখ এ সব সদ্‌গুণ একজন শূদ্রের মধ্যে আছে, তবে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই মানবে। আর যদি দেখ—কুলজাত ব্রাহ্মণের মধ্যেও ক্ষমা নেই, দয়া নেই, অহিংসা নেই, তপস্যা নেই, তবে তাকে শূদ্র বলেই চিহ্নিত করবে—যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ। নহুষ বললেন—কী কথা শুনালে দাদা! চরিত্র, ক্ষমা, অনৃশংসতা—এসব দিয়ে যদি বামুন চিনতে হয়, তবে তো জাতিবর্ণের কথাটাই বৃথা হয়ে গেল। সদ্‌গুণের কৃতিত্ব দিয়ে যদি শূদ্রকে বামুনের আসনে চড়াতে হয়, তাহলে চাতুর্বর্ণ্যের ভিত্তিটাই যে নড়বড়ে হয়ে গেল—বৃথা জাতিস্তদাযুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে।

AMARBOI.COM

যুধিষ্ঠির অসাধারণ একটি কথা বললেন। কথাটা তাঁর গভীর বিশ্বাস এবং অতিসংবেদনশীল দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গেও জড়িয়ে নিয়ে বলা যায়। যুধিষ্ঠির বললেন—জাতি! মানুষের কথা বল, বুঝি। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে জাতির ব্যাপারটা বড়ই বিচিত্র হে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জাতি-জন্মের বিচার যে বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যুধিষ্ঠির হাজার হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতির ঘেরাটোপের মধ্যে বসে পাকা নৃতাত্ত্বিকের মতো জবাব দিলেন। বললেন—মানুষ বলে কথা। আমি যে কথা বলি, যে শব্দ ব্যবহার করি, একজন ব্রাহ্মণও সেই শব্দ ব্যবহার করে। একজন শূদ্রও সেই শব্দ ব্যবহার করে। সেই অশেষ বাক্যরাশির মধ্যে কোনও শব্দের শুদ্ধতা বজায় রাখা কি সম্ভব? বলা কি যায়—এটা ব্রাহ্মণের অভিধান, আর এটা শূদ্রের? আরও সরস উদাহরণ দিয়ে বলি—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র— সবার মধ্যে যে প্রথায় মৈথুন চলে, সেই প্রথার মধ্যে থেকে কখনও কি এমন পৃথকীকরণ সম্ভব যে—এটাকে বলব ব্রাহ্মণের মৈথুন আর ওটা ক্ষত্রিয়ের অথবা ওটা শূদ্রের? সম্ভব নয়। কারণ বাক্য, মৈথুন, জন্ম, মরণ—সমস্ত বর্ণে একই রকম—বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্।

যুধিষ্ঠির সমতার উদাহরণ দিয়ে তাঁর আসল মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বলেছেন—মানুষ বলে কথা। ইন্দ্রিয় দুর্বার। এখনও পর্যন্ত এমন একটা শুদ্ধ-রক্তের সমাজ দেখাতে পারবে না, যেখানে তথাকথিত একটি জাতি অন্য জাতির রমণীতে সন্তান উৎপাদন করেনি। সবার ঘরে সবার ছেলে আছে। শূদ্রানীর গর্ভে ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের—সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ। কখনও রুচি-বৈচিত্র্য, কখনও বা সময় বুঝে মানুষ দেখে, তুচ্ছ জাতি শিকেয় তুলে নির্জন মিলন—টীকাকারের ভাষায়—রুচিবৈচিত্র্যাৎ প্রায়েণ রহোলাভাচ্চেতি। যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত দিলেন—একমাত্র মৈথুনের মাধ্যমেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের রক্ত এমনভাবে মিশে গেছে যে তার মধ্যে থেকে একটা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-জাতি অথবা একটা শুদ্ধ শূদ্র-জাতি খুঁজে বার করাটা ভীষণ কঠিন হবে—সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।

AMARBOI.COM

যুধিষ্ঠির এবার নৃতাত্ত্বিকের ভূমিকা ছেড়ে তত্ত্বজ্ঞের ভূমিকায় উত্তরণ করছেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, বেদ-বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি জানেন। উপরন্তু নিজের অনুভবের কথা বলেই তো আর ব্রাহ্মণ্যের বিচার চলে না। সেই জন্য তিনি পরম্পরাগত শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করছেন নহুষরূপী নাগবংশীয়র কাছে। বলছেন—জন্মের নিয়মেই শুধু একটা মানুষ ব্রাহ্মণ হতে পারেন কি না, এ সন্দেহ আজকের নয় সর্প! এ সন্দেহ বৈদিক কাল থেকে আরম্ভ করে ঋষিদের কাল পর্যন্ত একইভাবে চলেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণ বলেছেন—আমরা সঠিক জানি না, আমরা ব্রাহ্মণ, না অব্রাহ্মণ—ন চৈতদ্‌বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্ম বয়মব্রাহ্মণা বা। বেদের কালের যাজ্ঞিক যাঁরা, তাঁরাও নিজেদের জন্মে বিশ্বাস করেন না। যার জন্য যজ্ঞ করার সময় সাধারণভাবে তাঁরা একবারও বলেন না—আমরা ব্রাহ্মণেরা এই যজন-কর্ম করছি। তাঁরা বলেন—'আমরা যারা যজন-কর্ম করছি'—অর্থাৎ নিজেদের জন্ম-ব্রাহ্মণ্যে তাঁদের আস্থা নেই। কিন্তু যজ্ঞ যখন করছেন, তখন তাঁদের শম-দমাদি গুণের প্রশ্নটা স্বতঃসিদ্ধই বটে—শ্রুত্যা যাগসামান্যে 'যে যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠো বিহিতঃ, তত্র চ ব্রাহ্মণা বয়ং যজামহে ইত্যাদ্যনুকত্বা যৎ 'যে যজামহে' ইত্যুক্তং তদ্‌ যাজ্ঞিকানামাত্মজন্ম-সন্দেহাদেব।

যুধিষ্ঠির শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যের চরম উৎকর্ষ স্থাপন করলেন ব্রাহ্মণের সদ্‌বৃত্তি এবং চরিত্রে—তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ। যুধিষ্ঠির সারা জীবন ব্রাহ্মণদের মুখে তত্ত্বকথা শুনেছেন। তাঁর নিজের মধ্যেও ক্ষত্রিয়দের সংস্কারের চেয়ে ব্রাহ্মণের সংস্কার বেশি।

ফলত তাঁর কথা আস্তে আস্তে বড়ই তত্ত্ব-কর্কশ শুষ্ক হয়ে উঠছিল। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে নহুষও তো কিছু কম যান না। যিনি জ্ঞান এবং তপস্যার বলে দেবতা এবং ঋষিদের দ্বারা স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাঁর জ্ঞানও তো কিছু কম নয়। সেই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে তাঁর অধস্তনের মধ্যে। নাগবংশীয় নহুষও যুধিষ্ঠিরকে কিছু উপদেশ করেছেন। সেই উপদেশ এমনই যে, তার মধ্যেও ব্রাহ্মণ্যের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়দমন, তপস্যা, দান এবং ধর্মপরায়ণতা।

বস্তুত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সমাজ থেকে পতিত হয়ে অনুতপ্ত নহুষ হয়তো শম-দমের সাধনেই নিজেকেই শোধন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—মানুষ জ্ঞানী বা বীর হলেও ঐশ্বর্য এবং সম্পদ তার মধ্যে মত্ততা সৃষ্টি করে, যে মত্ততা তাঁকে এক সময় গ্রাস করেছিল। মানুষের জীবনে যখন চরম সুখ, সুখের কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেই সুখের মধ্যেই বাসা বাঁধে অভিমান আর মূঢ়তা—বর্তমানঃ সুখে সর্বো মুহ্যতীতি মতির্মম। নহুষ একসময় এই চরম সুখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরও মত্ততা এসেছিল এবং সে মত্ততার শাস্তিও তিনি পেয়েছেন। হয়তো মহাবনে নাগ-জন-জাতির সঙ্গে থাকতে থাকতে দিবারাত্র সেই বিস্ময়বোধ কাজ করেছে। ঋষি অগস্ত্যের কথা তাঁর মনে পড়ে। অর্থ নয়, দণ্ডধারণ নয়, রাজত্ব নয়; শুধু সত্য, অহিংসা, তপস্যার জোর একটা মানুষকে কত শক্তিমান করে দিতে পারে। দিনের পর দিন এই ব্রাহ্মণ্য-গুণের অনুশীলনে তাঁর পাপ-শোধন হয়েছে, বংশ-বংশ ধরে সেই শোধন মুক্ত করেছে ব্যক্তি নহুষকে এবং নহুষের পরিমণ্ডলে বাস করা নহুষ নামের নাগ-জন-জাতিকে। নহুষেরা বুঝেছেন—সত্যনিষ্ঠা, শম-দম—এইসব গুণই মানুষকে মানুষ করে তোলে। জাতিগৌরবও নয়, জন্মলব্ধ কুল-গৌরবও নয়—সাধকানি সর্বা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ। নাগদের মধ্যে বাস করেও নহুষেরা আজ তাই নিজের জাতি-কুল নিয়ে বিব্রত নয়। আজকে নহুষ দলের প্রধান পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে এমন একজনের, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট বটে, তবে তাঁর মধ্যে রয়েছে সেইসব গুণ যা শুদ্ধ ব্রাহ্মণোচিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমাজ-চ্যুত নহুষেরা আজকে ব্রাহ্মণ্যের শুদ্ধ-সংজ্ঞায় মিলিত হয়েছেন এমন একজনের সঙ্গে যিনি তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্মের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নহুষ মুক্ত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আর যুধিষ্ঠির সত্যনিষ্ঠ হয়ে বনান্তরালে বসে আছেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়ে।

AMARBOI.COM

আমরা চন্দ্রবংশের পরম্পরা দেখানোর সময় যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ না টেনেও নহুষের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করতে পারতাম। কিন্তু এখানে নহুষের প্রতিষ্ঠা, তাঁর রাজ্যচ্যুতি এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ্যের সংজ্ঞা নিয়ে যে যুধিষ্ঠিরকেও জড়িয়ে নিলাম, তার পিছনে কারণ একটা আছে। কারণটা হল—যুধিষ্ঠির যে বললেন—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সমস্ত বর্ণের মধ্যেই মিলন-বিবাহ এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তাতে কোনও একটি বর্ণকে রক্তের শুদ্ধতায় চিহ্নিত করা যায় না—এই সাঙ্কর্য বা মিশ্রণ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমরা দেখেছি—ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞক চন্দ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির স্ত্রীর মিলনে বুধ জন্মালেন। বুধের সঙ্গে মিলন হল ইলার—তিনি মানবী। পুরূরবার সঙ্গে মিলন হল স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর। অদ্ভুত সাঙ্কর্য।

যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তে আমরা রীতিমতো আধুনিকভাবে খুশি হতে পারি, কারণ মিলনের মধ্যে ভালবাসার বেদনা থাকে বলেই সন্তানের জন্মে কোনও কালিমা নেই। দেখার বিষয়, সেই সন্তানকে তাঁর পিতা কিংবা মাতা কোন সংস্কারে সংস্কৃত করছেন। এখনও পর্যন্ত চন্দ্রবংশের প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে শম-দম-তপস্যার গুণ দেখেছি, ভালবাসার রম্যতা দেখেছি, ভ্রষ্টাচারও

দেখেছি, আবার ভ্রষ্টাচারের শাস্তি এবং অনুশোচনাও দেখেছি। শুদ্ধির বিচারে এইগুলিই বড় কথা এবং এই বড় কথাটা মনে রেখেই আমাদের নহুষের মূল বংশপরম্পরায় ফিরে যাব। কেন না চন্দ্রবংশ এবার ছড়িয়ে যাবে। শুধু প্রতিষ্ঠানপুরের চৌহদ্দির মধ্যে আর চন্দ্রবংশকে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না।

ধরে নিতে পারি, নহুষ যখন পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন তার আগেই তাঁর সঙ্গে অশোকসুন্দরীর বিবাহ হয়েছিল। আমরা আগে বলেছি—অশোকসুন্দরী নামটার মধ্যে কিছু অর্বাচীনতা আছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রীর আসল নাম কী, তা মহাভারত থেকে জানা খুব কঠিন। তবে কতগুলি মহাপুরাণে এবং হরিবংশে নহুষের স্ত্রীর নাম বিরজা এবং এই নাম সেকালের নামের সঙ্গে মেলে। পুরাণ এবং হরিবংশে বিরজার কোনও বংশ বর্ণনা নেই। শুধু বলা আছে বিরজা হলেন 'পিতৃকন্যা' এবং সেই পিতৃকন্যার গর্ভে নহুষ পাঁচ অথবা ছয়টি পুত্রের জন্ম দেন। 'পিতৃকন্যা' শব্দটা শুনেই সাহেব-পণ্ডিতদের মধ্যে গুন-গুন রব উঠেছে। বিখ্যাত Pargiter সাহেব তো এক কলমের খোঁচায় বলে দিলেন—'Nahusa had six or seven sons by pitri-kanya Viraja, which no doubt means his sister'.

সাহেবের সন্দেহ থাকবে কেন? তাঁরা আমাদের ইতিহাস-পুরাণ পড়ে ফেলেছেন, বেদ পড়ে ফেলেছেন, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা। ব্যস্, আর আটকায় কে? বলে দিলেন—নহুষ পিতৃকন্যা বিবাহ করেছেন—মানে, নিজের বাপের মেয়েকে বিয়ে করেছেন—মানে, বোনকে বিয়ে করেছেন। সাহেবের ধারণা—নিজের বোনকে বিয়ে করেছেন—এসব কথা কি জনসমক্ষে বলা যায়? তাই একটা গাল-ভরা নাম দেওয়া হল—'পিতৃকন্যা'। আসলে এসব পৌরাণিকদের 'mythologizing'. আমরা বলি—সাহেব! আমরা যা করি, আমরা তা স্পষ্টভাবেই বলি। আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা নিজকন্যা শতরূপা -সাবিত্রীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, সে প্রবৃত্তি তিনিও লুকোননি, আমরাও লুকোইনি। এমনকি ব্রহ্মা পিতার কাণ্ড দেখে তাঁর ছেলেদের পর্যন্ত মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি 'অহো রূপং অহো রূপং' করতে করতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এ ঘটনার মধ্যে যত রূপকই থাক, আমরা লুকোইনি। লুকোনো আমাদের স্বভাব নয়। নমস্য মুনি-ঋষি, দেবতা থেকে আরম্ভ করে বাপ-ঠাকুরদা কারও অপকর্ম আমরা লুকোইনি। খামোখা এটাই বা লুকোতে যাব কেন?

আসলে সাহেব আমাদের বেদ-পুরাণ সব পড়েছেন, কিন্তু আসল সংস্কারটাই ধরতে পারেননি, ট্রাডিশন'টাও নয়। তুলনা দিতে সাহেবের জুড়ি নেই। তিনি হরিবংশের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন—শুকদেবের মেয়ে কৃত্বীও একজন পিতৃকন্যা। কিন্তু হরিবংশ বলেছে স্বয়ং শুকদেবের ওইরকম একটি কন্যা ছিল। তাঁর নাম কৃত্বী। শুকদেব সেই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন আজমীঢ় বংশের 'অণুহ'র সঙ্গে।

বঙ্কিমি ভাষায় বলতে হয়—ইহার দ্বারা কিসের উপপত্তি হইল? কিছু প্রমাণ হল কি? পারজিটারের ধারণায় এবং ভাষায় কৃত্বী যে শেষ পর্যন্ত শুকদেবের কন্যা রইলেন তা মনে হয় না। তাঁর বক্তব্য—The genealogies say that Nahusa's sons were born of pitri-kanya Viraja, connect a pitri-kanya with Visvamahat and call kritvi a pitri-kanya. There can be no doubt that the word meant 'father's daughter' that is 'sister' for union between brother and sister was not unknown, as Rigveda x. 10 about Yama and Yami shows.

AMARBOI.COM

বেদে কি যম-যমীর মিলন আছে নাকি? আমরা জানতাম না। ঋগ্‌বেদের বর্ণনায় যমী এই রকম একটা কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যম সেটা মানেননি। অপিচ ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে এইরকম অস্বস্তিকর আচরণ যে বিহিত নয়, তা বারবার যমের মুখেই শোনা যাচ্ছে। যা নিবারিত হল, তা যে কী করে বিধি হয়ে ফিরে এল, তা জানি না। ভ্রাতা-ভগিনীর 'ইনসেসচুয়াস রিলেশন' নিষিদ্ধ করার জন্য যে মন্ত্রবর্ণ রচিত হল, তা যে কী করে সিদ্ধরূপ লাভ করল (was not unknown) তা আমরা বুঝলাম না। আর শুকদেবের উদাহরণটা তো মিললই না। হরিবংশ বলেছে—শুকদেব তাঁর কৃত্বী নামের কন্যাকে বিবাহার্থে অণুহের হাতে দিয়েছেন। এরপর কথক ঋষি-ঠাকুর বলছেন—আমরা সনৎকুমারের কাছে শুনেছি যে ইনি একজন পিতৃকন্যা ছিলেন—সা হ্যদ্দিষ্টা পুরা ভীষ্ম পিতৃকন্যা মনীষিণী। এর থেকে Pargiter এর সিদ্ধান্ত—Nahusa and Visvamahat married their sisters and half-sisters and the same may be presumed of...Suka.

ডট্-ডটের মধ্যে আরও কতগুলি নাম আছে। সাহেব যে কোথা থেকে এসব বানালেন তা সাহেবরাই জানেন। Pargiter এর ওপর শত শ্রদ্ধা রেখে জানাই, হরিবংশ কিংবা পুরাণ তাঁর ইষ্টসিদ্ধির জন্য সেইভাবে পড়া থাকলেও পিতৃতত্ত্ব তিনি তত যুৎসই করে বোঝেননি। সাহেব যদি যত্ন করে হরিবংশের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়গুলি মন দিয়ে পড়তেন, অথবা পড়তেন অন্য পুরাণগুলি তাহলে আর তাঁকে হঠাৎ করে 'পিতৃকন্যার' এই আজগুবি তত্ত্ব ফেঁদে বসতে হত না। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক পুরাণে, হরিবংশে এবং মহাভারতে 'পিতৃগণ' এবং 'পিতৃবংশ' বলে একটা ভাবনা-চিন্তা আছে, সাহেব সেটা কিছুই বোঝেননি।

Pargiter হরিবংশে নহুষ এবং শুকদেবের ভগিনী-বিবাহ কল্পনা করেছেন। আমরা সেই হরিবংশ থেকেই জানাচ্ছি যে, আমাদের ভাবনায় সাতজন ঋষিস্বরূপ ব্যক্তি পিতৃপুরুষ নামে খ্যাত। এঁদের চারজনকে দেখা যায়, তিনজনকে দেখা যায় না। এঁরা যোগাচারী পুরুষ, কখনও বা যোগভ্রষ্টও হয়েছেন এবং তারপর আবার ব্রহ্মবাদী ঋষি হয়ে জন্মেছেন। পুরাণের ঋষিকল্পে আপনারা পুলহ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রমুখ প্রজাপতির নাম পাবেন। এরাই প্রথম লোকসৃষ্টি করেন। এই পুলস্ত্যের মানসী কন্যার নাম পীবরী। মানসী শব্দটার মধ্যে যদি আপনারা ধোঁকাবাজির গন্ধ পান, তাহলে ধরে নিন, কোনও অনামা স্ত্রীর গর্ভে পীবরী জন্মেছিলেন। এই পীবরী নিজে যোগিনী, যোগীর পত্নী এবং যোগীর মাতা। লক্ষ করে দেখবেন পীবরী শুধু পুলস্ত্যেরই কন্যা নন, তিনি অন্যান্য পিতৃগণেরও কন্যা। আমাদের স্বগত ধারণা—পুরাকালে যে সমস্ত কন্যা-সন্তান পিতামাতার অবহেলা লাভ করতেন, অথবা বাপ-মা-ভাইরা যে সমস্ত মেয়ের ভরণ-পোষণ করতেন না, তাঁরাই এসে জুটতেন ঋষিদের আশ্রমে।

ঋষির ঘরে খাবার-দাবারের অভাব হত না। এঁরা মমতায় ভালবাসায় ঋষির আশ্রম আলোকিত করতেন, কাজকর্মও করে দিতেন। আমাদের ধারণা, এই নামগোত্রহীনা রমণীরাই পিতৃকন্যা বলে পরিচিত হন। ঋষির আশ্রমে যেহেতু কাম-ক্রোধের প্রশ্রয় নেই অতএব এঁদের ধর্মসাধন, যোগসাধন করতে হত। হরিবংশ বলেছে—সর্বাশ্চ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সর্বাশ্চৈবোর্ধরেতসঃ। আপনারা কালিদাসের লেখায় মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে—অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথা শুনেছেন। তাঁদের অন্য কোন পিতৃ-মাতৃ পরিচয় নেই। তাঁরা কণ্ব-মুনির ঔরসজাত কন্যাও নন। আমাদের ধারণা, এঁদের মতো সাধনপরা রমণীরাই পিতৃকন্যা। কণ্বাশ্রমের আর্যা গৌতমীও তাই। সুপাত্র পেলে মুনিরা এঁদের বিয়েও দিয়ে দিতেন, নইলে তাঁরা আশ্রমেই থেকে যেতেন যোগচারিণী হয়ে।

পুলস্ত্যের যোগচারিণী কন্যা পীবরীর সঙ্গে শুকদেবের বিয়ে হয় এবং পীবরীর গর্ভে শুকদেবের চার পুত্র এবং কন্যা কৃত্বীর জন্ম হয়। এই কৃত্বীর সঙ্গেই অণুহের বিয়ে হয় এবং কৃত্বীর পুত্র পুরাণে সুবিখ্যাত ব্রহ্মদত্ত—

স (শুকদেবঃ) তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্য্যাং জনয়িষ্যতি।
কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং কৃত্বীং কন্যাং তথৈবচ।
ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীং ত্বণুহস্য চ।।

এখানে যে কোথায় শুকদেবের সঙ্গে তাঁর নিজের বোনের বিয়ে হল, তা সাহেবের ঈশ্বরই জানেন। সাহেব হরিবংশ থেকে শুকদেবের উদাহরণ দিয়েছেন আমরাও শুকদেবের ঘটনার নিরিখেই নহুষের কথা বলি। লক্ষ্য করলে দেখবেন—হরিবংশে 'বৈরাজ' পিতৃগণের নাম আছে, বিরাজ-প্রজাপতির পুত্রেরা 'বৈরাজ' নামে বিখ্যাত—বিরাজস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈরাজা ইতি বিশ্রুতা। নহুষের সঙ্গে যে পিতৃকন্যা বিরজার বিবাহ হয়েছিল, এই বিরজাও সম্ভবত 'বৈরাজ' পিতৃগণের যোগচারিণী কন্যা হবেন। মৎস্য পুরাণে পরিষ্কার বলা আছে—পুলহ-প্রজাপতির বংশে যে পিতৃগণ ছিলেন, তাঁদেরই মানসী কন্যার নাম বিরজা, যিনি নহুষের পত্নী, যযাতির জননী।

পুলহাঙ্গজদায়াদা বৈশ্যাস্তান্ ভাবয়ন্তি চ।
এতেষাং মানসী কন্যা বিরজা নাম বিশ্রুতা।
যা পত্নী নহুষস্যাসীদ্ যযার্তেজননী তথা।

এখানে কি কোথাও পেলেন যে, বিরজা নহুষের নিজের বোন। এক সাহেব 'ইন্দ্রিয়গ্রাম' অর্থ করেছেন village of senses. Pargiter-এর পিতৃকন্যাও সেই রকম—father's daughter. হাসব না কাঁদব। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে প্রজাপতিদের বংশ বর্ণনায় বৈরাজ পিতৃগণের কথা আছে—ভৃগুশ্চ বিরজাশ্চৈব কাশী চোগ্রশ্চ ধর্মবিৎ। নহুষপত্নী বিরজার নাম তাই কোনও অভাবনীয় ব্যাপার নয়। তাঁর 'পিতৃকন্যা' হওয়াটাও কোনও অবৈধ ব্যাপার নয়।

মহামতি Pargiter-এর ভ্রম উপস্থিত হয়েছে কেন, আমরা জানি। আধুনিক প্রগতিশীল অনেক গবেষকের উর্বর প্রতিভার সঙ্গে Pargiter-এর প্রতিভাও তুলনীয়। প্রাচীনেরা রমণীকে সবসময়েই ভোগ্যবস্তু হিসেবে ভেবেছেন—এই চরম ধারণা থেকেই এই মতের সৃষ্টি। 'পিতৃকন্যা'র মতো শব্দগুলি এই পূর্বকল্পিত ধারণা বা 'অবসেশন' থেকেই অপব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রাচীনদের মতো অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সমগোত্রীয় রমণীর প্রতি যদি আজও সেই সমব্যথা থাকত, তাহলে গবেষকরা বুঝতেন, প্রাচীন ঋষি-মুনিদের আশ্রমবাড়িতে নাম-গোত্রহীন কত 'পিতৃকন্যা' সসম্মানে জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের কারও বিবাহ হয়েছে, কারও বা হয়নি। যাঁর বিবাহ হয়ে যেত, সে পুরাতনী সখীর গলা ধরে 'পিয়সহি' বলে কাঁদত, আর ঋষি-পিতা সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—ওদের জন্য অমন করে কেঁদো না, বৎসে! ওদেরও তো বিয়ে দিতে হবে—বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে। এঁরাই আমাদের ধারণায় পিতৃকন্যা, পৌরাণিক ব্যাখ্যায় নাই বা গেলাম।

না, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার বিয়ে হয়নি। হলেও আমরা জানি না। তাঁরা কাব্যে উপেক্ষিতা। কিন্তু নহুষের বেলায় বেশ বুঝতে পারি, তাঁর জীবনের প্রথম কল্পে ঋষি-মুনিদের সঙ্গে যখন তাঁর দহরম-মহরম চলছে, তখনই কোনও আশ্রমবাসিনী 'পিতৃকন্যা' বিরজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তী পৌরাণিক সেই পিতৃকন্যার প্রতি অনুকম্পায় তাঁর নতুন নামকরণ করবেন—অশোকসুন্দরী। কিন্তু যত সুন্দরীই তিনি হোন, তাঁকে যোগচারিণী তপস্বিনী করে

রাখতে পৌরাণিক কিন্তু ভুলবেন না। গল্পের গরু যেমন করে লাফিয়েই গাছে উঠুক, বিরজা নামের সেই পিতৃকন্যার স্মৃতিটি অর্বাচীন পুরাণের কথক ঠাকুর ভুলতে পারেননি বলেই অশোকসুন্দরীকে নির্জন বনে নহুষের জন্য তপস্বিনী করে রেখেছেন—তস্য হেতোস্তপস্তেপে নিরালম্বা তপোবনে—অথবা সেই কারণেই অশোকসুন্দরীও শিব-শিবানীর মানসকন্যা। আমরা 'পিতৃকন্যা' শব্দের যে অর্থকল্পনা করেছি, তাতে মানসকন্যাকে পিতৃকন্যা বলতে অসুবিধে নেই কোনও। যে অর্থে অশোকসুন্দরী মানসকন্যা সেই অর্থে বিরজাও পিতৃকন্যা। মানুষটি একই, নামভেদমাত্র।

পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে নহুষের ছ'টি ছেলে। পুরাণগুলিতে ছেলের সংখ্যা কোথাও পাঁচ, কোথায় ছয়, কোথাও বা সাতটি। মহাভারতে ছয় ছেলের নাম—যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি এবং ধ্রুব। পুত্রসংখ্যা ছয় কি সাত, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল—প্রথম দু'জন ছাড়া আর কারও না জন্মালেও চলত। কালিদাস এক স্বয়ংবর সভার চিত্রে নায়ক পদবির এক পুরুষের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—দুনিয়ায় অনেক ছোটখাট রাজা থাকলেও যে ব্যক্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলা যায়—এই রাজার জন্য পৃথিবী নিজেকে সনাথা রাজন্বতী মনে করেন, ইনি তাই। নহুষের ছয় পুত্র থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রত্ব-পাওয়া পিতার পিতৃত্ব যে পুত্রের দ্বারা সার্থক হয়েছে, তিনি হলেন যযাতি।

নহুষের প্রথম এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন যতি। যতি শব্দের সাধারণ অর্থ যোগী, মুনি। নহুষ-পুত্র যতির ক্রিয়া-কলাপও তাঁর নামের সার্থের মতোই। তিনি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করে বনবাসী হলেন ব্রহ্মোপলব্ধির পরম আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য। ধারণা হয়—পিতা নহুষকে তিনি চরম ঐশ্বর্যের মধ্যে দেখেছেন এবং একই সঙ্গে ঐশ্বর্যের মোহে তাঁর বিকারগুলিও তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন। পরিশেষে নিরাসক্ত মুনিদের দ্বারা তাঁকে স্বর্গভ্রষ্ট হতেও দেখেছেন। পিতার সমস্ত ঘটনা হয়তো নহুষের প্রথম পুত্রের মনে নির্বেদ এনে দিয়েছে। তিনি মুনি হয়ে গেলেন—যতিস্তু যোগমাস্থায় ব্রহ্মীভূতো'ভবন্ মুনিঃ।

নহুষের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সেই কথোপকথন স্মরণ করুন। যুধিষ্ঠির যে জাতি-বর্ণ মাথায় তুলে দিয়ে শুধু গুণ এবং সদাচারের নিরিখে ব্রাহ্মণত্ব নির্ধারণ করেছিলেন, নহুষের প্রথম পুত্রই তার উদাহরণ। তৎকালীন সময়ে পিতা স্বর্গভ্রষ্ট তথা ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে পতিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর প্রথম পুত্রের ব্রাহ্মণত্বে বাধা হয়নি। সমাজ তাঁকে ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা মুনির সম্মান দিয়েছে।

যতি বনবাসী হলে নহুষের দ্বিতীয় পুত্র রাজা হলেন। শুধু রাজা নন, সম্রাট। অকৃত্রিম রাজগুণের সঙ্গে বিনয়শিক্ষা মিশ্রিত হওয়ায় তাঁর দিন আরম্ভ হত দেবতার পূজা এবং পিতৃপুরুষের তর্পণের মধ্য দিয়ে। অনুপযাচী ব্রাহ্মণদের যাতে কথঞ্চিৎ বৃত্তির ব্যবস্থা হয় তার জন্য মাঝে মাঝে দান-যজ্ঞের ব্যবস্থা করতেন যযাতি—ঈজে চ বহুর্ভি মুখৈঃ। আর সবার ওপরে ছিল প্রজাপালনের হিতৈষণা। একদিকে সুপ্রযুক্ত পররাষ্ট্রনীতি, অন্যদিকে প্রজারঞ্জন—এই দুয়ে মিলে যযাতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দৃঢ়ভিত্তির ওপর। যযাতির বংশ থেকেই যেহেতু মহাভারতের কথা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন ধরনের জটিলতা এবং নবতর মাহাত্ম্য সূচিত হয়েছে, তাই যযাতিকে আমাদের দেখতে হবে অসীম গুরুত্ব দিয়ে—নতুন ভাবনায়, নতুন আলোয়, নতুন পর্ববিভাগে।

AMARBOI.COM

উনত্রিশ

স্বর্গরাজ্যের অবস্থা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। দৈত্য-দানবের আক্রমণ তো ছিলই। তার মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রিয়া-কলাপ এবং রাজ্য-শাসনও নিশ্চয় ভাল ছিল না। ভাল হলে, তাঁকে স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হত না, মর্ত্যের মানুষ নহুষকেও বরণ করে নিয়ে যেতে হত না স্বর্গের রাজত্ব করার জন্য। তবে যত অন্যায়ই করুন, ইন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারতেন খুব তাড়াতাড়ি। তাই নিজেকে সংশোধন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মতো মহত্তর দেবতাদের সাহায্য পেতেও তাঁর দেরি হত না।

আগে যে ইলাবৃত-বর্ষের কথা বলেছিলাম, স্বর্গ এখন আর সে জায়গায় নেই। সেটা বোঝাও যায়। বেদের মধ্যে সিন্ধু নদীর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অপিচ বেদোত্তর যুগে হিমালয় এবং মানস সরোবরের কাছাকাছি অঞ্চলগুলির প্রাধান্যের নিরিখে বোঝা যায়—স্বর্গরাজ্যের ঠিকানা বদলে গেছে। মহাভারতের বনপর্বে অর্জুন যখন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে স্বর্গে ঘুরে এলেন, তখন স্বর্গের রথ যেখানে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেটা গন্ধমাদন পর্বতের কাছে একটা জায়গা। স্বর্গ যে সেখান থেকে খুব দূরে তো মনে হয় না। বরঞ্চ বলা যায়—স্বর্গ এখন অনেকটাই মানুষের নাগালের মধ্যে। মানুষ সেই স্বর্গে যায়। দেবতাদের সঙ্গে তার দেখা হয়, দরকারে সাহায্যও করে।

স্বর্গরাজ্যের সব চেয়ে বড় সমস্যা হল দৈত্য-দানবদের আক্রমণ। দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে পার্থক্য বেশি কিছু নেই। এঁরা সবাই দেবতাদের বৈমাত্রেয় ভাই। একই পিতার সন্তান মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। পার্থক্য শুধু, দেবতারা কশ্যপের প্রথমা পত্নী অদিতির পুত্র, দৈত্যেরা দ্বিতীয়া পত্নী দিতির পুত্র, আর তৃতীয়া পত্নী দনুর পুত্র হলেন দানবেরা।

নহুষের পিতা আয়ু যাঁকে বিয়ে করেছিলেন, পুরাণে তাঁর নাম কোথাও প্রভা, কোথাও বা

বাহুপুত্রী।—পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্তু আয়ুর্নাম স বাহোর্দুহিতরমুপযেমে। কিন্তু মহাভারতে এবং অধিকাংশ পুরাণে আয়ুর স্ত্রীর কোনও নাম নেই, তিনি শুধুই স্বর্ভানবী অর্থাৎ স্বর্ভানু রাজার কন্যা। আমাদের ধারণা স্বর্ভানু একজন দানব রাজা। মহাভারতে দনুপুত্র দানবদের লিস্টিতে তাঁর নাম আছে—স্বর্ভানুরশ্বো'শ্বপতিঃ। সেকালে এটা কিছু অপূর্ব নয়। দৈত্য-দানবদের অনেক মেয়েই মানুষের গৃহবধূ হয়ে এসেছেন। তাঁদের চাল-চলনও যথেষ্ট মানুষোচিত এবং যথেষ্টই ভদ্র।

আগেই বলেছি—নহুষের রাজা হতে হয়তো কিছু দেরি হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এক ভাই রজিও ছিলেন বিখ্যাত রাজা। রজি যখন রাজা হলেন মর্ত্যভূমিতে, তখন স্বর্গরাজ্যে দেবাসুর সংগ্রাম চলছে পুরোদমে। দৈত্যদের রাজা তখন বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ পরম বৈষ্ণব হলে কী হবে, তাঁর দাপট কিন্তু সাংঘাতিক। দৈত্য-বাহিনী নিয়ে প্রহ্লাদ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেছেন। দেবতাদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছে। দেবতাদের উদ্যোগের বিরাম নেই। সমস্ত দেব-বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে আত্মরক্ষায়। দুপক্ষের তুমুল সংগ্রাম চলছে, কেউ জিতছেও না, হারছেও না। দেবতারা দৈত্যদের মেরে সাফ করে দিতে চান। অসুর-দৈত্যরাও স্বর্গধাম থেকে দেবতাদের নাম চিরতরে মুছে দিতে চান। কিন্তু যুদ্ধে দু-পক্ষই সমান হওয়ার দরুন একসময় তাঁরা যুক্তি-বুদ্ধি করার জন্য লোক-পিতামহ ব্রহ্মার কাছে এসে পৌঁছলেন—পরস্পরবধেপ্সবো দেবাশ্চ অসুরাশ্চ ব্রহ্মাণং পপ্রচ্ছুঃ।

দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন—ঠাকুর! আমরা কি এই যুদ্ধে জিতব? একই সময়ে অসুর-দৈত্যরাও জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের অবস্থাটা কী বুঝছেন? আমরাই কি জিতব? প্রজাপতি ব্রহ্মা দুই পক্ষেরই ঠাকুরদাদা। তিনি আর কী বলবেন? অনেক ভেবে-চিন্তে দু-পক্ষেরই মন রেখে তিনি জবাব দিলেন—তোমাদের দু-পক্ষের মধ্যে মর্ত্যভূমির রাজা রজি যাঁদের হয়ে অস্ত্র হাতে তুলবেন, তাঁরাই এই ভয়ংকর যুদ্ধে জয় লাভ করবেন—যেযামর্থে রজিরাত্তায়ুধো যোৎস্যতীতি। ব্রহ্মা রজির অনেক প্রশংসা করলেন। বললেন—রজির যেমন ধৈর্য, তেমনটি কারও নেই। যেখানে ধৈর্য, সেইখানেই বিজয়-লক্ষ্মীর চিরাবাস। তোমরা রজির কাছে যাও। তিনি যে পক্ষে যুদ্ধ করবেন, সেখানেই জয়।

ব্রহ্মার কথা শুনে সুরাসুর দুই পক্ষই রজির সঙ্গে সমঝোতা করতে গেলেন। দৈত্যরা বললেন—মহারাজ! আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি আমাদের জয়ের জন্য ধনুর্ধারণ করুন—উচু রস্মজ্জয়ায় ত্বং গৃহাণ বরকার্মুকম্। মর্ত্যভূমির রাজা রজি দেখলেন—এই সুযোগ! একজন উন্নতিকামী রাজা নিজের স্বার্থ দেখবেন আগে। তারপর অন্যকে সাহায্য করার প্রশ্ন আসবে। রজি বললেন—যুদ্ধ করব নিশ্চয়, তবে যাদের হয়ে আমি যুদ্ধ করব, তারা জিতলে স্বর্গের ইন্দ্রপদ আমাকে দিতে হবে—ইন্দ্রো ভবামি ধর্মেণ ততো যোৎস্যামি সংযুগে। দৈত্য-দানবেরা সরল মানুষ। রজির প্রস্তাব শুনেই তাঁরা বললেন—দেখুন, আমাদের মনে-মুখে এক। বলব একরকম, আর করব একরকম—এ আমাদের চরিত্র নয়—ন বয়মন্যথা বদিষ্যামো'ন্যথা করিষ্যামঃ। দৈত্যরা তাঁদের মনের কথা পরিষ্কার করে বললেন—আমাদের ইন্দ্র হলেন প্রহ্লাদ। আমাদের যত চেষ্টা, যত উদ্যম—সবই তাঁর জন্য। আমরা যে যুদ্ধে জয় চাই, সেও তাঁরই জন্য—অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদো যস্যার্থে বিজয়ামহে। অতএব মহারাজ! আমরা এরকম কোনও আগাম কথা দিতে পারব না যে, যুদ্ধে জিতলে আপনাকেই আমরা ইন্দ্র বানাব। দুঃখিত মহারাজ। আমাদের কিছু করার নেই।

AMARBOI.COM

অসুরেরা চলে গেলে এবার দেবতারা এলেন রজির কাছে। নিজের স্বার্থ এবং ইন্দ্রত্বের যশঃপ্রার্থী রজি দেবতাদের কাছেও সেই একই প্রস্তাব দিলেন—যুদ্ধ জিতলে আমাকে কিন্তু ইন্দ্রের পদটি দিতে হবে। দেবতারা সময় বুঝে বললেন—সে আর বলতে! আপনি যা বলছেন, তাই হবে। যুদ্ধে যদি অসুরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি, তো, আপনিই ইন্দ্র হবেন—ভবিষ্যসীন্দ্রো জিত্বৈবং দেবৈরুক্তস্তু পার্থিবঃ।

আয়ুপুত্র রজি দেবতার কথা বিশ্বাস করে দেবতাদের জন্য অসুরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র রজির কাছে এসে রজির পা দুটি নিজের মাথায় রাখলেন—রজি-চরণ-যুগলম্ আত্মশিরসা নিপীড্যাহ। বললেন—মহারাজ! আপনি আমার মা-বাপ। অসুরদের ভয় থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন বলে, আজ থেকে আপনি আমার পিতা হলেন—ভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্।

নীতিশাস্ত্রে পাঁচ রকমের ব্যক্তিত্ব পিতার সংজ্ঞায় ভূষিত। যিনি অন্ন দান করেন, যিনি ভয় থেকে বাঁচান, যিনি কন্যা দান করেন, যিনি জন্মদাতা এবং যিনি উপনয়ন দেন—এই পাঁচ রকমের পিতার সংজ্ঞা বলা আছে স্মৃতিশাস্ত্রে। সম্ভবত পিতৃত্বের এই অভিধান মাথায় রেখেই ইন্দ্র বললেন—আপনি অসুরবিজয় সম্পন্ন করে আমাদের ভয় অপনোদন করেছেন; অতএব দেবতাদের মধ্যে আপনি ইন্দ্র বলে পরিচিত হলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ইন্দ্র আজ থেকে আপনার ছেলে বলেই পরিচিত হব—যস্যাহমিন্দ্রঃ পুত্রস্তে খ্যাতিং যাস্যামি কর্মভিঃ।

ইন্দ্রের কথার মধ্যে মায়া ছিল। কৌশল ছিল। ধরুন, কোনও পিতা তাঁর সন্তানকে কোনও একটি অঙ্গরাজ্যের রাজা করে দিয়েছেন। হঠাৎ সন্তান সেই রাজ্য নিয়ে বিপাকে পড়ল। পিতা এলেন সন্তানের জন্য যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে যদি জয় লাভ করা যায়, তবে পিতা কী করেন? তিনি পুনরায় তাঁর সন্তানকে আপন রাজ্যে সুস্থিত করে ফিরে আসেন। দেবরাজ ইন্দ্র যে রজির পায়ে মাথা খুঁড়ে তাঁর পুত্রত্ব স্বীকার করে নিলেন তার একটাই মানে। অর্থাৎ পিতা হয়ে কি কেউ পুত্রের রাজ্য দখল করে সেই রাজ্যের রাজা হয়ে বসেন? রজি ইন্দ্রের চালাকি সব বুঝলেন। কিন্তু সব বুঝলেও তিনি চন্দ্রবংশের গরিমা বহন করেন। শত্রুপক্ষে থেকেও যদি কোনও প্রধান-পুরুষ এইভাবে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে, তবে তাঁকে তাঁর অভীষ্ট বস্তু ফিরিয়ে দিতেই হয়—অনতিক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধ-চাটু-বাক্যগর্ভা প্রণতিঃ।

রজি ইন্দ্রের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। স্বর্গে ইন্দ্র রাজত্ব করতে লাগলেন—শতক্রতুরপীন্দ্রত্বং চকার। অসুর-বিজয়ের পরিবর্তে স্বর্গে ইন্দ্র হওয়ার যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন রজি, স্বয়ং ইন্দ্রের মায়া-চাটুবাদে তা বিফল হয়ে গেল। রজি মর্ত্যভূমিতে নিজের রাজত্ব চালিয়েই শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। এইবারে আসল লড়াই আরম্ভ হল। পিতার সম্পত্তির দায়ভাগ নিতে আধুনিক যুগে যে মামলা চলে, এবার সেই মামলার শুনানি আরম্ভ হল রজির মৃত্যুর পর।

ইন্দ্র রজির পুত্রত্ব স্বীকার করে নিয়ে স্বর্গের অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন। এদিকে মর্ত্যভূমিতে রজির পুত্র ছিলেন পাঁচশোজন। পৌরাণিকতার অতিবাদে রজির পুত্রসংখ্যা পাঁচশো নাই হোক, অন্তত অনেকগুলি পুত্র তাঁর ছিল। তাঁরা অত্যন্ত বলশালী এবং যুদ্ধবীর বলে খ্যাত ছিলেন। সবাই তাঁদের 'রাজেয়' ক্ষত্রিয় উপাধি দিয়েছিল। রজির মৃত্যুর পর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন—পিতা নিজে ইন্দ্র হতে না পেরে পুত্রত্ব-স্বীকার করা দেবরাজকে ইন্দ্রত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রজির পুত্রত্বই যদি ইন্দ্রত্ব লাভের প্রধান মাপকাঠি হয়, তবে তাঁরাই তো এখন

AMARBOI.COM

স্বর্গরাজ্যের আসল দাবিদার। আইনের সব দিক ভেবে রাজেয় ক্ষত্রিয়রা ইন্দ্রের কাছে গেলেন। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারে সমস্ত আইন দেখিয়ে তাঁরা বললেন—ইন্দ্রত্বের অধিকার এখন আমাদের। তাঁর নিজের ছেলেরা যেখানে বেঁচে আছে, সেখানে আপনার কোনও অধিকার টেকে না। বলা বাহুল্য রজির ছেলেদের পক্ষে প্রধান উকিল ছিলেন দেবর্ষি নারদ—নারদর্ষিচোদিতা রজিসুতাঃ শতক্রতুম্ আত্মপিতৃপুত্রসমাচারাদ্ রাজ্যং যাচিতবন্তঃ।

ভাল কথায় ইন্দ্র রাজ্য দিলেন না। রজির পুত্রেরা সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করলেন। তাঁরা অসীম শক্তিধর। অতি সহজেই ইন্দ্রকে তাঁরা পরাস্ত করলেন এবং স্বর্গ অধিকার করে নিলেন—অবজিত্য ইন্দ্রম্ অতিবলিনঃ স্বয়ংমিন্দ্রত্বং চক্রুঃ। অনেক কাল চলে গেল। ইন্দ্র কিছুই করতে পারলেন না। পৃথিবীর মানুষেরা ইন্দ্রকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। তাঁরা কেউই আর ইন্দ্রের সন্তুষ্টির জন্য যাগ-যজ্ঞের আয়োজন করে না। অগ্নিতে এক ফোঁটাও ঘৃতাহুতি দেয় না ইন্দ্রের উদ্দেশে। ইন্দ্র শেষে মনের দুঃখে দেব-পুরোহিত বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বললেন—আপনি আমার জন্য একটু ঘি আর এক টুকরো পুরোডাশের ব্যবস্থাও কি করতে পারেন না?

পুরোডাশ এক ধরনের পিঠের মতো জিনিস। পূর্বকালে বৈদিক-যজ্ঞে ঘি আর পুরোডাশ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হত। ইন্দ্রের করুণ কথা শুনে বৃহস্পতি নানা যাগ-যজ্ঞ করে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি করলেন। নিজে গিয়ে রজির ছেলেদের নানা কথা বলে বিভ্রান্ত করলেন। তাঁদের বোঝালেন—বেদ-ব্রাহ্মণ কিচ্ছু নয়। তোমরাই সব। বৃহস্পতির কথা শুনে রজির ছেলেরাও অকর্ম-কুকর্ম আরম্ভ করল। সেকালের দিনে বেদ-ব্রাহ্মণের ওপর আস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়া মানেই তার রাজ্যচ্যুতি হতে দেরি লাগত না। রজিপুত্রেরা রাজ্য হারালেন। ইন্দ্র আবার স্বর্গরাজ্যে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

রজির কাহিনী আপনারা শুনলেন। নহুষের কাহিনী আমরা পূর্বে বলেছি। রজি এবং নহুষ দুজনেই আয়ুপুত্র। দুজনের আমলেই ইন্দ্র নিজের রাজ্য হারিয়েছেন। মর্ত্যভূমির রাজাদের হাতেই তাঁর যখন এই নাকাল অবস্থা, সেখানে দেবতাদের চিরশত্রু দৈত্য-দানবদের আক্রমণ হলে ইন্দ্রের অবস্থা যে কতটা করুণ হয়ে উঠতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। আমরা তাই প্রথমেই বলেছি—স্বর্গভূমির অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না মোটেই। নহুষ যখন ইন্দ্রপত্নী শচীকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন আমরা দেবগুরু বৃহস্পতিকে যথেষ্ট উদ্যোগ নিতে দেখেছি ইন্দ্রের অনুকূলে। রজির পুত্র রাজেয় ক্ষত্রিয়রা যখন স্বর্গের ওপর ইন্দ্রের স্বত্ব-বিলোপ ঘটালেন তখনও আমরা সেই বৃহস্পতিকেই দেখেছি ইন্দ্রের সাহায্যে এগিয়ে আসতে। ইন্দ্রের বিপদে এই বৃহস্পতির বুদ্ধিই তাঁকে বারবার বাঁচিয়েছে।

রজির পুত্রেরা যখন ইন্দ্রকে মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিলেন, তখন বৃহস্পতির কাছে সামান্য এক টুকরো পুরোডাশের জন্য ইন্দ্র দীন ভিখারীর মতো উপস্থিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র বলেছিলেন—ঠাকুর! আমার খাবার-দাবার সব শেষ। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি, শরীরটা বড় দুর্বল, মনেও আমার কোনও সুখ নেই—ব্রহ্মন্ কৃশো'হং বিমনা হৃতরাজ্যো হৃতাশনঃ। হতৌজা দুর্বলো মূঢ়ঃ। বৃহস্পতি বলেছিলেন—তোমার এই অবস্থা হয়েছে, অথচ আগে একবারও একটু জানাওনি আমাকে। আগে জানলে এত খারাপ অবস্থা তোমার কখনও হত না। তোমার জন্য আমি করিনি বা পরে করব না, এমন কাজ তো কিছু নেই—নাভবিষ্যত্ তৎপ্রিয়ার্থমকর্তব্যং মমানঘ।

সত্যি কথা, স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের সুস্থিতির জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি করেননি হেন কাজ নেই।

নিজে বেদবাদী ব্রাহ্মণ হয়েও রজির পুত্রদের নাস্তিকের ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। একবার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তপস্যায় গেলে বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের বেশ ধরে দৈত্যশিবিরে গিয়েছিলেন এবং দৈত্যদের এমন কুশিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাঁদের সে শিক্ষা ভুলতেই সময় লেগেছিল কয়েক বছর। এসব তো সামান্য কথা। ইন্দ্র এবং অপরাপর দেবতাদের জন্য অনেক গভীর অন্যায় এবং ছলের আশ্রয় নিয়েছেন বৃহস্পতি। কিন্তু তবু কখনও এমন হয়নি যে, দৈত্য-দানবেরা তাঁর বুদ্ধিতে চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেল আর দেবতারা চিরতরে স্বর্গলক্ষ্মীর ঐশ্বর্য ভোগ করলেন।

না, এমন হয়নি। হয়নি, তার কারণ বলেছিলাম প্রথমে। অমৃত, লক্ষ্মী এবং স্বর্গরাজ্যের অধিকার নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের চিরকালের লড়াই লেগেই ছিল। এই লড়াইতে দেবগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবতাদের স্বার্থরক্ষায় সদা-সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন, তেমনই শুক্রাচার্য নিয়েছিলেন অসুরদের পক্ষ। শুক্রাচার্য মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণ। আমরা পূর্বে ভৃগু এবং পুলোমার কাহিনী বলেছি। শুক্রাচার্য ভৃগু-পুলোমার সাত ছেলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। মহাভারতের একটি শ্লোক দেখে অবশ্য মনে হয়, শুক্রাচার্য ভৃগুর ছেলে না হয়ে নাতিও হতে পারেন। ভৃগুর পুত্র কবি, কবির পুত্র শুক্রাচার্য—ভৃগোঃ পুত্রঃ কবি র্বিদ্বান্ শুক্রঃ কবিসুতো গ্রহঃ। আবার কোনও মতে ভৃগুমুনির অন্য নামই হল কবি। অতএব শুক্রাচার্য ভৃগুরই পুত্র। দেব-দানবদের প্রথম সংঘাতের সময় থেকেই বৃহস্পতি দেবতাদের পক্ষে আর শুক্রাচার্য দৈত্য-দানবদের পক্ষে যোগ দেন। শুক্র দেব-দানবদের পরামর্শদাতা, গুরু—অসুরাণামুপাধ্যায়ঃ শুক্রস্তু ঋষিসুতোঽভবৎ।

মহাভারতে শুক্রাচার্যের বাসস্থানটিও বড় চমৎকার। তিনি নাকি মেরু-পর্বতের চূড়ায় থাকেন আর সমস্ত দৈত্য-দানবেরা দিনরাত তাঁর পরিচর্যা করছে—তসৈব্য মূর্ধ্নুশনাঃ কাব্যো দৈত্যৈ র্মহামতে। তাঁর ভাণ্ডারে ধন-রত্নের শেষ নেই। সে ধন-রত্নের পরিমাণ এতটাই যে, ধনপতি কুবেরকে তিনি তাঁর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ভাগ দেন—তস্মাৎ কুবেরো ভগবান্ চতুর্থং ভাগমশ্নুতে।

শুক্রাচার্যের চার ছেলে এবং তাঁরাও অসুর-রাক্ষসদের যাজন করেন। শুক্রাচার্য যখন থেকে অসুরদের গুরু হয়েছেন, তখন থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত দেবতা এবং অসুরদের বিরাট বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং সে যুদ্ধের সংখ্যা বারো। অসুরদের মধ্যে হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ এবং বলি—এঁরা তিনজনই ইন্দ্রপদ লাভ করেন—ইন্দ্রাস্ত্রয়স্তে বিখ্যাতা অসুরাণাং মহৌজসঃ—এবং প্রায় দশ যুগ এঁরা তিন ভুবনের সর্বময় অধিকর্তা ছিলেন। কিন্তু বলি বামনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজ্য হারালে স্বয়ং ইন্দ্র আবার স্বর্গ দখল করেন। অসুরদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ হয়ে পড়ল। মাঝে মাঝেই দেবতাদের অতর্কিত আক্রমণে অসুরেরা প্রাণ হারাতে লাগলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর অসুর-শিষ্যদের ডেকে বললেন—বারোটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রধান প্রধান অসুরেরা সকলেই প্রায় নিহত হয়েছেন। এখন আর মাত্র ক'জন তোমরা বেঁচে আছ—কিঞ্চিচ্ছিষ্টাস্তু বৈ যূয়ং যুদ্ধেষ্বস্ত্যেষু বৈ স্বয়ম্। এই অবস্থায় তোমরা আর যুদ্ধের কোনও চেষ্টাই করো না। আমি অতি শীঘ্রই মহাদেবের তপস্যা করতে যাব। আমি জানি—ওদিকে বৃহস্পতি দেবতাদের জন্য কী মন্ত্র সাধনা করছেন। মহাদেবের উপাসনা করে আমাকে সেই মন্ত্র জেনে আসতে হবে, যা বৃহস্পতি কিংবা দেবপক্ষের অন্য কেউ জানেন না। তোমরা যুদ্ধ-বাসনা ত্যাগ করে আপাতত দেবতাদের সঙ্গে সন্ধি করো।

গুরুর কথা শুনে দৈত্যকুলের তদানীন্তন মুখপাত্র বুড়ো প্রহ্লাদ দেবতাদের ডেকে বললেন—আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে আর আমাদের কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ রইল না। তোমরা এই তিন ভুবনের অধিকার নাও—ন্যস্তবাদা বয়ং সর্বে লোকান্ যূয়ং ক্রমস্তু বৈ।

AMARBOI.COM

আমাদের যা অবস্থা তাতে আমাদের গাছের বাকল পরে বনবাসী তপস্বী হওয়া ছাড়া কোনও উপায় আর নেই। তোমরা সুখে রাজত্ব করো।

অসুরেরা যা বলেন, তাই করেন। শুক্রাচার্যও অসুরদের পরিকল্পনা অনুমোদন করে বললেন—আমি যতদিনে মহাদেবের তপশ্চর্যা সেরে ফিরে না আসি, ততদিন তোমরাও সংযত হয়ে তপস্যায় মন দাও—যূয়ং তপশ্চরধ্বং বৈ সংবৃতা বল্কলৈর্বনে। তারপর আমি ফিরে এলে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে আবার। সেখানে তোমাদের জয় হবে সুনিশ্চিত। শুক্রাচার্য চলে গেলেন। অসুররাও মন দিলেন তপস্যায়। দেবতারা একে একে অসুরদের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি অধিকার করে নিলেন নিশ্চিন্তমনে।

শুক্রাচার্য মহাদেবের কাছে গিয়ে বললেন—প্রভু! আমি এমন বিদ্যা চাই, যা দেবগুরু বৃহস্পতিও জানেন না—মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ। মহাদেব দেখলেন শুক্রাচার্য যে উদ্যম নিয়েছেন—তাতে দেবতাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ইচ্ছে করেই এমন এক কঠিন তপশ্চরণের নির্দেশ দিলেন শুক্রাচার্যকে, যা মনুষ্যদেহে প্রায় অসম্ভব। তিনি বললেন—তুমি যদি হাজার বছর ধরে অবাঙ্‌মুখ অবস্থায় শুধু কুণ্ডধূম পান করে তপস্যা করতে পার তবেই বৃহস্পতির অগম্য সেই মন্ত্র লাভ করবে তুমি। শুক্রাচার্য মহাদেবের নির্দেশ মেনে তাঁরই নির্দিষ্ট একটি ধূমোদগারী কুণ্ডাধারের পাশে তপস্যায় বসে গেলেন—ততো নিযুক্তো দেবেন কুণ্ডাধারো'স্য ধূমকৃৎ।

ধূমোদ্‌গারী কুণ্ডাধার আমাদের ধারণায় কোন 'হট-স্প্রিং' হবে বোধহয়, আর হাজার হাজার বছরের তপস্যা মানে বহু বছরের তপস্যা। সে যাই হোক শুক্রাচার্য একদিকে তপস্যায় বসলেন, অন্যদিকে অসুরেরাও নিয়ম-ব্রতে মন দিলেন। দেবতারা অবশ্য এই সুযোগ ছাড়লেন না। এই অবস্থাতেও তাঁরা অসুরদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। অসহায় অসুরেরা তখন শুক্রের মায়ের কাছে আশ্রয় নিলেন। শুক্রমাতা কোনওক্রমে অসুরদের বাঁচিয়ে রাখলেও তিনি নিজে দেবতাদের হাত থেকে নিস্তার পাননি। কিন্তু সুবিধা ছিল—সেটা ভৃগুমুনির আশ্রম। ভৃগুমুনি খুব সহজ লোক নন। একালের কবি তাঁকে বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছেন, কাজেও তিনি তাই ছিলেন। ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে যাঁর বাঁধেনি, তাঁর পক্ষে ইন্দ্র-বিষ্ণুর সাহস প্রতিহত করা মোটেই অসম্ভব হয়নি। অসুরেরা শুক্রমাতার নিরাপদ আশ্রয়ে কোনওরকমে বেঁচে রইলেন।

দেবতারা প্রমাদ গনলেন। সব কিছু পেয়েও ইন্দ্রের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেন শুধু শুক্রাচার্য। তিনি নিশ্চল তপস্যায় মগ্ন। ঠিক এই সময়ে ইন্দ্র দুটি কাজ করলেন। কাজ দুটি ক্রমান্বয়ে বলতে হবে। প্রথম কাজ—ইন্দ্র তাঁর নিজের মেয়ে জয়ন্তীকে ডেকে বললেন—বৎসে! একটা কাজ করে দিতে হবে তোমায়। অসুরগুরু শুক্রাচার্য ধূমব্রত গ্রহণ করে দুশ্চর তপস্যা করছেন মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য। এই কারণে আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। হয়তো আমার ইন্দ্রত্বই চলে যাবে। এই সময়ে আমার আদেশে তুমি শুক্রাচার্যের কাছে যাও। তাঁর যেমন ভাল লাগে, তেমন ব্যবহারে, নানা উপচারে তুমি তাঁকে সেবা করে বশ করো—সমারাধয় তন্বঙ্গি মৎকৃতে তং বশং কুরু। শুধু আমার জন্য এই কাজটা তোমায় করে দিতে হবে।

ইন্দ্র জানতেন—মনোমোহিনী অপ্সরাদের শুক্রাচার্যের কাছে পাঠালে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাতে তপস্বী মুনির অভিশাপ জোটা মোটেই অসম্ভব নয়। তার চেয়ে নিজের মেয়ে যদি বাপের করুণ অবস্থা বুঝে তোষামোদ আর ভালবাসায় কার্যোদ্ধার করতে পারে, সেটাই

AMARBOI.COM

হবে সবচেয়ে ভাল। শব্দটাও তিনি ব্যবহার করেছেন মোক্ষম—বশং কুরু—বশ করতে হবে, যেভাবে হোক। নিজের মেয়েকে এর চেয়ে বেশি কীই বা আর বলা যায়! পিতার চিন্তাকুল অনুরোধ শুনে শুভচারিণী জয়ন্তী সোৎকণ্ঠে উপস্থিত হলেন শুক্রাচার্যের তপোভূমিতে—যেখানে শুধু কুণ্ড-ধূম পান করে শিবের তপস্যায় মগ্ন আছেন অসুর-গুরু।

শুক্রাচার্যকে দেখার পর থেকে জয়ন্তী তাঁর সঙ্গে সেই ব্যবহারই করতে লাগলেন, যেরকমটি ইন্দ্র তাঁকে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবহারের মাত্রায় বুঝি কিছু তফাৎ ছিল। স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে শতেক প্রলোভন সৃষ্টি করতে পারতেন জয়ন্তী। কিন্তু ইন্দ্রের নিজের মেয়ে হওয়ার জন্যই হোক, অথবা জয়ন্তীর মধ্যে সেই গভীরতা আগে থেকেই ছিল, যার জন্য তিনি শুক্রাচার্যের সঙ্গে কোনও অসংযত আচরণ করতে পারলেন না। অন্যদিকে সমস্ত দেবতার বিরুদ্ধ-পক্ষে দাঁড়িয়ে একা একটি মানুষ কীভাবে তাঁর হতশ্রী শিষ্যদের জন্য কষ্ট করে যাচ্ছেন—এই উদ্যম, এই প্রয়াস জয়ন্তীকে মুগ্ধ করল। জয়ন্তী শুক্রাচার্যের মায়ায় পড়ে গেলেন।

ধূমোদ্‌গারী জলাধারের পাশে বসে শুক্রাচার্য তপস্যা করেন, আর জয়ন্তী তাঁর শরীরের উষ্ণতা হ্রাস করার জন্য কলার পাতা কেটে এনে তাঁকে হাওয়া করেন—কদলীদলমাদায় বীজয়ামাস তং মুনিম্। তৃষ্ণারুক্ষ মুনির সামনে এনে রাখেন সুবাসিত নির্মল জল। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে শুক্রাচার্য যখন শিবের তপস্যায় প্রচণ্ড দাবদাহ সহ্য করছেন, তখন জয়ন্তী তাঁর আঁচল বিছিয়ে ছায়া করেন মুনির মাথার ওপর—ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি। দিনান্তে মুনির ভোজনের জন্য বন্য ফল আহরণ, সকাল বেলায় মুনির নিত্যকর্ম অগ্নিষ্টোমের জন্য কুশ-কুসুমের ব্যবস্থা রাত্রে পল্লব-শয্যা রচনা করে আচার্যকে একটু পাখার হাওয়া করার জন্য বসে থাকেন জয়ন্তী। মুনি কোনও কথা বলেন না। জয়ন্তীও কোনও কথা বলেন না, এমন কোনও ব্যবহারও করেন না, যাতে মুনির মনে বিকার আসে, অথবা ক্রোধের আবেশ হয়—হাবাভাবাদিকং কিঞ্চিদ্ বিকারজননঞ্চ যৎ। ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেস্তদা। এক অর্থে শুক্রাচার্য যদি মহাদেবের তুষ্টির জন্য তপস্বী হয়ে থাকেন, তবে ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তী শুক্রাচার্যের তুষ্টির জন্য তপস্বিনী। আসলে জয়ন্তী অসুরগুরু শুক্রাচার্যকে ভালবেসে ফেলেছেন।

পৌরাণিক সংখ্যার গৌরবে হাজার বছর পর শুক্রাচার্যের তপস্যা নির্বিঘ্নে শেষ হল। সন্তুষ্ট মহাদেব বর দিলেন—যে তপস্যা তুমি করেছ, তা অন্য কেউ পারে না। আমি আশীর্বাদ করছি—আমি যে নিগূঢ় মন্ত্র জানি তার সমস্ত রহস্য তুমি ছাড়া আর অন্য কারও কাছে প্রতিভাত হবে না—প্রতিভাস্যতি তে সর্বং তস্যাদ্যন্তং ন কস্যচিৎ। এই মন্ত্রের শক্তিতে এবং তোমার প্রতিভার তেজে তুমি সমস্ত সুর-সমাজকে পরাভূত করতে পারবে—তেজসা চাপি বিবুধান্ সর্বানভিভবিষ্যসি।

মহাদেব শুক্রাচার্যকে যে মন্ত্র দান করলেন, সেটারই নাম সঞ্জীবনী মন্ত্র—যে মন্ত্রে মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন শুক্রাচার্য, যে মন্ত্র জানবার জন্য দেবসভা থেকে স্বয়ং বৃহস্পতির পুত্র কচ আসবেন শুক্রাচার্যের কাছে। কিন্তু তার আগে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সেই মৌন-মূক রমণীটির দিকে যিনি শুক্রাচার্যকে বশ করতে এসে নিজেই বশীভূত হয়ে বসে আছেন।

AMARBOI.COM

ত্রিশ

একদৃষ্টি শুক্রাচার্য ধূম-তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে যেদিন সঞ্জীবনী মন্ত্র পেলেন মহাদেবের কাছে, সেদিন তাঁর দৃষ্টি পড়ল ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর ওপর। কতকাল ধরে এই রমণী তাঁর ভোজন-শয়ন, জপ-যজ্ঞ-তপস্যার ওপর নির্বাক দৃষ্টি রেখেছে। একদিনের তরেও সে বলেনি—আমি ইন্দ্রকন্যা, আমি এই চাই আপনার প্রসন্নতার পরিবর্তে। শুধু প্রসন্নতাই যে চেয়েছে তাঁর দিকে আজ ঘুরে দাঁড়ালেন শুক্রাচার্য—কে তুমি রমণী? তুমি কি কারও পত্নী? কেনই বা তুমি আমার কষ্ট দেখে কষ্ট পাও—কস্য ত্বং সুভগে কা বা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা? আমি কঠোর তপস্যায় মগ্ন, আর তুমি সব সময় আমাকে রক্ষা করে চলেছ। আমার প্রতি মমতায় আমাকে তুমি শুধু প্রশ্রয়ই দিয়েছ, আর তোমার দিক থেকে ছিল শুধু আত্মদমন, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা। আমি বড় খুশি হয়েছি। বল তুমি কী চাও, তোমার সমস্ত প্রার্থনা আমি পূরণ করব—কিমিচ্ছসি বরারোহে কস্তে কামঃ সমৃধ্যতাম্।

ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তী নিজের পরিচয় দিলেন না। শুধু সলজ্জে বললেন—আমি কী চাই জানি না! আপনি আপনার মনের তপস্যায় জেনে নিন আমি কী চাই? শুক্রাচার্য তপস্যায় বসেন। স্মরণ করেন—প্রথম সেই দিনটির কথা, যেদিন মধ্যাহ্নের সূর্য-দগ্ধ তাঁর মাথার ওপর আঁচল বিছিয়ে ছায়া করে দাঁড়িয়েছিল এই রমণী। একে একে স্মরণ-তপস্যায় ভেসে আসে জয়ন্তীর নানা চিত্রপট—শয়নে বসনে আসনে অশনে, তাঁর উৎকট তপশ্চরণে তপস্বিনী এক রমণীর সদা-জাগ্রত সুরক্ষার ছবি। কিন্তু কেন? কেন এই শুষ্ক-রুক্ষ মুনির জন্য রমণীর এই রমণীয় মমতা? শুক্রাচার্য বুঝলেন—রমণী কী চায়। তবু এই অভিনবা সুন্দরীর আপন মুখে শুনতে ইচ্ছে হয় সেই কথা—যা বার বার উচ্চারণে লাঘবতা প্রাপ্ত হলেও চির-নূতন। শুক্রাচার্য বললেন—আমি আমার মনশ্চক্ষুতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তোমার মনের কী অভিলাষ। তবু

তুমি একবার স্পষ্ট করে স্বকণ্ঠে বলো সে কথা, আমি শুনতে চাই।—জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্। তুমি যা বলবে আমি শুনব। করব।

জয়ন্তী বললেন আমি ইন্দ্রের কন্যা। জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী। আমি আপনাকে ভালবাসি, আচার্য। আমি আপনার সঙ্গ কামনা করি। আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই ধর্মের নিয়ম-বিধি অনুসারে—রংস্যে ত্বয়া মহাভাগ ধর্মতঃ প্রীতিপূর্বকম্। শুক্রাচার্য সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—দশ বছর। দশ বছর আমার সঙ্গে তুমি সুখে কালাতিপাত কর, সবার অগোচরে অদৃশ্যভাবে। শুক্রাচার্য সম্মতা জয়ন্তীকে গৃহে নিয়ে গেলেন। নিজগৃহে কিনা বলা যায় না, তবে কোনও গৃহে নিশ্চয়। তারপর বিধিসম্মতভাবে তাঁর পাণিগ্রহণ করে শুক্রাচার্য ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর সঙ্গসুখে মত্ত হলেন—এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্বহন্।

দৈত্য-দানবদের মধ্যে হই-হই পড়ে গেল। তাঁরা শুনেছেন—তাঁদের গুরু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ফিরে এসেছেন। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা এখন শুক্রাচার্যের করায়ত্ত। তাঁরা সকলে ছুটে এলেন গুরুর বাড়িতে। কিন্তু কোথায় কী, গুরুকে তাঁরা চোখের দেখাও দেখতে পেলেন না। সেই যে শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে বলেছিলেন—তোমার সঙ্গসুখে থাকব দশ বছর, সকলের অগোচরে অদৃশ্য হয়ে—সর্বভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া। অতএব মায়াবৃত শুক্রাচার্যকে অসুরেরা দেখতে পেলেন না। দৈত্য-দানবরা তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানতেন যে তাঁদের আচার্য অসম্ভব 'মুডি' মানুষ। কখন তাঁর কী ইচ্ছে হয় কেউ বলতে পারে না। তাঁরা যেমন গুরুর সিদ্ধিলাভ এবং ফিরে আসার সংবাদ পেয়েছিলেন, তেমনই এও নিশ্চয়ই শুনেছিলেন যে, এক রমণীকে ভালবেসে শুক্রাচার্য তাঁকে নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে। 'মায়াবৃত'—কথাটার মধ্যে যতই অলৌকিকতা থাকুক, আমাদের ধারণা—অসুরেরা যখন শুক্রাচার্যের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তখন দেখাও নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু জয়ন্তীর সহবাসে শুক্রাচার্যের সরস অবস্থা দেখে তাঁরা তাঁকে আর বিরক্ত করার সাহস পাননি। তাঁরা পালিয়েছেন। পুরাণের কথা থেকেও তা বোঝা যায়। গুরুকে না দেখে অসুর-বীরেরা সিদ্ধান্ত নিলেন—তাঁদের গুরুর এখন এই রকমটাই ভাল লাগছে, তিনি যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে চাইছেন, অতএব তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না—দাক্ষিণ্যং তস্য তদ্ বুধ্বা প্রতিজগ্মু র্যথাগতম্। তাঁরা ফিরে গেলেন।

আগেও দেখেছি—অসুরেরা নিজেদের সততায় ঠিক থাকেন। তাঁরা যখন ঠিক করলেন—গুরুর বাড়ির কাছাকাছিও থাকবেন না। অতএব তাঁরা থাকেননি। তাঁরা যখন ভাবলেন—গুরু যেদিন নিজের ইচ্ছেয় আসবেন, সেদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে; অতএব তাঁরা বাড়িতেই গুরুর অপেক্ষায় বসে রইলেন। শুক্রাচার্যের ধারও মাড়ালেন না। ঠিক এই সুযোগেই ইন্দ্রের খেলা শুরু হল। দেবপক্ষপাতী পৌরাণিকেরা ছোট্ট করে জানিয়েছেন—ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তী পিতার কার্যসাধনের জন্যই শুক্রাচার্যকে দশ বৎসর ব্যস্ত করে রেখেছিলেন ইন্দ্রিয়সুখের মোহজালে—পিত্রর্থে দশবর্ষানি জয়ন্ত্যা হিতকাম্যয়া। কিন্তু আমাদের ধারণা—এই মোহজালে শুক্রাচার্য নিজেই ধরা দিয়েছিলেন। দশ বৎসর সময়টিও তাঁরই দেওয়া। ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বার রুদ্ধ করে অনেক বছর তপস্যা করার পর আচার্যের এই মুক্তি কামনাও কোনও অস্বাভাবিক কাণ্ড নয়। জয়ন্তীও কোনও জাল বিস্তার করেননি। তিনি শুক্রাচার্যের ছন্দচারিণী হয়েছেন তাঁরই ইচ্ছায়।

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই ঠিক, ইন্দ্র তাঁকে যে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন, সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে

অন্যভাবে। অর্থাৎ তিনি জয়ন্তীকে দিয়ে শুক্রাচার্যের তপস্যা ভাঙিয়ে সঞ্জীবনী মন্ত্র না পাওয়ার মতো ব্যাঘাত কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি। কিন্তু আপাতত দশ বৎসর সময় পাওয়ায় ইন্দ্র অন্য খেলায় মন দিলেন। তিনি যখনই দেখলেন—দৈত্য-দানবরা জয়ন্তী আর শুক্রাচার্যকে রমমান অবস্থায় রেখে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেলেন—রমমানং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্। ইন্দ্র বললেন—একটা ব্যবস্থা করুন গুরুদেব। ছলছুতো করে হোক, যেভাবে হোক, আমাদের কাজটা তো আপনাকে করে দিতে হবে—অস্মাকং কুরু কার্যং তং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য মানদ।

বৃহস্পতি নানা ভাবনা-চিন্তা করে শুক্রাচার্যের রূপ ধারণ করলেন। শুক্রাচার্যের যেমন জামা-কাপড়, যেমন দাড়ি, যেমন ভাবভঙ্গি এমনকি তিনি যেভাবে কথা বলেন—সেইভাবে সব রপ্ত করে দেবগুরু বৃহস্পতি অসুর-গুরুর রূপ ধরে দৈত্য-দানবদের সামনে উপস্থিত হলেন। দৈত্য-দানবরা শুক্ররূপী বৃহস্পতিকে একটুও চিনতে পারল না। আর যেটুকু বা অন্যরকম দেখাচ্ছিল তা নিশ্চয়ই তাঁরা মেনে নিলেন এই ভেবে যে, বহুদিন ব্যাপী তপস্যার ফলে হয়তো আচার্যের চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। তবে তাঁরা এসব কিছু ভাবেনইনি, শুক্রাচার্যের রূপধারী বৃহস্পতির ছলাকলায় তাঁরা এতটুকুও সন্দেহ প্রকাশ করেননি—ন বিদুস্তে গুরোর্মায়াং কাব্যরূপ-বিভাবিনীম্। এতকাল পরে গুরুকে দেখে তাঁরা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। যথাবিধি অভিনন্দন করে একপাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন—প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্বে।

শুক্রবেশী গুরু বললেন—তোমরা সব ভাল তো? তোমাদের ভালর জন্যই আমি এতকাল দুশ্চর তপস্যা করে ভগবান শম্ভুকে তুষ্ট করেছি, লাভ করেছি সঞ্জীবনী বিদ্যা। তোমাদের সে বিদ্যা একে একে শিখিয়ে দেব—অহং বোধয়িষ্যামি প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া হি সা। অসুররা আনন্দে আত্মহারা হলেন—তাঁদের গুরু সফল হয়ে ফিরেছেন, আর তাঁদের কোনও চিন্তা নেই। দেবতাদের আক্রমণে আহত কিংবা হত হলেও বেঁচে ওঠার সমস্যা আর রইল না। তাঁরা সব শুক্রবেশী বৃহস্পতির পিছন পিছন ঘুর-ঘুর করতে লাগলেন। কোনও কোনও পুরাণ জানিয়েছে যে, বৃহস্পতি মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেনই না, তো শেখাবেন কী করে? তিনি নাকি ওই পুরো দশ বছর ধরে অসুরদের অহিংসাব্রত শিখিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, এদিকে দশ বৎসর কেটে গেলে শুক্রাচার্যেরও জয়ন্তীর মোহ খানিকটা কেটে গেল। ইতোমধ্যে জয়ন্তীর গর্ভে তাঁর অসাধারণ সুন্দরী একটি মেয়ে হয়েছে। কন্যার নাম দেবযানী—সময়ান্তে দেবযানী সদ্যোজাতা সুতা তদা। শুক্রাচার্য এবার তাঁর অসুর-যজমানদের কথা স্মরণ করলেন। তিনি জানেন—কী অসীম ধৈর্য নিয়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবেন—আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতা কিল। জয়ন্তীকে ডেকে শুক্রাচার্য বললেন—একবার শিষ্যদের একটু দেখে আসি। তারা আমার ভক্ত, তাদের যাতে দেবতাদের থেকে ভয় না হয়, সেটা তো আমায় দেখতে হবে—মা দেবেভ্যো ভয়ং তেসাং মদ্ভক্তানাং ভবেদিতি। জয়ন্তী শুদ্ধমনে—পুরাণের ভাষায়, 'জয়ন্তী ধর্মবিত্তমা', শুক্রাচার্যের কথায় সম্মতি দিয়ে বললেন—আপনি যজমানদের দেখতে যাবেন, অসুরদের যাজক হিসেবে সেই তো আপনার ধর্ম, আমি আপনার ধর্মলোপ করব না—এষ ব্রহ্মণ্ সতাং ধর্মো ন ধর্মং লোপয়ামি তে। আপনি স্বচ্ছন্দে যান।

শুক্রাচার্য জয়ন্তীর প্রতি মমতায় পুনরাগমনের অঙ্গীকার করে অসুরদের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন—অভাবিত কাণ্ড। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁরই বেশ ধরে অসুরদের নানা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রাচার্য অসুরদের ডেকে বললেন—বাছারা! বৃহস্পতি তোমাদের প্রতারিত

AMARBOI.COM

করেছেন। ইনি মোটেই শুক্র নন, ইনি বৃহস্পতি, অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। আমি হলাম গিয়ে আসল শুক্র—কাব্যং মাং তাত জানীধ্বমেষ হ্যাঙ্গিরসো ভুবি। দৈত্য-দানবরা শুক্রের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে একবার শুক্রাচার্যকে, আরেকবার বৃহস্পতিকে দেখতে লাগলেন—প্রেক্ষন্তে স্ম হ্যভৌ তত্র। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা ঠিক করতে পারলেন না—কোনটা আসল শুক্র। শুক্রাচার্য বিমূঢ় অসুরদের আবার বললেন—ওরে বোকারা! এটা দেবতাদের গুরু। এঁকে ছাড়! তোরা আমাকে অনুসরণ কর, এটা বৃহস্পতি—অনুগচ্ছত মাং সর্বে ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম্।

শুক্রাচার্য যখন তারস্বরে আত্মঘোষণা করে যাচ্ছেন, তখন বিপদ বুঝে বৃহস্পতি পালটা চাল চাললেন। বৃহস্পতি বললেন—ঘোর চালাকি। একদম ফাঁকে পড়ো না বাছারা। ইনিই দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি। আমার ছদ্মবেশ ধরে তোমাদের ভোলাচ্ছে। এতদিন কোথায় ছিলেন উনি? তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—আমিই শুক্র, ওটাই বৃহস্পতি—কাব্যো'হং বো গুরুর্দৈত্যা মদ্রূপো'য়ং বৃহস্পতিঃ। দশ বছর ধরে শুক্ররূপী বৃহস্পতির কাছে থেকে, দশ বছর তাঁর সমস্ত আদেশ-উপদেশ শোনার অভ্যাসে দৈত্য-দানবরা আসল শুক্রাচার্যকে গ্রহণ করলেন না। তাঁরা বললেন—দশ বছর ধরে ইনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ইনিই আমাদের গুরু। ইনি অঙ্গিরার পুত্রই হোন, আর ভৃগু-পুত্রই হোন এঁকেই আমরা আমাদের গুরু বলে মানি। আপনি এখন যেতে পারেন—অয়ং গুরুর্হিতো'স্মাকং গচ্ছ ত্বং নাসি নো গুরুঃ—আপনি আমাদের গুরু নন।

অসুর-বীরেরা শুক্রাচার্যের দিকে অপছন্দের ভঙ্গিতে তাকিয়ে একটু চোখ গরমও করলেন—ক্রুদ্ধাঃ সংরক্তলোচনাঃ। শুক্রাচার্য রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অসুরদের ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে একটা অভিশাপও দিয়ে গেলেন। বললেন—তোরা যখন আমার কথা শুনলি না, তখন যুদ্ধে তোরা অবশ্যই হেরে যাবি। আমাকে অবজ্ঞা করার ফল তখন বুঝতে পারবি—মদবজ্ঞাফলং কামং স্বল্পে কালে হ্যবাপ্স্যথ। শুক্রাচার্য অভিশাপ দিয়ে চলে যেতেই বৃহস্পতির কাজ শেষ হয়ে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপ ধারণ করলেন এবং ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—কাজ হয়ে গেছে। শুক্রাচার্য নিজে তাঁর শিষ্যদের শাপ দিয়েছেন—যুদ্ধে তাদের হার হবে। অতএব কেল্লা ফতে—কৃতং কার্যং ময়া ধ্রুবম্।

দৈত্যদানবরা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং লজ্জায় অধোবদনে গুরু শুক্রাচার্যের পা জড়িয়ে ধরলেন। শুক্রাচার্যের মায়া হল। তিনি অভিশাপ প্রত্যাহার করলেন না বটে, তবে ভবিষ্যতে তাঁদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আমি যে এতক্ষণ ধরে শুক্রাচার্য—জয়ন্তী, ইন্দ্র-বৃহস্পতির সম্বন্ধে নানা কথা শোনালাম, তার কারণ দুটি। এক, কোন অবস্থায় শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে এসেছিলেন। দুই, শুক্রাচার্যের ঔরসে দেবযানীর জন্ম। কোনও কোনও পুরাণে শুক্রাচার্যের আরও দুটি স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। এমনও একবার শোনা গেছে যে, এই দুয়েরই অন্যতমা ঊর্জস্বতীর গর্ভেই দেবযানীর জন্ম। কিন্তু জয়ন্তী এবং শুক্রাচার্যের সঙ্গে মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা এবং দেবযানী দুটোই যেহেতু জড়িত, তাই অতি প্রাচীন বায়ুপুরাণের বিবরণ—দেবযানী জয়ন্তীর গর্ভজাতা—এই কথাটাই আমরা বেশি বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি এই কারণে যে, দেবযানী পিতৃ-পালিতা এবং তাঁর নয়নের মণি। দেবযানী ঊর্জস্বতীর মেয়ে হলে, দেবযানীর মায়ের নাম বারে বারে আমরা শুনতে পেতাম।

বৃহস্পতি যেমন শুক্রাচার্যের আগমন শুনেই স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তেমনই জয়ন্তীও হয়তো পিতার প্ররোচনায় অথবা শুক্রাচার্যের শাপভয়ে স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

কারণ শুক্রাচার্য অসুরদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকে আর আমরা জয়ন্তীর সংবাদ পাচ্ছি না। ধরে নিতে পারি—কন্যা দেবযানীকে রেখে জয়ন্তী একা বিদায় নিয়েছিলেন স্বর্গের পথে। আর দেবযানী শুক্র-পিতার সমস্ত আদর এবং মমতা লাভ করে মানুষ হচ্ছিলেন শুক্রাচার্যের কাছে। জন্মের পর-পরই দেবযানীর মা চলে যাওয়ায় তাঁর ওপরে শুক্রাচার্যের স্নেহ এতই মাত্রা-ছাড়া রকমের ছিল যে, অসুর-গুরু মেয়ের সামান্য আহ্লাদের জন্যও অনেক কিছু করতে পারতেন। এর প্রমাণ পাব পরে এবং পদে পদে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হবে—শুক্রাচার্য যখন অসুরদের অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন অসুরদের মুখপাত্র ছিলেন বুড়ো প্রহ্লাদ। শুক্র বলে দিয়েছিলেন—আমার কথা মিথ্যা হবার নয়। তবে তোমার নাতি বলি রাজার রাজত্বে আবার তোমরা স্বর্গরাজ্য লাভ করবে। শুক্রাচার্য অবশ্য তাঁর শিষ্যদের উপকারে বিরত হননি। অসুরদের ওপর অত্যাচার হলেই তিনি তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন এবং দেবতাদের আঘাতে মৃত্যু হলে সঞ্জীবনী মন্ত্রে বাঁচিয়ে তোলার কাজটিও করতেন। মনে রাখতে হবে—প্রহ্লাদ দিতির ছেলে, দৈত্য।

তিনি যখন দেখলেন—তাঁর বংশে স্বর্গ-গৌরব আসতে দেরি আছে কিছু, তিনি তখন একটু থিতিয়ে গেলেন হয়তো। এই সুযোগে দনুর ছেলে, দানব-কুলের প্রধান পুরুষ বৃষপর্বা দানবদের নেতৃত্ব দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগিয়ে দিলেন এবং দৈত্য-দানব—সবারই মুখ রাখলেন বলা যায়।

বলা বাহুল্য, সংঘর্ষের বিষয় সেই একটাই—ত্রিভুবনের অধিকার। দেবতারা বলেন—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের প্রভু হলাম আমরা। অসুররাও তাই বলেন। বলেন—তোরা নয়, আমরাই প্রভু—ঐশ্বর্যং প্রতি সংঘর্ষে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। আবারও সেই একই ব্যাপার। দেবতারা গিয়ে ধরলেন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে, অসুররা ধরলেন শুক্রাচার্যকে। দেবতা এবং অসুরদের পরস্পর প্রতিপক্ষতা মানেই এই দুই ব্রাহ্মণের চিরন্তন মর্যাদার লড়াই—ব্রাহ্মণৌ তাবুভৌ নিত্যমন্যোন্যস্পর্ধিনৌ ভৃশম্। তবে এবারের লড়াইতে নতুন বৈশিষ্ট্যটা মহাভারতের কবি একান্তে লিপিবদ্ধ করেছেন। বলেছেন—দেবতারা যখন অসুর দানবদের ওপর মারণাস্ত্র ক্ষেপণ করে মেরে ফেলেছিলেন, তখন শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাঁদের বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছিলেন—তান্ পুনর্জীবয়ামাস কাব্যো বিদ্যাবলাশ্রয়াৎ। তাঁরা বেঁচে উঠে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করে দিচ্ছিলেন দেবতাদের সঙ্গে। কিন্তু বৃহস্পতির ক্ষমতা সীমিত। যে সমস্ত দেবতারা অসুরদের হাতে মারা পড়ছিলেন, তাঁদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা বৃহস্পতির ছিল না, কারণ বৃহস্পতি সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন না—ন হি বেদ স তাং বিদ্যাং যৎ কাব্যো বেত্তি বীর্যবান।

এ ঘটনায় প্রথমে দেবতাদের কষ্ট হচ্ছিল, পরে সেটা ভয়ের রূপ নিল। তাঁরা বৃহস্পতির বড় ছেলে কচের কাছে গিয়ে বললেন—একটু সাহায্য করতে হবে, দাদা। ওই যে মানুষ বাঁচানোর বিদ্যে—মৃত সঞ্জীবনী ওই বিদ্যেটি তোমায় শিখে আসতে হবে, দাদা! সে বিদ্যে জানেন শুধু শুক্রাচার্য, যিনি এখন দানবরাজ বৃষপর্বার বুদ্ধিদাতা। একমাত্র তুমিই সেখানে যেতে পার। তোমার বয়স কম, শুক্রাচার্যের কাছে শিক্ষানবিশী করতে গেলে কেউ তোমায় সন্দেহ করবে না—তমারাধয়িতুং শক্তো ভবান্ পূর্ববয়াঃ কবিম্। দেবতারা শুক্রাচার্যের কাছে কচকে সোজাসুজি পাঠাতে চাইলেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। দেবতারা কচকে বললেন—জান তো ভাই, শুক্রাচার্যের একটি মেয়ে আছে। নাম দেবযানী। সে যেমন আহ্লাদী মেয়ে, তার ওপরে শুক্রাচার্যের প্রশ্রয়ও সেইরকম—দয়িতাং সুতাং তস্য মহাত্মনঃ। তুমি তাকে

AMARBOI.COM

ধরেও তোমার কাজ আদায় করতে পার। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি তোমার স্বভাব-চরিত্র, দয়া-দাক্ষিণ্য, মধুর ব্যবহার—সব কিছু দিয়ে যদি দেবযানীর হৃদয় বিগলিত করতে পার, তবে জেনে রেখ—সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে তোমার দেরি হবে না—দেবযান্যাং হি তুষ্টায়াং বিদ্যাং তাং প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্।

দেবতারা যে যে উপায়ে কচকে দেবযানীর হৃদয় হরণ করতে বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি সাংঘাতিক কথা ছিল। সেটা হল—ইন্দ্রিয়সংযম—আচারেণ দমেন চ। তাঁরা বুঝেছিলেন—দেবযানী যেমন সুন্দরী এবং পিতার প্রশ্রয় পাওয়া মেয়ে, তাতে কচ যদি দেবযানীকে বিমোহিত করতে গিয়ে নিজেই বিমোহিত হয়ে যান, তবে আর সঞ্জীবনী বিদ্যা কোনওদিন দেবলোকে আসবে না। তাই দাক্ষিণ্য অথবা মাধুর্যের মতো মনভোলানো গুণের সঙ্গে দেবতাদের সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে হল—আচারেণ দমেন চ।

বৃহস্পতি-সুত কচ দেবতাদের কথা শুনে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন। অবিলম্বে এসে পৌঁছলেন দানবরাজ বৃষপর্বার রাজ্যে, শুক্রাচার্যের আশ্রমে। কচ শুক্রাচার্যের সামনে আভূমি প্রণত হয়ে বললেন—আচার্য্য! আমার নাম কচ। আমি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র, মহর্ষি অঙ্গিরার নাতি। আমি আপনার শিষ্য হতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে আপনার শিষ্য হওয়ার সম্মান দান করুন—নাম্না কচমিতি খ্যাতং শিষ্যং গৃহ্ণাতু মাং ভবান্। কচ অঙ্গীকার করলেন—আমি আপনার শিষ্য হবার জন্য হাজার বছর ব্রহ্মচর্য পালন করতে রাজি আছি—ব্রহ্মচর্যং চরিষ্যামি ত্বয্যহংপরমং গুরৌ।

কচ বৃহস্পতির পুত্র হলেও তাঁর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ এবং বিনয়ের ভাব দেখে শুক্রাচার্য খুশি হলেন। এরপরে যে ভাষা এবং যে শব্দে তিনি শত্রুসুতকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানালেন, তা আজকের মাস্টারমশাইদের একটু খেয়াল করা দরকার। শুক্রাচার্য বললেন—আমার বাড়িতে তোমার শুভাগমন হোক। তুমি ব্রহ্মচর্যের অঙ্গীকারে আমাকে যেহেতু গুরু বলে মেনে নিয়েছ, আমিও তোমাকে শিষ্য হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি—কচ সুস্বাগতং তে'স্তু প্রতিগৃহ্ণামি তে বচঃ। আজকের দিনে যাঁরা ভাবেন—সেকালের দিনে গুরুগৃহে ছাত্রদের 'জন' খাটতে হত, তাঁদের কোনও সম্মান ছিল না এবং ছাত্ররা ছিলেন গুরুর নিপীড়ন-অত্যাচারের শিকার, তাঁদের জানাই—আরুণি-উদ্দালকের উপাখ্যান গুরুভক্তির পারম্য খ্যাপনের জন্যই, গুরুর অত্যাচারের কোনও তাৎপর্য নেই সেখানে। কিন্তু একজন ভাল ছাত্রকে কতটা খাতির করতে হয় তার পরিষ্কার প্রমাণ পাবেন শুক্রাচার্যের উত্তরে। ,তিনি বললেন—কচ! আমি তোমার অনুরোধ মেনে নিচ্ছি এই কারণে যে, তুমি শিষ্য হিসেবে আমার আরাধনীয়। আমি এক অর্চনীয় ব্যক্তিকে আরাধনা করছি, তাতে তুমিও যেমন অর্চিত বোধ করবে, তেমনই অর্চিত হোন তোমার পিতা বৃহস্পতি—অর্চয়িষ্যে'হম্ অর্চ্যং ত্বামর্চিতো'স্তু বৃহস্পতিঃ।

এ ব্যাপারটা সেকালে ছিল। শত্রুপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শুক্রাচার্যের কাছে শিক্ষার্থী হয়ে আসতে কচের কোনও অসুবিধে হয়নি। অনুরূপভাবে শুক্রেরও কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয়নি শত্রুপক্ষের কাউকে শিষ্যত্বে বরণ করতে। এমনকি যিনি চরম শত্রু সেই বৃহস্পতির বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে শুক্রাচার্যের মনে যথেষ্ট সম্মানবোধ আছে বলেই তাঁর এই অসাধারণ প্রতিক্রিয়া—তোমাকে শিষ্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে আমি শুধু তোমাকেই সম্মান দিচ্ছি না, তোমার পিতা বৃহস্পতিরও মর্যাদা রাখছি—অর্চিতো'স্তু বৃহস্পতিঃ।

আজকের দিনে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলি অপগণ্ড শিক্ষক দেখি—যাঁদের বিদ্যাবত্তা নেই বললেই চলে, কিন্তু ঢঙ্ আছে ষোলো আনা। এঁরা আবার গবেষণা করান। কাজ আরম্ভ

হলে দেখা যায়—এঁর কাছে নাম লেখালে অন্য কেউ আর সাহায্য করতে চান না। আবার ওঁর কাছে নাম লেখালে ইনি কোনও সাহায্য করতে চান না। রাজনৈতিক কারণে দু'জনে দু'জনের মুখ দেখেন না। ছাত্র-গবেষক নিজের দলের লোক না হলে অথবা শত্রুপক্ষীয় শিক্ষকের ছন্দানুবর্তী হলে, তার আর রক্ষা নেই। সে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়, তবে একেকটি পরীক্ষাপত্রের একার্ধে সে আটত্রিশ পেলেও অন্যার্ধে পনেরো পাবে। আর সে যদি গবেষক হয়, তবে বাইরে যেখানে তার গবেষণাপত্র গিয়ে পৌঁছল, সেখান পর্যন্ত ইনি ছুটবেন বা অন্যকে ছোটাবেন। ফল অবশ্যম্ভাবী।

রাজ্যের ঊর্ধ্বতম শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের মধ্যে মহাভারতে দেখা গুরুশিষ্যের এই মহান চিত্রটুকু আমাদের কাছে নানা কারণেই মূল্যবান। শুক্রাচার্যের আশ্রমের সমস্ত বিধি-নিয়ম বৃহস্পতির পুত্র কচ দু'দিনেই রপ্ত করে নিলেন। গুরুগৃহের বিধি-নিয়ম তো মানতেই হয়, সেই সঙ্গে মানতে হয় আরও কিছু যা আজকের অর্থকরী ভাষায় বলে অত্যাচার। এই তথাকথিত অত্যাচার আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও এ দেশে ছিল, তবে সেটা আপনি কীভাবে দেখছেন, তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। আমার শিক্ষক-পিতার গৃহে আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক ছাত্রই থাকতেন এবং খেতেন। খাবার-দাবারে আমার পিতার জন্য যা বরাদ্দ ছিল, ছাত্র এবং পুত্রদের জন্যও তাই বরাদ্দ ছিল। শীতের দিনে যে সব ছেঁড়া কাঁথার তলায় তাঁর শয়ন নির্দিষ্ট ছিল, তাঁর ছাত্র এবং পুত্ররাও ছিল সেই সব ছেঁড়া কাঁথারই অংশভাক্। এই সব ছাত্রদের দূরের হাট থেকে নুন-লঙ্কা আনতে বললে শিক্ষক এবং ছাত্র কেউই দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। বর্ষাকালের পূর্বে কাঠ কাঠতে বললে এসব ছাত্রদের আনন্দের কোনও ব্যাঘাত হত না কিংবা তার জন্য ছাত্রের পিতা বা অভিভাবকদের কাছে জবাবদিহিরও কোনও প্রশ্ন ছিল না। কারণ, আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় ছাত্রের পিতৃত্বের কাজটি পুরোপুরি ছিল শিক্ষকের। ফলত ছাত্রকে চলতে হত পুত্রের দায় বহন করে। পরবর্তী জীবনে আমার পিতার অনেক ছাত্রকে আমাদের পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্বও করতে দেখেছি। জানি না, আপনারা কী বলবেন—ছাত্র জীবনের সেই মধুর অত্যাচার তাঁরা আরও মধুরতর পন্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। এ ছাড়া অত্যাচারের আর কোন অর্থই বা এখানে বিবেচ্য হতে পারে।

আমরা এত কথা বললাম এই কারণে, যে বৃহস্পতির পুত্র কচ গুরুগৃহে এসে শুধু আশ্রমের বিধি-নিয়মে আবদ্ধ হলেন না। তার সঙ্গে আরও কিছু উদবৃত্ত কাজ তাঁর জুটে গেল। স্বর্গভূমি থেকে আসবার সময় দেবরাজ ইন্দ্র বলে দিয়েছিলেন—শুক্রসুতা দেবযানীকে তুষ্ট করলে শুক্রাচার্যের মন পাওয়া সহজ হবে। আর ঠিক সেই কারণেই বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্যের মনস্তুষ্টির জন্য যেমন চেষ্টা করতে লাগলেন, ঠিক তেমনই চেষ্টা করতে লাগলেন দেবযানীর মন পাওয়ার জন্য—আরাধয়ন্নুপাধ্যায়ং দেবযানীঞ্চ ভারত।

AMARBOI.COM

একত্রিশ

মহাভারতের কবি এক নিঃশ্বাসে বলে দিলেন—গুরু এবং গুরুপুত্রী দুজনের তৃপ্তির জন্যই কচ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ তো এক বিপরীত সাধন। শুক্রাচার্য যাতে খুশি হবেন সুন্দরী দেবযানী নিশ্চয়ই তাতে খুশি হবেন না। আবার যে ভাবে, যে কাজে দেবযানীর খুশি হওয়ার কথা, শুক্রাচার্য নিশ্চয়ই তাতে খুশি হবেন না। কচের সাধন তাই দুই রকম। একদিকে তিনি ব্রত-নিয়ম-ব্রহ্মচর্যে মুনিব্রত গ্রহণ করেছেন, যাতে গুরু শুক্রাচার্য তুষ্ট হন। অন্যদিকে এক যৌবনবতী সুন্দরীর হৃদয় হরণের জন্য এক উত্তাল যুবক যা করে কচ তাই করছেন। মহাভারতের কবিকে তাই একই পংক্তিতে 'যুবা' এবং 'মুনি' শব্দটি আলাদা করে কচের বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করতে হয়েছে—নিত্যমারাধয়িষ্যংস্তং যুবা যৌবনগাং মুনিঃ। শুক্রাচার্যের মন পাবার জন্য তিনি মুনি, যৌবনবতীর মন পাবার জন্য তিনি যুবা। তবে এই মুহূর্তেই স্মরণ করতে হবে যে, অসুরগুরু শুক্রাচার্যের উপাসনার থেকেও দেবযানীর মন পাবার তাড়না কচের কাছে বেশি জরুরি ছিল। ফলে ব্রতধারী মুনির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত সেই যুবা, যাঁকে প্রাতঃকালের গুরু-শুশ্রূষার অন্তে এক যৌবনবতী প্রশ্ন করত—

বন্ধু আমার! তুমি না স্বর্গে ছিলে একদিন? স্বর্গসুন্দরী অপ্সরা আর নৃত্য-কুশল গন্ধর্বদের নৃত্য-গীত কতবার তুমি দেখেছ, শুনেছ। আজ এই ঋষির আশ্রমে তুমি নন্দনের গন্ধবহ। তুমি কি স্মরণ করতে পার—সেই নৃত্য-গীত বাদিত্রের ধ্বনি?

যুবা বলে—পারি। শুধু স্মরণ কেন, তুমি চাইলে সেই নন্দনের নৃত্য কিছু দেখাতেও পারি তোমাকে, শোনাতে পারি ইন্দ্রসভায় গাওয়া কোনও গান।

যুবতী বলে—তবে দেখাও সেই মনোমোহন নৃত্য, গাও সেই গান। বৃহস্পতি-পুত্র কচ গুরু শুক্রাচার্যের করণীয় যজ্ঞকর্মের সমস্ত আয়োজন সেরে রেখে নৃত্য-গীতে মেতে ওঠেন

দেবযানীর সামনে। সস্মিত মুখে ভুজ-বিলাস আর কঠিন পাদন্যাসে ফুটে ওঠে সুর-নৃত্যের ছন্দ-লয়-তাল—গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষয়ৎ। দেবযানীর ভাল লাগে। বৃহস্পতিপুত্রের মেদবর্জিত শরীরে নৃত্যের নানা বিভঙ্গ নবীনা দেবযানীকে কেমন মোহগ্রস্ত করে তোলে। তিনি ভাল করে বোঝেন না—মনের মধ্যে এ কীসের আলোড়ন, রমণী-শরীরে এ কীসের শিহরণ!

কচের প্রাণশক্তি অফুরন্ত। নৃত্য-গীতের পরিশ্রমে তাঁর ক্লান্তি নেই। গুরুসেবার অনন্ত কর্মের মধ্যে তাঁর আরও কিছু নিত্যকর্ম আছে। পূজার ফুল তুলতে গেলে দেবতার জন্য যতগুলি তুলতে হয়, তার চেয়ে বেশি ফুল তুলতে হয় দেবযানীর জন্য। তাঁর কেশবন্ধে পুষ্পের অলংকরণ রচনা করা এখন কচের অন্যতম কাজ। দেবযানীর নিত্য-নতুন বায়না এবং ফরমাশের অন্ত নেই কোনও। বনের পথ চলতে চলতে কখনও এই যুবতী গাছের ফল কুড়িয়ে আনতে বলবে, কখন সেই পথ-সখার অঞ্জলিবদ্ধ কুসুমোচ্চয়ে শিঙার করতে বসবে, আর কখন বা প্রভুর মতো যথেচ্ছ আদেশে কচকে উচ্চকিত, তটস্থ করে তুলবে, তার কোনও ঠিক নেই। কচ সব করেন, দেবযানীর চোখের ইঙ্গিতে তিনি সব কাজ বুঝে নেন। কারণে অকারণে ফুল-ফল কুড়িয়ে আনাই শুধু নয়, আজ্ঞাপেক্ষী দাসের মতো তিনি সদা-সর্বদা দেবযানীর পাশে আছেন—পুষ্পৈঃ ফলৈঃ প্রেষণৈশ্চ তোষয়ামাস ভারত।

দেবযানীর জন্য কচের এই অফুরান প্রাণশক্তি বৃথা ব্যয়িত হয় না। তাঁর অল্প-বয়সের কিশোরী-মনে শিহরণ জাগে। তিনি ভাবেন—শুধু তুষ্ট করা নয়। নিশ্চয়ই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে সরসতা আছে, নইলে কেন, কেন এই সদ্যোযুবক শুক্রাচার্যের পাঠশালার কারাগৃহ থেকে বার বার তাঁর কাছে পালিয়ে আসে। দিনান্তের সূর্য যখন বনভূমি আরক্ত করে তোলে তখন এই ক্লান্ত শ্রান্ত যুবককে দেখে তাঁর মায়া হয়! সেই কোন সুদূরের স্বর্গ থেকে এখানে এসে কচ শুধুই মন্ত্রলাভের জন্য তাঁর দাসত্ব বরণ করেছেন—এ কথা দেবযানীর বিশ্বাস হয় না। তাঁর ধারণা কচ তাঁকে ভালবাসেন। ফলে সেই আরক্ত সন্ধ্যাবেলায় দেবযানী যখন নির্জন বনভূমিতে উদাস মনে বসে থাকেন, তখন গুরুগৃহে কর্মরত কচের জন্য তাঁর মন কেমন করে। কচের উদ্দেশে তিনি কাছে আসার ডাক পাঠান গানের সুরে—গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্য্যচরত্তথা।

গুরুগৃহের কাজ ফেলে কচ ছুটে আসেন দেবযানীর কাছে। দেবযানী আঁচল দিয়ে তাঁর কপালের ঘাম মুছিয়ে দেন। মধুর কথায় অপনোদন করেন পরগৃহবাসের ক্লান্তি। দেবযানীর তাড়নায় কচকে যে নাচতে হয়, গাইতে হয়, কুড়িয়ে আনতে হয় ফল-ফুল—সেই সব পরিশ্রম আর কৃত্রিমতা লঘু হয়ে যায় দেবযানীর সহজ সরল চাওয়ায়, রমণীর নির্জন পরিচার-সুখে—রহঃ পর্যচরত্তদা। দিন যায়। রাত যায়। দেবযানী আর কচের মধ্যে সাহচর্য ঘনীভূত হয়।

অসুরগুরু শুক্রাচার্য এখন দানবরাজ বৃষপর্বার রাজধানীর কাছেই আশ্রম বেঁধে আছেন—বৃষপর্বসমীপে হি শক্যো দ্রষ্টুং ত্বয়া দ্বিজঃ। বৃষপর্বার দানব-পরিচারকরা সদা-সর্বদা অসুর গুরুর তত্ত্বাবধান করত এবং সময়ের নিয়মে তারা জেনেও গেল যে, শুক্রাচার্যের নতুন শিষ্যটি আসলে বৃহস্পতির পুত্র কচ। দেবযানীর সঙ্গে ওই যুবকের প্রীতি-সম্বন্ধ তথা শিষ্যের ওপর শুক্রাচার্যের স্নেহ-সম্বন্ধও বৃষপর্বার দানব-সমাজে অপরিচিত নেই। অসুর-গুরুকে তাদের কিছু বলবার সাহস নেই এবং বললেও তিনি শুনবেন না। এখনকার শিক্ষিত-সমাজ যেমন রাজনীতিকদের দয়া-মায়ার ওপর নির্ভর করেন এবং তাঁদের সুরে সুর মেলান, তখনকার

দিনে সেটা তত সুলভ ছিল না। ফলে অসুর-দানবেরা শুক্রাচার্যকে একেবারেই ঘাঁটানোর চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাই বলে শত্রুশিবিরের এক প্রধান ব্যক্তির পুত্র তাঁদেরই গুরুর কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে তাঁদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন—এ জিনিস তাঁরা সইবেন কী করে? তাঁরা তলায় তলায় কচকে মারবার পরিকল্পনা শুরু করে দিলেন।

শুক্রাচার্যের আশ্রমে কচের নিত্যদিনের অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ ছিল গুরুর হোমধেনুটিকে চরাতে নিয়ে যাওয়া। সেকালের গ্রামপ্রান্তে পশুদের তৃণক্ষেত্র থাকত। অন্যান্য দিনের মতো কচ সেইখানেই গরু নিয়ে গেছেন। হোমধেনুর সঙ্গে অন্য গরুগুলিও একসঙ্গে তৃণভোজনে ব্যাপৃত হলে কচ এক জায়গায় বসলেন। তারপর আবার উঠলেন। গুরু শুক্রাচার্যের হোম-যজ্ঞের জন্য সমিধ্-কাঠ কুড়িয়ে জড়ো করলেন। কুশ কেটে গোছা বেঁধে নিলেন। চয়ন করলেন বন্য ফুল। সব এক জায়গায় পুঁটুলিতে বেঁধে তিনি আবার গিয়ে বসলেন বট-গাছের তলায়। হয়তো তাঁর মনে সঞ্জীবনী মন্ত্রলাভের চিন্তা গভীর হল, হয়তো বা উদাসী হাওয়ায় মনে পড়ল দেবযানীর কথা।

বৃষপর্বার দানব-পরিচারকরা কয়েকদিন ধরে কচের গতিবিধি নিপুণভাবে লক্ষ্য রেখে আজকে গোচারণ ক্ষেত্রে এসে পৌঁছল। তাঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে—এই বাহানায় দানবরা তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল বনের একান্তে—গা রক্ষন্তং বনে দৃষ্টা রহস্যেনমমর্ষিতাঃ। কচের গোষ্ঠ-বিহার সুখের হল না। দানবরা তাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। শুধু তাই নয়, তাঁর দেহাবশেষ অস্থি-চিহ্ন দেখে যাতে তাঁর মরণ-সূত্র আবিষ্কার করা না যায়, সেই জন্য তাঁর শরীরের টুকরোগুলি শিকারী কুকুরদের খাইয়ে দিল—হত্বা শালাবৃকেভ্যশ্চ প্রাযচ্ছল্লবশঃ কৃতম্। এর পেছনে তাদের চিন্তা একটাই—বৃহস্পতি দানবদের বার বার ঠকিয়েছেন, অতএব তিনি তাঁদের শত্রু। বৃহস্পতি বা তাঁর সমর্থিত দেবপক্ষ যাতে কোনওভাবেই সঞ্জীবনী-বিদ্যা না শিখতে পারে, সেইজন্যেই তাঁরা গোপনে কচকে হত্যা করলেন—জঘ্নুর্বৃহস্পতের্দ্বেষাদ্ বিদ্যারক্ষার্থমেব চ।

AMARBOI.COM

বনভূমি আরক্ত করে সেদিনও সূর্য অস্ত গেল। শুক্রাশ্রমের গরুগুলি পর্যাপ্ত তৃণ ভোজন করে অনেক শুয়ে থাকল, অনেক জাবর কাটল, অনেক ইতি-উতি চাইল। কচকে তারা দেখতে পেল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই পুরাতন অভ্যাসে গরুগুলি আশ্রমে ফিরে এল। অনেকক্ষণ পর এই ফেরার পথেই দেবযানীর সঙ্গে কচের দেখা হয়। সেদিনও তিনি অধীর আগ্রহে বসে আছেন পথ চেয়ে। কিন্তু কচ ফিরলেন না। রাখাল-বালককে কোথায় ফেলে রেখে গরুগুলি ফিরে এল। দেবযানী প্রমাদ গণলেন। এমন তো হবার কথা নয়।

চকিতের মধ্যে দেবযানী শুক্রাচার্যের কাছে গেলেন। বললেন—বাবা! তোমার সায়ন্তন হোম তো শেষ হয়ে গেল। সূর্যও অস্ত গেছে কতক্ষণ, আশ্রমের গরুগুলিও ফিরে এল সব। কিন্তু কই, কচকে তো দেখছি না—কচস্তাত ন দৃশ্যতে। এতকাল দানব-সমাজের কাছাকাছি থেকে তিনি যে দানবদের স্বভাব আঁচ করতে পারেন না, তা মোটেই নয়। দেবযানী বললেন—নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে মেরে ফেলেছে, বাবা! অথবা এমন কোনও কারণ ঘটেছে, যাতে নিজেই সে মারা পড়েছে। দেবযানী কেঁদে বললেন—বাবা! যা কিছুই হোক। কচের যদি এমন-সেমন কিছু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে, সত্যি বলছি বাবা! আমি কিন্তু বাঁচব না—তং বিনা ন চ জীবেয়ম্ ইতি সত্যং ব্রবীমি তে।

শুক্রাচার্য খুব বেশি বিচলিত হলেন না। তিনি সঞ্জীবনী-বিদ্যা জানেন। তাঁর শুধু কষ্ট হল

মেয়েকে দেখে। জন্মলগ্ন থেকে মায়ের স্নেহ-বঞ্চিতা এই মেয়েটির এতটুকু কষ্টও তিনি সহ্য করতে পারেন না। দেবযানী যেন সেই ছোট্ট আদরের মেয়েটি। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে শুক্রাচার্য বললেন—তা ধর—কচ যদি কোনওভাবে মরেই গিয়ে থাকে, তাতেই বা ভয় কী মা! এই আমি এক্ষুনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে বলব—কচ এদিকে এস তো, আর অমনি সে বেঁচে উঠবে—এহ্যেহি ইতি সংশব্দ্য মৃতং সঞ্জীবয়াম্যহম্।

মেয়ের অবস্থা দেখে শুক্রাচার্য আর দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে ডাকলেন কচকে। আর অমনি পৌরাণিক কালের সমস্ত অলৌকিকতা নিয়ে কচের কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুকুরের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সম্পূর্ণ কচের রূপ নিয়ে। কচকে বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল। শুক্রাচার্য হয়তো একবারের তরে আদরিণী কন্যার দিকে প্রশ্রয়ের চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিলেন, আর দেবযানী সেই মুহূর্তেই অন্য দিকে কচের মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি এত দেরি করলে কেন, কচ! তুমি জান আমি কত ভাবছি—কস্মাচ্চিরায়িতোঽসীতি পৃষ্টস্তামাহ ভার্গবীম্। কচ বললেন—ভাবিনী আমার! আমি গুরুদেবের জন্য সমিধ্-কুশ কাষ্ঠভার বেঁধে নিয়ে কেবল বটের ছায়ায় গিয়ে বসেছি। বড় ক্লান্তও লাগছিল। আমাকে বসতে দেখে আশ্রমের গরুগুলিও ছায়ার লোভে আমার আশেপাশে এসে বসল। এমন সময় কতগুলি অসুর এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে বটে? তোমার নাম কী? আমি বললাম আমি বৃহস্পতির পুত্র। লোকে আমাকে কচ বলে ডাকে। যেই না বলা, অমনি আমায় ওরা মেরে ফেলল। তারপর গুরুদেব আমাকে সঞ্জীবনী-মন্ত্রে ডাকলেন, আর আমি কোনওমতে বেঁচে তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি—ত্বৎসমীপমিহায়াতঃ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তজীবিতঃ।

AMARBOI.COM

কচের ফাঁড়া একবারেই কাটেনি। শুক্রাচার্যও দানবদের কিছু বলেননি। তিনি যেহেতু মন্ত্র জানেন, অতএব দানবদের তিনি তোয়াক্কাও করেন না। তিনি এও চান না—বৃহস্পতির পুত্রকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে দানবদের সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হোক। তিনি যেমন মেজাজে ছিলেন, তেমন মেজাজেই আছেন। আরও একবার এমন হল—দেবযানী কচকে পাঠিয়েছিলেন বন থেকে ফুল তুলে আনতে। দানবরা তাঁকে আবার কুচি কুচি করে কেটে সমুদ্রে ফেলে দিল। দেবযানী আবার পিতাকে সব জানাতে, আবারও তিনি কচকে বাঁচিয়ে তুললেন দেবযানীর অনুরোধে। কচ বেঁচে ফিরে যথারীতি সব ঘটনা জানালেন দেবযানীকে।

কিন্তু তৃতীয়বার যেভাবে কচ দানবদের কবলে পড়লেন, তাতে তাঁর পক্ষে বেঁচে ফেরাটাই খুব মুশকিল হয়ে গেল। মহামতি শুক্রাচার্যের একটু সুরাপানের অভ্যাস ছিল। সেকালের ব্রাহ্মণরা সুরাপান সম্বন্ধে ভাল কথা বলতেন না। যজ্ঞে সোমরস পানের ব্যবস্থা অবশ্যই চালু ছিল। কিন্তু সুরার বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য সুবিদিত। কিন্তু শুক্রাচার্যের ব্যাপার অন্য। তিনি ভৃগুবংশীয় ঋষি। যেমন তাঁর তেজ তেমনই তাঁর রাজকীয় সম্মান। বিশেষত তিনি অসুরদের উপাধ্যায়, আচার্য। হয়তো অসুরদের সঙ্গ-সুখেই তাঁর সুরাপানের অভ্যাস হয়েছিল। দানবরা এই সুযোগটাই নিল। দানবরা এবার কচকে রাস্তা থেকেই তুলে নিয়ে গেল। তারপর তাঁকে মেরে পুড়িয়ে ফেলল। এতেও তাদের শান্তি হল না। তারা কচের সেই ছাই-ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশিয়ে তাদের গুরুকেই খেতে দিল। শুক্রাচার্যও পরমানন্দে, এ বুঝি নতুন স্বাদের কোনও সুরা—এই ভেবে তাঁর পানপাত্র শেষ করলেন—অপিবৎ সুরয়া সার্ধং কচভস্ম ভৃগূদ্বহঃ। কচ তৃতীয়বার মারা গেলেন।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় আবার সেই একই চিত্র। ব্রাহ্মণ-রাখাল কচ বাড়ি ফিরলেন না। অরক্ষিত গরুর দল নিজেরা পথ চিনে বাড়ি ফিরে এল। দেবযানী ভীত-ত্রস্ত হলেন আগের মতোই। সন্ধ্যাবেলায় বন্য ফুলের সঞ্চয় হাতে নিয়ে কচের বাড়ি ফেরার কথা। কিন্তু কচ আসেননি। শঙ্কিতা দেবযানী পিতার কাছে গিয়ে তৃতীয়বার কেঁদে পড়লেন—কচ ফিরে আসেনি, পিতা! সে গোচারণে গেলে আমি তাকে ফুল নিয়ে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু ফুল নিয়ে সে ফেরেনি, পিতা—পুষ্পাহারঃ প্রেষণকৃৎ কচস্তাত ন দৃশ্যতে। নিশ্চয় তাকে কেউ মেরে ফেলেছে, তাকে ছাড়া আমি কেমন করে বাঁচব—তং বিনা ন চ জীবেয়ং কচং সত্যং ব্রবীমি তে।

মেয়ের মনের অবস্থা বুঝে শুক্রাচার্য আবার সঞ্জীবনী মন্ত্রে কচকে আহ্বান করলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য এটা বুঝলেন না যে, কচ বাইরে কোথাও নেই; সুরামিশ্রিত তাঁর দেহাবশেষ যে তাঁর নিজেরই উদরস্থ হয়ে আছে, সেটা ধারণা করতে পারলেন না শুক্রাচার্য—জ্ঞাত্বা বহিষ্ঠমজ্ঞাত্বা স্বকুক্ষিস্থং কচং নৃপ। সঞ্জীবনী-মন্ত্রের উচ্চারণ সত্ত্বেও কচ এলেন না দেখে শুক্রাচার্যের ধারণা হল—কচ মারা গেছেন—কচঃ প্রেতগতিং গতঃ। মেয়েকে তিনি বললেন—কচ বোধহয় সত্যিই মারা গেছে মা! কীই বা করব বল? আমার বিদ্যায় বার বার তাকে আমি বাঁচিয়ে তুলেছি; কিন্তু অসুর-দানবেরা আবার তাকে মেরে ফেলেছে। এ অবস্থায় আমি আর কীই বা করতে পারি—বিদ্যয়া জীবিতো'প্যেবং হন্যতে করবাম কিম্?

শুক্রাচার্য দেবযানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তুমি আর কেঁদ না মা। মনুষ্য-দেহ চিরন্তন নয়, অতএব মানুষের এই অবস্থা জেনে কচের মতো এক ব্যক্তির জন্য তোমার কান্নাকাটি শোভা পায় না। তাছাড়া অসুর-দানবেরা যেভাবে এর পেছনে লেগেছে, তাতে সত্যিই এই ব্রাহ্মণ-যুবককে বাঁচিয়ে রাখা বোধহয় সম্ভব নয়—অশক্যো'সৌ জীবয়িতুং দ্বিজাতিঃ। দেবযানী বললেন—কী বলছ তুমি, বাবা? বৃদ্ধ মুনি অঙ্গিরা যাঁর পিতামহ, স্বয়ং বৃহস্পতি যাঁর পিতা, সেই কচের জন্য আমি না কেঁদে কেমন করে থাকব—কথং ন শোচেয়ম্ অহং ন রুদ্যাম্। দেবযানী কচের সঙ্গে তাঁর পূর্ব সম্বন্ধের ঘটনাগুলি স্মরণ করলেন। বললেন—কচ আমাদের জন্য কী না করেছে বল? নিয়মিত ব্রহ্মচর্য আর তপস্যার ক্লেশ তো আছেই। এর মধ্যেও তাকে যখন যা বলেছি, সে তা কত দক্ষতার সঙ্গেই না করেছে! মনে রেখ বাবা—কচ যে পথে গেছে, আমারও সেই পথ। আমি কচকে ছাড়া বাঁচতে চাই না। সেই বিদ্বান সুপুরুষ কচকে আমি ভালবাসি—প্রিয়ো হি মে তাত কচো'ভিরূপঃ।

মেয়ের কষ্ট আর কান্না দেখে শুক্রাচার্য এবার তাঁর দানব শিষ্যদের ওপরেই রেগে উঠলেন। বললেন—অসুর-দানবেরা নিশ্চয় আমার ওপর বিদ্বেষ পোষণ করে। নইলে বার বার কেন তারা আমার নির্দোষ শিষ্যটিকে মেরে ফেলবে—অশংসয়ং মামসুরা দ্বিষন্তি/যে শিষ্যং মে'নাগসং সূদয়ন্তি। তারা যে এইভাবে আমার সঙ্গে প্রতিকূল ব্যবহার করছে, তার ফল তারা নিশ্চয় পাবে। শুক্রাচার্য এখন কচের ব্যাপারে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বরং যারা তাঁকে মেরেছে, তাদের শাস্তি দিয়ে এখন তিনি নিজের মনে সান্ত্বনা পেতে চান। দেবযানীকে খানিকটা শান্ত করতে চান। অন্যদিকে অসুর-দানবদের ক্ষতিবৃদ্ধি নিয়ে দেবযানীর কোনও মাথাব্যথা নেই। তিনি কচের জীবন চান, নিজে বাঁচার জন্য। দেবযানী বৃহস্পতির পুত্রকে ভালবেসে ফেলেছেন।

দেবযানী কোনও কথাই শুনছেন না দেখে শুক্রাচার্য আবার মন্ত্র পড়ে কচকে আহ্বান

www.amarboi.com

করলেন। বিদ্যার প্রভাবে কচ এবার শুক্রাচার্যের উদরের মধ্যেই সঞ্জীবিত হলেন। চৈতন্য লাভ করে তিনি গুরুর কথা শুনতে পেলেন বটে, কিন্তু গুরুর ক্ষতি হবে ভেবে—গুরোর্হি ভীতো বিদ্যয়া চোপহূতঃ—তিনি উদরের মধ্যে থেকেই আস্তে আস্তে গুরুর উদ্দেশে বললেন—গুরুদেব! প্রণাম। আমি কচ, আপনার উদরের মধ্যে থেকে কথা বলছি। লোকে নিজের পুত্রকে যেমন ভালবাসে, আপনি তেমন করেই আমাকে ভালবেসে ক্ষমা করুন। শুক্রাচার্য বললেন—তুমি কোন পথে আমার পেটের মধ্যে এসে ঢুকলে—তমব্রবীৎ কেন পথোপনীতস্ত্বং চোদরে তিষ্ঠসি ব্রূহি বিপ্র? শুক্রাচার্য তাঁর দানব-শিষ্যদের চক্রান্ত আশঙ্কা করে কুক্ষিগত কচকে বললেন—তুমি বল সব। এই অসুরদের মেরে আজ আমি দেবপক্ষে যোগ দেব—গচ্ছামি দেবান্ অহমদ্য বিপ্র।

কচ বললেন—প্রভু! আপনার কৃপায় আমার স্মৃতিশক্তি এতটুকু নষ্ট হয়নি। সব বলছি। কচ আমূলান্ত সব বললেন—কীভাবে দানবরা তাঁকে মেরে পুড়িয়ে, গুঁড়ো করে—হত্বা দগ্ধ্বা চূর্ণয়িত্বা চ কাব্য—সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে খাইয়ে দিয়েছে—সব বললেন। কচের কথা শুনে, শুক্রাচার্য দেবযানীকে বললেন—কীভাবে তোমার প্রিয় সাধন করব, জানি না মা! আমি যদি মরি তবেই কচ বেঁচে উঠতে পারে—কিং তে প্রিয়ং করবাণ্যদ্য বৎসে/বধেন মে জীবিতং স্যাৎ কচস্য। কচকে যদি বাঁচতে হয়, তবে আমার পেট চিরেই তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেবযানী পিতার কথায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন—কচ যদি মারা যায়, তবে জীবনে আমার সুখ বলতে কিছু থাকবে না, আর তুমি মারা গেলে আমি বেঁচে থাকতেই পারব না।

একদিকে ভালবাসার মৃত্যু, অন্যদিকে পিতার মৃত্যু। যৌবনের সন্ধিলগ্নে দেবযানী যাঁকে ভালবাসলেন, তিনি যদি মারা যান, তবে দেবযানী মানসিকভাবে সুখ পাবেন না কোনওদিন—কচস্য নাশে মম শর্ম নাস্তি। আর জন্মদাতা পিতা, যিনি অপার স্নেহে এক মাতৃহারা শিশুকে এত বড় করে তুলেছেন, তিনি যদি দেবযানীর যৌবন-সুখের জন্য মারা যান, তবে দেবযানী নিজের বেঁচে থাকাটা সমর্থন করবেন কী করে—তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা। দেবযানী জানেন—তাঁর পিতা সব পারেন। পিতার তপস্যার শক্তি আছে, তিনি সব পারেন। দেবযানী জানেন—দেবযানীর করুণ ক্রন্দনেই পিতা বিগলিত হয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করবেন, যাতে সবারই মঙ্গল হয়।

শুক্রাচার্য মেয়ের মনের অবস্থা সহজেই বুঝেছেন। বুঝেছেন—এক তরুণী-হৃদয় বাঁধা পড়েছে ভালবাসার বাঁধনে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—কচকে বাঁচাবেন অভিনব এক উপায়ে। কচ তাঁর শত্রুশিবিরের অন্যতম হলেও সে তার তপস্যায়, ব্রহ্মচর্যে এবং সেবায় শুক্রাচার্যকে এতটাই সন্তুষ্ট করতে পেরেছে যে, গুরু তাকে আর অবহেলা করতে পারছেন না। বিশেষত কচ এখন তাঁর গুরুর উদরস্থ হয়ে আছেন; গুরুর ক্ষতি হবে জেনে তিনি নিজে বাঁচবার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি একবারের তরেও। অতএব এই সময়।

শুক্রাচার্য বললেন—তোমার তপস্যায় তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ, কচ! তার ওপরে আমার মেয়ে দেবযানী তোমাকে ভালবাসে—যত্ত্বাং ভক্তং ভজতে দেবযানী। অতএব এই সেই উপযুক্ত সময়, তুমি সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর—বিদ্যামিমাং প্রাপ্নুহি জীবনীং ত্বম্।

বস্তুত শুক্রাচার্যের জীবন এখন কচের হাতে। মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে শুক্রাচার্য বললেন—তুমি নিজেকে আমার পুত্র বলে মেনে নিয়েছ। অতএব আমার দেহ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসার পর তুমি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রেই আমাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে—পুত্রো ভূত্বা

ভাবয় ভাবিতো মাম্/অস্মদ্দেহাদুপনিষ্ক্রম্য তাত। গুরুর কাছে বিদ্যা শিখে তুমি বিদ্বান হবে বটে, কিন্তু তাই বলে শিষ্যের ধর্ম যেন বিস্মৃত হয়ো না। আসলে একটাই মাত্র সম্ভাবনা আছে। কচ শুক্রাচার্যের কুক্ষিভেদ করে বেরিয়ে আর শুক্রাচার্যকে না বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। তাতেই তো দেবপক্ষের লাভ। সঞ্জীবনী বিদ্যার মন্ত্র কচের মাধ্যমে তাহলে শুধু দেবপক্ষেই থেকে যাবে।

কিন্তু গুরু হিসেবে শুক্রাচার্য যে ধাতুতে গড়া, শিষ্য হিসেবে কচও সেই ধাতুতে গড়া। শুক্রাচার্য তাঁর চরম শত্রুর পুত্রকে শিষ্যত্বে বরণ করে যে উদারতা দেখিয়েছেন, আজ সেই উদারতা ফিরিয়ে দেবার সুযোগ এল। শুক্রাচার্য মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কচ বেরিয়ে এলেন গুরুর কুক্ষি ভেদ করে। তিনি দেখলেন—তাঁর গুরু শুক্রাচার্য মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অধ্যাত্ম-জ্ঞানের এক প্রতিমূর্তি ভূমিলগ্ন হয়ে আছে। কচ সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে বাঁচিয়ে তুললেন নবলব্ধ সঞ্জীবনী-মন্ত্রে। বেঁচে ওঠা শুক্রাচার্যকে তিনি বললেন—আপনার মতো মানুষ যিনি, যিনি আমার মতো বিদ্যাশূন্য মানুষের কানে বিদ্যার অমৃত মন্ত্র জপ করেছেন, তাঁকে আমি আমার বাবা-মা—দুইই মনে করি—তং মন্যেহং পিতরং মাতরঞ্চ—আপনার সঙ্গে কোনওভাবেই আমি প্রতিকূল আচরণ করতে পারি না। কারণ, আমি জানি, আপনি আমার কত উপকার করেছেন—তস্মৈ ন দ্রুহ্যে কৃতমস্য জানন্।

শুক্রাচার্যের প্রতিভাশালী শিষ্য কচ জীবন ফিরে পেলেন। শুক্রাচার্য যৎপরোনাস্তি খুশি হলেন। মনে মনে নিজের ওপর একটু রাগও হল তাঁর। দানবদের তিনি যতই গালাগালি করুন, তাঁর সুরাপানের অভ্যাসের সুযোগ নিয়েই তো দানবরা এই বিপত্তি ঘটিয়েছে। তাছাড়া তাঁর প্রিয়শিষ্য কচ উদরস্থ অবস্থাতেও তাঁকে বলেছিলেন—অসুরেরা আমাকে মেরে, পুড়িয়ে আপনার পানীয় সুরার সঙ্গেই আমাকে মিশিয়ে দিয়েছে—অসুরৈঃ সুরায়াং ভবতোঽস্মি দত্তঃ—আমি কী করে সেই আসুরী মায়া অতিক্রম করি? কথাটা শুক্রাচার্যের মনে লেগেছিল। আজ যখন কচ বেঁচে উঠেছেন, তখন সেই আনন্দে শুক্রাচার্য বিধান দিলেন—কোনও অল্পবুদ্ধি বামুন ভুল করেও যদি আজ থেকে মদ খায়, তবে সে ধর্মহীন মহাপাতকী বলে গণ্য হবে—কশ্চিন্ মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ/অপেতধর্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাৎ।

ব্রাহ্মণদের প্রতি শুক্রাচার্যের এই অভিশাপের সামাজিক তাৎপর্য একটাই। যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণদের সোম-পানের ব্যবস্থা থাকলেও, সোমরস সুরা নয় বলেই, সেটা কোনও অপরাধ বলে গণ্য হত না। বৈদিক যজ্ঞরাশির মধ্যে একমাত্র সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরার আহুতি এবং সুরাপানের ব্যবস্থা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন—"সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরা দেওয়া হইত; বিধিমতে সন্ধান বা fermentation দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিয়া সেই সুরা দেওয়া হইত। এই যজ্ঞের দেবতা ছিলেন অশ্বিদয়, সরস্বতী, আর ইন্দ্র সুত্রামা। অধ্বর্য্যু (যজুর্বেদীয় পুরোহিত) আগুনে দুধ ঢালিয়া দিতেন; তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা সেই সঙ্গে সুরা ঢালিয়া দিতেন। সুরাহুতির মন্ত্র—'যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধিষু, সোমস্য শুষ্মঃ সুরয়া সুতস্য, তেন জিন্ব যজমানং মদেন, সরস্বত্যশ্বিনাবিন্দ্রমগ্নিং স্বাহা'—এই মন্ত্রে সুরাকে স্পষ্টতই সোমস্থানীয় বলা হইয়াছে। কালক্রমে এই যজ্ঞেও সুরাপান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে—আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুরার পরিবর্তে দুধ চলিবে। দ্বিজাতি-সমাজে—বিশেষত ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচের হত্যাপরাধে শুক্রের অভিশাপে সুরা অপেয় হইয়াছে, এই পৌরাণিক কাহিনী প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।"

www.amarboi.com

কচের বিপত্তি এবং শুক্রাচার্যের অভিশাপের ঘটনা বৈদিক যুগের সমসাময়িক কি না অথবা সৌত্রামণি যজ্ঞের সঙ্গে শুক্রাচার্যের অভিশাপের বিষয় মিলিয়ে দেওয়া যায় কি না, সেটা খুব বড় কথা নয়। বড় কথা হল, শুক্রাচার্যের অভিশাপের সামাজিক তাৎপর্য। বৈদিক যুগের সৌত্রামণি যজ্ঞের মতো এক মহাযজ্ঞে সুরাপানের বিধি থাকায় এক সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুরার প্রকোপ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়। হয়তো এই সুরাপানের ফলে কোনও আচার্যস্থানীয় ব্রাহ্মণ-ঋষির মত্ততা দেখা গিয়েছিল এবং তা থেকে কোনও অভাবনীয় দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছিল। এই রকম ঘটনা যাতে লোক-শিক্ষক ব্রাহ্মণদের মধ্যে না ঘটে সেইখানেই শুক্রাচার্যের অভিশাপের তাৎপর্য। মহাভারতের কবি লিখেছেন—সুরাপানের ফলে মহামতি শুক্রাচার্যের মতো ব্যক্তিত্ব যে রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করে ফেলেছিলেন—সুরাপানাদ্ বঞ্চনাং প্রাপ্য বিদ্বান্—সেই রকম প্রমত্ত আচরণ যাতে অন্য কোনও ব্রাহ্মণ-সজ্জন না করেন, সেই হিতৈষণাতেই শুক্রাচার্যের অভিশাপ নেমে এসেছে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ওপর—তদোশনা বিপ্রহিতং চিকীর্ষুঃ/সুরাপানং প্রতি সঞ্জাতমণ্যুঃ। বস্তুত ব্রাহ্মণদের সুরাপানমত্ততা নিষেধ করার মধ্যেই শুক্রাচার্যের অভিশাপের তাৎপর্য। সুরামিশ্রিত কচের দেহভস্ম পান করে ফেলাটা অনুরূপ কোনও অপেয়-পানের স্মারক উপাখ্যান-মাত্র।

বত্রিশ

পূর্বে শুক্রাচার্য তাঁর দানব-শিষ্যদের ওপর খুবই রেগে গিয়েছিলেন। বারংবার কচের ওপর আক্রমণ হতে দেখে ক্রোধাবেশে এক সময় তিনি হুমকি দিয়েছিলেন—দেব-পক্ষে যোগ দেবেন। কিন্তু কচ যখন সম্পূর্ণ বেঁচেই উঠলেন, তখন দানবদের ওপর শুক্রাচার্যের আর সেই রাগ রইল না। শুধু একবার তাঁদের ডেকে বললেন—বাছারা! তোমরা বড়ই মূর্খ। তোমাদের বোকামিতে এই লাভ হল—কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছেন। এখন তাঁর ক্ষমতা আমার সমান। তাছাড়া কচ এখন আমার কাছে অনেকদিন থাকবেন—সিদ্ধঃ কচো বৎস্যতি মৎসকাশে। শুক্রের কথা শুনে দানবরা হতচকিত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। হয়তো মেয়ের মুখ চেয়েই শুক্রাচার্য নিজ ভবনে কচের দীর্ঘতর আবাস কল্পনা করেছিলেন। হয়তো বা সঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রয়োগ এবং কৌশল আয়ত্ত করার জন্য কচও গুরুগৃহে রয়ে গেলেন আরও বহুদিন। তারপর সময় এল যখন বৃহস্পতির পুত্র কচ গুরু শুক্রাচার্যের কাছে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। কচের ব্যবহারে, গুরু-শুশ্রূষায় তথা মন্ত্র গ্রহণের নিপুণতায় পরম সন্তুষ্ট গুরুদেব তাঁকে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন—অনুজ্ঞাতঃ কচো গন্তুমিয়েষ ত্রিদশালয়ম্।

এইবার সবচেয়ে কঠিন কাজটি সারতে হবে কচকে। দেবযানীর কাছে বিদায় নিতে হবে। প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিই, বঙ্গভাষার কবিগুরু যে ভাষায়, যে ভাবধ্বনিতে কচ ও দেবযানীর সংবাদ-সূক্ত রচনা করে 'বিদায়-অভিশাপ' উপহার দিয়েছেন, সেই ভাষা, সেই ভাব যদি পাঠকের হৃদয়ে গভীর হয়ে থাকে, তবে মহাভারতে বর্ণিত কচ ও দেবযানীর কথোপকথন তাঁদের নিরাশ করবে। কবিগুরু মহাভারত থেকে 'বিদায়-অভিশাপে'র উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই কাহিনী কবিজনোচিত আত্মীকরণের পর নতুন এক মাত্রা লাভ করেছে। কচ ও দেবযানীর মিলন-বিরহ বঙ্গীয় কবির স্মরণে-মননে-পরিবর্তনে এতটাই মধুর

হয়ে উঠেছে যে, সে বুঝি মহাভারতের কবির কল্পনাতেও ছিল না।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মহাভারতের কবি যে সমাজ থেকে কচ আর দেবযানীর চিত্র তুলে এনেছেন, সে সমাজে প্রেমের পথ বড়ই সরল, বড়ই সাধাসিধে। দেবযানীকে একবারও এখানে 'পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল' হোমধেনুটির কথা কচকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। মনে করিয়ে দিতে হয় না 'গ্রাম্যবধূসম' স্রোতস্বিনী বেণুমতীর কথা। অথবা পর্যায়ক্রমে 'হোমধেনু' আর 'বেণুমতী'র কথা বলেই হঠাৎ করে শুধোতে হয় না নিজের কথা—'হায় বন্ধু, এ প্রবাসে/আরো কোনো সহচরী ছিল তব পাশে,/পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে?' মহাভারতে বিদ্যাশিক্ষার শেষ দিনে গুরু শুক্রাচার্যের কাছে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি লাভ করেই কচ স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছেন। ভুলেও তিনি নির্জন আশ্রমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দেবযানীর কাছে এসে বলেননি—দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস/করিবে প্রয়াণ।

আসলে, কবিগুরু তাঁর পরিশীলিত রুচিতে দেবযানীর মতো এক অসামান্যা রমণীর এমন দুরবস্থা কল্পনাই করতে পারেন না, যেখানে রমণী স্বয়ং উপযাচিকা হয়ে প্রায় পলায়নোদ্যত কচকে পাকড়াও করে প্রেম নিবেদন করবেন। মহাভারতের কবির মনে ইউরোপীয় রোমান্সের কোনও জটিলতা না থাকায় তিনি সুন্দরী দেবযানীকে কচের সামনে উপস্থিত করেছেন সোজাসুজি—কোনও ভণিতা না করে মন্ত্রসিদ্ধ কচকে দেখতে পাচ্ছি—তিনি গুরুর অনুমতি নিয়ে—বিসৃষ্টং গুরুণা কচম্—স্বর্গের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। আর ঠিক প্রস্থানোদ্যত অবস্থায় দেবযানী এসে কচকে ধরে ফেলেছেন—প্রস্থিতং ত্রিদশাবাসং দেবযান্যব্রবীদিদম্। দেবযানীর প্রথম বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কবিকেই অনুসরণ করেছেন। দেবযানী বললেন—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র তুমি। তোমার ব্যবহার, তোমার বিদ্যা, তোমার তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়-সংযম—সবই তোমার অলংকার—ভ্রাজসে বিদ্যয়া চৈব তপসা চ দমেন চ।

MAIBOI.COM

দেবযানী এবার খুব সরলভাবে বিদ্যাবংশের কথা তুলে তাঁর নিজের কাছে বৃহস্পতির মান্যতা স্থাপন করছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও বিদ্যাবংশের একটা গুরুত্ব ছিল পণ্ডিত-সমাজে। ঔরস-জাত পুত্র-পরম্পরার থেকে বিদ্যা সম্বন্ধে পরম্পরা-প্রাপ্ত শিষ্যদের মূল্য কিছু কম ছিল না। দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য মহর্ষি অঙ্গিরার শিষ্য। আর দেবগুরু বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র। দেবযানী জানালেন—মহর্ষি অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মাননীয়, বৃহস্পতিও তেমনই আমার মাননীয়—যথা মান্যশ্চ, পূজ্যশ্চ মম ভূয়ো বৃহস্পতিঃ। দেবযানী বোঝাতে চাইলেন—ঠিক এই রকম একটা সমীকরণ বুঝে নিলে আমার কথাটাও তোমার শ্রবণযোগ্য হয়ে উঠবে। মহাভারতের মধ্যে ঠিক এই মুহূর্তে যেভাবে দেবযানী নিজের দীনতা প্রকাশ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি।

কিন্তু এর পরে রাবীন্দ্রিক দেবযানীর বাচন ভঙ্গিতে যে রমণীয় বিদগ্ধতা আছে—আর কিছু নাহি কি কামনা,/ভেবে দেখ মনে মনে—এই বিদগ্ধতার কোনও লেশও নেই মহাভারতের কবির জবানীতে। সেখানে শুক্রাচার্য আর বৃহস্পতির মান্যতা সমীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই দেবযানীর পরিষ্কার ঘোষণা—আজ তোমার বিদ্যালাভ শেষ—স সমাবৃতবিদ্যঃ—কিন্তু যে সব

দিনে ব্রত-নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে নিজেকে তুমি বেঁধে রেখেছিলে, সেই সব কঠোর সময়ে আমি তোমার কত সেবা করেছি! সে পরিচর্যার মধ্যে শুধুই কর্তব্যের অনুশাসন ছিল না, ছিল অনুরক্তি, ছিল ভালবাসা। তোমার বিদ্যাশিক্ষা, মন্ত্রলাভ আজ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু আমার ভালবাসা তো সেই একই রকম রয়ে গেছে। আর আমি যখন তোমাকে ভালবাসি, তখন তোমারও উচিত আমাকে ভালবাসা। ভালবাসার অঙ্কে হিসাব কষে দুয়ে দুয়ে চার করে দিলেন দেবযানী। তাঁর সিদ্ধান্তও প্রকাশ পেল সঙ্গে সঙ্গে—তাহলে আর দেরি নয়, তুমি বৈদিক বিধি অনুসারে আমার পাণি গ্রহণ করো—গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্।

'বিদায়-অভিশাপ'-এ বিদগ্ধা দেবযানীর শত প্রশ্নে, শত তর্ক-যুক্তিজালে কচ একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছেন। কচের অন্তরে দেবযানীর জন্য যেন গভীর ভালবাসা আছে সেখানে। শুধু তিনি ইন্দ্রের কাছে কথা দিয়েছেন বলেই যেন আজ দেবযানীকে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে—এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে রাবীন্দ্রিক কচের ভাষণে। 'আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়, সখী এমন অধরা-ধরা কোনও আবেশ মহাভারতীয় কচের নেই। মহাভারতের কচ-দেবযানীর মনের কথা জানেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও জানেন দেবযানীকে ধরে তিনি আপন কার্যোদ্ধার করেছেন মাত্র। এর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা সামান্য কিছু থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সংকোচ নেই কোনও। আগে থেকে তিনি দেবযানীর মনের কথা বুঝেছিলেন বলেই তিনি তাড়াতাড়ি গুরুগৃহ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চান। আর যদি বা দেবযানী তাঁকে শেষ মুহূর্তে ধরেও ফেলেন, তবে তাঁকে সযত্নে প্রত্যাখ্যান করার উত্তর তাঁর সাজানোই আছে। অর্থাৎ মহাভারতের কচও অঙ্ক কষেই রেখেছেন।

দেবযানীর দিক থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতেই মহাভারতের কচ বললেন—তোমার পিতা যেমন আমার পূজনীয় ব্যক্তি, তেমনই তুমিও তাই—তথা ত্বম্ অনবদ্যাঙ্গি পূজনীয়তরা মম। মহাত্মা শুক্রাচার্য নিজের প্রাণের চেয়েও তোমাকে ভালবাসেন, সে কথা জানি। কিন্তু গুরুর কন্যা যেহেতু গুরুবৎ মান্যা, তাই বিয়ে করার মতো একটা প্রস্তাব তোমার মুখ দিয়ে না বেরলেই-ই ভাল,—দেবযানী তথৈব ত্বং নৈবং মাং বক্তুমর্হসি। কচের কথায় শাস্ত্রীয় যুক্তি অবশ্যই আছে। এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, স্মার্ত পণ্ডিতেরা গুরুপুত্র এবং গুরুপুত্রীদের গুরুর মতই সম্মান করতে বলেছেন। কিন্তু দেবযানী সেই যুক্তির ধারে কাছে গেলেন না। তিনি একেবারে মহর্ষি অঙ্গিরার বিদ্যাবংশ টেনে এনে কচই যে তাঁর আরাধ্যতম ব্যক্তি সে কথা প্রমাণ করে ছাড়লেন।

'বিদায় অভিশাপে' কচের ওপরে বারংবার দানবদের আক্রমণ এবং দেবযানীর করুণায় তাঁর পুনরায় জীবন লাভের প্রসঙ্গটি কচ নিজেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। স্ত্রীলোকের করুণায় বার বার প্রাণ পাওয়া একটি পুরুষের দিক থেকে এই বিনম্র আচরণই যে সবচেয়ে স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তারই আভাস ফুটে ওঠে—

ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া ক'রে
ফিরায়ে দিয়াছ মোর প্রাণ; সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।

এ কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের দেবযানী দীপ্র হয়ে ওঠেন। তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে নিশিত ক্ষুরধার—উপকার যা করেছি হয়ে যাক ছাই। কিন্তু মহাভারতে দেবযানীর করুণালব্ধ জীবনে

কচের কৃতজ্ঞতা নেই কোনও। উলটে দেবযানী তির্যক ভঙ্গিতে নিজের উপকারের কথা কচকে স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে অন্তত কৃতজ্ঞতার কারণেও কচ তাঁর প্রেমজালে আবদ্ধ হন। দেবযানী বলেন—কচ! অসুররা যখন বার বার তোমাকে মেরে ফেলছিল, তখন বার বার আমি যে পিতার কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছি, তার পেছনে আমার ভালবাসাই ছিল একমাত্র কারণ। আজ কৃতজ্ঞতার কারণেই অন্তত সেই কথাগুলি স্মরণ করো—তদা প্রভৃতি যা প্রীতিস্তাং ত্বমদ্য স্মরস্ব মে—কবির ভাষায় যার অনুবাদ—সুখস্মৃতি নাহি কিছু মনে? গুরু-গুরুপুত্রী, মহর্ষি অঙ্গিরার বিদ্যাবংশের সম্বন্ধ—এই সব কূট তর্কে এখন আর দেবযানী যেতে চান না। দেবযানীর বক্তব্য—অনুরাগ যদি থাকে, তবে বিবাহের পরিণতির জন্য সেই তো যথেষ্ট। ভালবাসার কাঙালকে তুমি এইভাবে ছেড়ে চলে যেতে পার না, কচ—ন মামর্হসি ধর্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তামনাগসম্।

কচ দেবযানীর প্রণয়-সূক্তিতে একটুও ভুললেন না। তিনি সেই একই যুক্তি দেখিয়ে বললেন,—যে কাজ করা উচিত নয়, তুমি সেই কাজটাই আমাকে দিয়ে জোর করে করাতে চাইছ। আমি বললাম না—তুমি আমার গুরুর মতো। আর যদি আমি শুক্রাচার্যের সঙ্গে শিষ্য সম্বন্ধটাই বড় করে দেখি, তবে তুমি আমার ভগিনী। কাজেই ওইসব বিয়ে-টিয়ের কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণও কোরো না—ভগিনী ধর্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ সুমধ্যমে।

যে সব কথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিদায়-অভিশাপ' আরম্ভ করেছিলেন, সেইসব কথা মহাভারতে আসছে কচের দ্বিধাহীন প্রত্যাখ্যানের পর। দেবযানীকে খুব খানিকটা ধমকে দেওয়ার পরই যেন কচের মনে হল—সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা বোধহয় দেবযানীকে জানানো দরকার। কাজেই সামান্য মধুর এক সমাপনের জন্য একেবারে দায়সারা ভাবে কচ বললেন—ভালই ছিলাম, দেবযানী! ভালই ছিলাম এখানে। কোনও দৈন্য, কোনও কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেনি—সুখমস্ম্যুষিতো ভদ্রে ন মন্যুর্বিদ্যতে মম।' তোমার কাছে যাবার অনুমতি চাই। যাবার পথ যাতে নির্বিঘ্ন হয় সেই মঙ্গলটুকু শুধু তুমি কামনা কর আজ। গুরু শুক্রাচার্য বা আর কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যদি আমার কথা আসে, তবে স্মরণ করো আমাকে স্মর্তব্যো'স্মি কথান্তরে। গুরু শুক্রাচার্য তোমার পিতা, তাঁর পরিচর্যা কোরো যথাসম্ভব।

কচের এই কটি কথার মধ্যে প্রেমের পরিপাটি যতটুকু আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সান্ত্বনা। প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী মধুর প্রলেপবাক্য। বিশ্বকবি এই কটি কথাকেই কবিতার প্রথমে নিয়ে এসে কচের অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেছেন মোহময়ী ব্যঞ্জনায়। অথচ মহাভারতে কচের এই সান্ত্বনা-প্রলেপের বাক্য স্তব্ধ হয়ে গেছে দেবযানীর কঠোর অভিশাপে। দেবযানী বলেছেন—তুমি যখন আমার প্রেম এবং বিবাহের প্রস্তাব এইভাবে প্রত্যাখ্যান করলে, তখন তোমার নবলব্ধ সঞ্জীবনী বিদ্যাও সফল হবে না—ততঃ কচ ন তে বিদ্যা সিদ্ধিমেষা গমিষ্যতি। কচও এখানে এত মহানুভব নন যে অভিশাপ শুনেও নিঃস্বার্থ সাধুতায় বলে উঠবেন—আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

মহাভারতের দেবযানীর অভিশাপে ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহস্পতিপুত্র কচ পালটা অভিশাপ উচ্চারণ করেন—তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে এমন নিষ্ঠুর অভিশাপ দিলে দেবযানী। আমি তোমাকে ধর্মকথা বলেছিলাম। বলেছিলাম—গুরুপুত্রী তুমি, তাই বিয়ে করতে পারব না। অথচ ধর্মের কথা না শুনে শুধু কামে মত্ত হয়ে তুমি আমায় অভিশাপ দিলে। তা শুনে রাখ, আমিও তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি—তুমি যা চেয়েছিলে, তা কখনও হবে না। কোনওদিন কোনও

AMARBOI.COM

ঋষিপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—ঋষিপুত্রো ন তে কশ্চিজ্জাতু পাণিং গ্রহীষ্যতি। কচ আরও কথা শোনালেন দেবযানীকে। ব্যঙ্গ করে বললেন—খুব তো বললে আমার বিদ্যা ফলবে না। তা কী আসে যায় তাতে? আমি কোনও মৃতের প্রাণ সঞ্চার করতে নাই বা পারলাম। কিন্তু আমি যাকে বিদ্যা শেখাব সে তো আমার হয়ে কাজটা করতে পারবে। তার তো বিদ্যা ফলবে—অধ্যাপয়িষ্যামি তু যং তস্য বিদ্যা ফলিষ্যতি।

অভিশাপ লাভ করে অভিশাপ দিয়ে কচ শেষ পর্যন্ত স্বর্গে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য স্বর্গে বিশাল আয়োজন ছিল। স্বয়ং ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কচকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন স্বর্গসভায়। এদিকে প্রত্যাখ্যান লজ্জিতা দেবযানী একাকিনী পড়ে রইলেন শুক্রাচার্যের আশ্রমে। তাঁর সান্ধ্য শিঙ্গারের জন্য কেউ আর ফুল তুলে আনে না। কেউ তাঁর অবসর সময় পূর্ণ করে তোলে না নৃত্য গীতে, বাদিত্রে।

দেবযানীর চরিত্র এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। ঘটনা যতটুকু ঘটেছে তাতে নিঃসন্দেহে এইটুকু বলা চলে যে, দেবযানী মৃদুলা বনলতাটি নন। তাঁর মন অনেক কঠিন ধাতুতে গড়া। মহাভারতের চিত্র থেকে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে কচের দিক থেকে প্রেম-ভালবাসার কোনও আভাস আমরা দেখিনি। তিনি সুচতুর অভিনয় করেছেন এবং দেবযানীর জন্য কুসুম-চয়ন থেকে আরম্ভ করে নৃত্য-গীত-দাসত্ব, সবই ছিল এই অভিনয়ের অঙ্গ। দেবযানীকে তুষ্ট করে তিনি শুক্রাচার্যের হৃদয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন—'বিদায় অভিশাপ'-এ দেবযানীর এই বাস্তব আক্ষেপটুকুই সত্যি।

অন্যদিকে এও স্বীকার করতে হবে, দেবযানীর ব্যবহারও কিছু কৃত্রিমতা মুক্ত নয়। তিনি যে অসাধারণ সুন্দরী, তিনি যে অসুর-গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা এবং সর্বোপরি তিনি যে সকলের চেয়ে আলাদা—এই উদগ্র অনুভূতি দেবযানীর মন সদা-সর্বদা ব্যাপ্ত করে রেখেছিল। মহাভারতের কয়েকটি পংক্তি আমাদের মনে ক্রিয়া করতে থাকে। কচ তাঁর স্বর্গীয় নৃত্যগীত দেখিয়ে দেবযানীর মন মাতানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাসত্বভাব বরণ করেছিলেন—প্রেষণৈশ্চ তোষয়ামাস ভারত। আরও লক্ষণীয়, তৃতীয়বার কচ দানবদের হাতে মারা পড়লে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য যে সমস্ত কারণ দেবযানী দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যে কচের জন্য তাঁর প্রণয় এবং প্রিয়ত্ব প্রকাশ পেলেও সে প্রিয়ত্ব সর্বার্থে অহংবর্জিত নয়। প্রেমের মধ্যে প্রণয়ের সঙ্গে যে বিনতি থাকে, যে আত্মনিবেদন থাকে, দেবযানীর ব্যক্তিত্ব তাঁকে কোনওদিন সেই প্রণয়ের রসভাগিনী করেনি। পিতার কাছে যখন তিনি কচকে বাঁচানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন, তখন কচের জন্য তাঁর প্রণয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেটা বড় হয়ে উঠেছে সেটা দেবযানীর ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়—শুধু ব্রহ্মচর্য আর তপশ্চর্যাই নয়, সব ব্যাপারে কচের উৎসাহ ছিল দেখার মতো। আর কাজ করতে বললে সে যেন সদা প্রস্তুত, যেন এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। কাজের দক্ষতাও তার সেই রকম— সদোত্থিতঃ কর্মসু চৈব দক্ষঃ।

দেবযানী যাঁকে প্রিয় ভাবছেন, যাঁকে সুন্দর দেখে মোহিত হচ্ছেন, সেই প্রিয়ত্ব এবং মোহের সঙ্গে তাঁর কর্ম-দক্ষতার হিসাবটুকু দেবযানীকে সম্পূর্ণ প্রেমিকার মর্যাদায় উত্তীর্ণ করে না। পরিশেষে কচের কাছে প্রেম নিবেদন করার সময়েও তিনি অন্য এক হিসাবের খাতা খুলে বসেছেন। সোজা কথায় তাঁর ভাবটা দাঁড়ায়—আমি তিনবার তোকে দয়া করে বাঁচিয়েছি, তুই আমাকে বিয়ে করবি না কেন? দেবযানী জানেন না—প্রেমের রাজ্যে প্রাণ-দানের দয়ার চেয়েও মনের সরসতা এবং পারস্পরিক সমতা অনেক বেশি জরুরি। দেবযানী শুক্রাচার্যের

আশ্রমে পুনরায় একাকিত্বের অবসরে জীবন কাটাতে লাগলেন বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে কচের কাছে প্রেম নিবেদনের দীনতা ছাড়া তাঁর একাকিত্বের সঙ্গী হল তাঁর অহংকার, এবং তাঁর একান্ত স্ব-আরোপিত এক মর্যাদাবোধ—যা একটা মানুষকে নিজের মনের মধ্যে যতই বড় করে তুলুক, তাকে শান্তি দেয় না। সরসতা দেয় না।

কচ দেবযানীকে অভিশাপ দিয়ে গেছেন—কোনও ঋষিপুত্র তোমার পাণি গ্রহণ করবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিশাপের বড় একটা তাৎপর্য নাই থাকতে পারে! আমরা ভাবতেই পারি যে, একজন ঋষির ছেলে অথবা স্বয়ং কোনও ঋষির সঙ্গে বিয়ে না হলে ভারি বয়েই গেল দেবযানীর। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই সামান্য অভিশাপেরও একটা গভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে। না, আমরা একথা বলছি না যে, মহাভারতের যুগে একজন ঋষিকন্যার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিবাহ হয়নি অথবা একজন ঋষি কোনও ক্ষত্রিয়া রমণীকে কণ্ঠলগ্না করেননি। এ রকম উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে এবং সে উদাহরণ বর্ণসাঙ্কর্যের ক্ষেত্রেই স্মরণীয়। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে একজন ঋষিকন্যা স্বামী হিসেবে কোনও ঋষিপুত্রের সন্ধান পেলেন না—এটা পিতামাতার পক্ষে কষ্টকর ছিল।

মনে রাখতে হবে—মহাভারতের সমাজ বৈদিক সমাজের উত্তর পর্যায় মাত্র। বৈদিক রীতি-নীতি এবং সামাজিকতা কোনও না কোনওভাবে মহাভারতের সমাজেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সে যুগে ঋষি এবং পুরোহিতেরা শুধু অধ্যাত্ম-বিদ্যার পথ-প্রদর্শকই ছিলেন না, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার এবং মর্যাদা ছিল সব চাইতে বেশি। ফলে একটি ঋষির ঘরের মেয়েকে যদি অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার ক্ষত্রিয় ঘরে বা বৈশ্য ঘরে বধূ হয়ে যেতে হত, তবে সেটা সামাজিকভাবে খুব আদরণীয় হত না। এমনকি ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়ের ঘরের মেয়েকেও বিয়ে করতে চাইতেন তবে একটি ক্ষত্রিয় পিতা মাতা উদ্বিগ্ন হতেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা যাচাই করে দেখতেন—সেই ব্রাহ্মণের শিক্ষা দীক্ষা মান মর্যাদা কতটা? আরও ভাবতেন রাজার ঘরের মেয়েকে যখন রাজপুত্রের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া গেল না তখন যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে তার অন্তত বিদ্যাবত্তা এবং পাণ্ডিত্যের মর্যাদাটুকু থাকুক। এই ভাবনা যে কত দৃঢ় প্রোথিত ছিল তা বোঝা যায় বৈদিক দেবতাবিষয়ক সুপ্রাচীন গ্রন্থ বৃহদ্দেবতার একটি কাহিনীর মধ্যে। কোনও ঋষিপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—কচের এই অভিশাপের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে মহাভারত পূর্ব এই কাহিনীর মধ্যেই।

তেত্রিশ

কচের অভিশাপের মধ্যে আমরা মহাভারতের সমাজের ওপর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৈদিক সমাজের উত্তরাধিকার দেখতে পাব। তার জন্যই বৃহদ্দেবতার একটি উপাখ্যান এখানে উল্লেখ করব।

ঘটনার 'লোকেশন' সেই হিমালয়ের উত্তরখণ্ড—রম্যে হিমবতঃ পৃষ্ঠে—যে জায়গাটাকে পূর্বে আমরা স্বর্গভূমির আদলে চিহ্নিত করেছি। ঘটনা আরম্ভ হচ্ছে রাজা দার্ভ্য রথবীতিকে দিয়ে। রথবীতি দার্ভ্য শুধু রাজা নন, তিনি রাজর্ষি অর্থাৎ রাজাও বটে ঋষিও বটে; হয়তো এক্ষেত্রে রাজার চেয়ে ঋষির গুণ তাঁর মধ্যে বেশি। রথবীতি একটি যজ্ঞ করবেন বলে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ঋষিকে তাঁর প্রয়োজনের কথা জানিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন রথবীতি দার্ভ্য। মহর্ষি অত্রি বৃদ্ধ হয়েছেন যথেষ্ট। তাই যজ্ঞকর্মে ঋত্বিকের কার্যভার সমাধা করার জন্য তিনি তাঁর পুত্র অর্চনানাকে নিযুক্ত করলেন। রাজা রথবীতি আত্রেয় অর্চনানাকে ঋত্বিক হিসেবে বরণ করে ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

আজ থেকে পঞ্চাশ/ষাট বছর আগেও যাঁরা বংশ-পরম্পরায় পৌরোহিত্যের কাজ করতেন, তাঁরা নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা, অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ বা সপিণ্ডকরণের মতো বড় বড় স্মার্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় সপুত্রক যজ্ঞিবাড়িতে উপস্থিত হতেন। নবীন ব্রাহ্মণ এইভাবে পিতৃপুরুষের ধারায় স্মার্ত ক্রিয়াকর্মগুলি নিজে রপ্ত করার চেষ্টা করত আবার পিতাকে সাহায্যও করত। মহর্ষি অর্চনানাও রাজবাড়িতে যাবার সময় আপন পুত্র শ্যাবাশ্বকে নিয়ে গেলেন—স সপুত্রো'ভ্যগচ্ছত্তং রাজানং যজ্ঞসিদ্ধয়ে। শ্যাবাশ্ব নবীনবয়সী যুবা। পিতার কাছে এতদিন তিনি বেদ-বেদাঙ্গের সম্পূর্ণ পাঠ শিক্ষা করেছেন। এখন রথবীতির যজ্ঞকার্যে পিতার সঙ্গে তিনি রাজাকে যাজন করাতে এসেছেন।

যজ্ঞকার্য আরম্ভ হল। একেকটি যজ্ঞের প্রক্রিয়াতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগে যায়।

বাড়িতে দুর্গাপূজা হলে চার/পাঁচ দিনের ওঠাবসায় পুরোহিতের সঙ্গে যেমন সম্পূর্ণ পরিবারের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে—তেমনই এক্ষেত্রেও তাই হল। যজ্ঞের বিস্তীর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেই মহর্ষি অর্চনানা একদিন রাজা রথবীতির কন্যাকে বড় কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন। মেয়েটিকে দেখে তাঁর বড় ভাল লাগল। যেমন তার রূপ, তেমনই তার প্রকৃতি। মহর্ষি অর্চনানা ভাবলেন —মেয়েটিকে যদি আমার ছেলের বউ করে নিয়ে যেতে পারতাম তবে ভারি ভাল হত—স্নুষা মে রাজপুত্রী স্যাদ্ ইতি তস্য মনো'ভবৎ।

রথবীতির কন্যা হয়তো এমনিই এসেছে যজ্ঞগৃহে। কখনও সে যজ্ঞের প্রক্রিয়া দেখে কৌতূহলী হচ্ছে, কখনও কারও সঙ্গে গল্প করছে, কখনও বা অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুবক শ্যাবাশ্ব মাঝে মাঝেই তাকে লক্ষ করছেন। যজ্ঞকর্মের নানা কাজের মধ্যেও রাজপুত্রীর দিকে যেমন তাঁর নজর আছে, তেমনই যজ্ঞকর্মের অবসরে তার হাত থেকে তৃষ্ণার জলপাত্র গ্রহণ করার সময়, আহারের পর তাম্বুল গ্রহণের সময় অথবা অন্যত্র কথোপকথনের অলস কোনও মুহূর্তে যুবক শ্যাবাশ্ব রাজপুত্রীকে যতবার দেখেছেন, ততবারই মোহিত হয়েছেন মনে মনে—শ্যাবাশ্বস্য চ তস্যাং বৈ সক্তমাসীত্তদা মনঃ। দিন যায়, রাত যায়, শ্যাবাশ্ব রাজপুত্রীকে দেখেন, মুগ্ধ হন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেন না। তবে সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁর সান্ত্বনা রথবীতির পুত্রটি তাঁর পিতা অর্চনানার অনুমোদিতা পাত্রী। অর্থাৎ বিবাহ করতে চাইলে পিতা তাঁকে না বলবেন না অন্তত।

মনে মনে ছট্‌ফট্ করতে করতে শ্যাবাশ্ব একদিন রাজা রথবীতিকে বলেই ফেললেন—মহারাজ! আপনার কন্যাটিকে বিবাহের অনুমতি দিন আমাকে—সংযুজ্যস্ব ময়া রাজন্। রাজা রথবীতি এমন কিছু চমকিত হননি। কোথায় কী ঘটছে, তিনি সবই খবর রাখেন। শ্যাবাশ্বের প্রস্তাবে রথবীতির খুব একটা আপত্তি কিছু ছিল না—শ্যাবাশ্বায় সুতাং দিৎসুঃ। কিন্তু একেবারে শেষ কথা দেওয়ার আগে তিনি রাজমহিষীকে একবার জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করলেন। নারীপ্রগতিবাদীরা বৃহদ্দেবতার এই অংশ শুনে খুশি হবেন কি না জানি না, কিন্তু সেই কালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা তত ভাল নয়, তাঁরা অন্তত একটি কথা শুনে স্বস্তি পাবেন যে, রথবীতি রাজমহিষীর যুক্তি-তর্ক মেনে নিয়েছিলেন।

রাজমহিষীকে রাজা বললেন—বুঝলে রানি! এই শ্যাবাশ্ব ছেলেটির হাতেই আমি আমার কন্যা সম্প্রদান করতে চাই। তা তুমি কী বল—কিং তে মতমহং কন্যাং শ্যাবাশ্বায় দদামি হি? রথবীতি বিবাহকার্যের যৌক্তিকতা বোঝাতে চাইলেন পাত্রের যোগ্যতা এবং মর্যাদা দেখিয়ে। রথবীতি বললেন—শ্যাবাশ্ব ছেলেটি ভাল। মহর্ষি অত্রির বংশ বলে কথা। আমাদের জামাই হবার যথেষ্ট সামর্থ্য এই ছেলেটির আছে—অত্রিপুত্রো'দুর্বলো হি জামাতা ত্বাবয়োরিতি।

রাজমহিষী মহর্ষি অত্রির অথবা অত্রিপুত্র অর্চনানার অভিশাপের ভয় করলেন না। রাজার কথাও শুনলেন না। রাজর্ষি রথবীতির মহিষী হবার গৌরবের সঙ্গে নিজের পিতৃগৌরব মিশিয়ে তিনি বললেন—মহারাজ! আমি এক রাজর্ষি-ঘরের মেয়ে—নৃপর্ষিকুলজা হ্যহম্। আমিও এই গৌরব মাথায় নিয়ে তোমায় জানাচ্ছি—এখনও যে ব্রাহ্মণ-যুবক বেদের একটি মন্ত্রবর্ণও দর্শন করেননি, এখনও যিনি ঋষি-পদবাচ্য নন, সেই রকম এক অঋষির হাতে আমি আমার মেয়েকে দিতে পারি না। তাঁকে জামাই হিসেবেও মন থেকে মেনে নিতে পারি না—নানৃষি-র্নৌ তু জামাতা নৈষ মন্ত্রান্ হি দৃষ্টবান্। এবার রাজমহিষী তাঁর নিজস্ব যুক্তি দেখিয়ে বললেন—মেয়ের যদি বিয়েই দিতে হয়, তবে তাকে দাও এক ঋষির হাতে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির

AMARBOI.COM

হাতে পড়লে লোকে আমার মেয়েকে বলবে বেদমাতা। যেহেতু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে লোকে বেদপিতা বলেই মান দেয়—ঋষয়ে দীয়তাং কন্যা বেদস্যাম্বা ভবিষ্যতি।

লক্ষণীয় বিষয় হল—রাজমহিষী কোনও ব্রাহ্মণের কথা বলছেন না। তিনি একজন ঋষিকে জামাই হিসেবে দেখতে চান। তিনি ব্রাহ্মণ হবেন, কি ক্ষত্রিয় হবেন—এ সম্বন্ধে তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। অনেকের ধারণা আছে—ঋষি মাত্রেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। হ্যাঁ, একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, বৈদিক সমাজে অধিকাংশ ঋষিই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু বিদ্যা-জ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়রা অনেকেই ঋষি ছিলেন এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজর্ষিই ছিলেন পরবর্তী কালের অনেক ব্রাহ্মণ ঋষির গুরু। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল—শূদ্র কিংবা জারজ হওয়া সত্ত্বেও বৈদিক সমাজে ঋষিত্ব আটকানো যায়নি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ কবষ ঐলূষ।

সেকালের বৈদিকদের কাছে সরস্বতী নদীর মাহাত্ম্য ছিল সবচেয়ে বেশি। এই সরস্বতী নদীর তীরে একসময় এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল। সেই পবিত্র যজ্ঞস্থলের মাঝখানে ঐলূষপুত্র কবষকে দেখতে পেয়ে অন্যান্য ঋষিরা বললেন—এ ব্যাটা দাসীপুত্র বেজন্মা কবষ এই যজ্ঞের দীক্ষা পেল কী করে? খুব তো এর সাহস দেখছি। ঋষিরা ঐলূষ কবষকে সেই পবিত্র সোমযোগের স্থান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এই চত্বরে যেন না দেখি। এই সরস্বতী নদীর জল পর্যন্ত তুই খাবি না, ছুঁবি না। কবষ ঐলূষ এক জলহীন দেশে বিতাড়িত হয়ে পিপাসায় আর্ত হলেন। মনে তাঁর ক্ষোভ—ঋষিরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একত্র বসে পান-ভোজনও করবেন না বলেছেন। এই ক্ষোভ আর আকৃতি থেকেই তাঁর জিহ্বায় জন্ম নিল অপূর্ব বৈদিক মন্ত্র। সরস্বতীর ঢেউ-তোলা জল বৈদিক ছন্দে বাঁধা পড়ল কবষ ঐলূষের কণ্ঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদীর পবিত্র জলধারা তাঁর চারদিক দিয়ে বইয়ে দিতে লাগল কবষ ঐলূষের মনের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাল রেখে।

ব্রাহ্মণ ঋষিরা সব দেখলেন। লজ্জায় তাঁদের মাথা নুয়ে গেল। যাঁকে তাঁরা এত হেলা-ফেলা করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাঁকে পিপাসার্ত হয়ে মেরে ফেলবার জন্য জলহীন দেশে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছিলেন, সেই কবষ ঐলূষ, তাঁদের ভাষায় জারজ বেজন্মা দাসীপুত্র—সেই কবষ ঐলূষ নদীরূপা সরস্বতী মন্ত্র দর্শন করে তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ঋষিরা সমবেত হয়ে ঐলূষের কাছে এসে 'ঋষি' সম্বোধন করে বললেন—প্রণাম ঋষি। রাগ করবেন না আমাদের ওপর—নমস্তে অস্তু মা নো হিংসীঃ। আমাদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, নইলে যে সরস্বতীর জলবাহিনী তীর থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেই সরস্বতী আপনারই অনুগমন করছে—ত্বং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি যং ত্বেয়মন্বেতি।

কবষ ঐলূষের উদাহরণ থেকে আমাদের আরও মনে হয় মন্ত্রদর্শন করা মানে নতুন কবিতার জন্ম—সে কবিতার জন্ম রামায়ণের বাল্মীকিকে ঋষি করেছে। শ্লোক উচ্চারণ করেই বাল্মীকি চমকে উঠেছিলেন—এ আমার মুখ দিয়ে কী বেরল! বাল্মীকি ঋষি হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা—রাজর্ষি রথবীতির মহিষী একজন কবি-ঋষিকে তাঁর জামাই হিসেবে চান—যে মন্ত্র দর্শন করেছে, ছন্দোবদ্ধ কবিতা সুন্দরীকে দেখতে পেয়েছে।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কাকে বলে? অধ্যাত্মবাদীরা বলেন—বহু তপস্যার ফলে কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি বেদমন্ত্র দর্শনের পুণ্যলাভ করতেন। ঋগ্‌বেদে যত মন্ত্র আছে, তা সবই কোনও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মন্ত্রদর্শনের ফল। তাঁদের মতে, বেদের মন্ত্র কেউ লেখেনি। অধ্যাত্মবিদ্যার চরম পর্যায়ে আরোহণ করে যাঁরা মন্ত্র দর্শন করেছেন, তাঁরাই ঋষি—দর্শনাদ্‌ ঋষয়ো বভূবুঃ। সেই

AMARBOI.COM

আর্যমন্ত্র শ্রুতিপরম্পরায় নেমে এসেছে আমাদের কাছে।

অধ্যাত্মবাদীদের কথা ঠেলে ফেলে দিয়ে কেউ যদি জড়ভাবেও কথাটা ব্যাখ্যা করেন, তবুও মন্ত্রদর্শনের মূল্যটা কম নয়। অলংকারশাস্ত্র মতে ঋষির এক নাম হল কবি। এঁদের মতে ক্রান্তদর্শী কবি তাঁর গভীর দৃষ্টি আর বর্ণনার ক্ষমতাতেই কবি পদবি লাভ করেন—দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চৈব রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ। হাজার হাজার বছর আগে অনেক আধুনিক সভ্যতার পূর্বতনেরা যখন কাঁচা মাংস খাচ্ছেন, তখন ভারতবর্ষে বেদের মতো কবিতার জন্ম হয়েছে। রাজমহিষীর কথার আলংকারিক ব্যাখ্যা করে যদি বলি—যে এখনও বেদের মন্ত্র দর্শন করেনি —নৈষ মন্ত্রান্ হি দৃষ্টবান্—অর্থাৎ যে এখনও একখানি বৈদিক কবিতার সৃষ্টি করতে পারেনি, সেই রকম অকবি-অঋষির হাতে আমার মেয়ে দেব না। কবিতা যে লেখে, সেই কবিতার জনক, পিতা। বেদমন্ত্র দর্শন করে যে মানুষ ঋষি হলেন, সেই স্রষ্টা, দ্রষ্টা ঋষিকেই লোকে বেদের পিতা বলে মানে—রাজমহিষীর ভাষায়—ঋষিং মন্ত্রদৃশং বেদপিতরং মন্যতে যতঃ। সেই বেদপিতা ঋষির সম্বন্ধেই একটি কুলবতী কন্যা বেদমাতা হবার সম্মান পায়। অন্তরে বুঝি আশা থাকে—এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিপত্নীর গর্ভ থেকেই আরও এক মন্ত্রদ্রষ্টা বেদপিতা ঋষির জন্ম হবে।

রাজা রথবীতি, রাজর্ষি রথবীতি রাজমহিষীর যুক্তি উড়িয়ে দিতে পারেননি। সত্যিও তো কবি, বিদ্বান, মন্ত্রদ্রষ্টা একজন ঋষিকেই তিনি জামাই হিসেবে পেতে চান। শ্যাবাশ্বকে তিনি জানিয়ে দিলেন—সম্ভব নয় বৎস। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নন, তিনি আমার জামাই হতে পারেন না—অনৃষির্নৈব জামাতা কশ্চিদ্ ভবিতুমর্হতি।

রথবীতির রাজ্যে তাঁর প্রারব্ধ যজ্ঞক্রিয়া শেষ হয়ে গেল।

মহর্ষি অর্চনানা এবং শ্যাবাশ্ব দুঃখিত মনে আশ্রমে ফিরে যাবার উপক্রম করলেন। কিন্তু শ্যাবাশ্বের মন পড়ে রইল রথবীতির রাজ্যে। সে মন জুড়ে রইল অদৃশ্য রাজকন্যার উপস্থিতি—শ্যাবাশ্বস্য তু কন্যায়াং মনো নৈব ন্যবর্তত। আশ্রমে ফিরে যাবার পথে আরও দুই রাজবাড়ি ঘুরে অনেক ধন-ধান্য, পশু-হিরণ্য দান লাভ করে মহর্ষি অত্রির কাছে ফিরে এলেন অর্চনানা এবং শ্যাবাশ্ব।

কিন্তু শ্যাবাশ্বের মনে কোনও শান্তি নেই। তিনি মন্ত্রদর্শন করে ঋষিপদবি লাভ করেননি বলেই তো আজ রথবীতির মতো যজমানের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেন। মনের দুঃখে তিনি বনবাসী হলেন। অন্তরে বার বার শুধু রাজকন্যার মুখটি জেগে ওঠে আর শ্যাবাশ্ব ধিক্কার দেন নিজেকে—শুধু মন্ত্রদর্শন করে ঋষি হইনি বলেই না আজ অমন সুন্দরী রাজকন্যার হৃদয় থেকে আমি বঞ্চিত—ন লব্ধবানহং কন্যাং হন্ত সর্বাঙ্গশোভানাম্। আহা যদি আমি মন্ত্র দর্শন করতে পারতাম, তাহলে কী সুখই না হত।

প্রেমের এই অদ্ভুত আকৃতি থেকেই শ্যাবাশ্ব মরুদ্‌গণের সাক্ষাৎ পেলেন অরণ্যের মধ্যে। মরুদ্‌গণের বয়স এবং রূপ শ্যাবাশ্বের মতোই। সে দেবতার বুকে রুপোর বর্ম আঁটা। দিব্যতেজ সমন্বিত মরুদ্‌গণকে দেখেই শ্যাবাশ্বের মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ হল। নতুন ঋক্ মন্ত্র, নতুন কবিতা, মরুদ্‌গণের স্তুতি-সূক্ত। শ্যাবাশ্ব ঋষি হলেন অথবা আমাদের মতে কবি হলেন। মন্ত্র দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে শ্যাবাশ্বের মন ছুটে গেল রথবীতির রাজ্যে—অগচ্ছন্মনসা তদা। ঋষি-কবি সশরীরে উপস্থিত হলেন রাজর্ষি দার্ভ্য রথবীতির রাজ্যের সীমানায়। দূতীর মাধ্যমে রাজার কাছে ঘোষণা করা হল ঋষিকবির নবীন ঋঙ্‌মন্ত্রোচ্চারণের কথা। রথবীতি সলজ্জে কন্যার হাত ধরে উপস্থিত হলেন শ্যাবাশ্বের পিতা অর্চনানার কাছে। রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—রাগ

করবেন না মহর্ষি। একসময় আপনি আমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটানোর কথা নিজমুখে বলেছিলেন। সেদিন আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু আজকে জেনেছি—ঋষির পুত্র স্বয়ং ঋষি হয়েছেন। আপনি এখন এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পিতা—ঋষেঃ পুত্রঃ স্বয়মৃঋষিঃ পিতাসি ভগবন্ ঋষেঃ। আপনি দয়া করে আমার কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে অঙ্গীকার করুন। তরুণ কবি-ঋষি শ্যাবাশ্বের সঙ্গে এইবার রাজর্ষিকন্যার মিলন সম্পূর্ণ হল।

আমরা বৃহদ্দেবতার এই উপাখ্যানের অবতারণা করলাম শুধু ওই শেষ পংক্তিটির জন্য—ঋষেঃ পুত্রঃ স্বয়মৃঋষিঃ। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করেছেন অথচ সে মন্ত্র প্রায় বিফল হয়ে গেল দেবযানীর অভিশাপে। কচ অভিশাপ দিলেন—কোনও ঋষিপুত্র তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না। কী নির্মম এই অভিশাপ, অথবা এই অভিশাপের সামাজিক তাৎপর্য কত গভীর, তা খানিকটা বোঝা গেল বৃহদ্দেবতার উপাখ্যানে এবং এই উপাখ্যানেরই উত্তরাধিকার নেমে এসেছে মহাভারতের সমাজে। দেবযানী পরমর্ষি শুক্রাচার্যের কন্যা হয়েও কোনও ঋষিপুত্র বা স্বয়ং কোনও ঋষির পত্নী হবেন না—এই অভিশাপ দেবযানীকে যে কতটা উতলা করে তুলেছে, কতটা বেপরোয়া করে তুলেছে, তা বুঝতে হবে দেবযানীর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি দেখে।

অসুরগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে অসুররাজ বৃষপর্বার সম্পর্কের অবনতি ঘটল আকস্মিকভাবে এবং তা ঘটল দেবযানীর কারণেই। কেন জানি না, মহাভারতের কবি এই ঘটনার মধ্যেও দেবতাদের ক্রূর অভিসন্ধি লক্ষ্য করেছেন। মহাভারত বলেছে—বৃহস্পতির পুত্র কচ দেবলোকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা নিয়ে গেলেন এবং তা শেখাতেও লাগলেন দেবতাদের। মন্ত্রলাভ করে দেবতারা ভাবলেন—দানবদের এবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এই ভাবনা রূপায়ণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র নিজে উদ্যোগী হলেন। তিনি ছদ্মবেশে তাঁর শত্রুপুরী বৃষপর্বার রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন। মহাভারতের কবি বলেছেন—ইন্দ্র হাওয়ার মতো অদৃশ্য হয়েছিলেন—বায়ুভূতঃ। কিন্তু আমাদের ধারণা, এই 'বায়ুভূত' শব্দটার মধ্যেই আসল সত্যটা লুকিয়ে আছে। কথাটা খুলে বলি।

AMARBOI.COM

অসুর-দানবদের ওপর আক্রমণ হানার আগে ইন্দ্র নাকি বৃষপর্বার গৃহসংলগ্ন বিশাল রাজোদ্যানের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন—রাজার ক্রীড়া-সরোবরে অনেক রমণী জলক্রীড়া করছে। ইন্দ্র তখন বায়ুভূত হয়ে সরোবরের তীরে রাখা রমণীদের পরিত্যক্ত বসনগুলি এলোমেলো করে মিশিয়ে দিলেন—বায়ুভূতঃ স বস্ত্রাণি সর্বাণ্যেব ব্যমিশ্রয়ৎ।

এর পরে যে ঘটনা ঘটবে, হয়তো তাতেই দেবকার্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বৃহস্পতি-পুত্র কচের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করা এবং দানবদের ওপর আঘাত হানা—এই দুয়ের সঙ্গে বায়ুভূত ইন্দ্রের উপরি উক্ত ক্রিয়ার কোনও সম্পর্কই নেই। এমন কী ঘটনা যা ঘটবে, তার সঙ্গেও সঞ্জীবনী মন্ত্র এবং দেবতাদের যুদ্ধোদ্যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে একমাত্র ঘটনা হল, রমণীদের বসনগুলি এলোমেলো হয়ে মিশে যাওয়া। কিন্তু তার জন্য সাধারণভাবে শুধু হাওয়াই যথেষ্ট, দেবরাজ ইন্দ্রের 'সুরদ্বিপাস্ফালন-কর্কশাঙ্গুলি'র কোনও ভূমিকাই এখানে নেই। বস্তুত এলোমেলো হাওয়ায় যে বিষম বিপত্তি ঘটল, তাতেই দেবকার্য সিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাভারতের পৌরাণিক এখানে দেবরাজ ইন্দ্রের কারসাজি দেখতে পেয়েছেন। আসল ঘটনা কিন্তু সেই দেবযানীকে নিয়ে। কচের কাছে প্রত্যাখ্যাত দেবযানীকে

নিয়ে। কচ যেহেতু স্বর্গে গিয়ে বিদ্যা বিতরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন, অতএব নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে ইন্দ্রের বায়ুভূত অভিসন্ধির কথাটা এসেছে। মূল ঘটনা কিন্তু একেবারেই আলাদা।

প্রকৃত যা ঘটেছিল, তা হল—রাজধানীর বিশাল উদ্যানের মধ্যে মেয়েদের স্নান করবার জায়গা, ক্রীড়া-সরোবর। পৌরাণিকদের কথাবার্তা থেকে যা বুঝি, তাতে মনে হয়—সেকালের দিনের যুবতী মেয়েরা অন্তঃপুরের সুরক্ষিত ক্রীড়া-সরোবরে স্নান করতে নামার সময় অঙ্গের মূল বসন পরিত্যাগ করেই জলে নামতেন। হয়তো বা কখনও কোনও স্নানবাসও ব্যবহার করতেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বস্ত্রহরণ লীলাতেও এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং এ বিশ্বাস নেমে এসেছে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন/ নামিলা স্নানের তরে...
তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে এক প্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত...
লুটায় মেখলাখানি মৌন অপমানে;

সেদিন কতগুলি যুবতী রমণী এইভাবেই উদ্যানবাটিকার ক্রীড়া-সরোবরে স্নান করতে নেমেছিল। ক্রীড়ারসের মত্ততায় কেউ অন্যের গায়ে জল ছেটাচ্ছিল, কেউ সাঁতার কাটছিল, কেউ হাবুডুবু খাচ্ছিল, আবার কেউ বা রঙ্গ-রসে নানা কথা বলছিল। স্নানরতা এই রমণীকুলের মধ্যে শুক্রদুহিতা দেবযানী যেমন আছেন, তেমনই আছেন দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা। দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার বয়স একই রকম। উভয়েই অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু দুজনের স্বভাবে কিছু পার্থক্য আছে। জলক্রীড়া করার সময়, একই জলভাগের অন্তরে দাঁড়িয়ে স্নান করবার সময় সমবয়সী এই দুই রমণীর মধ্যে কোনই বিসম্বাদ চোখে পড়েনি।

জলের শীতলতা, রঙ্গ-কৌতুকের মত্ততা এবং রমণীকুলের যৌবনের সরসতার সঙ্গে আরও যেটা ছিল, সেটা হল উতলা আকুল বাতাস। বাতাসের কাজ বাতাস করেছে। পুষ্করিণীর তীরে রাখা রমণীদের পরিত্যক্ত বসনগুলি বাতাসে এলোমেলো হয়ে একাকার হয়ে গেছে। স্নানকেলি সাঙ্গ হবার পর এত রমণী একই সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে উঠে এল আপন আপন বস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য। উদার আলোকরাশির মধ্যে পরস্পর বিলোকনে তারা লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে, অপিচ পরস্পর কথা-কুতূহলে অন্যমনস্ক থাকায় অসুররাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা বেখেয়ালে অসুরগুরুর মেয়ে দেবযানীর কাপড়খানি পরে ফেললেন।

দেবযানী সিক্তদেহে পুষ্করিণী থেকে উঠে এসে নিজের কাপড় খুঁজে পেলেন না এবং কোনওভাবে লজ্জামুক্ত হবার পর তিনি দেখতে পেলেন—শর্মিষ্ঠার গায়ে জড়ানো আছে তাঁরই পূর্বপরিহিত বসনখানি। দেবযানীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। এমনিতেই অসুরগুরুর মেয়ে হওয়ার দরুন তিনি কিছু স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকেন, তার মধ্যে কচের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকে তাঁর মেজাজটা একেবারেই ভাল থাকে না। শর্মিষ্ঠার পরিধানে নিজের বসনখানি দেখে দেবযানী ঝাঁকাড় দিয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁলা অসুরের ঝি! তোর ভাল হবে না মোটেই। কোনও আচার নেই, বিচার নেই, ভাল-মন্দবোধ নেই। তুই আমার শিষ্যের মতো। তুই মাগী অসুরের মেয়ে হয়ে আমার কাপড়টা পরলি কোন বুদ্ধিতে শুনি—কস্মাদ্ গৃহ্ণাসি মে বস্ত্রং শিষ্যা ভূত্বা মমাসুরি।

এত সমবয়সী মেয়ের সামনে রাজার মেয়ে হিসেবে এই অপমান মেনে নিতে পারলেন না

শর্মিষ্ঠা। এতক্ষণ জলের মধ্যে যার কোনও স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল না, সে জল থেকে উঠেই তার সমবয়সী সখীকে 'শিষ্যা' বলে অপমান করবে—এই বক্তৃতামুখি চণ্ড কোন রাজার মেয়ের সহ্য হয়। অন্তত অনুচরীদের সামনে সম্মান বাঁচানোর জন্যই শর্মিষ্ঠা একেবারে দেবযানীর পিতার নাম তুলে বললেন—বেশি গুরুগিরি দেখাস্ না বামনী। তোর বাপ নত হয়ে বসে থাকে আমার বাবার সিংহাসনের নীচে—নীচৈঃ স্থিতা বিনীতবৎ। শুতে বসতে তোর বাবা আমার বাবার খিদমদগারি করে—আসীনশ্চ শয়ানশ্চ পিতা তে পিতরং মম। স্তৌতি বন্দীব চাভীক্ষ্ণং...। শর্মিষ্ঠা আরও কেটে কেটে বললেন—তুই হলি সেই বাপের মেয়ে, যে বাপ দিনরাত চাটুকারিতা করে, ভিক্ষে চায়, আর দান নেয়—যাচতস্ত্বং হি দুহিতা স্তুবতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ। আর আমি হলাম সেই বাপের মেয়ে, যে বাপ স্তুতি করে না, স্তুতি শোনে; যে দান নেয় না, দান করে—সুতাহং স্তূয়মানস্য দদতো প্রতিগৃহ্নতঃ।

কথাটা সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। অথবা সত্যও বটে মিথ্যাও বটে। অসুরগুরু শুক্রাচার্য অসুররাজ বৃষপর্বার তত্ত্বাবধানেই থাকেন। তাঁর ভরণ-পোষণের ভার বৃষপর্বার ওপরেই। তিনি অযাচক-বৃত্তি হলেও রাজার অর্থ সম্পত্তি তাঁকে ব্যবহার করতেই হয়। শুক্রাচার্য সোজাসুজি বৃষপর্বার স্তুতি না করলেও দেশের রাজা হিসেবে বৃষপর্বার তদারকি তাঁকে খানিকটা মেনে নিতেই হয়। সমস্ত কিছুর মধ্যে শুক্রাচার্যের অসীম স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও বৃষপর্বার রাজ্যশাসনের নিয়ম-কানুন তাঁকে মেনে চলতেই হয়। বৃষপর্বা শুক্রাচার্যকে যত সম্মানই করুন, তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা এই ব্রাহ্মণ-গুরুকে যেহেতু রাজোপজীবী এক পুরোহিতমাত্র বলেই জানেন, তাই শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানীর কর্তৃত্ব তিনি স্বেচ্ছায় মেনে নিতে পারেননি। দেবযানীর প্রতি তাঁর ব্যবহার রাজকীয় মর্যাদা অতিক্রম করে একান্ত স্ত্রীসুলভ লঘুতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শেষ করার আগে শর্মিষ্ঠা রীতিমতো গালাগালি দিয়ে বললেন—ভিখারী মাগী! তুই কপাল কুটেই মর, অথবা মাটিতে গড়াগড়ি দে, তুই আমার অপকারের চেষ্টাই কর অথবা চিরকাল রাগ দেখিয়ে ঘুরে বেড়া—আদুষ্য বিদুষ্য দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাচকি—তুই আমার কিছুই করতে পারলি না। তুই বামনী ভিখারী, তোর হাতে অস্ত্রও নেই কোনও। আর আমি হলাম গিয়ে রাজকন্যা এবং তাও সশস্ত্রা। তুই জেনে রাখ, অন্তত আমি তোকে একটুও গ্রাহ্য করি না—ন হি ত্বাং গণয়াম্যহম্।

অসুরশক্তির কাছে যুক্তি-তর্কের শক্তি খাটে না। দেবযানী নিজের মান্যতা বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি-তর্ক দেখিয়ে বিফল হলেন। শেষে অসুরকন্যা শর্মিষ্ঠার অঙ্গে জড়ানো আপন বসনখানি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন দেবযানী। শর্মিষ্ঠার কোপ গাঢ়তর হল। উদ্যানবাটিকার মধ্যে একটি মজা কুয়ো ছিল। কাপড় ধরে টানাটানি করতেই শর্মিষ্ঠা রাগের চোটে এমনই ধাক্কা দিলেন দেবযানীকে যে, তিনি সেই কুয়োর মধ্যে গিয়ে পড়লেন। শর্মিষ্ঠা বুঝেশুনেই দেবযানীকে ধাক্কা দিয়েছেন এবং সেটা এতটাই ইচ্ছাকৃত এবং সুপরিকল্পিত যে, তিনি জানতেন—দেবযানী কুয়োয় পড়ে মারা যাবেন।

কুয়ো এতটাই গভীর যে সেখান থেকে একা একা উঠবার কোনও উপায় নেই। অসুরবাড়ির রাজকন্যা যাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে মারতে চেয়েছেন, তাঁকে অন্য কেউ, অন্তত ওই চত্বরের কেউ দয়া দেখিয়ে ওপরে তুলবে না। শর্মিষ্ঠা একবারের তরেও কুয়োয়-পড়া দেবযানীর দিকে ফিরেও তাকালেন না—অনবেক্ষ্য যযৌ বেশ্ম। তিনি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন যে, দেবযানী মারা গেছে—হতেয়মিতি বিজ্ঞায় শর্মিষ্ঠা পাপনিশ্চয়া।

AMARBOI.COM

চৌত্রিশ

আগেই বলেছিলাম—মহারাজ নহুষের অনেক পুত্র থাকা সত্ত্বেও যে দুটি পুত্রের সুবাদে তাঁকে যথার্থ পুত্রবান বলা যায়, সেই দুই পুত্র হলেন, যতি এবং যযাতি। যতি জ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি মুনিব্রত গ্রহণ করে বনবাসী হলেন আর পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন যযাতি।

একটি বিশাল রাজ্যের রাজা হওয়ার জন্য যা যা গুণ থাকা দরকার, যযাতির তা ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং সত্যনিষ্ঠ—যযাতি র্নাহুষশ্চাসীৎ রাজা সত্যপরাক্রমঃ। মনে রাখা দরকার—ধর্ম বলতে যাঁরা ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য এবং পুরোহিত বোঝেন, সেই অর্থে যযাতিকে ধার্মিক বলা ঠিক হবে না। ধর্ম শব্দটা এখানে খুব বিশদর্থে প্রযোজ্য। বিশেষত সেকালের মনু-কথিত রাজধর্মের নিরিখে ধার্মিক রাজা বলতে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, যথোপযুক্ত দণ্ডদাতা এবং এক প্রজাপালক রাজাকেই নির্দিষ্ট করা যায়। সেকালে যে কোনও রাজার পক্ষে বহুবিধ যাগ-যজ্ঞ করাটা ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ। আধুনিকেরা এগুলিকে একধরনের রাজোচিত বিলাস বলেই মনে করেন। তবে যাগ-যজ্ঞের ব্যাপারটা আদতেই তা নয়।

রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক হিসাবে রাজা ছিলেন চরম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যাগ-যজ্ঞের সময় একদিকে যেমন রাজাকে নিজের অভিমানমঞ্চ থেকে নেমে এসে ব্রাহ্মণের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিতে হত, তেমনই অন্যদিকে এই বিশেষ সময়গুলিতে তাঁর পক্ষে দার্শনিকভাবে কিছু উন্নত হওয়ারও সুযোগ আসত অথবা সুযোগ ঘটত নিজেকে চেনার। যজ্ঞস্থলীর অগ্নিকুণ্ডে ক্রমাগত আহুতি দেওয়ার বহিরঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু আড়ম্বর আছে, কিন্তু যজ্ঞকার্যের অন্তরঙ্গে যজ্ঞাধিষ্ঠিত দেবতা পুরুষের সঙ্গে একাত্মতাবোধের ভাবনা থাকায় রাজা যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে নিজেকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করতেন। বৈদিকেরা বলেছেন—দেবতারা যে সত্যি সত্যি

দেবতা হয়েছেন, তা এই যাগযজ্ঞ করেই হয়েছেন—তেনোপাবৃত্তেন দেবা অযজন্ত, তেনেষ্ট্বা, এতদভবন্ যদিদং দেবাঃ। অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ করে যজমান ভাবে, ভাবনায়, মানসিক সিদ্ধিতে নিজেকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করতেন—যা বৈদিকাশ্চ অশরীরা আহুতয়ঃ অমৃতত্বমেব তাভির্যজমানো জয়তি।

যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতার সঙ্গে রাজাদের এই একাত্মতার প্রয়াস যদি সত্যি হয়, তাহলে রাজার অভিষেকের সময় 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগটিই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হবে। রাজসিংহাসনে উপবেশন করার আগে নানা যাগ-যজ্ঞের মধ্য দিয়ে রাজার অভিষেক সম্পন্ন করা হত। পাঁচ দিনের অভিষেক মহোৎসবের প্রথম দিনের যজ্ঞে অন্তত আটজন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হত। রাজার সত্যনিষ্ঠার জন্য সবিতার উদ্দেশে, গার্হস্থ্য জীবনের জন্য অগ্নির উদ্দেশে—এই রকম আরও দেবতা আছেন—তাঁরা কেউ 'সত্যপ্রসব', কেউ 'গৃহপতি' কেউ বা বনস্পতি। কিন্তু সবার শেষে যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয় সেই বরুণ দেবতা কিন্তু 'ধর্মপতি'। এই ধর্ম শব্দের অর্থ ন্যায়; এই ধর্ম হল রাজদণ্ডের সুষ্ঠু প্রয়োগ। কারণ, বৈদিক দেবতার রাজ্যে বরুণই হলেন ন্যায়দণ্ডের অধিকর্তা। বরুণ তাই ধর্মপতি—বরুণো ধর্মপতীনাম্। যজ্ঞাহুতির একাত্মতায় রাজাকেও তাই 'ধর্মপতি' হবার চেষ্টা করতে হয়, যে ধর্মের 'পতি' হয়ে রাজা আইনের শাসন সঠিকভাবে চালু করার চেষ্টা করবেন। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় The Hindu theory regards Dharma or law, as the real sovereign, and the king as Danda or executive to support and enforce Dharma.

নহুষ যযাতিকে যদি ধার্মিক বলতে হয়, তবে এই অর্থে তাঁকে ধার্মিক বলতে হবে। নানা যাগ-যজ্ঞ করা অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক দেবকার্য বা পিতৃকার্য সম্পন্ন করা—এইসব অর্থে যযাতি যত বড় ধার্মিক, তার থেকেও বেশি ধার্মিক তিনি রাজদণ্ডের পরিচালনায়। তাঁকে পরাজিত করেন এমন রাজা সেকালে ছিলেন না। যাঁরা তাঁর প্রতিকূল ছিলেন, তাঁদের তিনি আপন শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন নিজে অপরাজিত থেকে। পররাষ্ট্রনীতির এই মাহাত্ম্য প্রভাব ফেলেছিল তাঁর অন্তঃরাষ্ট্রীয় শাসনে। যযাতির ব্যক্তিত্ব এবং ভালবাসায় সমস্ত প্রজা তাঁর বশবর্তী হয়েছিল এবং সেই বশবর্তিতার নিরিখেই বলা যাবে যযাতি ধার্মিক রাজা, তিনি ধর্মানুসারে বহুকাল প্রজা-পালন করেছিলেন—স শাশ্বতীঃ সমাঃ রাজা প্রজা ধর্মেন পালয়ন্।

যাঁরা ভাবেন—সেকালের রাজাদের জীবন খুব আয়েসে কাটত, তা সর্বার্থে ঠিক নয়। যিনি আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা তাঁর জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটত না। বরঞ্চ মন্দাক্রান্তা ছন্দের চেয়ে ত্বরিতগতি অথবা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের উপযোগই সেখানে বেশি। সকালে উঠে বন্দির বন্দনাগানের আয়েসটুকু মিটতে না মিটতেই বিদ্বান-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের সম্ভাষণ-সংকার দিয়ে রাজার দিন শুরু হত। তারপর সারাদিনই কাটত নানা ব্যস্ততার মধ্যে। দিনের পর দিন রাজকর্মের ব্যস্ততা রাজাদের এক সময় ক্লান্ত করে তুলত। আরও যেটা বড় সমস্যা— রাজাদের নানারকম কর্ম-মন্ত্রণা এবং মানসিক ব্যস্ততার মধ্যে শারীরিক কায়ক্লেশ যেহেতু খুব কমই ঘটত, তাই শরীরে অস্বস্তিকরভাবে মেদের উপচয় ঘটত।

জীবনের ক্লান্তি এবং শারীরিক অস্বস্তি—এই দুটোই কাটানোর একমাত্র উপায় ছিল শিকারে চলে যাওয়া। বলা বাহুল্য, রাজাদের এই মৃগয়াপর্ব একদিনের মধ্যে সমাধা হত না। মৃগয়া মানেই দেড়/দুমাস বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, বাঘ-সিংহ, বন্য বরাহ এবং হরিণের পেছন

AMARBOI.COM

পেছন ছোটা। খাওয়া-দাওয়ার সময়-অসময় নেই, নিদ্রার জন্য হস্তিপৃষ্ঠ এবং বৃক্ষশাখার সুব্যবস্থা। এতে শরীর ঝরে যেত দু'চার দিনেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মৃগয়াকে রাজাদের 'ব্যসন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এই ব্যাপারটি কখনও কখনও রাজাদের মনে নেশার মতো চেপে বসত। এতে যেমন রাজকার্য নষ্ট হত, তেমনই ঘটত বৃথা প্রাণিহত্যা। রাজনীতির নীতিনির্ধারকেরা তাই রাজাদের মৃগয়া একদমই পছন্দ করেননি।

কিন্তু নীতি-নিয়মের বাঁধন-দণ্ডের মধ্যে আকাশের মুক্তি ছড়িয়ে দেবার মতো মানুষ ছিলেন আমাদের কবিরা। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের অন্যতম অধস্তন পুরুষ মহারাজ দুষ্মন্ত যখন মৃগয়ায় যাবেন, তখন মহাকবি কালিদাস নীতিবাগীশদের মৃগয়া সম্বন্ধী প্রবচনগুলি মাথায় রেখে সেনাপতির মুখ দিয়ে গুণ গাইলেন মৃগয়ার। রাজার বিদূষক মাধব্য দিনরাত রাজবাড়ির আরামে থেকে থেকে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, সে বিরলে বসে রাজাকে গালাগালি দিচ্ছিল। বলছিল। কী পাল্লাতেই না পড়েছি। এ শিকারী রাজার বন্ধু হয়ে আমার কী ঝামেলাই না হয়েছে।

তার ঝামেলাটা কী আমরা জানি। রাজবাড়ির রাজভোগ বন্ধ হয়ে গেছে। বন্য হরিণ শুয়োরের মাংস পুড়িয়ে খেতে হচ্ছে। গাছের পাতা-পড়া এঁদো পুকুরের তিক্ত-কষায় জল পান করতে হচ্ছে। গ্রীষ্মের রোদ্দুরে ঘুমিয়ে পড়ার মতো সুনিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া পর্যন্ত নেই। দুষ্মন্তের সেনাপতি কিন্তু প্রাণোচ্ছল ব্যক্তি। রাজার সঙ্গে বনেবাদাড়ে ঘুরতে তার বেশ লাগছে। রাজাকে দেখেই সে বলে ওঠে—আহা। কী চেহারা হয়েছে মহারাজের, যেন পাহাড়ি হাতি। অনবরত ধনুকের গুণ টানতে টানতে শরীরের ওপর দিকটা একেবারে পেটা লোহা হয়ে গেছে। রোদে গরমে কোনও কষ্টই হচ্ছে না রাজার। সেনাপতি রাজার বিদূষককে দুয়ো দিয়ে বলে ওঠে—মেদ ঝরে যাওয়ায় মহারাজের শরীরটা কেমন রোগা হয়ে গেছে দেখেছেন, একেবারে ঝরঝরে, যেন এই ডাকলে এই উঠেন, কোনও আলস্য নেই—মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ। দুষ্মন্তের শরীর এবং মনে অসাধারণ উৎসাহ লক্ষ্য করে সেনাপতি শেষ সিদ্ধান্ত দেয়—মৃগয়ার মধ্যে শত শত দোষ খুঁজে শুধুশুধুই লোকে একে 'ব্যসন' বলে গালি দেয়, সত্যি সত্যি মৃগয়ার মতো এমন আনন্দ আর আছে নাকি—মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ।

আমরা মৃগয়ার কথাটা তুললাম এই জন্য যে, চন্দ্রবংশের কৃতী পুরুষ যতির ভাই যযাতি বহুদিন ধর্মানুসারে রাজত্ব করে পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় বেরলেন। সেকালের দিনে মৃগয়ায় বেরলে অসুবিধে যেমন অনেক ছিল, তেমনই সুবিধেও ছিল কিছু কিছু। মৃগয়ার জন্য দিন-রাত বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে যখন চরম ক্লান্তি আসত, তখন রাজাদের একমাত্র ভরসা ছিল ঋষিদের আশ্রম। ঋষি-মুনিরা লোকালয়ের বাইরে নির্জন অরণ্যভূমিতে পর্ণকুটির বেঁধে থাকতেন, ঋষিমুনিদের সঙ্গে দেখা করা এবং সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় এই ছিল সুযোগ। মুনি গৃহস্থ হলে ঋষিকন্যাও খুব দুর্লভা ছিল না। দুষ্মন্ত হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতেই কণ্বাশ্রমবাসিনী শকুন্তলার দেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বহু পূর্বপুরুষ যযাতির কাছে ব্যাপারটা এত সহজ হয়নি। সারাদিন মৃগ-বরাহের অনুবর্তী হয়ে তিনি অসম্ভব তৃষ্ণার্ত হয়ে বৃষপর্বার সেই বিশাল উদ্যানবাটিকায় প্রবেশ করলেন। তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। সামনেই বিশাল বাঁধানো ঘাট। উত্তাল সমীরণে পুষ্করিণীর জলে ঢেউ উঠছে, যেন তাঁকে হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে জলপানের জন্য।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটি ছেড়ে দিলেন তৃণভোজনের জন্য। হরিণের পিছনে ছুটে ছুটে ঘোড়াটি পরিশ্রান্ত, রাজা যযাতি পিপাসার্ত—শ্রান্তযুগ্যঃ শ্রান্তহয়ো মৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ। ধনুক-বাণ-উষ্ণীষ রেখে রাজা যযাতি জল খেতে নামবেন, এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এল রমণীকণ্ঠে ক্রন্দনের রোল। ক্রন্দনধ্বনি খুব পরিষ্কার নয়, কেমন যেন গুমরনো, কোনও এক বদ্ধ জায়গা থেকে যেন এ ক্রন্দন ভেসে আসছে। যযাতি ধনুক-বাণ-তরবারি পুনরায় হাতে নিলেন। মাথায় রাজোচিত উষ্ণীষটিও পরিধান করে নিতে ভুললেন না। ক্রন্দনের স্বর লক্ষ্য করে এগোতে এগোতে রাজা বুঝলেন দূরে কোথাও নয়, কাছেই আছে এই ক্রন্দনের উৎস। একটু এগোতেই তাঁর ভারি আশ্চর্য লাগল। একটি পরিত্যক্ত মজা কুয়োর মধ্যে একটি রমণী আর্ত চিৎকার করছে বাঁচার আশায়। রমণী অতিশয় সুন্দরী। তাঁর রূপ আগুনের শিখার মতো, যেন ঠিকরে বেরচ্ছে—দদর্শ রাজা তাং তত্র কন্যামগ্নিশিখামিব। পরিত্যক্ত মজা কুয়োর কথা পাঠকের স্মরণ আছে নিশ্চয়। সেই যেখানে বস্ত্রহরণের বিবাদে দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন।

ক্ষণিকের জন্য মহারাজ যযাতি হতচকিত বোধ করলেন। মহাভারতের কবি একটিমাত্র উপমার অঙ্গুলিসংকেতে যযাতির মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণ অবস্থায় একটি রমণীকে কুয়োয় পড়ে থাকতে দেখলে একটি পুরুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হত তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে আনা। কিন্তু কবি বলেছেন—রমণী যেন আগুনের শিখার মতো—অগ্নিশিখামিব। আগুনে হাত দিতে যেমন মানুষের ভয় লাগে, তেমনই দেবযানীর চেহারার মধ্যে এমন এক আগুনপানা ব্যক্তিত্ব ছিল, এমন অহংকার ছিল, এমন এক দূরত্ব ছিল যেন তাঁকে দেখামাত্রই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলা যায় না—উঠে এস। তাঁকে বিপদ থেকে ত্রাণ করার আগে ত্রাণকর্তাকেই যেন নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। তাঁকে স্পর্শ করার আগে মহারাজ যযাতির ভাষায় মধুর সান্ত্বনার স্বর যুক্ত হল—সাম্না পরমবল্গুনা। যযাতি আগে তাঁর পরিচয় জানতে চান, আগুনে হাত দেওয়ার আগে তার দাহিকাশক্তি অথবা উষ্ণতার পরিমাপ করে নিতে চান যেন।

যযাতি বললেন—কে তুমি কন্যে—কা ত্বং তাম্রনখী শ্যামা সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলা। সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে 'শ্যামা' শব্দটি লক্ষণীয়। কালিদাসের মেঘদূত-এ মন্দাক্রান্তায় উচ্চারিত 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা'র ঝংকারে যাঁরা যক্ষপ্রিয়াকে কালো মেয়ে ভাবেন, তাঁরা অবশ্যই ভ্রান্ত। শ্যামা মেয়ে মানে, যে মেয়ের গায়ের রঙ গলিত সুবর্ণের মতো। এর ওপরে আছে মহামতি নীলকণ্ঠের টিপ্পনি—শ্যামা ষোড়শবার্ষিকী যৌবনারূঢ়া। অর্থাৎ যযাতি যখন দেবযানীকে সম্বোধন করে বলেন—কে তুমি গো শ্যামা মেয়ে, তখন তাঁর একটি শব্দোচ্চারণের মধ্যেই যেন দেবযানীর সোনা-গলা গায়ের রং, আর তার ষোলো বছরের যৌবনটুকু ইঙ্গিতে বোঝানো আছে। অর্থাৎ আমার চোখ এড়ায়নি সুন্দরী, আমার খেয়াল আছে। যযাতি জিজ্ঞাসা করেন—কে তুমি কন্যে? এমন তপ্ত-সোনার মতো গায়ের রং তোমার, ওপরে উঠবার জন্য যে আঙুলগুলি তুমি বাড়িয়ে দিয়েছ, কেমন ঘষা তামার মতো লাল সেই আঙুলগুলি, কানে হিরে-পান্নার মাজা দুল—কিন্তু এসব তো সৌভাগ্যের লক্ষণ, সুন্দরী। এত সৌভাগ্য সত্ত্বেও তুমি বিপদাতুর মানুষের মতো কাঁদছ কেন—কস্মাচ্ছোচসি চাতুরা।

মহারাজ যযাতি আশ্চর্য হলেন। পরিষ্কার বুঝলেন, রমণী দূরে কোথাও থাকে না। ওই মাঠ, নদী, জঙ্গল, পুষ্করিণী—কোনওটাই যে এই রমণীর খুব অপরিচিত, তা মনে হচ্ছে না। যযাতি

AMARBOI.COM

তাই অবাক হয়ে বললেন—এমন তো নয় যে, এই তৃণ-গুল্ম আচ্ছাদিত পরিত্যক্ত এই কুয়োটির কথা তুমি জানতে না, তবু তুমি কী করে এর মধ্যে পড়ে গেলে—কথঞ্চ পতিতাস্যস্মিন্ কূপে বীরুত্তৃণাবৃতে? তার ওপরেও জরুরি কথাটা হল—তুমি কার মেয়ে? তোমার পরিচয় কী?

কুয়োর মধ্যে পড়ে থেকেও রমণী সগর্বে উত্তর দিল—যিনি সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে দেবতাদের দ্বারা নিহত অসুরদেরও বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, আমি সেই অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। আমি যে এখনও এই নোংরা মজা কুয়োর মধ্যে পড়ে আছি, তার কারণ আমার এই আকস্মিক বিপন্নতার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছয়নি—তস্য শুক্রস্য কন্যাহং স মাং নূনং ন বুধ্যতে। দেবযানী বুদ্ধিমতী এবং বিদগ্ধা। তিনি রাজাকে সেইটুকুমাত্র পরিচয় জানিয়েছেন, যেটুকু না জানালে নয়। এক অপরিচিতা সুন্দরীকে হাত ধরে টেনে তোলার আগে মহারাজ যযাতি সংকুচিত ছিলেন, অতএব আত্মপরিচয় দিয়ে দেবযানী রাজার সংকোচ অপনোদন করলেন মাত্র। কিন্তু কেন, কোথায়, কী হয়েছিল, কেনইবা তিনি কুয়োয় পড়ে গেলেন—এসব কথা তিনি কিছুই বললেন না, অনেক কথা বলে তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব লঘু করে দিলেন না যযাতির কাছে। বরঞ্চ কুয়ো থেকে তাড়াতাড়ি উঠে আসার জন্য তিনি তাঁর নিজের রক্তলাল অঙ্গুলিগুলির কথা পুনরুল্লেখ করলেন, কেন না রাজা যযাতি একটু আগেই তাঁর অঙ্গুলিগুলির প্রশংসা করেছেন।

দেবযানী বললেন—মহারাজ! এই আমার সেই দক্ষিণ হাতখানি, সেই তাম্ররক্ত অঙ্গুলি-পঞ্চক—এষ মে দক্ষিণো রাজন্ পাণিস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ। আপনি এই হাতখানি ধরেই তুলে নিন আমাকে। দেবযানী নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যই রাজাকে মর্যাদা দিয়ে বললেন—নিশ্চয় মহান কোনও কুলেই আপনার জন্ম। আপনাকে দেখে শান্ত, বলবান এবং মনস্বী পুরুষ বলেই মনে হচ্ছে, আর ঠিক সেই কারণেই আমার হাত ধরে ওপরে তুলে নিয়ে যাবার জন্য আপনাকেই আমি যোগ্য লোক বলে মনে করছি—তস্মান্মাং পতিতামস্মাৎ কূপাদুদ্ধর্তুমর্হসি।

দেবযানী যে অবস্থায় পড়েছিলেন, তাতে যে কোনও লোকের হাত ধরেই তিনি ওপরে উঠে আসতেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তিনি এতটাই সচেতন যে, রাজাকে দেখামাত্র তিনি নিজের অধীরতা প্রকাশ করেননি। কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসার আকুলতা দেখিয়ে নিজেকে তিনি কোনও প্রার্থিনী প্রগলভা রমণীতে পরিণত করেননি। বিপন্মুক্তির জন্য তাঁর কোনও অধীরতা বা আকুলতা ছিল না, তা মোটেই নয়। ছিল, কিন্তু বিদগ্ধা দেবযানী সে ব্যাকুলতা চেপে রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যযাতির সমমর্যাদায়। বলেছেন—তুমি শান্ত, বীর্যবান এবং মনস্বী বলেই আমাকে উদ্ধার করার উপযুক্ত মনে করি তোমাকে।

মহারাজ যযাতি বুঝলেন—রমণী ব্রাহ্মণকন্যা। অতএব যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করে তাঁর দক্ষিণ হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন দেবযানীকে তুলে আনার জন্য। মানবদেহের দুটি হাতই যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হলেও ডান হাতটিই মর্যাদা এবং সভ্যতার প্রতীক। যযাতি তাই নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর দক্ষিণ হস্তখানি ধারণ করলেন—সেই হস্তখানি, যার আতাম্র আভায় যযাতির ধনুর্ধারণ কর্কশ হস্তখানি যেন রঞ্জিত হল। দেবযানীকে তিনি কূপগর্ত থেকে উদ্ধার করে আনলেন—গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণাবুজ্জহার ততো'বটাৎ। কূপ থেকে দেবযানীকে তুলে আনবার পর মহারাজ আর এক মুহূর্তের জন্যও দেরি করেননি। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যযাতি নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

মহাভারতের কবি কিচ্ছুটি বললেন না। অথচ খটকা একটা রয়েই গেল। যে রাজা মৃগয়ায়

AMARBOI.COM

মত্ত হয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন, তৃষ্ণার্ত হয়ে উদ্যানবাটিকায় প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর শিকার বন্ধ হয়ে গেল, জল খাওয়া মাথায় উঠল। তিনি এক মুহূর্তের জন্য দেবযানীকে দেখলেন, আর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এ কেমন কথা হল? মহাভারতের কবি যযাতির বিদায়-যাত্রা বর্ণনা করেছেন একটি মাত্র পংক্তিতে এবং সেটি বড়ই অর্থবহ। বঙ্কিমি কায়দায় বলতে গেলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়—নির্জন জনপদে বিশাল উদ্যানবাটিকার মধ্যে সমীরণ যখন বড়ই ব্যাকুল, পাঠক! আপনি তখন তৃণাবৃত কূপের মধ্য হইতে এক সুন্দরী রমণীকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রমণীদেহের লঘুতা শাস্ত্রেকাব্যে যতই প্রশংসিত হউক, রমণীর কিশলয়পল্লববৎ কোমল অঙ্গুলিমাত্র, ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ রমণীর শরীর কূপের নিম্নতা হইতে সমভূমির উচ্চতায় তুলিয়া আনা কেবল দেবতার অলৌকিক স্পর্শেই সম্ভবে, মনুষ্যদেহে নহে।

মহাভারতের কবিকে তাই বলতে হল—যযাতি বলপূর্বক তাঁকে কুয়োর মধ্যে থেকে তুলে এনেই—উদ্ধৃত্য তরসা চৈনাম্—সুনিতম্বা দেবযানীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন—আমন্ত্রয়িত্বা সুশ্রোনীং যযাতিঃ স্বপুরং যযৌ। বলপূর্বক কূপ হইতে উদ্ধার করিতে গেলে রমণী শরীর কী পরিমাণে স্পর্শ করিতে হইবে, কতটুকুই বা বলপ্রয়োগ করিতে হইবে, পাঠক আন্দাজ করিতে পারেন। কিন্তু বিশাল বুদ্ধি ব্যাসের শব্দভাণ্ডারে দেবযানীর বিশেষণ হিসেবে আর কি কোনও শব্দ সুপ্রযুক্ত হতে পারত না। সুশ্রোণী দেবযানীর কাছে বিদায় নিলেন যযাতি। ভাবে বুঝি—যযাতির দাঁড়াবার কোনও উপায় ছিল না। অপরিচিতা রমণীকে যে শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে তাঁকে তুলে আনতে হয়েছে, তাতে যযাতির আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রম্ভালাপ করার মুখ ছিল না। তিনি মুহূর্তের মধ্যে বিদায় নিলেন, কিন্তু যাঁর কাছে তিনি বিদায় নিলেন, তিনি ধীরা, স্নিগ্ধা, লজ্জিতা দেবযানী নন, তিনি সুনিতম্বা দেবযানী। যযাতির বিদায় মুহূর্তে রমণীশরীরের এই একটি মাত্র প্রত্যঙ্গ সন্ধির উল্লেখ করে মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দিলেন—যযাতি মরিয়াছেন, তিনি পুনরায় মরিতে আসিবেন। দীপ্ত অগ্নিশিখাবৎ—কন্যামগ্নিশিখামিব—দেবযানীকে স্পর্শ করিয়া যে পতঙ্গ একবার হস্তপক্ষ পুড়াইয়াও কোনওমতে বাঁচিল, সে অগ্নির রূপে মুগ্ধ হইয়া আবার পুড়িতে আসিবে। পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ। পাঠক! ক্ষণকাল অপেক্ষা করো। রূপের আগুন মনুষ্যপতঙ্গকে কেমনে পুড়ায়, বসিয়া দেখো।

পঁয়ত্রিশ

নির্জন উদ্যানবাটিকার মধ্যে শীতল পুষ্করিণীর ধারে একাকী দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবযানী। হৃদয়ের মধ্যে ক্ষণিকের অকারণ ঘোর লাগিয়ে দিয়ে মহারাজ যযাতি চলে গেছেন। রাজা চলে যেতেই শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়ল দেবযানীর। মনে পড়ল তাঁর চরম অপমানের কথাগুলি। মনে পড়ল—শর্মিষ্ঠা তাঁকে কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাঁকে মারবার চেষ্টা করেছেন। রাগে অপমানে দেবযানীর মুহূর্তপূর্বের প্রসন্ন মুখখানি লাল হয়ে উঠল। এদিকে এতক্ষণ তিনি বাড়ি ফিরছেন না দেখে শুক্রাশ্রমের দাসী তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছে। দাসীর নাম ঘূর্ণিকা।

মহামতি শুক্রাচার্য অনেক আগেই বৃষপর্বার রাজসভায় চলে গেছেন। দেবযানীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিবাদ, দেবযানীকে কুয়োয় ফেলে দেওয়া, এবং যযাতির আগমন—কোনও খবরই তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। আশ্রমের দাসী ঘূর্ণিকা জানত—দেবযানী স্নানে গেছেন। সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে স্নানকেলি, নানা রঙ্গ, নানা খেলা—অতএব দেবযানীর দেরি হতেই পারে—এই ভেবে ঘূর্ণিকা এতক্ষণ বাড়িতেই বসেছিল। কিন্তু স্নানের বেলা বয়ে গিয়ে খাবার বেলাও যখন বয়ে গেল, তখন ঘূর্ণিকা দেবযানীর খবর নিতে বেরল। দাসী দেখল—শর্মিষ্ঠা সহ অন্যান্য সব সখী বাড়ি ফিরে এসেছে, শুধু দেবযানী ফেরেননি। কানাঘুষোয় সে খবর পেয়েছে যে, উদ্যানবাটিকার মধ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর কথা-কাটাকাটি হয়েছে। দাসী ঘূর্ণিকা দেবযানীর জেদ এবং খামখেয়ালিপনার সঙ্গে পরিচিত। সে আস্তে আস্তে সেই উদ্যানবাটিকার মধ্যে এসে পৌঁছল।

দেবযানী দাসীকে দেখামাত্রই শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যা যা বাদ-বিসংবাদ হয়েছিল সব জানালেন। তারপর তাকে আদেশ দিলেন—তুমি এই মুহূর্তে পিতার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলো। আমার যা অপমান হয়েছে তাতে আমি অন্তত বৃষপর্বার রাজবাড়িতে ঢুকব না—নেদানীং সংপ্রবেক্ষ্যামি

নগরং বৃষপর্বণঃ। ঘূর্ণিকা তখনই ছুটল দানবরাজ বৃষপর্বার সভাস্থলে, যেখানে শুক্রাচার্য বসে আছেন। দাসী ব্যস্ততা দেখিয়ে শুক্রাচার্যকে জানালে—আচার্য! বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে আঘাত করেছে। দেবযানী বলেছেন—আর তিনি এ বাড়িতে ঢুকবেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় শুক্রাচার্য সঙ্গে সঙ্গে বৃষপর্বার সভাস্থল ত্যাগ করে নগারোপান্তের সেই উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হলেন। আদরিণী কন্যাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে খুব দার্শনিকভাবে বললেন—সকলের জীবনেই কখনও দুঃখ, কখনও বা সুখ আসে। তবে জান তো, নিজের করা অন্যায় অথবা নিজের করা ভাল কাজ থেকেই মানুষ দুঃখ পায় অথবা সুখ পায়। আমার ধারণা—তুমি নিজেই এমন কিছু অন্যায় করেছ, যার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে শর্মিষ্ঠার আঘাতে—মন্যে দুশ্চরিতং তে'স্তি যস্যেয়ং নিষ্কৃতিঃ কৃতা।

আগেকার দিনে এটা ছিল। পাড়ায় চূড়ান্ত দস্যিপনা এবং বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করার পর বাড়িতে যদি কোনওভাবে সে খবর পৌঁছত বা নালিশ হত, তাহলে মা-বাবা আমাদেরই ধরে আগে খানিকটা পিটিয়ে নিতেন। তারপরে বিচার-আচার, কথাবার্তা। অনুরূপভাবে এও জানি—যে বন্ধুর অভিভাবক আমার বাড়িতে নালিশ করতে এসেছেন, তিনিও তাঁর পুত্রকে—তুমি কি ধোয়া তুলসী পাতা—ইত্যাদি গালাগালি সহযোগে উত্তম না হলেও মধ্যম গোছের কিছু ব্যবহার করে এসেছেন। তারপর যখন বিচার করে দেখেছেন, দোষটা বিপক্ষেরই বেশি, তখনই তিনি সলজ্জে নালিশ জানাতে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাবা-মাদের একটি সহজাত গুণ ছিল যে, তাঁরা নালিশ শ্রবণমাত্রেই প্রহার আরম্ভ করতেন; তখন পরপক্ষের অভিভাবকেরই যথেষ্ট মায়া হত। তিনি মাঝখানে থেকে এসে প্রহার থামানোর চেষ্টা করতেন এবং বলতেন—দেখুন, ছেলেপিলেদের ব্যাপার, আমারটিও কিছু কম অসভ্য নয়, কাজেই এবার ছেড়ে দিন, যা হবার হয়ে গেছে। কী অদ্ভুত উপায়ে যে আমাদের পিতৃ বিশেষত মাতৃকুল এক মুহূর্তের মধ্যে আপন উদগির্য্যমান ক্রোধরাশি সম্বরণ করে নিয়ে পর মুহূর্তেই শত্রুপক্ষের নালিশকারী অভিভাবকের জন্য সহাস্যে বসন সম্বরণ করে চা করতে যেতেন, তা রীতিমতো শিক্ষণীয়। এই নিরিখে আধুনিক পিতামাতাকে জীবনের বহু রোমাঞ্চকর নাটক থেকে বঞ্চিত বলে মনে করি। স্বকপোলকল্পিতভাবে অতি নির্দোষ পুত্র-কন্যার পিতা-মাতা হওয়া প্রায় নির্বাণ-মুক্তির শামিল। পুত্র-কন্যারা তাই এখন অল্প বয়সেই বৃদ্ধ পিতামহের মতো বিজ্ঞ-স্বভাব।

কথাগুলি উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, মহামতি শুক্রাচার্য অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি মনে মনে বেশ জানেন যে, বিনা প্ররোচনায় শর্মিষ্ঠা তাঁর মেয়েকে আঘাত করেনি। দেবযানীর কিছু দোষ নিশ্চয়ই আছে। অন্যদিকে আধুনিক পিতা-মাতার মতো তিনি একটি মাত্র কন্যার পিতা হওয়ায়, অপিচ কন্যাটি শৈশবের মাতৃহারা হওয়ায়, কন্যার ব্যাপারে তাঁর কিছু প্রশ্রয়ও আছে। কাজেই প্রাচীন এবং অত্যাধুনিক বৃত্তির দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে শুক্রাচার্যের মতো পিতা কী করেন, সেটাই এখন দেখার।

লক্ষণীয় বিষয় হল, শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে যত অপমান করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান করেছেন শুক্রাচার্যকে। বালক-বালিকার ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে পিতা-মাতার ওপর এই আক্রমণই ঘটনা জটিল করে তুলল। দেবযানী নিজের সুবিধের জন্য সেই মোক্ষম জায়গায় আঘাত করলেন। বললেন—পিতা! আপনি বলেছেন, আমার নিজের দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে শর্মিষ্ঠার আঘাতে। কিন্তু কিসের এই প্রায়শ্চিত্ত? দেবযানী যে শর্মিষ্ঠাকে গালাগালি

দিয়েছিলেন, সে কথা পিতাকে বললেন। শর্মিষ্ঠা যে ভুল করে তাঁর কাপড়খানি পরে ফেলেছিলেন এবং সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও যে দেবযানী সহজভাবে নেননি—এসব কথা তিনি কিচ্ছুটি বললেন না। তিনি শর্মিষ্ঠার পরের কথাগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন পিতার ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করার জন্য।

দেবযানী বললেন—আমার প্রায়শ্চিত্তই বল আর যাই বল,—নিষ্কৃতির্মে'স্তু বা মাস্তু—শর্মিষ্ঠা আমাকে কী বলেছে, একটু মন দিয়ে শোনো। শর্মিষ্ঠা চোখ লাল করে আমাকে বলেছে—তোর বাপ দৈত্যদের চাটুকারী স্তাবক। এ কথা কি সত্যি বাবা? তুমি কি সত্যিই এক স্তাবক—সত্যং কিলৈতৎ সা প্রাহ দৈত্যানামসি গায়নঃ? শর্মিষ্ঠা আমাকে বলেছে—তুই হলি সেই বাপের মেয়ে যে আমার বাবার স্তাবক এবং আমার বাবার কাছ থেকে যে দান প্রতিগ্রহ করে। আরও বলেছে—আমি হলাম সেই বাপের মেয়ে, যে স্তুত হয়, যে দান দেয়।

দেবযানী পিতার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে ব্যঙ্গোক্তিতে বললেন—বাবা! আমি যদি সত্যি সত্যি একজন স্তাবক এবং পরের দান প্রতিগ্রহী পিতার পুত্রী হই, তাহলে বলুন, আমি শর্মিষ্ঠার হাতেপায়ে ধরে তাঁকে যথাসাধ্য খুশি করার চেষ্টা করব;—আমি শর্মিষ্ঠার সখীকে আমার এই প্রতিজ্ঞার কথা বলেই দিয়েছি—প্রসাদয়িষ্যে শর্মিষ্ঠামিত্যুক্তা তু সখী ময়া। দেবযানী এবার শেষ অপমানের কথাটা ধরিয়ে দিলেন শুক্রাচার্যকে। বললেন—শুধু কথা বলেই আমাকে শাস্তি দেওয়া শেষ হয়নি বাবা! এই বিজন বনের ভেতর আমাকে সে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে এবং ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে গেছে—কূপে প্রক্ষেপয়ামাস প্রক্ষিপ্য গৃহমাগমৎ।

শুক্রাচার্য প্রাথমিকভাবে দেবযানীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি মহাপণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। দানবরাজ বৃষপর্বা যে তাঁকে কত সম্মান করেন, তা তাঁর ভালই জানা আছে। এই অনাবিল সুসম্পর্কের মধ্যে দুটি অল্পবয়স্কা সুন্দরীর ঝগড়া তাঁকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলেছে। শুক্রাচার্য বললেন—একেবারে, ভুল বুঝেছ দেবযানী! তুমি কখনও একজন স্তাবক, যাচক অথবা দানজীবী ব্রাহ্মণের মেয়ে নও। তুমি সেই বাপের মেয়ে, যে কোনওদিন কারও চাটুকারিতা করে না, কারও তোয়াক্কা করে না উল্‌টে সবাই যার স্তব করে,—অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য দুহিতা দেবযান্যসি।

তাঁর কথা যে কতটা ঠিক, সেটা প্রমাণ করার জন্য শুক্রাচার্য তিনটি বিশাল ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন—অসুররাজ বৃষপর্বা জানেন, দেবরাজ ইন্দ্র জানেন, আর জানেন মর্ত্যলোকের অধীশ্বর মহারাজ যযাতি। তাঁরা জানেন—একমাত্র পরব্রহ্মই আমার বল, আমার সর্বশক্তি। আর কারও তোয়াক্কা আমি করি না।

মহারাজ যযাতির সঙ্গে দেবযানীর দেখা হয়েছে। তিনিই যে দেবযানীকে উদ্ধার করেছেন—সে কথা এই মুহূর্তে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না দেবযানী। শুধু এইটুকু বুঝে নিলেন যে, মনুষ্যলোকের এই কীর্তিমান পুরুষটি তাঁর পিতার যথেষ্ট আদরণীয়। শুক্রাচার্য তখনও দেবযানীকে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি যে কত কিছু পারেন, দৈত্য-দানবরা যে তাঁকে কতটা সমীহ করে চলে, সে সব কথা বলে তিনি শর্মিষ্ঠার কথাটাকে লঘু করে দিতে চাইছেন। শুক্রাচার্য বললেন—ভদ্রলোকেরা নিজের গুণের কথা নিজের মুখে বলে নাকি কখনও! আমার কত ক্ষমতা, সে তো তুমি জান, মা! এ জগতে আমিই একমাত্র লোক, যে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানে। আর সেই বিদ্যা দিয়ে কত মৃত মানুষকে আমি জীবন দিয়েছি, তাও তো তুমি জান—ত্বং মে জানাসি যদ্ বলম্।

amarboi.com

শুক্রাচার্যের ভাবটা এই—এত যার ক্ষমতা, সে কারও চাটুকারিতা করতে পারে না, বরং অন্যেরাই, তাঁর চাটুকারিতা করে। শুক্রাচার্য দেবযানীকে বুঝিয়ে বললেন—স্বর্গে-মর্ত্যে যা কিছু আছে, সব কিছুই আমার অধীনে। স্বয়ং ব্রহ্মা আমায় সে কথা বলে দিয়েছেন। কাজেই যে যাই বলুক, দেবযানী! তোমার পিতা কোনও যাচক, স্তাবক মানুষ নন। তুমি ওঠো, বাড়ি চলো। বরং এই ভাল, শর্মিষ্ঠাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। কারণ বড় মানুষের গুণই হল ক্ষমা—তস্মাদুত্তিষ্ঠ গচ্ছামঃ স্বগৃহং কুলনন্দিনি।

আমরা দেবযানীর প্রকৃতি একটু-একটু জানি। তাঁর ইচ্ছে এবং অনিচ্ছে দুটোই খুব তীক্ষ্ণ এবং প্রবল। খানিকটা খামখেয়ালিপনাও বলা চলে। শুক্রাচার্য তাঁর মেয়েটিকে খুব ভাল করেই চেনেন। ছোটবেলা থেকে এই মাতৃহারা মেয়েটির ওপর তাঁর অজস্র প্রশ্রয় সত্ত্বেও তিনি জানেন—দেবযানীর কিছু দোষ নিশ্চয়ই আছে। তাছাড়াও এই অকিঞ্চিৎকর ঘটনা তাঁর কাছে নতুন এক বিপন্নতা বয়ে এনেছে। দুই পিতার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভাল, অথচ তাঁদের মেয়েরা ঝগড়া করছে, দুই স্বামীর মধ্যে সুসম্পর্ক আছে, অথচ তাঁদের স্ত্রীরা ঝগড়া করছে। এই অবস্থায় দুই পিতা বা দুই স্বামীর মনে যে বিচলিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, শুক্রাচার্যেরও তাই হল। এর ওপরেও মনে রাখতে হবে—শুক্রাচার্য মহাজ্ঞানী ঋষি। যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনই মার্জিত তাঁর বোধশক্তি। তিনি দেবযানীকে এবার শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

শুক্রাচার্য বললেন—রাগ জিনিসটা মোটেই ভাল নয়, দেবযানী। ঘোড়ার লাগাম যে ধরে থাকে, সেই লোকটাই শুধু সারথি নয়, কেন না ওই রাগ জিনিসটাই হল ঘোড়ার মতো। শুধুই দৌড়ে চলে, শুধুই টগবগ করে লাফায়। যে মানুষ টগবগে ফুটন্ত ক্রোধ প্রশমন করতে পারে তাকেই আসলে সারথি বলতে হবে—যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্ণাতি হয়ং যথা। স যন্তা...। শুক্রাচার্য ক্রোধের দোষ এবং ক্রোধ-প্রশমনের গুণ দেখিয়ে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিলেন। তারপর দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার বিবাদ-বিসম্বাদের অন্তঃসারশূন্যতা সপ্রমাণ করে একটি সারকথা বললেন—অবুঝ নির্বোধ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করেই থাকে—যৎ কুমারাঃ কুমার্যশ্চ বৈরং কুর্য্যুরচেতসঃ। তাই বলে, বড়রাও যদি সেই বিবাদে শামিল হয়, তাহলে কী করে চলে?

শুক্রাচার্যের শেষ কথাটা দেবযানীর পছন্দ হল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন। বললেন—আমার বয়স অল্প হলেও ধর্ম আর অধর্মের ফারাকটা আমি বেশ বুঝি, বাবা—বেদাহং তাত বালাপি ধর্মাণাং যদিহান্তরম্। ক্ষমা করা যে খুব ভাল, আর রাগ করাটা যে খুব খারাপ—সেটাও আমার ভালরকম জানা আছে। কিন্তু বাবা! শিষ্য যদি শিষ্যের মতো আচরণ না করে, আর চাকর যদি চাকরের কাজটি না করে তাহলে তো সবই বৃথা—প্রেষ্যঃ শিষ্যঃ স্ববৃত্তিং হি বিসৃজ্য বিফলং গতঃ। শিষ্য যদি কখনও গুরু-গুরু ভাব দেখায়, আবার কখনও বা শিষ্য-শিষ্য ভাব দেখায় তবে, তাহলে সেই রকম মিশ্রবৃত্তি শিষ্যের বাড়িতে আমার থাকতে ইচ্ছে হয় না, বাবা! তাছাড়া আরও একটা কথা। এঁরা কী রকম মানুষ, বাবা! আমাদের যা বৃত্তি আমরা সেই কাজ করি, অথবা আমাদের যা বংশ, আমরা সেই বংশের পরম্পরাগত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করি। এখন যদি কেউ আমাদের বংশ তুলে 'ভিখারি' বলে গালাগালি দেয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তির নিন্দা করে, 'দানজীবী' বলে পরিহাস করে—পুমাংসো যে হি নিন্দন্তি বৃত্তেনাভিজনেন চ—তাহলে সেখানে অন্তত কোনও বুদ্ধিমান লোকের থাকা চলে না।

শুক্রাচার্যের মননশীল উপদেশে দেবযানীর খুব লাভ হয়নি। হয়নি তার কারণও আছে এবং

AMARBOI.COM

সে কারণ বুঝতে গেলে দানবরাজ বৃষপর্বা এবং শুক্রাচার্যের সম্বন্ধ তথা তাঁদের সামাজিক, সাংসারিক অবস্থাটাও বুঝতে হবে। শুক্রাচার্য তাঁর নিজের আশ্রমেই থাকেন, দানবরাজ বৃষপর্বা তাঁকে চূড়ান্ত সম্মান দেন এবং আদরও করেন। তিনি জ্ঞানী, তিনি ঋষি, সর্বোপরি তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, যা আর কেউ জানেন না। অসুর-দানবদের ভাগ্যেই যে তিনি তাঁদের পক্ষে আছেন—এ কথা দানবরাজ বৃষপর্বার অজানা নয়। এবং এইজন্য বৃষপর্বা তাঁকে যথেষ্ট মাথায় তুলেও রাখেন। কিন্তু হাজার হলেও বৃষপর্বা রাজা। তিনি সুউচ্চ রাজসিংহাসনে বসে থাকেন, অন্য সভাসদরা সেখানে বসেন রাজার থেকে নীচাসনে। এমনকি অসুরগুরু শুক্রাচার্যের আসনও স্বভাবতই রাজাসনের নীচে। রাজগুরু হিসেবে রাজাকে যদি আদেশ, উপদেশ, এমনকি শাসনও করতে হয়, তবে তা নীচাসনে বসেই করতে হয় শুক্রাচার্যকে। কারণ রাজা রাষ্ট্রের প্রতীক, রাজদণ্ডের প্রণেতা তিনিই।

রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠার কাছে রাজার এই উচ্চ সিংহাসন, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কর্তৃত্ব এবং সর্বোপরি তাঁর সর্বাধিনায়কত্বই বড় হয়ে উঠেছে। দানবরাজ বৃষপর্বা যে অসুর-দানবদের কারণেই শুক্রাচার্যের গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন এবং সেই জন্যই যে তিনি শুক্রাচার্যকে দানে-মানে তুষ্ট রাখেন—এ কথা শর্মিষ্ঠা বোঝেন না। রাজকৃত ভরণ-পোষণ যে শুক্রাচার্য দয়া করে স্বীকার করেছেন, এই বোধ তাঁর বালিকা-হৃদয়ে কাজ করে না। বালিকা তার পিতার রাজগৌরবে এই কথাই শুধু উপলব্ধি করে যে, তার পিতা শুক্রাচার্যের ভরণ-পোষণ করেন এবং শুক্রাচার্যকে বসতে হয় রাজার আসনতলে। বালিকা যা দেখে, তার মধ্যে যে বাস্তবের সত্যটুকু নেই, রাজকীয় মর্যাদা এবং মুগ্ধতা শর্মিষ্ঠাকে সে কথা ভাল করে বুঝতে দেয় না।

আর এইটাই ঠিক পছন্দ হয় না দেবযানীর। তিনি আবার তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে এতটাই সচেতন, যে সমবয়সী শর্মিষ্ঠাকে তিনি মোটেই বন্ধু বলে মনে করেন না। শর্মিষ্ঠার পিতা আমার পিতার শিষ্য, অতএব সম্বন্ধগত নিয়মে শর্মিষ্ঠা আমার শিষ্যাপ্রায়—এই দৃঢ় ধারণায় দেবযানীর মন ব্যাপ্ত। এই স্বারোপিত অহংকৃতির মধ্যে শর্মিষ্ঠা যখন তাঁকে ভিখারির মেয়ে বলেন, অথবা প্রতিগ্রহজীবী বলে চিহ্নিত করেন শুক্রাচার্যকে, তখন দেবযানীর মনে আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, অথবা গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ-জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না, তখন সমস্ত সম্বন্ধ পর্যবসিত হয় ধনী-দরিদ্রের চিরন্তন ভেদবৈশিষ্ট্যে। দেবযানী তখন পিতাকে বলেন—ধনীরাও এক ধরনের চণ্ডাল, পিতা। চণ্ডালরা এবং ধনীরা সবসময়েই পরের উৎপীড়ন করে। ভাল কাজ এরা কেউই করে না এবং টাকার ক্ষমতায় এরা বড় হতে চায়। ধনী আর চণ্ডাল একইরকম পাপী, এরা একই রকম দুর্বৃত্ত—দুর্বৃত্তা পাপকর্মাণশ্চণ্ডালা ধনিনো'পিচ। দেবযানী আরও বললেন—শুধু চণ্ডালের ঘরে জন্ম নিয়ে জাতিতে যারা চণ্ডাল, তাদেরই শুধু চণ্ডাল বললে চলে না। নিজের কর্তব্য কর্মটি যে করছে না, অথচ টাকা-পয়সা, আভিজাত্য, আর বিদ্যার অহংকারে যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, তারাও এক ধরনের চণ্ডাল—ধনাভিজনবিদ্যাসু সক্তাশ্চণ্ডাল ধর্মিনঃ।

দেবযানী যা বললেন, তার মধ্যে তিনি নিজেও জড়িয়ে যান কিনা সে কথা পরে বিচার্য। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন মোক্ষম একটি কথা তিনি বলেছেন, যার সামাজিক তাৎপর্য এখনও বিদ্যমান। ভারি আশ্চর্য লাগে। একটা ব্যাপার ভারি আশ্চর্য লাগে। যার টাকা নেই, সে যখন অপরের কাছে মাথা নোয়ায়, তার কারণ বুঝি। যার শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবত্তা নেই, সে যখন অপরের কাছে মাথা নোয়ায়, তারও কারণ বুঝি। কিন্তু যার টাকা-পয়সা আছে অথবা যার বিদ্যা আছে, সে যে কেন অপরের কাছে মাথা নুইয়ে চাটুকারিতা করে, সেটা ভেবেই আশ্চর্য লাগে।

AMARBOI.COM

আজকাল কলেজ-ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ শিক্ষক রাজশক্তির কাছে মাথা নুইয়ে আরও কিছু পাবার আশায় প্রতিনিয়ত কতগুলি অযোগ্য রাজনৈতিক নেতার পদলেহন করেন। শিক্ষকসমাজের এই সামগ্রিক লোভ এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সর্বার্থে তাঁদের দরিদ্র বলতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।

মহামতি শুক্রাচার্য কারও চাটুকারিতা করেন না, কারও তোয়াক্কা করেন না—সে কথা দেবযানীও ভালভাবেই জানেন। কিন্তু রাজশক্তির প্রতিভূ হয়ে রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা যদি অন্যায়ভাবে কোনও ভিত্তি ছাড়াও শিক্ষক শুক্রাচার্যকে রাজশক্তির উপাসক বলে চিহ্নিত করেন, তবে তাঁর ঔরসজাতা বালিকা কন্যাও তাঁকে দরিদ্র মনে করেন। দেবযানী বললেন—দরিদ্র লোক যদি কিছু লাভের আশায় বিদ্বেষী ধনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বাবা, তবে তার থেকে বেশি দুঃখের আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে—যৎ সপত্নশ্রিয়ং দীপ্তাং হীনশ্রীঃ পর্য্যুপাসতে।

আসলে শর্মিষ্ঠা নয়, রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠার কটু কথাগুলি দেবযানীর হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধছে। কাটা আঙুল জোড়া লাগে, কুঠারছিন্ন অঙ্গে নতুন অঙ্গ জন্ম নেয়, কিন্তু কটু কথায় জর্জরিত হৃদয় কখনও সুস্থ হয় না। দেবযানী পিতাকে বুঝিয়ে ছাড়লেন—অসুরগুরু শুক্রাচার্য আজ নিশ্চয় রাজশক্তির কাছে মাথা নুইয়েছে, নচেৎ শুক্রাচার্য আজ শর্মিষ্ঠার কটূক্তিগুলিকে বালিকাসুলভ চাপল্য বলে উড়িয়ে দেবেন কেন?

দেবযানীর কথায় শিক্ষক শুক্রাচার্য, গুরু শুক্রাচার্য উত্তেজিত হলেন। ভাবলেন—সত্যিই দানবরা এইরকম চিন্তা করে না তো? তাঁকে দানবরা রাজার তল্পিবাহক ভেবে বসেনি তো? সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্য দানবরাজ বৃষপর্বার সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে সিংহাসনে বসা দানবরাজকে উদ্দেশ করে বললেন—পাপের ফল খুব তাড়াতাড়ি হয় না, মহারাজ! একটু সময় লাগে। ধরুন, এই মুহূর্তে আপনি খুব গুরুপাক দ্রব্য খেলেন, খুব ভালও লাগল খেতে, কিন্তু গুরু ভোজনের ফলটা কি এখনই পাবেন? না, তার ফল পাবেন কাল, পাপ জিনিসটাও ওইরকম। এখনই করলে এখনই তার ফল দেখা যায় না। পাপের ফল ফলতে একটু সময় নেয়—ফলত্যেব ধ্রুবং পাপং গুরুভুক্তমিবোদরে। সোজা কথায়—আপনি যদি অন্যায়টা করেন, তার ফল আপনি যদি বা এড়িয়েও যেতে পারেন তবু সে ফল ফলতে পারে গিয়ে আপনার ছেলে বা নাতির সময়ে—পুত্রেষু বা নপ্তৃষু বা ন চেদাত্মনি পশ্যতি।

কথাটা শুনতে প্রায় 'মরে পুত্র জনকের পাপে' এর মতো হল। আমাদের শাস্ত্রে পিতার পাপ পুত্রকে ভোগ করতে হয় না—এমন নীতি অবশ্যই আছে। কিন্তু বংশ বংশ ধরে পাপ-পুণ্য ভোগের নীতি আরেকভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। ধরুন পুণ্যের ফলে আপনার অনেক ঐশ্বর্য, অনেক টাকা হল। সেই ঐশ্বর্য সব সময় উপার্জনকারী ব্যক্তির ভোগেই ক্ষয় হয় না। উত্তরাধিকারী পুরুষেরা, অন্তত দু-এক পুরুষ পূর্বসঞ্চিত অর্থ বা ঐশ্বর্যের ফলভোগী হন। একইভাবে পাপের ফলে রোগ-শোক, বধ-বন্ধনাদি দণ্ডও শুধু পাপকারী ব্যক্তির শাস্তিতেই শেষ হয় না, কখনও বা তার প্রক্রিয়া চলতে থাকে আরও দু-এক পুরুষ ধরে।

শুক্রাচার্য এখানে দানবরাজ বৃষপর্বার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তাঁর ওপরেই রাগ দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি জানেন—বৃষপর্বার কোনও দোষ নেই। দোষ করেছেন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা। এই রাগের সময়েও তিনি যে পাপের কথা বলছেন, সেই পাপাচারণের দায়ভাগিনীও শর্মিষ্ঠাই। ঠিক সেই জন্যই তাঁর আক্রমণের ভাষাটা এইরকম—তুমি ফল না পেলেও তোমার

AMARBOI.COM

ছেলে বা নাতি সেই ফল পাবে। বৃষপর্বাকে বিনা কারণে গালাগালি দেওয়ার সময় শুক্রাচার্যের সঙ্কোচ হচ্ছে। সেই জন্য শর্মিষ্ঠার অন্যায়ের কথা বলার আগে তিনি বৃষপর্বাকেও একটু জড়িয়ে নিলেন পূর্বতন এক অপরাধের বাঁধনে।

শুক্র বললেন—মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজ কচ আমার বাড়িতে গুরুসেবায় নিরত ছিল। সে তোমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। অথচ তোমরা তাঁকে সুখে থাকতে দাওনি, বার বার আঘাত করেছ তাঁকে। এখন আবার তোমার মেয়ে আমার সরল মেয়েটিকে যা নয় তাই বলেছে। তারপর যা করেছে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। অপ্রস্তুত অবস্থায় তার সঙ্গে প্রতারণা করে শর্মিষ্ঠা তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে—বিপ্রকৃত্য চ সংরম্ভাৎ কূপে ক্ষিপ্তা মনস্বিনী। যে সব ঘটনা ঘটে গেল, তাতে আমার মেয়ে যে আর এখানে থাকবে, তা আমার মনে হয় না। আর আমার মেয়েই যদি না থাকে, তবে তাকে ছাড়া আমার পক্ষেই বা এখানে কী করে থাকা সম্ভব—সা ন কল্পেত বাসায় ত্বয়াহং রহিতঃ কথম্? অতএব তোমার রাজ্য ছেড়ে আমি চলেই যাব—ত্যজামি বিষয়ং নৃপ।

শুক্রাচার্যের কথার মধ্যেই একটা ফাঁক আছে এবং সে ফাঁকটা তিনি ইচ্ছে করেই রেখেছেন। শুক্রাচার্য একবারও নিজের রাগের কথা বলছেন না। বার বার বলছেন—দেবযানী অসন্তুষ্ট, আমার এখানে কিছু করার নেই। দেবযানীকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শুক্রাচার্য একটু সান্ত্বনাও দেন বৃষপর্বাকে—আমি চলে গেলে তুমি কষ্ট পেয়ো না, বৃষপর্বা। অথবা আমার ওপর রাগ কোরো যেন—মা শোচ বৃষপর্বন্ ত্বং মা ক্রুধ্যস্ব বিশাম্পতে। শুক্রাচার্যের কথা থেকে তাঁর মনের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন—তোমরা দেবযানীকে যেভাবে হোক ভোলাও এবং তাহলে আমার কোনও সমস্যাই থাকে না।

দানবরাজ শুক্রাচার্যকে বললেন—আমি যদি সত্যি সত্যিই আঙ্গিরস কচকে হত্যা করিয়ে থাকি অথবা যদি শর্মিষ্ঠাকে দিয়ে দেবযানীকে কটু কথা বলিয়ে থাকি, তাহলে যেন আমার সবরকম অসদ্‌গতি হয়। শুক্রাচার্য বললেন,—আমি কি মিথ্যা কথা বলছি, দৈত্যরাজ? তুমি নিজের দোষটা দেখছ না এবং এখনও আমাকে তুমি উপেক্ষাই করে চলেছ। কথাটার অর্থ, এখনও তুমি শর্মিষ্ঠাকে শাসন করছ না কিন্তু। বৃষপর্বা বললেন—আপনি মিথ্যা বলছেন না, এ কথা নিশ্চিত—নাধর্মং ন মৃষাবাদং ত্বয়ি জানামি ভার্গব। কিন্তু আপনি এ কী করছেন? আপনি সন্তুষ্ট হন অন্তত। আপনি যদি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যান, তবে আমাকে তো সমুদ্রে ডুবে মরতে হবে; এছাড়া আমার আর কী উপায় থাকবে বলুন—সমুদ্রং সংপ্রবেক্ষ্যামো নান্যদস্তি পরায়ণম্।

শুক্রাচার্য বললেন—তুমি সমুদ্রেই প্রবেশ কর কিংবা যেদিকে ইচ্ছা যাও, দেবযানীর কষ্ট আমি কিছুতেই সহ্য করব না। শুক্রাচার্য এবার আসল কথাটা পাড়লেন। অর্থাৎ আমার কথা ছাড়, তোমরা দেবযানীকে যদি তুষ্ট করতে পার, তবে সব ঠিক আছে। সে আমার প্রাণের থেকেও প্রিয় তোমরা তাকে তুষ্ট করো—প্রসাদ্যতাং দেবযানী জীবিতং যত্র মে স্থিতম্। দেবযানীর কথা বলেই শুক্র আবারও বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর নিজের কোনও রাগ নেই বৃষপর্বার ওপর। তিনি তাঁর ঘরে থাকতেই চান। কথাটা ঘুরিয়ে বললেন শুক্রাচার্য। বললেন—দেবগুরু বৃহস্পতি যেমন সদা সর্বদা ইন্দ্রের ভাল চান, তেমনই আমিও তোমাদের ভাল চাই—যোগক্ষেমকরস্তেঽহমিন্দ্রস্যেব বৃহস্পতিঃ। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই এখন গণ্ডগোল

AMARBOI.COM

হয়ে গেছে। তোমরা যে করে হোক দেবযানীকে প্রসন্ন করো।

বৃষপর্বা কচি খোকাটি নন। তিনি অসুররাজ। শুক্রাচার্যের টিপ্পনি তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু নিজের মেয়ের বয়সী এক বালিকার কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে—এই ভাবনা তাঁকে হয়তো লজ্জিত করেছে। কিন্তু অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কাছে যদি তাঁকে হাত জোড় করতে হয়, তবে তাতে তাঁর কোনও সঙ্কোচ দ্বিধা কিছুই নেই। তাই পুনরায় দেবযানীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন—অসুর-দানবদের বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি যা আছে, গরু, ঘোড়া, হস্তি যা আছে, আপনি সব কিছুরই অধীশ্বর। সব কিছুই আপনার—তস্য ত্বং মম চেশ্বরঃ। সব শুনে শুক্রাচার্য শেষ সিদ্ধান্ত দিলেন—আমি যদি সব কিছুরই প্রভু হই, তবে এই সামান্য কাজটা তোমরা করছ না কেন? তোমরা দেবযানীকে খুশি করো, সব ঝামেলা তাহলে মিটে যায়—তস্যেশ্বরোঽস্মি যদ্যেষা দেবযানী প্রসাদ্যতাম্। অর্থাৎ শুক্রাচার্য মেয়ের ব্যাপারে একেবারে আধুনিক পিতামাতার মতো অন্ধ। একমাত্র মেয়েকে তিনি কিছুতেই চটাবেন না। প্রথম দিকে তিনি প্রাচীন পিতাটির মতো দেবযানীর দোষ নির্ণয় করে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সমস্যার শেষ পর্বে ঘটনার নিয়ন্ত্রণ তিনি দেবযানীর হাতেই ছেড়ে দিলেন অবুঝ স্নেহান্ধ পিতামাতার মতো। তাঁর বক্তব্য—দেবযানী যা চায়, আমিও তাই চাই। অথচ মনে মনে জানি—তা হয়তো তিনি সম্পূর্ণ চান না।

ছত্রিশ

দানবরাজ বৃষপর্বা শুক্রাচার্যের মতো মহদ্গুরুকে কিছুতেই হারাতে চাইলেন না। শুক্রের কথা তিনি মেনে নিলেন। কথা দিলেন— তিনি যে কোনও মূল্যে তাঁর মেয়ে দেবযানীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। শুক্রাচার্য তবু বৃষপর্বার সম্মান বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। সত্যিই তো, একজন প্রবলপরাক্রম রাজা শুধু শুক্রাচার্যের কথা ভেবে একটি অল্পবয়সী বালিকার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইছেন— এ কথা ভাবতে শুক্রাচার্যের মায়া হচ্ছিল। শুক্র তাই বৃষপর্বার ভবন ছেড়ে আগেভাগেই দেবযানীর কাছে এসে বললেন—দেখ মা! তুমি তো জিজ্ঞাসা করেছিলে— আমি স্তাবক অথবা যাচক কিনা? দেখ, এই এক্ষুনি বৃষপর্বা তাঁর প্রভু বলে আমাকে মেনে নিয়েছেন। বলেছেন— আমিই তাঁর রাজ্য এবং ধনসম্পত্তির প্রভু। দেবযানী বললেন,— বিশ্বাস করি না তোমার কথা। রাজা বৃষপর্বা স্বয়ং এসে নিজের মুখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলুন এই কথা। নইলে বিশ্বাস করি না তোমার বক্তব্য।— নাভিজানামি তত্তে'হং রাজা তু বদতু স্বয়ম্।

আসলে দেবযানী শর্মিষ্ঠার কথা ভুলতে পারেননি। শর্মিষ্ঠা তাঁকে স্তাবকের কন্যা বলেছেন। আজকে তিনি দেখবেন— কে কাকে স্তুতি করে? দেবযানীকে তুষ্ট না করলে তাঁর পিতা অসুররাজ বৃষপর্বার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন—এই ভয় দেখানো যে শুধু মৌখিক আড়ম্বর নয়, এটা শর্মিষ্ঠাকে দেখতে হবে— কীভাবে দানবরাজ শর্মিষ্ঠার অভিমান মিথ্যা করে দিয়ে দেবযানীর স্তুতি রচনা করেন। দেবযানী তাই পিতাকে বলেই দিলেন— তুমি বললে হবে না, পিতা! শর্মিষ্ঠার বাবা এসে বলুন যে, তুমিই তাঁর সব কিছুর মালিক— রাজা তু বদতু স্বয়ম্।

শুক্রাচার্য দানবরাজকে তাঁর নিরুপায় অবস্থার কথা জানিয়ে দিলেন। বলে দিলেন— একবার তোমাকে যেতেই হবে দেবযানীর কাছে। বৃষপর্বা আর দেরি করলেন না। আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে নিয়ে বৃষপর্বা উপস্থিত হলেন সেই উদ্যানবাটিকায়, যেখানে অনেক নাটক

পূর্বাহ্নেই ঘটে গেছে। দানবরাজা সটান এসে নিজের মেয়ের সমবয়সী গুরুপুত্রীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন— পপাত ভুবি পাদয়োঃ। বললেন— তুমি রাগ কোরো না দেবযানী! তুমি যা চাও, তা যদি দেওয়া অসম্ভবও হয়, তবু তুমি বললে আমি সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব। দেবযানী বিনা দ্বিধায় এক মুহূর্তের মধ্যে জবাব দিলেন— আজ থেকে শর্মিষ্ঠাকে আমি দাসী হিসেবে পেতে চাই। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে থাকবে আরও এক হাজার দাসী, যারা শর্মিষ্ঠার সঙ্গেই আমার দাসীত্ব করবে— দাসীং কন্যাসহস্রেণ শর্মিষ্ঠামভিকাময়ে।

দেবযানী যে শর্মিষ্ঠাকে দাসী হিসেবে দেখতে চাইলেন— এ ঘটনার কারণ খুব স্পষ্ট। কিন্তু শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যে আরও এক হাজার দাসী চাইলেন, তার দুটি কারণ আছে। এক নম্বর কারণ, দেবযানী ব্রাহ্মণ-ঘরের অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়ে নিজেকে আর কোনওভাবেই হীন অবস্থায় রাখতে চান না। ব্রাহ্মণ-ঋষির দারিদ্র্যের মাহাত্ম্যের থেকেও রাজকীয় আড়ম্বর তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠল। শর্মিষ্ঠা তাঁকে বলেছিলেন—ভিখারির আবার রাগ— রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি! আজকে রাজবাড়ির হাজার দাসীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা যখন দেবযানীর দাসীগিরি করবেন, তখন দেবযানী থাকবেন রাজকন্যার প্রতিষ্ঠায়। দেবযানীর তাই শর্মিষ্ঠা ছাড়াও আরও দাসী দরকার। দ্বিতীয় কারণ, হাজার দাসীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা যখন তাঁর দাসীত্ব বরণ করবেন, তখন শর্মিষ্ঠাকে বুঝতে হবে যে অন্য দাসীদের থেকে তিনি আলাদা কেউ নন। দাসী হলেও একাকিত্বের মধ্যে শর্মিষ্ঠা যদি বা কখনও তাঁর পূর্বের রাজকীয়তা স্মরণ করতে পারতেন, হাজার দাসীর সঙ্গে শয়নে, ভোজনে, অপমানে শর্মিষ্ঠা একাকার হয়ে যাবেন; এই জন্যই দেবযানীর আরও হাজার দাসী চাই।

শুধু দাসীত্বের শাস্তি দিয়েই ক্রোধ প্রশমিত হয়নি দেবযানীর। বৃষপর্বাকে তিনি বলেছেন— শুধু এখনই নয়, আমার যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তখন পিতা আমাকে যে পাত্রে দান করবেন, শর্মিষ্ঠা আমার পিছন পিছন আমার স্বামীর বাড়িতেও দাসী হয়ে যাবে— অনু মাং তত্র গচ্ছেৎ সা যত্র দাস্যতি মে পিতা। দেবযানীর মুখ দিয়ে কথা বেরবার সঙ্গে সঙ্গেই দানবরাজ শর্মিষ্ঠার ধাত্রীকে আদেশ দিলেন শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে আসবার জন্য। বলে দিলেন— দেবযানী যা চায়, তাই করতে বলো শর্মিষ্ঠাকে।

দানবরাজ নিজের কন্যাকে চিনতেন। তিনি জানতেন— শর্মিষ্ঠা পিতার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেবেন এবং নিজকৃত অন্যায়ের জন্য তিনি অন্তত পিতাকে বিপদে ফেলবেন না। শর্মিষ্ঠা দেবযানী নন। শর্মিষ্ঠার ধাত্রী বৃষপর্বার বক্তব্য নিবেদন করার জন্য রাজনন্দিনীর ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। যত সময় ধরে দেবযানী, শুক্রাচার্য এবং বৃষপর্বার কথোপকথন চলেছে, তাতে রাজনন্দিনীর ঘরে সব খবরই পৌঁছে যাবার কথা। কাজেই ধাত্রী এসে যখন বলল— শর্মিষ্ঠা! তোমাকে যেতে হবে সেই উদ্যানবাটিকায়— তখনই দেখছি, শর্মিষ্ঠা মানসিকভাবে অনেক প্রস্তুত। তিনি এক দণ্ডের মধ্যেই যেন কৈশোরগন্ধী ষোলো বৎসর বয়সের চাপল্য কাটিয়ে অনেক বড় হয়ে গেছেন। ধাত্রী বলল— চলো শর্মিষ্ঠা! পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের সুখ সম্পাদন করো— উত্তিষ্ঠ ভদ্রে শর্মিষ্ঠে জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ।

বৃষপর্বা ধাত্রীকে যাই বলুন, রাজবাড়ির ধাত্রী, বহুকাল ধরে সে শর্মিষ্ঠার দেখাশোনা করছে। সে পরিষ্কার জানাল— দেবযানী। দেবযানীর প্ররোচনায় শুক্রাচার্য আজ তাঁর দানবশিষ্যদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। অতএব দেবযানী যা চায় তাই তোমাকে করতে হবে। শর্মিষ্ঠা জবাব দিলেন— দেবযানী যা চায়, আমি তাই করব। এমনকি শুক্রাচার্যও যদি দেবযানীর জন্য

AMARBOI.COM

আমায় কিছু করতে বলেন, তাও আমি করব। তবু যেন আমার দোষে শুক্রাচার্য এবং দেবযানী এই রাজ্য ছেড়ে চলে না যান— মদ্‌দোষান্মাগমচ্ছুক্রো দেবযানী চ মৎকৃতে।

রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা এক হাজার দাসী সঙ্গে নিয়ে পালকি চড়ে নগর থেকে বেরলেন। উপস্থিত হলেন দেবযানীর সামনে, সেই উদ্যানবাটিকায়, যেখানে তিনি চরম অপমান করেছিলেন দেবযানীকে। সবিনয়ে বললেন— দেবযানী! এই হাজার দাসীর সঙ্গে আমি তোমার পরিচারিকা দাসী হলাম— অহং দাসীসহস্রেণ দাসী তে পরিচারিকা। তোমার পিতা যেখানে তোমাকে পাত্রস্থ করবেন, সেখানেও আমি তোমার পেছন পেছন দাসী হয়েই যাব।

দেবযানী ভাবতেও পারেননি অত তাড়াতাড়ি শর্মিষ্ঠা আত্মনিবেদন করবেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন— শর্মিষ্ঠা এসে তাঁর পিতা বৃষপর্বার কাছে অনুযোগ করবেন। ক্রোধে দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে তিনি বৃষপর্বার কাছে আর্তি জানিয়ে বলবেন— এ তুমি কী করলে, পিতা? কেন তুমি এমন কথা দিলে? আর দেবযানী সেই করুণ কান্না শুনে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, আর অপেক্ষা করবেন শেষ সিদ্ধান্তের জন্য। বৃষপর্বা যদি শর্মিষ্ঠাকে রাজি করাতে না পারেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন।

কিন্তু না, এসব কিছুই হয়নি। শর্মিষ্ঠা এসে পিতার সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি যে মুহূর্তে বুঝেছেন— শুক্রাচার্য চলে গেলে দানব-রাজ্যের রাজনৈতিক বিপন্নতা তৈরি হবে এবং তাতে তাঁর পিতা বিপন্ন হবেন, সেই মুহূর্তেই শর্মিষ্ঠা, রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কাছে আত্মনিবেদন করেছেন। যার ওপর খুব রাগ করে বসে আছি, সে যদি একটুও রাগ না করে ঠাণ্ডা মাথায়, যা বলি তাই মেনে নেয়, তবে তার ওপরে আরও রাগ হয়। দেবযানীরও তাই হল। তিনি যখন দেখলেন— শর্মিষ্ঠা বিনা দ্বিধায়, একটিও কথা না বলে হাজার দাসীর সঙ্গে তাঁর দাসী হতে এসেছেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হল সেই প্রাচীন আক্রোশ— কেন? এখন কেন? তুই না বলেছিলি— আমি স্তাবক যাচক, পরজীবীর মেয়ে, আর তুই নিজে হলি বহুস্তুত, বহুপ্রার্থিত রাজার মেয়ে, তা এত বড় মানুষের মেয়ে হয়ে তুই আমার দাসী হবি কী করে—স্তূয়মানস্য দুহিতা কথং দাসী ভবিষ্যসি?

রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা রাজকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিলেন— দেবযানী! আমার বাপ-ভাই-বন্ধুরা আমারই জন্য বিপন্ন বোধ করছেন, যেভাবেই হোক, বিপন্ন আত্মীয়-স্বজনকে বিপন্মুক্ত করাই আমার কাজ। আর ঠিক সেইজন্যই তোমার পিতা তোমায় যেখানে পাত্রস্থ করবেন, আমি সেখানেই তোমার অনুবর্তন করব— অতস্ত্বামনুযাস্যামি যত্র দাস্যতি তে পিতা।

দেবযানী বুঝলেন না— তিনি হেরে গেলেন। শর্মিষ্ঠা পিতার গৌরবে দেবযানীকে এক সময় অপমান করেছিলেন, এখন আবার দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করে পিতারই গৌরব রক্ষা করলেন। তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেও বৃষপর্বা দেবযানীকে যেভাবে কথা দিয়েছিলেন, শর্মিষ্ঠা সেই কথার মর্যাদা রক্ষা করলেন অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য দেবযানীকে হাজার বুঝিয়েও স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁকে নিরুপায় অবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেবযানীর কথা মেনে নিতে হয়েছে। তিনি পিতার সঙ্গে বৃষপর্বার সম্পর্কের কোনও মূল্য দেননি। অন্যদিকে শুক্রাচার্যও কন্যার প্রতি স্নেহবশত নির্বিচারে কন্যার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেছেন। কাজেই অসুরগুরু শুক্রাচার্য এবং ঋষিকন্যা দেবযানী— দু'জনেই বুঝি হেরে গেলেন রাজকীয় মর্যাদা এবং পরম আত্মনিবেদনের গাম্ভীর্যে। শর্মিষ্ঠার নির্বিরোধ শীতল মন্তব্যে প্রত্যুত্তরহীন দেবযানী শেষ পর্যন্ত আত্মখ্যাপন করে বলেছেন— এইবার আমি

সন্তুষ্ট হয়েছি পিতা, এইবার আমি নগরে প্রবেশ করব— প্রবিশামি পুরং তাত তুষ্টাস্মি দ্বিজসত্তম। দানবরা সসম্মানে শুক্রাচার্য এবং দেবযানীকে নগরে প্রবেশ করাল, পিছন পিছন হাজার দাসীর সঙ্গে দেবযানীর অনুগামিনী হলেন রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা।

দেবযানী এখন বড় আনন্দে আছেন। শুক্রাচার্যের আশ্রমে তিনি পূর্বে যেভাবে ছিলেন, এখন আর তিনি সেইভাবে থাকেন না। বনের ফুল তুলে নিজের আভরণ রচনা করা, পয়স্বিনী হোমধেনুটির পরিচর্যা করা, কিংবা উদাস কোনও মুহূর্তে বেণুমতীর তীরে বসে কোনও এক ব্রাহ্মণ-বয়স্যের স্মৃতিমুখে অলস অবসর যাপন— এ সব দেবযানীর পোষায় না। তিনি এখন রাজকীয় মর্যাদায় থাকেন। দানবরাজ বৃষপর্বা হাজারের ওপর আরও এক হাজার দাসী দিয়েছেন। এক হাজার দাসী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে— দেবযানীর শর্ত অনুযায়ী। আরেক হাজার দাসী তিনি দিয়েছেন শর্মিষ্ঠাকে, যাতে তাঁর নিজের মেয়ের কষ্ট না হয়। দাসীবৃত্তি করতে গিয়ে শর্মিষ্ঠা যাতে অন্য দাসীদের ভিড়ে মিশে না যান, তাই দেবযানীর বুদ্ধিকে হারিয়ে দিয়ে বৃষপর্বা আরও এক হাজার দাসী দিয়েছেন শুধু শর্মিষ্ঠার মর্যাদারক্ষার জন্য। দেবযানী না চাইলেও, যেহেতু এটা কোনও শর্তের মধ্যে ছিল না, তাই শর্মিষ্ঠা তাঁর পূর্বপরিচারিকাদের নিয়ে খানিকটা রাজমর্যাদাই ভোগ করেন বলা যায়। তবু শর্মিষ্ঠার তুলনায় দেবযানীর মর্যাদা এখন অনেক বেশি। তিনি দুই হাজার দাসীর পরিচর্যা-সুখে এখন বনস্থলীর সেই কুসুমিত কুঞ্জ-শয্যা, বেণুমতীর তীরে সেই লতাবিতান, অথবা বৃহস্পতিপুত্র কচের পরিবার-সুখ—সব ভুলে গেছেন।

অশেষ রাজকীয় সুখের মধ্যে অন্যতর মধুর এক সুখের আবেশ দেবযানীর অন্তর্গত হৃদয়ের মধ্যে খেলা করে। সেই যে এক রাজা এসেছিলেন উদ্যানবাটিকায়। দেবযানীর তাম্ররক্ত অঙ্গুলিগুলির প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শ করে কূপের গভীর থেকে তুলে এনেছিলেন। একবারও কি মনে হয় না— ভালই করেছিলেন শর্মিষ্ঠা। তাঁকে কূপগর্তে নিক্ষেপ করে ভালই করেছিলেন তিনি। নইলে পাণিপীড়ন করে তাঁকে তুলতেন না সেই রাজা। আমাদের ধারণা, সেই দিন থেকে প্রায় প্রতিদিন দেবযানী রাজকন্যার মর্যাদায় বসে থাকতেন সেই উদ্যানবাটিকায়। আঙ্গিরস কচ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন— কোনও ঋষিপুত্র তাঁকে বিবাহ করবেন না। বয়েই গেছে দেবযানীর ঋষিপুত্র বিবাহ করতে। তিনি এখন রাজেন্দ্রাণীর মতো সর্বত্র বিচরণ করেন, আর ফিরে ফিরে আসেন সেই উদ্যানবাটিকায়। যদি আরও একবার রাজার তেষ্টা পায়। তিনি যদি আবারও পথশ্রান্ত হয়ে জল খেতে আসেন।

দেবযানী তাই দুই হাজার দাসীর মেলায় আজও এসে বসে আছেন উদ্যানবাটিকায়—বনং তদেব নির্যাতা ক্রীড়ার্থং বরবর্ণিনী। তিনি ইচ্ছে করেই এমন এক উচ্চাসনে বসে থাকেন যাতে রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠাকে নীচাসনে বসে তাঁর পদসেবা করতে হয়। কারণ, শর্মিষ্ঠা যে তাঁকে এক সময় তাঁর পিতার আসন নিয়ে কথা শুনিয়েছিলেন। এমনিতে দুই হাজার দাসী নিত্যদিনের ব্যবহারে দেবযানীর সঙ্গে সখীর মতোই আচরণ করে। তারা কেউ আজ গান করছে, কেউ নাচছে, কেউ ফুলের মধু খাচ্ছে, কেউ বা উদ্যানবাটিকার বৃক্ষ-লতার ফল চিবোচ্ছে আলস্যভরে। দেবযানী গান শুনছেন, বাজনা শুনছেন, নাচ দেখছেন আবার কখনও বা শর্মিষ্ঠার দেওয়া পানপাত্রে মধুমদ্য পান করছেন। মধুর আবেশ থেকে শর্মিষ্ঠাও বাদ যাচ্ছেন না। মধুমদ্যের ভাগ তিনিও কিছু পাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

পাঠক! সেই রাজার কথা স্মরণে আসে তো? সেই রাজা, যিনি দেবযানীর 'পাণিস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ' স্পর্শ করে সবলে উঠিয়ে এনেছিলেন দেবযানীকে, কূপগর্ত থেকে। সেই রাজা, যিনি মৃগয়ার পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে তৃষ্ণার জল পাবার জন্য উদ্যানবাটিকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই রাজা, যিনি দেবযানীকে উদ্ধার করার পর প্রায় বিনা বাক্যে বিদায় নিয়ে রাজধানীতে চলে এসেছিলেন। আমরা বলেছিলাম— রাজা পতঙ্গবৎ দেবযানীর রূপবহ্নিতে শুধু পাখা পুড়িয়ে চলে গেছেন। আমরা বলেছিলাম— তিনি আবার আসবেন— পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ। আগুনে পুড়ে মরতে কত সুখ, তা পতঙ্গ ভিন্ন আর কে বা জানে! মনুষ্য-পতঙ্গ যযাতির আবারও অকারণ সখ হল মৃগয়া করার। তিনি পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে আবারও মৃগয়ায় বেরলেন।

মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন— অনেক দিন পর দেবযানী আবারও একদিন সেই উদ্যানবাটিকায় ক্রীড়া করতে গেছেন। আর নাহুষ যযাতি আবারও একদিন মৃগয়া করতে করতে পিপাসার্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সেই বনের মধ্যে উদ্যানবাটিকায় এসে উপস্থিত হলেন— তমেব দেশং সংপ্রাপ্তো জলার্থী শ্রমকর্ষিতঃ। মনুষ্যচরিত্র যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা অবশ্যই বুঝবেন—এই চরম সমাপতন প্রায় অসম্ভব। মহাভারতের কবি মহারাজ যযাতিকে একটি রমণীর মোহে লালায়িত দেখাতে চাননি। কিন্তু আমরা জানি— দেবযানী স্বেচ্ছায় প্রায়ই উপস্থিত হতেন সেই উদ্যানবাটিকায়। কারণ, যদি তিনি আসেন। আর মহারাজ যযাতির মৃগয়ার পথগুলিও এতটাই ধরাবাঁধা ছকে বাঁধা হওয়ার কথা নয় যে, ঠিক ওইখানেই এসে তিনি হারিয়ে যাবেন, পাত্রমিত্ররা আর তাঁকে খুঁজে পাবে না এবং তাঁকে শ্রান্ত পিপাসার্ত হয়ে ঠিক ওই বনেই প্রবেশ করতে হবে— জলার্থী শ্রমকর্ষিতঃ। আমরা জানি— যযাতির মনেও সেই তাম্ররক্ত নখাঙ্গুলির হাতছানি ছিল— যদি তিনি সেখানে থাকেন। পতঙ্গ আগুন দেখতে পেল। আগুনের পুঞ্জ একটি নয়, দুটি।

মহারাজ যযাতি মৃগয়ায় শ্রান্ত হয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। উন্মুক্ত বনস্থলীর মধ্যে বৃক্ষলতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন— উদ্যানবাটিকায় যেন উৎসব লেগেছে। কত শত রমণী, কেউ গান গাইছে, কেউ বাজনা বাজাচ্ছে, কেউ নাচছে— গায়ন্ত্যো'থ প্রনৃত্যন্ত্যো বাদয়ন্ত্যো'থ ভারত। আরও দেখলেন— একটি রমণী সর্বাঙ্গে আভরণ পরে উচ্চাসনে বসে আছেন। রত্নখচিত আসনে সহাস্যে বসে তিনি অবসর বিনোদন করছেন। অন্যতরা এক রমণী, যাঁকে দেখলেই বোঝা যায়— তিনি সাধারণ নন, তিনি কিঞ্চিৎ নীচাসনে বসে উচ্চতরার পা টিপে দিচ্ছেন। অতুল তাঁর রূপরাশি, সমস্ত রমণীর মধ্যে তিনিই প্রধানা হবার উপযুক্ত। তবু তাঁর হেমভূষিত আসনখানি, নীচস্থ এবং তিনি উচ্চাসনস্থ রমণীর পা টিপে দিচ্ছেন—দদর্শ পাদৌ বিপ্রায়াঃ সংবহন্তীমনিন্দিতাম্।

দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার দুই হাজার দাসী নানা বিনোদন প্রক্রিয়ায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা মহারাজ যযাতিকে আগে দেখতে পান। চপল চটুল রমণী-সমাজের মাঝখানে বিখ্যাত এক পুরুষ এসে পড়ায় নিমেষে দাসীদের মুখ বন্ধ হল। লজ্জায় তাদের মাথা নত হল। যযাতি একটু অবাক হলেন। দুটি মাত্র রমণী। একজন উচ্চাসনে, একজন নীচাসনে। অথচ তাঁদের পরিচর্যা করছে দুই হাজার দাসী। আগের বার যযাতি যখন দেবযানীকে দেখেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন অসহায়। শুক্রাচার্যের মেয়ে বলে তিনি তাঁর পরিচয় পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেবযানীর নাম জানতেন না। সেদিন একটি পরিচারিকাও যাঁর

AMARBOI.COM

ধারে কাছে ছিল না, আজকে তিনি কোন মন্ত্রবলে হাজার হাজার দাসী নিয়ে রাজকন্যার মতো বসে আছেন। আরও আশ্চর্য, যে অপ্রতিম সুন্দরী এই বিপ্রকন্যার সেবা করছে, তার চেহারাটাও তো মোটেই দাসীর মতো নয়।

কৌতূহলী রাজা দু'জনকে উদ্দেশ করেই বললেন— আপনাদের পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি। আপনাদের নাম-গোত্র জানাবেন কি— গোত্রে চ নামনী চৈব দ্বয়োঃ পৃচ্ছাম্যহং শুভে। সেকালের দিনে নামের সঙ্গে গোত্র জানানোর রীতি ছিল। তবে এই মুহূর্তে যযাতি যে নামের সঙ্গে গোত্রও জানতে চাইলেন, তার কারণ খুব স্পষ্ট। যযাতি দেবযানীকে যথেষ্টই চিনতে পেরেছেন, কিন্তু অন্যতরা তাঁকে আরও বেশি মোহিত করছে। এই রমণী আদৌ ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা কি না— এই তর্ক হঠাৎই রাজার মন জুড়ে বসেছে। আমরা কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকেও দুষ্যন্তকে এই তর্কে নিযুক্ত দেখেছি। কণ্বাশ্রমের ব্রাহ্মণ্য পরিবেশে উপস্থিত হয়ে শকুন্তলাও ব্রাহ্মণকন্যা কি না— এই চিন্তায় দুষ্যন্তকে আমরা আকুলিত দেখেছি। আসলে, কন্যা ব্রাহ্মণী হলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব করা কঠিন ছিল, কারণ তাতে বর্ণের অনুক্রম নষ্ট হয়।

এখানে দেবযানীকে যযাতি ব্রাহ্মণকন্যা বলে চিনতেনই, কিন্তু হাত ধরে তাঁকে তোলবার সময়েই তিনি বুঝেছেন— রমণী মনে বড় দুর্বল। কিন্তু আজ শর্মিষ্ঠাকে দেখে তিনি মোহিত হয়েছেন। তিনিও দেবযানীর সমগোত্রীয় ব্রাহ্মণী কি না, রাজা সেটা যাচাই করে নিতে চান। যথাতির জিজ্ঞাসা দু'জনের দিকে ছুড়ে দেওয়া হলেও উত্তর দিলেন দেবযানী। তিনি মালকিন, দাসীভূতা শর্মিষ্ঠার কথা বলারই অধিকার নেই সেখানে। দেবযানী বেশি কিছু বলতে চাইলেন না, জবাবটাও দিলেন শর্মিষ্ঠাকে তাচ্ছিল্য করে। দেবযানী বললেন— আমার কাছেই শুনুন, রাজা! আমি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী।

দেবযানীর রাজ-সম্বোধনেই বোঝা যায়, তিনি রাজাকে চিনেছেন। এবার শর্মিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বললেন— এ আমার সখীও বটে, দাসীও বটে— ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী। কিন্তু সখীত্বের থেকেও শর্মিষ্ঠাকে যে তিনি দাসী বলতেই বেশি পছন্দ করেন, সেটা বোঝানোর জন্য বেশ জোর দিয়ে বললেন— ও হল দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা। আমি যেখানে থাকব সেখানেই ওকে থাকতে হবে, যেখানে যাব, সেখানেই ওকে যেতে হবে— ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী যত্রাহং তত্র গামিনী। মহারাজ যযাতি রাজ্য চালান, তিনি ধুরন্ধর রাজা। কথাটা শুনেই বুঝলেন— কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন— অসুরেন্দ্র বৃষপর্বার এমন সুন্দরী কন্যাটি কেমন করে আপনার সখীও হলেন আবার দাসীও হলেন— এটা শোনার জন্য আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে— কথং নু তে সখী দাসী কন্যেয়ং বরবর্ণিনী।

সারা ভারত জুড়ে মহাভারতের যে বিভিন্ন সংস্করণ আছে, তার কয়েকটিতে যযাতির এই প্রশ্নের পর আরও কয়েকটি অতিরিক্ত শ্লোক দেখা যায়। সেই শ্লোকগুলির মধ্যে যযাতির মুখে শর্মিষ্ঠার চরম প্রশংসা শোনা যায়। এমনকি দেবযানীর রূপের তুলনায় শর্মিষ্ঠা যে শতগুণ সুন্দরী এবং পূর্বজন্মের অনেক পাপ ছিল বলেই যে শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীত্ব বরণ করতে হয়েছে— এ সব কথা অনেকটাই বলা আছে। তবে এই শ্লোকগুলি আমাদের কাছে খুব সমীচীন মনে হয় না। তার কারণ যযাতি বিদগ্ধ রাজা। তিনি এত রুচিহীনভাবে দেবযানীর সামনেই শর্মিষ্ঠাকে এমন অসভ্যভাবে প্রশংসা করতে পারেন না। বরং রাজা কৌতূহল দেখাবেন এবং দেবযানী সেই কৌতূহল সবিস্তারে মেটাবেন না— এইরকম কথোপকথনই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

amarboi.com

বরং বলা যায়—রাজার যে শর্মিষ্ঠাকে ভাল লেগেছে— একথা রাজার কৌতূহল দেখেই বেশ বুঝতে পারলেন দেবযানী। কোনও বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে তিনি গেলেন না। শর্মিষ্ঠাকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন— সবই কপাল, রাজা। সবই কপাল। ললাটের লিখন, তাই ও আমার দাসী হয়েছে, এ বিষয়ে বেশি কথা বলে লাভ কী— বিধানবিহিতং মত্বা মা বিচিত্রাঃ কথাঃ কৃথাঃ।

সঙ্গে সঙ্গে দেবযানী অন্য কথায় টান দিলেন। আমাদের ধারণা সব জেনেশুনেও দেবযানী সাভিনয়ে বললেন— বরং আপনার কথা বলুন, আপনাকে দেখে তো রাজা বলে মনে হচ্ছে। কথাও তো বলছেন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের মতো। বেদও আপনার জানা আছে মনে হয়। তা আপনার কী নাম? কারই বা পুত্র আপনি? কোথা থেকেই বা এসেছেন— কো নাম ত্বং কুতশ্চাসি কস্য পুত্রশ্চ শংস মে।

মহারাজ যযাতিও বুঝলেন— দেবযানী শর্মিষ্ঠার বিষয়ে বেশি কথা বলবেন না। তিনি তাই সাধারণভাবে জবাব দিলেন—তা ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার ব্রহ্মচর্যের সময় থেকেই চতুর্বেদ আমার কানে এসেছে। আমি রাজাই বটে, আমার নাম যযাতি। দেবযানী এবার বুঝতে চাইলেন রাজা তাঁর জন্যই এখানে আবার এসেছেন কি না। বললেন—আপনি কী কারণে এই বনস্থলীতে এসেছেন? এই সরোবর থেকে লীলাপদ্ম আহরণ করার জন্য? নাকি মৃগয়া করার জন্য? যযাতি খট্‌খট্‌ করে জবাব দিলেন— না, ভদ্রে! আমি মৃগয়া করতে এসে জলের খোঁজে এসেছিলাম এই উদ্যানভূমির মধ্যে। সে যাই হোক। অনেক কথা হল, এবার আপনি বিদায় দিন আমাকে— বহুধা'প্যনুযুক্তো'স্মি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।

কিন্তু হায়! বিদায় চাইলেই কি বিদায় পাওয়া যায়? মুক্তি চাইলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়? যযাতি ধরা দিতে এসে আরেক বাঁধনে জড়িয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা দেবযানীর পদপ্রান্তে যে সুন্দরী অধোবদনে বসে ছিল, নিশ্চুপে যে দেবযানীর পাদসংবাহন করছিল, যযাতি তাঁকে দেখেই বেশি মুগ্ধ হলেন। কিন্তু সে কথা দেবযানীর সামনে তো আর বলা যায় না। অন্যদিকে দেবযানী রাজার কথা শোনার জন্য এতটাই ব্যগ্রভাব দেখিয়েছেন যে, যযাতি এখন পালাতে পারলে বাঁচেন। রাজার কথার মধ্যেও যেন সামান্য বিরক্তি ফুটে উঠেছে— অনেক প্রশ্ন হয়েছে— বহুধাপ্যনুযুক্তো'স্মি— এবার চলি। কিন্তু চলা আর হল না। যে রমণী পুরুষ শিকার করার জন্য হাজারো দাসী নিয়ে উদ্যানবাটিকায় বসে আছে, তার হাত থেকে পালানো কি অতই সোজা?

www.amarboi.com

সাঁইত্রিশ

দেবযানীর কাছে এসে দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠাকে বেশি পছন্দ হয়ে গেল যযাতির। তাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ জানা হল না, শুধু দাসীবৃত্তির নিগড়ে আবদ্ধ এক সুন্দরী রমণীর বাক্‌রুদ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টি যযাতিকে মোহিত করল। দেবযানীর নানা প্রশ্ন আর তাঁর ভাল লাগছে না। তিনি এখনই বিদায় নিতে চান। কিন্তু রাজপরিচয় প্রদানের শেষে যযাতির দিক থেকে— 'এবার চলি'— এই অনুমতি-যাচনাটুকুও শেষ হল না। কোনও ভণিতা নেই, কোনও প্রস্তাবনা নেই, দেবযানী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন— এই দুই হাজার রমণী আর আমার এই দাসী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে — দাস্যা শর্মিষ্ঠয়া সহ— আজ থেকে আমি তোমার অধীন হলাম, রাজা। আজ থেকে তুমি আমার সখা, তুমি আমার স্বামী হবে। তোমার মঙ্গল হোক—ত্বদধীনাস্মি ভদ্রং তে সখা ভর্তা চ মে ভব।

বুঝি আকাশের নীল থেকে ঘন বজ্রপাতও এত আকস্মিক নয়। ভাবনার বিষয় হল—যে রমণী মজা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েও নিজের অহংকার ত্যাগ করেননি, যে রমণী বিপন্ন অবস্থাতেও বিপৎ-ত্রাতার কুল-পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি, যে রমণী অতি স্বল্প কথায় নিজের ব্যক্তিত্ব বিস্তার করে আত্মমর্যাদা বজায় রাখেন—এই কি সেই রমণী? এক লহমার মধ্যে মহারাজ যযাতির কাছে তিনি বিবাহের প্রস্তাব করে বসলেন!

যযাতি রাজা। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্রও তাঁর নখদর্পণে। তার ওপরে আছে রাজোচিত স্বভাবসিদ্ধি। অন্য পক্ষের কথা শুনে মনের মধ্যে যে ভাব হয়, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না রাজার মুখমণ্ডলে। তাঁকে যত্ন করে শিখতে হয়—কী করে মনের ভাব গোপন করতে হয়, কী করে প্রতিক্রিয়া দমন করতে হয়। এমনকি হাত, মুখ, চোখ—কোথাও যাতে কোনও বিকার ধরা না পড়ে—তার জন্য তাঁকে সযত্নে বিকার-প্রশমনের পাঠ নিতে হয় ছোটবেলা থেকে। এসব কথা প্রাচীন রাজধর্মের নীতিতেই পাওয়া যাবে।

মহারাজ যযাতিকে আমরা তাই একটুও চমকিত দেখছি না। তাছাড়া এত সহজে যদি এক রমণী স্বল্প-পরিচিত একটি পুরুষের কণ্ঠলগ্না হতে পারেন, তার প্রতি আর যাই হোক যযাতির মতো বিদগ্ধ নরপতির প্রেম হয় না। এক মুহূর্তের মধ্যে দেবযানী তাঁর পূর্ব-বিদগ্ধতা, মর্যাদা এবং গাম্ভীর্য ত্যাগ করে যযাতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এই অতিরিক্ত তাড়াহুড়োর পিছনে কারণ একটাই। কচের অভিশাপ ছিল—কোনও ঋষিপুত্র তাঁর পাণিপ্রার্থী হবেন না। অতএব ক্ষত্রিয়ই যদি বিয়ে করতে হয়, তবে ক্ষত্রিয়ের মতো ক্ষত্রিয় হলেন মহারাজ যযাতি। তাঁর পিতা শুক্রাচার্য পর্যন্ত তাঁকে চেনেন এবং মর্ত্যভূমিতে তাঁকে প্রমাণস্বরূপ বলে মনে করেন। দেবযানী ভবিষ্যতে আর কোনও আশঙ্কা রাখতে রাজি নন।

দ্বিতীয় কারণও একটা আছে। তবে সেটাকে কারণ না বলে স্বভাব বলাই ভাল। কচের উদাহরণ থেকে যা বোঝা যায়, মহারাজ যযাতির উদাহরণ থেকেও তাই বোঝা যায়। দেবযানী পুরুষের সাহচর্যে এলেই প্রেমে পড়ে যান। প্রথম দিকে একটা সুনিপুণ ইচ্ছাকৃত গাম্ভীর্য এবং অহংকার তাঁর চারদিকে ঘনিয়ে থাকে যেন, কিন্তু সেই গাম্ভীর্য এবং অহংকার পুরুষের সামান্য সান্নিধ্যমাত্রেই ভেঙেচুরে যায়। দেবযানীর এই দুর্বলতা কচও বুঝেছিলেন এবং রাজা হওয়ার দরুন যযাতির কাছে তা আরও তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেছে। মহারাজ যযাতিকে মানসিকভাবে আমরা ভীষণ প্রস্তুত দেখছি।

যে মুহূর্তে দেবযানী রাজার কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানালেন, সেই মুহূর্তেই আমরা যযাতিকে ঝটিতি উত্তর দিতে দেখছি। দুহাজার দাসী আর শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর এই আত্মসমর্পণ যতই আকস্মিক হোক, যযাতি সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর জানিয়ে বললেন—আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না, দেবযানী। তোমার ব্রাহ্মণ পিতা নিশ্চয়ই একজন নিকৃষ্ট বর্ণের ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ করবেন না। দেবযানী লজ্জা ত্যাগ করে বললেন—এও কি একটা কথা হল? তুমি তো ভালই জান—বামুনদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের দিন-রাত ওঠা-বসা, বিয়ে-থাও এই দুই জাতের মধ্যে যথেষ্ট হয়। ক্ষত্রিয় মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে, অথবা বামুনের মেয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিয়ে—এরকম বর্ণসংকর সমাজে ভূরি ভূরি আছে—সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্।

কথাটা যে দেবযানী খুব মিথ্যা বলেছেন, তা নয়। মহাভারতের পূর্বে লেখা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে ক্ষত্রিয়ের থেকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হলেও বহু জায়গায় এই দুই জাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সাদরে উল্লিখিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ একদিকে বলেছে—ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় হলেন সমাজের সবচেয়ে শক্তিমান ধারা—ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চাশাস্ত উভে বীর্যে, —অন্যদিকে ঐতরেয় ব্রহ্মণ বলেছে—ব্রাহ্মণ্য শক্তির মধ্যেই ক্ষাত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা, আবার ক্ষাত্র শক্তির মধ্যেই ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মণি খলু বৈ ক্ষত্রং প্রতিষ্ঠিতম্, ক্ষত্রে ব্রহ্ম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রায় কবিতার মতো করে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক মেশামিশি ব্যাখ্যা করেছে। বলেছে—স্বর্গ আর মর্ত্যের যে সম্পর্ক, ঋক্‌মন্ত্র আর সামগানের মধ্যে যে সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও সেই সম্পর্ক—দৌরহং পৃথিবী ত্বং সামাহং ঋক্ ত্বং তাবেহ সংবহাবহৈ।

সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত এই মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলির সঙ্গে দেবযানীর কথার খুব বেশি তফাত নেই। তবে দেবযানীর দিক থেকে আকস্মিক প্রণয়ের আকুতিটুকু এমন উদ্‌ভ্রান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শুধু ক্ষত্রিয়ই নয়, মহারাজ যযাতি যদি বৈশ্য কিংবা শূদ্রও হতেন, তাহলেও বোধহয় দেবযানীর আপত্তি থাকত না। শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি অনুসারে পরম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু

এবং পা থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের সৃষ্টি। শাস্ত্রের কথা অন্য স্থানে যতই বৈষম্য বয়ে নিয়ে আসুক, মহারাজ যযাতির কাছে এই বর্ণবৈষম্যের অন্য এক মাত্রা আছে। তিনি বলেছেন—যদিও একই ঈশ্বর-শরীর থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, তাই বৈষম্যের কথাটা তত বড় না হলেও প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম, আচার এবং শুচিতার বোধ ভিন্ন ভিন্ন, যদিও শুচিতার নিরিখে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ—পৃথগ্‌ধর্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষান্তু ব্রাহ্মণো বরঃ। কাজেই এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিবাহ সম্বন্ধ সমীচীন নয় মোটেই।

আগেই বলেছি—যযাতির কথার একটা অন্য মাত্রা আছে এবং সেটা বাস্তব সত্য। ভারতে ধর্ম, আচার এবং শুচিতার বোধ এতটাই দৃঢ়মূল যে, এগুলি শুধু ব্রাহ্মণই নয়, বৈশ্য, শূদ্র সমস্ত জাতির মধ্যেই এই বোধ কোনও না কোনওভাবে দৃঢ়প্রোথিত। সন্দেহ নেই, ব্রাহ্মণ্যবাদই এই শৌচ-আচার প্রতিষ্ঠার জন্য মূলত দায়ী, কিন্তু এই শুচিতা এবং আচার পালন অন্য বর্ণের মধ্যে এমনভাবেই সংক্রমিত হয়েছে যে, কখনও সেই শৌচ-আচার খোদ ব্রাহ্মণকেও ছাড়িয়ে গেছে। দু-একটি উদাহরণ দিই।

মনে আছে—ছোটবেলায় আমি এক বৈশ্য 'সাহা'র বাড়িতে খেতে বসেছি। বৈশ্যবাড়িতে এই খাওয়া-দাওয়া সমাজ তখন ভাল চোখে দেখত না, কিন্তু আমার পিতৃদেব শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন বলে তিনি এসব কিছুই মানতেন না। সে যাই হোক—খাবার সময় যে ব্যাপারটা আমাদের সবার চোখে পড়ল, তা হল—থালা, গেলাস আর পাঁচ-ছটি বাটির চমক। কাঁসা-পেতলের থালা-বাটি, কিন্তু মাজা-ঘষায় সে সব বাসনপত্রের রং ছিল নির্ভেজাল সোনার মতো। সোজা কথায় হাজার আচার-নিয়ম পালন করা বামুন বাড়িতে কোনওদিন আমরা অত মার্জিত থালা-বাটি দেখিনি। আমার মা বলেছিল—হ্যাঁ গা বউ! তোমাদের বাসনপত্র এমন সুন্দর থাকে কী করে? গৃহকর্ত্রী বিনয় করে বললেন—সবই আপনাদের কাছেই শেখা, মা। বলা বাহুল্য, আমি সেই ছোট বয়সেও বুঝেছিলাম—সেই বৈশ্য-সাহাদের আচার-নিয়ম বামুনবাড়ির থেকে অনেক বেশি কঠোর। শৌচ-আচার-নিষ্ঠাও অনেক বেশি এবং শুধু তাই নয়, আলাদা।

পরবর্তীকালে এমনই এক বৈশ্য-সাহা পাত্রের সঙ্গে একটি বামুন বাড়ির মেয়ের বিয়ে হল। সন্দেহ নেই, সেই ভালবাসার বিয়ে এবং সৌভাগ্যবশত পাত্র-কন্যার পিতারা সে বিয়ে মেনে নিলেন। নতুন সংসার আরম্ভ হল। প্রথমদিকে বৈশ্যা শাশুড়িমাতা নতুন বউকে একটু সমঝেই চলতেন। পরে দেখলেন—নিয়ম, কানুন আচার-নিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ-কন্যা অনেক শিথিল। সাহা-বাড়ির শাশুড়ি তাঁর থেকে অনেক বেশি কট্টর, অনেক কিছুই তিনি বেশি মানেন। শাশুড়ি একদিন বলেই ফেললেন—হ্যাঁগা! তুমি বামুনবাড়ির মেয়ে! আর তোমার এই ব্যাভার? আচার-নিয়ম তুমি যে কিছুই মান না! একদিন দুদিন কথা শুনতে শুনতে বধূ জবাব দিল—আমাদের অত মানতে হয় না, এসব আমাদের রক্তে আছে। কথায় কথায় কথা বাড়ল, সংসার ভেঙে দু-খণ্ড হল।

শুধু এই আচার-নিয়মই নয়, বর্ণচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের মধ্যে ধর্মবোধ, সংস্কৃতি এবং স্বভাবও এত পৃথক যে, এঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হলে কিছু না কিছু বিরোধ একভাবে ফুটে ওঠেই। আবারও বলি—হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণের উচ্চতার অভিমানই এই বিরোধের মূল কারণ। তবে জাতি হিসেবে অন্য বর্ণেরও নিজস্ব অভিমান এবং স্বাতন্ত্র্যও কিছু কিছু আছে। সৌভাগ্যের বিষয় সমাজ এখন পালটাচ্ছে। উচ্চবর্ণ নিজেদের সংকীর্ণতা বুঝতে শিখছে এবং নিম্নবর্ণের মধ্যেও সেই বিশ্বাস গাঢ় হচ্ছে যে, তাঁরাও পারেন, সব পারেন। সমাজের

AMARBOI.COM

মধ্যবিন্দুতে সমস্ত বর্ণই একাকার হোক—এই কামনার পরেও মহারাজ যযাতির কথাটা আমাদের বুঝতে হবে তৎকালীন সমাজের বৈষম্যের নিরিখেই।

যযাতির বক্তব্য—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে যতই মেলামেশা আর বৈবাহিক সম্বন্ধ হোক, ব্রাহ্মণের শৌচ, আচার, নিষ্ঠা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে একমত নয়। একই শরীরের অন্তর্গত হলেও হাত, পা মুখের কাজ যেমন আলাদা, তেমনই একজন যেখানে যাগ-যজ্ঞ, ব্রতহোম নিয়ে দিন কাটাচ্ছে, অন্যজন সেখানে অমাত্য-সচিবের মন্ত্রণা, পররাষ্ট্রনীতি, শুল্কনীতি, দূত-নিয়োগ—এইসব নানান রাষ্ট্রীয় ভাবনায় ব্যস্ত। চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষধর্ম যেখানে ব্রাহ্মণের পরম অনুসন্ধানের বিষয়, রাজাদের সেখানে শাস্ত্রের নিয়মেই মোক্ষের অভিসন্ধি থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। কারণ রাজা যদি মুক্তিচিন্তায় বিভোর হন তবে রাজ্য লাটে উঠবে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ক্রিয়াকর্মের এই ভিন্নতাই তাঁদের আচার-নিষ্ঠা এবং স্বভাবেও ভিন্নতা এনেছে। বৈবাহিক জীবনে এই ভিন্নতা যদি পদে পদে বিরোধের সৃষ্টি করে—সেই ভয়েই যযাতি বললেন—এই বিবাহ হতে পারে না, দেবযানী! ধর্ম এবং শুচিতার বিধানে ব্রাহ্মণরা আমাদের থেকে অনেক বড়। দেবযানী বললেন— কেন যে তুমি এমন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিষম আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? তোমাকে আমি আমার সমান বর্ণ বলে মনে করি। ঋষি বল আর ঋষিপুত্রই বল, তুমি আমার কাছে তাই। তুমি আমার প্রিয়তম। আমাকে দয়া করে তুমি বিবাহ করো—ঋষিশ্চাপ্যৃষিপুত্রশ্চ নাহুষাঙ্গ বহস্ব মাম্।

যযাতি নহুষের পুত্র। তিনি রাজা। কিন্তু দেবযানী তাঁকে ঋষি অথবা ঋষিপুত্র বলে প্রমাণ করে ছাড়বেন। আমরা বুঝি—দেবযানীর মনে ক্রিয়া করছে কচের সেই অভিশাপ—কোনও ঋষি বা ঋষিপুত্র তোমার পাণিগ্রহণ করবে না। দেবযানী তাই যেন-তেন-প্রকারেণ যযাতিকে ঋষি অথবা ঋষিপুত্র বলেই প্রমাণ করতে চান। তাঁর যুক্তিটা এইরকম—চন্দ্রবংশের প্রথম পুরুষ চন্দ্র মহর্ষি অত্রির পুত্র। আবার চন্দ্রপুত্র বুধ চন্দ্রের ঔরসজাত হলেও দেবগুরু ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির সঙ্গেও তাঁর পিতৃসম্বন্ধ আছে। বুধ ইলাকে বিবাহ করবার সময় ছল করে নিজেকে ব্রাহ্মণের পুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন—পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ—এবং তা দিয়েছিলেন বৃহস্পতির পুত্রত্ব তিনি অস্বীকার করেন না বলেই। এইভাবে মূল বংশলতিকা থেকে যদি আরম্ভ করা যায়, তবে মহারাজ যযাতিও একভাবে ঋষির বংশধরই বটে, এমনকি ঋষিপুত্রও বলা যায় টেনেটুনে।

কিন্তু দেবযানী যযাতির ঋষিত্ব কিংবা ঋষিপুত্রত্ব প্রমাণ করে যতই আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হোন, যযাতি টললেন না একটুও। তিনি চতুর্বর্ণের উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতা দেখিয়ে নিজেকে বিবাহের অনুপযুক্ত বলে স্থাপন করলেন। দেবযানী এবার যযাতির প্রতি শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তিনি বললেন—ওসব বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্মের কথা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মশাই! পাণিধর্মের বেলায় কী হবে? কোনও কন্যার পাণিগ্রহণ করে তাঁকে আবার প্রত্যাখ্যান করার মতো অভদ্রতা এ পর্যন্ত কোনও পুরুষ মানুষ করেননি— পাণিধর্মো নাহুষায়ং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুরা। তুমি যে একবার আমায় সেই হাত ধরে উঠিয়েছিলে কুয়ো থেকে, সেই তো পাণিগ্রহণ হয়ে গেছে। আর আমিও সেই কারণেই তোমাকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছি। তুমিই বল—তোমার মতো একজন ঋষিপুত্র যদি কোনও ভদ্র ঘরের মেয়ের হস্ত স্পর্শ করে থাকে, তবে সেই রমণী কী করে আবার অন্য পুরুষের হাত ধরবে—কথং নু মে মনস্বিন্যাঃ পাণিমন্যঃ পুমান্ স্পৃশেৎ?

যযাতি তবু মানলেন না। যদিও পূর্বে হস্তস্পর্শ করার ফলে এবং এখন সেই হস্তস্পর্শের আকস্মিকতাই বৈবাহিক নিয়মের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করায় তিনি যথেষ্ট অপ্রতিভ হলেন। আবারও

amarboi.com

প্রশ্ন তুললেন, সেই ব্রাহ্মণ্যের প্রশ্ন। ব্রাহ্মণরা যে কত বড় শ্রেষ্ঠ আসনে বসে আছেন, ক্রুদ্ধ হলে অভিশাপ দিয়ে তাঁরা যে কত ক্ষতি করতে পারেন—এই সব নানা অজুহাতে যযাতি হস্তস্পর্শের পূর্ব অভিজ্ঞতাটুকুও যেন এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বেশি বিনয় এবং নিকৃষ্টতা দেখালে দেবযানীও যদি তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিকৃষ্ট ভেবে পাণিগ্রহণের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেন—এই ভরসায় যযাতি ব্রাহ্মণের স্তুতি করলেন অনেক। তারপর বললেন—তুমি যাই বল, দেবযানী! তোমার পিতা যদি আমার হাতে তোমাকে সমর্পণ না করেন, তবে আমার পক্ষে তোমাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়, দেবযানী— অতো দত্তাঞ্চ পিত্রা ত্বাং ভদ্রে ন বিবহাম্যহম্। যযাতির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল— অল্প বয়সী দেবযানী যাই বলুন, অসুরগুরু শুক্রাচার্যের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রাহ্মণ কিছুতেই ক্ষত্রিয় রাজার হাতে নিজের মেয়ে দেবেন না।

কথাটা যযাতি একভাবে ঠিক বললেও, মেয়ের কাছে শুক্রাচার্য যে একেবারে নিস্তেজ ক্রীড়নকে পরিণত হন— সেকথা বুঝি যযাতি জানতেন না। দেবযানী মুহূর্তের মধ্যে যযাতির কথাটা লুফে নিয়ে বললেন— বেশ তো মহারাজ! আমি তো তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করেইছি। এখন আমার পিতাই না হয় আমাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করবেন। কথাটা তো জলের মতো পরিষ্কার। তুমি তো আর আমাকে জোর করে বিয়ে করতে চাওনি। আমি নিজেই আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি। তুমি একজন আত্মসমর্পিতা রমণীকে গ্রহণ করে ধন্য করেছ মাত্র। এতে নিশ্চয়ই তোমার কোনও ভয় থাকতে পারে না— অযাচতো ভয়ং নাস্তি দত্তাঞ্চ প্রতিগৃহ্নতঃ।

দেবযানী যযাতির সঙ্গে কথা শেষ করেই ধাত্রীকে পাঠালেন শুক্রাচার্যের কাছে। বললেন—তুমি শিগ্‌গির যাও। আমার পিতাকে নিয়ে এসো এখানে। তাঁকে কিন্তু এ কথাও জানিও যে, আমি নহুষপুত্র যযাতিকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছি—স্বয়ংবরে বৃতং শীঘ্রং নিবেদয় চ নাহুষম্। ধাত্রী গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত দেবযানীর মনমতো করেই শুক্রাচার্যকে জানাল। অসুরগুরু শুক্রাচার্যও সঙ্গে সঙ্গে এসে রাজা যযাতিকে দর্শন দিলেন। যযাতি শুক্রাচার্যের চরণ বন্দনা করে হাত জোড় করে অবনত শিরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেবযানী বললেন—পিতা! এই সেই রাজা, যিনি সেই মজা কুয়োর মধ্যে থেকে টেনে তুলবার সময় হাত ধরেছিলেন আমার—দুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ। আপনি আমাকে এঁর হাতেই সম্প্রদান করুন। কারণ, ওই রকম করে হাত ধরার পর আমি কোনও পুরুষকে আর স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারব না—নমস্তে দেহি মাম্ অস্মৈ লোকে নান্যং পতিং বৃণে।

আগেও আমরা দেখেছি—যেখানে যে কথাটি দরকার, সেটা খুবই সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে পারেন দেবযানী। বিবাহের সংজ্ঞা এবং সম্পূর্ণতা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন পাণিস্পর্শমাত্রেই বিবাহ সম্পূর্ণ হত। কোনওকালে পিতা কর্তৃক কন্যাসম্প্রদানের মাধ্যমেই বিবাহ সম্পূর্ণ হত। পরবর্তীকালে সপ্তপদীগমন না হলে বিবাহ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। সময়ের পরিণতিতে এমনও হয়েছে যে, বিয়ের দিন কন্যা-সম্প্রদান অথবা সপ্তপদীগমন—এসবের কোনও মূল্য হবে না, যদি কুশণ্ডিকা না হয়। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দেবযানীর সময়ে কোনও রমণীর হস্তস্পর্শের মূল্য ছিল সাংঘাতিক এবং শুধুমাত্র এই কারণ দেখিয়েই বৈবাহিক বিধির অলঙ্ঘনীয়তা প্রমাণ করা যেত। দেবযানীর বুদ্ধিমত্তাও এইখানেই যে, তিনি যযাতির পাণিগ্রহণের তাৎপর্য বিবাহের অনিবার্যতায় পরিণত করতে পেরেছেন।

www.amarboi.com

শুক্রাচার্য সব বুঝলেন। আগেই বলেছি—তিনি মহাজ্ঞানী ঋষি। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বিবাদের সময়েও তিনি দেবযানীর দোষের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। পরে অবশ্য কন্যার প্রতি স্নেহের মোহগ্রস্ততায় তাঁর কথাই মেনে নেন। এখানেও দেখছি, দুর্গত অবস্থায় রাজার হস্তাবলম্বন-দানের ঘটনার মধ্যে দেবযানী যখন বিবাহের ধর্মীয় তাৎপর্য আবিষ্কার করলেন, তখন শুক্রাচার্য খুব কায়দা করে বললেন—দেখ বাছা! ধর্ম এক জিনিস, আর ভালবাসা আরেক জিনিস। অর্থাৎ এই ব্যক্তির প্রতি তোমার ভালবাসা জন্মেছে, বেশ কথা। সেটাই বলো। এখানে আবার ধর্মের প্রলেপ লাগাতে চাইছ কেন? তর্ক করলে বলা যায়—তুমি কুয়োর মধ্যে পড়ে ছিলে, রাজা তোমায় দয়া করে বাঁচিয়েছেন। এখানে বিপৎত্রাণই ধর্ম। কিন্তু সেই হাত ধরার ব্যাপারটাকে তুমি যদি এখন তোমার ঈপ্সিত কাজে ব্যবহার করে রাজাকে ফাঁদে ফেল, সেটা মোটেই ধর্ম নয়। শুক্রাচার্য তাই খুব মিষ্টি করে দেবযানীর কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন—ধর্মের কথা আলাদা, প্রণয়ের কথা আলাদা, ও দুটোকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না, বাপু। তুমি তো আমার কাছে আগে কিছু বলোনি, আমার মতামতও চাওনি। তার আগেই তুমি রাজাকে বরণ করে বসে আছ—অন্যো ধর্মঃ প্রিয়স্ত্বন্যো বৃতস্তে নাহুষঃ পতিঃ।

শুক্রাচার্য মহারাজ যযাতিকে ধর্মবিষয়ে অন্যতম প্রমাণ বলে মনে করেন। পূর্বে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর বিবাদের সময়ে তিনি দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বৃষপর্বার সঙ্গে মর্ত্য রাজা যযাতিকেও সমান মূল্য দিয়েছিলেন। ফলে যযাতির সামনে তিনি দেবযানীর ধর্মধ্বজিতার মূল্য দিলেন না। ধর্মের বড়াইকে বাড়তে না দিয়ে তিনি বরং উলটে দেবযানীর পূর্ব তর্কযুক্তিতে জল ঢেলে দিলেন। দেবযানী তো মহারাজ যযাতিকে কোনও এক সুদূর ঋষিসম্বন্ধে একেবারে ঋষি অথবা ঋষিপুত্র বলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। যেন কচের কথা কিছুই খাটল না, কচের অভিশাপ মিথ্যে করে দিয়ে তিনি যেন ঋষিপুত্রকেই বরণ করে ফেলেছেন—এমনই এক সাহংকৃত ভাব ছিল দেবযানীর।

কিন্তু শুক্রাচার্য বেশ কায়দা করে বললেন—তা বাপু! নিজে দেখে শুনে যযাতিকে তুমি স্বামীত্বে বরণ করেছ, বেশ করেছ। তোমার তো বাপু কোনও ঋষি অথবা ঋষিপুত্রের সঙ্গে বিয়েও হবে না—একথা তো কচ আগেই বলে দিয়েছে—কচশাপাত্ত্বয়া পূর্বং নান্যদ্‌ভবিতুম্‌ অর্হতি। অর্থাৎ ঋষি, ঋষিপুত্রের বাহানা দেখিয়ে তুমি নিজেকে ভোলাতে পারো, কিন্তু আমাকে ভুলিও না। যযাতি পরিষ্কার এক ক্ষত্রিয় রাজা। তুমি তাঁকেই স্বামী হিসেবে বরণ করেছ। এ যাত্রায় আর ঋষি অথবা কোনও ঋষিপুত্র তোমার স্বামী হিসেবে দেখা দেবেন না। সোজা কথা হল, তুমি পছন্দ করেছ, বিয়ে করো; কিন্তু ধর্ম, ঋষিপুত্র—ওইসব ছেঁদো যুক্তি দিয়ে মহামতি শুক্রাচার্যকে যে কাবু করা যায় না, সেটা তিনি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবযানীর প্রতি স্নেহের যুক্তিটাও মেনে নিলেন। অর্থাৎ দেবযানীর প্রণয় যেমন ধর্মাধর্ম অতিক্রম করে উৎসারিত হয়েছে, তেমনই দেবযানীর প্রতি শুক্রাচার্যের স্নেহও ধর্মাধর্ম অতিক্রম করে স্বতই উৎসারিত হল। সাগ্রহে তিনি যযাতিকে বললেন—আমার পরম স্নেহের পাত্রী এই আমার কন্যা দেবযানী। সে তোমাকে স্বামীরূপে বরণ করেছে; আমিও সাগ্রহে এঁকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। তুমি তোমার মহিষী হিসেবে এঁকে গ্রহণ করো—গৃহাণেমাং ময়া দত্তাং মহিষীং নহুষাত্মজ।

আটত্রিশ

ভার্গব শুক্র দেবযানীকে ক্ষত্রিয় যযাতির হাতে সমর্পণ করতে চাইলে যযাতি সসংকোচে বললেন— আমার দিক থেকে কোনও অধর্মের আশঙ্কা নেই তো, মুনিবর? আমি যে এই জেনেশুনে বর্ণসংকর ঘটাচ্ছি, তাতে কি ভীষণ অন্যায় হয়ে যাবে না— অধর্মো ন স্পৃশেদেষ মহান্ মামিহ ভার্গব? শুক্রাচার্য অভয় দিয়ে বললেন—অধর্ম যদি ঘটেও তবে সে অধর্ম থেকে আমি তোমায় মুক্ত করব। শুক্রাচার্য জানতেন— তাঁর মেয়ে সমস্ত অহংকার সত্ত্বেও যদি কারও প্রতি অনুরাগিণী হয়ে থাকে, তবে তিনি এই রাজা যযাতি। দেবযানী যেমন, তাতে মর্ত্যভূমির এই রাজার থেকে ভাল পাত্র তাঁর জুটবে না। তাই রাজাকে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে বললেন— এই বিয়েতে বর্ণসংকর ঘটলেও তুমি বিষণ্ণ হয়ো না রাজা! আমি তোমার সমস্ত পাপ অপনোদন করব— অস্মিন্ বিবাহে মা গ্লাসীরহং পাপং নুদামি তে।

যদি বলেন— কোন এক্তিয়ারে শুক্রাচার্য বললেন কথাটা। তাঁর কি এত ক্ষমতা, তিনি শাস্ত্রযুক্তি উলটে দিতে পারেন? আমাদের তাহলে সেই পুরনো কথাটাই বলতে হয়— শক্তিমান, মর্যাদা-সম্পন্ন পুরুষ সব পারেন। তাঁদের জন্যই সমাজে নতুন ভাবনার আমদানি হয়। প্রাচীন শাস্ত্রযুক্তির এঁদো পুকুর থেকে সমাজ উঠে আসে নতুন আলোয়, নতুন সিন্ধুপারে। ভগবদ্গীতায় ভগবান নামে চিহ্নিত সেই পুরুষটি সাংঘাতিক একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ অর্জুন! বড় মানুষেরা যা করেন, সাধারণ লোকে তাই করে—যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ। বড় মানুষ যদি কোনও নতুন কাজ করে ফরমান জারি করে বলেন—এইটাই প্রমাণ, তবে লোকে সেটাই মেনে নেয়—স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।

ভগবদ্গীতায় প্রসঙ্গ ছিল অন্য এবং সেখানে বড় মানুষেরা সমাজ এবং শাস্ত্র-বিগর্হিত কাজগুলি যাতে না করেন, তারই নির্দেশ আছে। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা ঠিক, কারণ

সমাজ-সচল প্রথার বাইরে গিয়ে বড় মানুষেরা যা করবেন, সাধারণে তার অনুবর্তন করবেই। একই সঙ্গে এও ঠিক যে, বড় মানুষ বলেই, তাঁরা সমাজের ঊর্ধ্বে উঠে বৈপ্লবিক পথ দেখাতে পারেন। তা না হলে আমাদের দেশে বেদের পর উপনিষদ আসত না, বুদ্ধ-মহাবীর আসতেন না, চৈতন্যদেব আসতেন না— রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দও আসতেন না। এই যে শুক্রাচার্য বললেন— দেবযানী তোমাকে ভালবেসে নিজের পছন্দে বরণ করে নিয়েছে, তুমিও এর সাহচর্যে অপার আনন্দ অনুভব করো— এই কথাটার মধ্যেই বড় মানুষের প্রশ্রয় আছে। ভাবটা এই, হোক বর্ণসংকরের অধর্ম, সে আমি বুঝব; তোমার পাপ অপনোদন করব আমি— অহং পাপং নুদামি তে।

বস্তুত কেউ কারও পাপ অপনোদন করতে পারে না। কিন্তু তথাকথিত অন্যায়ী মানুষের পাশে যদি কোনও বড় মানুষ দাঁড়িয়ে যান, তবে তার অন্যায় লঘু হয়ে যায়। তথাকথিত পাপী এইরকম কোনও পারস্পরিক অনুরাগযুক্ত যুবক-যুবতীর পাশে দাঁড়িয়ে কোনও শুক্রাচার্য যদি পিতার ভূমিকা পালন করেন তবে সমাজ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও কিছু করতে পারে। শুক্রাচার্য সেখানে অভয় দেন— অধর্ম যদি কিছু হয়, তবে তা থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে আসার ভার আমার— অধর্মত্ত্বাং বিমুঞ্চামি শৃণু ত্বং বরমীপ্সিতম্।

শুক্রাচার্যের অনুমতিতে এবং সাহসে যযাতির হৃদয় কিছু শান্ত হল। কিন্তু এই সাহস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্য আরও একটি নির্দেশ দিলেন। তিনি দীর্ঘদর্শী ঋষি। তিনি জানেন—দেবযানী আপন ক্রোধে শর্মিষ্ঠাকে দাসী হিসেবে চেয়েছিলেন। তাও না হয় ঠিক ছিল। কিন্তু স্বামীর বাড়িতেও শর্মিষ্ঠাকে দাসী হিসেবে চরাতে নিয়ে যাবে— এই দম্ভ দেবযানীকে বিপন্ন করবে। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর থেকে কম সুন্দরী নন, তার ওপরে রাজার মেয়ে। রাজবাড়ির মর্যাদা এবং বিদগ্ধতা তাঁর শরীরে এবং মনে প্রধান আকর্ষণচিহ্নের মতো সতত আলম্বিত। ফলে রাজা যদি দেবযানীকে অতিক্রম করে শর্মিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, সেটা কিছুই আশ্চর্যের হবে না। দীর্ঘদর্শী শুক্রাচার্য তাই যযাতিকে একটু সাবধান করে বললেন— এই যে এই মেয়েটিকে দেখছ, এ হল দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে কুমারী শর্মিষ্ঠা— ইয়ঞ্চাপি কুমারী তে শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী। শর্মিষ্ঠাকে তুমি পূজনীয়ভাবে প্রতিপালন করবে। কিন্তু কখনও যেন তাঁকে আপন শয্যায় স্থান দিয়ো না— সম্পূজ্যা সততং রাজন মা চৈনাং শয়নে হ্বয়েঃ। কথাটা যযাতি শুনলেন, শর্মিষ্ঠাও শুনলেন।

সংস্কৃতে কথাটা যেভাবে আছে, সেটাকে সোজাসুজি বাংলা অনুবাদ না করলেও বোঝা যায় শুক্রাচার্য অত্যন্ত চাঁচাছোলা মানুষ। দেবযানীকে রাজা বিয়ে করলেও তাঁর কাছে যে শর্মিষ্ঠার আকর্ষণ যে কোনও সময় বেশি হয়ে উঠতে পারে— এই বাস্তব সত্যটা শুক্রাচার্য বোঝেন বলেই বড্ড কাটাকাটা কতগুলি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে যাই হোক, শুক্রাচার্যের উপস্থিতিতে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে মহারাজ যযাতির সঙ্গে শুক্রকন্যা দেবযানীর বিয়ে হয়ে গেল। সুন্দরী দেবযানীর সঙ্গে দুই হাজার দাসী আর বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানপুরে মহারাজ যযাতির রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

যযাতির রাজভবন দেবরাজ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত প্রাসাদের মতো— মহেন্দ্রপুরসন্নিভম্। বিশাল বিশাল মহালের পর রাজার অন্তঃপুর। যযাতি সেই অন্তঃপুরে দেবযানীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উপবেশন করালেন। সমস্যা হল—শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে। তাঁকে অন্তঃপুরে স্থান দিলে, তাঁর মর্যাদা বাড়ে বই কমে না। দেবযানী তাঁকে দাসীর মতো খাটালেও, অন্তঃপুরে থাকলে অন্তঃপুরচারিণী রাজমহিষীদের সঙ্গে তাঁর সমতা আসে। অতএব শর্মিষ্ঠাকে যদি রাজভবনের বাইরে কোথাও

একটা ঘর-টর তুলে থাকতে দেওয়া হয়, তবে তাঁর রাজমর্যাদা সামান্যও অবশিষ্ট থাকে না। এই পরিকল্পনাই দেবযানীর মনোমত হল। রাজা তখন রাজ্যোদ্যানের প্রান্তভাগে যে অশোকবন আছে, সেই বনের কাছে একটা নতুন বাড়ি তৈরি করে শর্মিষ্ঠাকে থাকতে দিলেন—অশোকবণিকাভ্যাসে গৃহং কৃত্বা ন্যবেশয়ৎ।

শর্মিষ্ঠার অসুবিধে কিছু রইল না। তাঁর জন্য বরাদ্দ এক হাজার দাসী তাঁরই সেবায় নিযুক্ত হল। মহারাজ যযাতি অন্ন, বস্ত্র পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা করে দিলেন শর্মিষ্ঠার জন্য। এই ব্যবস্থার মধ্যে শুধু কর্তব্যের শুষ্কতা ছিল না। কারণ, কবি টিপ্পনি কেটেছেন—সুসংকৃতাম্—অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, পানীয়ের আয়োজনে আদর ছিল যথেষ্ট— বাসোভিরন্নপানৈশ্চ সংবিভজ্য সুসংকৃতাম্। এই সাদর আয়োজন শুধু দেবযানীর দাসী বলেই শর্মিষ্ঠার লভ্য হল, নাকি সেই উদ্যানবাটিকার মধ্যে দাসীত্বের পিঞ্জরে বাঁধা কোনও এক রাজনন্দিনীর করুণ আনত দৃষ্টিই এর জন্য দায়ী— তার বিচার করতে পারে শুধু সহৃদয়ের হৃদয়।

সব ব্যবস্থা শেষ হলে মহারাজ যযাতির সঙ্গে দেবযানীর দাম্পত্য বিহার আরম্ভ হল। রসে-রমণে অনেক কাল কেটে গেল এবং দেবযানী একটি পুত্রও লাভ করলেন। অশোকবনে নির্জনে থাকা শর্মিষ্ঠার কাছে খবর গেল— দেবযানীর পুত্র হয়েছে। তাঁর মনটা ভারি খারাপ হল। তাঁকে যে এখন দিনরাত দেবযানীর ফাই-ফরমাশ খাটতে হচ্ছে, তাও নয়; দিনরাত যে তাঁর পা টিপে দিতে হচ্ছে, তাও নয়। অথচ রাজ-অন্তঃপুরের বাইরে, পুষ্পবনের নির্জন অন্তরালে শর্মিষ্ঠার এই বন্দি-দশা তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে। কোনও কাজ নেই, কর্ম নেই, কষ্ট নেই, সুখ নেই, কিছুই নেই। অথচ অশোকবনের প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর গোপন গতি আছে— শরৎ-বসন্তের সঙ্গে আকাশ বাতাস সেই গতিময়তার ইঙ্গিত বয়ে আনে শর্মিষ্ঠার অন্তরে। আর আছে শর্মিষ্ঠার শরীর। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই শরীর এমনই এক সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হল যে, বসন্তের জাগরণে অশোক ফুল ফুটলে সে শরীর বলে—আমিও পুষ্পবতী; বসন্তের মৃদু-মন্দ হাওয়ায় সে শরীর আপনি আন্দোলিত হয়, পুষ্পের অন্তর্গত রেণুকণায় শিহরণ জাগে। শর্মিষ্ঠা সম্পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হলেন— দদর্শ যৌবনং প্রাপ্তা ঋতুং সা চান্বচিন্তয়ৎ।

অশোকবণিকার অন্তর্গৃহে দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠা কেবলই মনে মনে আকুলিত হন, বিকুলিত হন। দেবযানীর ওপর তাঁর ঈর্ষা হয়। তাঁর বিয়ে, দাম্পত্যসুখ, পুত্রলাভ— সবই তাঁকে কাতর করে তোলে। দাসীত্বের শৃঙ্খলে তাঁর শরীর-যৌবন বাঁধা পড়েছে। তিনি মনে মনে শুধু মুক্তির উপায় খোঁজেন। কী করব, কী করেই বা সেই বাক্যের শৃঙ্খল অতিক্রম করে স্বামী-পুত্র লাভ করা যায়— এই ভাবনা শর্মিষ্ঠার কষ্ট বাড়িয়ে তুলল চতুর্গুণ— কিং প্রাপ্তং কিং নু কর্তব্যং কিং বা কৃত্বা কৃতং ভবেৎ।

চিন্তা করতে করতে মনের মধ্যে যে আকুলতা দেখা দেয়, সেই আকুলতাই যৌবনবতীর মনে সিদ্ধান্তের জন্ম দেয়। সিদ্ধান্ত তৈরি হয় মনের অনুকূলে। যৌবনবতী ভাবে— দাসী তো দাসী। সে তো একটা কথার জালে আটকা পড়েইছি। তাই বলে কি সব বৃথা। আমি কি মানুষ নই। কথা দিয়েছিলাম— দেবযানী যেখানে যাবে, সেখানেই যাব। তা বেশ তো, এসেছি কথা রেখেছি। কিন্তু এমন কথা তো বলিনি যে, বসন্তের ফুল ফুটলে দেখব না, বাতাস দিলে গায়ে মাখব না। আর এদিকে তাঁর স্বামী-সুখে, সংসার-সুখে ছেলে পর্যন্ত হয়ে গেল, আর আমার স্বামী নেই, সংসার নেই, জীবন-যৌবন, রূপ সব বৃথা গেল— দেবযানী প্রজাতাসৌ বৃথাহং প্রাপ্তযৌবনা।

এইসব যুক্তি-তর্ক থেকেই শর্মিষ্ঠার মনে সিদ্ধান্তের জন্ম। তিনি ভাবলেন— দেবযানী যদি নিজের স্বামী নিজে ঠিক করতে পারে, তবে আমিও বা নয় কেন। সে যেমন রাজা যযাতিকে

AMARBOI.COM

স্বামী হিসেবে বরণ করেছে, আমিও তাঁকেই স্বামী হিসেবে বরণ করব— যথা তয়া বৃতো ভর্তা তথৈবাহং বৃণোমি তে। আমি যদি তাঁর কাছে একটি পুত্র চাই তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে বিফল করবেন না— ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।

রাজার ব্যাপারে শর্মিষ্ঠা এত নিশ্চিত কেন, তা আমরা বুঝি। সেই উদ্যানবাটিকায় রাজা দেবযানীকে শুধু শর্মিষ্ঠার কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর শুধু কথা কেন, শর্মিষ্ঠাকে দেখা অবধি মহারাজ যযাতির মুগ্ধতা দেবযানীরও চক্ষু এড়ায়নি। সন্দিহান ছিলেন বলেই দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য যযাতিকে অত সাবধান করে দিয়েছেন— আপনি এঁকে পুজো করতেও পারেন মহারাজ! কিন্তু শয্যায় আহ্বান করবেন না যেন। তারপর এই যযাতির রাজপ্রাসাদে এসেও রাজা যেমন করে অশন-বসনের ব্যবস্থা করেছেন, তাতেও শর্মিষ্ঠার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, রাজা তাঁকে বিফল করবেন না নিশ্চয়— ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ। শর্মিষ্ঠার এখন শুধু একটাই চিন্তা— রাজা যদি কখনও একবার ওই নির্জন অশোকবনের দিকে আসেন, তবে শর্মিষ্ঠা তাঁর মনের কথা বলবেন— অপীদানীং স ধর্মাত্মা ইয়ান্মে দর্শনং রহঃ।

মহাভারতের কবি যুবক-যুবতীর ওপর সরল বিশ্বাসে মন্তব্য করেছেন—তারপর রাজাও একদিন নিজের রাজভবন থেকে বেরিয়ে ঈশ্বরেচ্ছায় ওই অশোকবনের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন— তস্মিন কালে যদৃচ্ছয়া। সোজা কথায় বলি,— ঈশ্বরেচ্ছা যতই বলবতী হোক, রাজার নিজের ইচ্ছে কিছু কম ছিল না। আমাদের দৃঢ় অনুমান— ওই একদিন নয়, ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি প্রায়ই আসতেন অশোকবনের বিজন প্রান্তে। মুগ্ধ হৃদয় জুড়াতে। কথা কিছুই হত না। কিন্তু বহু পূর্বে সেই উদ্যানবাটিকার মধ্যে দুই উদ্ভিন্ন হৃদয় যুবক-যুবতীর মধ্যে যে নির্বাক দৃষ্টিবিনিময় হয়েছিল, তাতে অশোকবনিকার প্রান্তভূমিতে একজন অপেক্ষা করে বসে থাকলে অন্যজন সেখানে দর্শন দিতে বাধ্য। তাছাড়া দেখা দিতে এলে দেখাটাও হয়ে যায় একই সঙ্গে। ধারণা করতে পারি— সেই নির্বাক দৃষ্টি কথনের দিন এখনও হয়তো শেষ হয়নি, কিন্তু আজকের দিনটা অন্যরকম। আজ শর্মিষ্ঠা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন— তিনি মনের কথা বলবেন, অতএব ঈশ্বরেচ্ছাতেই হোক অথবা স্বেচ্ছায় মহারাজ যযাতি অশোকবনের উপান্তে এসে উপস্থিত, যেখানে শর্মিষ্ঠা দুয়ার খুলে বসে আছেন আত্মদানের বাসনা নিয়ে।

AMARBOI.COM

যযাতি এসেছেন এবং একা এসেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সঙ্গে পাত্রমিত্র কেউ নেই। রাজাকে দেখে শর্মিষ্ঠা ধীর-মধুর হেসে এগিয়ে এলেন রাজার কাছে— হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে— প্রত্যুদ্‌গম্যাঞ্জলিং কৃত্বা শর্মিষ্ঠা চারুহাসিনী। শর্মিষ্ঠা বললেন— বলার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল— শর্মিষ্ঠা বললেন— ভগবান সোম বা ইন্দ্র, বিষ্ণু বা যমের গৃহে অবস্থানরতা একটি রমণীকে যেমন অন্য কোনও পুরুষ দেখতে পায় না, আপনার গৃহের সুরক্ষাও তেমনই— তব বা নাহুষ গৃহে কঃ স্ত্রিয়ং দ্রষ্টুমর্হতি? ভাবটা এই— এমন নির্জন স্থানে আমাকে রেখেছেন, মহারাজ! যেখানে কোনও পুরুষের সুদৃষ্টি কি কুদৃষ্টি, কোনওটাই আমার ওপর পড়েনি। আর ঠিক সেই কারণেই একটি স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা নিয়ে আপনার কাছে আমি যাচনা করতে পারি। যাচনা করতে পারি আমার স্ত্রীধর্ম রক্ষার জন্য।

শর্মিষ্ঠা পুষ্পবতী হয়েছেন। সেকালের দিনে পুষ্পবতী রমণী যথার্থ সময়ে পুত্রলাভের জন্য যে কোনও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গত হতে পারত। এই নিয়ম ছিল প্রায় ধর্মীয়। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মহাভারত পুরাণের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় রমণীর কাছে বহু পুত্রের জননী হওয়াটা ছিল প্রায় আদর্শের মতো হয়তো স্থানান্তর থেকে আর্য পুরুষদের সঙ্গে আসা স্ত্রীলোকের সংখ্যা নগণ্য ছিল এবং হয়তো যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে যেকোনও উপায়ে বীর পুত্র লাভ করাটা তাঁদের

কাছে পরম ইপ্সিত ছিল। বেদের মধ্যে আর্য-রমণীদের পুত্র-লাভের আকাঙ্ক্ষা বারবার শোনা গেছে। রমণীর কাছে বীরসূ, বীরমাতা বীরপ্রজা হওয়াটা যেমন গর্বের ছিল, তেমনই পুত্রজন্মের অর্থই ছিল পরম কল্যাণ— যদ্ বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রং, গৃহা ভদ্রং প্রজা ভদ্রম্।

হয়তো এই কল্যাণের মাহাত্ম্য থেকেই স্ত্রীলোকের দিক থেকে ঋতুকালমাত্রেই যে কোনও পুরুষের কাছে পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করাটা অস্বাভাবিক ছিল না। মহাভারত এবং পুরাণে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে রমণী ঋতুর পর্যায় সফল করার জন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করছে। ঋতুরক্ষার তাগিদটা যেহেতু প্রায় ধর্মীয় সংস্কারের মতো হয়ে গিয়েছিল, তাই একজন বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে এই সময়টাই ছিল অভীষ্টতম— পুরুষের সঙ্গে সঙ্গত হওয়ার প্রকৃষ্টতম উপায়। উপায় না বলে তাই এটাকে কৌশল বলাই ভাল, যদিও শর্মিষ্ঠার আমরণ দাসীত্বের নিরিখে শর্মিষ্ঠার দিক থেকে এটাকে আমরা সুযোগ নেওয়া বলব, কৌশল বলব না।

নির্জন স্থানে আপন অশোক-কুঞ্জে রাজাকে পেয়ে শর্মিষ্ঠা বললেন— আমার রূপ নিয়ে আপনার কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়, রাজা! আমার আভিজাত্য এবং চরিত্রও আপনার অজানা নয়— রূপাভিজন-শীলৈ র্হি ত্বং রাজন্ বেত্থ মাং সদা। আমার এখন ধর্মসঙ্কট উপস্থিত। আপনার কাছে আমার সানুনয় প্রার্থনা— আমি পুষ্পবতী, আপনি আমার ঋতুরক্ষা করুন।

যযাতির মনের মধ্য থেকে এতকালের জমে থাকা উচ্ছ্বাস এক মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল। যযাতি বললেন— তোমার সুন্দর স্বভাবের কথাও জানি, তোমার বংশ এবং মর্যাদার কথাও আমার যথেষ্ট জানা। আর রূপের কথা বলছ? তোমার গায়ে যদি একটা ছুঁচ বিঁধিয়ে ছুঁচের আগায় যদি এতটুকু সামান্য অংশ খুঁচিয়ে তুলে আনি, তবে সেই অংশটুকুকেও কোনওভাবে খারাপ বলা যাবে না, আলাদা করে তাকে সুন্দর বলতে হবে, তোমার রূপ এতটাই— রূপঞ্চ তেন পশ্যামি সূচ্যগ্রমপি নিন্দিতম্।

AMARBOI.COM

বোঝা যায়, শর্মিষ্ঠার রূপ এবং আভিজাত্য নিয়ে রাজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; রাজার চিন্তা অন্য জায়গায়। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি দেবযানীর কথা ভাবছেন। শর্মিষ্ঠার রূপ-গুণের প্রশংসা করতে করতেই রাজা বলে ফেললেন—সবই বুঝি, শর্মিষ্ঠা! কিন্তু দেবযানীকে বিয়ে করার সময় শুক্রাচার্য বলে দিয়েছিলেন— এই বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠাকে তুমি যেন কখনও তোমার শয্যাসঙ্গিনী কোরো না। এখন সেই কথার কী করব?

শর্মিষ্ঠা রাজার মুখে নিজের রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা শুনে বুঝলেন—রাজার অর্ধেক হৃদয় তিনি পেয়েই গেছেন। তাঁর সামনে বড় বাধা ওই শুক্রাচার্যের একখানি কথা। শর্মিষ্ঠা ভরসা পেয়ে শাস্ত্রবিধি ছেড়ে লোকাচারের বিধি আঁকড়ে ধরলেন। কারণ নীতিশাস্ত্রে বলে— শাস্ত্রবাক্যে কুশল হওয়া সত্ত্বেও যে লোকাচার জানে না, সে মূর্খ। শর্মিষ্ঠা বললেন— আপনি এখনও সেই কথা চিন্তা করছেন, মহারাজ! কেন, লোকে ঠাট্টা করার সময়ও তো মিথ্যা-কথা বলে, সে মিথ্যায় পাপ নেই। পছন্দসই রমণীর রূপ-গুণের প্রশংসা করেন পঞ্চমুখে, কতবার বলেন— ভালবাসি। তার মধ্যেও মিথ্যে কথা থাকে। বিয়ের সময় তো লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না, তার মধ্যেও মিথ্যে থাকে। তাছাড়া ধরুন, নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হল, অথবা বাড়িতে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তখন যদি মিথ্যে বললে কাজ হয়, তো সবাই মিথ্যেই বলে। আসলে মহারাজ! পাঁচটা জায়গা। পাঁচ জায়গায় মিথ্যে বললে দোষ নেই কোনও। পরিহাস, প্রেম, বিয়ে আর সর্বনাশ অথবা প্রাণসংশয় উপস্থিত হলে লোকে যে মিথ্যে কথা বলে তাতে কোনও পাপ লাগে না—পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি।

যযাতির গলার স্বর নিচু হল। বললেন—আমি রাজা বটে। রাজারা যা করবেন, প্রজাদের কাছে সেইটাই উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে। আজকে আমি যদি এই কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিই, তবে আমার প্রজারাও কাল থেকে মিথ্যার দোষ বুঝবে না। তাই বলছিলাম—মিথ্যে কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না আমার পক্ষে।

শর্মিষ্ঠা এবার মোক্ষম যুক্তি দিলেন। রাজার পছন্দ এবং সংশয়ের অনেক ওপরে সেই যুক্তি। শর্মিষ্ঠা বললেন— নিজের স্বামী এবং সখীর স্বামী— দু'জনেই সমান। দুই সখীর বিয়েও সমান। অতএব আমার সখী যাঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছে, আমিও তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে পারি— সমং বিবাহমিত্যাহুঃ সখ্যা মে'সি বৃতঃ পতিঃ।

শর্মিষ্ঠার এই কথাটার মধ্যে একটু বুঝে নেবার ব্যাপার আছে সখীর স্বামীই আমার স্বামী— এমন যুক্তি অর্থের সংশয় ঘটায়। এমনটি হলে যে কোনও রমণীর স্বামী, তাঁর বন্ধু বা সখীর স্বামী বলে পরিগণিত হতে পারতেন। আসল কথাটা অন্য জায়গায়। শর্মিষ্ঠা নিজেকে দেবযানীর দাসী বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন না। দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার মধ্যে যখন ভাব-ভালবাসা ছিল, তখন এঁরা পরস্পরের সখীই ছিলেন। এমনকি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর যখন চরম ঝগড়া হয়ে গেছে, তখনও কিন্তু রাজার কাছে পরিচয় দেবার সময় দেবযানী বলেছিলেন— এ আমার সখীও বটে, দাসীও বটে— ইয়ঞ্চ মে সখী দাসী। তাছাড়া দেবযানী যখন দুই হাজার দাসীর সঙ্গে সেই উদ্যানবাটিকায় ক্রীড়া-বিনোদন করছিলেন, তখন কিন্তু দাসীদের সখী বলেই অভিহিত করেছেন কবি— তাভিঃ সখীভিঃ সহিতা সর্বাভির্মুদিতা ভৃশম্।

amarboi.com

এই কথাগুলি থেকে পরিষ্কারভাবে শর্মিষ্ঠার যুক্তি ব্যাখ্যা করা যায়। সখী বলতে শর্মিষ্ঠা দাসীই বুঝিয়েছেন। তখনকার দিনে রাজারাজড়ার বিয়ের সময় বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে যে দাসী বা দাসীরা আসতেন, তাঁরাও বিবাহিতা স্ত্রীর মতোই ভোগ্যা হতেন। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব— ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর মাতা অম্বিকা এবং অম্বালিকার দাসীর গর্ভে ব্যাসের ঔরসে বিদুরের জন্ম। আবার গান্ধারীর সঙ্গে যে দাসী এসেছিলেন গান্ধারের রাজবাড়ি থেকে তিনিও ধৃতরাষ্ট্রের ভোগ্যা ছিলেন। সেই দাসীর গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম।

ব্যাপারটা এই নিরিখে দেখলে বোঝা যাবে যে, সখীর স্বামী আর দাসীর স্বামী একই হতেন। দাসীরা যেহেতু নিজেরা বিবাহ করার অধিকার বা সুবিধা কোনওটাই পেতেন না, কাজেই দাসীদের যৌবন সফল করতে হত তাঁদের মালিকানীর স্বামীদের মাধ্যমেই। মালিকানীরাও এতে আপত্তির কিছু দেখতেন না, বরং স্বামীরা অতিরিক্ত ভোগপরায়ণ হলে,এই ব্যবস্থায় মালিকানীদের সুবিধেই হত। দেবযানীর ব্যাপারটা আলাদা। তিনি শর্মিষ্ঠার ওপর এতটাই রেগে ছিলেন যে কোনওভাবে শর্মিষ্ঠার সুখ হোক, এ তিনি চাইতেন না। উপরন্তু দাসীদের যেহেতু রাজভার্যাত্ব স্বীকৃত সত্য ছিল, অতএব জেনেবুঝেই শুক্রাচার্য যযাতিকে শর্মিষ্ঠার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আজকে শর্মিষ্ঠা রাজার বিবাহিতা পত্নী এবং পত্নীর দাসীর মধ্যে সমতার যুক্তি এনে যযাতিকে একেবারে বিচলিত করে দিলেন। বিচলিত না বলে বিগলিতই বলা উচিত। কেননা যযাতি বললেন— যে প্রার্থনা করছে, তাকেই দান করব— এ হল আমার ব্রত। তুমি আমার সঙ্গ কামনা করছ, সেটা কীভাবে সম্ভব তুমিই বলো— তঞ্চ যাচসি মাং কামং ব্রূহি কিং করবাণি তে।

উনচল্লিশ

মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার আশা পূরণ করার জন্য সেই মুহূর্তে মনে মনে দেবযানীকে অতিক্রম করলেন। অতিক্রম করার কারণও ছিল। যযাতির হৃদয় সামান্য বিগলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শর্মিষ্ঠা নিজের দাসীত্বের যন্ত্রণাটুকু বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। শর্মিষ্ঠা বলেছিলেন মহারাজ! আপনি তো জানেন—দাস-দাসী, পুত্র এবং স্ত্রীলোক—এরা নিজের চেষ্টায় যে অর্থ উপার্জন করে, সেই অর্থ পর্যন্ত তার নিজের নয়, সে অর্থও তার মালিকের—ত্রয় এবাধনা রাজন্ ভার্যা দাসস্তথা সুতঃ।

শর্মিষ্ঠার হাহাকারে সেকালের স্ত্রীলোক এবং ক্রীতদাসের করুণ অবস্থাটা বোঝা যায়। বোঝা যায়, এই যুগে স্ত্রীলোক এবং ক্রীতদাসের কোনও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। পুত্র-সন্তানেরা যে অর্থ উপার্জন করত, সে অর্থেরও মালিক হতেন তাঁর পিতা, ঠিক যেমন একটি স্ত্রীর উপার্জন চলে যেত তার স্বামীর হাতে এবং ক্রীতদাসের উপার্জন তার প্রভুর হাতে। শর্মিষ্ঠা বললেন—আমি তো দেবযানীর দাসী আর অন্যদিকে দেবযানী হলেন আপনার অধীনা। কাজেই মহারাজ! দেবযানী যেমন আপনার ভোগ্যা, তেমনই তাঁর দাসীও আপনারই ভোগ্যা—সা চাহঞ্চ ত্বয়া রাজন্ ভজনীয়াং ভজস্ব মাম্।

শর্মিষ্ঠার কথা মহারাজ যযাতির কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল। যযাতি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মিলিত হলেন। মনে মনে এই মিলন তাঁর কাম্য ছিল। হয়তো যেদিন তিনি শর্মিষ্ঠাকে দেখেছিলেন, সেদিন থেকেই এই মিলন তাঁর কাম্য ছিল। দেবযানী এবং শুক্রাচার্যের সাবধান-বাণীতে এতদিন যে মিলন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছিল, আজ শর্মিষ্ঠার যুক্তিতে এবং যযাতির মনের অনুকূলতায় সেই মিলন বাঁধভাঙা নদীর মতো আছড়ে পড়ল অশোক-বনের উপান্ত-শয্যায়। মিলন সম্পূর্ণ হলে দুজনেই পরস্পরকে সানন্দে কৃতজ্ঞতা জানালেন, তারপর যে যেখানে ছিলেন চলে

গেলেন সেইখানে—অন্যোন্যঞ্চাভিসম্পূজ্য জগ্মতুস্তৌ যথাগতম্।

শর্মিষ্ঠা চারুহাসিনী যযাতির ঔরসে প্রথম পুত্র লাভ করলেন যথাসময়ে এবং তৎক্ষণাৎ সে খবর দেবযানীর কাছে পৌঁছল। স্বামী-সুখে, পুত্রসুখে যার কথা প্রায় খেয়ালই ছিল না, দেবযানী সেই শর্মিষ্ঠার ক্ষুদ্র গৃহে নেমে এলেন সশঙ্কিত চিত্তে, নিজের গরজে চলে এলেন; এলেনও বড় তাড়াহুড়ো করে। ঘরে ঢুকেই তাঁর প্রশ্ন—এ সব কী শুনছি পাপের কথা, শরীর পুড়ছে বুঝি? কার সঙ্গে রঙ্গ করে এই পাপ জোটালি কোথা থেকে—কিমিদং বৃজিনং সুভ্রু কৃতং বৈ কামলুব্ধয়া।

শর্মিষ্ঠা বললেন— কিসের পাপ! এক ধার্মিক বেদজ্ঞ ঋষি এসেছিলেন আমার কাছে। তিনি বর দিতে চাইলে আমি তাঁর সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করি। সেই ঋষি-ঔরসেই আমার এই পুত্রের জন্ম। এর মধ্যে কাম-চরিতার্থতারই বা কী আছে, অন্যায়ই বা কী আছে?

শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে তাঁর কথাই ফিরিয়ে দিয়েছেন। দেবযানীই একসময় নিজের বিয়ের স্বার্থে মহারাজ যযাতিকে ঋষি অথবা ঋষিপুত্র প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন। পিতা বৃষপর্বার সেই উদ্যানবাটিকার মধ্যে দেবযানী এবং যযাতির সম্পূর্ণ কথোপকথনের সাক্ষী ছিলেন নির্বাক শর্মিষ্ঠা। আজকে সুযোগ পেয়ে সেই কথাটাই তিনি অন্যভাবে শুনিয়ে দিলেন দেবযানীকে। কোনও মিথ্যা নেই এর মধ্যে—তুমি যাঁকে ঋষি ভেবেছ আমিও তাঁকে ঋষি ভেবেছি—এই বিচার।

শর্মিষ্ঠার কথা শুনে দেবযানী বললেন—তা বেশ, তা বেশ—শোভনং ভীরু যদ্যেবম্—যদি এইরকমই হয়ে থাকে, তাহলে কিছুই বলার নেই আমার। তবে কিনা ব্রাহ্মণ-ঋষির কথা বলছিস, তা তাঁর নাম, গোত্র, বংশের কথা বল না একটু, যদি চিনতে পারি। শর্মিষ্ঠা সলজ্জে বললেন—তখন কি আর ওই সব কথা মনে থাকে নাকি? কী তাঁর সূয্যিপানা চেহারা। কী তাঁর তেজ। অমন তেজি পুরুষ দেখে নাম, গোত্র—ওসব সাধারণ কথা আর জিজ্ঞাসা করার শক্তি হল না আমার—তং দৃষ্ট্বা মম সংপ্রষ্টুং শক্তি র্নাসীচ্ছুচিস্মিতে।

WWW.AMARBOI.COM

দেবযানী বললেন—যাগ্ যে যাক, সে ঠিক আছে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে কথা। তুই যদি একজন ব্রাহ্মণ ঋষির কাছ থেকে সন্তান লাভ করে থাকিস, তাহলে জেনে রাখিস—কোনও রাগ নেই আমার—ন মন্যুর্বিদ্যতে মম।

অনেক দিন পর দেবযানীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার দেখা হল। রাগ নিয়ে এসেছিলেন দেবযানী, রাগও গলে জল হয়ে গেল। এতদিন পর দেখা, দুজনে পূর্বসখিত্ব ফিরে পেলেন যেন। আলাপে, হাসিতে ঠাট্টায় বেশ খানিকক্ষণ কেটেও গেল—অন্যোন্যমেবকত্বা তু সম্প্রহস্য চ তে মিথঃ। দেবযানী শর্মিষ্ঠার কথা সত্য মনে করেই চলে গেলেন, কথাটার দ্ব্যর্থচিন্তা তাঁর মনেও এল না।

তারপর বহুদিন চলে গেছে। বহু দিন। শর্মিষ্ঠার কথা দেবযানীর খেয়ালও হয়নি। এর মধ্যে দেবযানীর আরও একটি পুত্রও হয়ে গেছে। তাঁর বড় ছেলের নাম যদু, ছোট ছেলের নাম তুর্বসু। সেদিন দেবযানী ছেলেদের বাড়িতে রেখে বেড়াতে বেরিয়েছেন রাজার সঙ্গে। কর্মক্লান্ত রাজার আজ সময় হয়েছে। দেবযানীর ইচ্ছে হল রাজার সঙ্গে নিভৃতে বিশ্রম্ভালাপ করবেন। ঘুরতে ঘুরতে সেই অশোকবনের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন দেবযানী। জায়গাটা এমনিতে নির্জন; অশোকবনিকার প্রান্তদেশে শর্মিষ্ঠার বাড়ি। বনের পথ ধরে একটু এগোতেই দেবযানী দেখলেন—তিনটি অল্পবয়সী বালক পরস্পর খেলা করছে। তাদের চেহারা ভারি মিষ্টি এবং

তারা যেভাবে খেলা করছে, তাতে একবারও মনে হচ্ছে না যে, তারা এই জায়গায় অন্য সময় খেলে না। রাজোদ্যানের এই প্রান্তে বালকদের এই একান্ত বিশ্বস্ত এবং অভ্যস্ত খেলাধুলো দেবযানীকে একটু অবাকই করে দিল।

দেবযানী পাশে দাঁড়ানো যযাতিকে বললেন—কী সুন্দর দেখতে ছেলেগুলো? দেখ দেখ, কেমন দেবতার মতো সুন্দর! আচ্ছা, এরা কার ছেলে? মুখগুলো তো দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমার মুখ বসানো—বর্চসা রূপতশ্চৈব সদৃশা মে মতাস্তব। দেবযানী যযাতিকে কোনও কথা বলতে দিলেন না, কথা শুনতেও চাইলেন না। তিনি সোজাসুজি খেলায় মেতে ওঠা ছেলেগুলিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাছারা! তোমাদের বাবার নাম কী? কোন বংশেই বা তোমাদের জন্ম? ছেলেরা তর্জনী তুলে নিশ্চুপে দাঁড়ানো যযাতির দিকে প্রথমে দেখিয়ে দিল। বলল—এই আমাদের বাবা। তারপর দূরে দাঁড়ানো শর্মিষ্ঠার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে ছেলেরা বলল—আর ওই হল আমাদের মা।

চরম অস্বস্তি নিয়ে যযাতি দাঁড়িয়ে রইলেন এবং সেই অস্বস্তি দ্বিগুণ করে দিয়ে শর্মিষ্ঠার ছেলেরা সবাই মিলে তাদের পিতা যযাতিকে জড়িয়ে ধরতে চাইল—রাজানমুপচক্রমুঃ। দেবযানীর সামনে শর্মিষ্ঠার ছেলেরা তাঁকে এতই বিপদে ফেলল এবং এই বিপদ আরও বাড়বে—এই আশঙ্কায় যযাতি আর শর্মিষ্ঠার ছেলেদের তেমন আমল দিলেন না—নাভ্যনন্দত তান্ রাজা দেবযান্যাস্তদান্তিকে। প্রত্যালিঙ্গন তো করলেনই না, উপরন্তু ভাব দেখালেন যেন এই ছেলেগুলি তাঁর ছেলেই নয়। শর্মিষ্ঠার পুত্রেরা পিতার কাছে কখনও এই ব্যবহার পায়নি। পিতার আকস্মিক এই পরিবর্তন দেখে ছেলেরা কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার কাছে গেল। ছেলেদের কান্না শুনে রাজারও মন খারাপ হল, একটু লজ্জাও হল—সব্রীড় ইব পার্থিবঃ।

দেবযানী ক্ষণিকের মধ্যেই বুঝে গেলেন—অনেক নাটক হয়ে গেছে অশোক বনের অন্তরালে। একটি নয়, দুটি নয় শর্মিষ্ঠা যযাতির ঔরসে অন্তত তিনটি পুত্র লাভ করেছেন। দেবযানী ক্রোধে অধীর হয়ে শর্মিষ্ঠাকে বললেন—তুই আমারই অধীনে দাসীর কাজ করে আমারই সর্বনাশ করছিস। আমাকে কি তোর ভয় নেই একটুও? অবশ্য অন্যায় করতে তোর ভয় হবে কী করে? তুই অসুরঘরের মেয়ে। এখনও তোর অসুরের স্বভাব যায়নি—তমেবাসুরধর্মং ত্বমাস্থিতা ন বিভেষি মে।

গালাগালি খেয়েও শর্মিষ্ঠা খুব বেশি অপ্রস্তুত হলেন না। তিনি বুঝলেন— যে কোনও সময় দেবযানীর মুখোমুখি দাঁড়াতেই হত। কেননা, যদি শুধু ঋতুরক্ষার ধর্মেই ঘটনাটা শেষ হত, তাহলে শর্মিষ্ঠার প্রথম পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রাজসংসর্গের অবসান ঘটত। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—রাজা শর্মিষ্ঠাকে ভালবাসতেন এবং শর্মিষ্ঠাও রাজাকে ভালবাসতেন ততোধিক। উপরন্তু দেবযানীর সদাজাগ্রত রক্তচক্ষুর অন্তরালে যযাতি এবং শর্মিষ্ঠার এই যে 'চৌর্যমিলন' আরম্ভ হয়েছিল, তার সুখ এবং আনন্দ যে দেবযানীর শুদ্ধ দাম্পত্যের দৈনন্দিনতার চেয়ে অনেক অনেক বেশি, তার প্রমাণ দিয়ে রেখেছেন আলঙ্কারিকেরা। অশোকবনিকার কুঞ্জভবনে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে 'চৌর্যসুরত-ব্যাপার-লীলাবিধি'র ব্রত-নিয়ম পালন করে যযাতি ইতিমধ্যে তিনটি সন্তানের জনক হয়েছেন। দ্রুহ্যু, অনু এবং কনিষ্ঠ পুরু—শর্মিষ্ঠার গর্ভে এই তিন পুত্র। তারা কেউই এখন আর খুব ছেলেমানুষও নয়, প্রায় যুবক। প্রিয় পুত্রদের জনক কে—এ কথা আসবেই এবং সে প্রশ্ন অবধারিতভাবে দেবযানীর কাছ থেকেই আসবে— এ কথা শর্মিষ্ঠা জানতেন বলেই আজ তিনি স্পষ্টতই দেবযানীর মুখোমুখি হতে চাইলেন।

amarboi.com

শর্মিষ্ঠা বললেন—আমি যে সেই 'ঋষি'র কথা বলেছিলাম, সেটা তো ঠিকই আছে, আমি তো তাঁকে ঋষিই মনে করি—যদুক্তং ঋষিরিত্যেব তৎ সত্যং চারুহাসিনি। যযাতির সম্বন্ধে দেবযানীর পূর্বকল্পিত সেই ঋষি-সম্ভ্রম শর্মিষ্ঠা আবারও ফিরিয়ে দিলেন। শর্মিষ্ঠা আরও বললেন—তোমাকে আমার অত ভয় পাবার কীই বা আছে বল? আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। ধর্ম থেকেও চ্যুত হইনি একটুও। কারণ, আমার দাসীত্বের নিরিখে এটাই আমার ধর্ম। আমার মালিকানীর স্বামী, আমারও স্বামী। তুমি আমার পূজনীয়, মাননীয় যাই হও, কিন্তু স্বামী হিসেবে রাজর্ষি যযাতি যে আমার কাছে তোমার থেকেও পূজনীয়, সেটা কি তুমি জান না—ত্বত্তোঽপি মে পূজ্যতমো রাজর্ষিঃ কিং ন বেত্থ তৎ?

দেবযানী বুঝলেন—শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আর একটি কথাও বলে লাভ নেই। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল যযাতির ওপর। আর রাগ হলে তাঁর একটাই কথা—আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না, ঠিক যেমন পূর্বে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার সময়েও তিনি পিতা শুক্রাচার্যকে একই কথা বলেছিলেন—এই নগরে আর থাকব না। দেবযানী যযাতিকে বললেন—মহারাজ! আপনি যা করেছেন তা আমার ভীষণ ভীষণ অপছন্দ, আজ থেকে আর আমি এখানে থাকব না—রাজন্ নাদ্যেহ বৎস্যামি বিপ্রিয়ং মে কৃতং ত্বয়া।

কথাটা বলেই দেবযানী সেখান থেকে উঠে পড়লেন। দেবযানীর সুন্দর মুখমণ্ডল এক লহমায় যেন কালি হয়ে গেল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা। তিনি শুক্রাচার্যের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বেগতিক দেখে উদ্বিগ্ন ভয়াকুল রাজা দেবযানীকে বোঝাতে বোঝাতে তাঁর পিছন পিছন চললেন। কিন্তু দেবযানী রাজার মধুর সান্ত্বনাবাক্যে একটুও বিগলিত হলেন না, ফিরেও এলেন না।

দেবযানী আগে এবং যযাতি পরে এসে উপস্থিত হলেন শুক্রাচার্যের সামনে। প্রণাম, অভিবাদন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবযানী নালিশ জানালেন পিতার কাছে—আজ অধর্ম ধর্মকে দূরে ঠেলে ফেলেছে, পিতা! নীচ উঠে এসেছে ওপরে। বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা আজ আমাকে অতিক্রম করেছে। দেবযানী শর্মিষ্ঠার কথা বেশি বললেন না। কারণ, দোষ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে। তিনি যযাতিকে দেখিয়ে বললেন—ইনি শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন, আর আমি দুর্ভাগা, আমার গর্ভে দুটি। লোকে মহারাজ যযাতিকে ধর্মজ্ঞ বলে সম্মান করে। আর এই তাঁর ধর্মের নমুনা। আমার মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন এই রাজা—অতিক্রান্তশ্চ মর্যাদাং কাব্যৈতৎ কথয়ামি তে।

দেবযানীর কথার সারমর্ম—তাঁর গর্ভে দুটি পুত্র, আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিনটি পুত্র। আর দ্বিতীয় অনুযোগ—দেবযানীর সম্মান অতিক্রম। মজা হল—এই অনুযোগ যদি তিনি রাজার কাছে সোজাসুজি করতেন, তবে রাজার পক্ষে দুটির জায়গায় পাঁচটি সন্তান দিতেও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু গোলমালটা নিশ্চয়ই এখানে নয়, আরও গভীরে। দেবযানীর সেই সাহংকৃত বোধ— আমাকে অতিক্রম করা চলবে না। মহাভারতের টীকাকার আসল কথাটা ধরে দেবযানীর মনের ভাবটুকু বলে দিয়েছেন। দেবযানীর ভাব—আমি হলাম গিয়ে ব্রাহ্মণ ঋষি শুক্রাচার্যের মেয়ে। সেই বামুনের মেয়েকে অতিক্রম করে অসুরের মেয়ে শর্মিষ্ঠার ওপর এতটাই রাজার দরদ যে তার গর্ভে তৃতীয় একটি পুত্রের জনক হতেও তাঁর বাধেনি—ব্রাহ্মণদুহিতুঃ প্রাধান্যে কর্তব্যে অসুরদুহিতুঃ প্রাধান্যকরণান্-মর্যাদামতিক্রান্তঃ। অর্থাৎ দেবযানীর শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সমতাও নয়, তাঁর চেয়ে অধিক প্রাধান্য চাই।

AMARBOI.COM

অসুরদুহিতা শর্মিষ্ঠার ওপর শুধু দরদ কেন, ভালবাসাও যে রাজার বেশি ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য। দিনের পর দিন দেবযানীর সম্মান এবং মর্যাদা সামলাতে সামলাতে রাজা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজ যযাতি যতই রাজার আধিপত্যে থাকুন, প্রথম থেকেই তিনি এই উচ্চবর্ণের ঋষিকন্যাটিকে ঘরে আনতে কুণ্ঠিত ছিলেন। তাও যদি বা দেবযানীর সাময়িক চাটুবাক্যে ভুলে তিনি বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজার ঘরে এসে ইস্তক দেবযানী কখনই ভুলতে পারেননি যে, তিনি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের মেয়ে। দিন-রাত এই ব্রাহ্মণ্যের মূল্য দিতে দিতে মহারাজ যযাতি রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অশোকবনের প্রান্তে, শর্মিষ্ঠার কাছে।

প্রথম দর্শনেই যাঁকে ভাল লেগেছিল, সেই শর্মিষ্ঠার কাছে তিনি মনের মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলত শর্মিষ্ঠার সঙ্গ তাঁর কাছে দিন দিন কাম্য থেকে কাম্যতর হচ্ছিল। একাদিক্রমে তিনটি পুত্রের জন্ম শর্মিষ্ঠার সঙ্গে রাজার অধিক ঘনিষ্ঠতাই প্রমাণ করে। ভালবাসা তো আর বংশ-কুল মেনে হয় না, আর তাই অসুরকন্যার সম্ভ্রমে, লালনে শুশ্রূষায় যযাতির ভালবাসা পুষ্টিলাভ করেছিল। এই ভালবাসার কথা মহাভারতের কবি অতি স্পষ্ট করে স্বকণ্ঠে না বললেও পরবর্তী কালের মহাকবিদের তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কালিদাসের মতো ঋষি মহর্ষি কণ্বের মুখ দিয়ে শকুন্তলার প্রতি আশীর্বাদজ্ঞাপন করেছেন— যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব—তুমি তোমার স্বামীর কাছে এতটাই প্রার্থনীয়া হও, যেমনটি শর্মিষ্ঠা ছিলেন যযাতির কাছে।

দেবযানীর কাছে এই ভালবাসার মূল্য নেই। তিনি তাঁর ব্রাহ্মণ্যে উৎসিক্ত হৃদয় দিয়ে ব্রাহ্মণ পিতার কাছে যযাতির বিচার চাইলেন, মর্যাদা অতিক্রমের বিচার। বিচার পেলেন। শুক্রাচার্য কার্যাকার্য বিবেচনা না করে, কন্যার ওপর সমস্ত প্রশ্রয় ঢেলে দিয়ে যযাতিকে অভিশাপ দিলেন—তুমি ধর্মজ্ঞ হয়েও যে অধর্ম করেছ, তার ফলে বার্ধক্যের চিহ্ন জরা বিস্তার লাভ করবে তোমার সমস্ত শরীরে—তস্মাজ্জরা ত্বামচিরাদ্ধর্ষয়িষ্যতি দুর্জয়া। যযাতি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন শুক্রাচার্যকে। শর্মিষ্ঠার ঋতুকাল, তাঁর পুত্রকামনা, তাঁর দাসীত্ব, এবং সর্বোপরি যাচকের প্রতি করুণার ধর্ম—সব এক এক করে বোঝানোর চেষ্টা করেও বিফল হলেন যযাতি। শুক্রাচার্যের মতে যযাতি ধর্মের নামে যেমন যুক্তি দেখাচ্ছেন, সে সব আসলে চালাকি ছাড়া কিছুই নয় এবং এই চালাকির সঙ্গে তুলনা হয় শুধু চুরি করার অপরাধের—মিথ্যাচারস্য ধর্মেষু চৌর্যং ভবতি নাহুষ।

যযাতির কোনও যুক্তি শুক্রাচার্যের কাছে টিকল না। শুক্রের অভিশাপে তৎক্ষণাৎ জরা তাঁর অকাল-বার্ধক্য বয়ে নিয়ে এল। যযাতি দেখলেন—নিজের নয়, নিজের স্বার্থ নয়, একমাত্র দেবযানীর স্বার্থের কথা বললেই শুক্রাচার্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি হতে পারে। যযাতি শুক্রাচার্যকে বললেন—মুনিবর। আপনার কন্যা দেবযানীর সঙ্গে সম্ভোগ সুখের বাসনা এখনও শেষ হয়নি আমার। আপনি অনুগ্রহ করুন, যাতে এই সাঙ্ঘাতিক জরা আমার শরীরে প্রকট না হয়। শুক্রাচার্য বললেন—জরা তোমার শরীরে আসবেই। তবে একটাই সুযোগ আছে—তুমি তোমার জরা অন্যের শরীরে সংক্রমণ করতে পারবে।

যযাতি বললেন—তাহলে এমন হয় না মুনিবর। যে পুত্র আমাকে আমার যৌবন ফিরিয়ে দেবে, পুণ্যবান, কীর্তিমান আমার সেই পুত্রই ভবিষ্যতে লাভ করবে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকার। আপনি অনুমতি দিন। শুক্রাচার্য স্বীকার করে নিলেন রাজার প্রার্থনা। বস্তুত

AMARBOI.COM

রাজার এই প্রার্থনার মধ্যেই যযাতির রাজনৈতিক পরিশীলন লুকিয়ে ছিল। এতদিনে তিনি তাঁর সব পুত্রকেই ভালভাবে চিনেছেন। তাঁদের ভাব-সাব, মতি-গতি—সব কিছুর ব্যাপারেই তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। দেবযানীর স্বার্থ চিন্তা করে শুক্রাচার্য তাঁর জামাতাকে জরা-সংক্রমণের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু রাজা আপন যৌবন ফিরে পাবার 'উপকার' যে পুত্রের কাছে পাবেন, তাঁকেই রাজ্যের উত্তরাধিকার দিয়ে প্রত্যুপকার করতে চান রাজা। এখন পরে যদি প্রশ্ন আসে—তুমি দেবযানীর পুত্রদের কাউকে রাজ্য দাওনি কেন? যযাতি সেই প্রশ্নের মীমাংসার ভার নিজের হাতেই রেখে দিলেন। যে তাঁর জরা গ্রহণে সম্মত হবে, রাজা তাঁকেই রাজ্য দেবেন। শুক্রাচার্যের সম্মতি সেখানে আগে থেকেই জানা রইল।

যযাতি শুক্রাচার্যের কাছে বিদায় নিয়ে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজধানীতে ফিরে এলেন অকাল-বার্ধক্য নিয়ে। স্বামীর ওপর রাগে দেবযানী যযাতির যে ক্ষতিটুকু করলেন, তাতে যে তাঁর নিজেরই বেশি ক্ষতি হল—সেই চেতনা তাঁর ছিল না। দেবযানী ফিরলেন এক পক্ককেশ শিথিলচর্ম বৃদ্ধ যযাতির সঙ্গে। বৃষপর্বার রাজোদ্যানের কূপগর্ত থেকে যে রমণীকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন, সেই রমণী বাস্তবে অগ্নিপুঞ্জ ছাড়া কিছুই নয়। যযাতি পতঙ্গবৎ সেই আগুনে জ্বলে মরলেন। দেবযানী শুধু শর্মিষ্ঠাকে দাসী বানাননি, তিনি যযাতিকেও দাসে পরিণত করেছিলেন। দেবযানীকে বিবাহ করলে এই দাসত্ব যে আসবে—যযাতি সেই কথাই দেবযানীকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে। ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করলে, সেই ব্রাহ্মণকন্যার চির-স্ফীত ব্রাহ্মণ্যচেতনা যে তাঁকে পদে পদে জর্জরিত করবে, সে কথা যযাতি আগেই বুঝেছিলেন। কিন্তু এই কথোপকথনের মধ্যে শুক্রাচার্য এসে যাওয়ায় তিনি নিরুপায় হয়ে দেবযানীকে বহন করেছিলেন। অতি পরিচিত বিবাহ শব্দটা যে এমন গদ্যজাতীয় বহনে পরিণত হবে—এ কথা বোধ করি যযাতি বুঝেছিলেন। ভারি আশ্চর্য, দেবযানীর সঙ্গে যযাতির প্রথম বিবাহ প্রসঙ্গে যখন দেবযানী আর যযাতির উতোর-চাপান চলছে, তখন মহাভারতের কবিও 'বি' উপসর্গ বাদ দিয়ে শুধু 'বহন' শব্দটাই বারবার প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ তিনিও বুঝেছেন—এটা যতখানি বিবাহ, তার চেয়ে বেশি বয়ে নিয়ে চলা।

যযাতি দেবযানীর চাপে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে তিনিও যে পরিণত হয়েছিলেন দেবযানীর দাসে—একথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় শুক্রাচার্যের সঙ্গে যযাতির কথোপকথনে। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কেন তিনি মিলন সম্পূর্ণ করেছেন—এই কথা যযাতি যখন প্রাণপণে শুক্রাচার্যকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তখন শুক্রাচার্য যযাতিকে বলেছিলেন—তুমি কি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলে না? তুমি কি জান না—তুমি আমার অধীন—নন্বহং প্রত্যবেক্ষ্যস্তে মদধীনো'সি পার্থিব। বিশাল ক্ষমতাশালী একটি মাত্র কন্যার পিতাদের আমরা একালেও দেখেছি। তাঁদের সকলের কথা বলছি না, কিন্তু সেই রকম অনেক পিতার মধ্যেই জামাতাকে গ্রাস করার যে প্রবৃত্তি থাকে, শুক্রাচার্যের মধ্যে সেই প্রবৃত্তি ছিল, অবশ্য তা ছিল দেবযানীর কারণেই। এই বিবাহের প্রাক্ বা প্রথম অবস্থায় দেবযানী বা শুক্রাচার্যের দিক থেকে যত স্তুতিবাক্য বা যত ভরসাই দেওয়া হোক, নিজের প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধিতে যযাতি বুঝেছিলেন—তিনি কার্যত দাসে পরিণত হয়েছেন। এই দাসত্বের মুক্তি অন্যভাবে সম্ভব হয়নি, সেই মুক্তি ঘটেছে অন্যতরা এক দাসীর সঙ্গে গোপন মিলনে। যযাতির অন্তর থেকে হাহাকার বেরিয়ে এসেছে অশোকবনিকার অন্তরালে—আমি যত ভার জমিয়ে

তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।/এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও—।

কিন্তু শুক্রাচার্য যত বড় ব্রাহ্মণই হোন, অথবা দেবযানী যত বড়ই ব্রাহ্মণকন্যা, তাঁরা যযাতির রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে হার মেনেছেন। যযাতি সেই প্রথম থেকেই বুঝেছেন যে তিনি এক অভিশাপ-প্রবণ ব্রাহ্মণ-ঋষির কন্যাকে বিবাহ করে দাসে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য একদিকে যেমন তিনি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মিলিত হয়ে অন্তরের মুক্তি খুঁজেছেন, যদিও আমাদের মনে হয়—এ মিলন একান্তই ইচ্ছাকৃত, তেমনই অন্যদিকে শুক্রাচার্যের কথার পৃষ্ঠে অনুকূল কথা বলেই তিনি নিজের বংশধরকেও মুক্ত করেছেন শুক্রাচার্য এবং দেবযানীর ব্রাহ্মণ্যের কবল থেকে। নিজের অভিজ্ঞতায় যযাতি তাঁর সন্তানদের নাড়িনক্ষত্র জানতেন। ফলে কে তাঁর জরাগ্রহণে সম্মত হবেন—সে কথা তাঁর পূর্বাহ্নেই জানা ছিল। কিন্তু শুক্রাচার্য এবং দেবযানীর সামনে—সাধারণ এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেবযানীর পুত্রদেরও (জরা-গ্রহণের পরিবর্ত উপকার হিসাবে) রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা জিইয়ে রেখে এবং তাতে পূর্বাহ্নেই শুক্রাচার্যের অনুমতি গ্রহণ করে রেখে যযাতি তাঁর সারা জীবনের রক্তচাপ থেকে উদ্ধার পেলেন, অপিচ রাজনৈতিকভাবে শুক্রাচার্য এবং দেবযানীকে হারিয়েও দিলেন।

চল্লিশ

শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতির শরীরে অকালে নেমে এল দুর্জয় জরা। অলৌকিক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের অভিশাপে যযাতির বার্ধক্য ব্যাখ্যা করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে এই জরা-বস্তুটি যে কী—তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। আমরা অবশ্য এই ঘটনার মধ্যে সেই ব্রাহ্মণ-সমাজের অধিরোহণ দেখতে পাচ্ছি। পূর্বে পুরূরবার ক্ষেত্রে এবং নহুষের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্ষত্রিয়ের অধিকার যেভাবে খর্ব করেছিলেন, হয়তো যযাতির ক্ষেত্রেও তাই হল। জরা বা বার্ধক্য রাজত্ব ছেড়ে যাবার প্রতীক। সেকালের রাজারা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে বানপ্রস্থে যেতেন। এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে। এক্ষেত্রে যযাতিকে অকাল-বার্ধক্যের অভিশাপ দিয়ে অকালে রাজত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হল হয়তো। আমাদের ধারণা— একটি বৃদ্ধ লোকের জীবনে খাওয়া-দাওয়ার লঘুতা থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রিয় সংযমের যে স্বাভাবিক শাস্তি নেমে আসে— সেই সমস্ত সংযম-নিয়মের বিধি-বাঁধন আকালিকভাবেই যুবক যযাতির ওপর নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন শুক্রাচার্য। শর্মিষ্ঠার সঙ্গরঞ্জিত যযাতির জরার তাৎপর্য হয়তো এইখানেই। এর সঙ্গে ছিল রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার বঞ্চনা।

যযাতির যৌবন ফিরে পাবার কথা অতিলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যেই থাক। যৌবনের প্রতীক রাজত্বটুকুই যযাতি আরও বেশিদিন ভোগ করতে চেয়েছেন বিশ্বস্ত একটি পুত্রকে রাজ্যের আশ্বাস দিয়ে। জরা, বার্ধক্য—এসব অভিশাপের তাৎপর্য যাই হোক, যযাতি দেবযানীর 'যৌবন'টুকু নিজের স্বার্থ হিসেবে দেখিয়ে তাঁর রাজত্ব রাখতে পেরেছিলেন আরও কিছুদিন এবং পরবর্তী রাজপরম্পরাও সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই অধীনে। ব্রাহ্মণরা শুক্রাচার্যের আজ্ঞাবাহী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁরা যে ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের বংশধারায় আসা দেবযানীর প্রথম

সন্তানটিকে রাজা হিসেবে চেয়েছিলেন, সে কথা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের পরবর্তী আলোচনায়।

যযাতি রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর প্রথম সন্তান যদুকে বললেন—শুক্রাচার্যের অভিশাপে আমার এই অবস্থা, চুল পেকে গেছে, শরীরের মাংস শিথিল হয়ে গেছে। আমার বার্ধক্য তুমি নাও, যৌবনসুখ অনুভব করি। হাজার বছর চলে গেলে আবার আমি তোমার জরা গ্রহণ করব, তুমি তখন যৌবন ফিরে পাবে, রাজা হবে। যদু বললেন—এখনই বার্ধক্য এলে ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া তো সব মাথায় উঠবে— জরায়াং বহবো দোষাঃ পানভোজনকারিতাঃ। শরীর ঝুলে যাবে, দাড়ি হবে সাদা, আমার জোয়ান বন্ধুরা এখন আমায় কী যা-তা সব বলবে বলতো—সহোপজীবিভিশ্চৈব পরিভূতঃ সযৌবনৈঃ। তুমি বাপু তোমার অন্য যেসব সুপুত্তুর ছেলে আছে, তাদের বলো তোমার জরা গ্রহণ করতে, আমি পারব না।

যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অভিশাপ দিলেন—তুমি আমার হৃদয় থেকে জন্মেও যখন আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করলে না, তখন জেনে রেখো, তোমার বংশে কেউ কোনওদিন রাজা হবে না—তস্মাদরাজ্যভাক্ তাত প্রজা তব ভবিষ্যতি। যযাতি দেবযানীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুকেও ওই একই কথা বললেন। উত্তরও এল একই রকম। যযাতি তাঁকে বংশলোপের অভিশাপের সঙ্গে অন্ত্যজ এবং ম্লেচ্ছদের রাজা হবার অভিশাপ দিলেন। শর্মিষ্ঠার প্রথম পুত্র দ্রুহ্যুকেও যযাতি জরা গ্রহণের অনুরোধ করলেন। তিনিও স্বীকৃত হলেন না। যযাতির অভিশাপ নেমে এল— যে দেশে হাতি-ঘোড়া-পালকির ব্যবহার নেই, শুধু ভেলা আর ডিঙি নৌকাই যে দেশের একমাত্র পরিবহন, সেই দেশে তুমি সন্তানদের সঙ্গে রাজা না হয়েই থাকবে। তোমার উপাধি হবে 'ভোজ'। চতুর্থ পুত্র অনু জরা নিতে অস্বীকার করায় তাঁকেও অভিশাপ শুনতে হল যযাতির কাছ থেকে।

কনিষ্ঠ পুত্র পুরু অন্তত তাঁকে হতাশ করবেন না—মত্বা পুরুমলঙ্ঘনম্—এই বিশ্বাসে যযাতি পুরুকে তাঁর জরাগ্রহণের অনুরোধ জানালেন। সত্যিই যযাতির আশা সার্থক করে দিয়ে পুরু বললেন— আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব— যদাত্থ মাং মহারাজ তৎ করিষ্যামি তে বচঃ। আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করুন, আমি আপনার বয়স, রূপ এবং পাপ— সবই গ্রহণ করছি। যযাতি পরম সুখী হয়ে তাঁকে বর দিলেন— তোমার রাজ্যে সমস্ত প্রজা তাদের অভীষ্ট লাভ করবে। আশীর্বাদের পর যযাতি শুক্রাচার্যকে স্মরণ করে আপন জরা কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর মধ্যে সংক্রমিত করলেন।

পুরু বৃদ্ধ হলেন, যযাতি যুবক। আমরা বলি— যযাতি আরও কিছুদিন রাজত্ব করার সুযোগ পেলেন। বয়সোচিত ভোগ-উপভোগ— এসব তো দিন দিন বেড়েই চলল। এবং শুধু দেবযানীই নয়, স্বর্গের অপ্সরা বিশ্বাচী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য কিছু রমণীও এসে পড়লেন যযাতির ভোগের উপবৃত্তে। তবে এই যৌবনের সম্ভোগসর্বস্বতার মধ্যেও যযাতিকে আমরা রাজ্যশাসনে বড়ই তৎপর দেখতে পাচ্ছি। দেবতা থেকে দারিদ্র্যের সেবা, পিতৃযজ্ঞ থেকে অতিথিসেবা—এই সব জনতর্পণের বিষয় যদি সেই রাজশাসনের অন্তরঙ্গে থেকে থাকে তবে তার বহিরঙ্গে ছিল দস্যুদের নিগ্রহ এবং সামন্ত রাজাদের দমন তথা তুষ্টি। ভোগে এবং শাসনে যযাতির মর্যাদা দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য স্পর্শ করল—যযাতিঃ পালয়ামাস সাক্ষাদিন্দ্র ইবাপরঃ।

যযাতির এই চরম ভোগের মধ্যে একটা চরম কষ্টও ছিল— তৃপ্তঃ খিন্নশ্চ পার্থিবঃ। কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে তিনি রাজ্যের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন। যযাতির অকালবার্ধক্য মাথায় বহন

AMARBOI.COM

করে যুবক বয়সী পুরু হয়তো রাজোচিত পান-ভোজনে বিরত ছিলেন, এবং এই কষ্ট তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু স্বীকার করে নিতে চাননি। হয়তো বয়সোচিত রমণীর সঙ্গসুখ যার অভাব ঘটবে বলে যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু জরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই 'কামভোগপ্রণাশিনী' একটি অস্বাভাবিক অবস্থা পুরু হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে বরণ করেছিলেন পিতার জন্য। যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যু বলেছিলেন—জরা গ্রহণ করলে— হাতি-ঘোড়া-রথে চড়া দুষ্কর হয়ে পড়বে, দুষ্কর হবে স্ত্রী সম্ভোগ, হয়তো এই যুবক বয়সেই পুরু স্বেচ্ছায় ভোগ করতেন না রাজোচিত পরিবহন বরারোহণ—হাতি, ঘোড়া, রথ অথবা স্ত্রী সম্ভোগ—ন গজং ন রথং নাশ্বং জীর্ণো ভুঙ্ক্তো ন চ স্ত্রিয়ম্।

পুরুর এই স্বেচ্ছাকৃত উপভোগ নির্বাসনেই হয়তো জরা সংক্রমণের তাৎপর্য, যা যযাতি সাময়িকভাবে পরিহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক সংখ্যায় হাজার বছর অথবা অনেক সময় যখন কেটে গেল তখন যযাতির অন্তরে কষ্ট হল। পুরুকে ডেকে তিনি বললেন—পুরু! তোমার কাছ থেকে যৌবন লাভ করে আমি যেমন ইচ্ছে তেমন ভোগ করেছি। সময়ও পেয়েছি অনেক, উৎসাহও কিছু কম ছিল না। কিন্তু শরীর-মনের অন্তঃস্থিত কামনা এমনই এক বস্তু, বাছা! যা কেবল বেড়েই চলে, কমে না। আগুনে ঘি দেওয়ার মতো মনের ইন্ধন জোগালেই কামনা বাড়ে—হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে। যযাতি এবার একটু আত্মস্থ হয়ে বললেন—আমি ভেবেছিলাম— যথেষ্ট ভোগ করলে আমার আর কোনও ভোগতৃষ্ণা থাকবে না। কিন্তু দেখলাম— সেটা মস্ত ভুল। এখনও আমার লালসার কোনও নিবৃত্তি নেই। আমি তাই ঠিক করেছি— এবার বানপ্রস্থে গিয়ে পরম ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করব। তুমি তোমার যৌবন গ্রহণ কর এবং এই রাজ্যও গ্রহণ কর—রাজ্যঞ্চেদং গৃহাণ ত্বং... গৃহাণেদং স্বযৌবনম্।

যযাতি পুনরায় পলিতকেশ বৃদ্ধে পরিণত হলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যের রাজা হিসেবে অভিষেক করবেন বলে ঠিক করলেন। ঠিক এই সময়ে লক্ষ্য করে দেখুন—ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষ থেকে একটা প্রতিবাদ জানানো হল। তাঁরা যযাতিকে বললেন—যদু আপনার পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শুধু তাই নয়, সে দেবযানীর পুত্র, স্বয়ং শুক্রাচার্যের নাতি। সেই যদুকে অতিক্রম করে আপনি কনিষ্ঠ পুরুকে রাজা করছেন, এটা কেমন করে সম্ভব—জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য পুরোঃ রাজ্যং প্রযচ্ছসি?

আমি এর আগে তর্ক করে বলেছিলাম—শুক্রাচার্য যযাতিকে জরা-সংক্রমণের অনুমতি দিয়ে কোনওভাবে আশা করেছিলেন যে, যদু তাঁর পিতার জরা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হবেন এবং সেই সূত্রে রাজ্যের অধিকারও পাবেন। অন্যদিকে যযাতি এমনভাবেই কথাটা পেড়েছিলেন, যাতে সিদ্ধান্তটা যযাতিরই শর্তাধীন হয়ে গিয়েছিল। শুক্রাচার্যের হিসেব মেলেনি, কিন্তু তাঁর বংশধারায় আসা দেবযানীর পুত্র যদু এবং তুর্বসু কেউই যখন রাজ্য পেলেন না, তখন ব্রাহ্মণরা খুব নৈর্ব্যক্তিক একটা ভাব দেখিয়ে প্রতিবাদ করলেন। অর্থাৎ তাঁরা যেন শুধু দেবযানীর পুত্রদের কথা বলছেন না। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু—সবাই যখন এঁরা পুরুর জ্যেষ্ঠ, তবে কেন কনিষ্ঠ পুরু রাজা হবেন— এই কথাই যেন তাঁরা বলছেন। কিন্তু আমরা জানি, বিশেষত ওই সামান্য কথাটির মধ্যেই সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে—কথং শুক্রস্য নপ্তারং দেবযান্যাঃ সুতং প্রভো—শুক্রাচার্যের নাতি এবং দেবযানীর পুত্র যদুকে অতিক্রম করে কেন আপনি পুরুকে রাজ্য দিচ্ছেন? এই কথাটা বলে ফেলার পরেই সাধারণ অন্বয়ে অন্যান্য বড় ভাইদের নাম এসেছে। কিন্তু প্রতিবাদটা রয়ে গেছে বহুবচনে—কেমন করে বড় ভাইদের টপকে একজন ছোট ভাই রাজ্য পায়—কথং জ্যেষ্ঠানতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি?

যযাতি বললেন—জ্যেষ্ঠ হলেই তাকে আমি রাজ্য দিতে পারি না। যদু আমার আদেশ-অনুরোধ পালন করেনি। যে পুত্র পিতার আদেশ পালন করে না, জ্যেষ্ঠ হলেও তাকে আমি রাজ্য দিতে পারি না—আমি কোনও একটি পুরাণে দেখেছি, যদিও এখন সেই পুরাণটির নাম মনে করতে পারছি না— সেখানে যযাতি বলছেন— যে ছেলে বাপ-মায়ের কথাই শোনেনি সে লক্ষ লক্ষ প্রজার অনুরোধ শুনবে কী করে? যযাতি এইভাবে যদু, তুর্বসু প্রমুখ পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির যুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পরিশেষে এ বিষয়ে স্বয়ং শুক্রাচার্যের পূর্বানুমতি এবং সম্মতির কথা জানিয়ে কনিষ্ঠ হলেও পুরুর রাজ্যপ্রাপ্তির কথা প্রতিস্থাপন করলেন— শুক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যেনোশনসা স্বয়ম্।

এখানে আরও একটা ঘটনা লক্ষণীয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বিষয়ে যখন প্রতিবাদ এল যযাতির কাছে, তখন প্রতিবাদীদের সামাজিক অবস্থান উল্লেখ করা হচ্ছে মাত্র দুটি কথায়— 'ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোকেরাই যযাতির কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, যদিও 'প্রমুখ' শব্দটির দ্বারা প্রধানত ব্রাহ্মণদেরই বোঝায়, তাই আমরাও স্বতর্ক স্থাপনের জন্য তাই বুঝিয়েছি। এর পরে যযাতি যখন সবার সামনে নিজের যুক্তি বোঝাচ্ছেন, তখনই কিন্তু ওই সামান্য কথাটি 'ব্রাহ্মণ-প্রমুখা বর্ণাঃ যেন একটি বিশদাকার জন-সমূহের রূপ নিচ্ছে। যযাতি বলছেন—'সবাই শুনুন, ব্রাহ্মণ প্রমুখ যত বর্ণ আছে সবাই মন দিয়ে শুনুন আমার কথা—ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সর্বে শৃণ্বন্তু মদ্‌বচঃ। এই যে ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণ থেকে—সবাই শুনুন— এইখানে একটা জনসমর্থনের কামনা আছে, অর্থাৎ শুধু ব্রাহ্মণের মতো বর্ণমুখ্যরাই নন, প্রার্থনাটা সবার কাছে, সাধারণ প্রজা জনগণের কাছে— যার শেষ পরিণতি যযাতির অনুনয়-বাক্যে—আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা পুরুকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করুন—ভবতো'নুনয়াম্যেবং পুরুং রাজ্যে'ভিষিচ্যতাম্।

লক্ষ্য করুন, এই মুহূর্তে, মহাভারতের কবি আর কাউকে দিয়ে কথা বলাননি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রমুখ বর্ণ নয়, এবার কথা বলছেন প্রজারা— প্রকৃতয় উচুঃ। তাঁরা যযাতির কথা মেনে নিচ্ছেন। বাবা-মার কথা শুনছে এমন একটি প্রিয় পুত্রের কামনা তাঁদের নিজেদের ঘরেও রয়েছে। তাঁরা বলছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ এই পুরুকেই রাজ্য দেওয়া হোক, যে তোমার কথা শুনেছে— অর্হঃ পুরুরিদং রাজ্যং যঃ পুত্রঃ প্রিয়কৃত্তব। তাছাড়া মহামতি শুক্রাচার্য তো এই সম্মতি দিয়েই রেখেছেন, তারপরে আবার কথা কী? এই শেষ কথাটি ব্রাহ্মণপ্রমুখদের মুখ বন্ধ করার জন্যই। মহাভারতের কবি এবার আরও স্পষ্ট করে বললেন—যযাতিকে যাঁরা পুরুর রাজ্যাভিষেকে সম্মতি দিলেন, তাঁরা বর্ণশ্রেষ্ঠ কেউ নন, তাঁরা সব পুরবাসী, জনপদবাসী সাধারণ মানুষ—পৌরজানপদৈস্তুষ্টৈরিত্যুক্তো নাহুষস্তদা।

বলতে পারেন—এও এক ধরনের 'ইলেকশন'। ব্রাহ্মণ এবং অভিজাত সম্প্রদায় রাজা-নির্বাচনের ব্যাপারে যত বড় ভূমিকাই পালন করুন, তাঁদের কথা এবং বাদ-প্রতিবাদের থেকেও বড় হয়ে উঠল পৌরজন, জানপদ-জনের সমর্থন। পরবর্তী কালের বংশ-পরম্পরায় জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র এবং কনিষ্ঠ পাণ্ডুর রাজ্যপ্রাপ্তি নিয়ে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে, সেখানে প্রামাণিকতা বা নজির হিসেবে খেয়াল রাখতে হবে এই ঘটনাটি। আরও খেয়াল রাখতে হবে যে, চন্দ্রবংশের পরম্পরায় রাজা নির্বাচন শুধুমাত্র সমাজমুখ্যদের তর্জনী সংকেতে অনুষ্ঠিত হত না, দরকার পড়লে সাধারণ মানুষও সেখানে উপযুক্ত ভূমিকা নিতেন নীতি-যুক্তির পথে থেকেই।

রাজা হিসেবে পুরুর নির্বাচনের পর পরই মহারাজ যযাতি মুনিব্রত ধারণ করে বনে যাবার

জন্য প্রস্তুত হলেন—দত্ত্বা চ পুরবে রাজ্যং বনবাসায় দীক্ষিতঃ। রাজধানী ছেড়ে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের সঙ্গে যযাতি বনে প্রস্থান করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও কিন্তু এক মহান সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেলাম। একদিকে আছে এক ধরনের তাত্ত্বিক সঙ্কট, যা আমাদের পাঠকদের ধৈর্য ক্লিষ্ট করবে; অন্যদিকে আছে রাজনৈতিক সঙ্কট, যা আমাদের মহাভারত-পাঠের সহায় হবে। আমাদের তাত্ত্বিক সঙ্কট মহারাজ যযাতিকে নিয়ে। যযাতি মুনিব্রত গ্রহণ করে তপস্যার বলে স্বর্গরাজ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে প্রচুরতর ভোগ এবং তারপর বহুতর তত্ত্বজ্ঞানের পরেও কোনও এক সময় ইন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথনকালে যযাতির কিছু অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তিনি স্বর্গ থেকে পতিত হন। এই স্বর্গচ্যুতির পর যযাতির আবাস গড়ে ওঠে রাজর্ষি অষ্টকের সাধনভূমিতে। যযাতি এবং অষ্টকের মধ্যে ধর্ম-দর্শনের যে আলোচনা চলে, তার তাত্ত্বিক মূল্য অসামান্য। কিন্তু তবু আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। কেননা তাতে মহাভারতকথার মূল পরম্পরা ব্যাহত হবে। আমরা বরং স্বর্গগত যযাতির সঙ্গে ইন্দ্রের যে কথোপকথন হয়েছিল, তার মধ্য থেকে একটি কি দুটি পংক্তি উদ্ধার করতে চাই। তাতেই আমাদের পূর্বকথিত রাজনৈতিক সঙ্কটের মূল সূত্রগুলি পরিষ্কার হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

পুরুর রাজ্যাভিষেক এবং যযাতির বনগমনের প্রসঙ্গ শেষ করেই মহাভারতের কথকঠাকুর বৈশম্পায়ন শ্রোতার আসনে বসা জনমেজয়কে বলেছিলেন—মহারাজ! মহারাজ পুরু থেকেই এই পৌরব-বংশ, যার শেষ অধস্তন পুরুষ হলেন আপনি—পুরোস্তু পৌরবো বংশো যত্র জাতো'সি পার্থিব। আমাদের ধারণা— রাজ্যশাসনের জন্য পুরু উত্তরাধিকার সূত্রে যে ভূখণ্ডটি পেয়েছিলেন তা হল সেই পূর্বতন ভূখণ্ড— যার নাম প্রতিষ্ঠানপুর। আগেই বলেছি প্রতিষ্ঠান হল সেই পৈঠান বা পিহান, যা ইলাহাবাদের কাছে গঙ্গা-যমুনার জল ধোয়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বর্গের ইন্দ্র যযাতিকে প্রশ্ন করেছিলেন— আপনি পুরুকে রাজ্য দিয়ে কী কী উপদেশ দিয়েছিলেন? উত্তর দেবার সময় যযাতি বলেছিলেন— আমি পুরুকে শেষ উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছিলাম— পুরু! এই গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যদেশে অবস্থিত সমস্ত ভূখণ্ডই তোমার—গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে কৃৎস্নো'য়ং বিষয়স্তব। যযাতি আরও বলেছিলেন— আর তোমার ভাই-দাদারা হলেন তোমার রাজ্যের প্রান্তদেশের রাজা— ভ্রাতরো'ন্ত্যাধিপাস্তব।

যযাতি পুরু আরও যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা যথার্থ হলেও এখানে তার অবতারণা করছি না। কারণ আপাতত আমরা এক রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে আছি। যযাতি যে ভূখণ্ডে রাজত্ব করছিলেন, পুরু সেই ভূখণ্ডই উত্তরাধিকারসূত্রে পান এবং যযাতির মতে সেখানে রাজা হতে পারাটাই যথার্থ রাজা হতে পারা। নইলে যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—তুমি রাজা হতে পারবে না—অথচ দেখা যাবে তিনিও কোনও না কোনওভাবে রাজাই ছিলেন, যদিও কোনওভাবেই সেটা প্রতিষ্ঠানপুরের মূল ভূখণ্ডে নয়। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু এবং অনু পুরুর রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন—যযাতির মতে সেটা ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশ— ভ্রাতরো'ন্ত্যাধিপাস্তব।

যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, কিংবা অনু কোথায় গিয়ে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন, তা হয়তো স্পষ্ট করে বলা যাবে না; কিন্তু অস্পষ্ট হলেও তা বলার আগে আমরা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটা প্রতিপাদ্য উল্লেখ করে নিতে চাই। রমেশচন্দ্র ইলাহাবাদের কাছের ওই ভূখণ্ডটিকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পরম্পরাগত আবাসভূমি বলে মানতে চাননি। তাঁর ধারণা, চন্দ্রবংশের উত্তরপুরুষদের মধ্যে যাঁরা অনেকেই অতি-পরবর্তী কালের, তাঁরা এই জায়গাটায় থাকতেন এবং পৌরাণিকেরাও অনেকে এই রাজবংশের সঙ্গে পরিচিত থাকার ফলে তাঁরা

ইলাহাবাদের ওই অঞ্চলটিকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পূর্বতন আবাস বলে স্থির করেছেন। রমেশচন্দ্র মনে করেন, মহাভারতের যযাতির সঙ্গে একমাত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকেই সংশ্লিষ্ট বলে মেনে নেওয়া যায় এবং যযাতির প্রসঙ্গে সরস্বতী নদীর উল্লেখও মহাভারতে পাওয়া যাবে।

পুরু যেহেতু পৈতৃক রাজ্যই পেয়েছিলেন, অতএব তিনিও এই অঞ্চলেই রাজত্ব করতেন বলে ধরে নেওয়া যায়। রমেশচন্দ্রের এই ধারণার কারণ আছে। ঋগ্‌বেদের মধ্যে যযাতি এবং তাঁর পিতা নহুষের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এবং যযাতির চার ছেলে যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য, এবং অনু— এই চারজন রাজারও উল্লেখ ভালভাবে পাওয়া যাচ্ছে। পৈতৃক রাজ্য পুরুর হস্তগত হলে অন্যান্য ভাইরা যেহেতু প্রান্ত রাজগুলিতে চলে যান, তাতে যদুর স্থান হয় পশ্চিম দিকের প্রান্ত রাজ্যে। রমেশচন্দ্র মনে করেন— ঋগ্‌বেদে যদুকে যেহেতু সরযূ নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আক্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে এবং যেহেতু সরযূ নদীর সঙ্গে কুভা, সিন্ধু, ক্রুমু ইত্যাদি উত্তর পশ্চিমদেশীয় নদীর উল্লেখ আছে, অতএব যদু ছিলেন ওই অঞ্চলের রাজা।

সমস্ত ঘটনা থেকে রমেশচন্দ্রর সিদ্ধান্ত হল যে, যযাতির মতো পুরনো আর্যগোষ্ঠীর রাজারা থাকতেন পাঞ্জাব অঞ্চলেই এবং পুরুর রাজধানীও সেখানেই ছিল। বেশ বোঝা যায়— রমেশচন্দ্র বেদের মধ্যে যযাতি এবং তাঁর ছেলেদের উল্লেখ দেখেই সরস্বতী নদীর তীর ছেড়ে আর এগোতে পারেননি। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটাই যেহেতু ঋগ্‌বৈদিক আর্যদের পূর্বাবাস বলে চিহ্নিত, এবং ঋগ্‌বেদেই যেহেতু যযাতি, যদু তুর্বসুদের উল্লেখ আছে, অতএব প্রতিষ্ঠান নয়, পাঞ্জাবই যযাতি-পুরুদের ভদ্রাসন— এই হল রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত।

কথাটার যৌক্তিকতা যথেষ্টই আছে এবং পরবর্তী কালে ভাষাতত্ত্বের নিরিখেও এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতেও অসুবিধে হয় না। এমন হতেই পারে যে, জনমেজয়ের পূর্বপুরুষ কুরু-পাঞ্চালরা যেহেতু প্রতিষ্ঠানপুরে এসে বাসা বেঁধেছিলেন, তাই মহাভারতের কবি প্রতিষ্ঠানপুরকেই নহুষ-যযাতি-পুরুদের আদি নিবাস বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবতে হবে যে, ঋগ্‌বেদে যে যদু, তুর্বসু অথবা দ্রুহ্য-অনুদের পাওয়া যাচ্ছে— তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রায় যাযাবর আর্যজাতির এক-একটি গোষ্ঠী। প্রধানত যযাতির রাজ্যশাসনের পরেই এঁরা নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

বেদের মধ্যে সুদাস রাজার সঙ্গে বিখ্যাত দশ জন রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। বিখ্যাত যুদ্ধ। ঐতিহাসিক যুদ্ধ, যার সত্যতা অস্বীকার করা কঠিন। এই যুদ্ধ দাশরাজ্ঞ যুদ্ধ বলে পরিচিত। সুদাস ছিলেন পিজবনের পুত্র। আর দশজন রাজার মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন হলেন যযাতির পাঁচ পুত্র—পুরু, যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য এবং অনু। এঁদের সবাইকে এক সঙ্গে 'ভারতাঃ' বলা হয়েছে অর্থাৎ ভরতবংশীয়দের গোষ্ঠী। মনে রাখতে হবে—এই ভরতগোষ্ঠীর সঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত ভরতবংশীয়দের পার্থক্য আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন— বিশ্বামিত্র আগে ছিলেন সুদাস রাজার পুরোহিত। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক সুদাস এক সময় বিশ্বামিত্রকে ছেড়ে দিয়ে বশিষ্ঠকে পুরোহিত হিসেবে বরণ করেন। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র ভরতগোষ্ঠী অর্থাৎ দশ রাজার জোটে যোগ দেন।

ভারি সুন্দর বর্ণনা আছে ঋগ্‌বেদে। মন্ত্রগুলি শুনলেই বোঝা যায়—দশ রাজার দল অর্থাৎ পুরু, যদু, দ্রুহ্যরা অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে শতদ্রু বিপাশার বেলাভূমিতে উপনীত হয়েছেন, আর বিশ্বামিত্র তাঁদের জয়ের জন্য ইন্দ্রের কাছে স্তব করছেন। কী অসাধারণ উপমাতে যে বিশ্বামিত্র এই দুই নদীর কবিকল্প স্থাপন করেছেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কবি বলছেন— জলপ্রবাহবতী বিপাশা আর শুতুদ্রী! তোমরা কেমন পাহাড়ের কোল থেকে জন্ম নিয়ে

সাগর-সঙ্গমের অভিলাষে লাগামছাড়া ঘোটকীর মতো, বৎসলেহনাভিলাষিণী গাভীর মতো ছুটে চলেছ— প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।

অনেক মধুর বর্ণনার পর বিশ্বামিত্রের বর্ণনার উচ্ছ্বাস নেমে এসেছে—আমি দূর থেকে রথ-ঘোড়া সব নিয়ে এসেছি। আমার বোনের মতো দুই নদী আমার! তোমরা একটু নিচু হয়ে বও। তোমাদের স্রোতের জল যেন আমাদের রথের চাকার তলা দিয়ে যায়। আমরা যেন ঠিক পার হয়ে যেতে পারি— নি ষূ নমধ্বং ভবতা সুপারা অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ। বিপাশা আর শুতুদ্রী (শতদ্রু) বললে— শুনেছি গো শুনেছি। রথ-শকট নিয়ে দূর থেকে এসেছ তোমরা। তা বাবু আমরা নিচু হয়ে যাচ্ছি— মা যেমন তাঁর বাচ্ছা শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিচু হয়, যুবতী যেমন প্রেমিককে আলিঙ্গন করার জন্য অবনত হয়, আমরাও তেমনি নিচু হয়ে যাচ্ছি—নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা মর্যাযেব কন্যা শশ্বচৈ তে।

বিশ্বামিত্র দেখলেন— বিপাশা-শতদ্রুর স্রোতোধারা ক্ষীণ হয়ে গেছে, আর তাতে পার হয়ে যাচ্ছে ভরতগোষ্ঠীর রাজারা। বিশ্বামিত্র বললেন— যেহেতু ভরতগোষ্ঠীর রাজারা তোমাদের ওপর দিয়ে পার হবে, যেহেতু তারা ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হয়ে পার হবার অনুমতি পেয়েছে তোমাদের কাছে— যদঙ্গ ত্বা ভারতা সন্তরেয়ু— তাই তোমরা দুই নদীই আমার স্তবের যোগ্য। ভরতবংশীয়রা যখন নদী পার হয়ে গেলেন, তখন ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্তুতি করলেন— অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।

শোনা যায়—দশরাজার এই যুদ্ধে সুদাস মোটেই হারেননি। বিশ্বামিত্রের নদীস্তুতিতে শতদ্রু-বিপাশা পার হতে পারলেও সুদাসের কাছে ভরতগোষ্ঠীয়রা হেরে যান—The Bharatas, Matsyas, Anus, Druhyus must have crossed the Vipasa and the Satadru in order to attack the Trtsus. (সুদাস তৃৎসু বংশের ছেলে) After the two rivers were crossed, a battle took place. পণ্ডিতেরা মনে করেন দশ-রাজার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সুদাসের বিরুদ্ধে তাঁরা জিততে পারেননি। সুদাসের জন্য মঙ্গল-সূক্ত রচনা করেন স্বয়ং ঋষি বশিষ্ঠ। বারবার তিনি ঘোষণা করেন, দশ রাজার জোটকে কীভাবে সমূলে বিনাশ করেছিলেন সুদাস, বশিষ্ঠ বলেছেন— ওঁরা পারেননি। দশ জন যজ্ঞহীন রাজা (বশিষ্ঠ তাঁদের যজ্ঞ করেননি, অতএব যজ্ঞহীন) একসঙ্গে জোট বেঁধেও সুদাস রাজার কিছুই করতে পারল না— দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ। অন্যান্য ঋক্-মন্ত্রে দ্রুহ্যু এবং অনুর পুত্র এবং সেনারা সুদাসের হাতে কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হয়েছিলেন— সে বর্ণনাও বশিষ্ঠের জবানিতে পাওয়া যায়— নি গব্যবো'নবো দ্রুহ্যবশ্চ ষষ্ঠিঃ শতাঃ সুষুপুঃ ষট্ সহস্রাঃ।

শতদ্রু, বিপাশা এবং সিন্ধুনদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এই যে যুদ্ধগুলি হয়েছিল, তাতে বোঝা যায় দশ রাজার জোটের সকলেই প্রায় ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এই জোটের মধ্যে কখনও আমরা ত্রসদস্যু বা পুরুকে সুদাসের মিত্রস্থানেও দেখছি। আবার তুর্বসু এবং যদুকে দেখছি শত্রুস্থানে। অন্যত্র আরেক জায়গায় মৎস্যদেশবাসীদের সঙ্গে সুদাসের শত্রুপক্ষকে একত্র দেখছি। মৎস্যদেশ কিন্তু আধুনিক জয়পুরের কাছে। আরও একটি জায়গায় 'ভেদ' নামে এক রাজার ধ্বজান্তরালস্থিত তিনটি জনগোষ্ঠীর (অজস্, শিগ্রু এবং যক্ষু) সঙ্গে যুদ্ধরত দেখছি সুদাস রাজাকে, কিন্তু সে যুদ্ধ হয়েছিল যমুনার তীরভূমিতে।

আমরা যে শতদ্রু, বিপাশা নদী থেকে আরম্ভ করে যমুনা পর্যন্ত সুদাস রাজার গতি-স্থিতি দেখাতে চাইছি, তার কারণ একটাই। পরবর্তী কালে অর্থাৎ মহাভারতে কুরু রাজাদের সঙ্গে

ভরতগোষ্ঠীর রাজারা (যাঁদের মধ্যে যযাতি রাজার পাঁচ ছেলেও পড়েন) একাত্ম হয়ে যান— কুরবো নাম ভারতাঃ। কিন্তু অঞ্চল এবং ভূখণ্ডের নিরিখে দেখতে গেলে বলতে হবে অনু-দ্রুহ্যু-যদু-তুর্বসুদের কথা ঋগ্‌বেদে যতই শতদ্রু-বিপাশা অথবা সরস্বতী-দৃষদ্বতী নদীর তীরবাহিনী কথা হোক, কুরুদের নাম কিন্তু তখনই যথেষ্ট শোনা যাচ্ছে— কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবম্। এই 'কুরুশ্রবণ'—যার অর্থ অনেকে করেছেন 'কুরুদের নাম শোনা যাচ্ছে'— তিনি নাকি ঋগ্‌বৈদিক ত্রসদস্যুর পুত্র। অন্যদিকে শতপথব্রাহ্মণের মতো পুরাতন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 'কৃবি'দের নাম করে বলা হচ্ছে— পুরা-কালে পাঞ্চালদেশ বলতে 'কৃবি'দের বোঝাত—কৃব্যা (ক্রিব্যা) ইতি হ বৈ পুরা পাঞ্চালান্ আচক্ষতে। আধুনিকমতে পাঞ্চালের অবস্থান উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে।

শতপথব্রাহ্মণের সময়েই সেটা পুরাকাল, সে কাল নিশ্চয়ই ঋগ্‌বেদের সময় পর্যন্ত পৌঁছবে। আবার ওই শতপথব্রাহ্মণেই দেখছি পাঞ্চাল দেশের এক রাজা সাত্রাসহ যখন যজ্ঞ করছিলেন, তখন তুর্বসুদের উদয় হয় এবং তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ছয় হাজার ছশ তিরিশ জন বর্মধারী পুরুষ।

সাত্রাসহে যজমানেঽশ্বমেধেন তৌর্বশাঃ।
উদীরতে ত্রয়স্ত্রিংশাঃ ষট্‌সহস্রাণি বর্মিণাম্।।

তুর্বসুদের জনসংখ্যা ঋগ্‌বৈদিক দ্রুহ্যু অনুদের জনগোষ্ঠীর সংখ্যার সঙ্গে প্রায় মেলে—ষষ্টিঃ সুষুপুঃ ষট্ সহস্রাঃ।

পরিষ্কার বোঝা যায় তুর্বসুরা যুদ্ধবীরের পোশাকে এসেছিলেন পাঞ্চালে অপিচ তুর্বসু বংশীয়দের সঙ্গে পাঞ্চাল বা কৃবির যোগ বহু পুরাতন। শতপথব্রাহ্মণের এই প্রবচনের নিরিখে পাঞ্চাল দেশে যদি বহু পূর্বেই তুর্বসুদের আগমন হয়ে থাকে, তবে আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানপুরে পুরুর রাজ্য কল্পনা করাটাও অসম্ভব নয় এবং আরও অসম্ভব নয় এই জন্য যে, মহাভারতের দৃষ্টিতে এবং প্রবীণ ঐতিহাসিকদের মতেও কুরুদের দেশটা— Stretched from the Sarasvati to the Ganges. কাজেই ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র যযাতি-যদু-তুর্বসুকে যতই সরস্বতী নদীর তীরে আর্যদের পূর্বাবাসে টেনে নিয়ে যান, আমরা তাঁদের গঙ্গা-যমুনার তীরবাহী অঞ্চলে টেনে আনতে আগ্রহী।

একচল্লিশ

যযাতি এবং তাঁর পাঁচ ছেলের কথা একটু বেশি করে বলতে হল এই কারণে যে, ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ এবং পশ্চিমের একটা বড় জায়গা জুড়ে যে কটি নামী-দামি রাজবংশের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁদের অনেকেই এই যযাতির পুত্রদের নামে প্রসিদ্ধ। বস্তুত যযাতির পাঁচ পুত্রের অসংখ্য বংশধরই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ দখল করে নিয়েছিলেন।

মহাভারতে যযাতি তাঁর প্রিয় পুত্রদের যে কঠিন অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাতে আপাত ভাবে মনে হতে পারে যেন পুরু ছাড়া যযাতির অন্য পুত্রেরা সকলেই ম্লেচ্ছ-যবনে পরিণত হয়েছিলেন। মহাভারতে এমনও বলা হয়েছে যে, যদু থেকেই বিখ্যাত যাদব বংশের উৎপত্তি এবং তুর্বসু থেকে জন্ম হয়েছে যবনদের—যদোস্তু যাদবা জাতা স্তুর্বসোর্যবনাঃ স্মৃতা। যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য থেকে ভোজবংশীয়রা জন্মেছেন আর অনু থেকে জন্মেছেন ম্লেচ্ছরা—অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

আমাদের দৃষ্টিতে এই ম্লেচ্ছ-যবন ইত্যাদি শব্দের ওপর খুব বেশি জোর দেবার কারণ নেই। যযাতির অভিশাপের তাৎপর্য এইখানেই যে, তিনি পিতৃ-পরম্পরাগত রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে তুলে দেননি, কিংবা অন্য তিন পুত্রকেও দেননি, সেটা দিয়েছেন কনিষ্ঠকে। কিন্তু যযাতি বিশিষ্ট রাজা ছিলেন, তাঁর শাসন-ভুক্ত মূল রাজ্যটি ছাড়াও প্রান্তদেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। যযাতি তাঁর চার পুত্রকে ওই প্রান্তদেশেই ঠেলে দিয়েছিলেন। বায়ুপুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণ এই মর্মেই মন্তব্য করেছে—যযাতি নিজের রাজ্যে পুরুকে বসিয়ে সেই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে স্থাপন করেন তুর্বসুকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে বসান যদুকে। পশ্চিম ও উত্তর ভাগে ক্রমান্বয়ে দ্রুহ্য আর অনুকে রাজ্য দিয়ে যযাতি তাঁর বিশাল রাজ্য পাঁচভাগে ভাগ করে

দেন—ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজা পুত্রেভ্যো নাহুষস্তদা। তর্কের খাতিরে মেনে নিতে পারি, হয়তো এই সব রাজ্য নির্বিঘ্নে যদু-তুর্বসুদের হাতে চলে আসেনি। তাঁদেরকে এই রাজ্য পেতে হয়েছিল সামান্য লড়াই করে। আরও একটা কথা, নিজের চেষ্টায় এবং তেজে যে সব জায়গায় এঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেইসব জায়গায় হয়তো আর্যেতর জাতির বসতি ছিল। পুরাণের কথক ঠাকুর তাই নির্দ্বিধায় বলে দিলেন তুর্বসুর ছেলেরা সব যবন আর অনুর ছেলেরা ম্লেচ্ছ।

ঋগ্‌বেদে যদু-তুর্বসু এবং অনুদের যেটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে তাঁদের যথেষ্ট যুদ্ধবাজ মনে করার কারণ আছে, কিন্তু কোনওভাবেই তাঁরা ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞাচারহীন ম্লেচ্ছ-যবন ছিলেন না। একথা ঋগ্‌বেদের প্রমাণেই যথেষ্ট মেনে নেওয়া যায়। যযাতির অভিশাপের অনিবার্যতা মাথায় না রেখে আমরা যদি এমনটি বিশ্বাস করি যে, যদু-তুর্বসু অথবা অনু-দ্রুহ্যরা যেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে পৌরাণিকেরা তাঁদের বংশধরদের ম্লেচ্ছ-যবন বানিয়ে দিয়েছেন, তবে বোধ করি সেই তর্কটাই বাস্তবসম্মত হবে। কারণ, ঐতিহ্যগত দৃষ্টিতে দেখলে কোনও আর্য-জাতির প্রতিভূ যদি যবনদেশ, ম্লেচ্ছদেশ অথবা শূদ্র-বসতিতে গিয়ে থাকতেন, তবে সমাজের চোখে তাঁরা ম্লেচ্ছ যবন অথবা শূদ্রই হয়ে যেতেন। আমাদের বিশ্বাস, অনু-তুর্বসুদের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে।

শেফার বলে এক সাহেব আছেন, তিনি ক্ষুদ্রজাতি এবং দাসদের মধ্যে যদু-তুর্বসুর বসতির অভিশাপ শুনে তাঁদের বংশধরদের একেবারে 'ভীল' বানিয়ে দিয়েছেন—racially Bhils. অন্যদিকে অনু থেকে ম্লেচ্ছজাতির উদ্ভব শুনে তাঁর নামে নতুন জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করেছেন শেফার। তাঁদের নাম 'আনব ম্লেচ্ছ'—an original stock of Anava Mleccha. এই বাচাল সাহেবের কত কথা আর শোনাব। এঁর মতে পাণ্ডব-কৌরবদের বহু পূর্বপুরুষ অর্থাৎ যযাতির সেই পরমপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রটি—আমরা পুরুর কথা বলছি—তিনি নাকি সংস্কৃত ভাষাটাই ভাল জানতেন না। আর দ্রুহ্য লোকটার নামের মধ্যে যেহেতু 'দ্রুহ' বা 'দ্রোহে'র গন্ধ আছে, অতএব উনি শত্রু গোছের লোক অথবা 'ফরেনার'। পুরু-তুর্বসুদের কোন শ্যালক যে শেফার সাহেবকে এই সব খবর দিয়েছিল, তা তিনিই জানেন।

আমরা যদু-তুর্বসু অথবা দ্রুহ্য-অনুর বিশাল বংশলতার বাঁধনে আমাদের প্রিয় পাঠকদের পেঁচিয়ে বাঁধতে চাই না। কিন্তু পাণ্ডব-কৌরবরা যেহেতু পুরুবংশের লোক তাই যদু-তুর্বসু অথবা অনুদ্রুহ্যদের একটু-আধটু খবরও আমাদের নিতে হবে। নইলে, পরিবার বা সমাজগতভাবে মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলিকেও ভাল করে চেনা যাবে না। এমনকি সঙ্গে সঙ্গে এইসব রাজবংশের ভৌগোলিক অবস্থানটাও একটু জেনে নিতে হবে।

বলতে পারেন, যযাতির ছেলেরা পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার মানে হল আরেক দফা আর্যায়ন। যযাতির প্রথম পুত্র যদু এবং তাঁর বংশধর যাদবরা গঙ্গা-যমুনার মধ্যদেশ ছেড়ে প্রথমে কোন জায়গায় এসে বসতি স্থাপন করেন, সে কথা স্পষ্ট করে বলা যায় না বটে, তবে মহাভারতে এবং পুরাণে মথুরা জায়গাটাই যাদবদের বাসস্থান বলে বারংবার চিহ্নিত। মনে রাখতে হবে, ভগবান বলে কথিত সেই বহুশ্রুত মানুষটি, যাঁর নাম কৃষ্ণ, তাঁর ঠাকুরদাদা ছিলেন শূর বা শূরসেন। এই শূরসেনের নামে যে জায়গাটা বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, মথুরা তার একটি অঞ্চল মাত্র। আলেকজান্ডারের সমসাময়িক গ্রিক লেখকেরা মথুরার নাম জানতেন 'মেথোরা' (Methora) বলে আর শূরসেনের পুরো রাজ্যটাকে জানতেন Sourasenoi বলে। তবে এখন

যে সময়ের কথা বলছি, সে অনেক আগের কথা। কৃষ্ণ-পিতামহ শূরসেন তখন কোথায়? এবং এটাও মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণ-পিতামহ শূর বা শূরসেনের বহু পূর্বে এই যদুবংশেই শূর এবং শূরসেন নামে দুই ভাই ছিলেন। তাঁরা বিখ্যাত কার্তবীর্যার্জুনের পুত্র। হয়তো তাঁদের নামেই Sourasenoi।

আমরা আসলে বলতে চাই—শুধু মথুরা বলে নয়, যাদবরা প্রথমত গঙ্গা ছেড়ে একটু নীচের দিকে যমুনার ওপারে চলে এসেছিলেন এবং তারপর সে জায়গাও ছেড়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা এবং পশ্চিম দিকেও বেশ খানিকটা দখল করে নেন। এইভাবে পশ্চিমে সমুদ্রতীরবর্তী দ্বারকা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে নর্মদার পর-প্রান্তে বিদর্ভ, মাহিষ্মতী পর্যন্ত যাদবদের দখলদারি স্বীকার করে নিতে হবে। তবে এ সবের ওপরেও কিন্তু যদু বা যাদবদের প্রথম বসতি হিসেবে মথুরার কথাটাই আমাদের মনে বেশি ধরে। তার কারণ এই নয় যে, শুধু কৃষ্ণ পর্যন্ত এখানে যাদবদের স্মৃতিচিহ্ন আছে, তার কারণ আমরা শাক্যসিংহ বুদ্ধের মুখে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই একটা বিশাল বড়-রাস্তার খবর পাচ্ছি। এই রাস্তা একদিকে মথুরার সঙ্গে বেরঞ্জা বলে একটা জায়গায় সংযোগ ঘটিয়েছে। এই বেরঞ্জার সঙ্গে আবার যোগ রয়েছে বুদ্ধের প্রিয় শহর শ্রাবস্তীর সঙ্গে। শ্রাবস্তী হল রাপ্তী নদীর তীরে উত্তরপ্রদেশের গোন্দা জেলার বহ্রেইচ অঞ্চল জুড়ে। কিন্তু এই বেরঞ্জা আর শ্রাবস্তীর সংযোগকারী পথটি যে সব শহর ছুঁয়ে এসেছিল সেগুলি পালি ভাষায়—সোরেয্য, সংকাস্স (সাংকাশ্য) কন্নকুজ্জ (কান্যকুব্জ-কনৌজ) এবং পয়াগ-পতিষ্ঠান।

শেষ জায়গাটা যদি পালি ভাষাতেই চিনে থাকেন, তাহলে বুঝবেন, এ হল আমাদের সেই প্রয়াগের কাছে প্রতিষ্ঠানপুর। যযাতির ছেলে যদু হয়তো এইরকমই এক পুরনো রাস্তা ধরে মথুরায় এসে যাদবদের শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে একটা কথা এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে—যদুর নামে যতবড় যদুবংশই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, রাজা হিসেবে যদুর ক্রিয়া-কলাপ এমন কিছু বিখ্যাত নয়, বরঞ্চ তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন শৌর্যে, বীর্যে, ক্ষমতায়। একইভাবে অনু কিংবা দ্রুহ্য অথবা তুর্বসুও এমন কিছু বিখ্যাত নন। কিন্তু তাঁদের বংশধরদের মধ্যে অনেকেই শ্রুতকীর্তি রাজা-মহারাজা আছেন, যাঁদের নাম শুনলে এখনও আমরা মুগ্ধ হব।

প্রসঙ্গত জানাই, যদুর বিভিন্ন বংশধর যেমন মথুরা, বিদর্ভ, মাহিষ্মতী, অবন্তী প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যমুনা নদীর ওপার থেকে একেবারে তাপ্তী নদী পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই দখল করে নিয়েছিলেন, তেমনই অনুর বংশধরেরাও বিখ্যাত হয়েছিলেন পাঞ্জাব অঞ্চলে। পরবর্তীকালে অনুর চেয়েও এই বংশ উশীনর শিবির নামে বেশি বিখ্যাত হয়েছিল। উশীনর শিবি তাঁর দয়া আর করুণার গুণে ভারতবিখ্যাত হয়েছিলেন। কার্টিয়াস অথবা ডিয়োডোরোসের মতো পূর্বতন গ্রিক লেখকেরা ঝিলাম এবং চেনাব নদীর অন্তর্বর্তী নিম্নাঞ্চলে বিখ্যাত শিবিদের নাম শুনেছেন। যযাতিপুত্র অনুর সপ্তম পুরুষ হলেন মহামনা। তাঁর দুই ছেলে। একজন উশীনর, দ্বিতীয় জন তিতিক্ষু। ঐতিহাসিকেরা বলেন—Usinara and his descendants occupied the Punjab, and Titikshu founded a new kingdom in the east, viz, in East Behar. তার মানে অনুবংশের একটি ধারা পূর্ব বিহারেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, অনুবংশের এই পূর্বগামিনী ধারা থেকেই প্রাচীন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে আর্যসভ্যতার প্রথম অনুপ্রবেশ।

AMARBOI.COM

যযাতির অন্য পুত্র দ্রুহ্যুকে নিয়ে আমাদের খুব মাথাব্যথা নেই। তবে তাঁর বংশের অন্যতম প্রধান পুরুষ প্রচেতা এবং তাঁর পুত্রেরা ভারতবর্ষের বাইরে আরও উত্তর দিকে গিয়ে এমন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন, যেখানে আর্যেতর জনজাতির প্রাধান্য ছিল বেশি। ফলে প্রচেতার সব ছেলেই ম্লেচ্ছদের রাজা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন।

প্রচেতসঃ পুত্রশতং রাজানঃ সর্ব এব তে।
ম্লেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাঃ সর্বে হ্যুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।।

এই যে দ্রুহ্যুবংশে প্রচেতার নাম পাওয়া গেল, এই প্রচেতার এক ভাইয়ের নাম গান্ধার। অন্যমতে তিনি দ্রুহ্যু বংশে জাত অরুদ্ধের পুত্র। গান্ধার বলে যে রাজ্যটা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, তা এঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত এবং পণ্ডিতেরা বলেন গান্ধার রাজ্যেই দ্রুহ্যুরা বাস করতেন। তখনকার দিনে গান্ধার কাশ্মীরের উপত্যকার খানিকটা নিয়ে তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

যযাতির সব পুত্রের বসবাস নির্ণয় করার পরেও যাঁর বসবাস নিয়ে আমরা এখনও উচ্চবাচ্য করিনি, তিনি হলেন তুর্বসু। ধারণা করা হয়, তুর্বসুরা রাজত্ব করতেন এখনকার মধ্যপ্রদেশের সাতনা-রেওয়া অঞ্চলে। পূর্বকালে এই অঞ্চলের আরও খানিকটা জুড়ে নিয়েই বৈশালী নগরীর মানচিত্র তৈরি করা যায়। আরও পরিষ্কার করে বললে বৈশালীতেই তুর্বসুদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা যায়। এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন মরুত্ত, যাঁর কথা আমরা পূর্বে বৃহস্পতি এবং সংবর্তের কাহিনীতে উল্লেখ করেছি। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজা হওয়ার পর যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাইলেন, তখন নাকি তাঁর ভীষণ অর্থাভাব চলছে। ব্যাস প্রমুখ মুনি-ঋষিরা তখন সৎপরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন—মহারাজ! মরুত্তের সম্পত্তি গচ্ছিত আছে পাহাড়ের গুহায়। সেই সম্পত্তি, ধন-রত্ন নিয়ে এসে তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন করো।

মহাভারতের কবি হওয়া সত্ত্বেও ব্যাস যে কথাটা যুধিষ্ঠিরকে বলেননি, সেটা হল—তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত ছিলেন এক অর্থে যুধিষ্ঠিরের পূর্বপুরুষ। কেন না, ভারত-বিখ্যাত মহারাজ দুষ্যন্ত, যাঁকে মহাকবি কালিদাস অমর করে দিয়েছেন, যাঁর পুত্রের নামে প্রখ্যাত ভরতবংশের সৃষ্টি, অথবা যাঁর পুত্রের নামে এই দেশের নাম ভারত, সেই দুষ্যন্ত মানুষ হয়েছিলেন এই তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত রাজার কাছে। পুরুবংশের দুষ্যন্তকে যে কোন টানে তুর্বসু-বংশীয় মরুত্ত নিজের ঘরে এনে মানুষ করলেন, তার পিছনে অন্য এক ইতিহাস লুকনো আছে।

মনে রাখতে হবে—যযাতির যে পাঁচ সন্তানের নাম আমরা পেয়েছি, যযাতির মৃত্যুর পর সেই সব সন্তানের বংশধরদের মধ্যে কখনও যেমন সৌহার্দও লক্ষ্য করেছি, তেমনই কখনও দেখেছি প্রচণ্ড ঝগড়া এবং মারামারি। এইসব বিবাদ-বিসংবাদ যে খুব স্পষ্ট করে ইতিহাসের তারিখ মিলিয়ে বলে দেওয়া যাবে তা নয়, তবে মহাভারতের মূল ঘটনা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে এইসব পুরনো ঝগড়াঝাঁটির সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব যে বেশ খানিকটা আছে, সেটা বেশ ভাল করেই দেখিয়ে দেওয়া যাবে।

যযাতি গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী পৈতৃক রাজ্যটি খুব ভালবেসে পুরুকে দিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু যযাতি যে প্রথম পুত্রটিকে রাজ্যছাড়া করেছিলেন সেই যদু কিন্তু ভিন্‌রাজ্যে গিয়ে এতটাই শক্তি বিস্তার করেছিলেন যে তাঁর বংশধরেরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক বিশাল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

যদুবংশ কিছুদিনের মধ্যেই দুই বিশাল বংশে রূপান্তরিত হয়। যদুবংশের প্রথম ধারা যদুর

amarboi.com

দ্বিতীয় পুত্র ক্রোষ্টুর বংশ ধরে চলতে থাকে। তাঁরা যদুর নাম বজায় রেখে মথুরা—শূরসেনী অঞ্চলে রাজত্ব করতে থাকেন। যদুপুত্রের ধারায় আছে হৈহয়-বংশ। হৈহয় হলেন যদুর প্রথম পুত্র সহস্রজিতের নাতি। এই হৈহয়বংশে বিখ্যাত কার্তবীর্যার্জুনের জন্ম। যদুর দ্বিতীয়পুত্র ক্রোষ্টুর ধারায় প্রথম বিখ্যাত রাজা হলেন শশবিন্দু। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, তিনি রাজচক্রবর্তী সম্রাট—চক্রবর্তী মহসত্ত্বো মহাবীর্যো মহাপ্রজঃ। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, শশবিন্দু তাঁর পার্শ্ববর্তী পুরুবংশীয় রাজাদের রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করে ছেড়েছিলেন, কারণ ঐতিহাসিকদের মতে—The neighbouring countries were the Paurava realm on his (Shashavindu's) east and the Druhyu territory on his north. He appears to have conquered the Pauravas, beacuse there is a great gap in the Paurava genealogy. From this point till Dusyanta restored the dynasty long afterwards, which means that the dynasty underwent an eclipse.

পুরুবংশীয় পৌরবদের বিপদ শুধু শশবিন্দুর কারণেই হয়নি। তাঁদের আরেক বিপদ হলেন সূর্য বা ইক্ষ্বাকু-বংশের মান্ধাতা, যিনি রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। রাজা হিসেবে তিনিও ছিলেন বিরাট মাপের। মান্ধাতার বাবা দ্বিতীয় যুবনাশ্বের সময় থেকেই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজ্যবিস্তার শুরু হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে মান্ধাতার সময়ে। লক্ষণীয় বিষয় হল, শশবিন্দুর পক্ষে সরযূপারের সেই দেশটি অর্থাৎ অযোধ্যা জয় করা সম্ভব হয়নি এবং দুজনের স্ব-স্ব বংশের বিরাট পুরুষ বলে শত্রুতা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ইক্ষ্বাকু বংশের মান্ধাতা বিয়ে করেছিলেন শশবিন্দুর মেয়ে যাদবসুন্দরী বিন্দুমতীকে। বিন্দুমতীর আরেক নাম চিত্ররথী—তস্য চৈত্ররথী ভার্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ।

মান্ধাতার পর ইক্ষ্বাকুবংশের তেজ কিছুটা কমে বটে, তবে সব দিক থেকেই ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাদবরা। একদিকে শশবিন্দু এবং তার ছেলেদের দুর্দান্ত অভিযান যেমন ভারতবর্ষের মধ্যদেশ থেকে পৌরবদের অবলুপ্তি ঘটিয়েছিল, তেমনি শশবিন্দুর পরেও সাম্রাজ্যজয়ের ধারাটি চালিয়ে যান যাদবদেরই জাত ভাই হৈহয় বংশের কার্তবীর্যার্জুন। ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবন্তী, মাহিষ্মতী, বিদর্ভ অঞ্চলে যাদব-হৈহয়রা একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করার পর তাঁরা ভারতবর্ষের উত্তরপানে ধাওয়া করেছিলেন। যুবনাশ্ব-মান্ধাতার আমলে অযোধ্যার রাজবংশের যে মর্যাদা স্থাপিত হয়েছিল, সেই মর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল হৈহয়-যাদবদের আক্রমণে। অযোধ্যায় তখন রাজা ছিলেন বাহু। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় দানবীর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বেশ কয়েক পুরুষ পরের মানুষ। হৈহয়রা অন্যান্য যদুবংশীয়দের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যার রাজা বাহুকে রাজ্যছাড়া করে ছেড়েছিলেন—হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ নিরস্তো ব্যসনী নৃপঃ।

লক্ষণীয় বিষয় হল, যাদব-হৈহয়দের এই সাম্রাজ্যবাদী অভিযান অযোধ্যার পার্শ্ববর্তী বৈশালী এবং বিদেহরাজ্যের কাছে এসে থেমে যায়। আগেই বলেছি—বৈশালীতে, আধুনিক মধ্যপ্রদেশের সাতনা-রেওয়া অঞ্চলে তখন রাজত্ব করতেন তুর্বসুবংশের রাজারা। শোনা যায়, তুর্বসুবংশের করন্ধম রাজা যখন বৈশালীতে রাজত্ব করছেন তখন তিনি বিপক্ষীয় রাজাদের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে জয়ী হন এবং তাঁর পুত্রও তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে থাকেন। এই পুত্রের নাম অবীক্ষিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ লিখেছে—বিদিশার রাজার মেয়ের স্বয়ংবর সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে সমবেত রাজমণ্ডলী এবং অবীক্ষিতের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই বাধে। এই যুদ্ধে অবীক্ষিত শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে পরাজিত হন

এবং বিদিশার রাজবাড়িতে বন্দি হিসেবে তাঁকে ঢুকতে হয়। অবীক্ষিতের পিতা করন্ধম বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে পুত্রের মুক্তির জন্য বিদিশা আক্রমণ করেন এবং পুত্রকে মুক্ত করে নিয়ে যান।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই সময় বিদিশা (বেশনগর) হৈহয় রাজাদের রাজ্যভুক্ত ছিল—There can be little doubt that those enemies were the Haihayas, for Vidisa was in the Haihaya region, and that they were beaten off. তুর্বসুবংশীয় করন্ধম রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেলেও তাঁর পুত্র অবীক্ষিত পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেননি। সেই যে একবার সমস্ত রাজা তাঁকে পরাস্ত করে বিদিশার রাজপথে বন্দি হিসেবে হাঁটিয়েছিল, সেই অপমান তিনি ভুলতে পারেননি। বিদিশার রাজকুমারী কিন্তু মনে মনে রাজমণ্ডল-মধ্যবর্তী সেই একক রাজবন্দিকেই আপন প্রাণেশ্বর হিসেবে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। অবীক্ষিত বলেছিলেন— আমি যখন রাজকুমারীর সামনে অন্য রাজাদের দ্বারা পরাভূত হয়েছি, তখন সেই রাজকুমারীকে আমি আমার মুখ দেখাতে পারি না—সো'হমস্যাঃ পুরো ভূমৌ পরৈর্ভূপৈঃ খিলীকৃতঃ। কথা শুনে রাজকুমারী পিতাকে বলেছিলেন—না, বাবা! আমি শুধু তাঁর রূপ দেখে তাঁকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত হইনি। এত রাজার সঙ্গে একা যুদ্ধ করে তিনি যে অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন, সেই বিক্রমই আমার মন হরণ করেছে পিতা—শৌর্য-বিক্রম-ধৈর্যানি হরন্ত্যস্য মনো মম।

অবীক্ষিতের সঙ্গে এই বিয়ে তখন-তখনই হয়নি। কিন্তু বিদিশার রাজকুমারীর অনুরাগ এবং অবীক্ষিতের পিতা করন্ধমের আগ্রহে এই বিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল, কিন্তু সেই পুরাতন যুদ্ধস্মৃতি এবং পরাজয়ের অভিমান হৃদয়ে বহন করে অবীক্ষিত রাজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হন। বৃদ্ধ করন্ধম তখন পুত্রের বদলে নাতিকে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। করন্ধমের এই নাতিই হলেন মরুত্ত—আবীক্ষিত মরুত্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে পণ্ডিতদের মধ্যে সন্দেহ এসেছে। বস্তুত বেশিরভাগ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ভাল করে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে—আবীক্ষিত মরুত্তের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণের পৌরাণিক মরুত্তের একটি পুত্রসন্তানের ব্যবস্থা করেছেন, ফলত পণ্ডিতেরা বৈশালীর করন্ধম-অবীক্ষিত-মরুত্তকে তুর্বসু-বংশের করন্ধম-অবীক্ষিত-মরুত্ত থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। যদিও এই সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং পৌরাণিকেরাই। অবশ্য, এই অকারণ ভয় বা সন্দেহের কোনও ঘটনাই ঘটা উচিত নয়। কারণ তুর্বসু বংশ বৈশালীতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুরাণেই দেখা যাবে আবীক্ষিত মরুত্তের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না।

বায়ুপুরাণ এবং হরিবংশ তুর্বসুবংশের পরিচয় দেবার সময় বলেছে—তুর্বসুর পুত্র হলেন বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোভানু। গোভানুর পুত্রের নাম ত্রিসানু, ত্রিসানুর পুত্র করন্ধম এবং তাঁর পুত্র মরুত্ত—মাঝখানে অবীক্ষিত নেই—করন্ধমস্ত্রিসানোস্তু মরুত্তস্তস্য চাত্মজঃ। মরুত্তর নামটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুপুরাণ এবং হরিবংশ বলে উঠেছে—আমরা আরও একজন মরুত্তের কথা শুনেছি, তিনি অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত—অন্যস্তু আবীক্ষিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতঃ পুরা। সেই মরুত্তের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না—অনপত্যো মরুত্তস্তু। পুরাণকারেরা এক কথা বলেছেন আর অমনি পারজিটার সাহেবও সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন—They must be carefully distinguished.

আমাদের নিবেদন—এখানে মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিবরণ মাথায় রেখে বুঝে নিতে হবে—অবীক্ষিত এক সময় নিজের অভিমানে পিতার রাজ্য গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছিলেন—নাহংতাত করিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্। এই রাজ্যগ্রহণের অস্বীকৃতিই পরবর্তীকালে পৌরাণিকদের কীর্তিত তুর্বসু রাজবংশের পরম্পরায় অবীক্ষিতের নাম মুছে দিয়েছে। অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্তকে করন্ধম সোজাসুজি রাজ্য দিয়েছিলেন—স পিত্রা সমনুজ্ঞাতং রাজ্য প্রাপ্য পিতামহাৎ। এই কারণেই তুর্বসু রাজবংশের তালিকায় অবীক্ষিতের নাম ওঠেনি এবং পৌরাণিকেরা মরুত্তের নাম শুনলেই বলে ওঠেন আমরা অবীক্ষিতের ছেলে বলে আরও একজন মরুত্ত রাজার নাম শুনেছি—অন্যস্তু আবীক্ষিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতস্তব। আসলে এই মরুত্তই সেই মরুত্ত। এঁদের আলাদা করে 'carefully' দেখার কোনও কারণ নেই।

অবশ্য মার্কণ্ডেয়র অন্য বিবরণ মিথ্যে করে দিয়ে এ কথা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে মরুত্তের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। প্রধান পুরাণগুলির এই তথ্য অবিসংবাদিত—অনপত্যো'ভবদ্ রাজা যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ—মরুত্ত রাজা ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বহু বহু যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন। এইবারে আবার রাজনৈতিক চিত্রে ফিরে আসি। তুর্বসুবংশীয় করন্ধম, অবীক্ষিত এবং মরুত্তের চেষ্টায় যাদব-হৈহয় রাজবংশের পূর্বোত্তরী গতি খানিকটা থেমে ছিল বটে কিন্তু যযাতির মূল রাজ্য প্রতিষ্ঠানপুর—যেখানে যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশপরম্পরা চলছিল, সেখানে কখনও হৈহয়রা কখনও বা অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা ধুন্ধুমার কাণ্ড চালিয়ে পৌরব রাজবংশকে প্রায় মুছে দিয়েছিলেন। রাজবংশের অর্ধেক রাজার নাম পৌরাণিকদের বংশতালিকায় লুপ্ত। এমনকি পৌরব দুষ্যন্তের ঔরস পিতার নামও আমরা ভাল করে জানি না। জানি না মায়ের নামও। এরই মধ্যে হঠাৎই পুরাণে শুনতে পাই—পুরুবংশীয় দুষ্যন্তকেই বৈশালীর পুরবাসীরা মরুত্তের পুত্ররূপে স্বীকার করে নেন—দুষ্যন্তং পৌরবং চাপি সর্বে পুত্রমকল্পয়ন্। (বায়ুপুরাণের পাঠে দুষ্যন্তের নাম ভুল করে 'দুষ্কৃতং পৌরবঞ্চাপি' করা হয়েছে।) পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত দুষ্যন্তকে পেলে-পুষে বড় করেন।

আমরা আগে মরুত্ত রাজার যজ্ঞে বৃহস্পতির ভাই সংবর্তকে পৌরোহিত্য করতে দেখেছি। হরিবংশ বলেছে—মরুত্ত রাজা সংবর্তের পৌরোহিত্য কর্মে এতটাই সুখী হয়েছিলেন যে, অপুত্রক রাজা তাঁর কন্যা সম্মতাকে সংবর্তের হাতেই তুলে দেন। হরিবংশের ভাষাটা এইরকম—দক্ষিণা হিসেবে নিজের মেয়ে সম্মতাকে সংবর্তের হাতে তুলে দিয়ে মরুত্ত রাজা পৌরব দুষ্যন্তকে পুত্র হিসেবে পেলেন—

দক্ষিণার্থং স্ম বৈ দত্ত্বা সংবর্তায় মহাত্মনে।
দুষ্যন্তঃ পৌরবং চাপি লেভে পুত্রমকল্মষম্।।

মহাভারতে আদিপর্বের দ্বিতীয় বংশলতিকায় কোনও এক 'ইলিন'র নাম করা হয়েছে, যাঁকে দুষ্যন্তের পিতা বলা হয়েছে। কিন্তু এই 'ইলিন' স্ত্রী না পুরুষ, দুষ্যন্ত তাঁর ছেলে না নাতি সে সব নিয়ে প্রচুর বিবাদ আছে। তার ওপরে মহাভারতের ওই বংশলতিকা অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায় না। কাজেই বেশির ভাগ পুরাণে মরুত্ত রাজার ঘরে দুষ্যন্তকে বাড়তে দেখে আমরা ধারণা করি—হৈহয়-যাদবরা যখন মধ্যদেশের প্রায় সবটাই দখল করে নিজেদের করায়ত্ত করেছিলেন, সেই সময় কোনও একজন পুরুবংশীয় ব্যক্তির ঔরসে দুষ্যন্ত জন্মেছিলেন। পুরোহিত সংবর্ত মরুত্তের কন্যা সম্মতাকে দানে পেয়েছিলেন বটে, তবে তাঁরই গর্ভে দুষ্যন্ত সংবর্তের ঔরসে

AMARBOI.COM

জন্মেছিলেন কি না, তা খুব স্পষ্ট নয়। তবে আমাদের ধারণা, প্রতিষ্ঠানপুর থেকে ছিন্নমূল কোনও পুরুবংশীয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্মতার বিয়ে দিয়ে দেন সংবর্ত এবং রাজা মরুত্ত তা জানতেন। এই বিবাহের ফলেই হয়তো দুষ্যন্তের জন্ম, কিন্তু জন্মলগ্নেই তিনি পৌরব বা পুরুবংশীয় বলে চিহ্নিত। মরুত্ত নির্বিচারে দুষ্যন্তকে নিজের বাড়িতে স্থান দেন এবং দুষ্যন্তের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা এতটাই ছিল যে তুর্বসুর বংশ মরুত্তের পরে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তা মিশে যায় সুপ্রসিদ্ধ পুরুবংশে—পৌরবং তুর্বসোর্বংশঃ প্রবিবেশ নৃপোত্তম। যদুবংশীয় যাদব-হৈহয়দের নাশকতায় পুরুবংশের মূল স্তম্ভটাই যখন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল তখন যযাতিপুত্রের অন্য এক ধারায় পুরুবংশের শিবরাত্রির সলতে দুষ্যন্ত মানুষ হতে লাগলেন। পুরুবংশের ক্ষীয়মাণ ধারা পৌরব দুষ্যন্তের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়েছে মহাভারতে তাঁকে পৌরবদের 'বংশকর' বলে অভিহিত করা হয়েছে—পৌরবাণাং বংশকরো দুষ্যন্তো নাম বীর্যবান্।

বিয়াল্লিশ

দুষ্যন্ত তখনও মহারাজ দুষ্যন্ত হননি। হয়তো বৈশালী অথবা এখনকার সাতনা-রেওয়া অঞ্চলের রাজচক্রবর্তী মরুত্তের ঘরে মানুষ হচ্ছেন তিনি। সেই কবে যদু-তুর্বসুরা প্রতিষ্ঠানপুরে পুরুর রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। আর আজ কত পুরুষ পরে পুরুর রাজবংশ যখন প্রতিষ্ঠানপুর থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অযোধ্যার রাজা, আর যাদব-হৈহয়দের পর্যায়ক্রমিক আক্রমণে গঙ্গা-যমুনার এপার-ওপার এবং মধ্যদেশও যখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই কোন পূর্বপুরুষের রক্তের টানে তুর্বসুবংশীয় পুত্রহীন মরুত্ত রাজা পুরুবংশীয় দুষ্যন্তকে নিজের কোলে টেনে নিলেন, তা বলা সহজ নয়। বংশজ এক জ্ঞাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আরেক জ্ঞাতিকে আশ্রয় দিলেন মরুত্ত। ঐতিহাসিকদের মতে দুষ্যন্ত যখন খুবই ছোট, তখন প্রতিষ্ঠানপুরে যাদব-হৈহয়দের অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার আগে যদুবংশের যাদব-হৈহয়রা সমস্ত মধ্যদেশ দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তার ফলে মূল পুরুবংশটাই উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

যদুবংশে, অথবা আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় হৈহয় বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কার্তবীর্যার্জুনের ছেলের নাম ছিল জয়ধ্বজ। তিনি রাজত্ব করতেন অবন্তীতে। নর্মদা নদী থেকে তাপ্তী নদী পর্যন্ত এই জায়গার ভৌগোলিক বিস্তার। হৈহয়বংশীয় কার্তবীর্য অর্জুন কর্কোটক নাগদের যুদ্ধে হারিয়ে প্রথমে মাহিষ্মতী দখল করেছিলেন। মাহিষ্মতীতে যে হৈহয়দের প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল, সে কথা এই অঞ্চলের শিলালিপিগুলি থেকেও প্রমাণিত হবে। একটি শিলালিপিতে জনৈক হৈহয় রাজাকে 'মাহিষ্মতীপুরবরেশ্বর' বলে ডাকাও হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে মাহিষ্মতী অবন্তীর রাজধানী। যদিও পরে নর্মদার দুই পার ধরে উত্তরে প্রায় রাজপুতনা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে তাপ্তী পর্যন্ত অবন্তী রাজ্যের সীমানা ছড়িয়ে যাওয়ায় দক্ষিণ অবন্তীতেই মাহিষ্মতীর

ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করা যায়।

কার্তবীর্য অর্জুনের নাতি এবং জয়ধ্বজের ছেলের নাম হল তালজঙ্ঘ। এই তালজঙ্ঘ এতটাই শক্তিমান ছিলেন যে তাঁর পাঁচটি পুত্রও তাঁরই নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে তালজঙ্ঘ বলেই ডাকা হত। তালজঙ্ঘের পাঁচ ছেলে। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন রাজা বীতিহোত্র, যাঁকে বীতহব্যও বলেন অনেকে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব খুললে এক জায়গায় দেখবেন হৈহয় বীতিহোত্র কাশীর রাজা দিবোদাসের পিতামহ হর্যশ্বকে মেরে বংশ বংশ ধরে রাজ্য-ছাড়া করে রেখেছেন। তবে তাদের যুদ্ধটা যে শুধু কাশীতে গিয়েই হচ্ছে, তা মোটেই নয়। বীতিহোত্র এবং তাঁর ছেলেপিলে আত্মীয়স্বজনেরা গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ধুন্ধুমার কাণ্ড লাগিয়ে দিয়েছিলেন—গঙ্গা যমুনয়ো র্মধ্যে সংগ্রামে বিনিপাতিতঃ। শেষ পর্যন্ত হর্যশ্বের নাতি হৈহয় তালজঙ্ঘদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য কাশী-নগরীর পত্তন করলেন।

বীতিহোত্রের ছেলেরা অবশ্য কাশীতে গিয়েও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, কিন্তু কথাটা এখানে নয়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে যাদব-হৈহয়রা যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তাতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন প্রতিষ্ঠানপুরে আর পুরুবংশের চিহ্ন কিছু ছিল না। মহাভারতে পুরুর পরে দুষ্যন্ত পর্যন্ত পুরুবংশের একটা রাজতালিকা সাজানো আছে বটে, তবে সে সব রাজা নিতান্তই এলেবেলে। বিশেষত বিভিন্ন রাজবংশ এবং সেইসব রাজার সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য পরিবেশনের জন্য যেসব পুরাণ বিখ্যাত, সেই পুরাণগুলির সঙ্গে মহাভারতের বংশতালিকা মেলে না এবং বহু জায়গায় বংশের ছেদও পড়ে গেছে। এতসব দেখে পণ্ডিতেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পুরুবংশ কোনওমতে টিকে ছিল। কীর্তিহীন, অবলম্বনহীন, বীরের সদগতি থেকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট। হয়তো এইরকমই এক উচ্ছিন্ন পৌরব-পুরুষের ছেলের নাম দুষ্যন্ত—যিনি মরুত্ত রাজার ঘরে মানুষ হচ্ছিলেন।

মরুত্ত রাজার ঘরে দুষ্যন্ত তখনও মানুষ হতে আসেননি, হয়তো বা তিনি তখনও জন্মানওনি; সেই সময়ে একটা বিরাট সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। কাশীর রাজা হর্যশ্ব থেকে আরম্ভ করে দিবোদাস পর্যন্ত সকলেই যাদব-হৈহয়দের হাতে খুব মার খেয়েছিলেন বটে, কিন্তু দিবোদাসের ছেলে প্রতর্দন হৈহয়দের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং হৈহয় বীতিহোত্র শেষ পর্যন্ত নিজের কুল-শীল জাতি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ হয়ে যাবার চেষ্টা করেন এবং ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করে নিজেকে কোনওমতে টিকিয়ে রাখেন।

হৈহয়দের আরও ক্ষতি হয়ে গেল অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকু বংশের নবতর এক সমৃদ্ধির ফলে। হৈহয়রা অযোধ্যা দখল করেছিলেন অনেক আগে। অযোধ্যার রাজা বাহুকে তাড়িত হয়ে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। সেখানেই এক বনে তিনি তাঁর পত্নীদের নিয়ে তপস্যা করে দিন কাটাচ্ছিলেন—বনং প্রবিশ্য ধর্মাত্মা সহ পত্ন্যা তপো'চরৎ। হৈহয়রা বাহুর রাজ্য কেড়ে নিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি। রাজ্য জয় করে তাঁরা অযোধ্যায় আর্যেতর জনজাতি শক, যবন, পহ্লবদের বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা অযোধ্যায় এসে ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়দের মতোই দিন কাটাচ্ছিলেন—শকাদীনাং ক্ষত্রিয়াণাম্। অরণ্যাশ্রিত বাহু বনে থাকতে থাকতেই বুড়ো হয়ে গেলেন। এর মধ্যে একদিন নদী থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য জল আনতে গিয়ে তিনি মরেই গেলেন। তাঁর স্ত্রী—লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি যাদবী অর্থাৎ যাদবদের মেয়ে।

আপনাদের খেয়াল আছে নিশ্চয়—সেই যে যাদব শশবিন্দুর মেয়ে বিন্দুমতীর সঙ্গে অযোধ্যার রাজা মান্ধাতার বিয়ে হয়েছিল। হয়তো সেই সময় থেকে যাদবদের মেয়ে ঘরে

আনাটা একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল ইক্ষ্বাকুবংশে। এমনও হতে পারে, যাদবদের মেয়ে বিয়ে করে বাহু-রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত যাদব-হৈহয়দের খানিকটা হাতে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু সে 'স্ট্র্যাটেজি' খাটেনি। বাহু মারা গেলে তাঁর স্ত্রী যাদবী স্বামীর চিতায় আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি গর্ভিণী ছিলেন এবং এই অবস্থাতে তাঁর চিতারোহণ নিষিদ্ধ হতে পারে—এই ভেবেই তাঁর সতীন তাঁকে বিষ খাইয়ে দেন। যাদবীর এই বিষদগ্ধ অবস্থায় বাহু-পত্নী যাদবীকে দেখতে পান ভার্গব ঔর্ব। তিনি তাঁকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান এবং সুস্থ করে তোলেন। বিষের অন্য সংস্কৃত নাম 'গর'। 'গর' অর্থাৎ বিষের সহজাত বলেই যাদবীর পুত্রের নাম হয় সগর—গরেণ সা তদা সহ...ব্যজায়ত মহাবাহুং সগরং নাম ধার্মিকম্।

সগর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশের রাজলক্ষ্মীও ফিরে এলেন। রাজ্য গ্রহণ করার পর সগরের প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াল পিতৃশত্রু হৈহয়-যাদবদের উচিত শিক্ষা দেওয়া। যে হৈহয়-রাজারা গঙ্গা-যমুনার মধ্যদেশ রাজ্যভুক্ত করে অযোধ্যা পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন, সগরের হাতে তাঁরা প্রচণ্ড মার খেলেন। সগর যেখানে জন্মেছিলেন এবং যাঁর আশ্রমে মানুষ হয়েছিলেন তিনি ভার্গববংশীয় ঔর্ব। ঔর্বকে পৌরাণিকেরা অগ্নির পর্যায় শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত ভৃগু-বংশীয়রা ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র চালনাও ভাল রকম আয়ত্ত করেছিলেন। জমদগ্নি, পরশুরাম, ঔর্ব—সকলেই এই কারণে বিখ্যাত। সগর ঔর্ব জামদগ্ন্যের কাছে বেদ-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে প্রভূত আগ্নেয়াস্ত্রও লাভ করলেন—জামদগ্ন্যাত্তদাগ্নেয়ম্ অসুরৈরপি দুঃসহম্।

সগর নিজের সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে সেইসব আগ্নেয়াস্ত্র প্রথম ব্যবহার করলেন হৈহয়দের ওপরে। বনের মধ্যে রুদ্র-শিব যেভাবে পশুহত্যা করেছিলেন সেইভাবেই যাদব-হৈহয়দের হত্যালীলায় মেতে উঠলেন সগর—জঘান হৈহয়ান্ ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশুগণানিব। হৈহয়রা যেসব বহির্দেশীয় শক-যবন, পহ্লব-পারদ জনগোষ্ঠীকে অযোধ্যায় বসিয়ে দিয়ে ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সগর তাঁদের ধরে ধরে কোনও গোষ্ঠীর মাথা ন্যাড়া করে দিলেন, কাউকে লম্বা চুল রাখতে বাধ্য করলেন, কাউকে বা দাড়ি রাখতে বাধ্য করলেন। অর্থাৎ এঁদের সকলকে তিনি ক্ষত্রিয়ের আচার-ব্যবহার থেকে চ্যুত করে চুল-দাড়ির মার্কা মেরে দিলেন, যাতে এঁরা আর কখনও ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে সমতা অনুভব না করেন।

সগরের পরাক্রমে মধ্যদেশে হৈহয়দের প্রভাব স্তব্ধ হল বটে, কিন্তু সগর যখন দুর্বল বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, তখন তাঁর পুত্রেরা সগরের মতো রাজ্য চালাতে পারলেন না। তাঁর পুত্রেরা তাঁর উপযুক্ত হননি। জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ, যাঁর রাজা হবার কথা ছিল, তিনি নানা দুষ্কর্ম করতেন এবং প্রজাদের ওপর অত্যাচারও করতেন। ফলে সগর তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন—পৌরাণামহিতে যুক্তং পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরা।

অযোধ্যায় সগরের বংশজাত পুত্রেরা যখন বেশ দুর্বল হয়ে গেলেন—পণ্ডিতদের অনুমান—তখনই পুরুবংশীয় দুষ্যন্ত, যিনি এতকাল তুর্বসুবংশীয় মরুত্তের ঘরে মানুষ হচ্ছিলেন, তিনি আস্তে আস্তে নিজের শক্তি বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। পারজিটারের ভাষায়—(Marutta) had no son and adopted Dusyanta the Paurava. Dusyanta afterwards recovered the Paurava Kingdom, revived the dynasty and, and so is styled its *vamsakara*. The adoption could only have taken place before he gained that position, this corroborates the conclusion that the Kingdom was

in abeyance, so that Dusyanta, as the heir in exile, might naturally accept such adoption. He could only have restored the Paurava dynasty after the Haihaya power had been destroyed by Sagara and Sagara's empire had ended, so that he would be one or two generations later than this Marutta and two later than Sagara.

এতক্ষণ যেভাবে আমরা পুরুবংশের পরম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষটিকে উপস্থাপিত করলাম, মহাভারতে সেভাবে নেই। পুরাণগুলির মধ্যে আমরা দুষ্যন্তের উদ্ভব যেভাবে দেখতে পেয়েছি, তারই কিছু অংশ এসেছে আমাদের আলোচনায়। মহাভারতে যেখানে পুরুবংশের রাজনামগুলি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে দুষ্যন্তের নাম প্রসঙ্গত এসেছে বটে, কিন্তু তাঁর মর্যাদার কথা কিছু বলা নেই। দুষ্যন্তের কাহিনী সেখানে এসেছে এইভাবে—জনমেজয় মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করেছেন—আমি কুরুদের বংশ-বিবরণ শুনতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রথম থেকে তা বলুন—ইমন্তু ভূয় ইচ্ছামি কুরূণাং বংশমাদিতঃ। কুরুদের কথা প্রথম থেকে বলতে গেলে তো একেবারে ঐল পুরূরবা থেকে আরম্ভ করে যযাতি-পুরুকে ছুঁয়ে সেইভাবে বলতে হয়। কিন্তু বৈশম্পায়ন কোনও কিছু না বলে হঠাৎ আরম্ভ করলেন—পৌরবদের বংশকর রাজা হলেন দুষ্যন্ত। তার মানে সত্যিই কিছু ফাঁক আছে—যা আমরা এতক্ষণ ধরে ঐতিহাসিকতার স্পর্শ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

মহাভারতের কবি লিখেছেন—মহারাজ দুষ্যন্ত এই চতুরন্তা পৃথিবীর রাজা ছিলেন। পৃথিবী মানে যদি ভারতবর্ষও বুঝি, তাহলেও বলব দুষ্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন না। আবার আধুনিক বুদ্ধিতে যদি আমরা মহারাজ দুষ্যন্তকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের রাজত্ব নাও দিই, তবু কিন্তু মহাভারতের কবির আশয়টুকুও বুঝতে হবে, বুঝতে হবে, দুষ্যন্ত যথেষ্ট বড় রাজা। তিনি তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছেন, এ কথা খুব বড় নয়। তাঁর সাম্রাজ্য গঙ্গা-যমুনার মধ্যদেশ ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মহাভারত বলেছে—ম্লেচ্ছ রাজ্য পর্যন্ত ছিল দুষ্যন্তের রাজ্যের সীমা এবং সীমাটা উত্তর পশ্চিমেই মনে হয়—আম্লেচ্ছাবধিকান্ সর্বান স ভুঙ্‌ক্তে রিপুমর্দনঃ—কারণ, দুষ্যন্তের সময়ের আগে থেকেই ভারতের উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিমে ম্লেচ্ছ বা আর্যেতর জনজাতির বসতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে দুষ্যন্তের রাজ্য বিস্তারের কোনও প্রমাণ আমরা পাই না এবং ঐতিহাসিকদের মতে, দুষ্যন্তের সময়েও যেসব রাজ্যের স্বাধীন অবস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হল বিদেহ (মিথিলার উপকণ্ঠে), বৈশালী (সাতনা-রেওয়া), কাশী, বিদর্ভ (বেরার)। বিদর্ভে কিন্তু তখনও হৈহয়দের অথবা যাদবদের রাজত্বই চলছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, দুষ্যন্তের প্রসঙ্গে আমরা প্রতিষ্ঠানপুরের নামটি আর শুনতে পাচ্ছি না। হয়তো দুষ্যন্ত পূর্বপুরুষের রাজধানী ছেড়ে সরে এসেছিলেন উত্তরের দিকে। মহাভারতে শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার সময়ে তাঁর স্বামীর রাজধানীকে হস্তিনাপুর বলা হয়েছে—শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য সপুত্রাং গজসাহ্বয়ম্। শ্লোকোক্ত 'গজসাহ্বয়' হস্তিনাপুরের অন্য নাম। কিন্তু মজা হল, হস্তিনাপুর তখন কোথায়? দুষ্যন্তের পাঁচ পুরুষ পরে তাঁরই বংশজ রাজা হস্তীর নামে হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠা হবে। কাজেই আর যেখানেই হোক দুষ্যন্ত হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতেন না। তবে প্রতিষ্ঠানপুর ছেড়ে এসে তিনি হস্তিনাপুরের কোনও অঞ্চলে বসবাস করেই থাকতে পারেন এবং সেটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। তবে কোনও অবস্থাতেই তখনও সে রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর ছিল না।

ইতিহাসের তথ্যানুমান ছেড়ে এবার আমরা একটু মহাকাব্যে আসি। মহাকাব্যে আসতেই হবে কারণ, মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনী অবলম্বন করেই গুপ্তযুগের কালিদাস তাঁর অবিস্মরণীয় নাটকখানি রচনা করেছেন। শুধু কালিদাস লিখেছিলেন বলেই নয়, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনী মহাভারতের পূর্বযুগেই ইতিহাসের গণ্ডি ছেড়ে মহাকব্যের সরসতায় ধরা পড়েছিল; অথবা বলা যেতে পারে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম-কাহিনী ইতিহাস হয়ে গিয়েছিল বলেই সেই ইতিহাস থেকে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটা স্বীকার করতেই হবে যে, কালিদাস তাঁর নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত মহাভারত থেকেই। কিন্তু নাটক লিখবার সময় কালিদাসের একান্ত আপন কবি-হৃদয়ের কাব্যময়তা এমনভাবেই কাজ করেছে যে, মহাভারতের কাহিনী সেখানে রূপান্তরিত হয়েছে চূড়ান্ত কাব্যিক মহিমায়। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা, বিদায় অভিশাপ-এর কচ-দেবযানী অথবা কর্ণ-কুন্তীর রাবীন্দ্রিক চরিত্রায়ণের মধ্যে যে শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ পরিস্ফুট হয়েছে, কালিদাসের শকুন্তলা-দুষ্যন্তের কাহিনী সেইরকম মহাভারতের কাব্যশরীর অতিক্রম করে নতুন এক দুষ্যন্ত অথবা নতুন এক শকুন্তলার জন্ম দিয়েছে।

কালিদাসের নাটকে আরম্ভেই নাটক—একটি হরিণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, আর তার পিছন-পিছন ছুটছেন মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্ত। হাতে ধনুকবাণ, একা। পাত্রমিত্রের পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মহাকাব্যের বিশাল পটভূমি থেকে শুধু মৃগয়ার ইঙ্গিতটুকু ব্যবহার করে কালিদাস তাঁর নায়ক দুষ্যন্তকে হরিণের পিছন পিছন ছোটাতে ছোটাতে একা এনে ফেলেছেন কণ্বমুনির আশ্রমে, কারণ রাজাকে প্রথম থেকেই একাকিত্বের প্রশ্রয় দিলে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দিতে সুবিধে হয়।

কিন্তু মহাভারতের কবির বিশেষণ যে 'বিশালবুদ্ধি'—ব্যাসস্য বিশালবুদ্ধেঃ, যিনি নানারকম সামাজিক, রাজনৈতিক ধারার পরিণতি ঘটিয়ে কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত করবেন, তিনি তো আর দু-পাঁচটি শ্লোকে দুষ্যন্তের রথচক্রের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে তপোবনে এনে ফেলতে পারেন না। তাঁর ভঙ্গিটা সব সময়ই এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের ঠাকুরদাদার মতো। শূন্যতা, নির্জনতা, দুঁহু-দোঁহার অপাঙ্গ-ইঙ্গিত—এসব ক্ষুদ্র উদ্দীপন মহাকাব্যের কবিকে মানায় না। বনপথে দুষ্যন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে এসে পৌঁছবেন এর জন্য তাঁকে পরিবেশ প্রস্তুত করতে হয়েছে প্রায় দুই অধ্যায় ধরে। মহাভারতের দুষ্যন্ত, পৌরব বংশের 'বংশকর' রাজা। তিনি হাজারো সৈন্যবাহিনী নিয়ে মৃগয়ায় বেরোবেন, সে তো দুটি-চারটি শ্লোকে হয় না। রাজা মৃগয়ায় যাবেন, তার একটা উদ্যোগপর্ব আছে রীতিমতো। সেই মৃগয়ায় হাতি-ঘোড়া পদাতিকের সমন্বিত পদশব্দের সঙ্গে রথচক্রের ঘর্ঘর, অস্ত্র-শস্ত্রের বিপুল ঝনঝনানির সঙ্গে রথী পুরুষের শঙ্খনাদ—সিংহনাদৈশ্চ যোধানাং শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈ,— হাতি-ঘোড়ার বৃংহণ-হ্রেষিত শব্দের সঙ্গে মজা দেখতে আসা সমবেত জনতার চিৎকার—সব কিছু মিলিয়ে রাজবাড়ির পথ এবং প্রাঙ্গণ একেবারে মুখরিত হয়ে উঠল।

বনের পশু-পক্ষী, বাঘসিংহ শিকার করার জন্য মহারাজ দুষ্যন্তের এই বিরাট উদ্যোগ 'মশা মারতে কামান দাগা'র মতো শোনাতে পারে, কিন্তু সেকালের রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক পটভূমির কথা টেনে আনলে একটা গেরেমভারি শব্দও এখানে ব্যবহার করা যায়। বলা যায়—সেকালের সামন্ততন্ত্রের রেওয়াজই এইরকম। রাজা মৃগয়ায় যাবেন, তার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—সমস্ত বর্ণের লোকেরা তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে—নির্যান্তমনুজগ্মিরে। তাঁরা আশীর্বাদ আর জয়শব্দ উচ্চারণ করে চলে গেলে, জনপদবাসীরা

দুষ্যন্তকে অনুগমন করার জন্য প্রস্তুত হল। অন্যদিকে রাজধানীর সমস্ত গৃহের উপরিতলে ভিড় উপচে পড়ল পুরনারীদের—প্রাসাদবরশৃঙ্গস্থাঃ পরয়া নৃপ শোভয়া। দদৃশুস্তং স্ত্রিয়স্তত্র...।।

মহারাজ দুষ্যন্তকে দেখে পুরনারীরা ভাবছিলেন যেন বজ্র হাতে স্বর্গের দেবরাজ নেমে এসেছেন ভুঁয়ে। মহারাজের বীরত্বের কথা সপ্রেমে আলোচনা করতে করতে তাঁরা প্রাসাদশৃঙ্গ থেকে ফুল ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিলেন দুষ্যন্তের মাথায়—সসৃজুস্তস্য মূর্ধনি। প্রশস্ত রাজপথের মধ্যে উপরিপ্রাসাদতলগতা রমণীদের সানুরাগ কথাবার্তা উদ্ধার করে মহাভারতের কবি দেখালেন—উত্তমা নাগরিকাদের কাছেও দুষ্যন্ত কত কাম্য পুরুষ। সমস্ত জনপদবাসী দুষ্যন্তের পিছন পিছন অনেক দূর পর্যন্ত চলে এল। শেষে দুষ্যন্তই তাদের পাঠিয়ে দিলেন রাজধানীতে। বনের পথ আরম্ভ হয়ে গেছে।

বনের মধ্যে এবার মৃগয়ার প্রস্তুতি আরম্ভ হল। নির্জন বন দুষ্যন্তের হস্তি-অশ্ব-পদাতিকে আলোড়িত হয়ে উঠল। কোথায় সিংহ, কোথায় বাঘ, কোথায় বন্যশূকর—হাঁকে-ডাকে, হত্যায় নির্মনুষ্য বনভূমি যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিল। যারা ধনুক-বাণ চালায় তাদের লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা, যারা গদা চালায় তাদের 'রিফ্লেক্স', সব কিছুর পরীক্ষা হতে থাকল বন্য পশুদের ওপর। শব্দ-আঘাত-রক্তপাতে সমস্ত বনভূমি একেবারে ঘাঁটিয়ে তুললেন দুষ্যন্ত—লোড়য়ামাস দুষ্যন্তঃ সূদয়ন্ বিবিধান্ মৃগান্। এই বিশাল মৃগয়া-অভিযানে দুষ্যন্তের বাহিনীর বেশ কিছু লোক মারাও পড়ল। আবার অন্যদিকে এত পশুপাখি মারা পড়ায় বনবাসী কিরাত-শবরদের কিছু সুবিধেও হল। তারা আগুন তৈরি করে মৃত পশুপাখি পুড়িয়ে ভূরি-ভোজনের সুযোগ পেল। বলা বাহুল্য, এই বনের মৃগ-পশু শেষ হয়ে গেলে দুষ্যন্ত মৃগয়া-ব্যসনী হয়ে অন্য বনে প্রবেশ করলেন। মহাভারতের মৃগয়ার বর্ণনা সুচতুর কালিদাস ব্যঞ্জনার অঙ্গুলি সংকেতে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দ্বিতীয় অঙ্কে, বিদূষকের মুখে।

মহাভারতে দুষ্যন্ত বনান্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিবেশগত পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। কালিদাসে ছুটন্ত ভয়ার্ত হরিণ এসে প্রবেশ করেছিল তপোবনে। ঋষিবালক হাত তুলে দুষ্যন্তকে বারণ করেছিলেন—এটি আশ্রমের মৃগ, একে হত্যা কোরো না—আশ্রম-মৃগো'য়ং ন হন্তব্যঃ, ন হন্তব্যঃ। রবিঠাকুরের কালিদাস-অনুবাদ—মৃদু এ মৃগদেহে মেরো না শর, আগুন দেবে কে গো ফুলের পর। দুষ্যন্ত থামেন, রথ থেকে নামেন, অভিবাদন করেন ঋষিবালককে।

মহাভারতে যে বনে মৃগয়া হল, সেই বন থেকে এ বন একেবারেই আলাদা। যে বনে শেষ পর্যন্ত 'আশ্রমললামভূতা' শকুন্তলার দেখা পাওয়া যাবে, সেই বনের আবহ তৈরি হয়েছে নতুন সরসতায়। বনের পরিবেশে শীতল সমীরণের সঙ্গে বিহঙ্গের আলাপ যুক্ত হয়েছে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মধ্যে বিশাল বিশাল বটের ছায়া, বিচিত্র বন্য লতা, ফুল আর কোকিলের শব্দ। সহৃদয় পাঠক! দুষ্যন্তের সঙ্গে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার দেখা হবে, এ তারই প্রস্তুতি। পাগল সমীরণে, ফুলের গন্ধে, পাখির ডাকে পাঠকের মনে প্রিয়মিলনের সঙ্গীত বাজতে থাকে। যাঁরা ভট্টিকাব্যের শরদ্বর্ণনার শেষ শ্লোকটি শুনে মোহিত হন, তাঁরা জানবেন ভট্টির কাব্যে মহাভারতের কবির শব্দস্পর্শ লেগেছে—দুষ্যন্ত এইমাত্র যেখানে এসে পৌঁছলেন, সেখানে এমন কোনও গাছই ছিল না, যে গাছে ফুল ফোটেনি,—নাপুষ্প পাদপঃ কশ্চিৎ। এমন কোনও ফুলও ছিল না, যেখানে অনুপস্থিত মধুকরের অব্যক্ত গুঞ্জন—ষট্পদৈর্নাপ্যপাকীর্ণং ন তস্মিন্ কাননে'ভবৎ।

কালিদাসে কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করার সময় দুষ্যন্তের মুখে একখানিই শব্দ—শান্তমিদম্ আশ্রমপদম্। কিন্তু মহাকাব্যের কবির অনেক সমারোহ। তাঁর আশ্রমপদ কালিদাসের মতো পূর্বপরিকল্পিত শূন্য নয়। কালিদাসের দুটি ঋষিবালক, সে দুজনও বুঝি দুষ্যন্তকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সমিদাহরণ করতে চলে গেল, আর কণ্বমুনি তো আশ্রমেই নেই। দুষ্যন্তের কত সুবিধে। কালিদাসেরও বা কম কী? কিন্তু মহাভারতের দুষ্যন্ত নদীর তীর ঘেঁষা আশ্রমের মধ্যে কত ঋষি-মুনি দেখলেন, কত মৃগ-পক্ষী, কত ঋষিবালক সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব, কেউ বাদ নেই। সমবেত ঋষিমুনির ওঙ্কারধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় অগ্নিস্থাপনের বেদি পুষ্পস্তর দিয়ে সাজানো। কালিদাসের শান্ত আশ্রমপদের এক মজা, এখানে ওঙ্কার-সামগানে মুখরিত আরেক পরিবেশ। এরই মধ্যে মহাভারতের কবি অতি সংক্ষেপে একটি কথা বলে দিলেন—সুখশীতল সমীরণ পুষ্পরেণু বহন করে আশ্রমের বৃক্ষচূড়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছিল যেন রিরংসায় ভালবেসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আশ্রমবৃক্ষের পুষ্পগুলিকে।—পরিক্রামন্ বনে বৃক্ষানুপৈতীব রিরংসয়া। এর মধ্যে কোনও ইঙ্গিত আছে কি না জানি না, তবে দুষ্যন্তও ওই সুখশীতল বায়ুর মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কণ্বের আশ্রমে; পৌরববংশের পুষ্পরেণুর কণা তিনি বহন করে এনেছিলেন, তবে তা নিষিক্ত করার জন্য কণ্বাশ্রমের সেই যৌবনবিকশিত পুষ্পটির দেখা তিনি এখনও পাননি। মহাকাব্যের সমারোহভারে এখনও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মালিনীর তীরে—মালিনীমভিতো রাজন্ নদীং পুণ্যাং সুখোদকাম্।

তেতাল্লিশ

মালিনীর জল বড় স্থির। আয়নার মত,—এমন করে যিনি ছবি লিখেছিলেন, তাঁর কল্পচিত্র এই মহাভারত থেকেই উঠে এসেছে। কণ্বমুনির আশ্রমকে বেড় দিয়ে এমনভাবেই মালিনী নদী চলে গেছে যে, কণ্বের আশ্রমটিকে মনে হচ্ছে ঠিক একটি দ্বীপের মতো—অলংকৃতং দ্বীপবত্যা মালিন্যা রম্যতীরয়া—অথবা নদীটি আশ্রমের মালার মতো বলেই নামটি হয়তো মালিনী। মালিনীর পারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন মহর্ষি কণ্বের সঙ্গে দেখা করেই যাবেন।

কালিদাসে যেমনটি আছে—রাজা ঋষিকুমারদের কাছে যখনই জানতে পারলেন—ওটি কণ্বের আশ্রম, অমনই বললেন—তাহলে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করে একটু প্রণাম জানিয়ে যাই। ঋষিকুমারেরা বললেন—তিনি তো আশ্রমে নেই। তাঁর মেয়ে শকুন্তলাকে অতিথি-সৎকারের ভার দিয়ে তাঁর দুর্ভাগ্য প্রশমন করার জন্য সোমতীর্থে গেছেন। রাজা বললেন—ঠিক আছে। তাহলে তাঁর মেয়ের সঙ্গেই দেখা করে যাই। আমি যে এখানে এসেছিলাম, আমি যে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গিয়েছি, সেটা অন্তত তিনি বলে দেবেন মহর্ষিকে—সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষে কথায়িষ্যতি। রাজা আশ্রমের ভিতরে ঢুকলেন।

সেকালের দিনে এটা প্রায় নিয়মের মতো ছিল। ধরুন আপনি কোনও দেবস্থানে গেছেন, অথবা বেড়াতেই গেছেন এমন কোনও জায়গায়, যেখানে এক মহাপুরুষ আছেন অথবা এসেছেন। এমন জায়গায় গিয়ে স্থানীয় দেবতা বা প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের দর্শন না করে শুধু বেড়িয়ে আসাটা সেকালের দিনের লোকের ধাতে ছিল না। তাঁরা মনে করতেন—পূজনীয় ব্যক্তিকে সামান্য সম্মান না দেখিয়ে চলে এলে ধৃষ্টতা হয়, তাতে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে। অতএব মন্দিরের দেবতা হোক, আর মহাপুরুষই হোক, প্রণাম করেই আসতেন তাঁরা। বৃদ্ধদের

মুখে আরও একটা কথা শুনেছি। বৃদ্ধ বলেছিলেন—এখনও চিঠির শেষে 'প্রণামান্তে প্রণতঃ'—এই সব শব্দ ব্যবহার করে কেন জানিস? বলেছিলাম—জানি না। বৃদ্ধ বলেছিলেন—সে যুগে এমন মিথ্যাচার করা যেত না। পাঁচ লাইন চিঠি লিখে, শেষে খশ্‌খশ্‌ করে 'প্রণতঃ' কথাটা লিখে দিলাম, আর হয়ে গেল? পূজনীয় স্থানে পত্র প্রেরণ করার আগে পত্রদাতা পূজনীয় ব্যক্তির উদ্দেশে গড় করে প্রণাম করতেন মাটিতে। তারপর লিখতেন—প্রণামান্তে অথবা প্রণতঃ অমুক চন্দ্র অমুক।

কালিদাসের নাটকে দুষ্যন্তের উক্তি থেকে বুঝি—দুষ্যন্তও আশ্রমে ঢুকলেন কণ্বমুনিকে দর্শন করে প্রণাম করে যাবার জন্যই। এই পর্যন্ত কোনও সমস্যাই নেই, কারণ মহাভারতেও প্রায় একই রকম। কিন্তু তফাৎ আছে স্বভাবে। কালিদাসের দুষ্যন্ত যতখানি নায়ক-স্বভাবের, রাজোচিত ততটা নন। আর মহাভারতের দুষ্যন্ত বড় বেশি রকমের রাজগুণসমন্বিত বলেই মহাকবিকে তাঁর চারধারের সমস্ত পরিবেশের মধ্যে গম্ভীর সমারোহের ব্যবস্থা করতে হয়। যাই হোক, রাজা স্থির করলেন—কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করবেন—চকারাভিপ্রবেশায় মতিং স নৃপতিস্তদা। কিন্তু রাজার প্রবেশ তো আর সোজা কথা নয়। হিংসাবৃত্তির পরিচায়ক অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে, সৈন্যসামন্তদের তপোবনের এলাকার বাইরে রেখে রাজা প্রবেশ করলেন তপোবনে। মহাভারতের দুষ্যন্তের এই বিনীত ব্যবহার কালিদাসেও আছে। কিন্তু কালিদাসে দু-তিনটি শ্লোকের রেখায় গাছের ডালে মুনি-ঋষিদের কাপড় শুকনোর ব্যবস্থা দেখে, ইঙ্গুদীর ফল-বাটা তৈল-চিক্কন পাথর দেখে, অপিচ পক্ষী আর হরিণ শিশুর মুখোদগীর্ণ নীবার ধান্যের মুষ্ঠিতে আশ্রম-পরিচয় করেই মহারাজ দুষ্যন্ত শকুন্তলার কাছাকাছি চলে যেতে পেরেছেন। কিন্তু মহাভারতের রাজা দুষ্যন্তকে তপোবনে ঢুকতে হয়েছে নিজের পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে—পুরোহিতসহায়শ্চ জগামাশ্রমমুত্তমম্‌। এই পুরোহিতকে অবশ্য এখনকার দিনের পুরুতঠাকুর ভাবার কোনও কারণ নেই। পুরোহিত মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। সেকালের যে কোনও বড় রাজা তাঁর রাজ্য-সংক্রান্ত এবং জীবন সংক্রান্ত সমস্ত গভীর আলোচনা করতেন পুরোহিতের সঙ্গে এবং সব ব্যাপারে তাঁর নির্দেশের মূল্য ছিল প্রায় শেষ সিদ্ধান্তের মতো অনেক ক্ষেত্রেই তিনি রাজসভায় মন্ত্রী, কখনও বা প্রধানমন্ত্রীর কাজও করতেন। অবশ্য এখানে পুরোহিতের সঙ্গে রাজার অমাত্যও ছিলেন।

অমাত্য-পুরোহিতকে নিয়ে রাজা কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করলেন বটে, তবে সেখানে মহর্ষি কণ্বের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের আগেই তাঁর আশ্রমের পরিচয় পেলেন আরও গভীরভাবে। আশ্রমে ঋগবেদের মন্ত্রে দেবতার আহ্বান চলছে, সামগান করছেন সামবেদী ঋষিরা, যজুর্বেদী পুরোহিত আহুতি দিচ্ছেন আগুনে। মন্ত্রে-গানে সমস্ত আশ্রমের পরিবেশটা এমন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে যে, রাজার মনে হল যেন ব্রহ্মলোকে এসে উপস্থিত হয়েছেন—ব্রহ্মলোকস্থমাত্মানং মেনে স নৃপসত্তমঃ। রাজা কণ্বমুনির আশ্রম-কুটিরের প্রান্তদেশে এসে অমাত্য-পুরোহিত—সবাইকে বাইরে রেখে আশ্রম কুটীরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাবে বুঝি, অমাত্য-পুরোহিতকে বসিয়ে রেখে গেলেন মন্ত্র-গানের যজ্ঞীয় আসরে।

দুষ্ট নায়ক ছিলেন বটে কালিদাসের দুষ্যন্ত। আশ্রমের উঠোনে তিন সখী শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা যখন বৃক্ষতলায় জলসেচন করছিলেন, রাজা তখন নিজের পরিচয় না দিয়ে লুকিয়ে রইলেন লতাবিতানের অন্তরালে। তিন সখী নিজেদের মধ্যে নানারকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছিলেন, রাজা প্রাণ ভরে সেসব কথা শুনছিলেন। এমন সব কথা, যা মেয়েরা নিজেদের

মধ্যেই শুধু বলে। বৃক্ষের অন্তরাল থেকে সুন্দরী সখী-সমাজের একান্তে উচ্চারিত কথাগুলি শুনে দুষ্যন্তের নানা স্বগত মন্তব্যেও বোঝা যায় তিনি যতখানি নায়ক রাজা ততটা নন। এমনকি সখী-সমাজে নিজের আসল পরিচয়টি পর্যন্ত তিনি দেননি। শকুন্তলার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে রাজাকে প্রথম প্রেমের বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট মানুষটির মতো দেখতে পাচ্ছি। সারা প্রথম অংক জুড়ে রাজার সঙ্গে শকুন্তলার কোনও কথাই নেই প্রায়—প্রথম পুরুষের প্রথম সপ্রেম অভিধানে মাঝে মাঝে তাঁকে শৃঙ্গার-লজ্জায় লজ্জিত হতে দেখছি। কথা যা বলছেন, তা সখীরাই বলছেন রাজার সঙ্গে।

মহাভারতের দুষ্যন্ত আশ্রমের কুটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কণ্ব মুনিকে দেখতে পেলেন না। তখন রাজার মতই হেঁকে-ডেকে—ওরে কে কোথায় আছিস, সাড়া দে, আমাকে তোরা দেখ—এইভাবে সমস্ত তপোবনভূমি একেবারে কাঁপিয়ে তুললেন—উবাদ ক ইহেতুচ্চৈঃ বনং সংন্নাদয়ন্নিব। হাঁক-ডাক শুনে একটি কন্যা বেরিয়ে এলেন আশ্রম থেকে, ভারি সুন্দরী আর লক্ষ্মীমতী। গায়ে তপস্বিনীর বেশ। কোনও সংকোচ নেই, লজ্জা নেই, ডাগর আঁখি মেলে কন্যা রাজাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন—আপনার রাজ্যের কুশল তো রাজা? কোনও প্রতিকূলতা নেই তো? কন্যা রাজাকে পা ধোয়ার জল দিলেন, আসন দিলেন বসতে। হেসে বললেন—বিশেষ কোনও কাজ আছে নাকি আপনার?

রাজা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ধীরমধুরভাষিণী রমণীর দিকে। বললেন—আমি মহর্ষি কণ্বকে প্রণাম জানানোর জন্য এখানে এসেছিলাম। কোথায় গেছেন তিনি? সুন্দরী রমণী হেসে বললেন—এই তো কাছেই গেছেন পিতা কণ্ব। বন থেকে কিছু ফল কুড়িয়েই ফিরে আসবেন। আপনি একটু বসুন, এই তিনি এলেন বলে—মুহূর্তং সম্প্রতীক্ষস্ব দ্রষ্টাস্যেনমুপাগতম্।

কালিদাসের অভিজ্ঞানে রাজার হাতে অনেক সময় ছিল। নায়ক-নায়িকাকে প্রেমের অনুকূল সরস পরিস্থিতি দেওয়ার জন্য পিতা কণ্বের বহু দূরে থাকাই শুধু নয়, লজ্জাশীলা শকুন্তলাকে দিয়ে রীতিমতো প্রেম করিয়ে দেওয়ার জন্য অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো দুই সখী ছিলেন কালিদাসের হাতে। রাজার খবর, শকুন্তলার খবর সবই নায়ক-নায়িকার কাছে সঞ্চারিত হয়েছে দুই সখীর মাধ্যমে। কিন্তু মহাভারতে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো সুযোগ্যা সখীও নেই। এখানে সুন্দরী মধুরহাসিনী শকুন্তলা রাজার সামনে দাঁড়িয়ে, একা। এখানে রাজার হাতেও কোনও সময় নেই, কখন না জানি কণ্বমুনি ফল কুড়িয়ে এসে পড়েন। অতএব কণ্বমুনির গতিস্থিতি জানামাত্রই রাজার অবধারিত প্রতিক্রিয়া—প্রেম নিবেদন করা—যত কম সময়ে পারা যায়, প্রেম নিবেদন করা।

আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার পরনে ছিল চীরবাস, যা তাঁর অপার যৌবনরাশির তুলনায় ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। তার মধ্যে আশ্রমসুলভ শম-দমের সাধনে শকুন্তলার শরীরে ছিল সেই অদ্ভুত দীপ্তি যা নাগরিকার মধ্যে মেলে না—বিভ্রাজমানাং বপুষা তপসা চ দমেন চ। নাগরিক রাজা মুগ্ধ হলেন আশ্রমবাসিনীকে দেখে। অথচ হাতে সময় নেই, মহর্ষি কণ্ব এসে পড়বেন কখন? রাজা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে রমণী? কার মেয়ে? এই বনে এসেছ কী করতে, এমন সুন্দর যার চেহারা, সে কোথা থেকে এসে এই বনের মধ্যে জুটল—এবংরূপগুণোপেতা কুতস্ত্বমসি শোভনে? তোমাকে দেখামাত্রই আমি মুগ্ধ হয়েছি কন্যে। তুমি তোমার সমস্ত কথা আমায় খুলে বল।

মহাভারতে যেখানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ, কালিদাসের সুযোগ সেখানে। এমন রূপ নিয়ে তুমি

AMARBOI.COM

বনের মধ্যে এলে কেমন করে—শুধু এই সামান্য পংক্তিটির ইঙ্গিত কালিদাসে অসাধারণ কয়েকটি শ্লোকে এসেছে। আশ্রমের মধ্যে গাছে জল দেওয়ার কাজটুকু করার যে পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমও যেন শকুন্তলার মতো কোমলাঙ্গী সুন্দরীর যোগ্য নয় এবং মহর্ষি কণ্ব যে তাঁকে এই কঠিন কাজে নিয়োগ করে পদ্মফুলের পাতা দিয়ে মোটা মোটা গাছ কাটার চেষ্টা করছেন এই সব অসাধারণ আক্ষেপও রাজা দুষ্যন্তের মুগ্ধতা জ্ঞাপন করেছে কালিদাসে। শকুন্তলার কুল-শীল জন্ম নিয়েও রাজার মনে যা কিছু সংশয় ছিল, সেগুলো অবশ্য সবই রাজার কানে এসেছে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সঙ্গে রাজার কথোপকথনের সূত্রে। কিন্তু কুল-শীলের জিজ্ঞাসা কালিদাসেও আছে।

মহাভারতের শকুন্তলা নিজেই নিজের সহায়। মহারাজ দুষ্যন্তের মুখে নিজের শারীরিক স্তুতি-প্রশংসা শুনেও তাঁর লজ্জা পাবার অবকাশ নেই কোনও। তাঁকে নিজেই বলতে হচ্ছে নিজের জীবনের কাহিনী। তপস্বী কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলা ঋষি-বালক আর ঋষিদের ছাড়া এমন আর কাউকে এ পর্যন্ত দেখেননি, যিনি এমন হঠাৎ করে প্রণয় প্রকাশ করতে পারেন। তাপসীবেশধারিণী এক তথাকথিত ঋষিকন্যাও যে দেশের রাজার মনোহরণ করতে পারেন—এ ধারণা শকুন্তলার ছিল না। কিন্তু রাজার মুখে অমন দুর্বাধ প্রণয়োচ্ছ্বাস শুনেও সমস্ত সুস্থিরতা নিয়ে শকুন্তলা যে প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছেন, তাতে মহাভারতের শকুন্তলার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে মহাকাব্যের অন্যতমা নায়িকার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাল রেখে। নিজের কথা তিনি নিজেই বলতে পারেন নির্দ্বিধায়।

মহারাজ দুষ্যন্তের প্রণয় আকূতি এবং প্রশ্ন শুনে কণ্বাশ্রমের অধিবাসিনী একটু মধুর স্বরে হাসলেন, তারপর প্রথম পরিচয় জ্ঞাপন করলেন নিজের—মহারাজ! আমি ধর্মজ্ঞ তপস্বী কণ্বের মেয়ে। রাজা পালটা প্রশ্ন করলেন—মহাত্মা কণ্বকে আমরা ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী তপস্বী বলেই তো জানি। সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এমন চরিত্রস্খলন হতে পারে—এ তো ভাবাই যায় না। তুমি কেমন করে সেই ব্রহ্মচারী মহর্ষির মেয়ে হলে তা শুনতে আমার কৌতূহল হচ্ছে রীতিমতো—কথং ত্বং তস্য দুহিতা সম্ভূতা বরবর্ণিনী?

শকুন্তলার স্পষ্ট উত্তরের আগে দুষ্যন্তের প্রশ্ন শুনে আমাদের যে কিছু আশ্চর্য হবার আছে, সেটা জানাই। যে দুষ্যন্ত উচ্ছিন্ন পৌরববংশের এক অনামা অখ্যাত মানুষের ঔরসে জন্মেছিলেন এবং যিনি মানুষ হয়েছিলেন তুর্বসু-বংশীয় মরুত্ত রাজার ঘরে, তিনি এক রমণীর কুলশীল জিজ্ঞাসা করছেন—এটা ভাবতে বিপরীত লাগে। এমন প্রশ্ন শুনলে, যে কথা এতক্ষণ বলিনি, তাও বলতে হয়। আগে বলেছি—দুষ্যন্ত আবীক্ষিত মরুত্তের ঘরে মানুষ হয়েছেন। পুরাণে-ইতিহাসে তুর্বসু বংশের পরম্পরায় তাঁর নাম পাই বলে আমরা সসম্মানে সে কথা মেনেও নিয়েছি। কিন্তু দুষ্যন্তের এই প্রশ্নের নিরিখে আবারও আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা দেখছি—মরুত্ত আবীক্ষিত নামে এক 'আয়োগব' রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন—মহাব্রতমতিরাত্রস্তেন হ মরুত্ত আবীক্ষিত ইজে আয়োগবো রাজা।

আবীক্ষিত মরুত্ত যে অনেক বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বে সাড়ম্বরে বলেছি। কিন্তু তিনি যে 'আয়োগব' রাজা সে কথা বলিনি। মরুত্তর বিশেষণ হিসেবে 'আবীক্ষিত' শব্দটি থাকার ফলে ইনি যে আমাদের পূর্বকথিত মরুত্ত রাজা যিনি দুষ্যন্তকে মানুষ করেছিলেন, এই 'আইডেনটিটি' নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তাঁর আরেকটা বিশেষণ 'আয়োগবো

AMARBOI.COM

রাজা'। 'আয়োগব' শব্দের অর্থ কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রের টীকায় যেমনটি দেখা যায়, তা হল—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা রমণীর গর্ভজাত সন্তান। মরুত্ত যদি ঠিক এই রকমই এক আয়োগব রাজা হয়ে থাকেন, তবে সেই রাজার সুরক্ষায় এবং অন্নপ্রাণে মানুষ হয়ে দুষ্যন্তের মুখে কুল-শীলের প্রশ্ন মানায় না। পণ্ডিতেরা অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, ধর্মসূত্রগুলির প্রণয়ন-কাল পর্যন্ত যেহেতু 'আয়োগব' শব্দের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ চোখে পড়ে না, তাই মরুত্ত রাজাকে কোনও শূদ্র রাজা না ভেবে বরং কোনও অব্রাহ্মণ রাজাকে ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অঙ্গীকরণের উদাহরণ হিসেবে মেনে নেওয়াই ভাল। কিন্তু এই আশ্বাসবাণীর পরেও মরুত্ত রাজার ঘরে পালিত দুষ্যন্তের কাছ থেকে শকুন্তলার সম্বন্ধে প্রশ্নগুলি মানায় না।

আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার মনের মধ্যে অবশ্য এত জটিলতা নেই। তিনি নিশ্চিন্তে আগন্তুক রাজাকে নিজের জীবনের গল্প শোনাতে লাগলেন। শকুন্তলা বললেন—মহারাজ! আমি কেমন করে এখানে এলাম, কেমন করেই বা একদিন মহর্ষি কণ্বের মেয়ে হয়ে গেলাম, সে এক ইতিহাস, রাজা! শুনুন তাহলে। আপনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নাম শুনে থাকবেন। এক সময় তিনি এমন সাংঘাতিক তপস্যা করেছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রও সেই তপস্যা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন—হয়তো তপস্যা করে শেষ পর্যন্ত স্বর্গের ইন্দ্রত্বই অধিকার করে নেবেন ঋষি বিশ্বামিত্র—তপসা দীপ্তবীর্যো'য়ং স্থানান্মাং চ্যাবয়েদিতি।

ভীত পুরন্দর শেষ উপায় হিসেবে ডেকে পাঠালেন স্বর্গের অন্যতমা প্রধানা অপ্সরা মেনকাকে। ইন্দ্র তাঁকে বললেন—অপ্সরা-সমাজে তোমার মতো গুণী আর দ্বিতীয় কে আছে? তা তুমি বাপু আমার একটা উপকার করো। তুমি কি জান—বিশ্বামিত্র এমন তপস্যা করছেন যে আমার মনটা ভয়ে কাঁপছে সব সময়—মম কম্পয়তে মনঃ। তা এই বিশ্বামিত্রের ভার আমি তোমার হাতেই সঁপে দিলাম মেনকা—মেনকে তব ভারো'য়ং বিশ্বামিত্রঃ সুমধ্যমে। এই ভার দেওয়ার অর্থ কী, মেনকা তা জানেন। ইন্দ্র অবশ্য সবিশদে বুঝিয়েও দিলেন—কী করতে হবে মেনকাকে। বললেন—আমার ইন্দ্রত্ব চলে যাবে, মেনকা! বিশ্বামিত্রের ঘোর তপস্যায় সব যাবে আমার। তুমি এখনই যাও সেই উগ্রতপা তপস্বীর কাছে, তাঁকে প্রলোভিত করো—তং বৈ গত্বা প্রলোভয়। যেভাবে পারো, রূপ-যৌবনের মাধুর্য প্রকাশ করেই হোক, হাত-পায়ের ভঙ্গিমাতেই হোক অথবা মধুর হাসে, মধুর ভাষে—রূপযৌবন-মাধুর্য- চেষ্টিত-স্মিত-ভাষণৈঃ—যেভাবেই হোক এই তপস্বীকে প্রলুব্ধ করে তাঁকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে।

ইন্দ্রের কথা শুনে মেনকা জবাব দিলেন—ওরে বাবা বিশ্বামিত্র! তিনি যে কেমন রাগী মুনি, সে তো আপনি নিজেও জানেন দেবরাজ—কোপনশ্চ তথা হ্যেনং জানাতি ভগবানপি। মেনকা এক এক করে বিশ্বামিত্রের জীবনের দশ-বারোটি ঘটনা উল্লেখ করলেন ইন্দ্রের কাছে, যাতে বোঝা যায় বিশ্বামিত্র কত অসাধ্য সাধন করেছেন। বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে বিবাদের সময়, ত্রিশঙ্কুর স্থিতিনির্ণয় করার সময়, ক্ষত্রিয়-জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ্য লাভের ঘটনায়, এবং আরও বেশ কয়েকটা উদাহরণ দিলেন মেনকা যে সব সময় বিশ্বামিত্র মুনির অসম্ভব সম্ভব করার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন সকলে। মেনকা বলেছিলেন—আপনি স্বয়ং যাকে দেখে ভয় পান, দেবরাজ আমি তাঁকে ভয় পাব না—ত্বমপ্যুদ্বিজসে যস্য নোদ্বিজেয়মহং কথম্? যিনি রাগলে সবাইকে ভস্ম করে দিতে পারেন, তপস্যার তেজে যিনি সবাইকে কম্পিত করে তোলেন—সেই আগুনের মুখে, সেই কালজিহ্বার করাল গ্রাসের মধ্যে আমার মতো এক রমণী কী করে প্রবেশ করবে—হুতাশনমুখং দীপ্তং কথমস্মদ্‌বিধা স্পৃশেৎ?

AMARBOI.COM

মুশকিল হল, দেবরাজ ইন্দ্র মেনকার স্মরণাপন্ন হয়েছেন, স্বর্গরাজ্যের নিয়ন্তা এক রমণীর উপকারপ্রার্থী। মেনকা তাই যত ভয়ই পান, অথবা যত অনিচ্ছাই তাঁর থাকুক, তাঁর পক্ষে দেবরাজকে 'না' বলার উপায় নেই। মেনকা তাই বললেন—আপনি বলছেন যখন, তখন আর না বলি কী করে? কিন্তু আপনি আমার বেঁচে ফেরার রাস্তাগুলো ঠিকঠাক খোলা রাখুন। আমি যখন বিশ্বামিত্রের সামনে আমার রূপ-যৌবন এবং মাধুর্যের বিলোভন সৃষ্টি করব, তখন বায়ুদেবতা যেন উতল হাওয়ায় আমার লজ্জাবস্ত্র উড়িয়ে নেন—কামং তু মে মারুতস্তত্র বাসঃ/প্রক্রীড়িতায়া বিবৃণোতু দেব। ভালবাসার দেবতা অঙ্গহীন অনঙ্গ যেন আমার কাজে সহায় হন, যেন সহায় হন ঋতুরাজ বসন্ত। ঋষিকে প্রলুব্ধ করার সময় বনফুলের সুগন্ধ যেন আমোদিত করে দেয় সমস্ত বনস্থলী—বনাচ্চ বায়ুঃ সুরভিঃ প্রবায়াৎ।

বলা বাহুল্য, দেবরাজ রাজি হলেন মেনকার প্রস্তাবে। সদাগতি সমীরণ সাথী হলেন মেনকার। সর্বচিত্তহর মনমথন কামদেব এলেন বিশ্বামিত্রর মনে বাসনা তৈরি করার জন্য। (কালিদাসের কুমারসম্ভবে অকালবসন্তের উৎস কি এইখানে?) ইন্দ্রের যোজনায় সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। স্বর্গসুন্দরী মেনকা সভায় এসে উপস্থিত হলেন তপস্যাতপ্ত বিশ্বামিত্রের সামনে। তাঁর গায়ে জ্যোৎস্নার মতো সূক্ষ্ম বসন, চলনে নটন, বলনে গান। মেনকা ঋষিকে অভিবাদন করেই নানা নৃত্যভঙ্গিমায় আকর্ষণ করতে লাগলেন মুনিকে। এমন সময় উতাল হাওয়া বনস্থলীর সমস্ত সুগন্ধ চুরি করে এমনভাবে বইতে লাগল যে, তাতে মেনকার চাঁদচুয়ানো পরিধেয় বসন একেবারেই উড়ে গেল—অপোবাহ চ বাসোঽস্যাঃ মারুতঃ শশিসন্নিভম্। হাওয়ার তাড়নাতেই যেন মেনকার ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যাওয়া শরীরখানি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এতে যে তাঁর একটুও দায় নেই, এ দোষ যেন তাঁর নিজের নয়, এই ভাবেই মেনকা যেন তাঁর উড়ে-যাওয়া পরিধেয় বসনখানি ধরতে চাইলেন বারবার। বসন সংগ্রহ করার এই ভয়ংকর অভিনয়-চেষ্টার মধ্যেও কল্পলোকের নায়িকার মতো মেনকার মুখের হাসিটুকু কিন্তু তাঁর ঠোঁটে লেগে রইল, অম্লান—স্ময়মানেব সব্রীড়ম্।

উতলা হাওয়া, বনস্থলীর পুষ্প-পরিমল এবং হঠাৎ ঝড়ে উড়ে যাওয়া বসনের বিপন্নতার মধ্যে তপস্যা-ক্লান্ত বিশ্বামিত্র মেনকাকে দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ অনাবৃতা—অনির্দেশ্যবয়োরূপাম্ অপশ্যদ্ বিবৃতাং তদা। মেনকার অলোকসামান্য রূপ দেখে শুষ্ক-রুক্ষ মুনির কঠিন হৃদয় একেবারেই গলে গেল। মহাকাব্যের কবি লিখেছেন—মেনকার 'রূপ-গুণ' দেখে—তস্যা রূপগুণান্ দৃষ্ট্বা, এখানে গুণ কিছু দেখেননি ঋষি। আসলে এই সমাসের ব্যাসবাক্য 'রূপ' এবং 'গুণ' নয়, হবে 'রূপের গুণ'। সেই অমর্ত্য রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মিলনের আহ্বান জানালেন মেনকাকে, যে মিলন দেবরাজ ইন্দ্রের চক্রান্তে একান্ত কাঙ্ক্ষিত ছিল মেনকারও—ন্যমন্ত্রয়ত চাপ্যেনাং সা চাপ্যৈচ্ছদনিন্দিতা।

শকুন্তলা এতক্ষণে যে রাজাকে নিজের জীবন-কাহিনী শোনাচ্ছিলেন তা নিজের জবানীতে নয়। রাজাকে তিনি বলেছিলেন—এক ব্রাহ্মণ ঋষি পিতা কণ্বকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিক আপনার মতো করেই। আমি নিভৃতে সে কথা পিতা কণ্বের মুখে যেমন শুনেছি, তাই আপনাকে জানাচ্ছি। শুধু পিতা কণ্বের জবানী হলেও বিশ্বামিত্র-মেনকার মিলন কাহিনী শোনাতে শকুন্তলার একটুও লজ্জা হল না। কালিদাসে দুষ্যন্ত একই প্রশ্ন করেছিলেন শকুন্তলার সখীর কাছে। সেখানে শকুন্তলার জীবন-কাহিনী বলতে গিয়ে—বসন্তকালে উদার প্রকৃতির মধ্যে মেনকার পাগল-করা রূপ দেখে বিশ্বামিত্র—এইটুকু মাত্র বলে, অর্ধবাক্য শেষ

AMARBOI.COM

না করেই প্রিয়ংবদাকে লজ্জায় থামতে হয়েছে। নাগরিক রাজাও আর শুনতে চাননি। কিন্তু মহাকাব্যের নায়িকা কণ্বের জবানীতে নিজের কাহিনী শোনাচ্ছেন অনুপুঙ্খভাবে, রাজাও শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে। আসলে মহাকাব্যের উদার-অপার পরিবেশের মধ্যে কোনও কাহিনীই অসম্পূর্ণ থাকে না, কথা-সুন্দরী সলজ্জে স্তম্ভিত হন না অর্ধপথে।

শকুন্তলা বললেন—রমমান বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে একটি মেয়ের সম্ভাবনা হল। তারপর একদিন এই হিমালয়ের কোলে মালিনী-নদীর তীরভূমিতে অপ্সরা সুন্দরী মেনকা আপন স্বভাবে গর্ভমুক্ত হয়ে চলে গেলেন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের কাছে নিজের সাফল্য জ্ঞাপন করার জন্য। মালিনীর তীরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পড়ে রইল একটি শিশুকন্যা। বনের মধ্যে বাঘ-সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, হিংস্র শ্বাপদের আনাগোনা পদে পদে। ছোট্ট শিশুটিকে দেখে বনের যত পাখি ছিল, তারা অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের মতো ঘিরে রইল শিশুটিকে—দৃষ্ট্বা শয়ানং শকুনাঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্। ইতিমধ্যে মহর্ষি কণ্ব মালিনী নদীতে এলেন স্নান-আহ্নিক করতে। দেখলেন—পাখিরা একটি শিশুকে ঘিরে কিচির-মিচির করছে। অসহায় শিশুকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই যেন তাদের এই কিচির-মিচির আর্তনাদ। মহর্ষি কণ্ব পরিত্যক্তা শিশুকন্যাকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে এলেন আশ্রমে। আশ্রমবাসী সকলকে জানালেন—এই আমার মেয়ে। নির্জন বনের মধ্যে শকুনেরা (পাখি শকুন্ত। শকুন্ত মানে 'শকুন' নয়) পাখিরা যেহেতু একে রক্ষা করেছিল, আজ থেকে এই মেয়ের নাম তাই শকুন্তলা—যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা/শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া।

কণ্বের জবানীতে নিজের জন্ম-বিবরণ সম্পূর্ণ ব্যক্ত করে মহর্ষি কণ্ব ব্রহ্মচারী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁর পিতা হলেন, সে সম্বন্ধে শকুন্তলা রাজাকে শাস্ত্র কথা শুনিয়েছেন কণ্বের জবানীতেই। কণ্ব আশ্রমের সকলকে বলেছিলেন—জন্মদাতা পুরুষ যেমন পিতা, তেমনই যিনি প্রাণ রক্ষা করেন, যিনি ক্ষুধার অন্ন দেন, তাঁরাও একভাবে পিতার সংজ্ঞা লাভ করেন—শরীরকৃৎ প্রাণদাতা যস্য চান্নানি ভুঞ্জতে। শকুন্তলা এই কথার অন্য কোনও অর্থ করেননি। রাজাকে তিনি জানিয়ে দিলেন—জন্মদাতা পিতাকে আমি চোখে দেখিনি কখনও। তাই অন্তত দুটি কারণে, প্রাণ-রক্ষা এবং পালন-পোষণের গৌরবে আমি মহর্ষি কণ্বকেই আমার পিতা বলে মনে করি—কণ্বং হি পিতরং মন্যে পিতরং স্বমজানতী।

হয়তো 'আয়োগব' মরুত্ত রাজার ঘরে প্রতিপালিত মানুষটি এতদিনে নিজেরই মতো এক রমণী খুঁজে পেলেন, যিনি তাঁরই মতো পিতৃ-মাতৃ মুখ দেখেননি কখনও। অন্নে, প্রাণের সুরক্ষায় যে রমণী তাঁরই মতো কণ্বাশ্রমে প্রতিপালিতা, হয়তো সেই রমণীর মধ্যে নিজের পূর্বজীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন দুষ্যন্ত। দুষ্যন্ত দাঁড়িয়ে উঠলেন কথা-কাহিনীর জগৎ থেকে। মহর্ষি কণ্ব ফল কুড়োতে গেছেন। তিনি ফেরার আগেই বিখ্যাত পৌরববংশের ধুরন্দর রাজা হৃদয় উন্মোচন করতে চান মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার কাছে। এই হৃদয়-উন্মোচনে অন্তর্ধারায় আছে একাত্মতা—আমরা দুজনেই সমদুঃখদুঃখী, পরান্ন-প্রতিপালিত, বহির্ধারায় আছে তথাকথিত বংশগৌরব—আমি পৌরববংশ-ধুরন্ধর, তুমি বিশ্বামিত্রের ঔরসে স্বর্গসুন্দরী মেনকার কন্যা। এই হৃদয়-উন্মোচনের ফল প্রসুপ্ত আছে দূর-ভবিষ্যতের গর্ভে। সেই কারণেই বুঝি দিন বেছে বেছে আজকেই কণ্বমুনি ফল কুড়োতে আশ্রমের বাইরে গেছেন দূরে!

চুয়াল্লিশ

এখনকার দিনেও আমি অনেক যুবক-যুবতীকে দেখেছি, যাঁরা জাত মিলিয়ে প্রেম করেন। এই যুবক-যুবতীরা অবশ্যই বড় জাতের শিল্পী। নইলে ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ির ভাঙা দরজাটা মিলিয়ে দেবার ভার যাঁর ওপরে ছিল, তিনিও বুঝি চিন্তিত হতেন এই প্রেম এবং জাত একসঙ্গে মেলাতে। লক্ষণীয়, এই ট্র্যাডিশন আজকের নয়। শকুন্তলার মুখে আপন জন্মবৃত্তান্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ দুষ্যন্তের উচ্ছ্বাস শোনা যাচ্ছে। তিনি বলছেন—সুন্দরী! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তুমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে—সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বম্—অর্থাৎ দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস। রূপ দেখে ভীষণ পছন্দ হয়েছে, আবার জাতেও মিলেছে। অতএব তুমি যখন ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, রাজপুত্রী, তাহলে অবশ্যই আমার মতো ক্ষত্রিয় রাজার স্ত্রী হবার উপযুক্ত তুমি। তুমি আমার স্ত্রী হও, তোমার জন্য আমি সব করতে পারি—ভার্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রূহি কিং করবাণি তে।

কোনও এক সংস্কৃত কবি বলেছিলেন—প্রেমিক পুরুষ নাকি নিজের মতো করে দুনিয়াকে দেখে এবং দুনিয়াকে সাজিয়েও নেয় নিজের মতো করে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। সে এক বিরাট ইতিহাস। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এবং সঠিকভাবে ভাবলে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ এবং শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যাই ভাবা উচিত। কিন্তু স্বয়ং রাজা দুষ্যন্ত নিজে এবং ব্রাহ্মণ্য-জাত্যাভিমানী মহাভারতের টীকাকারেরা বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে প্রথম সুযোগেই বলেছেন—রুপোর গয়নার ওপর পারদলেপনের দ্বারা সোনার ভাবটুকু আসতে পারে বটে, কিন্তু রুপো রুপোর কাজই করে। একই দৃষ্টিতে তপস্যা-টপস্যা করে বিশ্বামিত্র যতই ব্রাহ্মণ হোন, বিশ্বামিত্র আসলে ক্ষত্রিয়। টীকাকারের সামান্য কথাটার মধ্যে একটু জাতের গোঁড়ামি আছে বটে, কিন্তু আমরা টীকাকারের থেকে মহারাজের মন বেশি বুঝি। ব্রাহ্মণ্যবাদী টীকাকার যা বলেছেন, তার মধ্যে একটা 'ডেলিবারেট্' ব্যাপার আছে, কিন্তু মহারাজ

দুষ্যন্ত যে মুগ্ধ হয়েছেন; মুগ্ধতাবশতই তিনি শকুন্তলার জাতি মিলিয়ে নিয়েছেন নিজের সঙ্গে।

জাত মেলার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে একটু লোভ দেখাতে আরম্ভ করেছেন। আসলে ভোগ-সুখ-বিরক্ত মুনির আশ্রমে থেকে থেকে শকুন্তলাও ভোগবিমুখ। তিনি সোনা-রুপোর গয়নাও পরেন না, অপাঙ্গ শাণিত করার জন্য চোখে কাজলও লাগান না, গাল সাদা-ফরসা করার জন্য লোধ্ররেণুও দরকার হয় না তাঁর। রাজা ভাবলেন—তপস্বিনীকে লোভ দেখালে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব ত্বরান্বিত হবে। রাজা বললেন—তোমাকে সোনার হার দেব, কানের দুল দেব, হিরে-মণি-মুক্তো এনে দেব নানা দেশ খুঁজে—সুবর্ণমাল্যং বাসাংসি কুণ্ডলে পরিহাটকে—কত শাড়ি দেব, বুকের কাঁচুলি গড়ে দেব হিরে-মানিক বসিয়ে; আর শাড়ি পছন্দ না হলে মৃগচর্মও নিয়ে আসতে পারি নানারকম। সব চেয়ে বড় কথা—আমার সমস্ত রাজ্যটাই তোমাকে দিয়ে দেব, তুমি শুধু আমার স্ত্রী হও—সর্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্যা মে ভব শোভনে।

তপোবনবাসিনী শকুন্তলা সামান্য একটু ভয় পেলেন। শাড়ি-গয়নার লোভে তিনি বিচলিত নন একটুও। কিন্তু দেশের রাজা তাঁকে এমন করে বিয়ে করতে চাইছেন, তিনি না বলেন কী করে? শকুন্তলা বললেন—একটু সবুর করো রাজা আমার। তোমাকে বললামই তো—পিতা গেছেন ফল কুড়োতে। তিনি এখনই এসে পড়বেন, তারপর আমাকে তুলে দেবেন তোমার হাতে—মুহূর্তং সংপ্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি। রাজা বললেন—বোকা মেয়ে! ভয় পায়! ভালবাসার বিয়েতে আবার এত 'বাবা-বাবা' করে নাকি? আমরা ক্ষত্রিয়, ভালবাসলেই আমরা বিয়ে করতে পারি আর আমাদের পক্ষে সেই বিয়েটাই সবচেয়ে ভাল—বিবাহানাং হি রম্ভোরু গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমিও আমাকে ভালবাস; আমরা পরস্পর পরস্পরকে চাই—স ত্বাং মম সকামস্য সকামা বরবর্ণিনী—এমন অবস্থায় গান্ধর্ব-প্রথায় বিয়ে হলেই তোমাকে আমার এখনই বিয়ে করা সম্ভব।

AMARBOI.COM

দুষ্যন্ত মাঝখানে সামান্য একটু বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। তপস্বিনীর মনে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি বিবাহের রকম-ফের নিয়ে বেশ একটু স্মৃতিশাস্ত্রীয় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমি যে এতক্ষণ এখানে রয়ে গেছি, সে শুধু তোমার জন্যই; তোমার জন্য আমার মনটাই পড়ে আছে এখানে—ত্বদর্থং মাং স্থিতং বিদ্ধি তদ্‌গতং হি মনো মম। তাছাড়া বিবাহের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমার পিতা কী বলছেন, সেটা বড় কথা নয়, তুমি কী বলছ সেটাই বড় কথা। এখানে তুমিই তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তবে তুমি নিজেই নিজেকে তুলে দিতে পার আমার হাতে—আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্তুমর্হসি ধর্মতঃ। দুষ্যন্ত এরপর আট রকমের বিয়ে নিয়ে—ব্রাহ্ম বিবাহ, দৈব, প্রাজাপত্য, রাক্ষস—ইত্যাদি নানা বিয়ের কথা বলে, ভালবেসে নিজে নিজে গান্ধর্ব-বিবাহ করাই যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেজনক, সেটা সরলা তপস্বিনীর কাছে প্রমাণ করে ছাড়লেন।

শকুন্তলা দেখলেন, রাজা তাঁকে ছাড়বেন না। আর রাজার দিক থেকে তাড়া শুধু মহর্ষি কণ্বের জন্য। তিনি ফিরে এলে কী বলবেন, কোনও বাধা দেবেন কিনা, এমনকি শেষ পর্যন্ত অভিশাপের ঘটনাও যে ঘটে যেতে পারে—এত সব ভেবেই তিনি সরলা বালিকাকে মানসিক চাপে একেবারে বিপর্যস্ত করে তুললেন। শকুন্তলা বুঝলেন, তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। নইলে, রাজা তাঁকে ছাড়বেন না। এদিকে পিতা কণ্ব এসে তাঁকে কী বলবেন—সে চিন্তা তাঁরও রয়েছে। সামনে প্রেমিক পুরুষের হাতছানি, আড়ালে পিতার শুভৈষণা—দুয়ের দ্বৈরথে যুবতী রমণী যা করে শকুন্তলাও তাই করলেন। তবে রাজা যখন শকুন্তলাকে—তুমি নিজেই নিজের

সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে উত্তেজিত করেছিলেন, তখন এক লহমার মধ্যে শকুন্তলার মনে সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই ভবিষ্যদ্-যুক্তি খেলে গিয়েছিল, যা এক অভিভাবক পিতার মধ্যে থাকে।

কালিদাসের অভিজ্ঞানে কবি-প্রতিভার চরম অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে প্রিয়সখীর জন্য চিন্তামগ্ন দেখেছি। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিয়ে তখন হয়ে গেছে। প্রিয়ংবদা বলেছিলেন—পিতা কণ্ব এখন এই বিয়ে মেনে নেন কিনা, সেটাই এখন ভাবনার বিষয়। অনসূয়া বলেছিলেন—মহর্ষির আপত্তি হবে না। কেন না, একটি গুণবান মানুষের হাতে কন্যাদান করতে হবে—এই বাসনা যে কোনও পিতারই থাকে। তো সেই গুণবান পাত্র মেলার ঘটনা যদি ভাগ্যই ঘটিয়ে দেয়, তবে বিনা পরিশ্রমে গুরুজনের ঈপ্সিত কাজটাই তো হয়ে গেল—তদ্ যদি দৈবমেব সম্পাদয়তি, ননু অপ্রয়াসেন কৃতার্থো গুরুজনঃ। অতএব পিতা ঠিক রাজি হবেন।

মহাভারতে শকুন্তলার সমস্যা এত সহজ নয়। পিতা কণ্ব আশ্রমে নেই—সে এক সমস্যা। সহায়তার জন্য মহাভারতের কবি কোনও প্রিয়ংবদা-অনসূয়ারও ব্যবস্থা করেননি শকুন্তলার জন্য। ফলত বিবাহের মতো এক চরম সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একাকিনী শকুন্তলাকে এখানে অনেক ভাবনা করে কথা বলতে হচ্ছে। একটি বিবাহের সূত্রে মহারাজ দুষ্যন্তের মতো একজন পাত্রের কাছে একজন কন্যা-পিতার কী কাম্য থাকতে পারে, সেকথা এখানে এই সুকুমারী তপস্বিকন্যাকে নিজেই ভাবতে হচ্ছে। নিজের দায়িত্ব যেখানে নিজেই নিতে হচ্ছে, সেখানে ভবিষ্যতের স্বার্থের কথাও চিন্তা করতে হচ্ছে স্বয়ং শকুন্তলাকে।

রাজা বলেছিলেন—তুমি নিজেই নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিজেকে সঁপে দিতে পার আমার কাছে। রাজার এই কথা শুনে শকুন্তলা বলেছেন—ধর্মের নীতিনিয়ম যদি এইরকমই হয়, আর আমাকে যদি নিজেই বিয়ে করতে হয়,—যদি ধর্মপথস্তু-এষ যদি চাত্মা প্রভুর্মম—তাহলে আমার একটা শর্ত আছে, মহারাজ! আমি কণ্বাশ্রমের এই নির্জন কুটির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তোমার সামনে যে কথা বলতে যাচ্ছি মহারাজ! তাঁর কোনও সাক্ষী নেই। তোমাকে তাই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মহারাজ—সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ। তোমাকে কথা দিতে হবে—আমার গর্ভে তোমার যে পুত্র হবে, সেই হবে ভবিষ্যতের যুবরাজ, তোমার অবর্তমানে সেই হবে রাজা। যদি তুমি আমার এই কথাটি মেনে নাও, তবেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন সম্ভব হবে জেনো—যদ্যেতদেবং দুষ্যন্ত অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া।

রাজার পূর্বেকার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি এবং গান্ধর্ব বিবাহের উত্তেজনার মধ্যে আধুনিক অর্থে যাকে 'প্রেম' বলি তা কিছুই ছিল না। অন্যদিকে শকুন্তলাকেও যে রকম ভবিষ্যতের স্বার্থভাবনায় ভাবিত দেখছি এখানে, তাতে তার মনের মধ্যেও যে রাজার আগমনে 'বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল' ফুটে উঠল, তা বলা যায় না। মহারাজ দুষ্যন্ত এখানে এক তপস্বিকন্যার রূপ-যৌবন-লাবণ্যের শারীরিক পরিভাষায় আন্দোলিত। অন্যদিকে শকুন্তলাও সেই যৌবনোচিত ভোগবাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন নিজের স্বার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণ মাথায় রেখে। রাখাল ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর মিলন নাই হোক, চক্রবর্তী সম্রাটের সঙ্গে আরণ্যক তপস্বিনীর মিলন তো হল বটে, তবে কোনওভাবেই এই মিলনের মধ্যে আধুনিক সংজ্ঞায় প্রেম-ভালবাসার কোনও স্ফুরণ নেই। হয়তো দুষ্যন্ত-শকুন্তলার এই মিলন-কাহিনীর মধ্যে প্রেমের আধুনিক সংজ্ঞার অভাবটুকু পূরণ করার জন্য আমাদের আরও কয়েক শত বৎসর অপেক্ষা করতে হবে—যখন কালিদাস জন্মাবেন। তাঁর লেখনীর অভিজ্ঞানে ফুল কীভাবে ফলে

AMARBOI.COM

পরিণত হয়, মর্ত্য কীভাবে স্বর্গে পরিণত হয়—তা পরীক্ষা করার জন্যই যেন মহাভারতের কবি শকুন্তলা-দুষ্যন্তের মিলনের মধ্যে এক সুনির্দিষ্ট ফাঁক রেখে দিলেন। আর সেই ফাঁকের মাঝখানটা ভরে রাখলেন মহারাজা দুষ্যন্তের অধৈর্য আর শকুন্তলার স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে।

তপস্বিনী শকুন্তলার মুখে শারীরিক মিলনের শর্ত শোনা মাত্রই দুষ্যন্ত কোনও কথা না ভেবে—প্রত্যুবাচাবিচারয়ন্—জবাব দিলেন—আমি তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাব, সুন্দরী! সেটাই তোমার উপযুক্ত জায়গা। শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়েই দুষ্যন্ত গান্ধর্ব বিবাহের বিধি নিয়ম মেনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করলেন। এই গান্ধর্ব-বিবাহের নিয়মে—তুমি আমার স্ত্রী হও—এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পাণিগ্রহণমাত্রেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহর্ষি কণ্ব তখনও ফিরে আসেননি। নির্জন বনস্থলীর মধ্যে দুষ্যন্তের সঙ্গে সহবাসে অনুমতা হলেন শকুন্তলা—জগ্রাহ বিধিবৎ পাণৌ উবাস চ তয়া সহ।

যুবতী-তপস্বিনীর মিলন-হৃষ্ট দুষ্যন্ত কণ্বমুনির আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার সময় বারবার শকুন্তলাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন—আমি রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি বটে। কিন্তু গিয়েই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য চতুরঙ্গিনী সেনা পাঠাব। রাজার রথ আসবে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। অনেক সান্ত্বনা বাক্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা শুধু মহর্ষি কণ্বের কথা চিন্তা করতে করতে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। সুখ-সহবাসের পর আশ্রম-যুবতী শকুন্তলার সুখস্মৃতি মহারাজ দুষ্যন্তকে ততখানি উদ্বেলিত করল না, যতখানি উদ্বেলিত করল মহর্ষি কণ্বের ভয়। আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের গান্ধর্ব-মিলনের কথা শুনে মহর্ষি কণ্ব কী ভাববেন, কী করবেন—এই চিন্তায় আকুলিত হয়ে দুষ্যন্ত রাজধানীতে ফিরে গেলেন—ভগবাংস্তপসা যুক্তো শ্রুত্বা কিং নু করিষ্যতি।

দুষ্যন্তও আশ্রম থেকে বেরলেন, মহর্ষি কণ্বও অমনি ফিরে এলেন আশ্রমে। রাজার সঙ্গে গোপন মিলন-হেতু শকুন্তলার মনে যুবতী-সুলভ লজ্জার অন্ত ছিল না। মহর্ষিকে তিনি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলেন এবং এই ব্যবহার তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না।—শকুন্তলা চ পিতরং হ্রিয়া নোপজগাম তম্। অন্য সময় ফলের বোঝা নিয়ে মহর্ষি বাড়ি ফিরলে শকুন্তলা যা যা করেন মহর্ষির ফল-ভার গ্রহণ করা থেকে আরম্ভ করে তালপত্রের ব্যজন—সে সব কিছুই করলেন না শকুন্তলা। নিজেকে তিনি লুকিয়ে রাখতে এতই ব্যস্ত হলেন যে, মহর্ষির মনে সন্দেহের উদয় হতে দেরি হল না। দিব্যজ্ঞানে ধ্যাননেত্রে মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্তকে দেখতে পেলেন কিনা জানি না—মহাভারত অবশ্য তাই বলেছে—কিন্তু লৌকিক বুদ্ধিতে আশ্রমের সর্বত্র খবর নিয়ে এবং সেই সঙ্গে শকুন্তলার লজ্জা-বিহ্বল ব্যবহার একত্র মিলিয়ে মহর্ষির বুঝতে দেরি হল না যে, দুষ্যন্ত এসেছিলেন এবং তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করেছেন মহর্ষির অসাক্ষাতে।

মহর্ষি কণ্ব সন্ন্যাসী যতই হোন, তাঁর লৌকিক বুদ্ধি অতি প্রখর। তিনি জানেন—বয়ঃসিদ্ধ স্বভাবেই যুবক-যুবতীর হৃদয়ে কামনার তরঙ্গ ওঠে, তাকে ধমক দিয়ে বা অভিশাপ দিয়ে রুদ্ধ করা যায় না। তিনি শকুন্তলাকে পরিষ্কার বললেন—আমাকে গুরুত্ব না দিয়েও গোপনে তুমি আজ যা করেছ—রহসি মাম্ অনাদৃত্য যঃ কৃতঃ—অর্থাৎ একটি পুরুষের সঙ্গে তোমার এই গোপন মিলনে অধর্ম কিছু হয়নি, মা! তিনি তোমাকে চেয়েছেন, তুমিও তাঁকে চেয়েছ—এই পারস্পরিক চাওয়ার মধ্যেই গান্ধর্ব বিবাহের সিদ্ধি লুকনো আছে। এমন বিয়েতে মন্ত্র-তন্ত্রের বালাই নেই কিছু—সকামায়াঃ সকামেন নির্মন্ত্রো রহসি স্মৃতঃ। ক্ষত্রিয় পুরুষেরা এমন বিবাহ করেই থাকেন। আর তোমার দিক থেকেও এতে কোনও অধর্ম ঘটেনি মা—ন স

www.amarboi.com

ধর্মোপঘাতকঃ। তাছাড়া মহারাজ দুষ্যন্ত ধর্মজ্ঞ পুরুষ, মহাত্মা। পুরুষ-সমাজে তাঁর মতো মানুষ কোথায় আছে? তুমি তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার করে যথার্থ কাজই করেছ।

হায়! আধুনিক যুবক-যুবতীর ভাগ্যে মহর্ষি কণ্বের মতো আরও কয়েকটি পিতার জন্ম হত যদি! মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ব-মিলন স্বীকার করে নিলেন এক অতি আধুনিক অনুকূলতা এবং সহজভাব দেখিয়ে। একই ভাব কালিদাসেও আছে অতি সংক্ষেপে, যদিও তা আরও কাব্যিক সরসতায় জারিত। আশ্রমিক ঋষির দৃষ্টিতে চোখে-না-দেখা দুষ্যন্ত সেখানে খানিকটা অন্তরীক্ষ লোকের দেবতার মতো। গান্ধর্ব-বিবাহে শকুন্তলার আত্মদানের ঘটনাটা তিনি যাজ্ঞিক ঋষির কল্পনায় ব্যক্ত করে বলেছেন—যজ্ঞ করার সময় যজ্ঞ-কাষ্ঠের ধোঁয়ায় দৃষ্টি অবরুদ্ধ হলেও যজমানের আহুতিটা আগুনেই পড়েছে ঠিকঠাক—দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা। মহাভারতের কণ্বমুনি শকুন্তলাকে সেই মুহূর্তেই আশীর্বাদ করে বলেছেন—তোমার গর্ভে এক বিরাট রাজপুরুষ জন্মাবেন। এই সসাগরা পৃথিবী তাঁর অধিগত হবে। তিনি হবেন চক্রবর্তী সম্রাট।

এতক্ষণে যেন শকুন্তলার হুঁশ হল। যখন তিনি বুঝলেন—মহর্ষি কণ্ব ক্ষুব্ধ হননি তাঁর গোপন-মিলনে, তখনই লজ্জানম্র মুখখানি তুলে পিতার কাছে এলেন। তাঁর ক্লান্ত স্কন্ধ থেকে নামিয়ে নিলেন সংগৃহীত সমিধ-ফুল-ফলের ঝোলাটি। এগিয়ে দিলেন পা ধোয়ার জল; আর কী আশ্চর্য, এরই মধ্যে ক্ষণকাল-সন্নিহিত প্রণয়ী রাজার সমৃদ্ধির জন্য কুশল-ভিক্ষা করলেন মহর্ষির কাছে। বললেন—তাঁর কোনও দোষ নেই পিতা। আমি স্বেচ্ছায় তাঁকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছি—ময়া পতির্বৃতো রাজা দুষ্যন্তঃ পুরুষোত্তমঃ। তুমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হও পিতা। শকুন্তলার কথা শুনে আধুনিক পিতা যা বলেন কণ্বও তাই বললেন। আজকের দিনে যদি আমাদের মেয়ে তার উপযুক্ত প্রণয়ীকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়, তবে সেই প্রণয়ী-স্বামী আমাদের একান্ত অজানা-অচেনা, এমনকি অপছন্দ হলেও, সে যেমন আমাদের মেয়ের প্রণয়-স্বার্থেই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে, মহর্ষি সেই দৃষ্টিতেই শকুন্তলাকে বললেন—আমি তো তোর জন্যেই দুষ্যন্তের ওপর খুশি হয়েছি মা। তুই তাঁকে নিজে পছন্দ করেছিস, আমি কি তাঁর ওপর প্রসন্ন না হয়ে থাকতে পারি—প্রসন্ন এব তস্যাহং ত্বৎকৃতে বরবর্ণিনী।

নতুন বিয়ে হলে গর্বিণী বধূটি যেমন বাপের বাড়ি এসে শ্বশুর বাড়ির সম্বন্ধে উচ্চগ্রামে নানা প্রশংসা করে কথা বলে,—আমার শ্বশুরবাড়িতে এরকমটি চলবে না, এমনটি হলে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি তুলকালাম করে ফেলবেন—এইরকম নানা কল্পিত গৌরবে বধূটি যেমন গৌরবান্বিত হয়, ঠিক তেমনই শকুন্তলাকে আমরা শ্বশুরবাড়িতে যাবার আগেই যথেষ্ট গৌরবান্বিত দেখছি। তিনি যে প্রসিদ্ধ পৌরব-বংশের বধূ নির্বাচিত হয়েছেন, স্বামীর বিশাল রাজ্য এবং রাজত্ব নিয়ে তাঁরও যে কত দায়িত্ব আছে, সে কথা বেশ প্রকট হয়ে উঠল শকুন্তলার হাবে-ভাবে, কথা-বার্তায়। কণ্বমুনি প্রসন্ন হয়ে শকুন্তলাকে বর চাইতে বললে শকুন্তলা বললেন—পৌরব-বংশের রাজারা যেন আপন ধর্ম থেকে চ্যুত না হন, পৌরবরা যেন তাঁদের রাজ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকেন—ততো ধর্মিষ্ঠতাং বব্রে রাজ্যাচ্চাস্খলনং তথা।

পরিষ্কার বোঝা যায়—এখনও দুষ্যন্তের রাজধানীতে প্রবেশ না করলেও শকুন্তলা এখনই পৌরব দুষ্যন্তের রাজবধূ হবার গৌরব অনুভব করছেন। ইন্দ্রিয়-সুখের চরিতার্থতায় ক্ষণমাত্র বিচলিত হলেও কণ্বাশ্রমের পালিতা কন্যাটি মুহূর্তের রূপান্তরে পৌরববংশের রাজবধূর

ইতিকর্তব্যতার মধ্যে নিজেকে স্থাপন করেছেন। হয়তো দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মৌহূর্তিক মিলনের মধ্যে প্রেম ছিল না কোনও, হয়তো যুবক-যুবতীর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রেম না থাকলেও বিবাহের পরক্ষণেই স্বামীর রাজধর্মের কর্তব্যে নিজেকে স্থাপন করার মধ্যেই সেকালের এক রমণীর চরম সার্থকতা ফুটে উঠছে। রাজা দুষ্যন্তের অর্থ নয়, শাড়ি-গয়না নয়, তিনি সামগ্রিক পৌরববংশের গৌরব কামনা করেন, ব্যক্তি দুষ্যন্তকে উপলক্ষ করে—'ব্যাপকহিতবরণে ব্যাপ্যহিতবরণ' আপনিই সিদ্ধ হয়ে যায়—শকুন্তলা পৌরবাণাং (ধর্মিষ্ঠতাং) বব্রে দুষ্যন্ত-হিতকাম্যয়া।

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার বিষয় মহাভারতের কবির কাছে গৌণ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দুষ্যন্তের হিতকামনা, সমগ্র পৌরববংশের হিতকামনার সমস্ত তাৎপর্য আস্তে আস্তে পর্যবসিত হয়েছে শকুন্তলার মাতৃত্বে। পৌরববংশের বীজ শকুন্তলার গর্ভে আহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্খলিতা যুবতী থেকে জননীতে পরিণত হয়েছেন। এমন মহিলা আমরাও যে দেখিনি, এমন নয়। সেকালে এমন মহিলা অনেক দেখেছি, যাঁদের মধ্যে ইউরোপীয় 'রোম্যান্টিসিজমে'র কোনও বালাই ছিল না, প্রেম-ভালবাসা বলতে কাব্যিক অর্থে যা বোঝায়, তাও খুব ভাল করে বোঝা যেত না তাঁদের দাম্পত্য ব্যবহারে; কিন্তু যেটা খুব বেশি করে বোঝা যেত, সেটা হল মাতৃত্ব। একটি পুত্র-কন্যা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের পুত্রকন্যার সাজাত্যে সমস্ত জগতের মানুষই তাঁর কাছে পুত্র-কন্যায় পরিণত হত। এক বৎসর আগে যাঁর যুবতী-সুলভ, শরম-বিজড়িত, আঁটোসাঁটো ব্যবহারে কুণ্ঠিত বোধ করতে হত, একটি পুত্র-কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষই এমন আলুথালু, মুখরা এবং আঁচল-খোলা হয়ে যেতেন যে, তাঁকে জননী ছাড়া আর কিছু ভাবা যেত না।

যে কবি গুপ্তরাজাদের স্বর্ণযুগে বসে বিরহিনী শকুন্তলাকে গর্ভিণী অবস্থায় পতিগৃহে যাত্রা করিয়ে দর্শক-শ্রোতার অনুকম্পা আকর্ষণ করবেন, তাঁকে অন্তত এই অংশের জন্য মহাভারতের কবির কাছে ঋণী বলা যায় না। মহাভারতে দুষ্যন্ত রাজা রথ পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করে চলে গেলেন বটে, কিন্তু কোথায় সেই প্রতিজ্ঞাত চতুরঙ্গিনী সেনা? কোথায় রাজার রথ? দুষ্যন্তের রাজধানী থেকে কেউ এল না নির্জন আশ্রম-ভবনে, শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য। তিনটি বৎসর সম্পূর্ণ চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল—ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু—রাজার রথ একবারও ঘর্ঘর করে এল না কণ্বাশ্রমের বনপথ ধরে। কিন্তু সময়কালে শকুন্তলার পুত্র জন্মাল মহর্ষির আশ্রমেই—অসূত গর্ভং বামোরুঃ কুমারম্ অমিতৌজসম্।

কী তার চেহারা! কী তার রূপ! মহর্ষির আশ্রম কুটিরে এক পুঞ্জ আগুন জ্বলে রইল শকুন্তলার কোল আলো করে। মহর্ষি কণ্ব পৌরব দৌষ্যন্তির জাতকর্মের সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করলেন। ছেলে বড় হতে লাগল ঋষির আশ্রমে। ছয় বৎসর বয়স হল ছেলের। গায়ের রঙ উজ্জ্বল হল, শরীর দৃঢ়, সম্ভাব্য সিংহের তেজ তার শারীরিক এবং মানসিক গঠনে। কুমার আরও একটু বড় হতেই তার রাজত্ব গড়ে উঠল বনস্থলীর পশু-সমাজকে নিয়ে। বাঘ, সিংহ, হাতি—সব কিছু ধরে এনে আশ্রমের কাছাকাছি গাছগুলিতে বেঁধে রাখা তার নিত্যদিনের খেলার মধ্যে পড়ত—ববন্ধ বৃক্ষে বলবান্ আশ্রমস্য সমীপতঃ। আশ্রমবাসীরা আগে কাউকে এমন দেখেননি। বন্য পশু-সমাজকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ-তাড়ন করা যে সে লোকের কর্ম নয়। আর সেটাই যখন এই রাজকুমার পারে—অতএব, আশ্রমবাসীরা বলল—অতএব এই রাজকুমারের নাম হোক সর্বদমন—অস্তু অয়ং সর্বদমনঃ সর্বং হি দময়ত্যয়ম্।

শক্ত-সমর্থ বালক সর্বদমনকে দেখে মহর্ষি বিচলিত হলেন। মহারাজ দুষ্যন্ত এখনও কোনও খোঁজই নেননি শকুন্তলার। তাঁর যে একটি পুত্র এই আশ্রমের পরিবেশে বড় হয়ে উঠল, তাও তিনি ভাল করে জানেন না। মহর্ষি একদিন শিষ্যদের ডেকে বললেন—তোমরা শকুন্তলা আর তাঁর ছেলেকে নিয়ে দুষ্যন্তের কাছে রেখে এসো। বিবাহিতা একটি রমণী যদি সুচিরকাল ধরে তার বাপের বাড়িতে পড়ে থাকে তবে পাঁচ জন পাঁচ কথা বলে—নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবেষু ন রোচতে। এমনি করে বেশি দিন থাকলে তার চরিত্র, ধর্ম, স্বভাব নিয়েও নানা প্রশ্ন আসবে। তোমরা তাই আর দেরি করো না, শকুন্তলাকে নিয়ে যাও দুষ্যন্তের কাছে—তস্মান্নয়ত মা চিরম্।

মহারাজ দুষ্যন্তকে শকুন্তলা যে শর্তের কথা বলেছিলেন—তোমার রাজ্যে আমার গর্ভজাত পুত্রই হবে যুবরাজ—সেই শর্তের কথা মহর্ষি কণ্বও জানেন। ফলে বয়ঃপ্রাপ্ত সর্বদমনকে দেখে মহর্ষি শকুন্তলাকে বলেছিলেন—এখন সময় হয়েছে মা! তোমার সর্বদমন এবার যুবরাজ হবে—সময়ো যৌবরাজ্যায় ইত্যব্রবীচ্চ শকুন্তলাম্। শকুন্তলা আপত্তি করেননি। মহর্ষির যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে দুষ্যন্তের রাজধানীর পথে রওনা হলেন, জনান্তিকে বলি—মহাভারতের কথকঠাকুর নিজে যেখানে বসে আছেন, সেই জায়গাটার নাম করেই মুখ ফসকে বলে ফেললেন—শকুন্তলার ছেলে সর্বদমনকে নিয়ে কণ্বমুনির শিষ্যরা হস্তিনাপুরে চললেন দুষ্যন্তের কাছে—শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য সপুত্রাং গজসাহ্বয়ম্। কিন্তু হস্তিনাপুর তখন কোথায়? দুষ্যন্তের বেশ কয়েক পুরুষ পরে পুরুবংশের পরম্পরায় মহারাজ হস্তীর রাজত্বকালে 'হস্তিনাপুরে'র প্রতিষ্ঠা হবে। কাজেই হস্তিনাপুরে নয়। শকুন্তলাকে নিয়ে কণ্বের শিষ্যরা চললেন দুষ্যন্তের রাজধানীতে। হয়তো হস্তিনাপুরের কাছাকাছি কোনও জায়গায়।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কবি তাঁর নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গর্ভিণী শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্-মুহূর্তগুলি ধরে রেখেছেন ছবির মতো কয়েকটি শ্লোকে। কিন্তু মহাভারতের কবির জগৎ নিতান্তই কর্তব্যময়। এখানে কোনও মৃগশিশু অর্ধভুক্ত শষ্পগ্রাস ত্যাগ করে শকুন্তলার আঁচল ধরে টানল না, নৃত্য ত্যাগ করল না ময়ূর-ময়ূরী। আশ্রমের বনবৃক্ষ থেকে অশ্রু-কুসুম ঝরে পড়ল না। কোনও প্রিয়ংবদা প্রিয়সখী 'ইন্দুপাণ্ডু-তরু'র চীরবাস পরিয়ে দিল না শকুন্তলাকে; কেউ বনফুলের আভরণ রচনা করে দিল না শকুন্তলার কেশে, গ্রীবায়, হাতে। বাষ্পাচ্ছন্ন মহর্ষির কণ্ঠ দিয়ে কোনও উদ্বেল উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হল না, শকুন্তলাও জিজ্ঞাসা করলেন না—কবে তিনি আবার ফিরে আসবেন শান্ত আশ্রমপদে।

মহাভারতের কবি শকুন্তলাকে পতিগৃহযাত্রা করালেন অত্যন্ত বাস্তব-কঠোর অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে। শকুন্তলা এখানে কোনও পুষ্পাঘাতভঙ্গুরা নায়িকা নন। তিনি স্বাধীনচেতা, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময়ী। দুষ্যন্তের স্বভাব তিনি জেনে গেছেন, বুঝেও গেছেন।—দুষ্যন্তবিদিতাত্মনা। এতদিন পরে দুষ্যন্তের কাছে তিনি যুবতীর প্রেম, স্ত্রীর ভালবাসা ভিক্ষা করতে আসেননি। তিনি এক দীপ্তিমান পুত্রের হাত ধরে দুষ্যন্তের রাজধানীতে পৌঁছেছেন তাঁরই পুত্রের মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে—গৃহীত্বামরগর্ভাভং পুত্রং কমললোচনম্। প্রেমের দাবি নয়, পুত্রের যৌবরাজ্য দাবি করার জন্য শকুন্তলা এসেছেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে—দুষ্যন্তের সঙ্গে আজকে তাঁর বোঝাপড়া হবে।

AMARBOI.COM

পঁয়তাল্লিশ

রাজবধূ শকুন্তলা স্বামীর রাজসভায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, অথচ কেউ তাঁকে রানি বলে চিনল না। কোনও মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল না তাঁর এতদিনের প্রতীক্ষিত আগমনে, দাসীরা কেউ রাজদ্বারে দাঁড়িয়ে নেই পুষ্পের থালি হাতে। তপস্বীরা রাজবাড়ির দৌবারিকের কাছে শকুন্তলা এবং তাঁর পুত্রের প্রবেশ সুগম করার জন্য অনুমতি চাইলেন এবং রাজার অনুমতিক্রমে তাঁদের প্রবেশ করানো হল—বেদিতা চ প্রবেশিতা। শকুন্তলার সঙ্গে আসা কণ্বাশ্রমের তপস্বীরা শকুন্তলা রাজসভায় ঢুকেছেন দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেলেন—আশ্রমং পুনরাগতাঃ। শকুন্তলা রাজসভায় প্রবেশ করলেন পুত্রের হাত ধরে, একা।

যে মহাকবি একটি মাত্র ঘটনার অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকটি লিখে ফেললেন, সে ঘটনা মহাভারতে নেই। তপোবন থেকে ফিরে আসবার আগে নিজের নাম লেখা যে আংটিখানি দুষ্যন্ত পরিয়ে দিয়ে এসেছিলেন শকুন্তলার হাতে, মহাকাব্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। মহাভারতের দুষ্যন্ত মহান পৌরব বংশের একান্ত অলক্ষ্য বীজ ব্যতীত আর কোনও স্মরণচিহ্ন রেখে আসেননি শকুন্তলার কাছে। কালিদাসে এই আংটির সূত্র ধরেই দুর্বাসার শাপও অনেক অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞানে দুর্বাসার অভিশাপ এমনই এক অপূর্ব ঘটনা, যার মাধ্যমে নাটকের সমস্ত নাটকীয়তাই তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন কালিদাস। তপোবনের মধ্যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যে কামনার আবর্ত তৈরি হয়েছিল, তারই ফলস্বরূপ গ্রিক ট্র্যাজেডির 'নেমেসিস' যেন দুর্বাসার শাপের আকার ধারণ করেছে অভিজ্ঞান-শকুন্তলে।

দুর্বাসার শাপের তাৎপর্য নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে রবীন্দ্রনাথ—সকলেই ব্যাকুলিত হয়েছেন। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু বলে রাখি—দুর্বাসার শাপের একটা রাজনৈতিক-

সামাজিক তাৎপর্যও আছে, তবে সে কথা আসবে আমাদের কাহিনীর অনুক্রমেই। কালিদাসের বর্ণনায় দেখছি—রাজার কাছে শকুন্তলার প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করছেন কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব। তিনি মহর্ষি কণ্বের নাম করে বলেছেন—আপনারা নিজে নিজে ঠিক করে যে বিবাহ করেছিলেন, সেটা মহর্ষি মেনে নিয়েছেন। এখন এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁকে আপনি আপনার গৃহস্থ ধর্ম আচরণের সহায় হিসেবে গ্রহণ করুন—তদিদানীম্ আপন্নসত্ত্বা প্রতিগৃহ্যতাং সহধর্মচরণায়েতি। শার্ঙ্গরবের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্যা গৌতমী—একমাত্র বয়স্কা মহিলা যিনি শকুন্তলার সঙ্গে এসেছিলেন তিনিও একটু বাঁকা করে বলেছিলেন—আমাদের মেয়েও কোনও গুরুজনের অপেক্ষা করেনি, আর আপনিও আপনার আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে একটুও আলোচনা করেননি—নাপেক্ষিত গুরুজনো'নয়া ন ত্বয়া পৃষ্টো বন্ধুঃ। আপনারা নিজেরাই যেহেতু স্বাধীনভাবে সব কিছু করেছেন, সেখানে একজনের জন্য আরেকজনের কাছে কী আর ওকালতি করব?

শার্ঙ্গরব, আর্যা গৌতমী—এঁদের কথা শুনে রাজার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল—এ সব আবার কী শুরু হল? উপন্যাস নাকি—কিমিদম্ উপন্যস্তম্? আর লজ্জানম্রা অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলা রাজার প্রথম কথাটা শুনে মনে মনে বলেছিলেন—কথা তো নয়, যেন আগুন—পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ। শার্ঙ্গরব রাজার কথায় আমল দেননি। শকুন্তলাকে রাজার ঘরে প্রবেশ করানোর জন্য নতুন যুক্তির অবতারণা করেছেন। রাজা তাতে বলেছেন—আমি কি কখনও এই রমণীকে বিবাহ করেছি বলে আপনাদের মনে হচ্ছে—কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা? শার্ঙ্গরব আকাশ থেকে পড়েছেন, আর্যা গৌতমী রাজার প্রত্যয়ের জন্য শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলে তাঁকে চেনানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাজা চিনতে পারেননি। কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না, কারণ দুর্বাসা শাপ দিয়েছেন। শকুন্তলা তপোবনে বসে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে সব ভুলে গিয়েছিলেন। দুর্বাসা অতিথি হয়ে এসে হাজার জানান দিয়েও শকুন্তলার ধ্যান ভাঙাতে পারেননি, তাই দুর্বাসা শাপ দিয়ে গেছেন—যার কথা তুই এমন করে ভাবছিস, তাকে হাজার বোঝালেও, হাজার চেনালেও সে তোকে চিনতে পারবে না—স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতো'পি সন্।

প্রিয়ংবদা দুর্বাসা মুনিকে অনেক তুষ্ট করে মুনির কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলেন যে, কোনও আভরণ-চিহ্ন রাজাকে দেখাতে পারলে রাজা তাঁকে চিনতে পারবেন। অনসূয়া সে কথা শুনে বলেছিলেন—বাঁচা গেল। রাজার দেওয়া আংটি তো শকুন্তলার কাছেই আছে। অতএব এ যাত্রায় বেঁচে যাবে শকুন্তলা। কিন্তু শকুন্তলা বাঁচেননি। 'অপূর্ব-নির্মাণ-নিপুণ' কবি সেই রাজার নামাঙ্কিত আংটিটি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার পথেই হারিয়ে দিয়েছেন। যাত্রাপথে শচীতীর্থের জলে স্নান-বন্দনা করতে নেমে শকুন্তলা আংটি হারিয়ে এসেছিলেন। অতএব দুর্বাসার শাপ ক্ষীণ হবার মতো কোনও উপকরণই রইল না শকুন্তলার অধীনে। রাজা কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না। কালিদাসের নাটকে অপূর্ব করুণ রসের যোজনা হল শৃঙ্গাররসের গৌণ বান্ধবের মতো।

মহাভারতের শকুন্তলার কাছে কোনও দুর্বাসা মুনি আসেননি। আংটি, অভিশাপ—কিছুই সেখানে নেই। তিনি পুত্রের হাত ধরে রাজসভায় ঢুকলেন এবং কোনও ভণিতা না করে রাজাকে বললেন—মহারাজ! এই নাও তোমার ছেলে। তুমিই এর জন্ম দিয়েছিলে। আমার সঙ্গে তোমার যেমন কথা হয়েছিল, সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার এই পুত্রকে এখন তোমার যুবরাজের সিংহাসনটি দেওয়ার কথা—অয়ং পুত্রঃ ত্বয়া রাজন্ যৌবরাজ্যে'ভিষিচ্যতাম্।

এতদিন পরে রাজার যদি সামান্য সন্দেহ বা বিস্মৃতিও কাজ করে, তাই শকুন্তলা এখানেই থামেননি। অবশ্য অবগুণ্ঠন মোচন করা, অথবা সেই যে সেই হরিণ-শিশু আমার আঁচল ধরে টেনেছিল—এই সব কাব্যিক স্মারকচিহ্ন কিছু নয়; যে ঘটনা সবার মনে থাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শকুন্তলা একেবারে গ্রাম্য ভাষায় বললেন—আমার সঙ্গে সঙ্গমের পূর্বে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, মহারাজ!—যথা সমাগমে পূর্বং কৃতঃ স সময়ঃ ত্বয়া—তুমি শুধু সেই কথাটা স্মরণ করো—তং স্মরস্ব মহাভাগ কণ্বাশ্রমপদং প্রতি।

মহাভারতের কবি এবার রাজার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মন্তব্য করছেন। তিনি বললেন—শকুন্তলার কথা শুনে রাজার সব কথা মনে পড়া সত্ত্বেও—তস্যা রাজা স্মরন্নপি—রাজা মিথ্যে কথা বললেন। বললেন—তোমার কথা আমার কিছুই মনে পড়ছে না। তোমার বেশটা তপস্বিনীর মতো হলে কী হবে, আসলে তুমি বদমাশ মেয়েছেলে। ধর্ম বল, অর্থ বল, আর কামই বল—এই তিন বর্গের কোনওটার ব্যাপারেই আমার সঙ্গে তোমার কোনওদিন কোনও সম্বন্ধ ঘটেছিল বলে আমার তো মনে পড়ছে না—ধর্মার্থকামসম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়া সহ। কাজেই তুমি এখানে থাক, বা চলে যাও, বা যা ইচ্ছে তাই করো, তাতে আমার কী আসে যায়—গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যথেচ্ছসি তথা কুরু।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের দুষ্যন্ত জ্ঞানপাপী আর কালিদাসের দুষ্যন্ত দুর্বাসার শাপের ফলে পূর্বঘটনা বিস্মৃত। স্বভাবতই কালিদাসের দুষ্যন্ত অনেক মহনীয় স্বভাবের মানুষ। কিন্তু কেন, এই কেন'র মধ্যেই আমাদের মতে দুর্বাসার শাপের তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। মনে রাখতে হবে—কালিদাস রাজসভার কবি। গুপ্তযুগের কোনও বিশালকীর্তি মহারাজার সভাকবি তিনি—সেকথা একেবারে নির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও তাঁর কাছে রাজার গৌরব অনেক বেশি। বিশেষত পৌরব-বংশের অধস্তন দুষ্যন্তের সম্বন্ধে বারবার তাঁর নাটকে মর্যাদা ফুটে উঠেছে। তপোবনের প্রথম উপন্যাসে সেই যে—'জন্ম যস্য পুরোর্বংশে'—বলে পৌরব-বংশের মহিমা কীর্তন করেছেন কালিদাস, সেই মহিমা থেকে তাঁর দুষ্যন্ত চ্যুত হননি কখনও। এমনকি অভিজ্ঞানের তৃতীয় অঙ্কে, যেখানে শকুন্তলা দুষ্যন্তের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন, সেখানেও দুষ্যন্তকে অতি-আগ্রহ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য শকুন্তলার মুখে সেই মর্যাদার অভিধান—পৌরব! শিষ্টাচার রক্ষা করো। কামনায় পীড়িত হলেও আমার নিজের ওপরে প্রভুত্ব নেই কোনও—পৌরব! রক্ষ বিনয়ম্। মদনসন্তপ্তা অপি নহি আত্মনঃ প্রভবামি।

বস্তুত পৌরব-বংশীয় এক রাজার সম্বন্ধে কালিদাসের এই মর্যাদাবোধ তৈরি হয়েছে গুপ্ত-বংশীয় রাজাদের মর্যাদাবোধ থেকেই। পুরুবংশের বংশকর পুরুষ দুষ্যন্ত নিজের পরিণীতা পত্নীকে সম্পূর্ণ চেনা সত্ত্বেও অস্বীকার করছেন—এই মিথ্যাচার এক স্বর্ণযুগীয় রাজার সভাকবির পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সেই কারণেই, হয়তো বা গুপ্ত-রাজার মর্যাদায় প্রতিবিম্বিত পৌরব-রাজার মর্যাদা রক্ষার জন্যই কালিদাস দুর্বাসার শাপের অবতারণা করেছেন অভিজ্ঞান-শকুন্তলে। বিস্মৃতির মতো এক অনিবার্য অভিশাপের নিয়তি তৈরি করে রাজসভায় কবি কালিদাস পৌরব দুষ্যন্তকে সমস্ত সামাজিক সঙ্কট এবং লোকাপবাদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। রাজা দুষ্যন্ত সেখানে এমনই এক রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, যেখানে তিনি পরিণীতা শকুন্তলার সম্বন্ধে কটু কথা কিংবা পূর্ব-পরিণয়ের অস্বীকৃতি জানালেও পাঠক-দর্শক তাঁকে বড় দোষ দিতে পারে না। দুর্বাসার শাপে যখন তাঁর কিছুই মনে নেই, তখন যদি শকুন্তলা বলেন—ঠিক আছে আপনার দেওয়া স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে আপনার সন্দেহ দূর করছি—সেই

মুহূর্তে রাজা একান্ত রাজোচিতভাবে বলেন—উদারঃ কল্পঃ—উত্তম প্রস্তাব।

পাঠক এখানেও রাজার বিচার-বুদ্ধি এবং স্বচ্ছ স্বভাবে সন্দেহ করতে পারে না। কোনও প্রমাণ পেলে রাজা নিশ্চয় মানবেন—এই নিরপেক্ষ রাজগুণে পাঠকের অন্তঃকরণ আশান্বিত হয়। কিন্তু শকুন্তলা তাঁর আংটি হারিয়ে ফেলেছেন। ফলত রাজার কটূক্তি তাঁকে শুনতেই হবে—এই অবধারিত যুক্তিতে শকুন্তলার জন্য পাঠকের মন যতই বিষণ্ণ হোক, পূর্বানুরাগবিস্মৃত শাপগ্রস্ত দুষ্যন্তকে তারা ক্ষমা করে দেয়। কালিদাস আপন কবি-প্রতিভায় দুষ্যন্তকে যে এই অপূর্ব মর্যাদায় স্থাপন করেছেন, তার কারণ অন্য আর যা কিছুই হোক, অন্তত একটা কারণ তাঁর নিজেরই পরিশীলিত বিদগ্ধ নাগরিক রুচি। সেই রুচিতে একজন পৌরব রাজাকে মিথ্যাচারী, কপট, হীন অবস্থায় রেখে দেওয়া যায় না। ফলত মহাভারতের আকরিক অবস্থা থেকে দুষ্যন্তকে তুলে এনে তিনি তাঁকে দুর্বাসার অভিশাপের মূর্ছায় যতখানি বিস্মৃত-মূর্ছিত করেছেন, তার থেকে অনেক বেশি, তিনি তাঁকে পৌরব রাজার মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অন্যদিকে শকুন্তলার অবস্থাও তাই। রাজাকে তিনি যত কথা বলেছেন, তাতে শকুন্তলার দিক থেকে সবচেয়ে বড় গালাগালি হল—অনার্য। সেকালের নাগরিক শব্দকোষে 'অনার্য' শব্দের চেয়ে বড় তিরস্কার কিছু নেই। আর এই শব্দটাই যদি আরও একটু বিশদভাবে বলা যায়, তবে কালিদাসের শকুন্তলার মুখে যা আসে, তা হল—অনার্য! আপনি নিজের মন দিয়ে সবাইকে দেখছেন। এমন আর অন্য কে আছে যে ধর্মের পোশাক পরা, ঘাসে ঢাকা কূপের মতো আপনাকে অনুকরণ করবে?

মহাভারতের দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে চিনেও ইচ্ছে করে চিনলেন না—তস্যা রাজা স্মরন্নপি—তখন প্রথম আঘাতে ক্ষণিকের তরে শকুন্তলা যেন লজ্জা পেয়েছিলেন, ক্ষণিকের তরে যেন তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল—নিঃসংজ্ঞেব চ দুঃখেন...ব্রীড়িতেব তপস্বিনী। অর্থাৎ সবটাই 'যেন'। লজ্জায় ভেঙে পড়ে রাজসভায় সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে পড়ে যাবার মতো দুর্বল রমণী তিনি নন। আকস্মিক আঘাত কাটিয়ে উঠতেই রাগে-অধৈর্যে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠল, ঠোঁট কাঁপতে থাকল আর বাঁকা চোখে এমন অর্থপূর্ণভাবে তিনি দুষ্যন্তের দিকে তাকাতে থাকলেন, যেন রাজাকে তিনি এক্ষুনি ভস্ম করে দেবেন—কটাক্ষৈর্নির্দহন্তীব তির্যগ্‌ রাজানমৈক্ষত।

কালিদাসের শকুন্তলার কি রাগ হয়নি? খুবই হয়েছিল, কিন্তু তা তাঁকে দমন করতে হয়েছে কালিদাসের হৃদয় অনুসারে বিদগ্ধা নায়িকার মতো। মহাভারতের শকুন্তলাও আপাতত এই স্ফুরমাণ ক্রোধ দমন করলেন কণ্বাশ্রমবাসিনী তপস্বিনীর শমতায়, তেজে। ঝগড়াঝাঁটির স্বরগ্রামের প্রথম স্বর থেকে তিনি আরম্ভ করতে চান, কারণ তিনি এখানে একা এবং কোথায় এ বিবাদ শেষ হবে তিনি জানেন না। শকুন্তলা বললেন—মহারাজ! সব মনে থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ছেঁদো লোকের মতো তুমি এমন মিথ্যা কথা বলছ কেন—জানন্নপি মহারাজ কস্মাদেবং প্রভাষসে? তুমি মনে মনে খুব ভালই জান—কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। কাজেই আদালতে ভদ্রলোক যেমন সত্যি কথা বলে, তুমিও তাই কর। তোমার মন জানে একরকম, আর তুমি বলছ আরেকরকম। তুমি তো নিজের কাছ থেকে নিজেকেই চুরি করছ চোরের মতো?

মহাভারতের শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের পরম্পরায় জ্ঞানীর মতো কথা বলেন। রাজাকে তিনি জীবাত্মা সাক্ষী-চৈতন্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—মানুষ নির্জনে পাপ করে

AMARBOI.COM

ভাবে—পাপ কিসের? কেউ তো জানতেই পারেনি—মন্যতে পাতকং কৃত্বা ন কশ্চিৎ বেত্তি মামিতি। কিন্তু মহারাজ! তোমার অন্তরপুরুষ জানে, তুমি কী করছ। আর জানেন অন্তরীক্ষ লোকের দেবতারা। তোমার হৃদি-স্থিত কর্মসাক্ষী জীবাত্মাকে তুমি ফাঁকি দিতে পার না। তুমি এই রাজসভার মধ্যে আমাকে এমনভাবে অপমান করছ যেন আমি ভীষণ খারাপ নীচ স্বভাবের মহিলা। অবশ্য আমি বোধহয় শূন্যে রোদন করছি কারণ, তুমি কিছুই শুনছ না।

শকুন্তলা এরপর 'জায়া' 'পুত্র', 'ভার্যা'—এই সমস্ত শব্দের ধর্মীয় এবং সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রতি, প্রীতি এবং ধর্ম যে পত্নীরই অধীন—তা খুব সুন্দরভাবে বোঝালেন। তারপর ভাবলেন—এতদিন পর যদি কোনও পুরুষ পূর্বপরিচিত স্ত্রীকে পছন্দ নাই করে, তবু তার পুত্রের ওপর তো মায়া থাকবে? শকুন্তলা তাই এবার পুত্রের কথা পাড়লেন। বললেন—মহারাজ! আমার কথা নাই ভাবলে, অন্তত পুত্রসুখের কথাটা ভাব। ধুলোমাটি গায়ে মেখে পুত্র যখন পিতার কোলে ওঠে—পিতুরাশ্লিষ্যতেঽঙ্গানি...ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ—তখন সেই আনন্দের কি সীমা আছে কোনও? তোমার পুত্র এই সামনে উপস্থিত, সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেমন করুণ চোখে তাকাচ্ছে তোমার দিকে, তাকে এমন করে অবজ্ঞা করছ কী করে? আরে এই সাধারণ পিঁপড়েগুলো পর্যন্ত নিজের ডিম কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সযত্নে সেগুলিকে রক্ষা করে, —অণ্ডানি বিভ্রতি স্বানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকাঃ—সেখানে তুমি কোনওভাবেই এই স্বাঙ্গজাত পুত্রটিকে ফেলে দিতে পার না। তুমি যেদিন আশ্রম থেকে চলে এসেছিলে তখন থেকে এই পুত্রমুখ দেখেই আমি তোমার বিরহ-দুঃখ সহ্য করেছি। শান্ত সরোবরের মধ্যে মানুষ যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, তেমনই পুত্রের মধ্যে পুরুষ-মানুষ তার নিজের ছায়াটাই দেখে, তোমার পুত্রও দেখ ঠিক তোমারই মতো—সরসীবামলেঽত্মানং দ্বিতীয়ং পশ্য বৈ সুতম।

শকুন্তলা পুত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধেও অনেক শাস্ত্রবাণী শোনালেন রাজাকে। কিন্তু সেসবে যখন কিছু হল না, তখন বললেন—আমার কপালটাই খারাপ, রাজা! অপ্সরাশ্রেষ্ঠা মেনকার গর্ভে আমার জন্ম। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র আমার জনক। কিন্তু হলে হবে কী? কী নিষ্ঠুর সেই অপ্সরা-জননী আমার! জন্মমাত্রেই হিমালয়ের এক সমভূমিতে আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন তিনি—যেন পরের ছেলে কোলে নিয়েছিলেন কোনওমতে—অবকীর্য্য চ মাং জাতা পরাত্মজমিবাসতী। আগের জন্মে কী পাপই না করেছিলাম, ঠাকুর! নইলে, সেই ছোটবেলায় বাপ-মা আমায় ছেড়ে চলে গেল, আর এখন তুমি আমায় অস্বীকার করছ—কিং নু কর্মশুভং পূর্বং কৃতবত্যন্যজন্মনি। তা বেশ, আমাকে না হয় তুমি চিনেও চিনলে না, না হয় ত্যাগই করলে আমাকে, আমি সেই আশ্রমেই আবার ফিরে যাব না হয়, কিন্তু এই ছেলেটি তোমার, একে তুমি নিশ্চয়ই ফেলে দিতে পার না—ইমন্তু বালং সন্ত্যক্তুং নার্হস্যাত্মজমাত্মনা।

শকুন্তলা এতক্ষণ ভালয় ভালয় অনেক কথা বলেছেন। ঝগড়া করার জন্য এখনও সেরকম করে গলা তোলেননি। মনে ক্রোধ জমা হলেও তা প্রকাশ করেননি। যা বলেছেন, তা সমাজ, ধর্ম এবং নৈতিকতার যুক্তি দিয়েই বলেছেন। এমনকি যা বলেছেন, তার মধ্যে সরলতাও এত বেশি ছিল যে, মহারাজ দুষ্যন্ত এবার তার সুযোগ নেবেন। সেই তপোবনে শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার পরেই দুষ্যন্ত তাঁর কাছে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনতে চেয়েছিলেন। শকুন্তলা অকপটে সব বলেওছিলেন। কথায় বলে—অর্থনাশ, মনের কষ্ট আর ঘরের কলঙ্ক কোথাও বেশি বলতে যেও না—অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ। কিন্তু কণ্বাশ্রমে পালিতা শকুন্তলা রাজাকে আপনার সমব্যথী ভেবে হৃদয় উজাড় করে সব বলে দিয়েছেন। নিজের মায়ের কলঙ্কও গোপন

AMARBOI.COM

করেননি। কিন্তু এখন একাকিনী পুত্রের হাত ধরে শকুন্তলা দাঁড়িয়ে আছেন রাজসভায় আর দুষ্যন্ত সরলা বালিকার সেই অকপট স্বীকারোক্তির সুযোগ নিচ্ছেন।

দুষ্যন্ত এতক্ষণ ধরে শকুন্তলার কথা শুনে পূর্বকালের বহুবিবাহিত কুলীন বামুনের মতো বললেন—তোমার গর্ভে আমার একটি পুত্র হয়েছে—এসব কথা আমার মোটেই স্মরণ হচ্ছে না। আর তোমার কাছে যেমন শুনছি, তাতে তোমার জননীটিকে তো একটি নির্দয়-হৃদয় বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না—মেনকা নিরনুক্রোশা বন্ধকী জননী তব। পুজোর প্রসাদী ফুল যেমন একসময় ফেলে দেয়, তেমনই তোমার মা মেনকা তোমাকে নির্মাল্যের মতো হিমালয়ের এক কোণে ফেলে দিয়ে গেছে। তোমার বাবা বিশ্বামিত্রও যে খুব দয়ালু মানুষ, তা মোটেই নয়। তাঁর আবার একসময় বামুন হবার শখ হয়েছিল—বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণত্বে লুব্ধঃ—কিন্তু এখন যা দেখছি তাতে ষড়-রিপুর প্রথমটিই তো তাঁর প্রধান অবলম্বন।

দুষ্যন্ত বুঝলেন—একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মেনকাকে না হয় যা তা বলা গেল, কিন্তু স্বাধ্যায়-অধ্যবসায়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ-করা বিশ্বামিত্র মুনিকে কামী বলে ফেলাটা রাজার পক্ষে যেন একটু বাড়াবাড়ি। দুষ্যন্ত তাই একটু সামলে নিয়ে বললেন—তা না হয় বুঝলাম যে, মেনকা অপ্সরা-সুন্দরীদের মধ্যে অন্যতমা শ্রেষ্ঠা আর বিশ্বামিত্রও মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁদের মেয়ে হয়ে তোমার কথাগুলো এমন বেশ্যাদের মতো কেন—তয়োরপত্যং কস্মাত্ত্বং পুংশ্চলীব প্রভাষসে? যে সব কথা তুমি আমার কাছে বলছ, তাতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। খুব তো তপস্বিনী সাজ নিয়ে বেশ একটা সাধু-সাধু ভাব করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু মনে রেখ—এটা রাজবাড়ি, তায় কথা বলছ রাজার সামনে। অতএব সাবধান। আমাকে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। ভণ্ড কোথাকার, বেরোও এখান থেকে—বিশেষতো মৎসকাশে দুষ্ট তাপসী গম্যতাম্।

শকুন্তলাকে নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা, তাঁকে অস্বীকার করার জন্য দুষ্যন্ত এমনভাবেই তাঁকে কলঙ্কিত করলেন যেন, একজন রাজার তো নয়ই, একজন সাধারণ মানুষের কাছেও তিনি পরিত্যাজ্যা। দুষ্যন্ত স্ত্রীকে অস্বীকার করে এবার পুত্রকে অস্বীকার করার যুক্তি সাজাচ্ছেন। বলছেন—আর তোমার ছেলেটি তো বেশ বড়সড় ঢ্যাঙা হয়ে গেছে, অল্প বয়স দেখতে লাগে বটে, কিন্তু গায়ে বেশ শক্তি আছে মনে হয়—অতিকায়শ্চ তে পুত্রো বালো'তিবলবানয়ম্। কোথা থেকে একটা শালখুঁটির মতো ঢ্যাঙা ছেলে নিয়ে এসে, বলে কিনা আমার ছেলে—শালস্তম্ভ ইবোদ্‌গতঃ। পরিষ্কার বোঝা যায়—তোমার মা বেশ্যা বলেই তুমিও বেশ্যার মতোই কথা বলছ। একমাত্র বেশ্যারাই নিজের অবিধিজাত সন্তানকে হঠাৎ এক পুরুষের সামনে হাজির করে তাকে তারই পুত্র বলে প্রতীত করাতে চায়। তুমি যা যা বলছ, যা যা সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইছ, আমি যেহেতু তার কিছুই স্মরণ করতে পারছি না, তাই আর তোমার দাঁড়িয়ে থাকা সাজে না। তোমাকে আমি চিনি না, তুমি যাও এখান থেকে—নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া।

রাজার বয়ান থেকে, ভাষা থেকে বোঝা যায়, তিনি সত্যিই নিজের কাছে নিজেকে লুকোতে চাইছেন। নইলে পুরুবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক রাজা তাঁর নাগরিকবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে নিজের পূর্বপরিণীতা স্ত্রীকে এইভাবে কলঙ্কিত করতে পারেন না; অস্বীকার করতে পারেন না ঔরসজাত পুত্রকে। বেশ বুঝতে পারি—একটা গভীর কারণ আছে, যে জন্য তাঁকে এই অত্যাভিনয় করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা শকুন্তলার দিক থেকে কতখানি মর্মান্তিক ভাবুন যে, তাঁর নিজের বলা কথা তাঁকে এখন গিলতে হচ্ছে আপন বমন-নিষেবণের মতো। কিন্তু এও

তো সত্যি যে নিজের বাবা-মা যত খারাপই হোন, অন্যের মুখ দিয়ে তা শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। সরলা শকুন্তলা তাই নিজের মতো করেই তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন রাজাকে।

শকুন্তলা ভীষণ রেগে গেছেন। বিদগ্ধা নায়িকার মতো সুচতুর বাগভঙ্গি প্রকাশ করে তাঁর পক্ষে দুষ্যন্তের প্রতিভাষণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তিনি সেই নায়িকা নন। আর কেউ যদি—'শালা, শুয়োরের বাচ্চা' বলে গালাগালি দেয়, তবে তার উত্তরে—দেখুন, আপনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না—এমন ভদ্রভাষণও কোনও কাজের কথা নয়। শকুন্তলা তাই দুষ্যন্তকে বললেন—সরষের দানা দেখেছ, মহারাজ! অন্যের দোষটা যদি সরষের দানার মতোও হয়, তবে সেটা খুব তোমার চোখে পড়ে। কিন্তু তোমার নিজের ছিদ্রটা যে বেলের মতো এত বড়, সেটা তো নজরেই আসছে না—আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি। শকুন্তলা এর আগে নিজের পিতা-মাতা সম্বন্ধে যা বলে ফেলেছেন, ফেলেছেন। এখন গলার জোরে তা ঠিক করার চেষ্টা করছেন। বেশ্যাপুত্রও অন্যের মুখে আপন জননীর বেশ্যা-পরিচয়ে ক্রুদ্ধ হয়। শকুন্তলা বললেন—আমার মাকে অত হেলা-ফেলা করো না, রাজা। মেনকা অপ্সরা হলে কী হবে, তাঁর চলা-ফেরা সব দেবতার মধ্যে, দেবতারা তাঁর পেছন পেছন ঘোরেন—মেনকা ত্রিদশেষ্বে ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্। সেদিক দেখতে গেলে তোমার জন্মের থেকে আমার জন্মের মর্যাদা অনেক বেশি—মমৈবোৎকৃষ্যতে জন্ম দুষ্যন্ত তব জন্মতঃ।

কথাটা শুনলে আপাতত মনে হতে পারে যেন শকুন্তলা একেবারে ছেলেমানুষি ঝগড়া করছেন। কিন্তু এই ছোট্ট একটি কথা—তোমার জন্ম আমার থেকে খারাপ—এই ছোট্ট একটি কথার মধ্যে কিছু ব্যঞ্জনা আছে বলে মনে হয়। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত দুষ্যন্ত তাঁর মুখেই শুনে এসেছেন, কিন্তু এতদিন যখন দুষ্যন্ত তপোবন থেকে স্ত্রীকে আনবার জন্য কোনও চিন্তাই করেননি, তখন নিশ্চয়ই রাজার সমালোচনা কিছু হয়েছে। দুষ্যন্তর জন্মবৃত্তান্ত, পরের ঘরে মানুষ হওয়ার কথা, তখনই শকুন্তলার কানে এসে থাকবে। আমরা আগে বলেছিলাম—মরুত্ত রাজা যজ্ঞ সমাপন করে তাঁর মেয়ে সম্মতাকে দাসী হিসেবে দান করেছিলেন পুরোহিত সংবর্তকে। 'দাসী' শব্দে সেকালে ভোগ্যা স্ত্রীকেই বোঝানো হত। তার সামাজিক মর্যাদা অনেকটা বেশ্যার মতোই, বেশ্যা না হলেও অনেকটা রক্ষিতার মতো। আমরা অনুমান করেছিলাম—উচ্ছিন্ন পৌরববংশের কোনও অকুলীন পুরুষের সঙ্গে সম্মতার সঙ্গতি হওয়ার ফলেই দুষ্যন্তের জন্ম হয়েছিল এবং কন্যার প্রতি মমতাবশত মরুত্ত রাজা আর জামাইয়ের ওপর নির্ভর করেননি। তিনি নিজেই মানুষ করেছিলেন দুষ্যন্তকে।

আমাদের বিশ্বাস—দুষ্যন্তের এই অমর্যাদাকর জন্মের কাহিনী শকুন্তলাও নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছিলেন। আর সেইজন্যই শকুন্তলার এত মেজাজ। অর্থাৎ সাধারণ এক রক্ষিতা বা বেশ্যার সংসর্গে যাঁর জন্ম তার থেকে অন্তত স্বর্গবেশ্যা মেনকার মূল্য বেশি। কারণ, তিনি দেবকার্য সিদ্ধ করেন। শকুন্তলা তাই বললেন—স্বর্গলোকে আর অন্তরীক্ষলোকে আমাদের চলাফেরা, আর তুমি ঘুরে বেড়াও এই মরণশীল মর্ত্যভূমিতে, আমার জন্মের সঙ্গে তোমার জন্মের তুলনা? যেন পাহাড় আর সরষে।

জন্মের কথা তো গেল। শকুন্তলা আপন জন্মের মর্যাদায় এখন রীতিমতো গৌরবান্বিত। এখন তিনি রাজার অকথ্য তিরস্কারের প্রতিভাষণ দিচ্ছেন। শকুন্তলা বললেন—মানুষ যতক্ষণ না আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে, ততক্ষণই সে নিজেকে সুন্দর দেখে। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখলেই তবে না লোকে বুঝতে পারে নিজের সঙ্গে অন্যের ফারাক—তদান্তরং

বিজানীতে আত্মানশ্চেতরং জনম্। মানুষ যখন কথা বলে, তখন ভালমন্দ দুইই বলে। যেমন আমিও আগে বলেছি—আমার জন্ম এবং প্রতিপালনের সমস্ত বৃত্তান্তই তোমাকে অনুপুঙ্খভাবে শুনিয়েছি। কিন্তু যে শুনছে সে যদি মূর্খ হয়, তবে ভাল কথাটা সে ধরে না, মন্দটাই ধরে, যেমন শুয়োর—ভাল জিনিসটা সে খায় না, তার নজর সব সময় বিষ্ঠার দিকে—অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ।

শকুন্তলা বলতে চাইলেন—তুমিও ওই মন্দটাই ধরছ, রাজা। কেননা, ভাল মানুষ হলে সে নীর বর্জন করে ক্ষীরই গ্রহণ করত। দুর্জন লোকে অন্যের নিন্দা করে সুখ পায়, আমাকে নিন্দা করে তোমার তো সেই সুখই হচ্ছে, মহারাজ! শকুন্তলা দুষ্যন্তের তপোবনের সেই আচরণের সঙ্গে আজকের আচরণ মেলাতে পারছেন না। দুষ্যন্ত যেহেতু তাঁকে চিনেও চিনতে পারছেন না, তাই শকুন্তলা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, জগতে এর চেয়ে হাসির ব্যাপার আর বুঝি হয় না, যখন একজন খারাপ লোক নিজেকে খারাপ জেনেও অন্য ভাল মানুষকে খারাপ বলে গালাগালি দেয়—যত্র দুর্জনমিত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্। কী আশ্চর্য! তুমি নিজে আমার গর্ভে নিজেরই মতো একটি পুত্র উৎপাদন করে এখন সেই পুত্রের পিতৃত্ব অস্বীকার করছ কেমন করে—তা আমার মাথায় আসছে না—স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যো'বমন্যতে।

শকুন্তলা পুত্রের স্বার্থ ভেবে আবারও নিজেকে সংযত করলেন। বললেন—মহারাজ! আমার যা হয় হোক, তুমি ছেলেটিকে এমন করে অবজ্ঞা করো না। তুমি রাজা বটে, সত্য এবং ধর্মের রক্ষা করা তোমার স্বাভাবিক ধর্ম। সেই তুমি এমন কপটতা করো না আমার সঙ্গে। তুমি তোমার সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। আর যদি সব জেনে-বুঝে মিথ্যেটাকেই তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, তবে আমি নিজেই চলে যাচ্ছি, তোমার মতো এক মিথ্যাচারী কপট মানুষের সঙ্গে বাস করা আমারই বা সইবে কেমন করে—আত্মনা হন্ত গচ্ছামি তাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্। তবে আমার যাবার আগে আমার সত্য প্রতিজ্ঞাও তুমি শুনে রাখ, মহারাজ। তোমাকে বাদ দিয়েও, তোমার কোনও সহায়তা ছাড়াই আমার এই পুত্র একদিন রাজরাজেশ্বর হবে—ঋতে'পি তাঞ্চ দুষ্যন্ত...চতুরন্তামিমাম্ উর্বীং পুত্রো মে পালয়িষ্যতি।

কালিদাসের সভ্য-ভব্য পুষ্পাঘাতভঙ্গুরা শকুন্তলাকে যদি এইরকম ঝগড়া করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে হত এবং তাও রাজার সামনে, তবে এতক্ষণ তিনি মৃত ঘোষিত হতেন। দুষ্যন্তকে সামান্য দু-চার কথা বলে একা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে অন্তরীক্ষলোকের সাহায্য এসে পৌঁছেছে অভিজ্ঞান-শকুন্তলে। কিন্তু মহাভারতের শকুন্তলা চিরন্তনী জননীর গৌরবে কপট স্বামীর মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে সপ্রত্যয়ে পুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে চলে এসেছেন রাজসভা ছেড়ে—এতাবদুক্ত্বা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা।

ছেচল্লিশ

শকুন্তলা দুষ্যন্তের রাজসভা ছেড়ে গেলেন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে। মহাভারতের সহজ সরল অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে রাজনামাঙ্কিত কোনও অঙ্গুরীয় রোহিত মৎস্যের পেট কেটে বার করতে হয়নি এখানে। শকুন্তলা বাইরে প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মহাভারতী দৈববাণী হয়েছে এবং সে দৈববাণী হয়েছে কখন? না, রাজা তখন বসেছিলেন রাজসভার ঋত্বিক, পুরোহিত, মন্ত্রী-অমাত্যের দ্বারা বৃত হয়ে। আমরা অবশ্য দৈববাণী বলতে আকাশ-ফাটা কোনও অশরীরী শব্দস্ফোট বুঝি না। যা বুঝি, তা হল জনমত। দুষ্যন্তের সভার ঋত্বিক, পুরোহিত, মন্ত্রী-অমাত্যেরা কেউ নির্বোধ গর্দভ নন। তাঁরা শকুন্তলার দাপট দেখে, সত্যের প্রত্যয় দেখে এবং সর্বোপরি একটি বালকের মধ্যে দুষ্যন্তের ছায়া দেখে নিশ্চয়ই দুষ্যন্তকে বলেছিলেন তাঁর মত পুনর্বিবেচনা করতে—এবং সেটাই হয়তো দৈববাণী।

দৈববাণী হল—দুষ্যন্ত এই পুত্রটিকে তুমি ভরণপোষণ করো। শকুন্তলার প্রতি এইভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না—ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্। কোনও সন্দেহ নেই—তোমারই ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে এই পুত্রের জন্ম হয়েছে—এবং শকুন্তলা সত্য কথা বলেছে—ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা। দৈববাণী শকুন্তলার বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করেই ক্ষান্ত হল না, দেবতাদের মুখ দিয়ে দুষ্যন্ত তাঁর পুত্রের নামকরণও শুনতে পেলেন—আমাদের অনুরোধেই যখন তোমাকে এই পুত্রের ভরণ-পোষণ করতে হবে, তখন এই পুত্রের নাম হোক ভরত—তস্মাদ্ ভবত্বয়ং নাম্না ভরতো নাম তে সুতঃ।

এই কথাগুলি দৈববাণী না জনবাণী সে কথা আরও একবার পরে আসবে। তার আগে জানাই—আংশিকভাবে যে শ্লোকগুলি আমরা এখানে উদ্ধার করলাম, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার সমগ্র কাহিনীর হাজারো শ্লোকের মধ্যে এই শ্লোক-দুটির পৃথক এক মূল্য আছে। মনে রাখতে হবে,

মহাভারত ছাড়াও প্রায় সব প্রাচীন পুরাণে শকুন্তলা-দুষ্যন্তের কাহিনী সংক্ষেপে বা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দুষ্যন্ত যখন ইচ্ছাকৃতভাবে শকুন্তলাকে স্মরণ করতে চাইলেন না, তখন প্রত্যেক পুরাণেই এই দৈববাণীর শ্লোক-তিনটি উল্লিখিত হয়েছে। সব পুরাণেই এই শ্লোকগুলি একই শব্দবিন্যাসে লিখিত এবং মহাভারতের শ্লোকগুলির সঙ্গে এই শ্লোকগুলির কোনও পার্থক্য নেই। শব্দেও নয়, অর্থেও নয়।

পুরাণকারেরা বলেছেন—এই শ্লোকগুলি নাকি দেবতারা গান করেন—দৈবৈঃ শ্লোকো গীয়তে। পণ্ডিতেরা বলেন—পুরাণগুলির মধ্যে যখনই এইরকম—'দেবতারা এই শ্লোকটি গান করেন', অথবা 'এমনটি শোনা যায়—ইতি শ্রুয়তে' অথবা এখানে 'গাথা শোনা যায়—তথাহি গাথাঃ'—এইরকম উল্লেখ থাকে, তখনই বুঝতে হবে যে, এই দেবগান-গাথাগুলি হল— allusions to matters that are handed down from very ancient times, long before the original Purana was compiled.

যে দু-তিনটি শ্লোকের একেকটি কলি আমরা উল্লেখ করেছি, সেই শ্লোকগুলি হাজারো শ্লোকের মালায় হীরকখণ্ডের মতো। ওই শ্লোকগুলি শুনলেই শকুন্তলা-দুষ্যন্তের পূর্বাপর জীবন-কাহিনী এক ঝলকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বোঝা যায়—মহারাজ দুষ্যন্ত কোন কারণে তাঁর আপন স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাঁর ঔরসজাত শিশুপুত্রটিকেও অস্বীকার করেছিলেন। শ্লোক কটি দুষ্যন্তের এই অন্যায়ের জন্য তাঁকে সাবধান করছে এবং স্ত্রী-পুত্রের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করছে। আমরা এই বহু-উল্লিখিত শ্লোক-তিনটির প্রাচীনতা নির্ধারণ করে বলতে চাইছি যে, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনী মহাভারতের কালের আরও আগে রীতিমত লোকস্তরে প্রচলিত ছিল। লোকেরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিশদ প্রণয় কাহিনী নাই জানুক, কিন্তু বহুশ্রুত এই শ্লোক দুটি তারা জানত। এই শ্লোক কটিকে প্রত্যেক মুখ্য পুরাণের কথকঠাকুর সন্নিবেশ করেছেন রাজবংশের পরম্পরার মধ্যে। শকুন্তলা-দুষ্যন্তের প্রণয়কাহিনী কিচ্ছুটি আনুপূর্বিক না বলে, যেই না ভরতের নাম আসবে অমনই পৌরাণিক বলবেন—ভারতের নাম ভরত কেন হল জান? দেবতারা আকাশ থেকে বলেছিলেন—ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত। এই 'ভরস্ব' শব্দের দুটি বর্ণ 'ভর' আর 'দুষ্যন্তে'র শেষ বর্ণ 'ত'—এই তিনটি ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে ভরত। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, এবং হরিবংশ—এই প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বত্র এই মহাভারতীয় শ্লোক-কটি অবিকৃত এবং প্রসঙ্গও সেই একই।

এই প্রাচীন অনুবংশ্য শ্লোক-কটিই হয়তো দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী এবং তাঁদের পুত্রনামের বীজস্বরূপ। এই শ্লোকগুলি পৌরাণিক-পরম্পরায় চলে আসছিল মহাভারতের পূর্বকাল থেকে এবং হয়তো দৈববাণীর চেয়েও এই কথাগুলির ব্যবহারিক এবং বাস্তব মূল্য ছিল অনেক বেশি। কালিদাসের অভিজ্ঞানে কুমার সর্বদমন অথবা ভরতের প্রসঙ্গ আসে তখনই যখন মর্ত্যের কামনা শাশ্বত প্রেমে পরিণত হয়, ফুল থেকে ফলে পরিণতি ঘটে। পুত্র জন্মের আনন্দ সেখানে নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এবং সে আনন্দ শৃঙ্গার রসের মহত্তর তাৎপর্যে বিশ্রান্তি লাভ করে। মহাভারতের কবির কাছে এই নাটক এবং নায়কোচিত পরিণতির কোনও মূল্য নেই। তাঁর কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রসিদ্ধ ভরতবংশের মূল ভরতের 'ভরণ' কীভাবে সম্ভব হয়েছিল—সেটা প্রকাশ করা। যে 'ভরত' থেকে 'ভারত' নামের সৃষ্টি—ভরতাদ্ ভারতী কীর্তিঃ—যে নাম থেকে পরবর্তী পাণ্ডব-কৌরবরা নিজের কুলমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবেন, সেই ভরত কীভাবে পিতার দ্বারা বিপ্রলব্ধ হয়েও পুনরায় রাজার আসনে প্রতিষ্ঠিত

হলেন—একমাত্র সেইখানেই মহাভারতের কবির দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনীর তাৎপর্য।

আমরা আগে বলেছি, দৈববাণীর সময় রাজার পাশে ছিলেন মন্ত্রী, অমাত্য এবং ঋত্বিক-পুরোহিতেরা। দৈববাণী শুনেই রাজা তাঁদের বললেন—আপনারা এই দৈববাণী শুনুন ভাল করে। এই পুত্রটি যে আমারই, তা আমি ভাল করেই জানতাম—অহঞ্চাপি-এবমেবৈনং জানামি স্বয়মাত্মজম্। কিন্তু আমি যদি শুধু শকুন্তলার কথায় এই বালকটিকে পুত্র হিসেবে স্বীকার করে নিতাম, তাহলে সাধারণ মানুষ আমাকে সন্দেহ করত এবং ভাবত—ছেলেটি ওর নিজের নয়, অথচ তাকে সিংহাসনে চাপিয়ে দিল শুধু রাজা বলে—ভবেদ্ধি শঙ্কা লোকস্য নৈব শুদ্ধো ভবেদয়ম্।

দেখুন, রাজসভায় শকুন্তলার যে হেনস্থা হয়েছে, তাতে আধুনিক পরিশীলিত বুদ্ধিতে সেকালে স্ত্রীলোকের মর্যাদা এবং তাঁর সামাজিক অবস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। কিন্তু দেখুন, সেকালের রাজাদেরও আজকের দিনে স্বেচ্ছাচারী বলা হয়। স্বৈরাচার ছাড়া তাঁরা নাকি জনগণের ধার ধারতেন না একটুও। কিন্তু এই কি তার নমুনা হল? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অলৌকিক কোনও দৈববাণী নয়, দুষ্যন্তের রাজসভার মন্ত্রী-অমাত্য-পুরোহিতেরাই শকুন্তলার প্রত্যয় দেখে রাজাকে সাবধান করেন এবং রাজা তখন বলেন—পুত্রটি যে আমারই, তা আমিও জানতাম। কিন্তু শুধু শকুন্তলার কথায় তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে লোকে আমাকে সন্দেহ করত। এখানে 'লোকে' মানে—আপনারাই সন্দেহ করতেন। সেকালের দিনের স্বৈরাচারী একনায়ক তথা রাজতন্ত্রের নিরিখে রাজার এই লোকাপেক্ষা আমাদের মুগ্ধ করে। অর্থাৎ রাজারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন না, মন্ত্রী, অমাত্য, পুরোহিতকে অতিক্রম করে, সাধারণ লোককে বুদ্ধু বানিয়ে যা ইচ্ছে রাজারা তাই করতে পারতেন না।

যাই হোক, দৈববাণী অথবা পুরোহিত-অমাত্যের সংশোধনে রাজা দুষ্যন্ত ভরতকে নিজের পুত্র বলে প্রমাণ করিয়ে নিলেন রাজসংসদে। শকুন্তলা এবং ভরতকে ফিরিয়ে আনতে দেরি হল না। রাজসভায় দাঁড়িয়ে রাজা দুষ্যন্ত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করলেন উজ্জীবিত বাৎসল্যে। ব্রাহ্মণদের স্বস্তিবাচনে, বন্দীর বন্দনা গানে রাজসভা মুখরিত হয়ে উঠল। শকুন্তলাকে পট্টমহিষীর সম্মান দিয়ে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর মৌখিক অভিনয়ের পাপ স্খালন করলেন। জনান্তিকে ডেকে বললেন—দেবি! তোমার সঙ্গে আমার মিলন হয়েছিল লোকের অসমক্ষে—কৃতো লোকপরোক্ষোঽয়ং সম্বন্ধো বৈ ত্বয়া সহ। এই ঘটনা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করে বার করেছি যে, লোকসমক্ষে তোমার নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্যই আমাকে এইরকম একটা অভিনয় এবং খারাপ ব্যবহার করতে হবে। নইলে লোকে ভাবত, একটি চপলা রমণীর দুরভিসন্ধিতে রাজা দুষ্যন্ত তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তারা ভাবত—তুমি স্ত্রীলোকের ছলাকলায় ভুলিয়ে আমায় বশ করেছিলে এবং এখন ছেলেটাকে চাপিয়ে দিলে রাজসিংহাসনে। তুমিই বোঝ, আমার পুত্রটিকেও তো ন্যায়সঙ্গতভাবে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে—পুত্রশ্চায়ং বৃতো রাজ্যে ময়া তস্মাদ্ বিচারিতম্। সেই ভাবনা ভেবেই আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি।

দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে অপমান করেছিলেন, তা পুষিয়ে দিলেন দানে, মানে, তোষণে—বাসোভিরন্নপানৈশ্চ পূজয়ামাস ভারত। পুত্র সর্বদমন এখন ভরতে পরিণত। দুষ্যন্ত তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অর্থাৎ তাঁর পর ভরতের রাজা হওয়া সুনিশ্চিত

AMARBOI.COM

হল। দুষ্যন্ত আরও বেশ কিছুকাল রাজত্ব করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় বনেই।

দুষ্যন্তের মৃত্যুর পর সর্বদমন-ভরত যথান্যায়ে পৈতৃক রাজ্য লাভ করলেন। একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করার মত। ভরতের জীবনের কোনও বিশিষ্ট কাহিনী আমরা মহাভারতে পাব না। প্রণয় কাহিনী নয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়, এমনকি তাঁর অপকীর্তিরও কোনও কাহিনী মহাভারতে ধরা নেই, যাতে করে মহারাজ ভরতের সম্বন্ধে আমরা উৎকর্ণ হতে পারি। অথচ মহারাজ ভরতই চন্দ্রবংশের সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁর নামে এই ভারতবর্ষ, যাঁর নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের ধারার অন্য নাম হয়ে গেল ভরত বংশ—ভরতাদ্ ভারতী কীর্তির্যেনেদং ভারতং কুলম্। ভবিষ্যতে আমরা দেখব—কৌরব, পাণ্ডব সকলেই নিজেদের ভরতবংশীয় বলতে গৌরব বোধ করবেন। কিন্তু কেন এই গৌরব—তা ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে এক অতিসাধারণ ঘটনায়—মহাভারতের বিশাল বিশাল চরিত্রের মেলায়, বহুল বিচিত্র কাহিনীর অন্তরালে সে ঘটনা প্রায় চোখেই পড়ে না।

ভরত রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘর শুনতে পাচ্ছি। কণ্বাশ্রমের তপোবনে সর্বদমন ব্যাঘ্র-সিংহের পশুসমাজে রাজা হয়ে বসেছিলেন, এখন তাঁর পৈতৃক রাজ্যে অভিষেক সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রথচক্রের ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল—তস্য তৎ প্রথিতং চক্রং লোকসংনাদনং মহৎ। ভরত দিগ্‌বিজয়ে বেরলেন। কাছে-দূরে সমস্ত রাজা-মহারাজ ভরতের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। একদিকে রাজ্যজয় অন্যদিকে রাজার আদর্শ ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা—এই দুয়ের মিশ্রণে ভরতের যশ ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তে। তিনি সার্বভৌম এবং চক্রবর্তী রাজা হলেন—স রাজা চক্রবর্ত্যাসীৎ সার্বভৌমঃ প্রতাপবান্। সার্বভৌম রাজা মানে যেমন তেমন রাজা নন, সমুদ্র পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছে—অয়ং সামন্তপর্য্যায়ী স্যাৎ সার্বভৌমঃ...সমুদ্রপর্যন্তায়া একরাট্।

ভরত যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তা শুধু তাঁর রাজদণ্ডের বিস্তার থেকেই প্রমাণযোগ্য নয়। সেকালের রাজা-মহারাজারা রাজ্যজয়ের সিদ্ধি হিসেবে নানা যাগ-যজ্ঞ করতেন। সেই যজ্ঞের নাম এবং তার গুরুত্ব থেকেও রাজাদের রাজ্য-বিস্তারের পরিমাপ করা যায়। মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি—মহারাজ ভরত অনেক যজ্ঞ করেছিলেন—ইজে চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ—এবং তাঁকে যজন করিয়েছিলেন স্বয়ং তাঁর মাতামহ মহর্ষি কণ্ব। ভরতের নানা যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে একটি খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, মহারাজ ভরত, 'গোবিতত' নামে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং তাতে তিনি বহু দক্ষিণা দিয়েছিলেন মহর্ষি কণ্বকে।

এখন প্রশ্ন হল—অশ্বমেধ যজ্ঞ কারা করেন? সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি বলেছে—অশ্বমেধ যজ্ঞ হল সমস্ত যজ্ঞের রাজা—ঋষভঃ রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—রাজসূয় যজ্ঞ করে একজন রাজার পদবি লাভ করতে পারেন আর বাজপেয় যজ্ঞ করে সম্রাটের পদবি। কিন্তু আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের মতে যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনিই আসলে সার্বভৌম রাজা। অথবা সার্বভৌম রাজা যিনি হতে চান, তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উপযুক্ত পাত্র—রাজা বা সার্বভৌমঃ অশ্বমেধেন যজেত। সত্যি কথা বলতে কী, একজন অশ্বমেধযাজী সার্বভৌম রাজার সংজ্ঞাই হল—যিনি চতুর্দিকে রাজ্যবিস্তার করেছেন। বিশাল সাম্রাজ্যের এক নিয়ন্তা এইভাবে সাম্রাজ্যের ধারকে পরিণত হন—অশ্বমেধযাজী সর্বা দিশো বিজয়তি ভুবনম্...যন্তারমেবৈনং ধর্তারং করোতি।

amarboi.com

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির এই প্রমাণ এবং যজ্ঞের পরিধি থেকে আমরা বুঝতে পারি—সার্বভৌম ভরত রাজা চতুরন্তা পৃথিবী সমুদ্র পর্যন্ত নাই জয় করে থাকুন, কিন্তু তাঁর আপন রাজ্যের চতুর্দিকে বেশ খানিকটা জায়গা পর্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তার করেছিলেন। মনে রাখতে হবে—ইংরেজিতে যাকে আমরা imperial unity বলি, তা মহাভারতের এই যুগে আক্ষরিক অর্থে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভরতকে প্রথম সার্বভৌম নৃপতি বলার কারণ—তিনি চতুর্দিকে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কোনও সন্দেহ নেই, প্রাচীর সেই প্রতিষ্ঠানপুরের নাম আমরা আর শুনতে পাচ্ছি না। মহাভারতের বক্তা নিরপেক্ষ বৈশম্পায়ন মন্তব্য করছেন—আমরা এইরকম শুনেছি যে, মহারাজ রাজধানীটি ছিল সারা পৃথিবীর সেরা রাজধানী—বিষাণভূতং সর্বস্যাং পৃথিব্যামিতি নঃ শ্রুতম্। ভরতাধ্যুষিতং পূর্বং...।

অনুমান করা যায়—দুষ্যন্ত ছিলেন উচ্ছিন্ন পৌরবকুলের বংশকর রাজা। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরের আশা ছেড়ে দিয়ে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্তী অঞ্চলেই রাজত্ব করতেন। ভরতের সময় তাঁর পৈতৃক রাজ্য আরও ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে এবং তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থানগুলি থেকে তাঁর রাজ্যের একটা স্থানস্থিতিও নির্ণয় করা যায়। সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক না হলে সেই জায়গায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করা সম্ভব নয় এবং ভরতের যজ্ঞস্থানগুলির পরিচয় মহাভারত ছাড়াও আরও প্রাচীনতর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আশ্চর্য হল—অতিপ্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যেও যখন ভরতের নাম করা হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে ভরতের কথা পূর্বে গান করা হয়েছে গাথায়—তদেতদ্‌গাথয়াভিগীতম্। অর্থাৎ ভরতের সম্বন্ধে অন্তত পাঁচটি গাথা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনার বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত। এই পাঁচটি অতি প্রাচীন গাথার ধ্রুবপদ হল—ভরতের মতো রাজা কখনও হয়নি, কখনও হবারও নয়। মানুষ যেমন হাত দিয়ে স্বর্গ ছুঁতে পারেন না, তেমনই মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর মহান কীর্তি স্পর্শ করতে পারবে না। তাই বলেছিলাম—তাঁর মতো কেউ হয়নি, আর হবারও নয়—মহদদ্য ভরতস্য ন পূর্বে নাপরে জনাঃ।

কী তাঁর কীর্তিকাহিনী, একটু শুনি। শতপথ আর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একযোগে বললেন—তাহলে প্রাচীন পদ্য শোনো, গাথা শোনো, যা আমরা উদ্ধার করেছি দুজনেই। প্রথম পদ্য হল—দৌষ্যন্তি ভরত যমুনার কাছে আটাত্তরটা আর গঙ্গার কাছে বৃত্রঘ্ন নামে একটা জায়গায় পঞ্চান্নটা ঘোড়া অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য বেঁধে রেখেছিলেন—অষ্টাসপ্ততিং ভরতো দৌষন্তির্যমুনামনু। গঙ্গায়াং বৃত্রঘ্নেঽবধ্নাৎ পঞ্চপঞ্চাশতং হয়ান্।

মহাভারতের কবি ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির সমস্ত সংবাদ একটি শ্লোকের মধ্যে পরিবেশন করে আরও একটা অতিরিক্ত খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—শুধু গঙ্গার তীরে আর যমুনার তীরেই নয় সরস্বতীর তীরেও ভরত-মহারাজের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বাঁধা ছিল—ত্রিশতৈশ্চ সরস্বত্যাং গঙ্গামনু চতুঃশতৈঃ। গঙ্গা-যমুনা আর সরস্বতীর জল-ধোয়া এই অশ্বমেধ যজ্ঞগুলির খবর দিয়ে আমরা যেটা প্রমাণ করতে চাইছি তা হল দৌষ্যন্তি ভরতের রাজদণ্ড বিস্তৃত হয়েছিল গঙ্গা-যমুনার মিলনভূমি, প্রয়াগের কাছাকাছি জায়গা থেকে সরস্বতী নদীর তীর মানে পাঞ্জাব পর্যন্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একটি অতিরিক্ত খবর দিয়ে বলেছেন যে, মষ্ণার নামে একটা জায়গায় মহারাজ ভরত শয়ে শয়ে কালো দাঁতাল হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দান করেছিলেন।

মষ্ণার নামে যে জায়গাটা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক্ষুণি দেখলাম, সে জায়গাটার ভৌগোলিক অবস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন, তবে তা করতে পারলে ভরতের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে নতুন খবর পাওয়া যেত। তবে ঐতরেয় বাদ দিয়ে যদি শতপথ ব্রাহ্মণের একটা অতিরিক্ত খবর আপনাদের

AMARBOI.COM

দিই, তবে নির্ঘাত তখনকার দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা আরও ভাল বোঝা যাবে। শতপথ বলেছেন—মহারাজ সাত্রাজিত শতানীক কাশীর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করেছিলেন, ঠিক যেমন মহারাজ ভরত হরণ করেছিলেন সাত্বতবংশীয়দের যজ্ঞীয় অশ্ব—আদত্ত যজ্ঞং কাশীনাম্-ভরতঃ সত্ত্বতামিব। তারপর আবার সেই গান—ভরতের মতো কেউ নেই, আর কেউ হবারও নয়। কথাটা প্রণিধানযোগ্য। মহামতি পারজিটার সব সময় ভাবেন—সেকালের মানুষদের কোনও ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছিল না এবং তাঁরা সব গুলিয়ে ফেলতেন। যেমন শতপথ নাকি এখানে দৌষ্যন্তি ভরতকে রামের ভাই ভরতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন—it has confused Bharata, the famous Paurava king, with apparently Bharata, the brother of Rama of Ayodhya.

আমাদের ধারণা স্বয়ং পারজিটারই এখানে গুলিয়ে ফেলেছেন। এখানে শতানীক সাত্রাজিতের তুলনা হচ্ছে দৌষ্যন্তি ভরতের সঙ্গে। কোথা থেকে যে এখানে রামের ভাই ভরতের প্রসঙ্গ এল এবং ব্রাহ্মণরা এই ভরতের সঙ্গে সেই ভরতকে যে কী করে গুলিয়ে ফেললেন, কোথায় গুলিয়ে ফেললেন, তার কোনও বিন্দুবিসর্গ আমাদের বুদ্ধিতে এল না। ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব প্রমাণ করতে গিয়ে এখন যদি শতপথের পংক্তির মধ্যে যে নামের ছায়ামাত্র নেই, তাই আমরা আমদানি করি, তাহলে তো বড়ই বিপদ। এই ধরনের শূন্যে কুসুমকল্পনা বাদ দিয়ে পারজিটার সাহেব যদি আপন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঐতরেয়-কথিত 'মষ্ণার' জায়গাটার ভৌগোলিক অবস্থিতি নির্ণয় করতেন, তবে আমাদের অনেক সুবিধে হত, মহারাজ ভরতের তো সুবিধে হতই।

পারজিটারের যুক্তিটাও অদ্ভুত। তাঁর বক্তব্য—King Bharata was long prior to Satavants or Sastvatas, but Rama and Bharata of Ayodhya were their Contemporaries. সাহেব ব্যাপারটা মোটেই ঐতিহাসিক যুক্তিতে বোঝেননি। তাঁর প্রথম বোঝা উচিত—দুষ্যন্তপুত্র ভরতের সম্বন্ধে যে প্রাচীন গাথাটি শতপথ ব্রাহ্মণে সংকলিত হয়েছে, সেই গাথাটির রচনাকালে হয়তো সাত্ত্বতদের আবির্ভাব ঘটেছে। সাত্ত্বতরা মূলত যদুবংশীয়, যদুবংশেরই এক রাজার নাম সাত্ত্বত। কৃষ্ণকে পরবর্তীকালে অন্তত দু'শ বার একাধারে যদুবংশীয় এবং সাত্ত্বতগণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—ভগবান্ সাত্ত্বতাং পতিঃ। ব্রাহ্মণ্য গাথাটির মধ্যে বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টি বেশি আছে, কারণ ভরতের সময়ে যদুবংশীয়রা বিভিন্ন বংশে (যাদব, তালজঙ্ঘ, হৈহয় ইত্যাদি) বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় নির্দিষ্ট কোনও যদুবংশীয় রাজার নাম না করে, পরবর্তীকালে যদুবংশীয়রা সকলেই যে নামে চিহ্নিত হতেন, সেই নামটি উল্লেখ করে গান বাঁধা হয়েছে—শতানীক সাত্রাজিত কাশীর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করেছিলেন—ঠিক যেমন ভরত হরণ করেছিলেন সাত্ত্বতগণের অশ্বটি। আর ঠিক এর পরেই ভরতের সম্বন্ধে সেই ধ্রুবপদ থাকার ফলে কোনও সন্দেহই থাকে না যে—ইনি হলেন দৌষ্যন্তি ভরত।

আমরা জানি এবং পূর্বে বলেছি যে, এর আগে যাদব-হৈহয়দের তাড়নায় তথা ইক্ষ্বাকুদের শক্তিতে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্তী অঞ্চল থেকে পুরুবংশীয়রাই সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বয়ং ভরতের বাবা দুষ্যন্ত পর্যন্ত নিজের পৈতৃক রাজ্য পাননি। প্রতিষ্ঠানপুরের রাজধানীটি অনেক আগেই খোয়া গেছে। অতএব এটাই স্বাভাবিক যে, সার্বভৌম রাজা হিসেবে দৌষ্যন্তি ভরত পূর্বশত্রুতার শোধ তুলবেন এখন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শতপথের প্রমাণটা এতই বেশি

AMARBOI.COM

যুক্তিযুক্ত যে, আমরা অনুমান করতে পারি যে, শুধু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর বিস্তীর্ণ তীরাঞ্চলই নয়, মহারাজ ভরত যদুবংশীয়দের রাজ্যও বেশ খানিকটা অধিকার করে নিয়েছিলেন। পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ হিসেবে। এই রাজ্য যাদবাধ্যুষিত মথুরা-শৌরশেনী অঞ্চলেরই খানিকটা হবে হয়তো।

মনে রাখতে হবে—চন্দ্র-পৌরববংশীয় কোনও রাজার পক্ষে এই প্রথম এত বড় একটা রাজ্য দখল করে তাকে শাসন করাও সম্ভব হল। এইজন্যই ভারত এক সার্বভৌম রাজা। তাঁর নামেই এই ভারতবর্ষের প্রথম imperial unity এবং তাঁর নামেই ভারত বংশ, মহাভারত, ভারত-যুদ্ধ। রাজা হিসেবে ভরত যদি শুধু এক সাম্রাজ্যবাদী প্রজাশোষক রাজা হতেন, তাহলে এতক্ষণে তাঁর আলোচনা বৃথা হয়েছে। বস্তুত তাঁর মহত্ত্বের এবং রাজকীয় প্রতিষ্ঠার আরও বিশাল এক কীর্তিভূমি আছে, যা আধুনিক রাজনৈতিক নেতাদের পর্যন্ত অতিশয় লজ্জা দেবে। পরবর্তীকালে দুর্যোধন-পিতা ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁর পুত্রদের বারবার যে কথা বলা হয়েছে—দেখ, এটা ভরতবংশীয়দের উপযুক্ত নয়—এই নিন্দাবাদের সূত্র বোধহয় সার্বভৌম ভরতের অন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠায়।

সাতচল্লিশ

কোনও রাজা-মহারাজা যদি বিখ্যাত হন, তবে তাঁর খ্যাতির পিছনে একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। মহারাজ ভরতের বহুকাল পরের উত্তরপুরুষ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন মহামতি কৃষ্ণ তাঁকে কতগুলি বিশিষ্ট রাজার নাম করে বলেছিলেন— ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতা শত্রুজয়ের মাধ্যমে নিজের কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। প্রজাপালনের সাধনে ভগীরথ, তপস্যায় কার্তবীর্য অর্জুন, তুর্বসু-বংশীয় মরুত্ত অতুল সম্পত্তি আহরণ করে যশস্বী হয়েছিলেন। আর মহারাজ ভরত বলপ্রয়োগের নৈপুণ্যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন—কার্তবীর্যস্তপোবীর্যাদ্ বলাত্তু ভরতঃ প্রভুঃ।

অতকাল পরে কৃষ্ণের এই স্মারক-বক্তৃতায় বোঝা যায়—ভরত যে সার্বভৌম রাজা হয়েছিলেন, তার পিছনে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বলপ্রয়োগের কৃতিত্ব। 'বল' মানে শুধু গায়ের জোর নয়, পারিভাষিক অর্থে 'বল' শব্দ রাজার সৈন্য-সামন্ত সেনাপতি এবং দণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতা বোঝায়। ভরতের রাজ্য জয় এবং দণ্ডনীতির নৈপুণ্য বহুকাল পরে যদুবংশীয় কৃষ্ণের মুখ দিয়ে অনুস্মৃত হওয়ার ফলে বুঝতে পারি—যাদবদের একাংশ অবশ্যই মহারাজ ভরতের দণ্ডনীতির বলি হয়েছিলেন এবং সে কথা কৃষ্ণের সময়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছে—বলাত্তু ভরতঃ প্রভুঃ।

এমন বিশাল এক সাম্রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার ভরতের পররাষ্ট্রনীতির প্রজ্ঞা বহন করে—স্বীকার করি; কিন্তু অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রজাসাধারণের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর এতটাই চিন্তা ছিল যে, সে ক্ষেত্রেও তাঁর ভাবনা প্রাবাদিক স্তরে পৌঁছেছিল। কেমন করে—তা বলি। মহারাজ ভরতের তিনটি স্ত্রী ছিলেন এবং এই প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভেই তাঁর তিনটি করে পুত্র হয়। সকলেই জানেন—ভারতবর্ষে রাজা বা মন্ত্রী হয়ে জন্মালে এক বিশাল সুবিধে পাওয়া যায়।

রাজারা বংশ-বংশ ধরে রাজত্ব চালিয়ে যান, মন্ত্রীরাও তাই। ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র যাই আসুক সেখানেও প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ক্রমান্বয়ে প্রধানমন্ত্রী হন, এ আমরা চোখে দেখেছি। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব অথবা বীরপূজার তত্ত্ব, যাই এখানে খাটুক না কেন, রাজার পরে রাজপুত্র রাজা হবেন—এটাই সাধারণ ধারণা। অন্তত সেকালের জনসাধারণ সাধারণভাবে রাজপুত্রকেই পরবর্তী রাজা হিসেবে চাইত। ভরত মহারাজের ন'টি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটিই যে রাজা হবেন—এটাই সবার ধারণা ছিল।

কিন্তু না, এই রুটিন-বাঁধা ব্যাপারটা ভরতের রাজত্বে ঘটল না। তিন রানীর গর্ভে জাত ন'টি পুত্রের চরিত্র এবং গতিবিধি লক্ষ্য করে ভরত তাঁদের একজনকেও ভরত-বংশের পরবর্তী রাজা হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেন না। তিনি বার বার বলতে লাগলেন—একটি পুত্রও আমার মত হয়নি—নাভ্যনন্দত তান্ রাজা নানুরূপা মমেত্যুত। 'আমার মত হয়নি'—এই কথার মধ্যে ভরতের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা অহংকার যতই প্রকাশিত হোক, আসলে তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য চালানোর মত চারিত্রিক বল তাঁর পুত্রদের নেই। রাজার ভাব দেখে তাঁর তিন রানী মোটেই খুশি হননি। মহাভারতের খবর অনুযায়ী তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে আপন পুত্রদেরই নাকি হত্যাই করেছিলেন—ততস্তান্ মাতরঃ ক্রুদ্ধাঃ পুত্রান্ নিন্যুর্যমক্ষয়ম্।

তিন রানীর এই ক্রোধ তাঁদের স্বামীর ওপরে, না পুত্রদের ওপরে—সে খবর মহাভারতের কবি দেননি। তবে রাজপুত্র হয়েও পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকার পেল না—এটা একরকম মৃত্যুরই সামিল। অথবা এতবড় সম্রাট পিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও যে পুত্রদের রাজ্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা বা চরিত্রবল নেই, বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়-মাতার কাছে সেই পুত্রেরা মৃতেরই সামিল। মায়েদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডও হয়তো এইরকমই কোনও অর্থ বহন করে। যাই হোক, ভরত নিজ পুত্রদের কাউকেই প্রজাপালনের উপযুক্ত না মনে করায় তাঁর বংশের উত্তরাধিকার নিয়ে একটা দারুণ 'ক্রাইসিস' তৈরি হল। নিজের বংশে পুত্র জন্মানো সত্ত্বেও তার কার্যকারিতা যখন বৃথা হয়ে গেল—ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিতথং পুত্রজন্ম তৎ—মহারাজ ভরত তখন নানারকম যাগ-যজ্ঞ করা আরম্ভ করলেন। মহাভারত খবর দিয়েছে—ভরত শেষ পর্যন্ত মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছ থেকে ভূমন্যু নামে একটি পুত্র লাভ করলেন—লেভে পুত্রং ভরদ্বাজাদ্ ভূমন্যুং নাম ভারত। ভরদ্বাজের কাছ থেকে সেই পুত্র লাভ করেই মহারাজ ভরত নিজেকে পুত্রবান মনে করলেন এবং ভূমন্যুকেই তিনি ভরতবংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন।

মহাভারতের কবি ভরতবংশের উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেন, ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়। মহাভারতের বক্তব্য থেকে আপাতত যেন মনে হতে পারে মহারাজ ভরত নিয়োগপ্রথায় ভরদ্বাজের কাছ থেকে একটি পুত্র লাভ করলেন। কিন্তু তা যদি হত, তবে তার উল্লেখ থাকত। কারণ, নিয়োগের ঘটনা লুকোনোর প্রয়োজন নেই মহাভারতের কবির। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হয়—হলটা কী তাহলে? হঠাৎ করে ভরদ্বাজকেই বা তিনি পেলেন কোথায়? ঘটনার তো পরম্পরা থাকবে একটা। সত্যি কথা বলতে কী—মহাভারতের বক্তব্যের সঙ্গে যদি অন্যান্য পুরাণগুলির বক্তব্য এখানে মিলিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই হয়তো সত্য কথাটা বেরিয়ে আসতে পারে, এমনকি তাতে মহাভারতের আকস্মিক বক্তব্যটা ভুলও প্রমাণ হয়ে যেতে পারে।

পুরাণগুলি যেহেতু রাজবংশ এবং ঋষিবংশের তালিকা নথিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে প্রায় ঐতিহাসিকদের মতো কাজ করছে, তাই এ বিষয়ে পুরাণগুলির সাহায্য আমাদের নিতেই হবে।

মহাভারতের যে দুটি পংক্তি এখানে আমরা উদ্ধার করেছি, তার মধ্যে খুব খেয়াল করার মতো দুটি শব্দ আছে—একটি হল 'বিতথ', দ্বিতীয়টি হল 'ভূমন্যু'। এই শব্দ দুটি পরে আসবে। এবারে মূল প্রস্তাবে আসি।

বংশানুক্রমে অনুপযুক্ত রাজার রাজত্ব প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলেই ভরত তাঁর উত্তরাধিকারী খুঁজে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। এই উত্তরাধিকারী সন্ধানের চেষ্টাটাই মহাভারতে ভরতের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞের প্রতিরূপে ধরা আছে—ততো মহদ্ভিঃ ক্রতুভিরিজানো ভরতস্তদা। যদি যজ্ঞের ফলে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে বেশির ভাগ পুরাণে দেখা যাচ্ছে—দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্রত্বে স্থাপন করেন :

ততো মরুদ্ভিরানীয় পুত্রঃ স তু বৃহস্পতেঃ।
সংক্রামিতো ভরদ্বাজো মরুদ্ভির্ভরতস্য তু।।

তার মানে মহাভারতের শূন্যতা খানিকটা পূরণ হল, অর্থাৎ ভূমন্যুকে প্রথমেই পাওয়া যাবে না, ভরদ্বাজই ভরতের পুত্ররূপে কল্পিত হলেন। এখানে আমাদের একটু পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করতেই হবে—তবে বিনীত অনুরোধ, যেন খেই হারিয়ে না যায়।

প্রথম কথা হল ভরদ্বাজ কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের একটু বিব্রতও হতে হবে। তবু না বললে পুরাণকাহিনীর পরম্পরা এবং রাজবংশের পরম্পরা—কোনওটাই বোঝা যাবে না। সমস্ত প্রধান পুরাণেই যে কাহিনী আছে, তা মোটামুটি গবেষণা করলে এই দাঁড়ায়—দেবগুরু বৃহস্পতির এক ভাইয়ের নাম আমরা পূর্বে বলেছি। তিনি সংবর্ত, যিনি তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত রাজাকে যজ্ঞ করিয়েছিলেন। এই বৃহস্পতির বড় ভাই ছিলেন উতথ্য বা উচথ্য—উতথ্যস্য যবীয়াংস্তু পুরোধাস্ত্রিদিবৌকসাম্। পুরাণকারেরা এই উতথ্য নামটিকে উশিজ বানিয়ে দিয়েছেন এবং তার কারণ হল—বেদে উতথ্য এবং উশিজ—এই দুটি নামই পাওয়া যায় বৃহস্পতির পূর্বপুরুষ হিসেবে। উশিজ খুব সম্ভবত উতথ্য, বৃহস্পতি এবং সংবর্তেরও পিতা ছিলেন, কিন্তু পুরাণকারেরা ভুলবশত উশিজকে বৃহস্পতির বড় ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। মহাভারতের কবির মাথা এ বাবদে ঠিক আছে। তাঁর মতে উতথ্য বৃহস্পতির বড় ভাই এবং তাঁর স্ত্রীর নাম মমতা—মমতা নাম তস্যাসীদ্ ভার্যা পরমসম্মতা।

সংবর্তের কথা, পূর্বে বলেছি যে, বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু নির্বাচিত হলে তিনি ছোট ভাই সংবর্তের জীবন দুর্বিষহ করে দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধেও বৃহস্পতির যে কিছু লালসা কাজ করেছে তারও প্রমাণ তখন আমরা পেয়েছি। লক্ষণীয় ব্যাপার হল—বৃহস্পতির ইন্দ্রিয়বৃত্তি কখনই খুব একটা সংযত ছিল না এবং তিনি বড় ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতিও সমানভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতির এই অভ্যাস ছিল। কোনও এক সময়ে—হয়তো উতথ্য তখন মারা গেছেন—বৃহস্পতি তাঁর অগ্রজের পত্নী মমতাকে দেখে মোহিত হন এবং তাঁকে বলেন—তুমি বেশ ভাল করে সেজেগুজে এস তো দেখি, আমি তোমার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করি। মমতার গর্ভে সেই সময় তাঁর প্রয়াত স্বামীর পুত্র রয়েছে। অতএব অবাক-বিস্ময়ে কাকুতি-মিনতি করে মমতা বৃহস্পতিকে বললেন—তোমার ভ্রাতার সন্তান আমার গর্ভে। তুমি বিরত হও বৃহস্পতি—অন্তর্বত্নী ত্বহং ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেনারম্যতামিতি।

মমতা আরও বললেন—যে ছেলে আমার গর্ভস্থ হয়ে আছে, সে গর্ভে থেকেই ষড়ঙ্গ বেদ উচ্চারণ করছে। এখন এই অবস্থায় যদি তুমিও আমার সঙ্গে মিলিত হও, তাহলে দুজনের সন্তান তো আর একই গর্ভে ধারণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে—দ্বয়োর্নাস্ত্যত্র সম্ভবঃ। মমতা

অনুনয় করে বললেন—আমার এই সময়টা পার হয়ে যাক, তারপর তুমি যা বলবে, তাই করব—অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে বিভো। বৃহস্পতি বললেন—তোমার কাছে আমি জ্ঞান শুনতে চাইনি—বিনয়ো নোপদেষ্টব্যঃ—যা বলছি তাই কর। স্বামীহীনা অরক্ষিতা মমতাকে বৃহস্পতি কিছুতেই মুক্ত হতে দিলেন না। অকামা রমণীর প্রতি বলপ্রয়োগ করে তিনি উপগত হলেন সকামে—স বভূব ততঃ কামী তয়া সার্ধম্ অকময়া।

বৃহস্পতি যখন কামনার চরম মুহূর্তে পৌঁছেছেন, সেই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মমতার গর্ভস্থ সন্তান গর্ভ থেকেই বলে উঠল—মহাশয়! আপনি এইভাবে কামপ্রবল হয়ে উঠবেন না। আমি এই গর্ভে পূর্বাহ্নেই উপস্থিত, এখানে দুজনের স্থান হবে না—ভোস্তাত মা গমঃ কামং...পূর্বঞ্চাহমিহাগতঃ। মহাভারত জানিয়েছে—বৃহস্পতি তেজোমুক্ত হবার আগেই মমতার গর্ভস্থ মুনি-সন্তান নিজের পা দিয়ে বৃহস্পতির কামগতি রুদ্ধ করলেন—পদ্ভ্যামারোধয়ন্ মার্গং শুক্রস্য চ বৃহস্পতেঃ। বৃহস্পতির তেজ অস্থানে পতিত হল এবং অভীষ্ট কামগতি রুদ্ধ হওয়ায় তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে মমতার গর্ভস্থ সন্তানকে অভিশাপ দিলেন—তুই যখন সমস্ত প্রাণীর পরমেপ্সিত এই রতিমুক্তির কালে আমাকে এইভাবে বাধা দিলি, অতএব তুই অন্ধ হয়ে জন্মাবি—প্রতিষেধসি তস্মাত্ত্বং তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি।

উতথ্য এবং মমতার সন্তান গভীর তমোময় দৃষ্টি নিয়ে জন্মালেন। তাঁর নাম হল দীর্ঘতমা। আর বৃহস্পতির রতিমুক্ত তেজ থেকে অন্য একটি শিশুর জন্ম হল; উতথ্যপত্নী মমতার কোনও মমতা সে পেল না। তাঁর জন্মমাত্রেই মমতা বৃহস্পতিকে বললেন—এটি তোমার জারজ সন্তান (দ্বাজ) একে তুমিই ভরণ-পোষণ কর, ভর দ্বাজং বৃহস্পতে। মমতা তৎক্ষণাৎ বৃহস্পতির পুত্রকে রেখে চলে গেলেন। এবং বৃহস্পতিও সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন তিনিও। কিন্তু যাবার আগে মমতা যে কথাটি বলে গিয়েছিলেন—জারজকে তুমিই মানুষ কর—ভর দ্বাজম্—শুধু সেই দুটি শব্দের অর্থ-স্মৃতি বহন করে সেই কুমার মাতা-পিতার স্নেহরসে বঞ্চিত হয়ে একা পড়ে রইল—তার নাম হল ভরদ্বাজ।

বায়ু-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ খবর দিয়েছে—ঠিক এই সময়েই সার্বভৌম মহারাজ—ভরত পুত্রলাভের জন্য মরুৎসোম যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। মরুদ্‌গণ এই যজ্ঞের প্রক্রিয়ায় খুশি হয়ে মাতা-পিতার ত্যাগ করা সেই শিশু ভরদ্বাজকে ভরত-মহারাজের হাতে তুলে দেন উপহারের মতো—উপনিন্যুর্ভরদ্বাজং পুত্রার্থং ভরতায় বৈ। মহর্ষি অঙ্গিরার বংশে জাত বৃহস্পতির ঔরস পুত্র ভরদ্বাজকে লাভ করে মহারাজ ভরত খুশি হয়ে কুমার ভরদ্বাজকে বললেন—আমার সব পুত্রের জন্মই যখন বিতথ অর্থাৎ বৃথা হয়ে গেছে, তখনই আমি তোমাকে লাভ করেছি। অতএব আজ থেকে তোমার নাম হোক 'বিতথ ভরদ্বাজ।'

পাঠক। আপনাকে মহাভারতের সেই পূর্বোদ্ধৃত পংক্তিটিকে 'বিতথ' শব্দটি খেয়াল রাখতে বলেছিলাম। এতক্ষণে সেই বিতথ শব্দের সঙ্গে আরও একটি শব্দ জুড়ে যে নামটি পাওয়া গেল, তিনিই মহারাজ ভরতের নবলব্ধ পুত্র 'বিতথ ভরদ্বাজ'। ভূমন্যুর প্রশ্ন এখনও আসেনি। কারণ তার আগে আরও দুটো কথা বলতে হবে। এবং এই 'বিতথ ভরদ্বাজ'কে নিয়েও কিছু গবেষণা এখনও বাকি আছে।

প্রথমেই ভাবতে হবে—এই বৃহস্পতি, এই দীর্ঘতমা এবং এই ভরদ্বাজই মূল বৃহস্পতি, মূল দীর্ঘতমা এবং মূল ভরদ্বাজ কি না। হতেই পারে না। কারণ আমরা চন্দ্রবংশের উৎপত্তিকালে বৃহস্পতিকে পেয়েছি, আমাদের ভরত রাজা তখন কোথায়? বস্তুত এখানে বৃহস্পতি, দীর্ঘতমা

amarboi.com

বা ভরদ্বাজ বলতে তাঁদের বংশধর কাউকে বুঝতে হবে। ভেবে দেখুন, রামচন্দ্রের পূর্ব পিতামহ দিলীপ-রঘু—এঁদেরও পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ মুনি, আবার দশরথ-রামচন্দ্রের পুরোহিতও ছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। এঁরা তো একই লোক হতে পারেন না। প্রাচীন ঋষিবংশে বশিষ্ঠর বংশজরা যেমন সবাই বশিষ্ঠ, তেমনি, বৃহস্পতি, দীর্ঘতমা বা ভরদ্বাজের বংশধরেরাও একেক জন বৃহস্পতি, দীর্ঘতমা এবং একেক জন ভরদ্বাজ। এখন 'বিতথ ভরদ্বাজ'কে নিয়ে আরও দুটো কথা বলি।

কথা হল—মহারাজ ভরত যাঁকে দত্তক হিসেবে পেলেন—তাঁর নামই ভরদ্বাজ? অথবা তাঁর নাম বিতথ? নাকি এটা ভরদ্বাজের বিশেষণ অথবা অন্য কোনও নাম? প্রশ্ন আছে আরও। মহর্ষি ভরদ্বাজই কি এর পরে প্রসিদ্ধ ভরতবংশের রাজা হয়ে বসলেন, নাকি তার কোনও ছেলে? মহাভারতের কবি এখানে একটি ফাঁক রেখে বলেছেন—ভরদ্বাজের কাছ থেকে ভুমন্যুকে লাভ করলেন ভরত। অন্যদিকে মৎস্যপুরাণ বলেছে—ভরতের পর বিতথ নামে ভরদ্বাজই রাজা হলেন—ততস্তু বিতথো নাম ভরদ্বাজো নৃপো'ভবৎ। কিন্তু এর দুই পংক্তি পরেই মৎস্যপুরাণ বললেন—বিতথ জন্মগ্রহণ করলে মহারাজ ভরত স্বর্গারোহণ করেন—ততো জাতে হি বিতথে ভরতশ্চ দিবং যযৌ। আবার তারপরেই—ভরদ্বাজও পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে স্বর্গস্থ হলেন—ভরদ্বাজো দিবং জাতো'ভিষিচ্য সুতং ঋষিঃ।

বায়ুপুরাণের শ্লোকগুলিও প্রায় মৎস্যপুরাণের মতোই। কিন্তু একটাই বাঁচোয়া—বায়ুপুরাণ মৎস্যপুরাণের মতো একবারও ওই কথাটি বলেনি যে—তারপর বিতথ নামে ভরদ্বাজ রাজা হলেন। আসলে এইখানেই মৎস্যপুরাণে একটি লিপিপ্রমাদ আছে। মৎস্যপুরাণের পংক্তিতে 'ভরদ্বাজঃ' শব্দটি হবে 'ভারদ্বাজঃ'—যার অর্থ ভরদ্বাজের পুত্র রাজা হলেন—ততস্তু বিতথো নাম ভারদ্বাজো নৃপো'ভবৎ। আমরা যে ঠিক বলছি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়ে গেছে হরিবংশে। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে—মহারাজ ভরতের পুত্রজন্ম বৃথা হল এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের এক পুত্র, যাঁর নাম বিতথ—সেই বিতথ জন্মালেই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী লাভ করে ভরত স্বর্গারোহণ করলেন—ততস্তু বিতথো নাম ভরদ্বাজসুতো'ভবৎ। অন্যদিকে ছেলে বিতথকে সিংহাসনে বসিয়ে মহর্ষি ভরদ্বাজও বনের পথে পা বাড়ালেন।

এর পরে মৎস্যপুরাণেও আর কোনও ভুল নেই, বায়ুপুরাণেও আর কোনও ভুল নেই, হরিবংশে তো নেইই। দেখা যাচ্ছে—মৎস্য এবং বায়ু সমস্বরে বলছে—বিতথের ছেলের নাম হল ভুবমন্যু যাঁকে মহাভারত বলেছে ভূমন্যু—বিতথস্য তু দায়াদো ভুবমন্যুর্বভূব হ (ভুবমন্যুর্মহাযশাঃ)।

আমরা বেশ বুঝতে পারছি—বায়ু, মৎস্য, হরিবংশ, মহাভারত—একেক পুরাণের একেক কথা উদ্ধার করে আমরা সুকুমারমতি পাঠকের মাথাটা একেবারে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এতে করে বোঝবার ব্যাপার আছে একটাই। মহারাজ ভরতের মরুৎসোম যজ্ঞে প্রীত হয়ে মরুদ্‌গণ পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্রত্বে স্থাপন করলেন—ততো মরুদ্ভিরানীয় পুত্রস্তু স বৃহস্পতেঃ। সংক্রামিতো ভরদ্বাজঃ। কিন্তু পুরাণগুলির নানা বয়ান থেকে যেহেতু বোঝা যায় যে, ভরদ্বাজ ভরতের সিংহাসনে বসেননি, তাতে বোধহয়, ভরত ভরদ্বাজকেও ভালরকম পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তাঁর পুত্র বিতথ জন্মালে—সেই বিতথকেই তিনি নিজের উত্তরাধিকারী বলে মনোনীত করেছেন।

ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ক্ষত্রিয় ভরতের পিতৃত্ব স্বীকার করেছেন, তার ফলে

ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ ক্ষত্রিয়ের সংজ্ঞা লাভ করেন—তস্মাদ্ দিব্যো ভরদ্বাজো ব্রাহ্মণ্যাৎ ক্ষত্রিয়ো'ভবৎ। পৌরাণিকেরা অবশ্য ভরদ্বাজের ব্রাহ্মণত্বও পুরোপুরি হরণ করেননি। তাঁরা বলেছেন— ভরদ্বাজ দ্বিপিতৃক—একদিকে বৃহস্পতিও তাঁর পিতা, অন্যদিকে মহারাজ ভরতও তাঁর পিতা। আরও একটা বিশেষণ ভরদ্বাজের কপালে জুটেছে, সেটা হল—দ্ব্যামুষ্যায়ণ—অর্থাৎ দো-আঁশলা। মৎস্যপুরাণ বলেছে—ভরদ্বাজের বংশে ক্ষত্রিয়রাও জন্মেছেন, ব্রাহ্মণেরাও জন্মেছেন—তস্মাদপি ভরদ্বাজাদ্ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া ভুবি। আমাদের ধারণা ভরতের পিতৃত্ব স্বীকার করার ফলে ভরতবংশে জাত পুত্রগুলিই ভরদ্বাজের ক্ষত্রিয় বংশ। আর বিতথকে সিংহাসনে বসিয়ে বনগমন করার পর ভরদ্বাজের যে সব পুত্র জন্মেছেন, তাঁরাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভরদ্বাজের দুর্ভাগ্য, তিনি দ্বিপিতৃক হওয়ার ফলে তাঁর পুত্রেরা ব্রাহ্মণই হোন, আর ক্ষত্রিয়ই হোন, তাঁরা সবাই দো-আঁশলা—দ্ব্যামুষ্যায়ণকৌলীনাঃ স্মৃতাস্তে দ্বিবিধেন চ।

আরও একটা কথা এখানে না বললে নয়। আমরা এতক্ষণ মহারাজ ভরতের মরুৎসোম যজ্ঞ, মরুদ্‌গণের তুষ্টি এবং তার ফলে ঋষি ভরদ্বাজের ক্ষত্রিয় বংশে সংক্রমণের কথা বললাম পৌরাণিকদের যুক্তি মেনে। তাঁদের ঈপ্সিত বক্তব্য আমরা একটু পরীক্ষা করে পেশ করেছি মাত্র। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতেও ভরতের পুত্র-অন্বেষণের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এবং সেটা পারজিটার সাহেবই কিন্তু ধরেছেন ভাল। অবশ্য আমাদের প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সাক্ষীটা এখানে খুব জরুরী। ঐতরেয় বলেছেন— মামতেয় দীর্ঘতমা, অর্থাৎ সেই উতথ্যের স্ত্রী মমতার ছেলে দীর্ঘতমা, যিনি বৃহস্পতিকে রতিক্রিয়ায় বাধা দিয়ে অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন—সেই দীর্ঘতমা ভরত দৌষ্যন্তির ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করেন।

ঐন্দ্র মহাভিষেক এমনই এক অভিষেক, যা হয়তো মহারাজ ভরতের সার্বভৌমত্ব লাভের পর সংঘটিত হয়েছিল। কারণ স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার প্রতিরূপেই মর্ত্যলোকের রাজার ঐন্দ্র মহাভিষেকের আচরণ অনুষ্ঠিত হয়। ধারণা করা যায়—ভরত কথঞ্চিৎ বৃদ্ধ হবার পর দীর্ঘতমা মামতেয় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এখন একটা সন্দেহ উপস্থিত হবে। কারণ পুরাণে দীর্ঘতমা এবং বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ—দুজনকেই আমরা যখন জন্মাতে দেখেছি, তখন ভরত-মহারাজের বয়স হয়ে গেছে। তিনি তখন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর সন্ধানে মরুৎসোম যজ্ঞ করছেন—তস্মিন্ কালে তু ভরতো মরুদ্ভিঃ ক্রতুর্ভিঃ ক্রমাৎ। এদিকে বৃদ্ধ দীর্ঘতমা, যিনি হয়তো মহারাজ ভরতের বংশগত পুরোহিত, তিনি বৃদ্ধ ভরতের মহাভিষেক সম্পন্ন করছেন—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই সংবাদ কিন্তু পুরাণের সংবাদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপারটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় মূল দীর্ঘতমা এবং মূল ভরদ্বাজও ভরতের থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। পারজিটার লিখেছেন—The aged Dirghatamas, and Bhardvaja also, may thus have lived till the beginning of Bharata's reign. Though that, the first Bharadvaja could not have been given in adoption to Bharata, yet his grandson (or perhaps great grandsons) may have been so given, and this...strongly suggests that it was Vidathin (আমাদের পৌরাণিক ভাষায় 'বিতথ') who was adopted.

পারজিটার সাহেবের আসল অনুমানের কথাটা এখনও বলিনি। কিন্তু সেটাই লৌকিকভাবে ভরতের এই পুত্রান্বেষণের ঘটনাটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করে। পারজিটার অনুমান করেন যে, বৃহস্পতি, সংবর্ত—এঁরা সবাই ছিলেন তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত রাজার দেশের লোক। বৃহস্পতি,

সংবর্ত এবং মরুত্তের কাহিনী আমরা পূর্বে বলেছি—তাতে এই অনুমানটা যথেষ্ট সমর্থনযোগ্যই মনে হয়। বৃহস্পতিই মরুত্ত রাজার বংশানুক্রমিক গুরু ছিলেন—তাও আমরা পূর্বে বলেছি। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হয়, বৃহস্পতি যে অন্যায়ই করে থাকুন অথবা মমতার ব্যাপারে যাই ঘটে থাকুক, ভরদ্বাজ এই মরুত্ত রাজার দেশেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পুত্র বা প্রপৌত্র বিতথ ভরদ্বাজও জন্মান ওখানেই। ভরতের পুত্রজন্ম যখন বিফল হল, তখন বৃদ্ধ দীর্ঘতমা—যিনি ভরতের ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করেন—তিনি হয়তো তখন তাঁর আত্মীয়কল্প যুবক ভরদ্বাজকে দত্তক নিতে বলেন। মহারাজ ভরত যেহেতু মরুত্ত রাজার দেশ থেকে ভরদ্বাজকে নিয়ে আসেন অতএব পৌরাণিকেরা ভুল করে অথবা সাধারণ ঘটনার দেবায়ন ঘটিয়ে বলেন—মরুদ্‌গণ ভরতের মরুৎসোম যজ্ঞের প্রক্রিয়ায় তুষ্ট হয়ে ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্রত্বে সংক্রমিত করেন। মরুৎ আসলে মরুত্ত রাজা।

পারজিটার সাহেবের এই অনুমান আমরা সমর্থন করি অন্য আরও একটা কারণে। আমাদের ধারণা—ভরতের পিতা দুষ্যন্ত মরুত্ত রাজার ঘরে মানুষ হয়েছিলেন। আজ এতদিন পরে মহারাজ ভরত যখন নিজের অযোগ্য পুত্রদের অসামর্থ্যে হতাশ বোধ করছিলেন, তখন সেই পালক পিতামহ মরুত্ত রাজার দেশ থেকে ভরদ্বাজ এবং তাঁর পুত্র বিতথকে নিয়ে এসে একভাবে পিতৃঋণ শোধ করলেন। হতেও বা পারে, এবং এই কারণেই সাহেবের অনুমানটা আমরা এখানে সমর্থনই করি।

ভরতবংশের ঊর্ধ্বতন পরম্পরায় এতদিন যা ঘটেছে, তাতে স্ত্রীলোকের রক্তবিশুদ্ধি খুব একটা থাকেনি। ব্রাহ্মণীর রক্ত, স্বর্গসুন্দরী স্বর্গবেশ্যার রক্ত, এবং অবশ্যই ক্ষত্রিয়ার রক্ত—সব কিছু মিলেমিশে বেশ একটা কঠিন-কোমল ধাতুর বংশ-পরম্পরা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম ঘটনা ঘটল যখন পুরুষের দিক থেকে একেবারে অন্য রক্ত-সংক্রমণ ঘটল ভরতবংশে এবং একে সংক্রমণ না বলে আহরণ বলাই ভাল। কারণ এক ঋষিপুত্রকে দত্তক নেওয়ার ফলে ভরতবংশে রীতিমত ব্রাহ্মণ্য সংক্রমণ ঘটে গেল। এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। মহাভারতের মূল আখ্যানে মহামতি যুধিষ্ঠিরের ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার এবং ব্রাহ্মণ্য-ভাবনা দেখে পণ্ডিতেরা এই বংশ-সংক্রমণের ঘটনার কথা স্মরণ করেন এবং যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারের তাৎপর্য খুঁজে পান। আমরা অবশ্য কথাটা বাড়াবাড়ি মনে করি। কেননা, যুধিষ্ঠিরের ব্রাহ্মণ-ভাবনার জন্য এত দূর না ছুটে, তাঁর অতিপ্রিয় পিতামহ ব্যাসদেব পর্যন্ত গেলেই চলবে। তবুও এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে—প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের পরম্পরার মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ-পুরুষ তাঁর ব্রাহ্মণ্যের মূল প্রোথিত করে দিলেন। ক্ষত্রিয়ের রাজবংশে ব্রাহ্মণের বিন্দু পতিত হল। এ ঘটনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আরও বোঝা যাবে—যখন ভরতবংশে আবারও উপযুক্ত বংশধরের 'ক্রাইসিস' তৈরি হবে। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীদের গর্ভাধান করার জন্য যখন আবার ব্যাসদেবের ডাক পড়বে, তার আগে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব এই ব্রাহ্মণ-বংশ-সংক্রমণের কথাই স্মরণ করেছিলেন।

আমার সহৃদয় পাঠককুল। এবারে একটা সুখবর দিই। ভরতবংশে বিতথের পুত্র ভূমন্যু বা ভুবমন্যু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কিন্তু বহুশ্রুত বহু-আলোচিত হস্তিনাপুরের কাছাকাছি চলে এসেছি। ভূমন্যুর সঙ্গে যে রমণীর বিয়ে হয়, তিনি যদুবংশীয় দাশার্হের ধারায় জন্মেছিলেন। তাঁর নাম বিজয়া। তাঁদের ছেলের নাম সুহোত্র। সুহোত্র যে খুব নামী রাজা ছিলেন তা নয়। তবে সার্বভৌম ভরতের সাম্রাজ্য তিনি সম্পূর্ণ দখলে রাখতে পেরেছিলেন। রাজসূয়-অশ্বমেধের মতো বড় বড় যজ্ঞ করে জনমনে ভরতবংশের 'ইমেজ'টাও অটুট ধরে

AMARBOI.COM

রেখেছিলেন সুহোত্র। চতুরঙ্গিনী সেনা এবং রাজকোষ—দুটোই সমৃদ্ধ থাকার ফলে তিনি একটু নগরায়ণ বা 'আরবানাইজেশনে'র দিকে মন দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ মহাভারত মন্তব্য করেছে—তাঁর আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়—মনুষ্যকলিলা ভৃশম্—এবং সুহোত্র বহু জায়গায় পাষাণ-নির্মিত চৈত্যগৃহ তৈরি করান। জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে এই চৈত্যগুলিকে পাষাণ-নির্মিত যজ্ঞ স্থানও মনে করা যেতে পারে কারণ, যজ্ঞপশুর বধ-বন্ধনের জন্য যূপ-কাষ্ঠও তৈরি করা হয়েছিল বহু জায়গায়—চৈত্যযূপাঙ্কিতা চাসীদ্ভূমিঃ শতসহস্রশঃ।

এখানে চৈত্য শব্দের সঙ্গে যূপ শব্দটি থাকায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা চৈত্য শব্দটাকে যজ্ঞস্থান বলেই মনে করেছেন, কিন্তু আমাদের সবিশেষ ধারণা—এখনকার দিনের মতো একেবারে 'পার্মানেন্ট' একটা বাঁধানো জায়গায় যজ্ঞ করতে সেকালের ঋষি-মুনিরা পছন্দ করতেন না। কিন্তু যজ্ঞীয় পশুর বধ-বন্ধনের ব্যাপারটা যেহেতু খুবই সমস্যা তৈরি করত, তাই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃত সমাজে জায়গায় জায়গায় যূপ নির্মাণ করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চৈত্য শব্দটা আমরা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার নিয়মে জমির সীমা নির্ধারণ করার জন্য পাষাণ স্তূপ হিসেবেই মেনে নিতে চাই। 'চৈত্য-যূপ' শব্দের সঙ্গে 'অঙ্কিত' শব্দটিও আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা 'অঙ্কিত' শব্দের অর্থ চিহ্নিত। সুহোত্র রাজার নগরায়ণের পদক্ষেপে শতসহস্র পাষাণ-স্তূপের বন্ধনে চিহ্নিত ভূমির পরিমাপই যদি এখানে গ্রাহ্য হয়, তবেই কিন্তু তাঁর পরবর্তী বংশধরের সবচেয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপটি সার্থক করে তুলবে।

সুহোত্র ইক্ষ্বাকু-বংশের কন্যা সুবর্ণাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভজাত পুত্রটির নামই হল হস্তী। হয়তো পিতার 'চৈত-যূপাঙ্কিত' নগরায়ণের পথ ধরেই মহারাজ হস্তী হস্তিনাপুর-নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন—

সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তী নাম বভূব হ।
তেনেদং নির্মিতং পূর্বং নাম্না বৈ হস্তিনাপুরম্।।

ভরতবংশের ধারায় মহারাজ হস্তীকে লাভ করার পর আমরা এখন হস্তিনাপুরে দাঁড়িয়ে আছি।

আটচল্লিশ

সেই কবে প্রতিষ্ঠানপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের ঠিকানা পেয়েছিলাম। তারপরে যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর রাজত্ব শেষ হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানপুরের ঠিকানাও হারিয়ে গেল। এতদিন পরে পুরু-ভরতবংশীয়দের নতুন রাজধানীর পত্তন করলেন মহারাজ হস্তী। হস্তীর পূর্বপুরুষ মহারাজ ভরত রাজ্য বিস্তারেই ব্যস্ত ছিলেন। গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল থেকে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করে ভরত নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু, তাঁর রাজধানীটির নাম আমরা পাইনি। পিতা সুহোত্রের নগরায়ণের পথ ধরে মহারাজ হস্তী শেষ পর্যন্ত নিজের নামে ভরতবংশের একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। পণ্ডিতেরা বলেন—আধুনিক 'মিরাট' শহরের কাছাকাছি কোনও জায়গায় হস্তিনাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান। স্থান নির্বাচনের মধ্যে যদি কোনও বুদ্ধি কৌশল কাজ করে থাকে, তবে রাজধানী হিসেবে হস্তিনাপুরের মতো একটা স্থান নির্বাচন করা যথেষ্ট রাজনৈতিক বোধের পরিচয়। কেননা, অতি আধুনিক কালেও আমাদের ভারতবর্ষের যে রাজধানী, সেই দিল্লি থেকে হস্তিনাপুর খুব দূরে নয়।

আমরা আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি যে, হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার আগে এই অঞ্চলে আর্যেতর নাগ জন-জাতির বসতি ছিল। নাগ অর্থ সর্প। তার মানে এই বিশেষ জনগোষ্ঠী সর্পের 'টোটেম' ব্যবহার করত। মহাভারতের অনেক জায়গায় হস্তিনাপুরকে সোজাসুজি 'নাগপুর' বলা হয়েছে। মহারাজ পাণ্ডুর বিশেষণ ছিল 'নাগপুরসিংহ'—তে নাগপুরসিংহেন পাণ্ডুনা করদীকৃতাঃ। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়—মহারাজ হস্তী ওই জায়গাটি অধিকার করার পর নিজের নামে তার নামকরণ করেন হস্তিনাপুর। নাগ অর্থে যেহেতু হস্তীও বোঝায় তাই সর্পার্থক নাগ শব্দ পরিত্যাগ করে গজ বা হস্তিবাচক নাগ শব্দ প্রচলিত হল

মহারাজ হস্তীর সম্মানে। কিন্তু পুরনো নামটাও স্মারক হিসেবে থেকে গেল—নাগসাহ্বয়, নাগপুর ইত্যাদি। আবার নতুন নামও চলল—হস্তিনাপুর গজসাহ্বয়, বারণসাহ্বয় ইত্যাদি।

অন্য কোনও কীর্তি না থাকলেও শুধুমাত্র হস্তিনাপুর নগরীর জন্যই হস্তী বিখ্যাত হয়ে রইলেন। মহাভারতের বংশলতিকায় পুরু-ভরতের বংশে বিকুণ্ঠন নামে এক রাজার নাম এসেছে, যদিও প্রাচীন পুরাণগুলির সঙ্গে এই নাম মেলে না। পুরাণের পুরু-বংশপরম্পরায় হস্তীর তিন পুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ়। জ্যেষ্ঠ অজমীঢ়ের বংশধারাতেই পুরু-ভরতবংশের রাজপরম্পরা চলতে থাকে হস্তিনাপুরকে কেন্দ্র করে। অজমীঢ় বিখ্যাত রাজা ছিলেন। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির এঁদের বহুবার 'অজমীঢ়' বলে সম্মান করা হয়েছে। তবে রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশাসন অথবা প্রজাপালনের জন্য অজমীঢ় যতখানি বিখ্যাত, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি বিখ্যাত বোধহয় তাঁর পুত্র-পৌত্রদের জন্য।

অজমীঢ়ের তিন স্ত্রী—নীলিনী, কেশিনী এবং ধূমিনী। এই তিন স্ত্রীর গর্ভে অজমীঢ়ের যে সব পুত্র হয়, তাঁরাই ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। এদিক দিয়ে মহারাজ অজমীঢ় একমাত্র যযাতির সঙ্গে তুলনীয়। কেশিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের যে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর বংশের সকলেই ব্রাহ্মণ হয়ে যান। এঁদের বলা হয় 'ক্ষত্রোপেত দ্বিজ' অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মেও এঁরা রাজদণ্ড গ্রহণ না করে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-হোম-তপস্যার পথ বেছে নেন। কেশিনীর গর্ভজাত ওই পুত্রের নাম কণ্ব ছিল বলে এঁর বংশধরেরা সবাই কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ বলে সমাজে পরিচিত হন।

অজমীঢ়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী কেশিনীর কথা আগেই বলে নিলাম। কারণ তাঁর প্রথমা স্ত্রী নীলিনীর গর্ভজাত পুত্রেরা অন্যদিক দিয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বংশ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতেন না। প্রথমেই বলা ভাল যে, অজমীঢ়ের ঔরসে নীলিনীর গর্ভজাত পুত্র নীল এবং তাঁর পুত্রেরা হস্তিনাপুরে থাকতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁদের দু-তিন পুরুষ পরেই এই বংশে পাঁচটি পুত্র জন্মায়। তাঁদের নাম মুদ্‌গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর এবং কৃমিলাশ্ব (অথবা কপিল অথবা কাম্পিল্য)। এই পাঁচ ছেলের বাবা হর্যশ্ব মুখে মুখে সবাইকে বলতেন—আমার এই পাঁচ ছেলে অন্তত পাঁচটা রাজ্য রক্ষা করতে সমর্থ হবে—পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণায় অলমেতে মৎপুত্রাঃ। হস্তিনাপুরে পৌরবংশের প্রধান ধারায় যেহেতু এঁরা কোনও রাজ্য পাননি, তাই রাজ্যবিস্তার বা অন্য রাজ্য স্থাপন করার একটা প্রবল প্রচেষ্টা এঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই যুদ্ধবীর ছিলেন এবং নিজেরা যুদ্ধ করে পাঁচটি ছোট ছোট রাজ্য অধিকার করেন। পাঁচজনই নিজেদের অধিকৃত ভূমি রক্ষা করতে সমর্থ (সংস্কৃতে অলং) ছিলেন বলে তাঁদের সম্পূর্ণ রাজ্যখণ্ডটির নাম পঞ্চাল (পঞ্চ+অলম্)—অলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতিবিশ্রুতাঃ।

ভবিষ্যতে পঞ্চ-পাণ্ডবের শ্বশুর এবং দ্রৌপদীর পিতা এই পঞ্চালের একতম সৃঞ্জয়ের বংশে জন্ম গ্রহণ করবেন বলেই পঞ্চাল বা পাঞ্চাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যে পাঁচজন পঞ্চাল রাজার নাম আমরা করলাম, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন মুদ্‌গল। তাঁর ছেলেরা সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে যান। এবং তাঁরা মৌদ্‌গল্য বা মৌদ্‌গল্যায়ন ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। অর্থাৎ কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণদের মতো এঁরাও ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ। এই মুদ্‌গলের বংশেই পরে কুরু-পাণ্ডবদের প্রথম অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য জন্মাবেন।

পাঞ্চাল-রাজ্যের প্রধান বংশটি চলতে থাকে সৃঞ্জয়ের ধারায়। মহাভারতে পাঞ্চালদের

www.amarboi.com

অন্তত একশবার সৃঞ্জয়ের বা সোমক নামে ডাকা হয়েছে। তার কারণ সৃঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন চ্যবন পঞ্চজন অথবা চ্যবন পিজবন এবং তাঁর তিন পুরুষ পরেই সোমক। সৃঞ্জয় এবং সোমক পাঞ্চালদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বলেই পরবর্তীকালে দ্রুপদ রাজার দেশবাসীকে কখনও পাঞ্চাল, কখনও সৃঞ্জয় আবার কখনও সোমক বলে ডাকা হয়েছে। ঠিক যেমন যুধিষ্ঠিরকে ভারত, পৌরব অথবা অজমীঢ় বলে ডাকা হয়েছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে পঞ্চাল রাজ্যটার অবস্থিতি ছিল হস্তিনাপুরের দক্ষিণ-পূর্বে। এখনকার দিনে উত্তরপ্রদেশের বেরিলি, বুদাউন, ফুরুখাবাদের সঙ্গে যদি রোহিলখণ্ডের বেশ খানিকটা জুড়ে দেওয়া যায় তবেই আমরা সেকালের পঞ্চাল দেশটি পেয়ে যাব। এর পুবদিকে গোমতী নদী বয়ে চলেছে কুলুকুলু করে, পশ্চিমে মথুরা-শূরসেনের দেশ। পাঞ্চালের দক্ষিণে অভিশপ্ত চম্বল—দক্ষিণাংশ্চাপি পাঞ্চালান্ যাবচ্চর্মণ্বতী নদী। আর উত্তরে, অথবা বলা উচিত পঞ্চাল-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে বিখ্যাত সেই হস্তিনাপুর। যদিও বিশাল ঘন বনরাজির নিবিড় সন্নিবেশ পঞ্চাল রাজ্যটাকে যেন হস্তিনাপুর থেকে একটু আলাদা করে রেখেছে, তবে স্বীকার করতেই হবে ভরতবংশ অথবা অজমীঢ় বংশের হস্তিনাপুরী ধারা থেকে বেরিয়ে আসার ফলে এঁদের একটু স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং অহমিকাও ছিল।

বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—যেদিন থেকে সৃঞ্জয়-বৃহদিষুরা পঞ্চদেশ অধিকার করে পাঞ্চাল নামে পরিচিত হলেন, সেদিন থেকেই হস্তিনাপুরের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে—সৃঞ্জয়দের অধস্তন স্থপতি বলে এক রাজাকে সৃঞ্জয়রাই সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। পাঞ্চাল দেশের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর যায় কৌরব রাজা প্রাতিপীয় বাহ্লীকের কানে—তদুহ বাহ্লিকঃ প্রাতিপীয়ঃ শুশ্রাব কৌরব্যো রাজা। তিনি এই পাঞ্চালের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন এবং সৃঞ্জয়দের বিরুদ্ধে 'অপরুদ্ধ' বা সিংহাসনচ্যুত রাজা স্থপতির জন্য কিছু করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সব তো অনেক পরের কথা। সৃঞ্জয় যখন পাঞ্চালে এসে রাজা হন; তখন কুরু, কৌরব—এঁরা কোথায়?

সৃঞ্জয় উত্তর পঞ্চালের অধিপতি হলেন। আর তাঁর রাজধানীর নাম হল অহিচ্ছত্র। 'অহি' মানে সর্প। এখানেও কি নাগজনজাতির বসতি ছিল? যাই হোক উত্তর পঞ্চাল জায়গাটা গঙ্গার উত্তর দিকে। ঠিক সৃঞ্জয়ের সময় থেকেই হস্তিনাপুরের রাজাদের সঙ্গে পাঞ্চালদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা, সেটা সঠিক বলা না গেলেও তাঁর ছেলে চ্যবন-পিজবনের সময় থেকেই এই দুই আর্যগোষ্ঠীর সম্পর্ক খারাপের দিকে যেতে থাকে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল—ভগবান বলে চিহ্নিত কৃষ্ণ যে যদুবংশে জন্মেছিলেন সেই যদুবংশের যে মহান পুরুষেরা পাঞ্চাল সৃঞ্জয়ের সমসাময়িক ছিলেন তাঁরা হলেন ভজিন, ভজমান, অন্ধক, দেবাবৃধ এবং বৃষ্ণি।

এই পাঁচ পুরুষের পিতা ছিলেন মহারাজ সাত্বত—যিনি রাজত্ব করতেন মথুরা অঞ্চলে। সাত্বত নিজে যেমন বিখ্যাত ছিলেন, ঠিক তেমনই ছিলেন তাঁর পাঁচ পুত্র। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকে সাত্বত, বৃষ্ণি অথবা অন্ধক বংশের ধুরন্ধর পুরুষ বলেই লোকে ডাকবে। যাই হোক, সাত্বতের দ্বিতীয় পুত্র ভজমানের সঙ্গে পাঞ্চালরাজ সৃঞ্জয়ের দুই মেয়ের বিয়ে হয়। সৃঞ্জয়ের দুই মেয়ের নাম বাহ্যকা এবং উপবাহ্যকা—ভজমানস্য সৃঞ্জয়্যৌ বাহ্যকাথোপবাহ্যকা। আমাদের ধারণা—সৃঞ্জয় এই বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন নিজের স্বার্থেই। এই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে পিতৃপুরুষের গড়া নতুন রাজ্য পঞ্চালদেশকে তিনি অন্তত খানিকটা সুরক্ষিত

amarboi.com

রেখেছেন। যাদব-সাত্বত-বৃষ্ণিদের সঙ্গে জোট বাঁধায় হস্তিনাপুরের ভরতবংশীয় রাজারা পঞ্চালদেশকে কোনওভাবে আঘাত করেননি বা করতে পারেননি।

সৃঞ্জয়ের পুত্র চ্যবন-পিজবন এবং তাঁর পুত্র সুদাস—দুজনেই কিন্তু রাজ্য বিস্তারে মন দেন। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে—স্বয়ং ইন্দ্র সুদাস পৈজবনের জন্য নতুন জনপদ তৈরি করেন—কর্তা সুদাসে অহ বা উ লোকম্‌। পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন, পৈজবন সুদাস এতটাই শক্তিমান ছিলেন যে তিনি নিজের রাজ্য উত্তর পঞ্চাল অতিক্রম করে দক্ষিণ পঞ্চালও জিতে নিয়েছিলেন। ঋগবেদের খবর অনুযায়ী পৈজবন সুদাস অন্তত দুটি জনপদের একুশ জন লোককে হত্যা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি জনপদ যদি দক্ষিণ পঞ্চাল হয় তবে আর একটি কোন জনপদ?

ঠিক এই জায়গা থেকেই আমাদের আবারও হস্তিনাপুরে ফিরে যেতে হবে। হস্তিনাপুরের রাজা হস্তীর পুত্র অজমীঢ়ের দুই পত্নী কেশিনী এবং নীলিনীর কথা বলতে বলতে আমরা পঞ্চালে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু অজমীঢ়ের তৃতীয়া পত্নী ধূমিনীর কথা আমরা বলিনি। হস্তিনাপুরের ভরতবংশ এই ধূমিনীর বংশধারাতেই চলছিল—তস্মিন বংশঃ প্রতিষ্ঠিত। অজমীঢ়ের তৃতীয় পত্নী ধূমিনীর গর্ভজাত পুত্র হলেন ঋক্ষ। ঋক্ষর গায়ের রঙ ছিল ধোঁয়ার মতো। হস্তিনাপুরের রাজা হিসেবে ঋক্ষর তত সুখ্যাতি কিছু নেই। কিন্তু তাঁর পুত্র সম্বরণ নানা কারণেই বিখ্যাত ছিলেন—ঋক্ষাৎ সংবরণো জজ্ঞে রাজন্‌ বংশকরঃ সুতঃ।

ঋক্ষপুত্র সংবরণ যখন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসলেন, তখন তিনি ভরত এবং অজমীঢ়ের রাজ্যশাসনের গৌরবেই সম্পূর্ণ আপ্লুত ছিলেন। একবারও তিনি ভাবেননি যে, সার্বভৌম রাজা ভরতের পরম্পরাপ্রাপ্ত পৈতৃক রাজ্যের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ তৈরি হয়েছে পাশেই। পাঞ্চাল রাজ্যে পৈজবন সুদাসের ক্ষমতা তিনি একটুও পরিমাপ করতে পারেননি। মহাভারতের কবি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন—ঋক্ষপুত্র সংবরণ যখন রাজা হলেন হস্তিনাপুরে, তখন বিরাট এক ধ্বংস নেমে এসেছিল হস্তিনাপুরে—সংক্ষয়ঃ সুমহানাসীৎ প্রজানাম্‌ ইতি নঃ শ্রুতম্‌। রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত, রাজকোষ, মন্ত্রী-অমাত্য—সব কিছুর মধ্যেই এমন এক বিপর্যয় দেখা দিল যে, সংবরণ কোনওভাবেই রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও কিছু ছিল—দেশে অনাবৃষ্টির ফলে শস্য ছিল না। তার ফল যা হয়, ব্যাধি-মৃত্যু লেগেই রইল হস্তিনাপুরের রাজমণ্ডলে। সংবরণের এই বেহাল অন্তঃরাষ্ট্রীয় অবস্থার সুযোগ নিল শত্রুসেনারা। তারা দলে দলে এসে ভরতবংশীয়দের আক্রমণ করল—অভ্যঘ্নন্‌ ভারতাংশ্চৈব সপত্নানাং বলানি চ।

এই শত্রুদের মধ্যে প্রথম যে দেশের নাম করতে হবে, সেটি হল পঞ্চাল রাজ্য। ঋগ্‌বেদে ভরতবংশীয়দের সঙ্গে সুদাসের সংঘর্ষের উল্লেখ থাকায় পণ্ডিতেরা মনে করেন—তখন পাঞ্চালের রাজা ছিলেন ওই সুদাস পৈজবন। তিনি তাঁর চতুরঙ্গিনী সেনা-বাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুর আক্রমণ করলেন—অভ্যয়াৎ তঞ্চ পাঞ্চাল্যো বিজিত্য তরসা মহীম্‌। পাঞ্চালদের ভয়ংকর আক্রমণের মুখে সংবরণ হস্তিনাপুর রক্ষা করতে পারলেন না। দশ অক্ষৌহিনী সেনার তোড়ে সংবরণ ভেসে গেলেন পৈতৃক রাজধানী থেকে। স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁকে পালিয়ে যেতে হল। তাঁর সঙ্গে রইলেন বিশ্বস্ত পুরাতন কিছু বন্ধু-বান্ধব আর রইলেন পুরাতন মন্ত্রীমশাইরা।

শক্তপোক্ত একটা রাজ্যের উত্তরাধিকার বহন করে সংবরণ কী করে তাঁর পৈতৃক রাজ্য খোয়ালেন, তার পিছনে আমাদের নিজস্ব একটা অনুমান আছে। আমাদের মহাকবি মহারাজ

AMARBOI.COM

সংবরণের প্রেমের তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন—

পত্নীবর মাগি
করেনি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত?

নিঃসন্দেহে এই কবি-কল্পনার মধ্যে কিছু 'অ্যানাক্রনিজম্' আছে। কারণ এখানে সংবরণের কথা যিনি সবিস্ময়ে স্মরণ করাতে চাইছেন তিনি দেবযানী। বৃহস্পতিপুত্র কচকে যদি সংবরণের কথা স্মরণ করিয়ে ধিক্কার দিতে হয় তবে ক্রান্তদর্শী কবিকে দেবযানীর পাঁচ-সাত পুরুষ পরের ভবিষ্যতে দৃষ্টি দিতে হয়। কবি-ঋষির ভুল ধরার জন্য আমার কোনও আকুলতা নেই। আকুলতা যতটুকু আছে, তা হল সংবরণের প্রেমের তপস্যা নিয়ে। মহাকবি তাঁর প্রেমের ব্যাপ্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই, দেবযানীর মুখে তাঁর অতি-কনিষ্ঠ প্রপৌত্রের উদাহরণটি সাজিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেননি।

আমরা আমাদের গদ্যজাতীয় বক্তব্য পেশ করার সময় এই কাব্যপংক্তি স্মরণ করলাম এই কারণে যে, আমাদের অনুমান—হয়তো এ কথা শুনে মহাকবি আরও খুশি হতেন—আমাদের অনুমান—প্রেমের মুগ্ধতার কারণেই হয়তো হস্তিনাপুরের সম্রাট সম্বরণ তাঁর রাজ্য হারিয়ে বসেছিলেন। কেমন করে?—তা একটু বলতেই হয়। সম্বরণের বেশ কয়েক পুরুষ পরে পাণ্ডবরা যখন জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচে পাঞ্চালের পথে রওনা হয়েছেন, তখন গন্ধর্ব চিত্ররথের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। প্রধানত অর্জুনের সঙ্গেই তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল এবং বারবার তিনি অর্জুনকে 'তাপত্য' বলে সম্বোধন করেছিলেন। 'তাপত্য' মানে তপতীর বংশজ। অর্জুন স্বভাবতই এই সম্বোধনে আকৃষ্ট হলেন এবং এই মিষ্টি সম্বোধনের কারণ জানতে চাইলেন। অর্জুন বললেন—সবাই আমাদের কৌন্তেয় বলে ডাকে, তাই তো বেশ ভাল। এই তপতী আবার কে, যাঁর নামে 'তাপত্য' হলাম আমরা—তপতী নাম কা চৈষা তাপত্যা যৎকৃতে বয়ম্? গন্ধর্ব চিত্ররথ তখন তপতীর কাহিনী বললেন অর্জুনকে এবং আমাদের ধারণা এই কাহিনীর মধ্যেই মহারাজ সম্বরণের রাজ্য হারানোর সংকেত লুকিয়ে আছে।

রাজ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে সম্বরণের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, তেমন কোনও সমাচার আমরা পাইনি। বরং প্রথম দিকে তিনি বেশ ভাল রাজ্যশাসন করেছিলেন। সামন্ত রাজারা তাঁর বশংবদ ছিলেন। বন্ধু সজ্জনের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো কোমল-কমনীয়, আর দুষ্ট জনের প্রতি সংবরণ ছিলেন সূর্যের মতো প্রতাপী—স সোমম্ অতি-কান্তত্বাদ্ আদিত্যমিব্ তেজসা। মর্ত্যভূমির রাজার এই অসামান্য ক্ষমতা দেখেই নাকি ভগবান সূর্যদেব তাঁর মেয়েকে সংবরণের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেন।

সূর্যদেবের মেয়ের নাম তপতী। অপূর্ব তাঁর রূপ, মোহন তাঁর স্বভাব। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুচারু বর্ণনা করতে গেলে দেবতা, মানুষ, যক্ষ-রাক্ষস—কারও মধ্যে তাঁর কোনও উপমান খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি প্রত্যঙ্গসুন্দরী—সুবিভক্তানবদ্যাঙ্গী স্বসিতায়তলোচনা—এবং তাঁর পিতা সূর্যদেব সারা দুনিয়ায় তাঁর উপযুক্ত কোনও পাত্র খুঁজে পাননি। তিনি তাই মনে মনে সম্বরণকেই জামাতা হিসেবে ঠিক করে রেখেছিলেন, যদিও মুখে তাঁকে কিছ্ছু বলেননি।

তপতীর পিতা এই সূর্যদেব সূর্যবংশীয় কোনও নৃপতি কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের লৌকিক বিশ্বাস প্রবল। মহাভারতের কবি অবশ্য সূর্যপুত্রী তপতীর সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্বরণের মিলন

www.amarboi.com

ঘটাবেন বলে সম্বরণকে পূর্বাহ্নেই সূর্যের উপাসক বলে চিহ্নিত করেছেন। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরের যুগে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা সূর্যের উপাসক ছিলেন—এটা কোন আশ্চর্য কথা নয়। যাই হোক, সম্বরণ প্রতিদিনই পুষ্প-গন্ধ-মাল্যের উপচারে সূর্যপূজা করতেন—সূর্যমারাধয়ামাস নৃপঃ সম্বরণস্তদা। কিন্তু এই সূর্যপূজার সঙ্গে সূর্যকন্যা তপতীর কোনও সংস্রব আপাতত ছিল না। সূর্যদেব নিজের মেয়ের সৌম্যসুন্দর রূপ দেখে উপযুক্ত পাত্রের চিন্তায় ভাবিত ছিলেন—নোপলেভে ততঃ শান্তিং সম্প্রদানং বিচিন্তয়ন্—এবং সংবরণের কথা তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, এই পর্যন্ত—তপত্যা সদৃশং মেনে সূর্যঃ সম্বরণং তদা—কিন্তু এদিকে অন্যরকম একটি ঘটনা ঘটল।

হস্তিনাপুরের সুযোগ্য শাসক সম্বরণ রাজা রাজ্যশাসনের ক্লান্তি কাটাতে মৃগয়ায় বেরলেন। মৃগয়া করতে করতে সম্বরণ পার্বত্য দেশের গভীর বনাঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এদিকে পাহাড়ী পথের ধকল সহ্য করতে না পেরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত তাঁর অশ্বটি হঠাৎই মারা গেল। সম্বরণ আর কী করেন? পায়ে হেঁটেই তিনি পার্বত্য প্রদেশের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—পদ্ভ্যামেব গিরৌ নৃপঃ—আর ঠিক এই সময়েই পাহাড়ের কোল আলো করা একটি রমণীকে দেখতে পেলেন সম্বরণ—যাঁর তুলনা তিনি নিজেই—দদর্শাসদৃশীং লোকে কন্যামায়ত লোচনাম্।

পাহাড়ের কোলে নির্জন বনভূমির মধ্যে একাকিনী সেই রমণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সম্বরণের মনে হল যেন আকাশ থেকে সূর্যের প্রভা খানিকটা খসে পড়েছে ভূঁয়ে—রবের্ভ্রষ্টামিব প্রভাম্। সম্বরণের মনে হল—সূর্যের মতো দীপ্তিময় ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি চাঁদের কমনীয়তা মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবেই যেন এ রূপের তুলনা হয়। সম্বরণ মুগ্ধ হলেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে রমণীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দেখলেন—সোনার বরণ রমণীর রূপে বৃক্ষলতা-পাহাড়ও যেন কখন সোনা হয়ে গেছে। এই রূপের তুলনায় দুনিয়ায় তাবৎ সুন্দরীকে সম্বরণের মনে হল যেন খেঁদি-পেঁচি—অবমেনে চ তাং দৃষ্ট্বা সর্বলোকেষু যোষিতঃ। মানুষের চক্ষু থাকার যা ফল, সে ফল সম্পূর্ণ লাভ করে সম্বরণ শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর যেন কোনও কাজ নেই, রাজধানীতে ফেরবার কোনও তাড়া নেই, অশ্বটিও মারা গেছে—যেন ভাল হয়েছে। তিনি শুধু দাঁড়িয়েই রইলেন—ন চচাল ততো দেশাদ্ বুবুধে ন চ কিঞ্চন।

অনেকক্ষণ চক্ষু সার্থক করে রাজা এবার রমণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কার মেয়ে, সুন্দরী? তুমি কারও স্ত্রী নও তো? কী জন্যই বা এই নির্জন অরণ্য দেশে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ—কথঞ্চ নির্জনে'রণ্যে চরস্যেকা শুচিস্মিতে? সম্বরণ থাকতে পারলেন না। রমণীয় রূপ দেখে নিজের ভাবটুকুও তিনি আর গোপন করতে পারলেন না। সম্বরণ বললেন—তোমার মতো সুন্দরী আমি কোনওদিন দেখিনি। তোমার অঙ্গের এই মনোহর অলংকারগুলি আমার কাছে বাহুল্য মনে হচ্ছে, বস্তুত তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই এই আভূষণের যথার্থ অলংকার। তোমার এই মধুর মুখখানি দেখে আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে ভালবাসায়—মাং মথ্নাতীব মন্মথঃ।

সম্বরণ অনেক কথা বলে গেলেন প্রলাপের মতো। কিন্তু রমণী একটি কথারও উত্তর দিলেন না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো হঠাৎই তিনি অদৃশ্য হলেন। সম্বরণ তাঁর দেখা না পেয়ে চার দিকে খুঁজতে লাগলেন—তামন্বেষ্টুং স নৃপতিঃ পরিচক্রাম সর্বতঃ। কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে একসময় সম্বরণের চেতনা লুপ্ত হল। তিনি

AMARBOI.COM

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। যিনি এতকাল ভরতবংশের সমস্ত শত্রু নিপাত করে ভূতলে শায়িত করেছেন, তিনি এক রমণীর মোহে নিজেই লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে—পাতনঃ শত্রুসংঘানাং পপাত ধরনীতলে। রাজা যখন চেতনা-লুপ্ত হয়ে পড়ে আছেন, ঠিক তখনই সেই রমণী আবারও উপস্থিত হলেন রাজার সামনে—পুনঃ পীনায়তশ্রোণী দর্শয়ামাস তং নৃপম্। রমণী বললেন—আপনি ভূতলশয়ন ছেড়ে উঠুন রাজা। বিধাতা আপনাকে রাজা করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আপনার কি এত অল্প কারণে মূর্ছিত হওয়া চলে—মোহং নৃপতিশার্দূল...ন ত্বমর্হস্যরিন্দম? পরিষ্কার বোঝা যায়, রমণী এতক্ষণ লুকোচুরি খেলছিলেন রাজার সঙ্গে।

সম্বরণ দেখলেন—সেই রূপ, সেই মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চার। এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনি বিবাহের প্রস্তাব করলেন রমণীর কাছে। বললেন তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না—ন হ্যহং ত্বদৃতে ভীরু শক্ষ্যামি খলু জীবিতুম্। সম্বরণ এইটুকু কথা বলেই থামেননি। যত রকম স্তুতি-প্রশংসায় রমণীর মন জয় করা যায়, সেসব তো তিনি করলেনই, উপরন্তু শতরকম ভাবে রমণীর হৃদয়ে শত করুণার উদ্রেক করে তিনি শুধু বললেন—আমার প্রাণ বাঁচাতে হলে তোমাকে যে আমার কাছে আত্মদান করতেই হবে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না—প্রাণা হি প্রজহন্তি মাম্। সম্বরণ শেষ প্রস্তাব করলেন—এই মুহূর্তেই আমরা গান্ধর্ব বিবাহের নিয়মে মিলিত হতে পারি। তুমি রাজি তো?

রমণীর কোমল হৃদয় আর কত সইতে পারে। এতক্ষণ রাজার অন্তরালে থেকে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস আর আকুতি লক্ষ্য করেছেন তিনি। রাজার কথা শুনে এবারে তিনি আর নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকলেন না। একটু ঘনিষ্ঠভাবেই বললেন—বিবাহ? মহারাজ! আমি শুধু আমার ইচ্ছাতে এই কাজ করতে পারি না। আমার পিতা আছেন। আমাকে যদি সত্যিই তুমি ভালবেসে থাক, তবে আমার পিতার কাছে তুমি আমাকে যাচনা করে নাও—ময়ি চেদস্তি তে প্রীতির্যাচস্ব পিতরং মম। আমি স্বীকার করি—আমি যদি প্রথম দর্শনেই তোমার ভালবাসার পাত্র হয়ে থাকি, তবে তুমিও প্রথম ভালবাসবার মতো এক পুরুষ-রত্ন। তবু কী জান, এই শরীরটা আমার পিতার দেওয়া। এই শরীরের আমার অধিকার নেই কোনও। একবারটি তুমি আমার পিতাকে বল। তবে শুধু আমার কথা জানতে চাইলে বলি—পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে যে তোমার মতো বিখ্যাত বংশের অভিজাত রাজাকে মনেপ্রাণে স্বামী হিসেবে না চাইবে, বিশেষত যে রাজা আমাকেই চান—কন্যা নাভিলষেন্নাথং ভর্তারং ভক্তবৎসলম্। তুমি তোমার তপস্যায়, প্রণিপাতে আমার পিতাকে তুষ্ট করো। তিনি অনুমতি দিলেই আমি তোমার হব—ভবিষ্যাম্যথ তে রাজন্ সততং বশবর্তিনী। সম্বরণের সঙ্গে কথা শেষ করে রমণী নিজের পরিচয় দিলেন—আমি সূর্যের কন্যা। মনে রেখ রাজা—আমার নাম তপতী।

পরিচয়ের শেষে রমণী আবারও অন্তর্হিতা হলেন এবং সম্বরণ তাঁকে না দেখে আবারও চেতনালুপ্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। এদিকে সম্বরণের অনুযাত্রী বৃদ্ধ মন্ত্রী সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে আসছিলেন। সেই মহাবনের মধ্যে এসে অশ্বহীন লুপ্তচেতন রাজাকে দেখে বৃদ্ধ মন্ত্রীর বুক কেঁপে উঠল। তিনি ভাবলেন—নিশ্চয় ঘোড়া খুইয়ে শ্রান্ত পিপাসার্ত রাজা বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে সংজ্ঞালুপ্ত হয়ে পড়ে গেছেন মাটিতে—ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তং তর্কয়ামাস বৈ নৃপম্। বৃদ্ধ মন্ত্রী পিতার মতো স্নেহে সম্বরণকে মাটি থেকে উঠালেন, পদ্মগন্ধী শীতল জল এনে ছিটিয়ে দিলেন তাঁর মাথায়। রাজার সংজ্ঞা ফিরে এল

AMARBOI.COM

অচিরেই। কিন্তু সংজ্ঞা ফিরে আসতেই রাজার মনে পড়ল তপতীর কথা। তপতী বলেছিলেন—তুমি তপস্যায় প্রণিপাতে সন্তুষ্ট কর আমার পিতাকে—আদিত্যং প্রণিপাতেন... যাচস্ব পিতরং মম—তবেই আমি তোমার হব।

বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে সৈন্য-সামন্ত সবাইকে রাজধানীতে ফিরে যেতে বললেন সম্বরণ। তারা চলে যেতেই রাজাও সূর্যের উপাসনার জন্য সেই পাহাড়ের সানুদেশে সূর্যের সন্তুষ্টির উদ্দেশে তপস্যা আরম্ভ করলেন; আর মনে মনে স্মরণ করতে লাগলেন ঋষি বশিষ্ঠকে, তাঁর এই বিষণ্ণতায় তিনিই একমাত্র সাহায্য করতে পারেন তাঁকে—জগাম মনসা চৈব বশিষ্ঠম্ ঋষিসত্তমম্। বশিষ্ঠ সম্বরণ রাজার পুরোহিত। পুরো বার দিন উর্ধ্বমুখে সূর্যের তপস্যায় সম্বরণের দিন কাটল। বশিষ্ঠ সম্বরণের অবস্থা জেনে উপস্থিত হলেন সেই পর্বতের সানুদেশে। সম্বরণ তপতীকে লাভ করার জন্য এই তপস্যা করছেন জেনে বশিষ্ঠ নিজেই গিয়ে দেখা করলেন সূর্যদেবের সঙ্গে। তিনি বললেন—মহারাজ সম্বরণ আমাদের রাজা। তিনি যশস্বী ধর্মজ্ঞ এবং উদারচেতা। আমি তাঁর বিবাহের জন্য আপনার মেয়ে তপতীকে নিয়ে যেতে চাই। সূর্যদেব মনে মনে আগেই সম্বরণকে তপতীর উপযুক্ত স্বামী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। অতএব বশিষ্ঠের প্রস্তাবমাত্রই তিনি বললেন—সম্বরণ রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর মুণিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনি এবং রমনীকুলে মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমার এই কন্যা তপতী। অতএব এই বিবাহের প্রস্তাবে আমার আপত্তি কোথায়—তপতী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা কিমন্যদপসর্জনাৎ।

সূর্যদেব সানন্দে নিজের কন্যা তপতীকে বশিষ্ঠের হাতে তুলে দিলেন। মহর্ষি তপতীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই পর্বতের সানুদেশে, যেখানে সম্বরণ তপস্যা করছিলেন তপতীকে পাবার জন্য। বশিষ্ঠের সঙ্গে তপতীকে আসতে দেখে রাজার মনে হল যেন—বিদ্যুতের ঝলক নেমে এল চারিদিক উদ্ভাসিত করে। ঋষি বশিষ্ঠের সাহায্যে সম্বরণ শেষ পর্যন্ত তপতীকে স্ত্রী হিসেবে পেলেন। রাজার সাধের সাধনা যেন আজ মূর্তি ধরে, নেমে এল তাঁর আকুল বক্ষে, বাহুর ডোরে।

উনপঞ্চাশ

মহর্ষি বশিষ্ঠের করুণায় মহারাজ সম্বরণ তপতীকে লাভ করলেন বটে, কিন্তু নবলব্ধ দাম্পত্য প্রেমে মোহিত হয়ে সম্বরণ কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজধানীতে আর ফিরে গেলেন না। তপতীকে সম্বরণ লাভ করেছিলেন সবুজ পার্বত্যভূমির ঘন বনাঞ্চলে। পর্বতের সানুপ্রদেশের শোভা এবং সঙ্গে হিরন্ময়ী প্রতিমা তপতী। মহারাজ রাজধানীতে তখনই ফিরে যেতে চাইলেন না। পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির কাছে সম্বরণ অনুমতি চাইলেন সেই পার্বত্য ভূমিতেই আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য। বশিষ্ঠের অনুমতি পেয়েই রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন হস্তিনাপুরের রাজ্যপাট সামলানোর জন্য—আদিদেশ মহীপালস্তমেব সচিবং তদা।

বশিষ্ঠ রাজাকে পার্বত্যপ্রদেশের মধ্যে মধুচন্দ্রিমা যাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি আর কি জানতেন—তপতীর সঙ্গলাভে মহারাজ সম্বরণের কোনও জ্ঞান থাকবে না। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে রাজা রাজ্যপাট সামলানোর আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি ধারণাও করতে পারেননি—রাজা সমস্ত সীমা অতিক্রম করে ভোগে লিপ্ত থাকবেন। মহাভারতের কবি বলেছেন—বশিষ্ঠ চলে গেলে মহারাজ সম্বরণ দেবতার মতো বিহার করতে থাকলেন—বিজহারামরো যথা। এক দিন নয়, এক মাস নয়, এক বছরও নয়, সম্পূর্ণ বারো বছর ধরে দেবতার মতো উপভোগ বিহার—কাননে, বনে, পার্বত্যভূমিতে—ততো দ্বাদশ বর্ষাণি কাননেষু বনেষু চ—রাজার রাজ্যপাট চুলোয় গেল।

কবি লিখেছেন—রাজার শাসন নেই, সম্বরণের রাজ্যে ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দিলেন না। বারো বচ্ছরের অনাবৃষ্টিতে খাঁ-খাঁ করতে লাগল কর্ষণভূমি। একটি হিমবিন্দুও পতিত হল না, শস্য হল না একটুও। ক্ষুধার অন্ন জুটল না প্রজাদের। রোগ-শোক মহামারীতে হস্তিনাপুরীর শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। মানুষ স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে লাগল।

পুরু-দুষ্যন্ত-ভরতের রাজপুরী প্রেতপুরীতে পরিণত হল—অভবৎ প্রেতরাজস্য পুরং প্রেতৈরিবাবৃতম্।

মহাভারত-রামায়ণ এবং পুরাণগুলি পড়লেই দেখতে পাবেন—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, মহামারী এবং রোগ-শোকের বর্ণনা তখনই শোনা যায় যখন কোনও রাজার শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দেশের রাজা যদি রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকেন, যদি তাঁর ব্যক্তিগত ভোগ-সুখ আর বিলাস-ব্যসনে প্রজাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, পুরাণ-ইতিহাসে তখনই উপরিউক্ত নিয়মে 'কনভেনশনালি' একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনা করা হয়। সোজা কথা হল—হস্তিনাপুরের রাজা সম্বরণ বার বছর রাজ্যে উপস্থিত নেই। তিনি ভোগ-বিলাসে, স্ত্রীবিলাসে কাল কাটাচ্ছেন রাজ্যের বাইরে—রেমে তস্মিন্ গিরৌ রাজা তয়ৈব সব ভার্যয়া। আমাদের ধারণা—হস্তিনাপুরে সম্বরণ রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর পার্শ্বরাষ্ট্রের শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই পার্শ্বরাষ্ট্র হল পাঞ্চাল। হয়তো পাঞ্চালের রাজা তখন সুদাস।

মহাভারতের বর্ণনায় দেখতে পাচ্ছি—পাঞ্চালের রাজা শতশত সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাজা সম্বরণ হয়তো শেষ মুহূর্তে খবর পেয়ে পাঞ্চালদের সঙ্গে যুদ্ধ লড়তে এসেছিলেন। কিন্তু পাঞ্চালরা তাঁকে এমনভাবেই যুদ্ধে জয় করেন যে, সম্বরণকে স্ত্রী-পুত্র, অমাত্য-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যেতে হয় দূরে—রাজা সম্বরণস্তসমাৎ পলায়ত মহাভয়াৎ। পণ্ডিতেরা মনে করেন—পাঞ্চালরাজ সুদাসই মহারাজ সম্বরণকে পরাজিত করেন এবং এই যুদ্ধ হয়েছিল যমুনা নদীর তীরে—Sudas drove the Paurava King Samvarana of Hastinapura out, defeating him on the Jamuna.

পরাজিত সম্বরণ তাঁর রাজ্যের খুব কাছাকাছি থাকতে পারলেন না। তাঁকে পালিয়ে যেতে হল সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে—সিন্ধোর্নদস্য বিষয়ে নিকুঞ্জে ন্যবসত্তদা। সঙ্গে বিশ্বস্ত মন্ত্রী-পরিজন আর স্ত্রী তপতী। কখনও পর্বতের কন্দরে, কখনও সিন্ধুনদের তটবর্তী জঙ্গলে, কখনও বা সিন্ধুনদের তীর ধরে আরও এগিয়ে গিয়ে সম্বরণ পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন—নদীবিষয়পর্যন্তে পর্বতস্য সমীপতঃ। মহাভারতের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, পাঞ্চালরা সম্বরণকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, সম্বরণকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যার জন্য সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে যেখানেই সম্বরণকে থাকতে হয়েছে, তাঁকে যথেষ্ট সুরক্ষা নিয়েই থাকতে হয়েছে। মহাভারত বলেছে—নদ-নদী, জঙ্গল কিংবা পর্বতে অথবা যেখানেই সম্বরণ বাস করেছেন, সেখানেই তাঁকে থাকতে হয়েছে দুর্গের সুরক্ষা নিয়ে এবং থাকতেও হয়েছে বহু বছর—তত্রাবসন্ বহূন্ কালান্ ভারতা দুর্গমাশ্রিতাঃ। দুর্গ বলতে এখানে 'ফোর্ট' বোঝাচ্ছে না, দুর্গ মানে এখানে—অন্যের পক্ষে দুর্গম জায়গা।

যাই হোক, অনেক কাল বাইরে বাইরে কাটানোর পর মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে আবার তাঁর দেখা হল। মহারাজ সম্বরণ তাঁকে পুরোহিত নিযুক্ত করলেন। বশিষ্ঠের এই পৌরোহিত্য অবশ্য চাল-কলার পৌরোহিত্য নয়, রাজার যাগ-যজ্ঞ সম্পাদনও নয়, এই পৌরোহিত্যের অর্থ রাজার প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টার ভূমিকা। কারণ, সম্বরণ তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বলেছিলেন—আপনি আমার পৌরোহিত্য স্বীকার করুন এবং আমরা একসঙ্গে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি—পুরোহিতো ভবান্নোঽস্তু রাজ্যায় প্রযতেমহি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সঙ্গে চাণক্যের যে সম্পর্ক—আমরা ধারণা করি বশিষ্ঠের সঙ্গেও সম্বরণের সেই সম্পর্ক স্থাপিত হল।

amarboi.com

বশিষ্ঠের সুপরামর্শ ছাড়াও সম্বরণ হয়তো তাঁর রাজ্যে অন্য পার্শ্ববর্তী রাজাদেরও সাহায্য পান। মথুরার যাদবরা, গান্ধারদেশবাসী দ্রুহ্যুবংশীয়রা, উশীনর শিবিরা (যাঁরা অনু-বংশীয় আনব নামে পরিচিত ছিলেন) এবং রেওয়া-সাতনা অঞ্চলের তুর্বসুবংশীয়দের মিলিত সাহায্যেই হয়তো মহারাজ সম্বরণ সার্বভৌম ভরতের রাজধানী পুনরুদ্ধার করছিলেন। কারণ বশিষ্ঠ যখন সম্বরণের রাজ্যোদ্ধার করার জন্য স্বীকার বাক্য উচ্চারণ করলেন, তখন সেখানে শুধু সম্বরণই ছিলেন না, ছিলেন ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়া যদু-অনু-দ্রুহ্যু-তর্বুসুরা—যাঁরা সকলে 'ভারতাঃ' নামে পরিচিত—তে সর্বে ভারতাস্তদা। ভারতান্ প্রত্যপদ্যত। লক্ষণীয়, রাজ্যে প্রতিষ্ঠার সময় সম্বরণকে তাঁর বহু পূর্ব পরিচয়ে সম্বরণ পৌরব বলে ডাকা হচ্ছে—অথাভ্যষিঞ্চৎ সাম্রাজ্যে সর্বক্ষত্রস্য পৌরবম্। আরও, একটা কথা, আমরা পূর্ব ভারতের রাজধানীর ঠিকানা দিতে পারিনি, কিন্তু সম্বরণকে যেহেতু ভরতের অনুপমা রাজধানীটিই পুনদখল করে নিতে দেখছি, তখনই বুঝতে পারি যে, হস্তিনাপুর অঞ্চলটাই ভরতেরও রাজধানী ছিল—ভরতাধ্যুষিতং পূর্বং—যার নামকরণ শুধু সম্বরণের পিতা হস্তীর কৃতিত্ব।

রাজ্য দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই সম্বরণ বিভিন্ন জায়গায় বেশ কতগুলি যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। সামন্ত রাজারাও আবার সম্বরণের প্রভুত্ব মেনে তাঁকে কর দিতে আরম্ভ করলেন—পুনর্বলিভৃতশ্চৈব চক্রে সর্বমহীক্ষিতঃ। তবে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, সম্বরণ নিজের কৃতিত্বে অথবা সম্মিলিত রাজাদের কৃতিত্বেই যে নিজের রাজ্য দখল করতে পেরেছিলেন তা বোধহয় নয়। কারণ পাঞ্চালরাজ সুদাস নিজের রাজত্বের শেষদিকে রাজার কর্তব্য ভুলে, রাজনীতির শিক্ষা ভুলে প্রজাপীড়নে মত্ত হয়েছিলেন। মনু মহারাজ তাঁর সংহিতাগ্রন্থে বেশ কয়েকজন বোকা রাজার নাম করেছেন যাঁরা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি এবং দুর্বিনীত স্বভাবের ফলে নিজেদের রাজ্য পর্যন্ত খুইয়েছেন। মনু মহারাজের সেই নামের লিস্টিতে পৈজবন সুদাসেরও নাম আছে—সুদা পৈজবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।

আমরা ধারণা করি—কোনও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার ফলেই সুদাসের রাজ্যভ্রংশ ঘটেছিল, এবং সেই সুযোগে সম্বরণ আবার রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন—সুদাস নয়, হয়তো তাঁর ছেলে সহদেব অথবা নাতি পাঞ্চাল সোমকের সময় মহারাজ সম্বরণ তাঁর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কারণ এঁরা সবাই ছিলেন দুর্বল রাজা। হতেও পারে। পুরাণগুলিতে দেখছি—সুদাসের পাঞ্চাল বংশ দুর্বল হয়ে যাওয়ার সময়েই সোমকের রাজত্ব চলছিল—ক্ষীণে বংশে তু সোমকঃ। পাঞ্চালরা মহারাজ সম্বরণের সাধের হস্তিনাপুরী তচনচ করে দিয়ে যেভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন, এতদিন পরে অজমীঢ় বংশের প্রধান সম্বরণ তার শোধ তুললেন। আর শোধ তোলার অর্থ কিন্তু নিজের রাজ্যটুকু উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হওয়া নয়; সেকালের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পাঞ্চালদের নিজ রাজ্যে পর্যুদস্ত না করে সম্বরণের পক্ষে এই জয় লাভ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সুদাসের উত্তর পাঞ্চাল তখনকার মতো হস্তিনাপুরের অধিকারেই চলে এল।

আরও একটা সম্ভাবনার কথা বলি—মহাভারতের তথ্য অনুযায়ী হস্তিনাপুর হারানোর পর সম্বরণকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল স্ত্রী এবং পুত্রকেও নিয়ে—ততঃ সদারঃ সামাত্যঃ সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ। অনুমান করি, সম্বরণের এই পুত্রের জন্ম হয়েছিল বার বছরের সেই বিলাস-বিহারের কালেই, যখন তিনি হস্তিনাপুরীতে অনুপস্থিত ছিলেন। সম্বরণের এই পুত্রের

amarboi.com

কথা আমাদের সাড়ম্বরে জানাতে হবে, কারণ ইনি সেই সেই ভারতবিখ্যাত মহারাজ কুরু, যাঁর নামে ততোধিক বিখ্যাত কৌরব বংশ। পণ্ডিতদের অনুমান—পাঞ্চালরাজ সুদাস যখন হস্তিনাপুর আক্রমণ করেন, তখন তিনি বয়সে প্রবীণ এবং সম্বরণ তখন যুবক বয়সের রমণীর আমোদে প্রমত্ত। সম্বরণকে বহুকাল স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে এবং হয়তো পাঞ্চালরাজ সুদাস পৈজবনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র-পৌত্রদের কাছ থেকে তিনি নিজ রাজ্যের সঙ্গে পাঞ্চালও অধিকার করেন। কিন্তু এই রাজ্যোদ্ধারের কৃতিত্ব বোধহয় তাঁর একার নয়, এর মধ্যে তাঁর বীরপুত্র কুরুরাজের অবদান ছিল।

পাঞ্চালরাজ 'সাহ দেব্য' সোমক, যিনি সুদাসের নাতি ছিলেন তিনি একসময় যমুনার তীরে একটি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পাণ্ডবরা যখন বনপর্বে তীর্থযাত্রা করেছেন, তখন যমুনা নদীর একান্তস্থিত একটি পুণ্যস্থান দেখিয়ে লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—এই সেই যমুনা নদী, যেখানে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন সূর্যবংশীয় মান্ধাতা, যেখানে যজ্ঞ করেছিলেন সহদেবের পুত্র পাঞ্চালরাজ সোমক—সাহদেবিশ্চ কৌন্তেয় সোমকো দদতাং বরঃ। সন্দেহ নেই, সোমক এই যজ্ঞ করার সুযোগ পেয়েছিলেন সম্বরণ এবং তাঁর পুত্র কুরু পাঞ্চালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে। আমাদের ধারণা—সম্বরণ যে পুনরায় পাঞ্চালদের আক্রমণ করে পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তা প্রধানত তাঁর পুত্র কুরুর ভরসায়। তপতীর ঔরসজাত এই পুত্রটি যেমন বীর ছিলেন তেমনই উদ্যমী। হয়তো এই বীরপুত্রের উদ্যম লক্ষ্য করেই সম্বরণও নিজের প্রৌঢ় বয়সে পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে উদ্যমী হন।

রাজ্যলাভের পর সম্বরণ কিছু কিছু যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে প্রবল প্রতাপান্বিত কুরুর সম্বন্ধে অনুকূল আলোচনার পরিমণ্ডল তৈরি হতে থাকে। তাঁরা বৃদ্ধ সম্বরণের পরিবর্তে কুরুকেই সিংহাসনের অধিকারী দেখতে চান। সম্বরণ প্রজাদের এই উৎসাহ দমিত করেননি। প্রজাদের ইচ্ছাতেই শেষ পর্যন্ত কুরু হস্তিনাপুরের রাজা হলেন—রাজত্বে তং প্রজাঃ সর্বা ধর্মজ্ঞ ইতি বব্রিরে। প্রসিদ্ধ ভরতবংশের গৌরব রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে মহারাজ কুরু প্রথমেই রাজত্ব বিস্তারে মন দিলেন। তিনি তাঁর নিজের নামে একটি বসতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নাম হয় 'কুরুজাঙ্গল'—তস্য নাম্নাভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙ্গলম্।

'জাঙ্গল' শব্দটা শুনলে পরে মনে হয় যেন জায়গায় খুব জঙ্গল আছে। এমনকি হেমচন্দ্রের মতো প্রৌঢ়গৌড় ঐতিহাসিক লিখেছেন—Kurujangala, as its name implies, was probably the wild region of the Kuru realm that stretched from the Kamyaka forest on the banks of the Sarasvati to Khandava near (samipatah) the Jumna. তবে আমাদের ধারণা—কুরুজাঙ্গল-প্রদেশে জঙ্গল নিশ্চয় ছিল, এবং wild region বলতেও আমাদের তেমন কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু 'জাঙ্গল' শব্দটা যেহেতু একটা পারিভাষিক অর্থ আছে, তাই কুরুজাঙ্গলকে আমরা সেই অর্থেই ধরতে চাই। 'জাঙ্গল' শব্দের অর্থ যে জায়গায় জল বেশি দাঁড়ায় না, আবার ভীষণ সবুজ কোনও তৃণভূমিও সেটা নয়, যেখানে প্রচুর হাওয়া এবং রোদও প্রচুর—স্বল্পোদকতৃণো যস্তু প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ। স জ্ঞেয়ো জাঙ্গলো দেশঃ...।

এই পারিভাষিক অর্থ থেকে বুঝতে পারি, মহারাজ কুরু নিজের নামে অতিসুন্দর একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে প্রচুর হাওয়া এবং রোদ থাকায় একটি বিশাল বসতির পক্ষেও সে জায়গা খুব উপযুক্ত ছিল। মহাভারতে কুরুজাঙ্গল দেশটার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র দেশটাও

www.amarboi.com

কুরুরই নামাঙ্কিত হয়ে আছে এবং কুরুক্ষেত্র বোধহয় কুরুজাঙ্গল থেকে আলাদা। কেন না, মহাভারতে বলা হচ্ছে—মহারাজ কুরু অনেক তপস্যা করে বিশাল একটা জায়গাকে কুরুক্ষেত্র বলে পরিচিতি দেন—কুরুক্ষেত্রং স তপসা পুণ্যং চক্রে মহাতপাঃ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কুরুক্ষেত্রের সীমানাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা এইরকম—কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে খাণ্ডব বন, উত্তরদিকে তূর্ঘ্নবন আর পশ্চিমে পরীণ নদী (সিন্ধুনদের শাখা নদী)।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা এত কাঠ-কাঠ নয়। সেখানে এক মুনি বলে —কুরুক্ষেত্রে যে বাস করতে পায়, সে মনে করে আমি স্বর্গে আছি—যে বসন্তি কুরু ত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে। জায়গাটা কোথায়? সরস্বতী নদীর দক্ষিণে আর দৃষদ্বতী নদীর উত্তরে—এই হল কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রের আরেক নাম সমন্তপঞ্চক। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, কুরুক্ষেত্রের পুরো জায়গাটা জুড়ে আছে এখনকার থানেশ্বর, দিল্লি এবং গঙ্গার উর্ধ্বসীমার দোয়াব অঞ্চল। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে ক্ষুদ্র নদীগুলি, সেগুলোর নাম হল অরুণা (পেহোয়ার কাছে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিলেছে) অংশুমতী, হিরণ্বতী, কৌশিকী (রক্ষীর শাখা নদী) ইত্যাদি।

মহারাজ কুরু নিজের নামে দুটি দেশ সৃষ্টি করেও কিন্তু পৈতৃক রাজধানী ছেড়ে যাননি। তিনি হস্তিনাপুরেই থাকতেন। লক্ষণীয় ঘটনা হল, মহারাজ ভরতের আমলে হস্তিনাপুরের রাজা হিসেবে তিনি যে সার্বভৌমত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন, সে স্বাদ সম্বরণপুত্র কুরুরও অপ্রাপ্য রইল না। ওদিকে সরস্বতী দৃষদ্বতীর মধ্যস্থান থেকে এদিকে প্রায় প্রয়াগ পর্যন্ত এক বিশাল দেশের অধিপতি হয়ে মহারাজ কুরু শুধু তাঁর পূর্ববংশীয়দের মর্যাদাই রক্ষা করেননি, তাঁর সময় থেকে তাঁর রাজত্বাধীন সমগ্র দেশটার নাম হয়ে গেল কুরুরাষ্ট্র, এবং তাঁর বংশের সবার নাম হয়ে গেল কৌরব এবং এই নাম আমরা মহাভারতের শেষ পর্ব পর্যন্ত শুনব।

মহারাজ কুরু অনেক গৌরবের কাজ করলেন, অনেক কিছুই খুব ভাল হল বটে, কিন্তু পিতার সঙ্গে একাধারে পাঞ্চাল আক্রমণ করার সূত্র ধরে সেই যে একটা শত্রুতা তৈরি হল সে শত্রুতা কোনওদিন মেটেনি। কুরুরাজ খুব সম্ভবত উত্তর পাঞ্চাল অধিকার করে নিয়েছিলেন বলেই মনে হয় এবং সেই থেকে কৌরবদের সঙ্গে পাঞ্চালদের শত্রুতা এতটাই গভীরে চলে যায় যে—মহাভারতের মধ্যে এ কথা সদা-সর্বদা এই মর্মে উচ্চারিত হতে থাকে। কুরু আর পাঞ্চালদের কথা উঠলেই লোকে স্মরণ করে বলত—ওরে বাবা! ওদের তো আবার বিরাট ঝগড়া—বিবদমান দুই জাতি-গোষ্ঠীর নামই তো কৌরব আর পাঞ্চালরা—কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ জিগীষূণাং পরস্পরম্।

আগেই বলেছিলাম—পিতার সঙ্গে কুরুরাজ যখন পাঞ্চালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন সৃঞ্জয়, সুদাস—এই সব বিখ্যাত পাঞ্চাল রাজার কীর্তি লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সুদাসের নাতি সাহদেবি সোমক পাঞ্চালদের রাজা হয়ে কোনওমতে হয়তো রাজ্যের একাংশমাত্র টিকিয়ে রেখেছিলেন। সম্বরণের মতো তাঁকে পুরো রাজ্য হারিয়ে পালিয়ে যেতে হয়নি, এই যা। সোমক যে খুব বড় রাজা ছিলেন তা নয়, তবে পাঞ্চালদের জন্য তাঁর ভাবনা ছিল যথেষ্ট। পাঞ্চালদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাঞ্চালদের জোয়াল কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলেই সোমকের কথা প্রসঙ্গত বলতে গেলেই পৌরাণিকরা বলেন—পাঞ্চাল বংশের ক্ষীণ বা দুর্বল অবস্থায় সোমকের জন্ম—ক্ষীণে বংশে তু সোমকঃ।

নিজের জীবিত অবস্থায় নিজবংশের হীনবীর্য অবস্থা দেখে পাঞ্চাল সোমকের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সেকালের দিনে যা হত—বংশের প্রায় বিলুপ্তি অথবা ক্ষীণ অবস্থায় সংসারের

amarboi.com

পিতৃপুরুষেরা ভাবতেন—বাড়িতে যদি অনেক পুত্র জন্মায়, তবে কেউ না কেউ পুনরায় নিজের প্রযত্নে পূর্ব রাজমর্যাদা সমুদ্ধার করে বংশেরও পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবে। পাঞ্চাল-মহারাজ সোমকও বোধহয় সেই ভাবনাতেই ছিলেন। লুপ্ত-গৌরব ফিরিয়ে আনার উপায় অবশ্য তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল। প্রথম কথা হল—এক রাজ্যের রাজা হলেও সোমকের রাণী ছিল একশটি—তস্য ভার্যাশতং রাজন্ সদৃশীনামভূত্তদা। পৌরাণিকের অতিবাদে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা একশ নাই হোক, অন্তত বহু তো বটেই এবং তাঁরা সকলে ছিলেন সৃঞ্জয়-পাঞ্চাল বংশের উপযুক্ত বধূ।

সোমকের একশ রানী থাকা সত্ত্বেও তাঁর কোনও পুত্র ছিল না। দেখতে দেখতে রাজার বয়সও হয়ে গেল অনেক, তবু ঘরে তাঁর বংশধর কোনও পুত্র নেই। শেষ পর্যন্ত অনেক সাধ্য-সাধনা করে, অনেক ব্রত-হোম করে রাজার ঘরে—কদাচিৎ তস্য বৃদ্ধস্য ঘটমানস্য যত্নতঃ—রানীদের কোল আলো-করা একটি পুত্রের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল জন্তু। এই নাম অবশ্য আগেই দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না, তার কারণ পরে জানাচ্ছি।

এতদিন পর রাজার ঘরে পুত্র জন্মাল বটে, কিন্তু সে আরেক জ্বালা হল। একশ রানীর কোলে এক ছেলে। ব্যক্তিগত বাৎসল্যের নিম্নগামিনী ধারা, যা সব সময় স্বকীয় সন্তানের মধ্যেই বিশ্রান্তি লাভ করে, তার কোনও পুষ্টি হল না ব্যক্তিগতভাবে। একটি মাত্র ছেলে পেয়ে একশ রানীর প্রত্যেকেই তাকে নিয়ে থাকতে চান। ছেলে যদি এক জায়গায় বসে থাকে তো একশ রানী তাকে ঘিরে বসে থাকেন—তং জাতং মাতরঃ সর্বাঃ পরিবার্য্য সমাসতে। একশ রানীর সব আদর একজনের ওপর গিয়ে পড়ার ফলে, সেই শিশুর খাওয়া-দাওয়া, আহ্লাদ আর খেলার সরঞ্জাম নিয়ে একশ রানীই তার পিছনে ঘোরাফেরা করেন সব সময়—সততং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামভোগান্ বিশাম্পতে।

একটি শিশুকে যদি একশ রানীর উষ্ণ ক্রোড়ের মধ্যে রেখে সততই তাকে খাওয়ানো আর খেলানোর চেষ্টা করা হয়, তবে তারও জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। আসলে একটি শিশুর ভাল লাগা-না-লাগা নিয়ে একশ রানীর কোনও মাথা-ব্যথা নেই, তাঁদের চিন্তা শুধু নিজেদের ভাল-লাগা নিয়েই। সাধে কি আর উপনিষদে বলেছে—ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। একপুত্রকে ঘিরে শতরানীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন আবর্তিত হচ্ছে, তখনই এক উটকো বিপদ ঘটল। শিশুপুত্র একদিন মাটিতে বসে আছে হঠাৎই একটি পিঁপড়ে কামড়ে দিল তাকে। পিঁপড়ের কামড় খেয়েই আদুরে ছেলে তো চিৎকার করে কেঁদে উঠল, এবং সেটা বিচিত্র নয় কিছু। কচি চামড়ায় পিঁপড়ের কামড় তো শিশুর কাছে অসহ্যই বটে। কিন্তু তার চেয়েও অসহ্য হয়ে দাঁড়াল শিশুর কান্না ছাপিয়ে একশ রানীর চিৎকার—ততস্তা মাতরঃ সর্বাঃ প্রাক্রোশন্ ভৃশদুঃখিতা। তাঁরা শিশুপুত্রকে ঘিরে এমন ভাবে কাঁদতে থাকলেন যেন শিশুটির এমন-সেমন কিছু হয়ে গেছে।

একশ মায়ের আর্তনাদ এমন উচ্চগ্রামে পৌঁছল যে, সে শব্দ রাজবাড়ির অন্দরমহল অতিক্রম করে রাজসভায় রাজাসনে উপবিষ্ট, অমাত্য পরিষদ-পরিবৃত রাজা সোমকের কানে গিয়ে পৌঁছল—তমার্তনাদং সহসা শুশ্রাব স মহীপতিঃ। তিনি তাড়াতাড়ি সভা ভঙ্গ করে দিয়ে অন্দরমহলে এসে উপস্থিত হলেন—কী হল, কী হল—এই কথা বলতে বলতে—কিমেতদিতি পার্থিবঃ। অন্দরমহলের রুক্ষশুষ্ক দৌবারিক রাজাকে জানাল—মহারাজ! আপনার প্রিয় পুত্রকে পিঁপড়ে কামড়েছে, তাই রানীমায়েরা সব আর্তনাদ করছেন। রাজা অন্দরমহলে প্রবেশ করে

শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করলেন। শান্ত ছেলেকে রানীদের কোলে দিয়ে রাজা তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন সভাগৃহে।

রাজসভায় তখন মন্ত্রী-অমাত্যেরা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন, বসে আছেন পাঞ্চালদের প্রধান পুরোহিত যিনি অন্যতম মন্ত্রীও বটে। ছেলেকে একটি পিঁপড়ে কামড়েছে বলে এই আর্তনাদ—খবরটা এরকম করে সভার মধ্যে বলতে তাঁর সংকোচই লাগল। ক্ষত্রিয়ের ঘরের ছেলে, তাকে কত সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে চলতে হয়! তাকে কিনা একটি পিঁপড়ে কামড়েছে বলে তাঁর ক্ষত্রিয়াণী রানীরা সব মরণ-চিৎকার করছেন। প্রখর বাস্তববোধে প্রবীণ রাজা অমাত্য-পুরোহিত মহতী সভা আহ্বান করে বললেন—ধিক্কার দিচ্ছি মশাই! আমাকেই শত ধিক। এর থেকে আমার পুত্র না হওয়াও ভাল ছিল—ধিগস্তু একপুত্রত্বম্ অপুত্রত্বং বরং ভবেৎ—আমার এই এক ছেলে হওয়ার থেকে ছেলে না হওয়াও ভাল ছিল। পুত্র-লাভের জন্য দেখে দেখে কত পরীক্ষা করে আমি একশ'টা বিয়ে করে এনেছি। অথচ তাঁদের কোলে একটিও ছেলে পেলাম না আমি। যদি বা ভাগ্যবলে একটি ছেলে হল আমার, তো একশ রানী সবাই মিলে এমন আদর-যত্ন করছে তাকে যে, আমারই পাগল হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে—যতমানাসু সর্বাসু কিম্নু দুঃখমতঃ পরম্।

রাজা এবার দুঃখিত হয়ে অমাত্য-পুরোহিতকে উদ্দেশ করে বললেন—এদিকে আমার তো বয়স পেরিয়ে গেছে আর ওই একটি মাত্র ছেলে—সে যেন একশ রানীর প্রাণ। আপনারা এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে এই এক পুত্রের দুঃখ ঘুচিয়ে আমি একশ ছেলে পেতে পারি। ক্ষীণ পাঞ্চাল বংশের উত্তরাধিকারী সোমক একটি পিঁপড়ের কামড় থেকে উপলব্ধি করলেন—পিঁপড়ের কামড়েই এই! যদি এমন-তেমন কিছু হয়, তবে তো পাঞ্চালরাজ্যের কোনও উত্তরাধিকারীই থাকবে না। পূর্বের গৌরব উদ্ধার করা তো দূরের কথা। একটি মাত্র পুত্র হলে এক ছেলের আদর বাবা-মাকে কোন সুখস্বর্গে নিয়ে যায়—তা এই আধুনিক জগতে আমরা প্রতিপলেই উপলব্ধি করছি। পাঞ্চালরাজ সোমক একপুত্রের আদরে ধৈর্য হারিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কথার মাত্রা এক করে দিয়ে অমাত্য-পুরোহিতকে বলেছেন—এক ছেলে কোন পুণ্য নয়, সে শুধু শোকেরই কারণ—শোক এবৈকপুত্রতা—one child is sin.

পঞ্চাশ

পাঞ্চালরাজ সোমক বড় অসহায় বোধ করছিলেন। একমাত্র পুত্র সামান্য পিঁপড়ের কামড় খেলেই যদি তার একশ জননী মরণ-চিৎকার করে ওঠেন, তবে ক্ষত্রিয়ের ছেলে বড় হবে কী করে? অনেক অনুনয়-বিনয় করে ঋত্বিক্-পুরোহিতকে সোমক বললেন—আপনি এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে আমার একশটি পুত্র হয়। ভাল কাজ, মন্দ কাজ, এমন কি সে কাজ অসাধ্য হলেও আমি করব—মহতা লঘুনা বাপি কর্মণা দুষ্করণে বা। ঋত্বিক্ বললেন—উপায় যে একটা নেই, তা নয়। তবে তুমি কি সেটা পারবে? সোমক বললেন—কার্য হোক, অকার্য হোক, আপনি বলুন, আমি নিশ্চয় পারব। আপনি ধরে নিন—সে কাজ হয়েই গেছে—কৃতমেবেতি তদ্বিদ্ধি ভগবন্ প্রব্রবীতু মে!

রাজার আগ্রহ দেখে ঋত্বিক বললেন—যেভাবে আমরা পশুমেধ যজ্ঞ করি, সেইভাবে আপনার ওই একমাত্র পুত্রকেই যজ্ঞের পশু হিসেবে আমরা ব্যবহার করব। পুত্রটিকে বলি দিয়ে তার মেদ-বপা যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। তখন প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকবে। একশ রানী সেই ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করে শতপুত্রের অধিকারী হবেন—বপায়াং হূয়মানাং ধূমমাঘ্রায় মাতরঃ। ঋত্বিকরা বলে দিলেন—আপনার যে পুত্রটি আছে, সেই পুত্রই শত পুত্র হয়ে জন্মাবে। রাজা সম্মত হয়ে বললেন—আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন, আমি প্রস্তুত।

যজ্ঞ আরম্ভ হল। রানীরা তো কেউ সেই পুত্রকে ছাড়বেন না। তাঁরা যদি পুত্রের ডান হাত ধরে টানেন, তো ঋত্বিকরা ছেলের বাঁ হাত ধরে টানেন যজ্ঞস্থলের দিকে—

রুদন্ত্যঃ করুণং চাপি গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
সব্যে পাণৌ গৃহীত্বা তু যাজকো'পি স্ম কর্ষতি।।

রানীমাদের করুণ কান্না তুচ্ছ করেও ঋত্বিক-যাজকরা রাজার একমাত্র পুত্রকে বলি দিয়ে

যজ্ঞে আহুতি দিলেন। যজ্ঞের উদ্‌গীর্ণ ধূম আঘ্রাণ করে মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভসঞ্চার হল। গর্ভের কাল সম্পূর্ণ হলে তাঁদের প্রত্যেকের একটি করে পুত্র হল, যদিও পূর্বের সেই রাজপুত্র তাঁরই জননীর গর্ভে পুনরায় জন্ম নিলেন এবং তাঁর নাম হল জন্তু। একশ রানীমা তাঁদের নিজের কোলে পুত্র লাভ করলেও জন্তুর ওপর তাঁদের আগের ভালবাসাই ছিল, সেই ছেলেটি তাঁদের নিজেদের ছেলের থেকেও প্রিয়তর—স তাসামিষ্ট এবাসীৎ ন তথা তে নিজাঃ সুতাঃ।

মহাভারতে দেখছি—সোমকের যখন একটি পুত্র ছিল তখনও তাঁর নাম ছিল জন্তু। আমাদের তা মনে হয় না। সোমকের একমাত্র পুত্রকে পশুর মতো বলি দিয়ে পুত্র লাভ করেছিলেন বলেই পরে তাঁর নাম হয় জন্তু। ঋত্বিক পূর্বে বলেছিলেন—যজস্ব জন্তুনা রাজংস্ত্বং ময়া বিততে ক্রতৌ। নীলকণ্ঠ লিখেছেন—জন্তুনা পশুভূতেন—অর্থাৎ ছেলেটিকে জন্তুর মতো বলি দিতে হবে। আমাদের ধারণা—ছেলেটির সঙ্গে যজ্ঞীয় পশুর মতো ব্যবহার করা হয়েছিল বলেই রাজার ওই পুত্রের নাম জন্তু। আমরা অবশ্য অতিলৌকিকতার মধ্যে না গিয়ে বলতে চাই—পুত্রহীন মায়েরা যা করেন, সেইভাবেই একটি জন্তুর সঙ্গেই রানীমায়েরা পুত্র ব্যবহার করতেন। নইলে একটি রাজপুত্রের নাম 'জন্তু' হওয়া স্বাভাবিক নয়। যজ্ঞ করার জন্য হয়তো পুত্রস্নেহে পালিত সেই জন্তুটিকে বলি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম যে রানী সেই জন্তুটিকে লালন-পালন করেছিলেন, তাঁর পুত্রটি হয়তো জন্তু নামে পরিচিত হন এবং তিনি সব রানীর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

আমাদের ধারণা—সোমক বৃদ্ধ বয়সে অনেক যাগ-যজ্ঞ এবং পশুমেধ যজ্ঞ করে শেষ পর্যন্ত অনেক পুত্র লাভ করেন। ক্ষীণ পাঞ্চাল বংশে এত পুত্রের জনক হয়েই সোমক রাজা বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তবে এতক্ষণ জন্তুর সম্বন্ধে যা বললাম, তা সবই মহাভারতের বৃত্তান্ত অনুসারে। বস্তুত পুরাণগুলির মধ্যে জন্তুকে নিয়ে এত আদিখ্যেতা নেই। বায়ু, মৎস্য অথবা খিল-হরিবংশে কোথাও আমরা এমন খবর পাইনি যে সোমক রাজার পুত্র জন্তুকে বলি দিয়ে তাঁর একশ ছেলে হয়েছিল। যা পাই, তা হল—সোমকের একটি পুত্র এবং তাঁর নাম জন্তু। জন্তু মারা গেলে সোমকের একশটি পুত্র হয়—সোমকস্য সুতো জন্তু র্হতে তস্মিন্ শতং বভৌ। এই ঘটনা থেকে স্বাভাবিকভাবে মনে হয়—সোমকের একটিই পুত্র ছিল, এবং যেভাবেই হোক সে পুত্রটি মারা গেলে সোমক তাঁর একপুত্রতার জন্য মনে মনে অসম্ভব পীড়িত হন। তিনি ঘটনার প্রতিকার করেন বহুবিবাহের মাধ্যমে এবং বৃদ্ধ বয়সে অনেক সন্তানের জনক হন।

হরিবংশ অবশ্য এই পাঠ গ্রহণ করেনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে সোমকের পুত্রের নাম জন্তু এবং জন্তুরই একশটি পুত্র হয়—সোমক'স্য সুতো জন্তু র্যস্য পুত্রশতং বভৌ। আমরা অবশ্য মহাভারতে জন্তুর সম্বন্ধে বিশদ বৃত্তান্তটি বিবেচনা করে বায়ু-মৎস্যের নীরস তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ সোমকের একমাত্র পুত্রসন্তান জন্তু অল্প বয়সেই স্বর্গত হন। ক্ষীণ পাঞ্চাল বংশের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে সোমক একেবারেই ভেঙে পড়েন এবং ঋত্বিক-পুরোহিতের কাছে তিনি নিজের বৃদ্ধ বয়সের কথা বলে সুপরামর্শ চান। ঋত্বিকরা যাগ-যজ্ঞ করেন এবং সেই যাগ-যজ্ঞ সদ্যোমৃত জন্তুর মেদ-বপার দ্বারাও সম্পন্ন হয়ে থাকতে পারে। এর পরের সম্ভাব্য ঘটনা হল—সোমক অনেক বিবাহ করে অনেক পুত্র লাভ করেন।

আশ্চর্য ঘটনা হল—এই শত পুত্রের কনিষ্ঠ পুত্রটি যিনি, তিনি হলেন আমাদের অতিপরিচিত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পিতা, যাঁর নাম পৃষত—তেষাং যবীয়ান্ পৃষতো দ্রুপদস্য

amarboi.com

পিতা প্রভুঃ। পরিষ্কার কথা হল—জন্তু সোমকের সবার বড় ছেলে আর পৃষত সর্বকনিষ্ঠ। এই যে হঠাৎ করে একশ ছেলের একটি তালিকা দেখিয়ে পৃষতকে নিয়ে আসা হল—এর মধ্যে একটু গরমিল আছে বই কি। এত শীঘ্র দ্রুপদের পিতা পৃষতকে পেয়ে গেলে ওদিকে কুরুবংশের পুত্র-পরম্পরার সঙ্গে মিলবে না। পণ্ডিতেরা তাই সন্দেহ করেন—সোমকের পরেই পাঞ্চাল বংশ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং there was also a long gap between Jantu and Prisata, during which Panchala was dominated by Hastinapura.

এটা তো আমরা আগেই দেখেছি যে, সম্বরণ রাজা পুত্রের সঙ্গে হস্তিনাপুর পুনরুদ্ধার করার সময়েই পঞ্চাল অধিকার করে ফেলেছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ সোমনস্‌স জাতকেও উত্তর-পাঞ্চাল নগরকে কুরুরাষ্ট্রের (কুরুরঠ্‌ঠ) মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে। হয়তো পাঞ্চাল রাজ্যে কুরুদের এই অধিকার চলেছিল জন্তু থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠ সেই পৃষত পর্যন্ত। পৃষত এই জন্যই কনিষ্ঠ, যেহেতু তিনিই হয়তো পাঞ্চাল রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাও হয়তো কুরুবংশের অখ্যাত রাজাদের আমলে।

পাঞ্চালবংশে জন্তু থেকে পৃষত পর্যন্ত যেমন একটা শূন্যতা আছে একইভাবে কুরুবংশেও মহারাজ কুরুর পরে কতগুলি অখ্যাত রাজা আছেন। সেইসব রাজার সংখ্যা পুরাণ এবং মহাভারতের তালিকা অনুযায়ী অন্তত দশ থেকে পনেরজন। কুরুবংশের এই অখ্যাত রাজাদের নাম এখানে আমরা স্মরণ করছি না, কিন্তু সঙ্গে এটাও আমাদের বলতে হবে যে, এঁদের আমলে হস্তিনাপুর, কুরুজাঙ্গল বা কুরুক্ষেত্র—কোনওটাই হাতছাড়া হয়ে যায়নি। কিন্তু এই বংশে আর বিশিষ্ট কোনও রাজা না জন্মানোর ফলে কুরুর নামে এই বংশধারা চলছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে পরীক্ষিৎ, জনমেজয়—এইসব রাজার নাম আপনারা শুনতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন—সমনামের আরও কয়েকজন রাজা মহারাজ কুরুর পর হস্তিনাপুর শাসন করে গেছেন। এঁদের মধ্যে একজন—ভীমসেনও আছেন। লক্ষণীয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের নামকরণ করা হয়েছিল ক্ষীণ বা পরিক্ষীণ বংশের উত্তরাধিকারী রক্ষার অন্বর্থ-কল্পনায়। আমাদের জিজ্ঞাসা—মহারাজ কুরুর অব্যবহিত পরেই যে পরীক্ষিৎকে আমরা পাই, তিনি কি ভরত অথবা কুরু মহারাজের সুনাম বজায় রাখতে পারেননি বলেই পরীক্ষিৎ নামে অভিহিত হয়েছিলেন? যাই হোক, কুরুর পর পারীক্ষিৎ-জনমেজয়, সার্বভৌম-মহাভৌম, দেবাতিথি-দিলীপদের মতো অখ্যাত কুরুবংশীয়দের একটা ধারা শেষ হবার পরেই আমরা যাঁকে পাচ্ছি, তিনি হলেন মহারাজ প্রতীপ—যিনি মহামতি ভীষ্মের পিতামহ।

পাঞ্চালরাজ্যে মহারাজ জন্তুর অন্তত দশ-বারো পুরুষ পরে আমরা দ্রুপদপিতা পৃষতকে অধিষ্ঠিত দেখেছি। সমান্তরালভাবে কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরে মহারাজ প্রতীপকেও আমরা অধিষ্ঠিত দেখলাম। কিন্তু এবারে আমাদের একটু মথুরায় যেতে হয়। আমরা যাদব-হৈহয়দের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। মহারাজ যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর গৌরবে এতক্ষণ ধরে শুধু পৌরববংশের মূল ধারায় দুষ্যন্ত, ভরত, সম্বরণ, কুরু—এঁদেরই ইতিহাস কীর্তন করলাম। কিন্তু যাদবদের কথা আর বলাই হয়নি। যাদবদের কথা বলতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে বিশ্রুত-কীর্তি শশবিন্দু অথবা কার্তবীর্য-অর্জুনের কথা বলেছি, তালজঙ্ঘ অথবা বীতিহোত্র (বীতহব্য) কথাও বলেছি। কিন্তু খুব সংক্ষেপে বললেও আরও দু-চারজনের কথা না বললে কুরু-পাঞ্চালদের সঙ্গে তাঁদের 'ইন্টার‍্যাকশন' দেখাতে পারব না—এটা একটা কথা। দ্বিতীয়

AMARBOI.COM

কথা, যাদবরা দু-চারটে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজেদের নামে বা পুত্রের নামে—সেগুলো ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ভীষণ মূল্যবান।

আমরা এর আগে যাদবদের সাধারণ আবাসস্থান মথুরার নাম করেছি, শূরসেনের নামও করেছি। কার্তবীর্য-অর্জুনের দুটি পুত্রের নাম শূর এবং শূরসেন হওয়ায় আমরা অনুমান করেছিলাম যে, তাঁর নাম থেকেই হয়তো শূরসেন নামে জায়গাটার উৎপত্তি এবং মেগাস্থিনিস হয়তো 'শূরসেনাই' বলতে ওই জায়গাটাই বুঝিয়েছেন। এখন কিন্তু আমরা একটা বিকল্প সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করব—যাতে মথুরা এবং শূরসেনের নামকরণের নতুন ইতিহাস জানা যেতে পারে। তবে মথুরার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো দেশের জন্মকথা আমাদের বলে নিতে হবে কেন না ওই দেশ দুটিও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আমরা আবার সেই যযাতিপুত্র যদু থেকে আরম্ভ করছি না। শুধু এইটুকু বলি—যদুর পুত্র ক্রোষ্টুর বংশে শশবিন্দু যেমন জন্মেছিলেন, তেমনই বহু পরবর্তীকালে সেই বংশে ভগবান বলে চিহ্নিত নামক বিখ্যাত পুরুষটিও জন্মেছিলেন। আমরা এই বংশের মাঝামাঝি একটা জায়গায় জ্যামঘ বলে এক রাজার নাম পাব। জ্যামঘ ছিলেন পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মধ্যম। তাঁর দুই দাদার প্রথমজন রাজা হয়ে তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। জ্যামঘ বনে চলে যেতে বাধ্য হন এবং একটি আশ্রমে বাস করতে আরম্ভ করেন—তাভ্যাং প্রব্রাজিতো রাজ্যাজ্-জ্যামঘো'বসদাশ্রমে। বনবাসী ব্রাহ্মণেরা জ্যামঘকে নানা পৌরুষের কার্যে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজের শক্তিতে বিশ্বস্ত হয়ে জ্যামঘ একটি নতুন রাজ্য জয় করেন। নর্মদা নদী পেরিয়ে এই রাজ্য। তার নাম মৃত্তিকাবতী—নর্মদাকূলমেকাকী নগরীং মৃত্তিকাবতীম্।

নর্মদার পাড়ে মৃত্তিকাবতী নগরীর মধ্যে আবার একটা রাজপুরী তৈরি করলেন জ্যামঘ। তার নাম দিলেন শুক্তিমতী। ভালই চলছিল। জ্যামঘের স্ত্রীর নাম ছিল শৈব্যা, কোনও পুরাণ-মতে চিত্রা। এই শৈব্যার গায়ে যেমন শক্তি ছিল, তেমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। আর বয়সও বোধ হয় তাঁর জ্যামঘের থেকে বেশি ছিল—শৈব্যা বলবতী ভৃশম্/শৈব্যা পরিণতা সতী। পত্নীর ভয়ে জ্যামঘ সেকালের স্বর্ণযুগেও দ্বিতীয় একটি বিবাহ করতে পারেননি; এমন কি তাঁর একটিও পুত্র ছিল না, কিন্তু সেই বাহানাতেও রাজা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারেননি—অপুত্রো'পি স বৈ রাজা ভার্যামন্যাং ন বিন্দতি।

যাই হোক, জ্যামঘ একবার নিজের রাজ্য ছেড়ে আরও দক্ষিণ দিকে রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। রাজ্য জয়ের পর শত্রু রাজ্যের একটি অতি সুন্দরী কন্যা তাঁর হস্তগত হল। কন্যাটি যে আর্যগোষ্ঠীর কেউ নন, সেটা তাঁর নাম থেকেই বোঝা যায়। কন্যার নাম উপদানবী। জ্যামঘ রাজ্যজয় করে সেই কন্যাকে রথে চড়িয়ে স্বদেশে ফিরলেন বটে, তবে স্ত্রী শৈব্যার সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চটকা ভেঙে গেল। স্ত্রীর ভয়ে জ্যামঘ বললেন—দেখ, দেখ। তোমার ছেলের বউ নিয়ে এসেছি কেমন, দেখ।

মাথাই নেই তার মাথাব্যথা। রাজার কোনও ছেলেই নেই, তার ছেলের বউ! শৈব্যা বললেন—এই কন্যাটি কার ছেলের বউ, তোমার কি মাথা খারাপ হল—এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্দেবী কস্য চেয়ং স্নুষেতি বৈ। জ্যামঘ জোর দিয়ে বললেন—তোমার যে পুত্র হবে, এ কন্যা তারই বউ হবে। রাজার মনের জোর আর সেই উপদানবী কন্যার ভাগ্য—শেষ পর্যন্ত জ্যামঘর একটি ছেলে হল। রাজা পুত্রের নাম দিলেন বিদর্ভ। হয়তো নতুন যে রাজ্য জয় করেছিলেন জ্যামঘ, সেই রাজ্যের নামেই পুত্রের নাম রাখেন তিনি, নয়তো পুত্রের নামেই সেই নতুন রাজ্যের নাম

দেন বিদর্ভ। বিদর্ভের থেকে বয়সে অনেক বড় সেই উপদানবীর সঙ্গেই কিন্তু বিদর্ভের বিয়ে হল এবং তাঁদের তিনটি পুত্র জন্মাল। তাঁদের নাম হল ক্রথ, কৌশিক এবং লোমপাদ।

আমরা আগেই বলেছি—বিদর্ভ দেশে যাদবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই হল সেই প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ভবিষ্যতে বিদর্ভ দেশটাকে আমাদের প্রয়োজন হবে—মহামতি কৃষ্ণ এই রাজ্যে বিবাহ করতে আসবেন, আমরা তাই নগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে রাখলাম। বিদর্ভের প্রথম পুত্র ক্রথ বোধহয় স্বদেশে অর্থাৎ বিদর্ভেই রাজা হন এবং সেই কারণেই পুরাণাদিতে তাঁকে—ক্রথো বিদর্ভপুত্রস্তু—বলে বিদর্ভেই তাঁর অধিষ্ঠান নির্ণীত হয়েছে। কিন্তু বিদর্ভের দ্বিতীয় পুত্র কৌশিক (কৈশিক) বোধহয় অন্য একটি রাজ্য জয় করেন এবং নিজ পুত্রের নামে সেই দেশের নাম রাখেন চিদি। এই চিদি রাজ্যে পরবর্তীকালে শিশুপাল জন্মাবেন এবং বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হবেন। ক্রথ এবং কৌশিকের অনেক অনেক পুরুষ পরে কৃষ্ণের জন্ম হবে ঠিকই, কিন্তু এই দুই রাজা বিদর্ভ রাজ্য এবং চেদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কারণেই এত বিখ্যাত হয়েছিলেন যে, চৈতন্যদেবের পরম পার্ষদ রূপ গোস্বামী তাঁর ললিতমাধব নামক নাটকে রুক্মিনীর বিবাহের প্রসঙ্গে এই ক্রথ-কৌশিককে চরিত্র হিসাবে আমদানি করেছেন। ইতিহাসের 'অ্যানাক্রনিজম' দেশকালের কতটা বিপর্যয় ঘটাতে পারে, এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই জ্যামঘর কথা বললাম, তাঁর সাত-আট পুরুষ পরেই যদুবংশে মধু নামে এক রাজার উৎপত্তি ঘটে এবং এই মধু নামের রহস্য থেকেই মধুরা বা মথুরা নামের উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন যে, ইক্ষ্বাকু বংশের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করছেন, তখন ভীম সাত্বত রাজা হয়েছেন যাদবদের। রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে অনেক পুরাণেই দেখা যাবে—রামচন্দ্রের ভাই শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয় করার সময় মাধব লবণকে বধ করে মধুবনে গিয়ে মথুরা পুরী স্থাপন করেন—মাধবং লবণং হত্বা গত্বা মধুবনঞ্চ তৎ।

'মাধব লবণ' বলতে কেউ বলেছেন—মধুর ছেলে লবণ, আবার কোনও কোনও পুরাণ-কাহিনীতে, এমন কি রামায়ণেও লবণ একজন দানব অথবা দৈত্য। হরিবংশের বক্তব্য—যমুনার তীরে বহুজনপদযুক্তা মথুরা-নগরীর মধ্যেই মধুবন নামে এক ভীষণ বন ছিল এবং লবণ নামে এক দানব বাস করত সেই মহাবনে—ঘোরং মধুবনং নাম যত্রাসৌ ন্যবসৎ পুরা। সন্দেহ নেই—মহাবন হলেই সেখানে দৈত্য-দানবের অধিবাস, অথবা কেউ যদি দানব নামেই পরিচিত হন তবে তাঁকে বনেই থাকতে হবে—এই পুরা-কল্পনা থেকেই লবণ আর মধুবনের সৃষ্টি। তবে পণ্ডিতরা মনে করেন—অযোধ্যায় রামচন্দ্র যখন রাজত্ব করছেন, তখন মথুরা অঞ্চলে—হয়তো তখনও মথুরার নাম মথুরা হয়নি—মথুরা অঞ্চলে রাজত্ব করছেন ভীম সাত্বত, যাঁকে মধুবংশীয় মাধব বলা হত। মধু নামে একজন যাদব রাজা অবশ্যই ছিলেন এবং তিনি যদুবংশজাত সত্বান্ রাজার ঊর্ধ্ব-পুরুষ ছিলেন। হরিবংশ জানিয়েছে—মধু রাজা এতই ভাল মানুষ ছিলেন এবং তিনি এমনই মিষ্টি কথা বলতেন যে, পিতৃপরম্পরায় তাঁর নাম দেবক্ষত্রি হওয়া সত্ত্বেও লোকে তাঁকে মধু বলেই ডাকত। হয়তো এত জনপ্রিয় ছিলেন বলেই তাঁর নামে যাদবরা একসময় মাধব নামে পরিচিত হতে থাকবেন—মধূনাং বংশকৃদ্ রাজা মধু-র্মধুরবাগপি—এবং পরবর্তীকালে এই বংশের অলংকার হিসেবেই কৃষ্ণের এক নাম হয়তো মাধব।

আমাদের ধারণা—জনপ্রিয়তার জন্য যদুবংশীয় দেবক্ষত্রির নাম যেমন মধু হয়ে গেল,

AMARBOI.COM

তেমনই নিজের নামেই তিনি একটি অসাধারণ সুন্দর কাননভূমির নাম রেখেছিলেন মধুবন। রামায়ণে কিংবা অন্যান্য পুরাণে মাধব লবণ—অর্থাৎ মধুবংশীয় লবণ নামে যে তথাকথিত দানবের নাম পাচ্ছি—সে একটা কথার কথা। বাস্তবে মধুবংশীয়দের মধ্যে লবণ নামে কেউ ছিলেন না। লক্ষণীয় বিষয় হল—আমাদের পূর্বোক্ত মধু অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশীয়া একটি রমণীকেই বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রের নাম সত্ত্বান্—ঐক্ষ্বাকী চাভবদ্‌ভার্যা সত্ত্বাংস্তস্যামজায়ত। সত্ত্বান্ এতই বিখ্যাত এবং এতই তিনি গুণবান যে তাঁর নামেই যদুবংশের ধারা পুনর্গঠিক হয় সাত্ত্বত-বংশ নামে। পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন—মাধব লবণ নয়, মাধব—অর্থাৎ মধুর পুত্র সত্ত্বান্‌ই কোনও সময় রামচন্দ্রের ছোটভাই শত্রুঘ্ন কর্তৃক পরাজিত হন এবং তিনিই মধুবন কাটিয়ে নতুন একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করেন—ছিত্ত্বা বনং তৎ সৌমিত্রি র্নিবেশং সো'ভ্যরোচয়ৎ। এই উচ্ছিন্ন বনভূমিতেই শেষ পর্যন্ত মথুরা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন রাম-কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন—তস্মিন মধুবন-স্থানে মথুরা নাম সা পুরী। মথুরা পুরী পূর্বে 'মধুরা' নামেই বিখ্যাত ছিল কিন্তু লোকমুখের অপভ্রংশে মধুর স্মৃতি লুপ্ত হয়ে মধুরা মথুরায় পরিণত হয়।

ইক্ষ্বাকুবংশের পরম কীর্তিমান পুরুষ রামচন্দ্র যখন লীলা সম্বরণ করেন, তখন অযোধ্যার মূল রাজ্যভূমির উত্তরাধিকার পান তাঁরই পুত্র কুশ। শত্রুঘ্নের দুই পুত্র সুবাহু এবং শূরসেন রাজ্য পান পিতার অধিকৃত মথুরায়—সুবাহুঃ শূরসেনশ্চ শত্রুঘ্নসাহিতাবুভৌ। পালয়ামাসতুঃ সুতৌ বৈদেহ্যৌ মথুরাং পুরীম্।। শত্রুঘ্নের পুত্র শূরসেনের নাম থেকেই হয়তো মথুরা অঞ্চলের নাম হয় শূরসেন, মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকায় যার পরিচয় 'শূরসেনাই'।

পণ্ডিতেরা মধুপুরীতে শত্রুঘ্নের অধিকার লক্ষ্য করে যে অনুমানই করুন, আমরা ইতিহাস-পুরাণে কোথাও এমন খবর পাইনি যে, মধুরপুত্র সত্ত্বান্ একবারও তাঁর রাজ্য হারিয়েছিলেন; অথবা কোনও সময়ে তাঁকে রাজ্য পুনরুদ্ধারও করতেও হয়েছে—সে খবরও আমরা পাইনি। পুনশ্চ যদুবংশীয় মধুর সঙ্গে যেহেতু একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয়ার পরিণয় ঘটেছিল; সেই হেতু তাঁরই পুত্র সত্ত্বানের রাজ্য হারানোর কথাটা মোটেই অনুমানযোগ্য নয়, আদরণীয়ও নয়। আমরা তাই কার্তবীর্য অর্জুনের দুই পুত্র শূর এবং শূরসেনের নামেই শূরসেন অঞ্চলের প্রসিদ্ধি অনুমান করি এবং মধুর নাম থেকেই মধুরা বা মথুরা। শত্রুঘ্ন হয়তো মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চলে লবন নামে কোনও অনার্য গোষ্ঠীর নেতাকে পরাভূত করেছিলেন এবং বন কেটে তাঁকে নতুন বসতি গড়তে হয়েছিল। অন্যথায় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে লবনকে কোনওভাবেই সত্ত্বান্ বলে প্রমাণ করা বড়ই কঠিন।

যাই হোক, মথুরাপুরীতে এই যে সত্ত্বান্ বা সত্ত্বত নামে যে যাদব রাজার নাম পেলাম, ইনি একদিক দিয়ে যযাতি বা অজমীঢ়ের মতোই বিখ্যাত। কারণ এঁরই পুত্র-পরম্পরায় পরবর্তীকালে মহামতি কৃষ্ণ, অক্রূর অথবা মহাভারত-খ্যাত কৃতবর্মা, সত্যভামা—এমন কি কংসও জন্মাবেন। কৃষ্ণকে ডাকা হবে সত্ত্বতবংশের স্বামী বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে—ভগবান্ সাত্ত্বতাং পতিঃ।

সত্ত্বান্ বা সত্ত্বতের সঙ্গে কোশল দেশের এক রমণীর বিবাহ হয়, যাঁর নাম আমরা জানি না। তাঁকে শুধু কৌশল্যা বলেই জানি। কৌশল্যার গর্ভে সত্ত্বতের সাত ছেলে—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ এবং বৃষ্ণি। এঁদের মধ্যে সবাই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা নয়। তবে আগেই আমরা জানিয়েছি যে, সত্ত্বতের দ্বিতীয় পুত্র ভজমানের সঙ্গে পাঞ্চাল-রাজ সৃঞ্জয়ের দুই মেয়ে বাহ্যকা এবং উপবাহ্যকার বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁদের পুত্রেরা খুব একটা কেউ বিখ্যাত নন। সত্ত্বতের এই সাত ছেলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন অন্ধক এবং বৃষ্ণি।

amarboi.com

কৃষ্ণকে পরে অন্ধক এবং বৃষ্ণির উত্তরপুরুষরূপে কল্পনা করা হবে। সত্ত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক—এঁরা সবাই কিন্তু সমভাবে ভোজ নামে পরিচিত।

পুরাণকারেরা অন্ধক-বৃষ্ণির সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুব তাড়াতাড়ি কৃষ্ণের পিতামহ, শ্বশুর এবং মাতামহের কাছাকাছি নামগুলিতে চলে এসেছেন কিন্তু অন্ধক-বৃষ্ণির বড় দাদা ভজমান পাঞ্চালরাজ সৃঞ্জয়ের সমসাময়িক হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি—বৃষ্ণি-অন্ধকদের বংশতালিকায় মাঝে মাঝে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। সে যাই হোক, আমরা তো আর নতুন নাম সৃষ্টি করে সে তালিকা পূরণ করতে পারব না। তাই অন্ধক-বৃষ্ণিবংশের দু-চারজন বিখ্যাত পুরুষের নাম করেই আমরা সেই জায়গায় চলে আসব যেখানে সমান্তরালভাবে কুরুবংশের শান্তনুর পিতা মহারাজ প্রতীপকে পাব অথবা পাঞ্চালবংশে দ্রুপদপিতা মহারাজ পৃষতকে পাব।

সাত্ত্বতবংশে অন্ধকের বিখ্যাত পুত্রটির নাম হল কুকুর। ভগবান কৃষ্ণকে মহাভারতের মধ্যে সত্ত্বত-অন্ধকের সঙ্গে একযোগে কুকুর-বংশীয় বলেও ডাকা হয়েছে। এই কুকুর থেকে পৌরাণিক মতে আট-দশ পুরুষ পরে অথবা আধুনিক গবেষকের মতে অন্তত পনের/ষোল পুরুষ পরে জন্মান অভিজিৎ বলে এক রাজা। অভিজিতের একটি কন্যা এবং একটি পুত্র। তাঁদের নাম আহুক আর আহুকী। এই আহুকই হলেন মথুরার অত্যাচারী রাজা কংসের পিতামহ। আমরা যেহেতু আহুকের নাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বোক্ত কুরু-পাঞ্চালবংশীয় প্রতীপ এবং পৃষতের সম-সময়ে পৌঁছলাম, তাই এরপর থেকে আমাদের নতুন পর্ব শুরু করতে হবে।

একান্ন

যাঁরা দিন-রাত ব্যাকরণের কচ্‌কচি নিয়ে সময় কাটান, লোকে তাঁদের রুক্ষ-শুষ্ক মানুষ বলে ভাবেন। কিন্তু পাণিনি-ব্যাকরণের ওপর মহাভাষ্য রচনা করে খ্রিস্টপূর্ব দেড়শ শতাব্দীতে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই পতঞ্জলির রসবোধ নেই— এ কথা বোধ করি কেউ বলবেন না। অব্যয়ীভাব সমাসের একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে পতঞ্জলি লিখলেন—অনুগঙ্গং হস্তিনাপুরম্। অর্থাৎ গঙ্গার তীরেই হস্তিনাপুর। ইতিহাসের রসবোধ যাঁদের আছে, তাঁরা বুঝবেন যে, হস্তিনাপুর শহরটা গঙ্গা নদীর সঙ্গে এমনভাবেই জড়িত যে গঙ্গাকে বাদ দিয়ে হস্তিনাপুরের অস্তিত্বই যেন কল্পনা করা যায় না। আর ঠিক এই কারণেই গঙ্গাকে আমরা সুন্দরী এক রমণীর রূপ ধরে হস্তিনাপুরের রাজার কাছে সমাগত দেখতে পাচ্ছি।

মহাকাব্যের ইতিহাসে এমন উদাহরণ কিছু বিচিত্র নয়। জলবাহিনী নদী যে দেশের শোভা এবং শস্য বর্ধন করে সেই দেশের রাজার সঙ্গে তার প্রণয়-পরিণয়ের সম্পর্ক মহাকাব্যে খুব পরিচিত। মথুরা-বৃন্দাবনে যমুনার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কও একই রকম। একটু আগে আমরা যদুবংশীয় সত্ত্বান্ রাজার কথা বলেছি। তাঁরই এক পুত্র হলেন দেবাবৃধ। তিনি বোধহয় এখনকার রাজস্থানের দেওলি-সওয়াই-মধোপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। এইসব জায়গায় তখন যাদবদেরই বাস ছিল। দেবাবৃধের রাজ্য ঠিক ঠিক পর্ণাশা নদীর ওপর। পর্ণাশা এখনকার বনসা। হরিবংশে দেখছি দেবাবৃধ সর্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র কামনা করে তপস্যা আরম্ভ করলেন এবং তপস্যার সময় সারাক্ষণ তিনি পর্ণাশা নদীর জল স্পর্শ করে রইলেন— সংযুজ্যাত্মনমেবং তু পর্ণাশায়া জলং স্পৃশন্।

দেশের রাজার এমন একাগ্র মনের স্পর্শ সদোপস্পৃশতস্তস্য তরঙ্গ-ভঙ্গ-শোভিনী কোন নদী-রমণী সইতে পারে? রাজা দেবাবৃধের সর্বগুণসম্পন্ন পুত্রের জন্ম দেবার জন্য পর্ণাশা

নিজেই গর্ভধারণ করবেন বলে স্থির করলেন। কুমারীর বেশে সুন্দরী নদী-রমণী পর্ণাশা রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে কামনা করলেন। রাজা দেবাবৃধও তাঁকে দেখে মোহিত হলেন—বরয়ামাস নৃপতিং তামিয়েষ চ প্রভুঃ।

পর্ণাশা গর্ভে যে মহান পুত্রের জন্ম হল— সেটা আমাদের কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হল— নদীর এই রমণীরূপ ধারণ। যদি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন, তো ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যদি আমারই মতো কুতার্কিক হন, তাহলে একটা কথা বলার আছে। আমাদের ধারণা— পুরাণে-ইতিহাসে নদীর রমণীরূপ ধারণ করার মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এইসব ক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীলা কোনও সুন্দরী রমণীই এই তাৎপর্যের বিষয়। নদীর জলস্পর্শ করে বসে থাকা অথবা নদীর ধারে বসে আছেন রাজা, আর ঠিক এই সময়ে সুন্দরী রমণীর রূপ পরিগ্রহ করে নদী এসে রাজার পাণি প্রার্থনা করছেন— এর একটাই মানে। এমনই এক সুন্দরীর সঙ্গে রাজার দেখা হয়েছে যাঁর জাতি-কুল-মান জানা নেই অথচ রমণী সুন্দরী। মোহিত রাজার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই। আর রমণীর নাম নদীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে পর্ণাশা হতেই পারে অথবা হতেই পারে গঙ্গা।

হস্তিনাপুরের রাজা প্রতীপ। ভরত-কুরুবংশের শেষ জাতক। তিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন গঙ্গাদ্বারে গঙ্গার ধারে। মন্ত্র জপ করছেন, স্নান-আহ্নিক করছেন আর গঙ্গার শোভা দেখছেন—নিষসাদ সমা বহ্বীর্গঙ্গাদ্বারগতো জপন্। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে— মহারাজ প্রতীপ এখন রাজধানীতে নেই। তিনি গঙ্গার তীরবর্তী নির্জন কোন প্রদেশে এসে অস্থায়ী বাসা বেঁধেছেন এবং সেখানে আছেনও বহুকাল— সমা বহ্বীঃ। এই সময়েই একদিন গঙ্গা-নদীরূপিণী গঙ্গা— রাজার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে মনোহরা রমণীর রূপ ধারণ করে উঠে এলেন নদীর মধ্য থেকে— উত্তীর্য্য সলিলাত্তস্মাল্লোভনীয়তমাকৃতিঃ।

সংস্কৃত কাব্য এবং অলংকারগ্রন্থগুলিতে নদীর সঙ্গে রমণীদেহের তুলনা করে মহাকবিরা অতি উপভোগ্য রসসৃষ্টি করেছেন। নানা বিভঙ্গে রমণীর চলা-হাসা এবং নৃত্যের সঙ্গে নদীর সাযুজ্য কল্পনা করে মহাকবিরা শেষ পর্যন্ত নদীর তরঙ্গকে রমণীর উচ্ছল চুম্বনদায়ী ওষ্ঠের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। আর কালিদাস তো উপলব্যথিত গতি বেত্রবতীর নাভিদেশ পর্যন্ত আবিষ্কার করে মেঘদূতের পাঠককে এক কল্পনার জগতে পৌঁছে দিয়েছেন। কাজেই মনোহারিণী চঞ্চলা নদীর সঙ্গে উচ্ছল স্বভাবের রমণীর কোনও তফাত নেই। গঙ্গা তো এতই উচ্ছল যে, তিনি বিনাবাক্যে একটুও ভণিতা না করে মহারাজ প্রতীপের শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুর ওপর এসে বসে পড়লেন—দক্ষিণং শালসঙ্কাশম্ উরুং ভেজে শুভাননা।

মহারাজ প্রতীপ একটু গম্ভীর হলেন। আমাদের ধারণা তাঁর একটু বয়সও হয়েছে। একটি যুবক পুরুষের মতো রমণীর স্পর্শে তিনি বিচলিত হলেন না। বললেন— কল্যাণী। (সম্বোধনটা খেয়াল করবেন) কী করতে পারি তোমার জন্য, কী তোমার ইচ্ছে, খুলে বলো দেখি— করোমি কিন্নু কল্যাণি প্রিয়ং যত্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতম্। রমণী নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন— তুমি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমি তোমাকে আমার ঈপ্সিততম নায়ক হিসেবে পেতে চাই। আর তুমি তো জান— কোনও রমণী যদি নিজেই মিলনেচ্ছা প্রকাশ করে, তাকে অবহেলা করাটা কত খারাপ কাজ। প্রতীপ বললেন— তোমাকে ভাল লাগছে বলেই আমি পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হব, অসবর্ণা এক রমণীকে বিবাহ করে বসব— এ আমি করতে পারি না। তাতে অধর্ম হবে, কল্যাণী— ন চাসবর্ণাং কল্যাণি ধর্ম্ম্যং তদ্ধি ব্রতং চ মে।

মাত্র দুটি শব্দ, মহারাজ প্রতীপের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে মাত্র দুটি শব্দ— 'পরস্ত্রী' এবং 'অসবর্ণা'— এই শব্দ দুটো শুনলেই স্পষ্ট বোঝা যায়— এই গঙ্গা কোনও নদীও নন, কোনও অলৌকিক দেবীও নন। রমণী সাধারণী, জাতি-কুলের মাত্রায় তাঁর কিছু হীনতাও আছে যা হস্তিনাপুরের রাজা কুরুবংশের অলংকার মহারাজ প্রতীপকে মানায় না। তাছাড়া গৃহে তাঁর স্ত্রী বর্তমান। পরম দয়ালু শিবি রাজা যে বংশে জন্মেছিলেন, সেই বংশের মেয়ে সুনন্দার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে কতকাল। আজকে তাঁর এই প্রৌঢ় বয়সে অজ্ঞাতকুলশীলা এক নারী হঠাৎ করে তাঁর দক্ষিণ উরু স্পর্শ করে বিবাহের প্রস্তাব করায় প্রতীপ একেবারে অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রত্যাখ্যানের উপায় এখানে ওই দুটি মাত্র শব্দ— 'পরস্ত্রী' এবং 'অসবর্ণা'। পরস্ত্রী বলতে পরের বউ না বুঝিয়ে পরের মেয়েও বোঝাতে পারে— এমন কথা আমরা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পড়েছি। কিন্তু এখানে পরস্ত্রী বলতে প্রতীপ যদি পরের মেয়েও বোঝেন, সেখানেও 'কার না কার মেয়ে'— এমন একটা তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয়েছে, আর সেটা খুব ভালই প্রমাণ হয়ে যায় অসবর্ণা কথাটার মধ্যেই।

রাজার মুখে এমন প্রত্যাখ্যান শুনেই রমণী সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন—কেন আমি কি দেখতে এতই খারাপ! কোনও দুর্লক্ষণও তো নেই আমার শরীরে—উঁচু কপাল, কী চুল নেই, কী গায়ের লোমগুলো পুরুষ মানুষের মতো— এসব তো আমার কিছুই নেই। আর অসবর্ণা বলে আমি কি অগম্যা হলাম নাকি? অমন কথা বোলো না, রাজা— নাশ্রেয়স্যাস্মি নাগম্যা ন বক্তব্যা চ কর্হিচিৎ। জেনে রেখ— আমি রীতিমত স্বর্গীয়া এক রমণী, আর পরস্ত্রী কিসের, আমি রীতিমত কুমারী। সবচেয়ে বড় কথা—আমি তোমাকে চাইছি, অতএব তুমিও আমাকে চাইবে— ভজন্তীং ভজ মাং রাজন্ দিব্যাং কন্যাং বরস্ত্রিয়ম্।

রমণী সুন্দরী, অতএব স্বর্গীয়া তো বটেই। আর যেভাবে সে নাছোড়বান্দা হয়ে মহারাজ প্রতীপের দক্ষিণ উরুখানি স্পর্শ করে বসেছে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন। প্রতীপ তাঁর গম্ভীরতা বজায় রেখেও একটু প্রশ্রয় দিয়ে বললেন— আমার ভাল লাগার জন্য যে কাজ তুমি করতে বলছ, ভাল লাগার সেই বয়স আমি পার করে এসেছি— মমাতিবৃত্তমেতত্তু যন্মাং চোদয়সি প্রিয়ম্। তোমার পথ এখন একরকম, আমার অন্যরকম। এখন যদি তোমাকে আমি বিয়ে করে বসি, সে বড় অধর্ম হবে। সে হয় না। মহারাজ প্রতীপ রমণীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য একটু কৌশল করে বললেন— তুমি আমার কাছে এসেই আমার ডান উরুখানি জড়িয়ে ধরে বসেছ। এই ডান উরুটি কাদের বসার জায়গা জান? আত্মজ পুত্র আর পুত্রবধূদের আদর করে বসাতে হয় ডান উরুতে— অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ ভীরু বিদ্ধ্যেতদ্ আসনম্। আর তুমি কিনা আমার কাছে এসেই বোকার মতো প্রেমিকার যোগ্য আমার বাম উরুটি বাদ দিয়ে বসলে গিয়ে আমার দক্ষিণ উরুতে। কাজেই এখন তো আর কোনও উপায় নেই। আমি আর তোমার সঙ্গে সকাম ব্যবহার করতে পারি না। সে বড় অধর্ম হবে।

আমরা আগেই বলেছিলাম— মহারাজ প্রতীপের বয়স হয়েছে। তিনি আর যুবকটি নেই। তবু কিনা এই নির্জন গঙ্গার তীরে এক অসামান্যা রূপবতী রমণীকে সম্পূর্ণ নিরাশ করতে তাঁর ইচ্ছে হল না। তিনি বুঝলেন— কুরুবংশের মহারাজকে রমণীর বড় পছন্দ হয়েছে, রাজার চটক রমণীকে মোহিত করেছে। প্রতীপ তাই প্রশ্রয় দিয়ে বললেন— তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হতে চাও, তবে আমি তোমাকে সেই সম্মান দিতে পারি। আমার দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করে তুমি আমার পুত্রবধূর স্নেহ লাভ করেছ জেনো। অতএব আমার পুত্রের জন্য আমি তোমাকে

amarboi.com

বরণ করছি, কন্যে— স্নুষা মে ভব কল্যাণি পুত্রার্থং তাং বৃণোম্যহম্।

রমণী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েই বললেন— তবে তাই হোক, মহারাজ। আমি তোমার পুত্রের সঙ্গেই মিলিত হব। তোমাকে দেখেই আমি মনে মনে কেবলই ভেবেছি— আমি প্রখ্যাত ভরত-বংশের কুলবধূ হব— ত্বদ্‌ভক্ত্যা তু ভজিষ্যামি প্রখ্যাতং ভরতং কুলম্। রমণীর কথা শুনে বোঝা যায়— নির্জন গঙ্গার তীরে প্রৌঢ় মহারাজ প্রতীপের ভাব-গম্ভীর আচরণ দেখে তিনি শুধু মুগ্ধই হননি, তাঁর ইচ্ছে শুধু ভরতবংশের কুলবধূ হবার। রমণী এবার তুমি থেকে 'আপনি'তে চলে গেলেন। সোচ্চারে বললেন— পৃথিবীতে যত রাজা আছেন, আপনারা হলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনাদের গুণের কথা একশ বছর ধরে গান গাইলেও শেষ হবে না। পূর্বে যাঁরা আপনাদের বংশজাত, তাঁরা সব মহান ব্যক্তি। আপনি যখন আপনার পুত্রের হয়ে কথা দিলেন, আশা করি, তিনি তা ফেলবেন না, অন্য কোনও বিচারও করবেন না— তৎ সর্বমেব পুত্রস্তে ন মীমাংসেত কর্হিচিৎ। হয়তো এই মহান ভরত-বংশের গৌরবেই সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করে এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী প্রায় বৃদ্ধ এক রাজার দক্ষিণ উরু জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপাতত তাঁর সংকট সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু মহারাজ প্রতীপ ভরতবংশের বধূমর্যাদা প্রার্থিনীর কাছে পুত্রকে বাগ্‌দত্ত করে রাখলেন।

এই ঘটনার পর মহাভারতের কবির কাহিনী খানিকটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কবি বলেছেন—তারপরে মহারাজ, প্রতীপ পুত্রের জন্য সস্ত্রীক তপস্যা আরম্ভ করলেন এবং তাঁর পুত্র জন্মাল— যাঁর নাম শান্তনু। শান্তনু যখন বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন মহারাজ প্রতীপ তাঁকে সেই অপরিচিতা রমণীর কথা বলে তাঁকে বিয়ে করার কথা বললেন।

আমাদের কাছে এই উপাখ্যান তত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কেন, সে কথা খুলেই বলি। আপনারা জানেন— শান্তনু এবং গঙ্গার মিলনের পিছনে আরও একটা কাহিনী আছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ মহাভিষ নাকি এক সময় দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন. নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাও সেখানে পৌঁছেছিলেন অন্য কোনও কারণে। ব্রহ্মার সঙ্গে কথোপকথনের সময় গঙ্গার আবরণ-বস্ত্রখানি হাওয়ায় উড়ে গেলে দেবতারা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করেন কিন্তু মহাভিষ রাজা— কী করবেন, মানুষের স্বভাব তো— তিনি নাকি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন অসংবৃতা গঙ্গার দিকে— মহাভিষস্তু রাজর্ষিরশঙ্কো দৃষ্টবান্ নদীম্। ব্রহ্মা তখন মহাভিষ রাজাকে অভিশাপ দেন যে, তিনি মর্ত্যলোকে জন্মাবেন। মহাভিষ রাজা অনেক চিন্তা করে কুরুবংশীয় মহারাজ প্রতীপের ছেলে হয়েই জন্মাবেন ঠিক করলেন। ওদিকে গঙ্গা মহাভিষ রাজার ধৈর্যচ্যুতি দেখে, তাঁরই কথা চিন্তা করতে করতে স্বস্থানে ফিরে গেলেন— তমেব মনসা ধ্যায়ন্ত্যপাবর্তৎ সরিদ্বরা।

আমরা কিন্তু অভিশপ্ত ঘটনার মধ্যেই মহারাজ শান্তনুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কাছে অভিশপ্ত মহাভিষ রাজা বা পরবর্তীকালে গঙ্গার গর্ভজাত অষ্টবসুর সলিল-সমাধি, কোনওটাই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হল— তথাকথিত গঙ্গার সঙ্গে যখন শান্তনুর প্রথম দর্শন বা মিলন হয়, তখনও তিনি রাজা হননি বলেই মনে হয়। অন্যদিকে মহারাজ প্রতীপের সঙ্গে যখন গঙ্গার দেখা হয় তখনও শান্তনুর জন্ম হয়নি— এটাও ঘটনা নয়। আসল কথা হল— শান্তনু তখন অবশ্যই জন্মেছেন এবং সেই অজ্ঞাতকুলশীলা সেই রমণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। কোনও ব্রহ্মলোকে নয়, এই মর্ত্যলোকেই হয়তো দেখা হয়েছে। শান্তনু তখনও রাজা হননি। ইক্ষ্বাকুবংশীয় অভিশপ্ত মহাভিষের সেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা

সোজাসুজি শান্তনুরই কাজ। নির্জন গঙ্গার তীরে অজ্ঞাতকুলশীলা সেই রমণী ভরতবংশের এক প্রসিদ্ধ জাতককে এই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তখনকার মতো লজ্জা পেয়েছিলেন। কিন্তু রমণী নিজেও শান্তনুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় একদিন লজ্জা ত্যাগ করে শান্তনুর পিতা মহারাজ প্রতীপের দক্ষিণ পাখানি জড়িয়ে ধরেছিলেন।

এটা তাঁর বোকামি নয়, বুদ্ধি। প্রতীপ সস্নেহে সেই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঘরে এসে যৌবনপ্রাপ্ত কুমার শান্তনুকে বলেছেন—শান্তনু! একটি পরম সুন্দরী রমণী যদি কোনওদিন তোমার কাছে প্রণয়প্রার্থিনী হয়ে তোমাকে কামনা করে,— ত্বমাব্রজেদ্ যদি রহঃ সা পুত্র বরবর্ণিনী— তবে তুমি যেন তাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। তাকে যেন তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না— তুমি কে, কার মেয়ে— ইত্যাদি। আমার আদেশে তুমি সেই অনুরক্তা রমণীর ইচ্ছাপূরণ কোরো সে যা করতে চায়, বাধা দিও না তাকে। মহারাজ প্রতীপ তাঁকে এই কথা বলে শান্তনুকে নিজের রাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে চলে গেলেন— স্বে চ রাজ্যে'ভিষিচ্যৈনং বনং রাজা বিবেশ হ।

মহাভারতের কবি ভারতবর্ষের প্রাণপ্রদায়িণী গঙ্গাকে ভরতবংশের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নানা কাহিনীর নিবেশ ঘটিয়ে আমাদের কী বিপদেই না ফেলেছেন। বস্তুত মহারাজ শান্তনুর রাজা হওয়ার মধ্যেও একটা বড় ঘটনা আছে। অপরিচিতা রমণীকে গঙ্গার মাহাত্ম্য দান করতে গিয়ে কবি সে কথা এখনও বলতেই পারেননি। তাঁকে সে ঘটনা উল্লেখ করতে হয়েছে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে গিয়ে। আমরা সেটা বলে নিয়ে আবারও গঙ্গার কথায় আসব। মহারাজ প্রতীপের তিন পুত্র— প্রথম পুত্রের নাম দেবাপি, দ্বিতীয় শান্তনু, তৃতীয় হলেন বাহ্লীক। নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপিরই রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু রাজা হওয়া তাঁর হল না। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে যখন পাণ্ডব-কৌরবের যুদ্ধোদ্যোগ শুরু হয়েছে, তখন কৃষ্ণ শান্তির বাণী বহন করে কৌরব-সভায় এলেন। সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী— সবাই মিলে দুর্যোধনকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পাননি অঙ্গহীনতার জন্য। সেই কারণে কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুর রাজ্যের উত্তরাধিকার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রে বর্তায় না। সবার কথা শেষ হলে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র নিজেই নিজের অধিকার খর্ব করে দুর্যোধনকে বেঝালেন। আর ঠিক এই সময়েই প্রতীপের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপির কথা এল।

মহাভারতের আদিপর্বে যেখানে আমরা কুরুবংশের পরম্পরা দেখেছি, সেখানে দেবাপি সবার বড় ছেলে, শান্তনু মেজ ছেলে এবং বাহ্লীক সবার ছোট। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বয়ানে দেখছি— দেবাপি ঠিক আছেন, কিন্তু বাহ্লীক মেজ এবং শান্তনু সবার ছোট। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বুঝিয়ে বললেন—আমার পিতার পিতামহ যিনি, সেই মহারাজ প্রতীপ কি কম বড় মানুষ ছিলেন নাকি। অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি শাস্ত্র সব তাঁর জানা। রাজা হিসেবে নাম-ডাকও তাঁর কম ছিল না—প্রতীপঃ পৃথিবীপাল-স্ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতঃ। তাঁর তিন পুত্র— দেবাপি, বাহ্লীক এবং শান্তনু—যিনি আমার পিতামহ— তৃতীয় শান্তনুস্তাত ধৃতিমান্ মে পিতামহঃ। ধৃতরাষ্ট্র প্রতীপের পুত্রদের কথা বলে বিশেষভাবে দেবাপির পরিচয় দিচ্ছেন— আমার জ্যেষ্ঠ পিতামহ দেবাপি ছিলেন মহাশক্তিধর পুরুষ এবং রাজা হবার পক্ষে সত্তম ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর দেহে চর্মরোগ ছিল, ত্বকের দোষ তাঁর সমস্ত শরীরে বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল—দেবাপিস্তু মহাতেজা ত্বগ্‌দোষী রাজসত্তমঃ।

ধৃতরাষ্ট্রর তথ্য বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে— হস্তিনাপুরের জনপদবাসীরা দেবাপিকে বেশ পছন্দই

করতেন, ত্বকের দোষ থাকা সত্ত্বেও পুরবাসীরা তাঁকে যথেষ্ট আদর-যত্নও করতেন— পৌর-জানপদানাঞ্চ সম্মতঃ সাধুসৎকৃতঃ। মানুষ হিসেবে দেবাপি ছিলেন অতি চমৎকার— ধার্মিক, সত্যবাদী, পিতার সমস্ত ইচ্ছাপূরণে আগ্রহী একটি পুত্র। রাজ্যের ছোট ছোট বাচ্চা থেকে বুড়ো মানুষটি পর্যন্ত তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। সমস্ত মানুষের প্রতি দেবাপিরও বড় দয়া। সবার যাতে ভাল হয় সে জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না—বদান্যঃ সত্যসন্ধশ্চ সর্বভূতহিতে রতঃ। ছোট ভাই বাহ্লীক এবং শান্তনুর সঙ্গেও তাঁর কোনও বিরোধ নেই। তাঁরাও দেবাপিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন— সৌভ্রাত্রঞ্চ পরং তেষাং সহিতানাং মহাত্মনাম্।

সকলের পছন্দসই এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই মহারাজ প্রতীপ রাজ্য দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি বুড়ো হয়েছেন, আজ আছেন কাল নেই—কালস্য পর্যায়ে বৃদ্ধো নৃপতিসত্তমঃ— অতএব জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপির রাজ-অভিষেকের জন্য শুভ সময় দেখে তিনি শাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত উপকরণ এবং অভিষেক-সম্ভার যোগাড় করতে বললেন রাজ-কর্মচারীদের—সম্ভারান্ অভিষেকার্থং কারয়ামাস যত্নতঃ। শুভ দিনে দেবাপির অভিষেকের মঙ্গলকার্যও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঠিক এই সময়ে রাজ্যের ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা, বৃদ্ধরা, পুর-জনপদবাসীদের সঙ্গে নিয়ে মহারাজ প্রতীপকে দেবাপির পুণ্য-অভিষেক-কার্য থেকে বিরত হতে বললেন—সর্বে নিবারয়ামাসু-র্দেবাপেরভিষেচনম্। কারণ সেই ত্বকের দোষ, চর্মরোগ। অবালবৃদ্ধ জনসাধারণ সবাই দেবাপিকে ভালবাসলেও দেবাপির চর্মদোষ যে তাঁর রাজকার্য পরিচালনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে—এই যুক্তিতেই সকলে মহারাজ প্রতীপকে দেবাপির অভিষেককার্য সম্পন্ন করতে নিষেধ করলেন।

দেবাপির ত্বগ্‌দোষ হয়তো খুব সাধারণ নয়। তবে তা যে প্রাচীন ভয়ঙ্কর সেই কুষ্ঠরোগও নয়, তা আমরা হলফ করে বলতে পারি। কারণ কুষ্ঠ-রোগ মহাভারতের কালেও খুব অস্পৃশ্য এবং ঘৃণ্য ছিল। ঠিক ওরকমটি হলে দেবাপি আবালবৃদ্ধ সকলের তত প্রিয় হতেন না— সর্বেষাং বালবৃদ্ধানাং দেবাপি-র্হৃদয়ঙ্গমঃ। কিন্তু কুষ্ঠ না হলেও ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধরা নানা সন্দেহে দেবাপিকে নিজেদের রাজা হিসেবে চাইলেন না। কারণ রাজা যদি প্রথম দর্শনেই পৌর-জনপদের কাছে ঘৃণ্য হয়ে ওঠেন, তবে সে রাজা প্রজাসাধারণের গ্রহণীয় হন না। আর রাজার কাছে প্রজারাই তাঁর দেবতা। তাঁরা পছন্দ না করলে সে রাজার মূল্য কী— হীনাঙ্গং পৃথিবীপালং নাভিনন্দতি দেবতাঃ।

প্রজাদের দিক থেকে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল। কিন্তু হঠাৎ এই সর্বত্র উচ্চার্য্যমান অভিষেক-কার্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপির মনের অবস্থা হল শোচনীয়। মহারাজ প্রতীপের চোখে নেমে এল অশ্রুর ধারা। প্রাণপ্রিয় পুত্র রাজ্য লাভ করল না দেখে প্রতীপ অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন। নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে শোকক্লিষ্ট পিতাকে তিনি মুক্তি দিলেন নিজে ত্যাগ স্বীকার করে। দেবাপি রাজভবন ছেড়ে মুনিবৃত্তি গ্রহণ করে বনে চলে গেলেন। ত্বগ্‌দোষের জন্য রাজ্য না পেলেও মুনি হিসেবে দেবাপির সফলতার অন্ত নেই। মহাভারতে দেখছি— যখন তিনি বনে প্রস্থান করেন তখন তাঁর বয়স খুবই কম— দেবাপিঃ খলু বাল এবারণ্যং বিবেশ। কিন্তু প্রায় বালক বয়সে বনে গিয়েও দেবাপি ঋষি-মুনির তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তপস্যার বীর্যে তিনি শেষ পর্যন্ত দেবতাদের আচার্য নিযুক্ত হন— উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ।

বৈদিক গ্রন্থ বৃহদ্দেবতা এবং নিরুক্তে বলা হয়েছে— দেবাপিকে প্রায় অবৈধভাবে অতিক্রম করে শান্তনু যে রাজা হয়েছিলেন, তাতে একভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল শান্তনুকে।

শান্তনুর রাজ্যে বার বছর বৃষ্টি না হওয়ায় তাঁর রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়। ঘটনাটা সবিস্তারে বলা হয়েছে বিষ্ণুপুরাণে। অনাবৃষ্টির প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় মহারাজ শান্তনু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা ডেকে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন— মহাশয়েরা! আমার রাজ্যে বৃষ্টি হচ্ছে না কেন? এখানে আমার অপরাধটা কী? ব্রাহ্মণরা বললেন— মহারাজ! এ রাজ্য আপনার বড় ভাইয়ের প্রাপ্য ছিল। তাঁর রাজ্য আপনি ভোগ করছেন। এ তো অনেকটা বিবাহবিধির মত— বড় ভাইয়ের বিয়ে হল না, ছোট ভাই আগেই বিয়ে করে বসল— এ তো সেইরকম— অগ্রজস্য তে'র্হেয়ম্ অবনিস্ত্বয়া ভুজ্যতে, পরিবেত্তা ত্বম্।

ব্রাহ্মণদের এই বাক্য থেকে বোঝা যায়— দেবাপির চর্মদোষ যাই থাক, তা অন্তত কুষ্ঠরোগ ছিল না। রাজার কাছে পৃথিবীও অনেকটা ভোগ্যা স্ত্রীর মতো। বড় ভাইয়ের বিয়ে হওয়ার আগেই কনিষ্ঠের বিয়ে হলে একটা বড় অন্যায় হয় বলে ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন। যে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠের এই দোষ হয় না, তা হল— বড় ভাই যদি জন্মান্ধ বধির বা মূক হন— জাতান্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে। শান্তনুজ্যেষ্ঠ দেবাপি অন্ধ, বধির কিংবা মূক নন। অথচ তিনি রাজ্য পাননি। আরও আশ্চর্য, চর্মদোষের জন্য তাঁর আসন্ন অভিষেক নিবারিত হয়েছে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই, এখন সেই ব্রাহ্মণরাই আবার বলছেন—এটা তোমার অন্যায়। বড় ভাইয়ের রাজ্য তুমি ভোগ করছ।

বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী থেকে ধারণা হয়—দেবাপির আসন্ন অভিষেক নিবারণ করার ব্যাপারে শান্তনুর কোনও হাত ছিল না তো? পূর্বতন ব্রাহ্মণদের তিনিই উত্তেজিত করেননি তো? এখন শান্তনু বিপদে পড়েছেন, এখন রাজসভার মন্ত্রণালয়ে দেবাপির পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাও মুখ খুলেছেন। শান্তনু জিজ্ঞাসা করলেন— তাহলে এখন কী করা যায়? আমার কর্তব্য কী? ব্রাহ্মণরা বললেন— যতক্ষণ না দেবাপির পাতিত্য-দোষ ঘটছে, ততক্ষণ এ রাজ্য তাঁর। অতএব আপনি আপনার রাজ্যাধিকার ত্যাগ করুন। দেবাপিকে বন থেকে ডেকে এনে এই রাজ্য তাঁকেই দিয়ে দিন— তদ্ অলমেতেন। তস্য অর্হং রাজ্যং.... তস্মৈ দীয়তাম্।

পাতিত্য-দোষ মানে পতিত হওয়া। সে যেমন অন্ধতা, বধিরতা বা মূকতার জন্যও একজন রাজার পাতিত্য ঘটতে পারে, তেমনই তিনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজের সদাচার ছেড়ে বেদবিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তবে সে রাজা অবশ্যই পতিত হবেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যাচ্ছে—মন্ত্রিসভার আলোচনা শ্রবণমাত্রেই রাজার প্রধানমন্ত্রী—অশ্মসারী তাঁর নাম— তিনি কত বেদচার-সদাচার বিরোধী মানুষকে দেবাপির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের কাজ হল—বেদোক্ত যজ্ঞ-দান, ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ কথা বলে দেবাপিকে প্রায় নাস্তিকের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া— মন্ত্রিপ্রবরেণ অশ্মসারিণা তত্রারণ্যে তপস্বিনে বেদবাদবিরোধ-বক্তারঃ প্রযোজিতাঃ। এই লোকগুলি নাকি সরলমতি দেবাপিকে নানাভাবে বুঝিয়ে বেদবিরোধী করে তুলল।

এদিকে মহারাজ শান্তনু ব্রাহ্মণদের তিরস্কারে দুঃখিত হয়ে সেই ব্রাহ্মণদের নিয়েই বনের পথে চললেন দেবাপির কাছে। জ্যেষ্ঠ দেবাপিকে তিনি পৈতৃক রাজ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। দেবাপির কাছে পৌঁছে ব্রাহ্মণেরা তাঁকে অগ্রজের অধিকার স্বীকার করতে বললেন। উত্তরে দেবাপি নাকি বেদাচারবিরুদ্ধ নানা কথায় উত্তেজিত করে তুললেন সমাগত ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের। ব্রাহ্মণেরা তখন শান্তনুকেই বললেন— অনেক হয়েছে, মহারাজ! একে আর বেশি কিছু বলে লাভ নেই— আগচ্ছ ভো রাজন্! অলমত্রাতিনির্বন্ধেন। এ লোকটা একেবারে পতিত হয়ে গেছে। শান্তনু রাজ্যে ফিরে এলেন এবং তাঁর পূর্বোক্ত দোষমুক্তি ঘটায় রাজ্যে সুবৃষ্টি হল।

বিষ্ণুপুরাণে দেবাপির বিরুদ্ধে যেভাবে ষড়যন্ত্র ঘটিয়ে তাঁর পাতিত্য-দোষ ঘটানো হল—

এর মধ্যে আর কিছু না হোক মহারাজ শান্তনুর কিছু দায় থেকে যায়। যে মানুষটি হস্তস্পৃষ্ট রাজমুকুট মাটিতে নামিয়ে রেখে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন, তিনি দু-পাটি বদ লোকের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বৈদিক বিধি লঙ্ঘন করবেন— এ ঘটনা তত আদরণীয় নয়। বিষ্ণুপুরাণের ঘটনায় শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, জ্যেষ্ঠকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে শান্তনুর কিছু হাত থাকতে পারে। উপরন্তু মেজভাই বাহ্লীকই বা কেন মাতুল রাজ্যে চলে যাবেন, দেবাপির পরে তাঁরই তো রাজা হওয়ার কথা। আর তিনি কোনও এলেবেলে লোক ছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের নিজের ভাষায়—বাপ-ভাই ছেড়ে তিনি মাতুল রাজ্যে চলে গেলেও রাজ্যশাসনে তিনি পরম ঋদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

বৃহদ্দেবতা বা নিরুক্তের মতো প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানকার বক্তব্য শুনলে মনে হয় দেবাপির মুনিবৃত্তি, ত্যাগ-বৈরাগ্যে শান্তনু খানিকটা অনুতপ্ত হয়েই তাঁকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে যান। অনাবৃষ্টির অজুহাতটা অবশ্যই ছিল। দেবাপিকে বন থেকে নিয়ে এসে শান্তনু তাঁকে অনেক মান্যি করে নিজের রাজ্যটাই তাঁকে সমর্পণ করেন। দেবাপি অবশ্যই রাজ্য গ্রহণ করেননি, শুধু তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৌরোহিত্য স্বীকার করেন। সবচেয়ে বড় ঘটনা— ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একখানি সূক্ত (১০,৯৮) এই দেবাপির রচনা। খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি— শান্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করার জন্য উদ্যোগী হয়ে বৃষ্টি-উৎপাদনকারী দেবস্তব রচনা করেছিলেন গানের দ্বারা— যদ্ দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।... বৃষ্টিবনিং রবাণঃ...। লক্ষণীয় ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের সম্পূর্ণ একখানি সূক্তই দেবাপির রচনা (ঋগ্‌বেদ ১০.৯৮)। এমন একটি মানুষ বিষ্ণুপুরাণে বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলছেন— এটা অবিশ্বাস্য। কবিস্বভাব এই মানুষটিকে প্রজাদের অতি প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও শুধু এক চর্মরোগের জন্য রাজ্য হারাতে হয়েছিল— প্রিয়ঃ প্রজানামপি স ত্বগ্‌দোষেণ প্রদূষিতঃ— এবং সেটা হয়তো অন্যায়ভাবেই। এমনকি শান্তনুর সামান্য ষড়যন্ত্রেও সেটা ঘটে থাকতে পারে। অন্তত বিষ্ণুপুরাণ দেখলে তাই মনে হয়।

যাই হোক, মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি, দেবাপি রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে মেজ ভাই বাহ্লীকও পিতার রাজ্য স্বীকার করলেন না। সেটা অবশ্য বড় দাদার প্রতি কোনও সমব্যথায় নয়। তিনি তাঁর মামার রাজ্য পেয়েছিলেন কোনও কারণে—বাহ্লীকো মাতুলকুলং ত্যক্ত্বা রাজ্যং সমাশ্রিতঃ। বাপ-ভাইদের ছেড়ে গেলেও তাঁর অবশ্য সমৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কনিষ্ঠ শান্তনুকে তিনি স্বেচ্ছায় রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং সমস্ত সময়েই ভাইয়ের রাজ্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পিতা প্রতীপ স্বর্গত হলে মেজ দাদা বাহ্লীকের অনুমতি নিয়ে শান্তনু রাজা হয়ে বসলেন হস্তিনাপুরে— বাহ্লীকেন ত্বনুজ্ঞাতঃ শান্তনু লোকবিশ্রুতঃ।

শান্তনুর সম্বন্ধে তাঁরই সময়ে একটি প্রবাদ তৈরি হয়েছিল, যে প্রবাদ লোক-পরম্পরায় বাহিত হয়ে পৌরাণিক কালে একটি শ্লোকে পরিণত হয়েছিল। সেই প্রবাদের ভাষায়— শান্তনু যদি তাঁর দুই হাত দিয়ে একটি বৃদ্ধ লোককেও স্পর্শ করতেন, তবে তার বৃদ্ধজনোচিত জরাজীর্ণ ভাবটি মুহূর্তের মধ্যে চলে যেত। তিনি যুবক হয়ে যেতেন এবং এই যৌবনের নবায়ন তাঁর হস্তস্পর্শেই সংঘটিত হত বলে লোকে তাঁকে শান্তনু বলে ডাকত— পুনর্যুবা চ ভবতি তস্মাত্তং শান্তনুং বিদুঃ। আসল কথা—শান্তনু বোধহয় একটি বুড়ো মানুষের মধ্যেও সেই উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারতেন— যাতে করে একটি বৃদ্ধও যুবক-জনের মতো ব্যবহার করতেন।

AMARBOI.COM

বাহান্ন

মহারাজ ভরতের বংশে, অথবা আরও আগে থেকে যদি বলি, তবে বলতে হবে মহারাজ যযাতির বংশে কনিষ্ঠের রাজ্য-প্রাপ্তি কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। অপিচ রাজা হিসেবে শান্তনু যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ প্রতীপ শম-দম সাধন করে শান্তনুকে পুত্র হিসেবে লাভ করেছিলেন বলেই যেমন তার নাম শান্তনু—শান্তস্য জজ্ঞে সন্তানস্তস্মাদাসীৎ স শান্তনুঃ—তেমনই বৃদ্ধ মানুষও যাঁর স্পর্শে যুবকের উদ্দীপনা লাভ করতেন, সে শান্তনু রাজা হিসেবে যে যথেষ্ট সফল ছিলেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জ্যেষ্ঠ দেবাপি বা মধ্যম বাহ্লীক রাজ্য না পাওয়ায় মহারাজ প্রতীপের অন্তরে যদি বা কোন দুঃখ থেকেও থাকে, মহাভারতের কবি সে কথা স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করেননি। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলা সেই রমণীকে প্রতীপ যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা আদেশের অক্ষরে লেখা ছিল শান্তনুর মনে। শান্তনুর মনে ছিল—পিতাঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—পরমা সুন্দরী এক রমণী তোমার কাছে বিবাহের যাচনা নিয়ে আসবে। তুমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরো না, এমনকি সে যা করতে চায় তাতে বাধাও দিও না। আমার আদেশে তুমি সেই অনুরক্তা রমণীর ইচ্ছা পূরণ কোরো—মন্নিযোগাদ্ ভজন্তীং তাং ভজেথা ইত্যুবাচ তম্।

আমাদের ধারণা, শান্তনু তখনও রাজা হননি অথবা হলেও সদ্যই রাজা হয়েছেন। শান্তনুর মৃগয়ার অভ্যাস ছিল ভালরকম। রাজ্যপ্রাপ্তিতে যদি কোনও শান্তি এসে থাকে মনে, তবে সেই শান্তি উপভোগ করার জন্যই হয়তো তিনি মৃগয়ায় বেরলেন। মৃগয়া চলতে থাকল রাজার ইচ্ছামত। তারপর একদিন গঙ্গার তীর বেয়ে একাকী যেতে যেতে সেই অপূর্বদর্শন রমণীর সঙ্গে শান্তনুর দেখা হল। তাঁর রূপে গঙ্গার তীর আলো হয়ে উঠেছে—জাজ্জ্বল্যমানাং বপুষা। গা-ভর্তি গহনা, পরিধানের বস্ত্র কিছু সূক্ষ্ম, গায়ের রঙ পদ্মকোষের মতো গৌর।

শান্তনুর শরীর রোমাঞ্চিত হল। ভাবলেন বোধহয়— এমন রূপসীর জন্য পিতাঠাকুরের আদেশের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের ধারণা—এমন কোনও আদেশ হয়তো ছিলও না। এক অপরিচিতা রমণীকে গঙ্গার মাহাত্ম্যে গৌরবান্বিত করার জন্যই হয়তো ওই আদেশ এবং বসুদেবতার উপাখ্যান। রূপে মুগ্ধ হয়ে রমণীর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন শান্তনু, যাতে বলা যায়, তিনি চোখ দিয়ে পান করছিলেন রমণীর প্রত্যঙ্গ-রূপ-রাশি—পিবন্নিব চ নেত্রাভ্যাং নাতৃপ্যত নরাধিপঃ। অন্যদিকে লক্ষণীয়, সেই রমণীও কিছু কম মুগ্ধ ছিলেন না শান্তনুর রূপে। রাজাকে দেখে তাঁরও অনুরাগ এতটাই উদ্বেল যে, বিলাসিনী রমণীর সপ্রণয় দৃষ্টিতে তিনিও হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন রাজার দিকে। শান্তনু আর দেরি না করে বললেন—তুমি দেবী না, দানবী? গন্ধর্বী না অপ্সরা? তুমি যে হও সে হও, তোমাকে আমি স্ত্রী হিসেবে চাই—যাচে ত্বং সুরগর্ভাভে ভার্যা মে ভব শোভনে।

রমণী এক কথায় রাজি হলেন। কিন্তু একটা শর্তও দিলেন। রমণী বললেন—আমি তোমার বশবর্তিনী স্ত্রী হতেই পারি। কিন্তু মহারাজ আমি যা কিছুই করব তুমি বাধা দেবে না, কিংবা আমাকে কোনও কটু কথাও বলবে না। আমাকে বাধা দিলে বা কটু কথা বললে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব—বারিতা বিপ্রিয়ঞ্চোক্তা ত্যজেয়ং ত্বামসংশয়ম্। শান্তনুও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন।

তৎকালীন দিনের সামাজিক অবস্থার নিরিখে এক রমণীর মুখে এ হেন শর্তের কথা শুনেই বোঝা যায়—রমণীই চালিকার আসনে বসেছিলেন, মহারাজ শান্তনু এই রূপসী জাদুকরীর হাতে পুত্তলিকামাত্র। রমণী নিজের পরিচয় দিলেন না, শান্তনুও সে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি, তাঁর পিতাঠাকুরও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বারণ করেছেন। আমাদের ধারণা হয়—পরিচয় দেবার মতো কোনও পরিচয় হয়তো তাঁর ছিলও না। আর রমণীর ভাব-ভঙ্গি দেখুন—রমণীকে দেখে শান্তনু তো মুগ্ধ হয়েইছিলেন, কিন্তু শান্তনুকে দেখে রমণী যে ব্যবহার করেছিলেন, তা মহাভারতের কবির ভাষায় 'বিলাসিনী'র মতো। শান্তনুকে দেখে তাঁরও আবেগ ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না— নাতৃপ্যত বিলাসিনী।

AMARBOI.COM

আরও একটা ঘটনা লক্ষ করার মতো। মহারাজ শান্তনু এই রমণীকে হস্তিনাপুরের রাজধানীতে নিয়ে আসেননি। হস্তিনাপুরের রাজরানী বলে তাঁর বধূ-পরিচয় হয়নি একবারও। মহাভারতের কবি এই রমণীর ওপর দেবনদীর মাহাত্ম্য অর্পণ করে তাঁর নাম দিয়েছেন গঙ্গা। কিন্তু ওই যে নীতিশাস্ত্র বলেছে—নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ—নদী আর নখযুক্ত জন্তুর জন্মমূল খুঁজতে যেও না বাপু, ধন্দে পড়ে যাবে। মহাভারত সসম্মানে জানিয়েছে—স্বর্গের দেবী বা দেবনদী হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গা শান্তনুর সঙ্গে কামব্যবহার করতেন শান্তনুর সৌভাগ্যে; কিন্তু তার পরের পংক্তিতেই বলা হয়েছে—শান্তনু যাতে গঙ্গার সঙ্গে রমণ-সুখ অনুভব করেন, তার জন্য গঙ্গার চেষ্টার অন্ত ছিল না। কখনও রমণপূর্বের শৃঙ্গার, কখনও সম্পূর্ণ সম্ভোগ, কখনও একটু নাচ, কখনও বা মনোহর ভাবভঙ্গি—সম্ভোগ-স্নেহ-চাতুর্যৈর্হাব-লাস্যমনোহরৈঃ—যখন যেটি প্রয়োজন, সেইরকম রমণ-নৈপুণ্য ব্যবহার করেই রাজাকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন গঙ্গা।

আমাদের জিজ্ঞাসা— এই কি দেবী অথবা দেবনদীর মতো ব্যবহার? মহাভারতের কবি উপাখ্যানের বহিরঙ্গে বসুদেবতা এবং গঙ্গার দেবীত্ব প্রকট করে অনেক কথার মাঝে একটি মাত্র কথা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন গঙ্গা ঠিক বিবাহিতা রমণীর মতো শান্তনুর সঙ্গে সম্ভোগ ব্যবহার করছিলেন বটে, তবে বাস্তবে কোনও পরিণীতা পত্নীর গৌরব গঙ্গার ছিল না। ঠিক বিবাহিতা

নয়, বিবাহিতা স্ত্রীর মতো—ভার্য্যেবোপস্থিতাভবৎ। সামান্য এই 'মতো' শব্দটির মধ্যেই গঙ্গার আসল পরিচয়টি লুক্কায়িত আছে বলে মনে করি। শান্তনু তাঁকে রাজবধূর মর্যাদায় হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে পারেননি, অথবা বলি—নিয়ে আসেননি। ভাবে বুঝি—গঙ্গা, তিনি দেবীরূপিণীই হোন, অথবা 'বিলাসিনী'—সেই দেবরূপের মধ্যে বিলাসিনী রমণীর আঙ্গিকটাই বড় হয়ে উঠেছে, দেবীর মাহাত্ম্য সেখানে উপাখ্যানমাত্র।

বছর বছর সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দেবার মধ্যেও উপাখ্যানের আঙ্গিকটাই বড় কথা। বাস্তবে মহাত্মা ভীষ্মদেব যে অজ্ঞাতপরিচয় রমণীর গর্ভে জন্মাবেন, তাঁকে গৌরব প্রদান করার জন্যই গঙ্গা নাম্নী এক রমণীকে বসুজননী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মনোরম উপাখ্যানেরও জননী হতে হয়েছে। অথবা এমন হতেও বা পারে যে, সেই রমণী তাঁর প্রথমজাত পুত্রগুলিকে ভাসিয়েই দিয়েছিলেন নদীতে এবং শান্তনুও এই 'বিলাসিনী' রমণীর ক্রূরতায় বিপন্ন বোধ করেছিলেন কখনও। অথবা অষ্টম গর্ভের সন্তানের অন্য কোনও মাহাত্ম্য আছে কিনা, তাই বা কে জানে? নইলে অষ্টম গর্ভের কৃষ্ণ এবং অষ্টম গর্ভের দেবব্রত ভীষ্মের জন্মেই বা এত সাদৃশ্য কেন? আর কী আশ্চর্য, অষ্টম গর্ভে জন্মে যাঁরা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হবেন, তাঁদের পূর্বজন্মাদের মৃত্যু সব সময়েই ক্রূরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন কৃষ্ণের অগ্রজন্মা অন্য পুত্রেরা কংসের হাতে আছাড় খেয়ে মরেছেন আর ভীষ্মের পূর্বজরা মায়ের ক্রূরতায় নদীর জলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

তবে সমস্ত এই অনুমানের ওপরেও আমাদের তর্কে এই রমণীর চেয়েও বড় ঘটনা হল ভীষ্মের জন্ম। ভীষ্ম জন্মাবেন বলেই তাঁর মাতৃদেবী গঙ্গার মাহাত্ম্যে ভূষিত। ভীষ্ম জন্মাবেন বলেই অষ্টবসুর মর্ত্যে অবতরণের উপাখ্যান যাই হোক, মহাভারতের কথা-মতো সাতটি সন্তানকে পরপর জলে ডুবিয়ে দেবার পর শান্তনুর ধৈর্য অতিক্রান্ত হল। তারপর অষ্টবসুর তেজে সমৃদ্ধ হয়ে গঙ্গার অষ্টম গর্ভের যে পুত্রটি জন্মান, গঙ্গা তাকে দেখে হেসে উঠলেন—অথ তামষ্টমে জাতে পুত্রে প্রহসতীমিব। মহারাজ শান্তনু প্রমাদ গণলেন—এই কি সেই ক্রূর হাসিটি যা অষ্টম বার তাঁকে পুত্রশোক দেবে। শান্তনু চেঁচিয়ে উঠলেন—আর নয়। কী রকম মেয়ে তুমি? কে তুমি? কার মেয়ে? কেনই বা এমন করে পুত্রহত্যা করছ—মা বধীঃ কাসি কস্যাসি কিঞ্চ হংসি সুতানিতি? স্বামীর মতো ব্যক্তিটিকে বেশি করে পাবার জন্যই কি গঙ্গার এই পুত্রহত্যা?

রমণী সহাস্যে বললেন—আর তোমার পুত্রবধ করব না। কিন্তু আজই তোমার সঙ্গে আমার শেষ প্রহরের বসবাস সমাপ্ত হল। তোমার সঙ্গে কথা ছিল—তুমি আমার কোনও কাজে বাধা দেবে না—জীর্ণো'স্তু মম বাসো'য়ং যথা স সময়ঃ কৃতঃ। গঙ্গা এবার আপন পরিচয় দিলেন শান্তনুর কাছে এবং তিনি যে দেবকার্য সিদ্ধ করার জন্যই শান্তনুর স্ত্রীত্ব বরণ করেছিলেন, সে কথাও জানালেন। কথায় কথায় বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপ সুব্যক্ত হল শান্তনুর কাছে। যথার্থ হয়ে উঠল গঙ্গার পুত্রবধের কাহিনী।

আধুনিক গবেষকরা অবশ্য গঙ্গাকে সুরনদী গঙ্গা বলে মানেন না। তাঁরা বলেন—শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার প্রণয়-সম্পর্কের মতো ঘটনাগুলি মূলত সাময়িক প্রেমের উদাহরণ—Other instances of Gandharva marriage, such as Ganga and Santanu... also present the free love union of some nymphs and dolphins, very probably women from some non-Aryan tribes.

মনুষ্যরূপিণী দেবনদীকে এক অনার্যজাতীয়া রমণী বলব কিনা সে সম্বন্ধে তর্কযুক্তির

AMARBOI.COM

অবকাশ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এও তো ঘটনা যে, শান্তনু তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যেতে পারেননি। কোন ধরনের রমণীর পক্ষেই বা এক রাজপুরুষকে রাজধানীর বাইরে শুধু কামব্যবহারেই সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব। এমনই সেই সন্তুষ্টির প্রক্রিয়া, যাতে শান্তনুর পক্ষে অন্যত্র মন দেওয়া সম্ভব ছিল না—রাজানাং রময়ামাস যথা রেমে তয়ৈব সঃ। সবচেয়ে বড় কথা হল—শান্তনুর আগ্রহে যে পুত্রটিকে গঙ্গা বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই পুত্রটিকে রাজা রাজধানীতে নিয়ে যেতে পারলেন না সঙ্গে সঙ্গে। গঙ্গা সেই পুত্রকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন—রাজার গৌরবহানি না করে—আদায় চ কুমারং তং জগামাথ যথেপ্সিতম্।

মহাভারতের অনুবাদক পণ্ডিতেরা গঙ্গার মাহাত্ম্য রক্ষা করে এখানে অনুবাদ করেছেন, 'বালকটিকে লইয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।' কিন্তু সংস্কৃত 'জগাম' ক্রিয়ার অর্থ সোজাসুজি 'চলে গেলেন' বলাটাই যথার্থ। আরও একটা কথা—চলে যাবার আগে গঙ্গা বলেছিলেন—এই যে তোমার ছেলেটি, সে বড় হলে তোমার কাছে আবার ফিরে আসবে—বিবৃদ্ধঃ পুনরেষ্যতি—আর তুমি ডাকলে আমিও তোমার কাছে আসব—অহঞ্চ তে ভবিষ্যামি আহ্বানোপগতা নৃপ। এই পরিষ্কার লৌকিক প্রতিজ্ঞার মধ্যে 'বালকটিকে লইয়া' অলৌকিক অন্তর্ধানের কথাও আসে না, পুনরায় আবির্ভাবের কথাও আসে না। যে ছেলের মা স্বয়ং হস্তিনাপুরের রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারেননি, তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলে শান্তনুর যে স্বস্তি বিঘ্নিত হবে, সে কথা এই বিচক্ষণা রমণী বুঝেছেন। আর 'বিবৃদ্ধঃ পুনরেষ্যতি' কথাটার মানে সিদ্ধান্তবাগীশ যে কী করে 'আপনার পুত্র এই বালক অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বর্গে যাইবেন'—এইরকম করলেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলোয় না। কেননা 'পুনরায়' শব্দটাই এখানে ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি না বলি—তোমার এই পুত্র বড় হয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে—পুনরেষ্যতি।

মনে রাখবেন—ভবিষ্যতে ভীমপত্নী হিড়িম্বা, অর্জুনপত্নী উলুপী—এঁরাও ওই একই কথা বলবেন—তুমি ডাকলেই আসব। গঙ্গাও তাই বলেছেন—তুমি ডাকলেই তোমার কাছে ফিরে আসব—আহ্বানোপগতা নৃপ। হিড়িম্বা-উলুপীদের পুত্রেরাও রাজধানীতে আসেননি, তাঁরা মায়ের কাছেই ছিলেন। গঙ্গাকে যদি হিড়িম্বা, উলুপী অথবা চিত্রাঙ্গদার থেকে বেশি মাহাত্ম্য না দিই, তাহলেই কিন্তু মহাকাব্যের কবির আশয় আরও বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হয়। আমাদের কাছে অলৌকিক চমৎকৃতির চেয়েও বাস্তবের যুক্তিগ্রাহ্যতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গঙ্গা আপন পুত্রকে নিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেলেন আর মহারাজ শান্তনু গঙ্গা এবং নিজপুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হৃদয়ে বহন করে হস্তিনাপুরের রাজধানীতে ফিরে এলেন—শান্তনুশ্চাপি শোকার্তো জগাম স্বপুরং ততঃ।

দেখা যাচ্ছে, মহাভারতের কবি এক প্রণয়িনী রমণীর সঙ্গে শান্তনুর মিলন ঘটিয়ে, তারপর শান্তনুকে রাজধানীতে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু শান্তনুর অসাধারণ রাজগুণের বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে তারও পরে। ফলত মহাভারতের গবেষকরা বলবেন—বসুগণের কাহিনী পরবর্তী সংযোজন। শান্তনুর কাহিনীর আরম্ভ এইখান থেকেই। আমরা বলি—অভিশপ্ত বসুগণের কাহিনী না হয় উড়িয়েই দিলেন, কিন্তু ওই লাস্যময়ী নদীর মতো বিলাসিনী রমণী আর তাঁর গর্ভজাত পুত্রটিকে তো আর উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বরঞ্চ বলা ভাল এই ঘটনা ঘটার পরে শান্তনুর রাজগুণ বর্ণিত হওয়ায় আমাদের কেবলই মনে হয়—শান্তনু রাজা হবার আগেই গঙ্গার সঙ্গে তাঁর প্রণয়মিলন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দেবব্রতর জন্মও হয়ে গিয়েছিল আগেই। রাজা

হবার পরে হয়তো তিনি সগৌরবে তাঁর প্রথমজাত গূঢ় পুত্রটিকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

শান্তনুর রাজগুণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে বোঝা যায় একজন আদর্শ রাজার যে যে গুণ থাকলে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটে, সে সবই তাঁর মধ্যে ছিল। ধর্মনীতি এবং অর্থনীতির সম্যক বোধের সঙ্গে বুদ্ধি এবং বিনীত আচরণ একত্র যুক্ত হওয়ায় সামন্ত রাজারা আপনিই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে শান্তনুকেই তাঁদের নেতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন—তং মহীপা মহীপালং রাজরাজ্যে'ভ্যষেচয়ন্। শান্তনু সেইভাবেই রাজ্য পরিচালনা করছিলেন, যাতে তাঁর রাজ্যে অন্যায়-অবিচার কিছু না ঘটে। বর্ণধর্ম এবং আশ্রমধর্ম তৎকালীন সামাজিক নীতি অনুসারেই পালিত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সকলেই আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে শান্তনুর অশান্তির কোনও কারণ ছিল না এবং তাঁর রাজ্য চলছিল তৎকালীন সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণদের নীতি এবং আইন মেনেই—ব্রহ্মধর্মোত্তরে রাজ্যে শান্তনুর্বিনয়াত্মবান্

রাজ্য যখন ভালই চলছে, তখন রাজার মনে কিছু চপলতা ঘটেই। পথের নেশা, দূরের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। আর আগেই বলেছি—মৃগয়ার ব্যাপারে শান্তনুর কিছু দুর্বলতা ছিলই। শান্তনু একা বেরিয়ে পড়লেন মৃগয়ায়। একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করার পর সেই মৃগকে অনুসরণ করতে করতে তিনি গঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হলেন। মহাভারতের কবি শান্তনুকে যতই মৃগয়ার ছলে গঙ্গার তীরভূমিতে নিয়ে আসুন, আমরা মনে মনে জানি—শান্তনু ফিরে এসেছিলেন সেই রমণীর খোঁজে, যাকে তিনি বেশ কয়েক বছর আগে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়। আর সেই স্বাঙ্গজাত পুত্রটি—সে এখন কত বড় হয়েছে? শান্তনুর মনে এইসব জল্পনা নিশ্চয়ই ছিল। মৃগয়া অথবা এই শব্দের আক্ষরিক অর্থে যদি অন্বেষণ বুঝি তবে যে হরিণীটিকে তিনি অনেককাল আগে প্রেমবাণে বিদ্ধ করে ফিরে গিয়েছিলেন, তারই অনুসরণক্রমে তিনি উপস্থিত হলেন গঙ্গার তীরভূমিতে।

শান্তনু দেখলেন—গঙ্গার জল অল্প। কী ব্যাপার, এমন তো হবার কথা নয়। নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গার জলপ্রবাহ শীর্ণ হল কী করে, এমন তো আগে ছিল না—স্যন্দতে কিং ত্বিয়ং নাদ্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যথা পুরা? কারণ অনুসন্ধান করার জন্য শান্তনু গঙ্গার তীর ধরে এগোতে লাগলেন। খানিক দূর গিয়েই তিনি দেখলেন—অপূর্বদর্শন এক কৈশোরগন্ধী বালক। অতি দীর্ঘ তাঁর শরীর। মহাবলবান, মহাতেজস্বী। শান্তনু দেখলেন—বালক একটার পর একটা বাণ ছুঁড়ে গঙ্গার স্রোত যেন আটকে রেখে দিয়েছে—কৃৎস্নাং গঙ্গাং সমাবৃত্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈরবস্থিতম্। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে প্রবাহিনী গঙ্গার এই রুদ্ধগতি শরাচ্ছন্ন অবস্থা দেখে মহারাজ শান্তনু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। বালককে তিনি চিনতে পারলেন না, কিন্তু বালকের অলৌকিক অস্ত্রবীর্য লক্ষ্য করে তিনি অভিভূত হলেন। আশ্চর্য ঘটনা হল, বালকটি কিন্তু মহারাজ শান্তনুকে দেখে বেশ খুশি হল এবং তাঁকে বেশ কাছের লোক বলেই মনে করল।

বালক বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। শান্তনুকে দেখে তার ভাল লেগেছে এবং তাঁকে দেখে কী যেন ভাবল আচম্বিতে এবং মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। শান্তনুর বোধহয় মনে পড়ল—সেই শিশু পুত্রটির কথা। যাকে তিনি কোনও কালে মায়ের সঙ্গে চলে যেতে দেখেছেন। এই কিশোরমুখ বলবান বালকটিকে দেখে তাঁর বুঝি সেই শিশু পুত্রটির কথা মনে পড়ল। শান্তনু গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরাতনী প্রণয়িনীকে একবার ডাকলেন—গঙ্গা! গঙ্গা! আমার সেই ছেলেটিকে একবার দেখাবে?

শান্তনুর ডাকার দরকার ছিল না। শান্তনু সবিস্ময়ে দেখলেন—শ্বেতশুভ্র বসন পরা সালংকারা এক রমণী ডান হাতে সেই বালকটিকে ধরে শান্তনুর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। শান্তনু একটু আগেই এই বালকটিকে বাণ ছুঁড়ে নদীর স্রোতধারা রুদ্ধ করতে দেখেছেন। আমাদের ধারণা—শান্তনুকে দেখামাত্রই বালকটি তার মাকে ডাকতে গেছে। মায়ের কাছে রাজার বর্ণনা সে বহুবার শুনেছে হয়তো। ফলে রাজাকে পিতা বলে চিনতে বালকের একটুও অসুবিধে হয়নি। বস্তুত শান্তনুকে পিতা বলে চিনতে পেরেই মুগ্ধ-নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল বালক। আর তারপরেই মোহাবিষ্টের মতো ছুটে গিয়েছিল মায়ের কাছে—সংমোহ্য তু ততঃ ক্ষিপ্রং তত্রৈবান্তরধীয়ত। যার জন্য শান্তনু 'গঙ্গা' বলে ডাকার পর একটুও তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি। গঙ্গা সপুত্রক এসে দাঁড়িয়েছেন রাজার কাছে। শান্তনু এতদিন পরে গঙ্গাকে দেখে ঠিকমত চিনতেও পারেননি ভাল করে—দৃষ্টপূর্বামপি স তাং নাভ্যজানত শান্তনুঃ। এই কথা থেকেই বুঝি গঙ্গা কোন অলৌকিকী দেবী নন। তাঁর চেহারার পরিবর্তন হয়েছে বলেই শান্তনু তাঁকে চিনতে পারেননি। গঙ্গা বললেন—মহারাজ! এই তোমার সেই পুত্র, আমার অষ্টম গর্ভে যার জন্ম হয়েছিল।

শান্তনু অপলক-নয়নে চেয়ে রইলেন দীর্ঘদেহী পুত্রের দিকে। গঙ্গা বললেন—তোমার এই পুত্র এখন সমস্ত অস্ত্রবীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমি একে মানুষ করেছি, বড় করেছি। এখন তুমি একে নিজের ঘরে নিয়ে যাও—গৃহাণেমং মহারাজ ময়া সংবর্ধিতং সুতম্। এখানে এই 'বড় করেছি—সংবর্ধিতং' শব্দটির থেকেই গঙ্গার মুখে পূর্বে বলা 'বিবৃদ্ধঃ পুনরেষ্যতি' বড় হয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে'—এই কথাগুলি যথার্থ হয়ে যায়। পুরাকালে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলা যেমন ভরতকে দুষ্মন্তের কাছে নিয়ে এসে বলেছিলেন—তোমার সন্তান আমি মানুষ করেছি, এখন তুমি একে গ্রহণ করো। এখানে গঙ্গার মুখেও সেই একই কথা উচ্চারিত হল। গঙ্গা এবার মায়ের ঘরে মানুষ হওয়া পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার খবর জানাচ্ছেন স্বামীকে।

AMARBOI.COM

গঙ্গা বললেন—একটু বড় হতেই আমি তোমার পুত্রকে মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে শিক্ষা নিতে পাঠিয়েছি। সেখানে বেদ-বেদাঙ্গ সবই অধ্যয়ন করেছে সে। আর অস্ত্রশিক্ষার কথা যদি বল, তবে বলতে হবে যুদ্ধে তোমার এই পুত্র এখন দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষ—দেবরাজসমো যুধি। গঙ্গা অবশ্য জানেন—ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে শুধু অস্ত্রবিদ্যা শিখলেই চলে না, তাকে রাজনীতি, অর্থনীতি সব শিখতে হয়। আর রাজনীতি অর্থনীতি মানেই সেকালের দিনে অসুরগুরু শুক্রাচার্যের রচিত পুস্তক অথবা দেবগুরু বৃহস্পতি রচিত শাস্ত্র। যাঁরা রাজনীতির পাঠ নিতেন তাঁরা নিজেদের পছন্দমত এক পক্ষকে মেনে নিতেন, অর্থাৎ কেউ শুক্রনীতি অনুসরণ করতেন, কেউ বা বৃহস্পতিনীতি।

গঙ্গা বললেন—তোমার এই পুত্র দেবতা এবং অসুর—সবারই বড় প্রিয়পাত্র। তুমি জেনো—স্বয়ং শুক্রাচার্য রাজনীতির যত বিষয় জানেন, তোমার এই পুত্রও তা জানে—উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রময়ং তদ্বেদ সর্বশঃ। আবার দেবগুরু বৃহস্পতি রাজনীতি এবং অর্থনীতির সম্পর্কে যত বিধান দিয়েছেন, তা সবই এই বালকের অধিগত—কৃৎস্নমস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্। সব কথার শেষে গঙ্গা এবার তাঁর পুত্রের অস্ত্রবিশিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। সেকালের দিনে অস্ত্রশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন পরশুরাম জামদগ্ন্য। রামায়ণে পরশুরামের ক্ষমতার কথা আমরা শুনেছি এবং পরশুরামের দ্বারা পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার ঘটনাও আমাদের কানে

এসেছে। ইনি সেই মূল পরশুরাম নাও হতে পারেন, কিন্তু অস্ত্রশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পরশুরামের একটি 'ইনস্টিটিউশন' নিশ্চয়ই ছিল। সেখানে যিনি অস্ত্রগুরু হতেন তিনিই হয়ত পরশুরামের নামে খ্যাতি করতেন। গঙ্গা সগর্বে জানালেন—মহাবীর পরশুরাম অস্ত্রবিদ্যার যে গূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তোমার এই ছেলেও সে সব বিদ্যা অধিকার করেছে—যদস্ত্রং বেদ রামশ্চ তদপ্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।

গঙ্গা এবার শেষ অনুরোধ করলেন পুরাতন প্রণয়ীর কাছে। বললেন—অস্ত্রবিদ্যা এবং রাজধর্ম সব যাকে সযত্নে শেখানো হয়েছে, তোমার সেই বীর পুত্রকে তুমি এবার গ্রহণ করো আমি তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করছি, তুমি তাকে রাজধানীতে নিয়ে যাও—ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীরং বীর গৃহং নয়। গঙ্গা আর উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেলেন। কোন মায়ের না ইচ্ছে থাকে—সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র রাজ্য লাভ করে সমৃদ্ধ হোক। গঙ্গাপুত্রকে শান্তনুর হাতে দিয়ে সেই ইচ্ছেই পূরণ করতে চাইলেন।

মহারাজ শান্তনু উপযুক্ত পুত্রের হাত ধরে রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজধানীর মন্ত্রী-অমাত্যেরা কেউ তাঁকে কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্ন করল না। আমাদের ধারণা—বহুকাল পূর্বে শান্তনু যখন রাজধানী ত্যাগ করে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে বাস করেছিলেন, সেই সময়ের কথা কারও অবিদিত ছিল না। রাজধানীর সকলেই জানতেন—রাজা কী করছেন অথবা কোথায় আছেন। শান্তনুকে তাই রাজধানীতে এসে কোনও জবাবদিহিও করতে হয়নি।

শান্তনুর পুত্রের নাম গঙ্গাই রেখেছিলেন দেবব্রত। আদরের ছেলে, পিতার সঙ্গ পায় না। তাই সকলে তাকে গাঙ্গেয় বলেও ডাকে। মায়ের নামেই তাঁর বেশি পরিচয়। পিতা শান্তনু দীর্ঘদর্শন এই পুত্রটিকে রাজ্যপ্রান্ত গঙ্গার তীরভূমির আবাস থেকে রাজভবনে নিয়ে এসে জ্ঞাতিগুষ্টি, মন্ত্রী-অমাত্য—সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুত্রের প্রতি সমস্ত বাৎসল্য প্রকাশ করে শান্তনু নিজেকে পিতা হিসেবে যেমন সফল মনে করলেন, তেমনই আরও একটি কাজ তিনি করে ফেললেন প্রখর বাস্তববোধে। এতকাল এই পুত্র রাজভবনের বাইরে ছিল, এখন যদি পুরু-ভরতবংশের লতায়-পাতায় জন্মানো জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে? তাই খুব তাড়াতাড়ি পৌরব-বংশে আপন পুত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেবব্রত গাঙ্গেয়কে তিনি যুবরাজ-পদে মনোনীত করলেন সমস্ত পৌরবদের আহ্বান করে—পৌরবেষু ততঃ পুত্রং রাজ্যার্থম্....অভ্যষেচয়ৎ।

গুণবান পুত্রকে পুরু-ভরতবংশের পরম্পরায় স্থাপন করে শান্তনুর আপন কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গেয় দেবব্রতও তাঁর যুবরাজ-পদের সার্থকতা প্রমাণ করলেন আপন গুণে। তাঁর অপূর্ব ব্যবহারে পিতা শান্তনু যেমন নন্দিত হলেন, তেমনই কিছুদিনের মধ্যে দেবব্রতর গুণে রাজ্যের পুরবাসী জনপদবাসীরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠল—রাষ্ট্রঞ্চ রঞ্জয়ামাস বৃত্তেন ভরতর্ষভ। তখনও শান্তনুর কোনও পত্নী রাজরানী হয়ে সিংহাসনে তাঁর পাশে বসেননি, কিন্তু অসাধারণ মেধাবী পুত্রকে নিয়েই শান্তনুর দিন কাটতে লাগল। অল্পদিন নয়, চার-চারটি বছর এইভাবে কেটে গেল—বর্তয়ামাস বর্ষাণি চত্বার্যমিতবিক্রমঃ।

তিপান্ন

এর আগে আমরা মহারাজ সংবরণের পুত্র কুরুর নাম করেছি। সেই কুরুরাজ, যাঁর নামে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র এবং কুরুজাঙ্গল প্রদেশ। মহারাজ কুরুর চারটি পুত্র সুধন্বা, জহ্নু, পরীক্ষিত এবং অরিমেজয়। এঁদের মধ্যে পরীক্ষিত, যাঁকে আমরা প্রথম পরীক্ষিত বলতে চাই, তিনিই হস্তিনাপুরে কুরুবংশের প্রধান রাজ-পরম্পরা রক্ষা করছিলেন। দেখা যাচ্ছে, এখানে জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কুরুপুত্র সুধন্বা পিতৃরাজ্য পাননি। পেয়েছেন তৃতীয় পুত্র পরীক্ষিত। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক যে, ক্ষত্রিয়ের রাজবংশে জন্মে জ্যেষ্ঠ সুধন্বা কনিষ্ঠের রাজ্যে বসে নিজের অঙ্গুলি-চোষণ করছিলেন না। তিনি তাঁর ভাগ্য অন্বেষণ করতে বেরিয়েছিলেন অন্যত্র। এমন হতেই পারে যে, তিনি যুদ্ধ জয় করে কোন রাজ্য অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। হতে পারে—তাঁর পুত্র এবং পৌত্রও এই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং ব্যর্থতা ছিল তাঁদেরও।

কিন্তু এই কুরুজ্যেষ্ঠ সুধন্বার প্রপৌত্র অর্থাৎ এই বংশের চতুর্থ পুরুষকে দেখছি—তিনি একটি রাজ্যের অধিকার পেয়েছেন। কুরুর জ্যেষ্ঠপুত্রের ধারায় এই চতুর্থ পুরুষের নাম বসু। কিন্তু এঁকে কেউ বসু বলে ডাকে না। পুরাণে-ইতিহাসে সর্বত্র তাঁর নামের আগে একটি বিশেষণ আছে। সকলে তাকে উপরিচর বসু বলে ডাকে। এমনকি তিনি নতুন যে দেশটি জয় করেছিলেন, সেই চেদি দেশও তাঁর নামের বিশেষণে পরিণত—চৈদ্য উপরিচর বসু।

এখনকার দিনে যে জায়গাটাকে আমরা বুন্দেলখণ্ড বলি, সেকালের দিনে সেইটাই হল চেদি রাজ্য। একপাশ দিয়ে শুক্তিমতী নদী বয়ে যাচ্ছে, অন্যপাশে কালিদাসের মেঘদূত-বিখ্যাত উপলব্যথিতগতি বেত্রবতী। দুই নদীর মাঝখানের অংশটুকুই বোধহয় সেকালের চেদিরাজ্য। ভারি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। কুরুবংশের চতুর্থ পুরুষ বসু-রাজা প্রখর বাস্তব-বোধে হস্তিনাপুর বা পাঞ্চালদেশের দিকে হাত বাড়াননি। আপন ভাগ্যান্বেষণের জন্য হস্তিনাপুর ছেড়ে

তিনি দক্ষিণ-পূর্ব রাজ্যগুলির দিকে চলে এসেছিলেন। তারপর শুক্তিমতী নদীর ওপর শুক্তির মতো এই অপূর্ব রাজ্যটিই তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। তিনি পিতৃ-পিতামহের যুদ্ধ-বাহিনী একত্র করে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই রাজ্যের ওপর। এই ঝাঁপিয়ে পড়াটা ছিল এতই আকস্মিক, এতই অতর্কিত যে তা অনেকটাই ছিল উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো। হয়তো এই কারণেই তাঁর নাম—উপরিচর বসু।

মহাভারত অবশ্য অন্য একটা খবর দিয়েছে। মহাভারত বলেছে—দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন বসু-মহাশয়ের বন্ধু মানুষ। প্রধানত তাঁরই পরামর্শেই বসু-রাজ চেদিরাজ্যে নিজের আবাস স্থাপন করেন—ইন্দ্রোপদেশাদ্ জগ্রাহ রমণীয়ং মহীপতিঃ। দেবরাজ ইন্দ্র বসুকে কাছে ডেকে বলেছিলেন—তুমি আমার বন্ধু মানুষ—সখাভূতো মম প্রিয়ঃ। আমার ইচ্ছে—পৃথিবীর একটি সুরম্য স্থানে তোমার আবাস হোক। আর রম্য বলতে আছে একমাত্র চেদি-রাজ্য। ধনধান্যে পূর্ণ দেশ। সরস মাটির সব গুণই এতে আছে—ভোগৈর্ভূমিগুণৈ-র্যুতঃ। দেবরাজ বললেন—শস্য আর অর্থের সম্ভাবনায় পূর্ণ এই দেশেই তুমি বসতি স্থাপন করো, আমি তাই চাই—বসুপূর্ণা চ বসুধা বস চেদিষু চেদিপ।

দেবরাজ নাকি তাঁর বন্ধুত্বের স্মৃতি হিসেবে বসুরাজকে একটি দিব্য বিমান দিয়েছিলেন। এই বিমানে চড়ে রাজ্যের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন বলেই তিনি উপরিচর বসু—চরিষ্যসি উপরিস্থো দেবো বিগ্রহবানিব। নতুন রাজ্যের অধিপতিকে বরণ করে দেবরাজ বসু-মহাশয়ের গলায় পদ্মফুলের জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন। দেবরাজের আন্তরিক ইচ্ছায় সুরম্য জনস্থান চেদিরাজ্যের ভার নিলেন বসুরাজ—সম্পূজিতো মঘবতা বসুশ্চেদীশ্বরো নৃপঃ।

মহাভারতের এই বর্ণনায় বসুরাজের সঙ্গে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব, তাঁর দেওয়া দিব্য বিমান এবং অম্লান পঙ্কজের মালাখানির কথা কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে আমাদের সময় লাগে না। আসল কথা—খোদ ঋগ্‌বেদের দানস্তুতির মধ্যে আমরা জনৈক 'কশু চৈদ্যে'র নাম পাই। তাঁর প্রশংসাও শুনতে পাই ভূরি ভূরি। চেদির রাজা এই 'কশু চৈদ্য'ই মহাভারতীয় নামে চৈদ্য বসু হয়েছেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা, অন্তত র‍্যাপসন এই মতই পোষণ করেন। আমরা এই নামের বিপর্যয়ের কথাটা যথেষ্টই বুঝি। কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা বোঝার ব্যাপার, সেটা হল খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যে কশু চৈদ্যের এত প্রশংসা আছে বলেই মহাভারতে বসু চৈদ্যের সঙ্গে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের এত বন্ধুত্ব, এত দানাদানের কথা কল্পিত হয়েছে।

তবে বিমানে চড়ে বসুরাজ যতই 'উপরিচর' হোন, আমাদের গভীর বিশ্বাস—বসু মহাশয় ভাগ্যান্বেষণে এসে এই মনোরম রাজ্যটির ওপর অতর্কিতে অর্থাৎ যেন উপর থেকে হানা দিয়েছিলেন। সেই জন্য চেদি-দেশের এই বিখ্যাত রাজার নাম হয়ে গেল চৈদ্য উপরিচর বসু। চেদি দেশের রাজা বলে এই যে 'চৈদ্য' নামের বিশেষণটি পেলেন বসু-মহাশয়, তারপর থেকে এই দেশের রাজারা নিজেদের 'চৈদ্য' বলতেই বেশি পছন্দ করতেন। পরবর্তী সময়ে মহাভারতখ্যাত শিশুপালকে অন্তত একশবার চৈদ্য নামে ডাকা হবে। আরও কিছুদিন পর আমরা খারবেল নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে কলিঙ্গ-রাজার নাম পাব, তার বহুপূর্ব পিতামহরা বোধহয় এই দেশের লোক ছিলেন। খারবেল যে বংশে জন্মেছিলেন তার নাম চেত-বংশ। রমাপ্রসাদ চন্দ দেখিয়েছেন—'চেত' রাজপুত্রেরা আসলে চেদিদেশের লোক। বৌদ্ধ উপাখ্যান বেস্‌সন্তর জাতকে সেইরকমই বলা আছে।

আমরা বলি—এত কল্পনার দরকারই নেই কোনও। বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দপন্‌হোতে (রাজা মিনান্দারের প্রশ্ন) এক 'চেত' রাজার নাম করা হয়েছে, তাঁর নাম 'সুর' অথবা 'শূর পরিচর'।

AMARBOI.COM

এবার ভাবুন, এই শূর পরিচর নামটির সঙ্গে কোনওভাবেই কি আমাদের চৈদ্য রাজার বসু উপরিচরের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়? স্টেন কোনো সাহেব আবার সামান্য একটু বাগড়া দিয়ে বলেছেন—কলিঙ্গরাজ খারবেল চেত-বংশে নয়, তিনি চেতি-বংশে জন্মেছিলেন, সাহেব খেয়াল করলেন না 'চেতি' বলার ফলে চৈদ্য-রাজাদের কথা আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়। কেন না, বৌদ্ধ জাতকমালায় একটি জাতকের গল্পের নামই হল চেতিয় জাতক এবং এই জাতকে এক চৈদ্য রাজার বংশকাহিনী উদ্ধার করা হয়েছে—যে রাজার নাম উপচর।

দেখা যাচ্ছে—উপরিচর বসু-মহাশয়কে কোনও বৌদ্ধগ্রন্থ বলছে—পরিচর, কোনটি বলছে উপচর। তাতে প্রমাণ হয়ে যায় কুরুবংশের প্রথম গৌরব কুরুর জ্যেষ্ঠপুত্র সুধন্বা হস্তিনাপুরে রাজ্য না পেলেও তাঁর প্রপৌত্র উপরিচর বসু চেদিরাজ্যে নিজের অধিকার কায়েম করে কতটা হই-হই ফেলে দিয়েছিলেন সেকালে। আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আর্যস্থান রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ আর পাঞ্জাব ছেড়ে পূর্বভারত এবং দক্ষিণে কুরুবংশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এই উপরিচয় বসু। দুর্ভাগ্যের বিষয়, হস্তিনাপুরের মহারাজই কুরুবংশের ধুরন্ধর পুরুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে রইলেন, আর উপরিচর বসু নিজ পরাক্রমে রাজ্য দখল করে নিজের নামেই বিখ্যাত হলেন। কথায় বলে—স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামা তু মধ্যমঃ। অতএব উপরিচর বসু সেই স্বনামধন্য ব্যক্তি, যাঁর কথা উচ্চারণ করলে আর তাঁর পূর্বপুরুষ কুরুর নাম স্মরণ করতে হয় না। ঋগ্‌বেদ থেকে আরম্ভ করে খারবেলের বংশ পর্যন্ত তিনি একভাবে উপস্থিত আছেন—স্বমহিমায় স্বপরাক্রমে। কুরুর নাম বাদ দিয়ে উপরিচর বসুর নামেই তাঁর পরবর্তী বংশধারা চলেছে, যার নাম বাসব (বসু+ষ্ণ) বংশ—বাসবাঃ পঞ্চ রাজানঃ পৃথগ্‌বংশাশ্চ শাশ্বতাঃ।

নতুন দেশ জয় করে উপরিচর বসু চেদিরাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন, কিন্তু এখনও তাঁর কোনও রানী নেই। তিনি আর্যাবর্ত ব্রহ্মাবর্তের রাজা নন, কাজেই কাশী-কোশল বা অযোধ্যা-শূরসেন থেকে কোনও পতিংবরা কন্যা তাঁকে বরণ করেননি। আর ওই সব দেশের জামাতা হিসেবে বৃত হওয়ার জন্য কোনও চেষ্টাও বোধহয় তাঁর ছিল না। মহাভারতে বসুরাজের বিবাহ নিয়ে একটি কল্পকাহিনী আছে। বলা হয়েছে—চেদিরাজ্যের কোল-ঘেঁষা শুক্তিমতী নদীকে সেই রাজ্যের এক পর্বত আটকে রেখেছিল আপন কন্দরে—পুরোপবাহিনীং তস্য নদীং শুক্তিমতীং গিরিঃ। অরৌৎসীৎ চেতনাযুক্তঃ...। পর্বতটির নাম কোলাহল। বীরবাহিনী শুক্তিমতী নদীকে দেখে পর্বতপুরুষ কোলাহল মুগ্ধ হয়ে নির্জনে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন—কামাৎ কোলাহলঃ কিল।

মহারাজ উপরিচর বসুর কাছে এই ধর্ষণের সংবাদ অচিরেই পৌঁছল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাত করলেন পর্বতের দেহে। পদাঘাতের ফলে পর্বত-পুরুষ শুক্তিমতী নদীকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। শুক্তিমতীর কোলে ততক্ষণে যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম হয়েছে এবং অলৌকিকভাবে তারা বড়ও হয়ে গেছে। বলাৎকারী পর্বতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় শুক্তিমতী এতই খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি বসু মহারাজকে বললেন—এই কন্যাটি তোমার পত্নী হবে, আর আমার এই পুত্র তোমার সেনাপতির কাজ করবে। বসুরাজ শুক্তিমতীর অনুনয় মেনে নিলেন। শুক্তিমতীর পুত্রটিকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করে, কন্যাটিকে তিনি বিবাহ করলেন। কন্যার নাম গিরিকা।

মহাভারতের এই কল্পকাহিনীর মধ্যে গভীর এক বাস্তব লুকিয়ে আছে। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি—উত্তরভারতের কোনও আর্যা রমণীর পাণিগ্রহণে আগ্রহ দেখাননি মহারাজ

উপরিচর বসু। বরং তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা এতটাই প্রখর যে, তিনি যে রাজ্যে 'উপরিচর' হয়ে জুড়ে বসেছিলেন, যে রাজ্যে আপন অধিকার কায়েম করেছিলেন, তিনি সে রাজ্যেরই নদী-পর্বতের গন্ধমাখা এক রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। হয়তো চেদিরাজ্যের পুরাতন আবাসিনী সেই রমণীর নাম গিরিকা।

ভূগোলের সামান্য জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়—শ্রীময়ী শুক্তিমতী, যাঁকে আধুনিকেরা 'কেন' বলে ডাকেন, সেই নদীটি বেরিয়েছে কোলাহল পর্বত থেকে। কোলাহল পর্বত এখনকার বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বন্দেইর পর্বত বলে চিহ্নিত হয়েছে। শুক্তিমতীর উৎসভূমি এই পর্বত। বসুরাজের মহিমা বর্ধন করার জন্যই কোলাহল পর্বতের শিলা-বাহুর আলিঙ্গন থেকে অবরুদ্ধা শুক্তিমতীর ধারামুক্তির কল্পনা। এই কল্পনার অবসান ঘটে কোলাহল-শুক্তিমতীর ভূমিকন্যা গিরিকার সঙ্গে চৈদ্য উপরিচর বসুরাজার মিলনের পর। লক্ষণীয় বিষয় হল, পৌরাণিক তালিকায় অপ্সরাসুন্দরীদের অনেক নামের মধ্যে আমরা গিরিকার নামও পেয়েছি। মহাভারতে পদ্যবন্ধে এও দেখেছি যে, মহারাজ বসু যখন বিমানে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন, তখন গন্ধর্ব-অপ্সরারা অনেকেই তাঁকে ঘিরে থাকতেন। কাজেই শুক্তিমতীর নদীর তীরবাসিনী কোনও দেশজা রমণীকে দেখেই মহারাজ হয়তো মুগ্ধ হয়েছিলেন। হয়ত তাঁর পিতৃনাম-মাতৃনাম কোনও পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বহন করে না। হয়তো বা এই রমণী কোনও স্বেচ্ছাবিহারিণী নদীর মতোই উচ্ছল। কিন্তু তবু বসু চৈদ্যের মনে সে দোলা দিয়েছিল; দেশজা সাধারণী গিরিকা তাই রাজরানী হলেন চেদিরাজ্যে।

উপরিচর বসুর কথা আবারও আসবে পরে। অন্য প্রসঙ্গে। তার আগেই জানাতে হবে যে, এই গিরিকার গর্ভে বসুরাজের পাঁচটি মহাবলশালী পুত্র হয়। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন বৃহদ্রথ। দ্বিতীয় পুত্র প্রত্যগ্রহ, তৃতীয় কুশাম্ব, চতুর্থ যদু এবং পঞ্চম মাবেল্ল। মহারাজ বসু এই পঞ্চ পুত্রের জন্ম দিয়েই বসে থাকেননি, তিনি পুত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করেছিলেন যথেষ্ট। হয়তো তাঁর মনে ছিল তাঁর প্রপিতামহ কুরুপুত্র সুধন্বাকে পিতৃরাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। মনে মনে তিনি এও জানতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চেদিরাজ্যটি নিয়ে ভাই-ভাই বিবাদ বাধতে পারে। অথবা এক পুত্র পৈতৃক রাজ্য পেলে অন্যের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। ফলত নিজের জীবৎকালেই তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দিয়েছিলেন। চেদিরাজ্যের ভূমিলগ্ন অন্যান্য অনেক রাজ্যই তিনি আপন বাহুবলে অধিকার করে নিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মগধ।

পূর্বভারতের মগধরাজ্যের তখন সেরকম কোনও আভিজাত্য ছিল না। উত্তরভারতের আর্যায়ণের পরেও মগধের দিকে আর্যরা তেমন স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখেননি কোনওদিন। সেকালের দিনে যে পাঁচটি জায়গায় এলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, তারমধ্যে চারটি দেশই পূর্বভারতে অবস্থিত। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং মগধ—এইসব রাজ্যের মৃত্তিকার মর্যাদা ছিল অত্যন্ত লঘু। অন্তত উত্তরভারতের তুলনায় তাই। মহারাজ উপরিচর বসু এই মগধ রাজ্য জয় করে সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বৃহদ্রথকে বসিয়ে দিলেন এবং এই বৃহদ্রথের নামেই মগধে বার্হদ্রথ বংশের সূচনা হল। বসুরাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রত্যগ্রহ পৈতৃক রাজ্যের অধিকার পেলেন। চেদিদেশেই তৃতীয় পুত্র কুশাম্ব নিজের নামেই কৌশাম্বী নগরী স্থাপন করলেন। রাজপুত্র কুশাম্বকে লোকে মণিবাহন বলেও ডাকত। চতুর্থপুত্র যদু রাজ্য পেলেন করূষ দেশে, যার আধুনিক নাম বাঘেলাখণ্ড। আর সর্বশেষ মাবেল্ল—অথবা বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে এই পঞ্চম পুত্রটির নাম মাথৈল্য, এমনকি মারুতও হতে পারে—তিনি রাজত্ব পেলেন মৎস্যদেশে, যা

এখনকার রাজস্থানের ভরতপুর-জয়পুর-আলোয়ার অঞ্চল। এই পঞ্চম পুত্রটিকে নিয়েও পরে কথা আসবে।

চৈদ্য উপরিচর বসু আপন বাহুবলে পাঁচ রাজ্য জয় করে তাঁর পাঁচ পুত্রকে সেই সব রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন—নানারাজ্যেষু চ সুতান্ স সম্রাড়ভ্যষেচয়ৎ। আগেই বলেছি—এই সব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মগধ, যেখানে রাজা হয়েছিলেন বাসব-জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ। উপরিচর বসু স্বয়ং এই মগধদেশ জয় করেছিলেন বলেই হয়তো এই দেশের আরেক নাম বসুমতী। খোদ বাল্মীকি রামায়ণেও মগধকে বসুমতী বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে মগধের নাম আগে মগধও ছিল না, বসুমতীও ছিল না। এই দেশের নাম আগে ছিল কীকট-দেশ। ঋগ্‌বেদে কীকটদেশের এক জননেতার নাম পাচ্ছি বটে, কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কের মত বৃদ্ধ বৈদিক লিখেছেন—কীকট-দেশ হল অনার্যদের বাসস্থান—কীকটা নাম দেশো'নার্যনিবাসঃ। এদেশে গোমাতার মর্যাদা নেই, এখানকার লোকেরা ধর্মাচার মানে না—নাশিরং দুহ্রে তপন্তি ধর্মম্—ঋগ্‌বেদের এই পংক্তি উল্লেখ করে মহামতি যাস্ক কীকটদেশের নেতাটির নামও বলে দিয়েছেন। সেই নেতার নাম প্রমগন্দ। যাস্কের মতে মগন্দ মানে কুসীদজীবী, মহাজন। আর প্রমগন্দ মানে কুসীদী-কুলীন অপবিত্র ব্যক্তিটি। ভাষাতাত্ত্বিকরা কী বলবেন জানি না, তবে বেদে উল্লিখিত মগন্দ শব্দটা থেকেই মগধ শব্দটা আসেনি তো?

কীকট সম্বন্ধে বেদের ঋক্‌মন্ত্র এবং যাস্কের বিরুদ্ধ মত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বৈদিক কালে এই দেশের আর্যায়ণ সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন পূর্বভারতের অনেকাংশেই আর্যদের অধিকার ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও কীকটদেশের অস্পৃশ্যতা ঘোচেনি। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কীকটদেশের অন্তর্গত কয়েকটি পুণ্যস্থানের মহিমা কীর্তিত হলেও বলা হয়েছে এখানকার রাজা কাককর্ণ অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-দ্বেষী মানুষ এবং ঐ জায়গায় কেউ মারা গেলেও বলতে হবে সে পাপ-ভূমিতেই মারা গেল—কীকটেষু মৃতো'প্যেষ পাপভূমৌ ন সংশয়ঃ। অথচ আশ্চর্য, একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত কীকটদেশের 'গয়া' জায়গাটা কিন্তু পিতৃপুরুষের স্বর্গদায়ী এক পুণ্যদেশ। ঐতিহাসিকেরা বৃহদ্ধর্ম কথিত কাককর্ণ রাজাকে শৈশুনাগ-বংশীয় কাক-বর্ণের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন।

কিন্তু শৈশুনাগ বংশের কাহিনী তো অনেক পরে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে কীকট-দেশের আর্যয়ণই সম্পূর্ণ হয়নি। কীকট-দেশই যে মগধ, সে কথা অভিধানচিন্তামণির মতো প্রাচীন গ্রন্থেই বলা আছে—কীকটা মগধাহ্বয়াঃ— যদিও মগধ নামটা আমরা প্রথম পাই অথর্ববেদে। আর্যায়ণের প্রথম কল্পে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ মগধরাজ্যে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদেরও ভাগ্যে সুখ ছিল না। ব্রাত্য, ব্রহ্মবন্ধু এই সমস্ত অনাচারীর সঙ্গে তাঁরা একই সগন্ধতায় উচ্চারিত। তবে মগধ সম্বন্ধে এই সমস্ত নিন্দাবাদের কারণ একটাই, মগধে আর্যদের অধিকার সহজে প্রোথিত হয়নি।

এ হেন মগধ-দেশে সাহস করে যিনি প্রথম কুরুবংশের অঙ্কুর প্রোথিত করে নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসালেন, তিনি হলেন উপরিচর বসু। কুরুবংশের পূর্বগন্ধ নিয়ে তাঁর অবশ্য মাথাব্যথা ছিল না। তিনি আপন শক্তিতে রাজ্যের অধিকার পেয়েছিলেন, অতএব তাঁর পুত্র বৃহদ্রথও হস্তিনাপুরে প্রতিষ্ঠিত কুরুবংশের মূলধারার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করেননি কখনও। বৃহদ্রথের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল অন্যরকম। মগধদেশে তাঁর নিজের নামে একটি স্বতন্ত্র নগরও প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম বৃহদ্রথপুর—বার্হদ্রথপুরং প্রতি। অবশ্য বৃহদ্রথপুর নামটি শুধু রাজা বৃহদ্রথের জায়গা বা সামান্যভাবে মগধ রাজ্য বলে মনে করলেও কোনও অসুবিধা নেই।

কারণ, মগধের রাজা বৃহদ্রথের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ।

হস্তিনাপুরের রাজা বলুন, মথুরা-শূরসেনের অধিপতি বলুন অথবা সরযূপারে অযোধ্যার রাজার কথাই বলুন, মগধের রাজধানী গিরিব্রজের মতো সুরক্ষিত রাজধানী কোনও রাজারই ছিল না। দক্ষিণ বিহারের পাটনা আর গয়া জেলা নিয়েই ছিল তখনকার গিরিব্রজের ভৌগোলিক স্থিতি। গিরিব্রজ আপনা আপনিই এক দুর্গের মতো, যার উত্তরে এবং পশ্চিমে দুই মহানদী—গঙ্গা এবং শোন। পশ্চিমে বিন্ধ্য পর্বতমালার ছিন্নাংশ আর পূর্বে আছে চম্পা নদী। এ হল মগধের সাধারণ অবস্থিতি। এর মধ্যে আবার স্বয়ং বৃহদ্রথ যে জায়গায় নিজের আবাস-গৃহটি বানিয়েছিলেন, সে জায়াগাটা ছিল একটি আদর্শ গিরিদুর্গের মতো।

মনু মহারাজ রাজাদের বাসের জন্য যে সমস্ত দুর্গের কথা বলেছেন, তার মধ্যে আদর্শ হল গিরিদুর্গ। তিনি বলেছেন, রাজা যদি নিজের রাজধানীর চারপাশে পাহাড়ের সুবিধা পান, তাহলে তাঁর মতো সুবিধে আর কিছুতে হয় না—এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে। মহাভারতের কবি মহারাজ বৃহদ্রথের রাজধানীকে বার্হদ্রথপুর বলবার আগে তার নামকরণ করেছেন গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহ। পাঁচটি পর্বতের দ্বারা রাজগৃহ সুরক্ষিত। আমাদের মনে হয় রাজগৃহকে হয়তো বা রাজগিরিও বলত কেউ কেউ, যার ফলে আজকের অপভ্রংশে রাজগির শহরটিকে পেয়েছি আমরা। অবশ্য রাজগৃহ শব্দ থেকেও রাজগির শব্দের উৎপত্তি সম্ভব।

যাইহোক মহাভারতে দেখতে পাচ্ছি—বার্হদ্রথপুরের চারদিকে যে পাহাড়গুলি আছে তাদের প্রথমটির নাম হল বইহার। মহাভারতের কবি এই শব্দটার বানান করেছেন ঐকার দিয়ে—বৈহার। সংস্কৃতের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে শব্দটাকে আগে আমি 'বিহার' শব্দ থেকে উৎপন্ন বলে ভাবতাম। কিন্তু বিভূতিভূষণের মহাকাব্যে লবটুলিয়া-বইহারের কথা পড়ার পর আমরা 'বৈহার' শব্দটিকে ভেঙে বইহারই বলতে ভালবাসি। এখানে এটাও অবশ্য জানিয়ে দিতে হবে যে, মহাভারতের কবিও 'বৈহার' বিহার শব্দজাত কোনও নিষ্পন্ন শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেননি। বৈহার তাঁর মতে আলাদা একটি শব্দ, যেটা বিপুল-বৈহার বলে একটি পাহাড়ের নামও যেমন হতে পারে, তেমনি এই শব্দের মানে হতে পারে একটি বড় পাহাড়, কবি যাকে বলেছেন—বৈহারো বিপুলঃ শৈলঃ।

মহাভারতের বর্ণনায়—বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক—এই পাঁচটি পাহাড়ের নামে পাঠভেদ আছে। তবে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মঝ্‌ঝিমনিকায় এবং আধুনিক রাজগিরে প্রচলিত আধুনিক নামগুলির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নামগুলির তুলনামূলক বিচার করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে বার্হদ্রথপুরের চারপাশের পাহাড়গুলি এইভাবে সাজানো যায়—

মহাভারত	মঝ্‌ঝিমনিকায়	আধুনিক
১ বিপুল বৈহার	বেপুল	বিপুলগিরি
২ বরাহ	বৈভার	বৈভার
৩ বৃষভ	পাণ্ডব	সোনাগিরি
৪ ঋষিগিরি	ইসসিগিল্লি -	উদয়গিরি
৫ চৈত্যক	গৃধ্রকূট	ছত্রগিরি + রত্নগিরি

আমরা যে এত গুরুত্ব দিয়ে মগধের রাজধানী গিরিব্রজ অথবা বার্হদ্রথপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করছি, তার কারণ একটাই। বসুপুত্র মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁর নিজের নামে এমনই একটি বংশ-পরম্পরা তৈরি করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য আচারভূমির বাইরে, যা হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনুর সম-সময়েই এক প্রবল পরাক্রান্ত রূপ ধারণ করেছিল। একথা ঠিক যে বৃহদ্রথের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্ররা সকলেই খুব নামী রাজা ছিলেন না এবং তাঁদের সবার নামও সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু বৃহদ্রথের পাঁচ-সাত পুরুষ পরেই এই বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর জন্য এই অনার্যপ্রায় জনপদ ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামী জনস্থানে পরিণত হল। মগধের রাজ-সিংহাসনে যেদিন মহারাজ জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক হল, সেদিন কেউ ভাবেনি যে, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা মগধের অনুশাসনে আবর্তিত হবে। জরাসন্ধ এমনই এক রাজা যিনি সমগ্র পূর্ব-ভারতকে এক বিশাল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং পরাক্রমশালিতার মিশ্রণে জরাসন্ধের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের আর্যস্থানে তখন এমন কোনও আর্য রাজা ছিলেন না, যিনি মাগধ জরাসন্ধের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পারেন। তাঁর একটা সুবিধে ছিল—চেদি, করূষ অথবা কৌশাম্বীতে তাঁর নিজের জ্ঞাতি-গুষ্ঠিরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এঁরা যেমন জরাসন্ধের অনুসরণ করতেন আত্মীয়তার কারণে, তেমন অনাত্মীয় যাঁরা, তাঁরা জরাসন্ধের অনুগমন করতেন ভয়ে, শাস্তির ভয়ে।

AMARBOI.COM

আশ্চর্য ব্যাপার হল, জরাসন্ধ হস্তিনাপুরবাসী কৌরবদের সঙ্গে কখনও নিজে থেকে শত্রুতা আচরণ করেননি। হয়তো এর পিছনে তাঁর বংশমূল কুরুরাজার পূর্ব-স্মৃতি কাজ করেছে। কিন্তু জরাসন্ধের মনের গভীরে যদি বা এই ভাবনা-গৌরব কিছু থেকেও থাকে, কৌরব শান্তনু বা মহামতি ভীষ্ম সে কথা মনে রেখেছিলেন বলে মনে হয় না। হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে যখন গঙ্গার দেখা হল, তখনও জরাসন্ধের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমরা কিছু শুনতে পাইনি বটে, কিন্তু তিনি তখন জন্মেছিলেন নিশ্চয়ই। অন্যদিকে এই অনুমান অবশ্যই সার্থক যে, মহামতি ভীষ্ম যখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন, তখন জরাসন্ধ শুধু পূর্বভারত নয়, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিক্রান্ত রাজা। এই অনুমানের প্রমাণ একটাই। মথুরা শূরসেনের রাজা কংস, যিনি যাদব-কুলপতি উগ্রসেনের পুত্র ছিলেন, তিনি ছিলেন মগধরাজ জরাসন্ধের জামাই। পরিষ্কার বোঝা যায়, মথুরাধিপতি উগ্রসেন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং হস্তিনাপুরের বৈধ রাজপুত্র শান্তনব ভীষ্ম ছিলেন পরস্পর পরস্পরের ছোট-বড় সমসাময়িক, যাকে ইংরেজি ভাষায় বলি younger বা older contemporaries.

চুয়ান্ন

হস্তিনাপুরে মহারাজ শান্তনু যখন রাজত্ব করছেন, পাঞ্চালে যখন দ্রুপদ-পিতা পৃষতের অধিকার চলছে অথবা মগধে জরাসন্ধ যখন যৌবনে পদার্পণ করেননি, তখনও কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যাদবদের অবস্থা খুব ভাল। আমরা আগেই জানিয়েছি— যাদবদের মধ্যে কার্তবীর্য অর্জুন অথবা তারও আগে শশবিন্দুর মতো বিরাট পুরুষ জন্মেছিলেন। মহারাজ সত্বান্ বা সাত্বত জন্মানোর পর যাদবদের বিশাল বংশ খানিকটা খণ্ডিত হল বোধহয়। সাত্বতের প্রত্যেকটি পুত্রই এত বিখ্যাত ছিলেন যে, সেই সময় থেকে বংশ-পরম্পরায় একজনকে রাজা বানিয়ে দেওয়াটা খুব কঠিন ছিল। সাত্বত্ত-পুত্রদের একেক জন পুরুষ থেকে একেকটি প্রখ্যাত বংশধারার সূত্রপাত হয়। ভোজ, অন্ধক, ভজমান, বৃষ্ণি—এঁদের মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন? এঁরা প্রত্যেকেই খ্যাতিমান পুরুষ।

আবারও এঁদেরও পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে এত বিখ্যাত মানুষ আছেন, যাতে যে কোনও একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আর সবাই তাঁর মত মেনে চলবেন— এমন কল্পনা করাটা যেমন অসম্ভব, তেমনই অবাস্তব। যদুবংশের অধস্তনরা, বিশেষত সাত্বতবংশীয়রা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরাও ব্যাপারটা বুঝতেন। অতএব রাজ্য শাসনের জন্য সেইকালেই তাঁরা এক অভিনব উপায় সৃষ্টি করেন। সাত্বতের পুত্রেরা বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজেরা প্রত্যেকেই তাঁদের পুত্র-পরিবার সহ একেকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান, যে গোষ্ঠীর নাম ছিল সংঘ। যেমন ভোজসংঘ, বৃষ্ণিসংঘ, অন্ধক-সংঘ।

মনে রাখা দরকার, এই 'সংঘ' শব্দটি আমাদের স্বকপোলকল্পিত কোনও শব্দমাত্র নয়। খোদ মহাভারতের শান্তিপর্বেই যাদবদের নানা গোষ্ঠীর সম্বন্ধে সংঘ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং ভগবান নামে চিহ্নিত সেই কৃষ্ণকে 'সংঘমুখ্য' বলে ডাকা হয়েছে—সংঘমুখ্যো'সি কেশব।

মহামতি কৌটিল্যও অর্থশাস্ত্র রচনার সময় যদু-বৃষ্ণি-সংঘের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকেরা সংঘ-নায়ক হিসেবে এতটাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে বৈয়াকরণ পাণিনি থেকে আরম্ভ করে পতঞ্জলির সময় পর্যন্ত তাঁদের অধস্তন বিশাল ব্যক্তিত্বদের নামের পরে কী ধরনের তদ্ধিত প্রত্যয় ব্যবহার করা হবে তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে— ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণি-কুরুভ্যশ্চ।

পণ্ডিতেরা কৌটিল্য এবং পাণিনির শব্দচয়ন মাথায় রেখে অন্ধক-বৃষ্ণিদের গোষ্ঠীগুলিকে 'রিপাবলিক' বা 'কর্পোরেশন' নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অন্যেরা বলেন, এগুলি 'রিপাবলিক' ঠিক নয়, বরং এগুলিকে 'অলিগার্কি' বলাটা বেশ যুক্তিসঙ্গত। আমরা এইসব মতের কোনওটাই অস্বীকার করছি না। কেন না, 'রিপাবলিক' বলুন, 'কর্পোরেশন' বলুন, অথবা 'অলিগার্কিই' বলুন—যদু-বৃষ্ণিদের শাসনতন্ত্র আধুনিকনামা এই সমস্ত তন্ত্রেরই মিশ্রণ, যে নামেই ডাকুন খুব একটা অসঙ্গত হবে না।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে— একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি কতিপয় সংঘমুখ্যের বিবেচনায় চলে, সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরোধ ঘটাটাও খুব স্বাভাবিক। হস্তিনাপুরের শান্তনুর সময়ে আমরা যাদবদের শাসন ব্যবস্থার যা পরিমণ্ডল লক্ষ্য করেছি, তাতে অন্ধক-কুকুর বংশের ধারার প্রধান পুরুষটিকেই সকলে মিলে রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনুর সম-সময়ে যিনি অন্ধক-বৃষ্ণিদের সর্বসম্মত সংঘমুখ্য বা রাজা হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁর নাম আহুক। আহুকের পিতার নাম অভিজিৎ এবং আহুক নিজে এতই বিখ্যাত ছিলেন যে তাঁর বোনের নামও হয় তাঁরই নামে — আহুকী।

আমরা পূর্বে পৌরাণিকদের সঙ্কলিত গাথার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছি। পুরাণের মধ্যে যেখানে গাথা বলে কারও কথা উল্লেখ করা হয়, বুঝতে হবে সেই অংশ পুরাণ-রচনার পূর্বে মানুষের শ্রুতি-পরম্পরায় সেই কথা এসেছে। আহুকের উৎসাহ এবং উদ্যম ছিল বেগবান অশ্বের মতো। তিনি যখন সপরিবারে কোথাও যেতেন, তখন অন্তত আশি জন মানুষ তাঁর সিংহাসন বয়ে নিয়ে যেত। যে মানুষের পুত্রসন্তানের জনক হওয়ার ভাগ্য নেই, যে মানুষ অন্তত একশ জন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেননি, যে মানুষ শুদ্ধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেননি— তেমন মানুষ কোনও দিন আহুকের ধারেকাছে যেতে পারতেন না।

আহুকের গুণকীর্তন করে যে গাথা তৈরি হয়েছে, তার আশয় থেকে বোঝা যায়, সেকালের দিনের নিরিখে যাঁদের খুব সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মনে করা হত, আহুকের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিলেন তাঁরাই। আহুকের রাজোচিত আড়ম্বরও কম ছিল না। দশ হাজার হাতির সওয়ার আর দশ হাজার সপতাক রথে চড়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী তাঁকে অভিনন্দন জানাত। এটা 'মার্চ পাস্টে' 'স্যালুট' নেবার মতো কোনও ব্যাপার। এর পরেই বলা হচ্ছে—ভোজবংশীয় সমস্ত রাজাই তাঁকে সবসময় অভ্যর্থনা জানাতেন এবং মহারাজ আহুক বোধহয় সমস্ত যদু-বৃষ্ণি সংঘকে নিজের আয়ত্তে আনার জন্য মথুরা-শূরসেনের পূর্ব এবং উত্তরদিকে কিছু কিছু যুদ্ধযাত্রাও করেছিলেন— পূর্বস্যাং দিশি নাগানাং ভোজস্য প্রতিমোʼভবৎ।

বিভিন্ন পুরাণ এবং হরিবংশে আহুকের সম্বন্ধে যে গাথাগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলির মধ্যে বিস্তর পাঠভেদ আছে। এগুলির বাংলা অনুবাদেও কোনও সমতা নেই, কোথাও কোথাও তা উদ্ভটও বটে। তবে সমস্ত শ্লোকের মর্মার্থ বিবেচনা করে যা বোঝা যায়, তাতে মথুরা শূরসেনের

AMARBOI.COM

পূর্ব এবং উত্তরদিকে যে সব ভোজ-যাদব ছিলেন তাঁদের তিনি আপন ব্যক্তিত্বে একত্র করতে পেরেছিলেন হয়তো। তবে আহুকের পরে যাদব-ভোজদের এই রাজনৈতিক বন্ধন সামান্য শিথিল হয়েছিল বলে মনে হয়।

আহুকের বিয়ে হয়েছিল কাশীর রাজার মেয়ের সঙ্গে এবং তাঁর গর্ভে আহুকের দুটি পুত্র হয়। তাঁদের নাম হল দেবক এবং উগ্রসেন। মহাভারত এবং পুরাণগুলির বক্তব্য থেকে দেবককেই আহুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মনে হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি রাজা হননি, সে কথা কোথাও বলা নেই। আহুকের পরে উগ্রসেনই রাজা হন এবং তিনি ভালই রাজত্ব চালাতে থাকেন। এমন কি উগ্রসেনের জন্য অন্ধক-কুকুরের বংশধারার সুনামও হয় যথেষ্ট। পতঞ্জলির মতো বিশালবুদ্ধি বৈয়াকরণ সামান্য একটা তদ্ধিতপ্রত্যয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে উগ্রসেনের সঙ্গে তাঁর বংশেরও নামোল্লেখ করেছেন— অন্ধকো নাম উগ্রসেনঃ। স্বভাবতই বোঝা যায় যাদবদের মধ্যে তিনিই নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্ধকেরা তো বটেই ভোজ, বৃষ্ণি, কুকুর, শূর—এইসব ছোট ছোট যাদব গোষ্ঠীর নেতারা সকলেই উগ্রসেনকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। রাজ্যও ভাল চলছিল।

হস্তিনাপুরের অধিপতি শান্তনুর সঙ্গে যাদবদের যেহেতু সরাসরি কোনও বিবাদ হয়নি, অতএব যাদবরা এবং কৌরবরা পাশাপাশি ভালই ছিলেন। কিন্তু কুরুপুত্র সুধন্বার বংশধর জরাসন্ধ, যিনি মগধে রাজা হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাদবদের সম্পর্ক মোটেই ভাল রইল না তার কারণও আছে যথেষ্ট। সুধন্বার চতুর্থ পুরুষ উপরিচর বসু, যিনি হঠাৎ চড়াও হয়ে চেদিরাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন, সেই চেদি কিন্তু পূর্বে যাদবদের অধিকারে ছিল।

আমরা ইতঃপূর্বে যাদব রাজা জ্যামঘর কথা বলেছি। সেই জ্যামঘ, যিনি যুদ্ধ জয় করে এক রমণীকে রথে চড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং স্ত্রীর কাছে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করেছিলেন— এই রমণী তোমার পুত্রবধূ হবে। এই জ্যামঘ কিন্তু প্রথম শুক্তিমতী নদীর তীরভূমি থেকে আরম্ভ করে নর্মদা নদীর তীরভূমি পর্যন্ত জয় করে নেন। চেদি, বিদর্ভ এই সমস্ত নগরের পত্তন করেন যাদবরাই এবং এইসব জায়গায় জ্যামঘের বংশধরেরাই রাজত্ব করছিল। পুরাণ অনুসারে বিদর্ভ জ্যামঘের পুত্র এবং বিদর্ভের অধস্তন ক্রথ-কৈশিকের অন্যতম কৈশিকের পুত্র হলেন চেদি, যাঁর নামে তাঁর বংশধরেরা চৈদ্য নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন—চেদিঃ পুত্রঃ কৈশিকস্য তস্মাচ্চৈদ্যা নৃপাঃ স্মৃতাঃ।

যাদব চৈদ্যদের ওপর চড়াও হয়ে যিনি চেদি রাজ্য দখল করে নিলেন, তিনিই তো উপরিচর বসু চৈদ্য। শুধু চেদি কেন উপরিচর বসুর পাঁচ ছেলে যখন পাঁচ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তখন চেদি, কারুষ, মগধ (বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলাখণ্ড, এবং গয়া-পাটনা)— এগুলি তো মগধরাজ জরাসন্ধের অধিকারে বা আয়ত্তে ছিলই, এমন কি মৎস্য দেশও (জয়পুর+ভরতপুর +আলোয়ার) যখন জরাসন্ধের শাসনে নাই হোক অনুশাসনে এসে গেছে। মহাভারতের মধ্যে যেসব জায়গায়—'চেদি-মৎস্য-কারুষাশ্চ' কিংবা 'চেদি-মৎস্যানাম্' বলে দ্বন্দ্ব-সমাস করা হয়েছে, সেইসব জায়গাতেই বার্হদ্রথ পরিবার জরাসন্ধের সাম্রাজ্যবাদ অনুস্মৃত হয়েছে.

বস্তুত জরাসন্ধ মগধদেশে রাজত্ব করছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, পূর্ব ভারতের মগধরাজ্যকে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিলেন। লক্ষ্য করে দেখুন ভারতবর্ষের মানচিত্রে মথুরা-শূরসেন, হস্তিনাপুর, এবং পাঞ্চাল ছাড়া দক্ষিণে, উত্তরে এবং পূর্বে সর্বত্রই তখন জরাসন্ধের লোকজনেরাই রাজত্ব

করছেন। দক্ষিণে এবং উত্তর ভারতের মৎস্য দেশের আগে যেহেতু যাদবদেরই একচ্ছত্র অধিকার ছিল অতএব যাদবদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন জরাসন্ধ। যাদবরা জরাসন্ধের অগ্রগতি রোধও করতে পারেননি, তাঁর সঙ্গে সন্ধিও করতে পারেননি। অন্যদিকে জরাসন্ধ মথুরা-শূরসেনের অর্থাৎ যাদবদের মূল ঘাঁটিতে ঢুকতে চাইছিলেন, কিন্তু ওই একটি জায়গায় যাদবদের অধিকার অত্যন্ত দৃঢ়প্রোথিত থাকায় জরাসন্ধ সোজাসুজি সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যে যাননি। তিনি উপায় খুঁজছিলেন, যে উপায়ে সুদূর মগধরাজ্য থেকে কোনও আক্রমণ না চালিয়েও মথুরা-শূরসেনে নিজের শাসন কায়েম রাখা যায়।

মহারাজ উগ্রসেনের পুত্রসংখ্যা কম নয়। সব মিলে তাঁর নয়টি পুত্র। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন কংস—নবোগ্রসেনস্য সুতাস্তেষাং কংসস্তু পূর্বজঃ। অন্য পুত্রদের নাম ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, সভূমিপ, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, অনাধৃষ্টি এবং পুষ্টিমান। কংস যদিও উগ্রসেনের একান্ত আত্মজ বলে পরিচিত, তবুও এই ছেলেটি তাঁর আপন ঔরসজাত কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পৌরাণিকেরা কংসকে কৃষ্ণের শত্রুপক্ষে স্থাপন করে, তাঁকে রাক্ষস, দানব— যা ইচ্ছে তাই বলেছেন। কিন্তু কংস রাক্ষসও নন, দানবও নন। তবে তাঁর জন্মের মধ্যে কিছু রহস্যও আছে, কলঙ্কও আছে। পুরাণকারেরা কৃষ্ণ-সমর্থিত উগ্রসেনের মাহাত্ম্য স্থাপনের জন্য সেইসব পারিবারিক কলঙ্কের কথা প্রায় উল্লেখই করেননি। একমাত্র হরিবংশের একটি কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে সহজ দাম্পত্যসুখে কংসের জন্ম হয়নি, তাঁর জন্ম হয়েছে উগ্রসেনের স্ত্রীর গর্ভেই, কিন্তু অন্যকৃত ধর্ষণে।

শোনা যায়, মহারাজ উগ্রসেনের স্ত্রী একবার রাজবাড়ির বউ-ঝিদের সঙ্গে পর্বতের শোভা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে সুযামুন পর্বতের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন—প্রেক্ষিতুং সহিতা স্ত্রীভি র্গতা বৈ সা কুতূহলাৎ। সুযামুন পর্বত যমুনা নদীর তীরবর্তী কোনও ক্ষুদ্র পর্বত ছাড়া আর কিছুই নয়, কেন না এই নামে কোনও পাহাড়ের নাম আমরা শুনিনি। যাই হোক, মথুরাপুরীর অন্তর্গৃহের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে উগ্রসেনের গৃহিণী পরমানন্দে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একবার পাহাড়ে উঠছিলেন, একবার নদীর তীর বেয়ে উচ্ছলভাবে ছুটে যাচ্ছিলেন, কখনও বা পর্বতকন্দরে বসে বসে প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলেন—চচার নগশৃঙ্গেষু কন্দরেষু নদীষু চ। প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল বড় মধুর। পৌরাণিকদের চিরাচরিত বর্ণনা অনুযায়ী ময়ূর, ভ্রমর কিংবা নাগকেশর ফুলেরও কোনও অভাব ছিল না সেখানে। সমীরণ-মথিত কদম্ব-পুষ্পের সর্বত্র মধুকরের আভরণ। নীচে পাদচারের ভূমি নবতৃণচ্ছন্না। বসন্তের ঋতুস্নাতা সমগ্র পার্বত্য বনাঞ্চলের শোভা যেন ঋতুস্নাতা যৌবনস্থা বনিতার মতো।

চিরাচরিত এই বর্ণনার মধ্যে আমরা যেতাম না, যদি না আমরা উগ্রসেনের পত্নীকে এই বাসন্তিক শোভায় বিহ্বলা না দেখতাম। প্রকৃতির বিহ্বলতায় আতুরা রমণীর মনে এই মুহূর্তে আমরা পুরুষের সঙ্গকামনার উৎস দেখতে পাচ্ছি। তিনি মহারাজ উগ্রসেনের কথা ভাবছিলেন, তাঁকে কাছে পেতে চাইছিলেন—স্ত্রীধর্মম্ অভিরোচয়ৎ। ঠিক এই মুহূর্তে, মহারাজ উগ্রসেন নয়, আরও একটি মানুষকে সেই সুযামুন পর্বতের উদ্ধত ভূমিতে রথ থেকে অবতরণ করতে দেখছি। হরিবংশ ঠাকুর আমাদের পৌরাণিক কল্পনাপুষ্ট করে এই পুরুষটিকে 'দানব' বলে ডেকেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সৌভপতি বলে চিহ্নিত করে এই পুরুষটির মনুষ্য-পরিচয়ও আচ্ছন্ন করেননি—অথ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ দ্রুমিলো নাম দানবঃ।

সৌভপতি দ্রুমিল। সেই রথচারী পুরুষের নাম। হরিবংশের কথক ঠাকুর যতই বলুন দ্রুমিল দানব বিমানে চড়ে মনোরথগতিতে এসে নামলেন সেই পর্বতের শিখরে, আমরা জানি সৌভদেশটার

ভূগোল জানলেই আর কোনও দানবের গোল থাকবে না এই কাহিনীর মধ্যে। বস্তুত সৌভপুর বলে একটা জায়গা আছে যেখানে শাম্বরা থাকতেন। মহাভারতে এক শাম্ব রাজার সঙ্গে ভীষ্মের এবং অন্য এক শাম্ব রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল। এই শাম্ব রাজারাই সৌভদেশে থাকতেন। শাম্ব শব্দটা একটি মানুষের নামমাত্র নয়, এটি একটি জাতির নাম, যাঁদের রাজধানী ছিল সৌভপুর।

পারজিটার লিখেছেন— শাম্ব-রাজারা থাকতেন রাজস্থানের আবু পাহাড়ের কাছাকাছি। অন্যেরা বলেন শাম্বরা যমুনা থেকে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত মোটামুটি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে অবশ্য যমুনা নদীর তীরেই শাম্বদের নিবাস নির্ণীত হয়েছে। মহাভারতে শাম্ব-মৎস্যদের দ্বন্দ্ব সমাস (শাম্বা-মৎস্যাস্তথা) দেখে মনে হয় শাম্বদের সঙ্গে মৎস্য-দেশের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সে যাই হোক, যমুনাপারের দেশই হোক আর রাজস্থানের কোনও জায়গার মানুষই হোন সৌভপতি দ্রুমিল যমুনা নদী বা হরিবংশ কথিত সুযামুন পর্বতের থেকে বহু দূরে কোথাও থাকতেন না। অন্যদিকে মৎস্যদেশে আলোয়ার বা আবু-পাহাড়ের কাছাকাছি যেহেতু মগধরাজ জরাসন্ধের আত্মীয়-পরিজনেরাই রাজত্ব করতেন, তাই আমাদের দৃঢ় অনুমান এই সৌভপতি জরাসন্ধেরই অনুগত কেউ। রাজা বলে তাঁকে প্রথমে ডাকা হয়নি, কারণ তিনি রাজা ছিলেন না। আমদের এই অনুমান আরও সুদৃঢ় হবে যখন পরে আমরা জরাসন্ধের সঙ্গে শাম্ব রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের প্রমাণ দেব। মহাভারতের শাম্বকেই সৌভপতি বলা হয়েছে কাজেই হরিবংশে যে সৌভপতি দ্রুমিলকে এক্ষুণি সুযামুন পর্বতে এসে পৌঁছতে দেখলাম, তিনি অবশ্যই শাম্বরাজের লোক ওরফে জরাসন্ধের লোক।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী দানব দ্রুমিল একচারিণী উগ্রসেন-পত্নীকে পর্বতের শোভা-বিবর্তের মধ্যগত অবস্থায় নিরীক্ষণ করে রূপমুগ্ধ হলেন এবং তিনি নাকি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে, রমণী উগ্রসেনের পত্নী। সৌভপতি তখন উগ্রসেনের রূপ ধরে সকামা সেই রমণীর সঙ্গে সুরত-ক্রীড়ায় মত্ত হলেন। উগ্রসেনের পত্নী প্রথমে কিছুই নাকি বোঝেননি, তারপর দানব দেহের অতিরিক্ত ভারে তিনি সচেতন হন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ধৃষ্ট নায়ক উগ্রসেন নন।

আমাদের ধারণা—এ সব কথা উগ্রসেনের পত্নীর সতীত্ব রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত। নইলে সৌভপতি পর্বত-বন-বিহারিণী একাকিনী রমণীকে ধর্ষণ করেছেন সুযোগ বুঝে এবং উগ্রসেনের পত্নী তা মেনে নিয়েছেন নিরুপায় এবং বাধ্য হয়ে। ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেল। ধর্ষিতা উগ্রসেনপত্নী স্বামী ছাড়া অন্য মানুষের দ্বারা ধর্ষিত হলেন এবং ধর্ষণ একান্তভাবেই দানবোচিত বলেই তিনি দানবরাজ দ্রুমিল। যাই হোক, উগ্রসেনের পত্নী সক্রোধে বলে উঠলেন—তুই কে? এমন করে আমার স্বামীর রূপ ধারণ করে আমার সতীত্ব নষ্ট করলি? আমার আত্মীয়-স্বজন এখন আমাকে কীই বা না বলবে এবং সেইসব নিন্দাবাদ শুনে কীভাবেই বা আমি বেঁচে থাকব—কিং মা' বক্ষ্যন্তি রুষিতা বান্ধবাঃ কুলপাংসনীম্?

সৌভপতি অনেকক্ষণ গালাগালি শুনলেন, তারপর এক সময় ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন— দেখ রমণী। অনেকক্ষণ তুমি বিজ্ঞের মতো কথা বলছ—মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি। আমি সৌভপতি দ্রুমিল, এমন কিছু হেঁজি-পেজি লোক নই আমি যে এত বকতে হবে। দেবতা-দানবদের সঙ্গে একটু ব্যভিচার করলে তোমার মতো মানুষের এমন কিছু দোষ হয়ে যায়না। এই রকম ব্যভিচারের ফলে কত কত মানুষী রমণীর গর্ভে কত শত নামকরা দেবতার মতো ছেলে হয়েছে শুনেছি। সেখানে তুমি এমন করে চুল-ফুল-কাঁপিয়ে ঘৃতশুদ্ধ সতীত্বের

বড়াই করছ যেন কীই না কী ঘটে গেছে— শুদ্ধা কেশান্ বিধুন্বন্তী ভাষণে যদ্ যদিচ্ছসি? আমি বলি কি, ওগো বড়ো মানুষের মেয়ে! তুমি যে আমাকে বড় মুখ করে জিজ্ঞাসা করলে—কস্য ত্বং— তুই কার ছেলে, এর থেকেই তোমার ছেলের নাম হবে কংস।

হরিবংশে অন্যত্র উগ্রসেনের নয় ছেলের লিস্টি দেবার সময় কংসের নাম করে আলাদাভাবে বলেছেন— কংসস্তু পূর্বজঃ। এখন এই 'পূর্বজ' মানে সবার আগে জন্মানো জ্যেষ্ঠ পুত্রও যেমন হতে পারে তেমনই হতে পারে—কংস অন্য সময়ে অন্যভাবে আগে জন্মেছিলেন। দাম্পত্য সরসতার ফল তিনি নন, তিনি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্রমাত্র। কংসের নিজের মুখ দিয়েই এ কথা পরে বেরিয়েছে— ক্ষেত্রজো'হং সুতস্তস্য উগ্রসেনস্য হস্তিপ।

সেকালের দিনে পত্নীগর্ভজাত এইরকম ক্ষেত্রজ পুত্রকে ত্যাগ করার রীতি ছিল না। বরং সে পুত্রকে সাদরে মানুষ করার মধ্যেই বংশের সম্মান ছিল। কিন্তু কংস বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সেইসব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল, যা একজন বড় বংশের ছেলের মানায় না। অত্যাচার এবং রাজ্যকামিতা তাঁকে পেয়ে বসল। আমাদের ধারণা, তাঁর জন্মদাতা সৌভপতির সঙ্গে কংসের যোগাযোগ নাই থাক, কিন্তু মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর দৃঢ় যোগাযোগ ছিল। হয়তো কংসের আনুক্রমিক দুর্ব্যবহারে তাঁর মাতা-পিতাও তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁরা সাময়িকভাবে তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। কংস নিজেই এক সময় এ কথা বলেছেন—আমি নিজের ক্ষমতায় বড় হয়েছি, বাপ-মা আমাকে কোনও সুযোগ দেননি, তাঁরা আমায় ত্যাগ করেছেন— মাতৃপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ স্থাপিতঃ স্বেন তেজসা।

উগ্রসেনের সঙ্গে তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্রের তিক্ত সম্পর্কের সম্পূর্ণ সুযোগ নেন মগধরাজ জরাসন্ধ। কংসের সঙ্গে তিনি আত্মসম্পর্ক গড়ে তোলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। জরাসন্ধের দুটি মেয়ে ছিল। তাঁদের নাম অস্তি আর প্রাপ্তি। মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরবার জন্য তিনি এই মেয়ে দুটির বিয়ে দেন কংসের সঙ্গে। কংস জরাসন্ধের এই ব্যবহারে ধন্য হয়ে যান। বলা বাহুল্য, কংসের এই বিবাহ হয়েছিল পিতা-মাতার বিনা অনুমতিতে। জামাই কংসকে জরাসন্ধ এরপর রাজনৈতিক মদত দিতে থাকেন, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে মথুরা-শূরসেনের রাজনৈতিক পরিবর্তনে।

কংস জরাসন্ধের সাহায্যে নিজ পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসন থেকে হঠিয়ে দিয়ে নিজে মথুরার সিংহাসন দখল করেন। এর মধ্যে যে জরাসন্ধের সাহায্য বহুল পরিমাণে ছিল, তার প্রমাণ আছে মহাভারতের সভাপর্বে, যেখানে জরাসন্ধবধের পরিকল্পনা করার সময় বাসুদেব কৃষ্ণ নিজ মুখে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন—বার্হদ্রথ কুলে জাত জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তিকে বিয়ে করে শ্বশুরের বলে বলীয়ান হয়ে কংস আমাদের যাদবকুলের আত্মীয়-জ্ঞাতিদের দলিত পিষ্ট করে ছেড়েছিল— বলেন তেন স্বজ্ঞাতীন্ অভিভূয় বৃথামতিঃ।

পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসন-চ্যুত করেই কংস নিশ্চিন্ত থাকেননি। তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। আমরা আগেই বলেছি— যাদবদের রাজ্য ছিল প্রধানত সংঘনির্ভর অলিগার্কি-গোছের। অন্ধক, কুকুর, বৃষ্ণি, শৈনেয়— এইভাবে অন্তত আঠারটা সংঘের কথা আমরা কৃষ্ণের মুখে পরবর্তীকালে শুনব। উগ্রসেন যদি কারাগারের বাইরে থাকেন, তবে যদি তিনি যদু-বৃষ্ণি সংঘের সকলকে একত্রিত করে কংসের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ রচনা করেন, তবে যে স্বনিযুক্ত মথুরাধিপতি কংসের সমূহ বিপদ হবে, সে কথা কংস খুব ভাল করেই জানতেন।

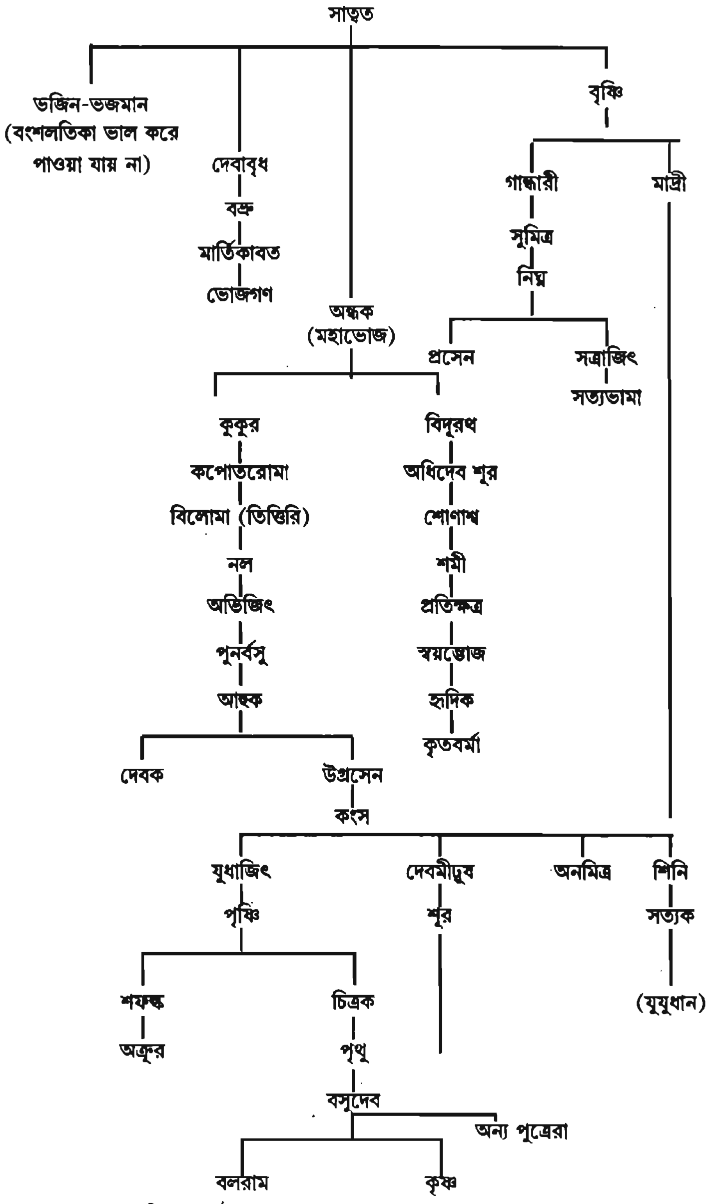
সাত্বত
ভজিন-ভজমান
(বংশলতিকা ভাল করে
পাওয়া যায় না)
দেবাবৃধ
বভ্রু
মার্তিকাবত
ভোজগণ
অন্ধক
(মহাভোজ)
বৃষ্ণি
গান্ধারী
মাদ্রী
সুমিত্র
নিঘ্ন
প্রসেন
সত্রাজিৎ
সত্যভামা
কুকুর
কপোতরোমা
বিলোমা (তিত্তিরি)
নল
অভিজিৎ
পুনর্বসু
আহুক
দেবক
উগ্রসেন
কংস
বিদূরথ
অধিদেব শূর
শোণাশ্ব
শমী
প্রতিক্ষত্র
স্বয়ম্ভোজ
হৃদিক
কৃতবর্মা
যুধাজিৎ
পৃশ্নি
দেবমীঢুষ
শূর
অনমিত্র
শিনি
সত্যক
(যুযুধান)
শফল্ক
অক্রূর
চিত্রক
পৃথু
বসুদেব
অন্য পুত্রেরা
বলরাম
কৃষ্ণ

খেয়াল রাখতে হবে—যদুবৃষ্ণি সংঘের যাঁরা প্রধান ছিলেন, তাঁদের ব্যবহার ছিল অনেকটা সুলতানি আমলের আমির-ওমরাহদের মতো। উগ্রসেন যেমন এঁদেরই মদতে নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তেমনই রাজা হওয়ার পর কংসেরও প্রধান কাজ ছিল— এইসব সংঘমুখ্যের মদত সংগ্রহ করা। আমরা সময়-মতো প্রমাণ করে দেখাব যে অন্ধকসংঘ, কুকুরসংঘ, বৃষ্ণিসংঘ, পৃষ্ণিসংঘ, ভোজসংঘ, শিনিসংঘ—এইসব যদুসংঘের বেশিরভাগ প্রধান পুরুষেরাই সাময়িকভাবে কংসের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছেন। অর্থাৎ ভয়েই হোক অথবা ঝামেলা এড়ানোর জন্য সংঘমুখ্যরা অনেকেই কংসকে মদত দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজসভার অলংকার হলেও এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই ছিলেন যাঁরা সামানাসামনি কংসের মন যুগিয়ে চললেও আড়ালে সিংহাসনচ্যুত রাজা উগ্রসেনের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন— এরকমই একজন সংঘমুখ্য হলেন কৃষ্ণের পিতা বসুদেব।

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। একেবারে নির্ভুলও নয়। তবে এটা থেকে যদুবৃষ্ণিদের সংঘ-মুখ্যদের একটা আঁচ পাওয়া যাবে। এঁদের মধ্যে বয়সেরও সমস্যা আছে। সমসাময়িক হলেও কেউ বয়োজ্যেষ্ঠ, কেউ বা বয়ঃকনিষ্ঠ।

পঞ্চান্ন

বার্হদ্রথ জরাসন্ধ এখন কেবলই মগধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পূর্বভারতে কৌরব বংশধারার বীজ তখন কেবলই উপ্ত হয়েছে মাত্র। তখনও সমগ্র ভারত জরাসন্ধের পরাক্রমে পর্যুদস্ত হয়নি। হস্তিনাপুরের যুবরাজ শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার চঞ্চল সাক্ষাৎকার কেবলই সমাপ্ত হয়েছে। মথুরা ভূখণ্ডে তখন আহুকপুত্র উগ্রসেন আপন অধিকার কেবলই বিস্তারিত করছেন। আনুমানিক ঠিক সেই সময়ের এক গোধূলিবেলায় আধুনিক মিরাটের পশ্চিম দিকে যেখানে যমুনা নদী বয়ে যাচ্ছে, সেই যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে একটি নৌকা দাঁড়িয়েছিল। যাতে নদীতে ভেসে না যায়, সেইজন্য একটি লতানির্মিত রজ্জুর একদিকে একটি খুঁটি বেঁধে সেটি যমুনার তীরভূমিতে আটকানো রয়েছে। রজ্জুর অন্য প্রান্ত নৌকার সঙ্গে বাঁধা।

নৌকাটি জলের ওপর ভাসছিল। নদীর কৃষ্ণবর্ণ জলতরঙ্গগুলি ছলাৎ ছলাৎ করে তীরের ওপরেও যেমন সামান্য আছড়ে পড়ছিল, তেমনই নৌকার তলদেশেও সেই তরঙ্গের অভিঘাত টের পাওয়া যাচ্ছিল। নৌকাটি একটু-আধটু দুলছে আর সেই ঈষদুচ্চলিত নৌকার হালের পিছনে একটি রমণীকে বসে থাকতে দেখা গেল। রমণী অতিশয় সুন্দরী। কিন্তু তাঁর গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। লোকেও তাঁকে কালী বলে ডাকে।

কালো যমুনার জলের ওপর নৌকার প্রান্তদেশে নিষণ্ণা কৃষ্ণবর্ণা এই রমণী চিত্রার্পিতের মতো দিগন্তের শোভা বর্ধন করছিলেন। তাঁর কেশরাশি মাথার ওপর চূড়া করে বাঁধা। আতাম্র ওষ্ঠাধারের মধ্যে মুক্তাঝরানো হাসি। রমণীর উত্তমাঙ্গের বস্ত্র পৃষ্ঠলম্বী গ্রন্থিতে দৃঢ়নিবদ্ধ। আর অধমাঙ্গের বস্ত্র কিছু খাটো। নৌকার ত্রিকোণ প্রান্তের ওপর বসে রমণী পা-দুটি নিবদ্ধ অবস্থায় নৌকার কাষ্ঠ-স্তরের ওপর ছড়িয়ে দেবার ফলে কদলীস্তম্ভ-সদৃশ তার পা-দুটি উরু পর্যন্ত প্রায় অনাবৃত।

আপনি সাধারণ মানুষ হোন অথবা জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাপুরুষ, নীলোর্মিচঞ্চল যমুনার জলে একটি নৌকার ওপর এমন একটি স্বভাবসুন্দর প্রত্যঙ্গমোহিনী রমণীমূর্তি দেখতে পেলে যোগী-ধ্যানী—কারও ধৈর্য স্থির থাকবে না—অতীবরূপসম্পন্নাং সিদ্ধানামপি কাঙ্ক্ষিতাম্। নদীর তীরভূমিতে এইমাত্র যে এক মহর্ষি এসে পৌঁছলেন, তিনি নদীর পরপারে যাবার জন্যই এসেছিলেন। মহর্ষি তীর্থ-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। হয়তো যমুনা পার হয়ে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের কোনও তীর্থে যাবেন তিনি, হয়তো বা মৎস্যদেশের কোনও তীর্থে যাবার ইচ্ছে আছে তাঁর।

এই অঞ্চলে যমুনা কিঞ্চিৎ শীর্ণতোয়া। ফলে নদী পারাপারের জন্য এইখানেই সকলে আসে। মহর্ষিও তাই এসেছেন। অন্য সময়েও তিনি এখানে যমুনা পার হয়েছেন এবং একটি পুরুষকেই তিনি নদী পার করে দিতে দেখেছেন। কিন্তু আজ এই গোধূলিবেলায় সূর্যের শেষ অস্তরাগ যখন নীল যমুনার জলে মাখামাখি করে এই নিকষা-কালো রমণী দেহের উরুদেশের ওপর বিচ্ছুরিত হল, তখন এই মহামুনির মনেও জেগে উঠল আকস্মিক আসঙ্গ-লিপ্সা, লালসা—

দৃষ্টৈব চ তাং ধীমাংশ্চকমে চারুহাসিনীম্।
দিব্যাং তাং বাসবীং কন্যাং রম্ভোরুং মুনিপুঙ্গবঃ।।

তবে মনে মনে লালসা-তাড়িত হলেও সঙ্গে সঙ্গে মুনি তা প্রকাশ করলেন না। ক্রোধ, লোভ, লালসা স্তম্ভন করার অভ্যাস তাঁর আছে। অতএব তিনি সামান্য সংযত হয়ে মৃদুহাসিনী সুন্দরীকে বললেন—হ্যাঁগো মেয়ে! এখানে যে চিরকাল নৌকা পারাপার করে, আমাদের সেই পরিচিত নাইয়াটি কোথায়—ক কর্ণধারো নৌকায়াঃ যেন নীয়তে ব্রূহি ভামিনি? রমণী বলল—আমার পিতার কোনও পুত্র সন্তান নেই, মহর্ষি! তাঁর যাতে বেশি কষ্ট না হয়, সেইজন্যই এই নৌকা নিয়ে আমিই খেয়া পারাপার করি। লোক বেশি হলেও আমাকে বাইতে হয় এই নৌকা—নৌর্ময়া বাহ্যতে দ্বিজ। মহর্ষি বললেন—সে তো খুব ভাল কথা, তাহলে আর দেরি কিসের? আমাকে নিয়ে চলো ওপারে। হয়তো আমিই তোমার শেষ আরোহী—অহং শেষো ভবিষ্যামি নীয়তামচিরেণ বৈ। নীল যমুনার জলবাহিনী নৌকার ওপরে মধুহাসিনী নাইয়া নৌকা বেয়ে চলল। আরোহী একা মহর্ষি। সে দিনের শেষ আরোহী।

এই মুনির পরিচয় আর না দিলে নয়। সূর্যবংশের বিখ্যাত পুরোহিত বশিষ্ঠের নাম আপনারা শুনেছেন। এই মুনি তাঁর নাতি। বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে বশিষ্ঠের যে দীর্ঘদিনের বিবাদ চলেছিল, তাতে বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তি মারা গিয়েছিলেন। মারা গিয়েছিলেন মানে, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল। পুরাণ-ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্যবংশের রাজা কল্মাষপাদের পুরোহিত-পদবী লাভের জন্য বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ দুজনেরই কিছু প্রতিযোগিতা ছিল। এই অবস্থায় বশিষ্ঠপুত্র শক্তির সঙ্গে কল্মাষপাদের বিবাদ বাধে একটি পথের অধিকার নিয়ে। রাজা শক্তিকে অপমান করেন। শক্তিও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে শাপ দেন।

রাজা কল্মাষপাদ নাকি শক্তির শাপে নরমাংসভোজী এক রাক্ষসে পরিণত হন এবং এই পরিণতির পর শক্তিকে দিয়েই নাকি রাজা কল্মাষপাদের নরমাংস ভোজনের আরম্ভ সূচিত হয়। এই উপাখ্যানের মধ্যে যে সত্য আছে, তার চেয়েও বড় সত্য হল—রাজা কল্মাষপাদ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহযোগিতায় বশিষ্ঠপুত্র শক্তিকে অকালে বধ করেন। আসলে এটা এক ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বিবাদের ঘটনা। মহাভারতে এই ঘটনার প্রসঙ্গও এসেছে ভার্গব ব্রাহ্মণদের

amarboi.com

সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজাদের বিবাদের সূত্র ধরে। রাক্ষস-টাক্ষসের উপাখ্যান থাক, কল্মাষপাদ শক্ত্রিকে হত্যা করেছিলেন। পরে অবশ্য শক্ত্রির পিতা বশিষ্ঠের সঙ্গে কল্মাষপাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু এতদিনে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেছে।

শক্ত্রি যখন মারা যান, তখন তাঁর ঔরসজাত পুত্র গর্ভস্থ ছিলেন। শক্ত্রি স্ত্রীর নাম অদৃশ্যন্তী। ঋষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে পাগল হয়ে যান। নানাভাবে তিনি আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। বহুকাল নানা জায়গায় ঘুরে—স গত্বা বিবিধান্ শৈলান্ দেশান্ বহুবিধাস্তথা। ক্লান্ত শ্রান্ত শোকাচ্ছন্ন মুনি আবার নিজের আশ্রমে ফেরার পথ ধরলেন। ঠিক এই সময়ে একটি দীনহীন বিধবা রমণী বশিষ্ঠকে অনুসরণ করে চলতে লাগল পিছন পিছন। আনমনা বশিষ্ঠের কানে হঠাৎ ভেসে এল বেদ-উচ্চারণের উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত। মহর্ষি পিছন ফিরে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কে? কে আমার পিছন পিছন আসছে? বিধবা রমণী বললেন—আমি। পিতা আমি আপনার পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। বশিষ্ঠ বললেন— তাহলে কার মুখে এই বেদধ্বনি উচ্চারিত হতে শুনলাম। এই ধ্বনি এই স্বর। এ যে আমার বহুপূর্ব-পরিচিত। আমার মৃত পুত্র শক্ত্রির মুখে আমি ঠিক এই স্বর, এই উচ্চারণ শুনেছি— পুরা সাঙ্গস্য বেদস্য শক্ত্রেরিব ময়া শ্রুতঃ।

অদৃশ্যন্তী সলজ্জে বললেন—পিতা! আমার গর্ভে একটি পুত্র রয়েছে। আপনার পুত্র শক্ত্রির ঔরসেই এই পুত্রের উৎপত্তি। এখন তার বার বৎসর বয়স। সে গর্ভস্থ অবস্থাতেই সাঙ্গ বেদ উচ্চারণ করছে। এটি সিদ্ধান্তবাগীশের বঙ্গানুবাদের ভাবমাত্র। আমাদের বিশ্বাস— বশিষ্ঠ পুত্রশোকে পাগল হয়ে বহুকাল আশ্রমের বাইরে ছিলেন। হয়তো তিনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন শক্ত্রিপুত্রের বার বছর বয়েস হয়ে গেছে। মায়ের কাছে, মায়ের অনুশাসনে, একমাত্র মায়েরই অঞ্চলছায়ায় তিনি এত বছর ধরে বড় হয়েছেন বলেই হয়তো এই গর্ভাবাসের কল্পনা। সংস্কৃত শ্লোকটি থেকেও এই কথাই প্রমাণ হয়। সেখানে বলা আছে— আমার গর্ভ থেকেই এই পুত্রের জন্ম। আপনার পুত্র শক্ত্রির পুত্র এই বালক। ছোটবেলা থেকে বেদ্যাভ্যাস করতে করতে এই ছেলের এখন বার বছর বয়স হল—সমা দ্বাদশ তস্যেহ বেদান্ অভ্যস্যতো মুনে।

অদৃশ্যন্তীর মুখে এই কথা শুনে বশিষ্ঠ আহ্লাদিত হলেন। শক্ত্রি বেঁচে নেই, তবে তাঁর পুত্র তো আছে—অস্তি সন্তানম্, ইত্যুক্ত্বা-বংশের ধারাটি তো অবিচ্ছিন্ন রইল। বশিষ্ঠ পুত্রবধূর সঙ্গে আশ্রমে ফিরে চললেন। শক্ত্রির পুত্র—সে যেন শক্ত্রিরই অন্য এক রূপ, অন্য এক জীবন—পরাসু। পর-অন্য। অসু-প্রাণ, জীবন। অথবা পরাসু অর্থাৎ নিষ্প্রাণভাবে যে এতকাল বর্তমান ছিল, শক্ত্রির সেই পুত্রের নাম তাই পরাশর।

পরাশর অদৃশ্যন্তীর সামনেই পিতামহ বশিষ্ঠকে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকতেন। স্নেহময় বশিষ্ঠ তাতে বাধা দিতেন না। ভাবতেন—আহা! পিতা নেই, অন্যদের দেখে দেখে কাউকে পিতা বলে ডাকতে কোন বালকের না ইচ্ছা করে। পুত্রের এই ব্যবহারে মাতা অদৃশ্যন্তী বড় অস্বস্তিতে পড়তেন। কিছু লজ্জাও হত বুঝি। তা একদিন পরাশর বশিষ্ঠকে 'বাবা-বাবা' করছেন, এই অবস্থায় অদৃশ্যন্তী পুত্রকে বললেন—বাছা! তুমি তোমার ঠাকুরদাদাকে এমন 'বাবা-বাবা' বলে ডাক কেন। এমন কোরো না—মা তাত তাত তাতেতি ব্রূহ্যেনং পিতরং পিতুঃ। বনের ভিতর তোমার পিতাকে এক রাক্ষস খেয়ে ফেলেছে।

পরাশরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হল। তিনি রাক্ষসবধের জন্য রাক্ষসমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দলে দলে রাক্ষস এসে যজ্ঞের আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। উপাখ্যান অনুযায়ী মহর্ষি অত্রি,

amarboi.com

পুলহ এবং রাক্ষসদের মূলপিতা পুলস্ত্যও পরাশরের ক্রোধ শান্ত করার জন্য যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলে একবাক্যে নিরীহ রাক্ষসদের বধ না করার জন্য পরাশরকে অনুরোধ করলেন। পরাশর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রদীপ্ত রোষ সম্বরণ করলেন। তিনি যজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন। তদা সমাপয়ামাস সত্রং শাক্তো মহামুনিঃ।

রাক্ষসবধের জন্য নির্দিষ্ট কোনও যজ্ঞে পর পর রাক্ষস-বধ চলছিল কিনা, তা বলা সম্ভব নয়। তবে ব্রাহ্মণ-পরাশরের সঙ্গে অনাচারী রাক্ষসদের যে একটা তুমুল বিবাদ আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা না বললেও চলে। অনুমান করা যায়—রাক্ষস-পক্ষপাতী পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ইত্যাদি খ্যাতনামা মুনিদের হস্তক্ষেপে পরাশর যজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন। পরাশরকে মুনিরা বলেছিলেন—ক্রোধ নয়, শান্তিই ব্রাহ্মণের ধর্ম। পরাশর শান্ত হলেন।

পরাশরের এই ক্রোধশান্তির ব্যাপারে অন্যান্য মুনি-ঋষিদের তর্ক-যুক্তির অবদানই বেশি বলে মহাভারতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে দেখেছি—পরাশরকে তাঁর পিতামহ বশিষ্ঠই শান্ত করেছিলেন। পরাশরকে তিনি বুঝিয়েছিলেন—আমার এবং আমার পুত্রের কোনও অপকার যারা করেনি, সেই নিরীহ রাক্ষসদের অগ্নিদগ্ধ কোরো না—অলং নিশাচরৈর্দগ্ধৈ-দীনৈরনপকারিভিঃ। পিতামহের অনুনয়ে পরাশর তৎক্ষণাৎ আরব্ধ যজ্ঞ বন্ধ করেন এবং তখনই রাক্ষস-সমাজের মূল জনক পুলস্ত্য তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—তীব্র বৈরভাব থাকা সত্ত্বেও তুমি যে গুরুজনের কথায় এইভাবে ক্ষমা অবলম্বন করেছ, তাতে আমার আশীর্বাদ তুমি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবীণ হবে। আরও বড় কথা, তুমি একটি পুরাণ-সংহিতার কর্তা হবে—পুরাণসংহিতাকর্তা ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি। আমরা জানি বিষ্ণুপুরাণের সংকলক স্বয়ং পরাশর।

পরাশর বিষ্ণুপুরাণ রচনা করেছিলেন কিনা, অথবা তিনি বার বৎসর বয়সের মধ্যেই সাঙ্গ বেদ অধিগত করেছিলেন কিনা, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। আমরা এই উপাখ্যানের অবতারণা করেছি একটিমাত্র কারণে। পরাশর কত শীঘ্র ক্রোধ প্রশমন করতে পারেন। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—কাম এবং ক্রোধের জন্ম হয়েছে একই উৎস থেকে। উভয়েই রজোগুণের আত্মজ—কাম এবং ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। যিনি এক মুহূর্তের মধ্যে নিজের উদ্যত ক্রোধকে বশীভূত করতে পারেন সেই পরাশর মুনিকেই একটু আগে আমরা যমুনার তীরে এসে দাঁড়াতে দেখেছি। খেয়াতরীর নাবিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর মেয়ে নৌকা নিয়ে বসে আছে ঘাটে। মুনি তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবন নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁর কালো রূপের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছেন তিনি।

কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য নরনারীর মধ্যে একবারের দর্শনমাত্রেই যে কামভাব লক্ষ্য করেছি, এখানে মুনির মনেও সে কামভাব আছে, কিন্তু তার মধ্যে পরিশীলনও আছে। আর আছে কবির মতো সেই ভাষা—আমি তোমার দিনশেষের শেষ যাত্রী হব, বাসবী। আমাকে নিয়ে চল যমুনার পরপারে—অহং শেষো ভবিষ্যামি নীয়তাম্ অচিরেণ বৈ।

'বাসবী'! এই শব্দের অর্থ এই রমণী বোঝে। তবে মুনি তাকে কেন 'বাসবী' বলে ডাকলেন, তার কারণ জানার জন্য মনে মনে এই রমণীর আগ্রহ জেগে রইল। তবে আপাতত মুনির মন টলিয়ে কালী তাঁর নৌকায় শেষ যাত্রীকে তুলে নিলেন। নৌকা বাইতে আরম্ভ করলে হালের টানের সঙ্গে তাঁর রমণী-শরীরের বিভঙ্গও একাকী সেই যাত্রীর চোখে পড়ল। মুনি তাঁর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। কালো মেয়ে সব বুঝে ফেলল এক লহমায়। খানিকটা সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে সে বলল—লোকে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে। আমি ধীবররাজ দাশের

AMARBOI.COM

কন্যা। বাস্তবে আমার পিতা-মাতা যে কে, তা ঠিক জানি না। সেজন্য আমার দুঃখও আছে যথেষ্ট।

মুনি রমণীকে নিরীক্ষণ করছেন অপলকে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে, কেন তিনি তাঁকে 'বাসবী' বলে ডেকেছেন, তার কারণ জানার ইচ্ছেটাই সাময়িকভাবে বড় হয়ে উঠল। পরাশর যা বললেন, অথবা মহাভারতে যেমন বলা আছে, তাতে এই রমণী সেই বিখ্যাত চৈদ্য রাজা উপরিচর বসুর কন্যা বলে প্রমাণিত। কিন্তু এ প্রমাণ মহাকাব্যের উপাখ্যানশৈলীতে সঠিক বলে মনে হলেও বাস্তবে তা হতে পারে না। উপাখ্যানে আছে—উপরিচর বসু তার স্ত্রী গিরিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় বসেছিলেন। ঋতুস্নাতা গিরিকাও প্রস্তুত হয়ে ছিলেন মিলন কামনায়। কিন্তু এই অবস্থায় রাজাকে পিতৃপুরুষের আদেশে পিতৃযজ্ঞের জন্য মৃগবধের উদ্দেশে চলে যেতে হয় আকস্মিকভাবে।

মৃগয়ায় রাজার মন বসল না। সুন্দরী গিরিকার কথা বারবার তাঁর মনে পড়ল—চকার মৃগয়াং কামী গিরিকামেব সংস্মরন্। রাজার মন মানল না, কামনার তেজবিন্দু তিনি ধারণ করলেন পত্রপুটে।

তারপরের ঘটনা সবার জানা। সেই তেজবিন্দু রাজা পাঠিয়ে দেন গিরিকার কাছে, এক বাজপাখির পায়ে বেঁধে। পথিমধ্যে অন্য একটি বাজপাখির আক্রমণে এই তেজ পতিত হয় যমুনা নদীতে। সেখানে শাপগ্রস্তা অপ্সরা অদ্রিকা মৎসী হয়ে বিচরণ করছিলেন। উপরিচর বসুর তেজ সেই মৎসী ভক্ষণ করে এবং গর্ভবতী হয়। একসময়ে যমুনা নদীতে জাল ফেলে ধীবরেরা এই মৎসীকে দৈবাৎ ধরে ফেলে। ধীবরেরা এই মৎসীর গর্ভ থেকে একটি স্ত্রী এবং একটি পুরুষ শিশু দেখতে পায়। এই আশ্চর্য ঘটনা ধীবরেরা দেশের রাজা উপরিচর বসুর কাছে নিবেদন করে। সব দেখে শুনে চৈদ্য পুরুষ শিশুটিকে গ্রহণ করেন এবং মহাভারত বলেছে—রাজার এই পালিত পুত্র ভবিষ্যতে মৎস্য নামে একটি ধার্মিক রাজা বলে পরিচিত হন—স মৎস্যো নাম রাজাসীদ্ ধার্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ। শিশুকন্যাটিকে রাজা ধীবরদের হাতেই দিয়ে দেন এবং বলে দেন শিশুটিকে যেন তারাই মানুষ করে। মৎস্যঘাতীদের আশ্রয়ে থাকায় এই মেয়েটি মৎস্যগন্ধা নামে পরিচিত হন—সা কন্যা দুহিতা তস্যা মৎস্যা মৎস্যসগন্ধিনী। তাঁর অপর নাম সত্যবতী এবং তাঁর ডাকনাম হয়তো কালী।

এই উপাখ্যানের অলৌকিকতার খোলস থেকে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা যথেষ্টই কঠিন এবং অসম্ভবও বটে। উপরিচর বসুর বংশ-পরম্পরা বিচার করলে কোনওভাবেই তিনি মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর পিতার সমবয়সী হতে পারেন না। সত্যবতী, ব্যাসদেব, ভীষ্ম এবং শান্তনুর সঙ্গে উপরিচর বসুর সমসাময়িকতা মাথায় রাখলে কোনওভাবেই সত্যবতী উপরিচরের কন্যা হতে পারেন না। কারণ, উপরিচর বসু অনেক আগের মানুষ। তবে এখানে একটা কথাই খেয়াল করার মতো। পরাশর মৎস্যগন্ধা কালীকে ডেকেছিলেন 'বাসবী' বলে। আমরা পূর্বে মহাভারতের মধ্যেই দেখেছি উপরিচর বসুর সব পুত্রকে একসঙ্গে 'বাসব' বলে ডাকা হয়—বাসবাঃ পঞ্চ রাজানঃ পৃথগ্বংশশ্চ শাশ্বতাঃ। আমাদের অনুমান—মৎস্যগন্ধা বসুরাজের পুত্র কোনও 'বাসব' রাজার বংশে জন্মেছেন। সেই কারণেই পরাশর তাঁকে ডেকেছেন 'বাসবী' বলে।

আমাদের আরও একটা অনুমানের কথা বলি। আমরা পূর্বে জানিয়েছি—উপরিচর বসুর পঞ্চম পুত্র 'মাবেল্ল' হয়তো বসুরাজের অধিকৃত মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন। কিন্তু বায়ু পুরাণে

amarboi.com

দেখছি—উপরিচর বসুর পুত্রসংখ্যা পাঁচ নয়, সাত জন এবং তাঁর সপ্তম পুত্রের নামই মৎস্য অথবা মৎস্যকাল—মাথৈল্যশ্চ (মাবেল্লশ্চ) ললিত্থশ্চ মৎস্যকালশ্চ সপ্তমঃ। সংস্কৃত পংক্তিটিতে 'ললিত্থ' বলে যাঁদের বলা হয়েছে পণ্ডিতেরা তাঁদের রাজপুত লাঠোরদের পূর্বপুরুষ মনে করেন। আর আগেই আমরা জানিয়েছি যে, তখনকার মৎস্যদেশ হল এখনকার রাজপুতনার জয়পুর-ভরতপুর এবং আলোয়ার অঞ্চল। অর্থাৎ ললিত্থ এবং মৎস্য—এঁরা দুজনেই রাজপুতনা বা মৎস্যদেশের অধিবাসী ছিলেন।

মহাভারতের উপাখ্যানে সত্যবতীর জননীকে যেভাবে এক মৎসীর রূপ দেওয়া হয়েছে এবং সত্যবতীর আপন ভ্রাতার নামেই যেহেতু মৎস্যদেশের প্রতিষ্ঠা, অপিচ এই মৎস্যও যেহেতু একজন বাসব রাজা, তাই আমরা অনুমান করি সত্যবতী মৎস্যদেশীয় কোনও রমণী ছিলেন। অথবা তত্রস্থ মৎস্যরাজার সঙ্গে তাঁর আত্মসম্বন্ধ ছিল বলেই মহাভারত তাঁকে 'মৎস্যা মৎস্যগন্ধিনী' বলেছে। সংস্কৃতে 'সগন্ধ' শব্দের অর্থ আত্মীয় অর্থাৎ নিজের জাত। গান্ধার দেশের মেয়ে যদি গান্ধারী হতে পারেন, মদ্রদেশের মেয়ের নাম যদি মাদ্রী হয়, তবে মৎস্যদেশের মেয়েই বা মৎসী বা মৎস্যগন্ধা হবেন না কেন? অবশ্য এমন হতেই পারে সত্যবতীর জন্মের মধ্যে গৌরব ছিল না তত। আমরা উপরিচর বসুর পট্টমহিষী গিরিকার জন্মেও তেমন গৌরব কিছু দেখিনি। মহাভারতে যমুনানদীর অন্তরচারিণী যে মৎসীকে আমরা উপরিচর বসুর তেজবিন্দু ভক্ষণ করতে দেখেছি, আমাদের ধারণা, তিনি বসুরাজের পূর্বাধিকৃত মৎস্যদেশের কোনও রমণী। হয়তো সেই মৎস্যদেশীয় কোনও রমণীর বংশধারাতেই সত্যবতীর জন্ম, যাঁর জন্মদাতা স্বয়ং কোনও বাসব বা বসুবংশীয় কোনও রাজা।

এমন হতেই পারে—সেই রমণীর কুলশীল আর্যজনের বিগর্হিত ছিল এবং সত্যবতী পালিত হয়েছেন কোনও ধীবরপল্লীতে। কিন্তু এই ধীবর শব্দটি মহাভারতের উপাখ্যানে এসেছে শুধুমাত্র 'মৎস্য' শব্দের সূত্র ধরে। আমরা মনে করি, মৎস্যগন্ধার পিতা সেই ধীবররাজ আসলে মৎস্যদেশের রাজা। সত্যবতী ধীবররাজ ওরফে মৎস্যরাজের কন্যা ছিলেন বলেই তাঁর গায়ে আঁশটে গন্ধ ছিল,—এটা যেমন আমাদের কাছে উপাখ্যানমাত্র, তেমনই তাঁর পিতা নৌকা পারাপার করেন—এই কাহিনীও আমাদের কাছে উপাখ্যানমাত্র। খেয়াপারের নাবিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর কন্যা সহস্র মানুষকে পারাপার করাচ্ছে—রমণীর শরীরে কি এতও সয়। তবে হ্যাঁ, এটা স্বীকার করি এবং স্বীকার করতে পছন্দ করি যে সেদিন সেই গোধূলিবেলায় মৎস্যরাজের কন্যা একটি ডিঙি নৌকায় একা বসেছিলেন সবিভঙ্গে, ক্ষণিকের অবসর অথবা বিনোদনে। আর সেই সময়েই মহামুনি পরাশর এসে বলেছিলেন— আমি তোমার শেষ যাত্রী হব।

নৌকার ওপরে পরাশর সপ্রেম দৃষ্টিপাতে রমণী যখন কিঞ্চিৎ আপ্লুতা বোধ করছেন, তখনই তিনি জানিয়েছেন—আমি ধীবররাজার মেয়ে, আমার পিতা-মাতা কেউ নেই সেজন্য আমার মনে কষ্ট আছে জেনো—জন্মশোকাভিতপ্তায়াঃ কথং জ্ঞাস্যসি কথ্যতাম্। সত্যবতী যদি উপরিচর বসুর মেয়েই হবেন, তবে মাতৃপিতৃহীন বলে তাঁর শোকাতুরা হবার কোনও কারণ নেই। তিনি আরও জানিয়েছেন—আমি দাশরাজার মেয়ে; লোকে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে। বস্তুত তিনি মৎস্যরাজের মেয়ে বলে তাঁকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে, আর তাঁর মায়ের ব্যাপারে কোনও গৌরব না থাকায় 'বাসব' মৎস্যরাজ তাঁকে ঘরে রাখেননি। কিন্তু মহামুনি পরাশর তাঁর জন্ম-কর্মের খবর রাখেন এবং জানেন—মৎস্যগন্ধা আসলে বসুবংশেরই

AMARBOI.COM

মেয়ে—'বাসবী' যিনি মানুষ হয়েছেন, মৎস্য দেশের কোনও অপাংক্তেয় মানুষের কাছে, যাঁর নাম অবশ্যই দাশ।

পরাশর কোনও অসভ্য ভণিতার মধ্যে যাননি। একবারও মৎস্যগন্ধার অপার রূপরাশি বর্ণনা করে তাঁর স্তন-জঘনের প্রত্যঙ্গশোভায় মন দেননি। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন—বাসবী। আমি তোমার কাছে একটি পুত্র চাই, তাই তোমার সঙ্গে আমি মিলন প্রার্থনা করি। মৎস্যগন্ধা সলজ্জে জানিয়েছেন—যমুনার ওপারে ঋষি-মুনিদের দেখা যাচ্ছে—পশ্য ভগবন্ পরপারে স্থিতান্ ঋষীন্—এই অবস্থায় কীভাবে আপনার সঙ্গে মিলন সম্ভব? সবাই যে দেখছেন আমাদের—আবয়ো-দৃষ্টয়োরেভিঃ কথং নু স্যাৎ সমাগমঃ। পরাশরের অলৌকিক মহিমায় কুয়াশার সৃষ্টি হল মিলনপিয়াসী দুই নর-নারীর চতুর্দিকে। নাকি, গোধূলির শেষ লগ্নে অন্ধকারের ছায়া নামছিল প্রেম-নত নয়নের দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লবের মতো। সেটাই হয়তো অলৌকিক সেই নীহারিকা।

ঘন-সন্ধ্যার প্রায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে কামপ্রবৃত্ত পরাশরের সামনে প্রখর বাস্তব বিদ্ধ করল কুমারী সত্যবতীকে। তিনি বললেন—মুনিবর! আমি যে কুমারী। আমার পিতা কি বলবেন? আমার কুমারীত্ব দূষিত হলে আমি ঘরে ফিরব কী করে, ঘরে থাকবই বা কী করে—গৃহং গন্তুমৃষে চাহং ধীমন্ ন স্থাতুমুৎসহে। পরাশর প্রখর ব্যক্তিত্বময় মহামুনি। তিনি জানেন—তিনি যদি এই কুমারীর কুমারীত্ব হরণ করেও পশ্চাদ্জাত পুত্রের পিতৃত্ব স্বীকার করেন, তবে এই রমণীর অসুবিধে কিছু হবে না। তখনকার সমাজে এই ঘটনা দূষণীয়ও ছিল না। অতএব তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গি মিশিয়ে কুমারীকে বললেন—তুমি আমার প্রিয় কার্য সম্পাদন কর। তুমি আবার তোমার কন্যাভাব ফিরে পাবে। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি যে বর চাও তাই পাবে।

মৎস্যগন্ধা বললেন—আমার গায়ের মৎস্যগন্ধ দূর হোক, সৌগন্ধে প্রসন্ন হোক আমার শরীর। আমরা পূর্বে এই মৎস্যগন্ধের কথা বিশ্বাস করিনি, এখনও করি না। বস্তুত যে জন্মদাতা মৎস্যরাজ তাঁর জন্ম দিয়েও তাঁর পিতৃত্ব স্বীকার না করে তাঁর পালনের ভার দিয়েছিলেন অন্যের ওপর, পিতৃমাতৃহীন অভিমানিনী সেই রমণী মৎস্যরাজের সগন্ধতা অথবা আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন প্রথম সুযোগে। পরাশরের আশীর্বাদে তাঁর রমণীশরীরে পদ্মের সৌগন্ধ এসে তিনি 'যোজনগন্ধা' বা 'গন্ধবতী'তে পরিণত হলেন কিনা তা জানি না, তবে এই মুহূর্ত থেকেই যে তাঁর নাম সত্যবতী হল, সে কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সত্যবতী মিলিত হলেন মহর্ষি পরাশরের সঙ্গে এবং অলৌকিকভাবে সদ্যই গর্ভবতী হলেন। পুত্রও প্রসব করলেন সঙ্গে সঙ্গেই। জন্মালেন মহাভারতের কবি বেদব্যাস। সদ্যগর্ভ, সদ্য-প্রসবের কথা অলৌকিকতার মহিমাতেই মহিমান্বিত থাকুক, কারণ আমাদের মহাভারতের কবি জন্ম নিয়েছেন—জয়তি পরাশর-সুনুঃ সত্যবতী-হৃদয়-নন্দনো ব্যাসঃ।

লক্ষণীয় বিষয় হল—ওদিকে গঙ্গা নামের সেই রমণী হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনুর পুত্রকে নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন মানুষ করার জন্য। আর এদিকে মহামুনি পরাশর নিজ পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে মানুষ করার জন্য। শান্তনু তবু নিজের ঔরসজাত পুত্রটিকে ফিরে পেলেন গঙ্গার কাছ থেকে। কিন্তু ব্যাস তাঁর মাতা সত্যবতীকে জানিয়ে গেলেন—আপনার প্রয়োজন হলে আমাকে স্মরণ করবেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনার কাছে উপস্থিত হব।

সমস্ত মহাভারত জুড়ে যে ভীষ্মের অবস্থিতি, যিনি ভবিষ্যতে পিতার বিবাহ দিয়ে প্রসিদ্ধ

কুরুবংশের সন্তান-পরম্পরা রক্ষা করবেন তাঁদেরও মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থেকে, সেই ভীষ্ম হস্তিনাপুরে পৌঁছেছেন আগেই। আর যিনি কুরুবংশের ইতিহাস রচনা করবেন, যিনি ভবিষ্যতে কুরুবংশের সন্তানবীজ বপন করবেন নির্বিকারভাবে, তিনি নির্বিকার ঐতিহাসিকের মতো, পড়ে রইলেন এক দ্বীপে। কৌরব-পাণ্ডববংশের অগাধ ঘটনাধারা তাঁর চারপাশে বয়ে চলবে আর তিনি মাঝখানে বসে থাকবেন দ্বীপের মতো। মহান ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনাবলীর উষ্ণ-শীতল জলস্পর্শ চারদিক থেকে তাঁর গায়ে লাগবে, লাগবে মনে, বুদ্ধিতে। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস চতুরন্ত জলধির মধ্যে জেগে থাকবেন অবিকারী দ্বীপের মতো। নির্বিকারভাবে তিনি ভারতের ইতিহাস শোনাবেন, যে ইতিহাসের মধ্যে তাঁর আপন হৃদয়ের মমতা মাখানো আছে, যে ইতিহাসের মধ্যে তাঁর আপন শোণিত বিন্দু ক্ষরণ হবে প্রতি পলে পলে। অবিকারী দ্বীপের মতো নির্বিকার এক ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করার সময় তাঁর কবিহৃদয়ের ব্যথা-বেদনা সেই ইতিহাসকে মহাকাব্যে উত্তরিত করবে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কেন এই মহাকাব্যের উচ্চাবচ আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ তিনি এড়াতে পারেন না, তার কারণ একটাই—তিনি শুধু দ্বীপজন্মা দ্বৈপায়ন ব্যাসই নন, দ্বীপের সমস্ত সগন্ধতা স্মরণে রেখেও তাঁর বিচার করতে হবে কৌরব-পাণ্ডবের জন্মদাতা পিতার হৃদয় ব্যাখ্যা করে। তিনি যখন নির্বিকার দ্বীপের মতো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মহাভারতের ইতিহাস বর্ণনা করবেন, তখনই তাঁকে জন ডানের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দিতে হবে মহাকাব্যের প্ররোচনা মিশিয়ে—

No man is an island, entire of itself; each is a piece of the continent, a part of the main; if a clod bee washed away by the sea, Europe is less, as well as if a promontory were, as well as if a Mannor of your friends or of your own were; any man's death diminishes me, because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee. (পুরাতন ইংরেজি শব্দ কথঞ্চিৎ আধুনিকভাবে রূপান্তরিত)

ছাপান্ন

মহামুনি পরাশরের সংস্পর্শে এসে তথাকথিত কৈবর্তপল্লীর রমণী মৎস্যগন্ধা 'গন্ধবতী' সত্যবতীতে পরিণত হলেন। তিনি যেখানে উপস্থিত থাকতেন, সেখান থেকে দূর দূরান্তে তাঁর অঙ্গের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত, আমোদিত হত দিগ্‌দিগন্ত। আমরা এই পুষ্পামোদের অর্থ অন্যরকম বুঝি। আমরা বুঝি—কৈবর্তপল্লীতে মানুষ হওয়া এই রমণী মহামুনি পরাশরের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্বতন পালক-পিতার জাতি-সংস্কার কাটিয়ে উঠে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর সুনাম-সৌগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। হয়তো সেই কারণেই এবার গঙ্গার তীর ছেড়ে যমুনা পুলিনে এসেছিলেন শান্তনু। হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনু।

শান্তনু যমুনার তীরে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আর তখনই তাঁর নাকে ভেসে এল মধুর গন্ধ—বসন্তের বাতাসটুকুর মতো। গন্ধের উৎস খুঁজতে খুঁজতে তিনি দেখতে পেলেন স্বর্গসুন্দরীর মতো সেই রমণীকে, যাঁর নাম সত্যবতী, গন্ধবতী, যোজনগন্ধা। এতই তাঁর নামের প্রচার যে একটি মাত্র নামে তাঁকে ডাকাও যেন সঙ্গত হয় না। দেবরূপিণী কন্যাকে দেখেই শান্তনু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কার মেয়ে? তুমি কী করছ এখানে—কস্য ত্বমসি কা বাসি কিঞ্চ ভীরু চিকীর্ষসি। কন্যা বলল—আমি দাসরাজার কন্যা। তিনি বলেছেন, তাই আমি তাঁর নৌকাখানি বেয়ে খেয়া পারাপার করি।

গঙ্গাতীরবর্তিনী গঙ্গার পরে যমুনাতীরবর্তিনী সত্যবতী। কত কাল পরে এমন এক সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে দেখে মুগ্ধ হলেন শান্তনু। সেই সম্ভোগসুখের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল—গঙ্গা কীভাবে তাঁকে সুখী করার জন্য কত চেষ্টাই না করেছেন। নৃত্য-গীত লাস্য কীই না প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেও রইলেন না শান্তনুর গৃহবধূ হয়ে অথবা তাঁকে

রাজধানীতে নিয়ে যাবার মতো গৃহিণীর সুস্থ সত্তাও তাঁর মধ্যে ছিল না। অধুনা শান্তনু তাঁর ঔরসজাত পরম প্রিয় পুত্র দেবব্রতকে ফিরে পেয়েছেন বটে, কিন্তু সুচিরকাল স্ত্রী সঙ্গহীন এক রাজার দিন-রাত কাটে শুধু রাজকার্যে আর পুত্রস্নেহে। বসন্তের জ্যোৎস্নায়, শরতের প্রভাতে অথবা বর্ষার মেঘমেদুর সুনীল ছায়ায় তাঁর অনেক কিছু বলার থাকে, বলা হয় না, অনেক কিছু শোনার থাকে, শোনা হয় না। শান্তনু তাই যমুনাপুলিনে এসেছেন নিঃসঙ্গতা এড়াতে। আর ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দাসেয়ী গন্ধবতীর সঙ্গে।

এমন রূপ মহারাজ শান্তনু বুঝি আর দেখেননি। কী তাঁর রূপ! কী মাধুর্য! কৃষ্ণবর্ণ শরীরে রূপের আগুন লেগেছে। শান্তনু তাঁকে দেখামাত্রই প্রেমে পড়লেন; কামে মোহিত হলেন—সমীক্ষ্য রাজা দাসেয়ীং কাময়ামাস শান্তনুঃ। দেবরূপিণী কন্যার দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন—তুমি আমার হও। সহাস্যে কন্যা বলল—আমি নিজেই নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না। তুমি আমার পিতাকে বলো। শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্তপল্লীতে দাস রাজার কাছে গেলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু। তোমার কন্যাটিকে বিবাহ করতে চাই আমি—স গত্বা পিতরং তস্যা বরয়ামাস তাং তদা।

কৈবর্তপল্লীর দাস-রাজা মোড়ল গোছের মানুষ। মৎস্য রাজের কন্যাকে তিনি পালন করেছেন ভাত-জল দিয়ে। মেয়েকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসেন। অনার্য কৈবর্তদের প্রধান হলে কী হবে, তিনি যথেষ্ট পাটোয়ারিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হল, আর তিনি ধন্য হয়ে যাবেন—এমন হীনম্মন্যতা তাঁর নেই। তাঁর বিষয়বুদ্ধি অন্য কারও থেকে কম নয়। তিনি বুঝলেন—হস্তিনাপুরের রাজা যখন তাঁর মেয়ের অঞ্চল ধরে এই কৈবর্তবস্তীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, অতএব তাঁর কাছ থেকে মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা আদায় করতে হবে।

দাসরাজা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—মেয়ে যখন হয়েছে, তখন তাকে তো পাত্রস্থ করতেই হবে, মহারাজ! সে আর এমন বেশি কথা কী—জাতমাত্রৈব মে দেয়া বরায় বরবর্ণিনী। তবে কিনা আমার দুটো কথা ছিল এ বিষয়ে। অভিলাষ সামান্যই, তবু মহারাজ সে কথাটা আপনার শুনতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি সত্যিই এই কন্যাকে আপনার ধর্মপত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তবে আপনাকে তিন সত্যি করে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাটি করলেই আমি আপনার হাতে মেয়ে তুলে দেব—নইলে আপনার মতো খাসা জামাই আর কোথায় পাব, মহারাজ—ন হি মে ত্বৎসমো কশ্চিদ্‌বরো জাতু ভবিষ্যতি।

শান্তনু রাজা মানুষ। সহজেই তিনি বুঝে গেলেন—দাসরাজ সহজ লোক নন। শান্তনু প্রথমেই তিন সত্যি করে বসলেন না। বললেন—আগে তোমার অভিলাষটা শুনি, দাস! তবেই না সেটা মেটাবার চেষ্টা করব। যদি সেটা মানার মতো হয়, তবেই তো মানব। একটা অসম্ভবকে তো সম্ভব করে ফেলা যাবে না।

দাস-রাজা নিজের সমস্যা ব্যক্ত করলেন—মহারাজ! আমার এই কন্যার গর্ভে যে ছেলেটি হবে, আপনার পরে তাকেই দিতে হবে হস্তিনাপুরের সিংহাসন। আপনি বেঁচে থাকতেই সেই পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে, যাতে অন্য কোনও ভাগীদার আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবি না করতে পারে—নান্যঃ কশ্চন পার্থিবঃ। যমুনার তীরচারিণী যে রমণী তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর মোহন মুখটুকু ছাপিয়ে শান্তনুর মনে ভেসে উঠল গঙ্গাপুত্র, দেবব্রতের সেই কৈশোরগন্ধী মুখখানি। হস্তিনাপুরে সে তার পিতা ছাড়া আর কিছু জানে না। রাজ্যের প্রতিটি

amarboi.com

প্রজার জন্য তার মায়া ছড়ানো আছে। তাছাড়া, বহু পূর্বেই তিনি হস্তিনাপুরের যুবরাজপদে অভিষিক্ত হয়েছেন। সেই নবযৌবনোৎসুক দেবব্রতকে যৌবরাজ্য থেকে সরিয়ে দিয়ে এই স্বার্থান্বেষী কৈবর্তমুখ্যের কথা মেনে নিতে পারলেন না শান্তনু।

কৈবর্তরাজ শান্তনুকে ভালভাবেই চিনতেন। তাঁর চরিত্রও অস্পষ্ট ছিল না তাঁর কাছে। কৈবর্তরাজ নিশ্চয় জানতেন যে, গঙ্গানাম্নী এক রমণীর সঙ্গে মহারাজ শান্তনুর আত্মিক ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁকে তিনি বিবাহ করে রাজধানীতে নিয়ে যেতে পারেননি। এমনকি শান্তনুর ঔরসে জাত গঙ্গার পুত্র দেবব্রতই যে হস্তিনাপুরের যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত—এই সংবাদও তাঁর অজানা নয়। সবচেয়ে বড় কথা মহারাজ শান্তনু যে স্ত্রী-সঙ্গলোভী এক কামুক ব্যক্তি—এও তিনি ভালভাবেই জানতেন। যমুনাতীরবর্তিনী সত্যবতীকে দেখে শান্তনু যখন মুগ্ধ হয়েছেন, তখন তাঁকে দিয়ে যে খানিকটা অন্যায় কাজও করিয়ে নেওয়া যাবে—এই ছিল দাসরাজার ধারণা। কিন্তু শান্তনু আপাতত রাজি হতে পারলেন না। সাময়িকভাবে হলেও যুবক পুত্র দেবব্রতর জন্য তাঁর কিছু চক্ষুলজ্জা কাজ করল, বিশেষত মতলববাজ দাসরাজার সামনে।

কিন্তু দাসরাজার সামনে যতই তিনি 'না' করুন, শান্তনুর মন থেকে সত্যবতীর মোহ একটুও দূরীভূত হল না। সত্যবতীর রূপ চিন্তা করতে করতে কামনায় অধীর হয়ে তিনি হস্তিনাপুরে ফিরলেন—স চিন্তয়ন্নেব তু তাং...কামোপহতচেতনঃ। হস্তিনাপুরের রাজকার্যে তাঁর মন লাগে না, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগে না, মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজ্য শাসনের ভাল-মন্দ নিয়ে আর তিনি কোনও আলোচনায় বসেন না। সারাটা দিন তিনি শুধু বসে থাকেন, আর আনমনে কী যেন ভাবেন।

এইরকমই একদিন মহারাজ শান্তনু বসে বসে সত্যবতীর রূপের ধ্যানেই যেন বসেছিলেন—শান্তনুং ধ্যানমাস্থিতম্—আর তখনই পুত্র দেবব্রত এসে তাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন—সবদিকেই তো আপনার মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, পিতা! সমস্ত সামন্ত রাজাই আপনার শাসন মেনে নিয়েছেন, তবে কেন সব সময় আপনাকে খুব দুঃখিত আর শোকক্লিষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সব সময় কেমন যেন ধ্যান-যোগীর মতো বসে আছেন। আমার সঙ্গে পর্যন্ত একটা কথা বলেন না, ঘোড়া ছুটিয়ে বাইরেও যান না আপনার পূর্বের অভ্যাস মতো। আর শরীরটাই বা কী হয়েছে আপনার—বিবর্ণ, কৃশ, পাণ্ডুর—ন চাশ্বেন বিনির্যাসি বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ।

দেবব্রত গাঙ্গেয় শেষ পর্যন্ত একটু অধৈর্য হয়েই বললেন—আপনার রোগটা কী জানতে পারি আমি? রোগটা জানলে তার প্রতিকারও সম্ভব—ব্যাধিমিচ্ছামি তে জ্ঞাতুং প্রতিকুর্য্যাং হি তত্র বৈ। শান্তনু প্রত্যুত্তর দিলেন বটে এবং দেবব্রতকে খুব ভাল ভাল কথাও বললেন বটে, কিন্তু সেই ভাল ভাল কথাগুলির মধ্যে এমন একটা হাহাকার ছিল, যা পুত্রবাৎসল্য অতিক্রম করে অত্যন্ত নঞর্থকভাবেই শান্তনুর জীবনে এক নতুন সত্যোপলব্ধিকে সদর্থক করে তোলে।

শান্তনু বললেন—তুমি যেমন বলছ—আমি ধ্যানী-যোগীর মতো বসে আছি, কথা-বার্তা বলছি না—এসব কথা মিথ্যা নয়। তবে কি জান—আমার এই বিশাল বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান। তুমি যেমন সব সময় নিজের পুরষকার প্রদর্শন করে অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল দেখাচ্ছ তাতে আমার বড় ভয় আছে মনে। মানুষের জীবন বড় চঞ্চল, বাবা। কখন কী হয় কিছুই ঠিক নেই। তাই বলছিলাম—তোমার যদি বিপদ ঘটে, তবে তো আমার বংশটাই লোপ হয়ে যাবে।

শান্তনু কী বলতে চাইছেন বলুন তো? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন এই পুত্রটির ভাবনা ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি জীবনে। একমাত্র পুত্রের সম্ভাবিত কোনও বিপদের জন্য

যেন তিনি বড়ই আকুল। শান্তনুর এবারের ভাষণটি মনে রাখার মতো। তিনি বললেন—তুমি আমার একশ ছেলের বাড়া এক ছেলে। আমি আর সন্তান বৃদ্ধির জন্য অনর্থক বিয়ে-টিয়ে করে গোলমাল পাকাতে চাই না—ন চাপ্যহং বৃথা ভূয়ো দারান্ কর্তুমিহোৎসহে।

এ যেন অতিরিক্ত মদ্য মাংসপ্রিয় এক অতিথি আমন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে বলছে—না, না, ওসব ব্যবস্থা করবেন না। ওই শাক-শুক্তোতেই খুব ভাল। কিন্তু এই ভাল-মানুষির সঙ্গে শান্তনু যখন বলেন—পিতার কাছে একটি মাত্র পুত্রও যা নিঃসন্তান হওয়াও তাই—তখনই তাঁর আসল ইচ্ছেটা বোঝা যায়। দেবব্রতকে তিনি শতপুত্রের অধিক গৌরব দান করেও যখন মন্তব্য করেন—যজ্ঞ বল, বেদ বল, এই সমস্ত কিছুই পুত্রপ্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে কম—তখন বোঝা যায় দেবব্রত ছাড়াও অন্য আরও কোনও পুত্রের মাহাত্ম্য তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠছে। দেবব্রতকে শান্তনু বলেছিলেন—তুমি সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ করে বেড়াচ্ছ—ত্বঞ্চ শূরঃ সদামর্ষী শস্ত্রনিত্যশ্চ ভারত—এই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তোমার যদি ভালমন্দ কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তুমি যদি কোনওভাবে নিহত হও—নিধনং বিদ্যতে ক্বচিৎ—তাহলে এই বিশাল বংশের কী গতি হবে?

শান্তনুর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—দেবব্রত ছাড়াও তিনি অন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করছেন এবং পুত্রের কথা বলাটাই যেহেতু ধর্মসম্মত, যেহেতু শাস্ত্রে বলে—পুত্রের প্রয়োজনেই বিবাহ—অতএব বিবাহের মতো একটি গৌণ কর্ম তাঁর অভীপ্সিত নয় এবং যেন পুত্রোৎপত্তির মতো কোনও মুখ্য কর্মের সাধন হিসেবেই এই বিবাহের প্রয়োজন। পুত্র দেবব্রত সব বুঝলেন। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—সব বুঝেই বুদ্ধিমান দেবব্রত পিতার কাছে বিদায় নিয়ে কুরুসভার এক বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে এলেন—দেবব্রতো মহাবুদ্ধিঃ পথ্যমেবানুচিন্তয়ন্। দেবব্রত তাঁকে পিতার মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেই মন্ত্রী কোনও ঢাক্‌ঢাক্-গুড়গুড় না করে স্পষ্ট বললেন—দাস রাজার কন্যা সত্যবতীর জন্য শান্তনুর মন খারাপ হয়েছে। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন।

মন্ত্রীর কথা শুনে দেবব্রত সঙ্গে সঙ্গে কুরুসভার অভিজ্ঞ, বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই কৈবর্তপল্লীতে। পিতার বিবাহের জন্য দেবব্রত সত্যবতীকে যাচনা করলেন দাসরাজার কাছে। দাসরাজা বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি আকস্মিকভাবে কোনও উলটো কথা বলে বসলেন না। কুমার দেবব্রতকে সাদর সম্ভাষণে তুষ্ট করে আগে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন নিজের সভায়। বললেন—কুমার! আপনি মহারাজ শান্তনুর পুত্র। যাঁরা অস্ত্রবিদ্ বলে বিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে আপনি হলেন গিয়ে শ্রেষ্ঠ। পিতার উপযুক্ত অবলম্বন। আপনাকে আর কীই বা আমি বলব! সত্যি কথা বলতে কি—মহারাজ শান্তনুর মতো এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের সুযোগ পেয়েও যদি সেটা গ্রহণ করা না যায়, তবে আমি কেন স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রঠাকুরও অনুতপ্ত হবেন মনে মনে।

দাসরাজা লুব্ধ শান্তনুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছিলেন, যেভাবে নিজের শর্তটি তাঁকে শুনিয়েই চুপ করে গিয়েছিলেন, এখানে কুমার দেবব্রতর সঙ্গে সেভাবে কথা বললেন না। দেবব্রত যুদ্ধবাজ মানুষ, সত্যে তাঁর চিরপ্রতিষ্ঠা, অতএব দাসরাজা ধীরভাবে তাঁর কথাগুলি সযৌক্তিক করে তুললেন। দাসরাজা বললেন—এ মেয়ে আমার নয়, কুমার। কন্যাটি রাজা উপরিচরের—যে উপরিচর কৌলীন্যের গুণে আপনাদেরই সবার সমকক্ষ। তিনি কতবার আমাকে বলেছেন যে, এই মেয়ের উপযুক্ত স্বামী হতে পারেন একমাত্র মহারাজ শান্তনু—তেন

AMARBOI.COM

মে বহুশস্তাত পিতা তে পরিকীর্তিতঃ। অর্হঃ সত্যবতীং বোঢুম্...।

কোথায় মহারাজ উপরিচর, আর কোথায় শান্তনু! ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সময়ের একটা মস্ত ফারাক ঘটে যায়। তবে ওই যে বলেছিলাম—মৎস্যদেশে উপরিচর বসু যে পুত্রটিকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুত্রের পরম্পরায় জাত কোনও মৎস্যরাজের কন্যা হবেন সত্যবতী। দাসরাজা কৈবর্তপল্লীতে তাঁকে মানুষ করেছেন বটে, তবে বাসব রাজাদের কৌলীন্য তিনি ভুলে যাননি। আর কী অদ্ভুতভাবে সত্যবতীর উপাদেয়তা এবং দুর্লভতা উপস্থাপন করছেন তিনি। দাস রাজা বললেন—এই তো সেদিন দেবর্ষি অসিত এসেছিলেন আমার থানে। অসিত, দেবল—এঁরা সব দেবর্ষি। তা দেবর্ষি অসিত বললেন—সত্যবতীকে তাঁর চাই। আমি সোজা 'না' বলে দিলাম—অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতঃ পুরা ময়া। রাজকন্যে বলে কথা, তাকে কি আর এক শুষ্করুক্ষ মুনির হাতে তুলে দিতে পারি!

দাস-রাজা এবার প্রকৃত প্রস্তাব করছেন। বললেন—তবে কিনা কুমার! আমি মেয়ের বাবা বলে কথা। আমার তো কিছু বলার থাকতেই পারে। আমি শুধু চাই—আমার মেয়ের ঘরে যে নাতি জন্মাবে, তার কোনও বলবান শত্রু না থাকে। আমি তো জানি রাজকুমার—তোমার মতো এক মহাবীর যদি অসুর-গন্ধর্বদেরও শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তবে সেই অসুর-গন্ধর্বরাও রক্ষা পাবে না, তাঁদের কাউকে আর সুখে বেঁচে থাকতে হবে না—ন স জাতু সুখং জীবেৎ ত্বয়ি ক্রুদ্ধে পরন্তপে। তা এখানে আমার এই মেয়ের গর্ভে তোমার পিতার যে পুত্রটি জন্মাবে এবং, ভগবান না করুন, কখনও যদি তাঁর সঙ্গে তোমার শত্রুতা হয়, তবে তার আর বাঁচার আশা থাকবে? শান্তনুর সঙ্গে আমার মেয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধে আমি এইটুকুই মাত্র দোষ দেখতে পাচ্ছি। আমার আর কোনও অসুবিধেই নেই। সত্যবতীকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া বা না দেওয়া—এর মধ্যে এইটুকুই যা খটকা—এতাবান্ অত্র দোষো হি...দানাদানে পরন্তপ।

কুমার দেবব্রত কৈবর্ত রাজার আশয় স্পষ্ট অনুধাবন করলেন। সমস্ত ক্ষত্রিয়বৃদ্ধর সামনে তিনি সোদাত্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—তুমি তোমার মনের সত্য গোপন করনি, দাসরাজ! আমিও তাই সত্যের প্রতিজ্ঞা করছি। উপস্থিত ক্ষত্রিয়রা সবাই শুনে রাখুন—এমন প্রতিজ্ঞা আগে কেউ করেননি, পরেও কেউ করবেন না—নৈব জাতো ন চাজাত ঈদৃশং বক্তুমুৎসহেৎ। দেবব্রত এবার দাসরাজের কথার সূত্র ধরে বললেন—তুমি যেমনটি বললে, আমি তাই করব। আমি কথা দিচ্ছি—এই সত্যবতীর গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, সেই আমাদের রাজা হবে—যো'স্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি।

আগেই বলেছিলাম—কৈবর্তরাজ পাটোয়ারিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তিনি বুঝলেন—সত্যবতীর ছেলের রাজা হবার পথ নিষ্কণ্টক। কিন্তু রাজত্ব, রাজসুখ এমনই এক বস্তু যা পেলে বংশ-পরম্পরায় মানুষের ভোগ করতে ইচ্ছা করে। উল্কার মতো এসে যে সুখ ধূমকেতুর মতো চলে যায়, সে সুখ রাজতন্ত্রের রাজা বা গণতন্ত্রের নেতা—কেউই চান না। দাসরাজা তাই চিরস্থায়ী রাজসুখের স্বপ্ন দেখে দেবব্রতকে বললেন—আপনি যা বলেছেন, তা শুধু আপনারই উপযুক্ত। তবে কিনা আমি মেয়ের বাবা বলে কথা। মেয়ের বাবাদের স্বভাবই এমন আর সেই স্বভাবের বশেই আরও একটা কথা আমায় বলতে হচ্ছে—কৌমারিকাণাং শীলেন বক্ষ্যাম্যহমরিন্দম।

কৈবর্তরাজ বলেন—আপনার প্রতিজ্ঞা যে কখনও মিথ্যা হবে না, সে কথা আমি বেশ জানি। আমি জানি—আপনার পিতার পরে আমার সত্যবতীর ছেলেই রাজা হবে। কিন্তু কুমার!

আপনার যে পুত্র হবে তাঁর সম্বন্ধে আমার সন্দেহটা তো থেকেই যাচ্ছে—তবাপত্যং ভবেদ্ যত্তু তত্র নঃ সংশয়ো মহান্। দেবব্রত দাসরাজার অভিপ্রায় বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—শুনুন মহাশয়েরা, আমার পিতার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি পূর্বেই রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করেছি, আপনারা শুনেছেন। এখন আমি বলছি—আমি বিবাহও করব না এ জীবনে। আজ থেকে আমি ব্রহ্মচর্য পালন করব—অদ্য প্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি। আমি চিরজীবন অপুত্রক অবস্থায় থাকলেও এই ব্রহ্মচর্যই আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।

সেকালের দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল—অপুত্রকের স্বর্গলাভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচারীর জীবনে যে নিয়ম-ব্রত এবং তপস্যার সংযম আছে, সেই সংযমই তাকে স্বর্গের পথে নিয়ে যায়। দেবব্রতের প্রতিজ্ঞার পরে ব্রহ্মচর্যের সংযম তাই স্বেচ্ছাকৃত হলেও অকারণে নয়।

দেবব্রতর কঠিন প্রতিজ্ঞা শুনে অন্য কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হল, মহাভারতের কবি সে খবর দেননি, কিন্তু দাস রাজার হৃদয় আপন স্বার্থসিদ্ধিতে প্রোৎফুল্ল হয়ে উঠল। সানন্দে তিনি ঘোষণা করলেন—মেয়ে দেব না মানে! তোমার পিতার নির্বাচিত বধূকে এই এখুনি তোমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। পিতার মনোনীত হস্তিনাপুরের রাজবধূ সত্যবতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবব্রত। তাঁকে আপন জননীর সম্মান দিয়ে ভীষ্ম বললেন—এস মা! রথে ওঠ। আমরা এবার নিজের ঘরে ফিরব—অধিরোহ রথং মাতঃ গচ্ছাবঃ স্বগৃহানিতি।

বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেবব্রত হয়তো সত্যবতীর সমবয়সী হবেন প্রায়। হয়তো বা সত্যবতী একটু বড়। দেবব্রত যখন শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মেছেন, হয়তো তাঁর সমসাময়িককালেই পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মেছেন মহাভারতের কবি। কিন্তু বিবাহের বয়স যেহেতু রমণীর ক্ষেত্রে সব সময়েই কম হয় অপিচ পরাশর যেহেতু সত্যবতীর প্রথম যৌবনটুকুই লঙ্ঘন করেছিলেন, তাতে অনুমান করি—সত্যবতী দেবব্রতর চেয়ে খুব বেশি বড় হবেন না বয়সে।

AMARBOI.COM

যাই হোক, দেবব্রত যেদিন জননীর সম্বোধনে সত্যবতীকে নিজের রথে তুলে নিয়ে হস্তিনাপুরের পথে পা বাড়ালেন, সেদিন থেকেই এই অল্পবয়স্কা জননীর সঙ্গে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল। হস্তিনাপুরের রাজসঙ্কটে এই প্রায় সমবয়স্ক দুই মাতা-পুত্রের পরম বন্ধুত্ব বার বার পরে আমাদের স্মরণ করতে হবে। দেবব্রত অল্পবয়স্কা জননীকে রথে চাপিয়ে—রথমারোপ্য ভাবিনীম্—উপস্থিত হলেন হস্তিনাপুরের রাজধানীতে, পিতার প্রকোষ্ঠে। শান্তনুকে তিনি জানালেন—কীভাবে দাসরাজাকে রাজি করাতে হয়েছে এই বৈবাহিক সম্পর্ক সুসম্পন্ন করার জন্য।

এই মুহূর্তে শান্তনুর মুখে পুত্র দেবব্রতর স্বার্থ-সম্বন্ধীয় কোনও সুশ্চিন্তার বলিরেখা আপতিত হয়নি। একবারও উচ্চারিত হয়নি—পুত্র! তোমাকে আমি যুবরাজ পদবীতে অভিষিক্ত করেছিলাম, এখনও তুমি তাই থাকলে। একবারও শান্তনু বলেননি—দেবব্রত! তোমার মতো পুত্র থাকতে, অন্য পুত্রের প্রয়োজন নেই আমার। পরম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দেবব্রতর যৌবরাজ্যের সুখ সংক্রান্ত হল শান্তনু ভাবী পুত্রের জন্য। যৌবনবতী সত্যবতীকে লাভ করে শান্তনুর হৃদয়ে যে রোমাঞ্চ তৈরি হয়েছিল, সেই আকস্মিক হৃদয়াহ্লাদ মহাভারতের কবি সলজ্জে বর্ণনা করেননি, কারণ আপন জননী সত্যবতীর সম্পর্ক চেতনার মধ্যে রাখলে শান্তনুও মহাভারতের কবির পিতা। তাঁর পক্ষে শান্তনুর হৃদয় ব্যাখ্যা করা সাজে না। যা সাজে তিনি তাই করেছেন। শান্তনুর মুখ দিয়ে পরমেপ্সিত স্ত্রী লাভের কৃতজ্ঞতা বেরিয়ে এসেছে পুত্র

দেবব্রতর জন্য। তিনি বর দিলেন—বৎস! তুমি যত কাল বেঁচে থাকতে চাও, ততকালই বেঁচে থাকবে। মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন, তুমি ইচ্ছামৃত্যু—ন তে মৃত্যুঃ প্রভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।

আমরা শুধু ভাবি—শান্তনু যখন একপুত্রের জীবন নিয়ে পূর্বে এত শঙ্কিত হচ্ছিলেন, তখনই এই মহান বরদান সম্পন্ন করলে পারতেন। কিন্তু তাতে মহাভারতের কবির পক্ষে লোকচরিত্রের বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব হত না। পুত্রকে সারা জীবন বাঁচিয়ে রাখা বা মৃত্যুকে তাঁর ইচ্ছাধীন করে রাখার মধ্যে পিতার সবথেকে বেশি বাৎসল্য প্রকাশ পায়, জানি। হয়তো পুত্রকে এক বৃহৎ জীবন দান করে তাঁর নিজকৃত বঞ্চনার প্রতিদান দিয়েছেন শান্তনু। কিন্তু মহাভারতের কবির দৃষ্টিতে—এই ঘটনা বঞ্চনার অক্ষরে লিখিত হয়নি, হয়তো তাঁর কাছে এ ঘটনা তত রূঢ়ও নয়। পরবর্তী সময়ে মহাভারতের বিশাল ঘটনা-সন্নিবেশের মধ্যে দেবব্রতকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হবে, তাতে দেখা যাবে, পিতার বাৎসল্যে এই মহান পুরুষটি বঞ্চিত হলেও, অতিদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হওয়ার সুবাদে তিনি এক বিশাল যুগের দ্রষ্টা বলে পরিগণিত হবেন।

পিতার বিবাহের জন্য প্রতিজ্ঞা করে একদিকে তিনি ইচ্ছামৃত্যু হলেন, অন্যদিকে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য রাজা-প্রজা সকলে তাঁকে 'ভীষ্ম' নামকরণ করল। কিন্তু আমাদের কাছে এ সব কিছুর চাইতেও দাসরাজার ক্ষুরধার বক্তব্যটুকু বড় হয়ে উঠেছে। সত্যবতীর সঙ্গে পিতার বিবাহ দেওয়ার জন্য দেবব্রতর রাজত্ব পরিত্যাগের শপথ শুনেই দাসরাজা বলেছিলেন—আপনি এই প্রতিজ্ঞা করে শুধু মহারাজ শান্তনুরই প্রভু হলেন না, এই কন্যা সত্যবতীরও প্রভু হলেন—ত্বমেব নাথঃ পর্যাপ্তঃ শান্তনোরমিতদ্যুতেঃ। কন্যায়াশ্চৈব ধর্মাত্মন্...।

AMARBOI.COM

আমরা পরে দেখব—দেবব্রত ভীষ্ম কুরুবংশের গৌরবের জন্য সত্যবতীর পুত্র থেকে আরম্ভ করে সেই দুর্যোধন পর্যন্ত তাঁর লোকহিতৈষিণী ভাবনা প্রসারিত করেছেন। আমরা বলব—তাঁর এই ভাবনা আরম্ভ হয়েছে পিতার বিবাহ দেওয়া থেকে। যে ব্যক্তি পিতার বিবাহ দর্শন করে নিজের যৌবন আরম্ভ করেন, সেই ব্যক্তিকে এক মহাকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখে মহাভারতের কবি তাঁকে এক সাক্ষী চৈতন্যের ভূমিকায় দ্রষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এই দ্রষ্টার দৃষ্টি থেকেই পরে মহাভারতের কর্তার সৃষ্টি হবে। সত্যবতীর এক পুত্র সত্য দর্শন করছেন, সত্যবতীর আরেক পুত্র সত্য বর্ণন করছেন—সত্য-দর্শন আর সত্যের বর্ণন থেকেই কবির জন্ম—দর্শনাৎ বর্ণনাচ্চৈব রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ। এক অর্থে বেদব্যাস যদি মহাভারতের স্রষ্টা কবি হন, তাহলে দেবব্রত ভীষ্ম হলেন দ্রষ্টা কবি। আর শুধু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেই নয়—পিতার বিবাহ থেকে আরম্ভ করে দিন-দিন প্রতিদিন, তাঁর মৃত্যুকামনা পর্যন্ত যত ভীষণ ঘটনা তাঁকে দেখতে হবে, সেইজন্যই নিষ্পাপ নিষ্কলুষ দেবব্রত 'ভীষ্ম' হলেন হয়তো। 'ভীষ্ম' না হলে এত কঠিন ঘটনা-পরম্পরা, যা তাঁর স্বপ্নসৃষ্টি থেকে একটু একটু করে অবক্ষীণ হতে থাকবে, 'ভীষ্ম' না হলে, তিনি সেসব সহ্য করবেন কী করে?

সাতান্ন

এই সেদিনও নবাব আলিবর্দি খাঁকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব বলে বিমলানন্দ লাভ করতাম। বাংলা-বিহার-ওড়িশার এই একক জোটের বৈশিষ্ট্য, বলতে গেলে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে চলে আসছে। মগধরাজ জরাসন্ধ যখন তাঁর শাসন-ক্ষমতার তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছেছেন, তখন অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গের রাজা ছিলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অসম বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অনার্য রাজাও ছিলেন তাঁরই মিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভূত। দক্ষিণে চেদি, বিদর্ভ, দশার্ণ দেশের রাজারা জরাসন্ধের আজ্ঞায় উঠতেন এবং বসতেন, অথচ এই সমস্ত রাজ্যই আগে যাদবদের অধিকারভুক্ত ছিল। হয়তো সেই কারণেই যাদবদের যে কোনও উপায়ে পর্যুদস্ত করাটাই যেমন জরাসন্ধের ধর্মের মতো হয়ে গিয়েছিল, তেমনই যাদবরাও জরাসন্ধের চিরশত্রু হয়ে গিয়েছিলেন।

যাদবদের প্রতি জরাসন্ধের শত্রুতা চরমে পৌঁছয়, যখন মথুরার অধিপতি উগ্রসেন কারাগারে বন্দী হলেন। জরাসন্ধের 'এজেন্ট' হিসেবে তাঁরই ক্ষেত্রজ পুত্র কংস খুব ভালভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন মথুরা-শূরসেনের ভূখণ্ডে। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা—যাদবরা যেহেতু বিভিন্ন সংঘমুখ্যকে নিয়ে একটি গোষ্ঠীতন্ত্র চালাতেন, তাই বিভিন্ন সংঘমুখ্যর মধ্যে যে সব অন্তর্বিবাদ ছিল, সেই বিবাদের সুযোগ নিয়েই জরাসন্ধ মথুরায় নিজের প্রতিনিধি কংসকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয়—অন্ধক-কুকুর বংশের প্রধান আহুকের পুত্র দেবক, উগ্রসেনের বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি মথুরা-শূরসেনের রাজা হতে পারেননি। রাজা হয়েছিলেন কনিষ্ঠ উগ্রসেন। দেবক স্বেচ্ছায় এই রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন নাকি তাঁর মনে এ সব ঘটনা নিয়ে কোনও ক্ষোভ ছিল, তা নিয়ে ইতিহাস-পুরাণে একটি কথাও স্পষ্ট করে বলা

নেই। অন্য রাজবংশগুলিতে রাজা হিসেবে অমনোনীত জ্যেষ্ঠ পুরুষদের হয় মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতে দেখেছি, নয়তো ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে দেখেছি। আজকের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবক কিন্তু নিজের রাজ্যেই অথবা কনিষ্ঠ উগ্রসেনের রাজ্যেই বসবাস করছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনও চাপা ক্ষোভ ছিল কি না আমরা তা জানি না, কিন্তু অন্ধক, বৃষ্ণি, ভজমান ইত্যাদি যাদবসংঘের মধ্যে সব সময়েই যে খুব সদ্ভাব ছিল এমন মোটেই নয়। নানা বিষয় নিয়ে এঁদের মতপার্থক্য ছিল এবং হয়তো এই পার্থক্যের সুযোগ নিয়েই কংস রাজা হতে পেরেছিলেন মথুরায়।

দেশে নতুন রাজা রাজত্বভার গ্রহণ করলে সর্বকালে এবং সর্বদেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, কংস রাজা হবার পর যাদব সংঘমুখ্যদের মধ্যেও সেই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। সাধারণত ক্ষমতার পালা বদল হলে উচ্চশ্রেণীর মানুষের একাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে রাজা বা নেতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন, আর অন্যাংশ এই নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে থাকেন। কংস রাজা হবার পর যাদব সংঘমুখ্যদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে আমরা কংসের রাজসভার একটি আলোচনাচক্রের কথা উল্লেখ করব। এখন তার প্রসঙ্গ নেই বলে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে, কংস ভোজ-বৃষ্ণিমুখ্যদের অনেককেই সঙ্গে পেয়েছিলেন।

উপরিউক্ত এই সভায় প্রথম বক্তৃতা দেবার সময় কংস রাজোচিতভাবে বলেছিলেন—এই মহান যদুকুল যখন নিজের মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন—ব্যাবর্তমানং সুমহৎ—তখন আপনাদের মতো কীর্তিমান লোকেরাই এই যদুবংশকে আপন মর্যাদায় স্থাপন করেছিলেন, ঠিক যেমন পাহাড়ের দৃঢ়তায় ধৃত হয় এই ধরাতল—ধৃতঞ্চ যদুকুলং বীরৈ র্ভূতলং পর্বতৈরিব। সন্দেহ নেই—কংসের বলা ওই যদুকুলের মর্যাদাভ্রংশের সময়টি অবশ্যই কংসের পূর্বঘটিত বলেই কংস মনে করেন। তিনি নিশ্চয় মনে করেন—তাঁর সময়েই যদুবংশের চরম প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা মর্যাদা পুনঃস্থাপনে সাহায্য করেছেন কংসকে, তাঁরা অনেকেই কংসের মন যুগিয়ে চলেন। কংস নিজেই সেকথা সগর্বে উচ্চারণ করে বলেছেন—আপনারা সকলেই আপন আপন স্থানে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি এবং আপনারা প্রত্যেকেই আমার মনের অনুকূল আচরণ করেন—এবং ভবৎসু যুক্তেষু মম চিত্তানুবর্তিষু।

কংসের মনের অনুকূল আচরণ যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে এমন সব নাম আমরা পাচ্ছি, যাঁদের নাম শুনলে আমাদের কিছুটা আশ্চর্যই লাগবে। কংস এই সভায় কৃষ্ণপিতা বসুদেবকে খুব কষে গালাগালি দিয়েছিলেন। তাতে বুঝি, তিনি তাঁর অনুকূল ছিলেন না। কিন্তু কৃতবর্মা, ভূরিশ্রবা যাঁদের নাম আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আবার শুনতে পাব, কিংবা অক্রূর, যাঁকে ভবিষ্যতে অনেক সময়েই কৃষ্ণের বিপক্ষভূমিতে দেখতে পাব, অথবা দারুক, সত্যক—ভবিষ্যতে যাঁদের কৃষ্ণের সহমর্মিতার স্থানে দেখতে পাব—এঁদের সকলকে কিন্তু এখন কংসের অনুকূল ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কংস রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বলেই হোক, বুদ্ধিতেই হোক অথবা মগধরাজ জরাসন্ধের জুজু দেখিয়েই হোক—এঁদের সবাইকে তিনি নিজের অনুকূলে টানতে পেরেছিলেন।

মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে কংসের রাজনৈতিক স্থিতি নিয়ে আমরা যে দু-চারটে কথা বলছি, বা বলব, তা যেমন মহাভারতে একটু-আধটু পাব, তেমনই অনেকটাই পাব হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণগুলিতে। মহাভারতের স্বল্পোল্লিখিত সংবাদগুলি আমরা যখন পুরাণগুলি থেকে 'সাবস্ট্যানসিয়েট' করতে পারব তখনই বুঝব, আমরা ঠিক কথা বলছি। কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্যই আমরা এখন শুধু ভূমিকা রচনা করছি এবং তা করতে হচ্ছে হরিবংশ কিংবা পুরাণ থেকে।

অন্ধক বংশের রাজা উগ্রসেন কারাগারে বন্দী হলে কংস রাজা হলেন। কিন্তু উগ্রসেন যখন রাজা ছিলেন, তখনও কিন্তু আমরা উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠ দেবকের মধ্যে কোনও মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখিনি। তিনি উগ্রসেনের বড় ভাই না ছোট ভাই, সেই তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি—দেবক কখনও উগ্রসেনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেননি। কিন্তু কংস যখন রাজা হলেন এবং পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করলেন, তখন কিন্তু তিনি কংসের বিরুদ্ধ রাজনৈতিক কোটিতে অবস্থান করছিলেন বলেই মনে করি। এই ধারণার কারণও আছে।

প্রাথমিকভাবে কংস বেশিরভাগ যাদব গোষ্ঠী বা সংঘমুখ্যর সমর্থন আদায় করে নিলেও ক্ষমতার লোভে অথবা ক্ষমতার চূড়ায় বসে তিনি নিজেকে আর নিজের বশে রাখতে পারেননি। এর ফলে মথুরাবাসীর ওপরে নেমে এসেছে অত্যাচার আর অবিচারের বোঝা। হরিবংশে বর্ণিত কংসের চেহারাটা যদি ধর্মের নির্মোক মুক্ত করে বিচার করি; তাহলে ইতিহাসের তথ্যগুলো একটু একটু করে বেরিয়ে আসতেও বা পারে।

ধর্মের রক্ষার কারণে ঈশ্বর যখন অবতার গ্রহণ করেন, তখন প্রায় রুটিনমাফিক একটা আবেদন-নিবেদনের পালা আসে ভগবান বিষ্ণুর কাছে। মুনি-ঋষি, দেবতা, অথবা স্বয়ং পৃথিবীমাতাকে আমরা এই সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় বিষ্ণু-নারায়ণের কাছে পৌঁছতে দেখব। তাঁরা পৃথিবীতে অত্যাচারী রাজার অত্যাচারের ফিরিস্তি দিয়ে ঈশ্বরকে অবতার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ঈশ্বর ভক্তের ওপর অপার করুণায় দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে অত্যাচারীকে বধ করেন এবং পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে এই দেবতা, ঋষি বা পৃথিবীর সরোদন অনুরোধ ভগবান বিষ্ণুর কাছে এসেছিল কংসের রাজত্বকালেও। আমরা সে সবের মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা যেহেতু পরবর্তী কালে কৃষ্ণকে এক বিশুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এবং ত্রাতা হিসেবে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করব, তাই এই অবতারগ্রহণের প্রণালীর মধ্যে থেকেই আমাদের রাজনৈতিক উপাদানগুলি চয়ন করতে হবে। কংসের অত্যাচার চরমে পৌঁছলে নারদ ঋষি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রথমে মথুরাপুরীর বর্ণনা দিলেন খানিকটা। তিনি বললেন—মথুরাপুরী এক বিরাট বিস্তৃত নগরী। বড় বড় বাড়ি অথবা অট্টালিকার শোভা তো আছেই, কিন্তু আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল মথুরাপুরীর সুবৃহৎ প্রাচীরখানি এবং তার প্রবেশদ্বারটুকু—সা পুরী পরমোদারা সাট্টপ্রাকারতোরণা।

আমরা জানি—ইতিহাসের প্রয়োজনেই মথুরাপুরীর এই বিরাট প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। মগধরাজ জরাসন্ধের আগ্রাসী হাত থেকে মথুরাবাসীদের বাঁচনোর জন্যই এই দুর্গপ্রায় প্রাচীর পরে ব্যবহৃত হবে বটে, তবে এই প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল কংস রাজা হওয়ার বহু পূর্বে। পৌরাণিকদের কথা শুনে বোঝা যায়—মথুরা নগরীর মধ্যস্থিত বাসস্থানটি তৈরি করেছিলেন শূরসেন, যাঁকে আমরা পূর্বে যদুবংশীয় কার্তবীর্যার্জুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে চিহ্নিত করেছি—নিবিষ্টবিষয়শ্চৈব শূরসেন স্ততো'ভবৎ। পৌরাণিকেরা কাব্য করে বলেছেন—মথুরা-নগরীর চারদিকে যে স্বচ্ছজলের পরিখা নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই পরিখাটি দেখতে লাগত উড়িয়ে দেওয়া একটি ওড়নার মতো। তার মধ্যে যমুনার প্রাকৃতিক বেষ্টনী মথুরানগরীকে অর্ধচন্দ্রের শোভায় ভূষিত করেছিল—অর্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা।

দেখুন, কংসের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করার জন্য মথুরার নিসর্গশোভা বর্ণনার যে কোনও প্রয়োজন নেই সেটা আমরা যথেষ্ট জানি। কিন্তু এই বর্ণনার অনুষঙ্গে আমরা যেটা বলতে চাই, সেটা হল—মথুরা-নগরীর সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এতটাই ভাল ছিল যে, কংসকে সে দিক দিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তাই করতে হয়নি। মনু-মহারাজ শূরসেনকে

AMARBOI.COM

ব্রহ্মর্ষিদেশগুলির অন্যতম বলে গণ্য করেছেন, সেটা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মহাভারতের মন্তব্যের সঙ্গে মেলে। মহাভারত বলেছে—বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাপারে মথুরা-শূরসেনীদের বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হত—শূরসেনাশ্চ যজ্ঞান্। অন্যদিকে অর্থনীতির কথা যদি ভাবেন, তাহলে হিউয়েন সাঙের সময়ে অন্তত এই রাজ্যের সম্পন্নতা এবং ভূমির উর্বরতার সংবাদ যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের অবস্থাও মোটেই খারাপ ছিল না। শস্যও হত প্রচুর। ক্ষেত্রাণি শস্যবন্ত্যস্যা কালে দেবশ্চ বর্ষতি। মথুরায় একটা ভাল বাজার ছিল, যেখানে দেশ-বিদেশের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। নগরীর দোকান-পাট, রত্নসঞ্চয় সমসাময়িক অন্যান্য নগরীর তুলনায় ঈর্ষণীয় ছিল—পুণ্যাপণবতী দুর্গা রত্নসঞ্চয়গর্বিতা।

মথুরা-নগরীর এই সমৃদ্ধিই এক সময় মহারাজ কংসকে লুব্ধ করে তুলল। মথুরা-শূরসেনীদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে তিনি বিচ্যুত হলেন। ব্রাহ্মণ্য যাগ-যজ্ঞ অথবা সত্যধর্মের পথ তাঁকে কোনওভাবেই আকর্ষণ করল না। জরাসন্ধের জামাই হবার সুবাদে সমস্ত সামন্ত রাজা তাঁকে ভয় করে চলতে আরম্ভ করল—রাজ্ঞাং ভয়ঙ্করো ঘোরঃ শঙ্কনীয়ো মহীক্ষিতাম্—আর সেই থেকেই কংস নিজেকে বেশ কেউকেটা বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত সৎ পথ থেকে তিনি যেমন বিচ্যুত হলেন, তেমনই মথুরাবাসী প্রজাদের কাছেও অত্যন্ত ভীতিজনক হয়ে উঠলেন—সৎপথাদ্ বাহ্যতাং গতঃ...প্রজানাং রোমহর্ষণঃ।

অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠলেন কংস। রাজধর্মের সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দেওয়াটা তাঁর কাছে সামান্য ঘটনা। আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি এমন সব কাণ্ড করতে আরম্ভ করলেন, যে যদুবংশীয় সংঘমুখ্যেরা আর তাঁর অন্যায় আচরণ মেনেও নিতে পারছিলেন না—ন রাজধর্মাভিরতো নাত্মপক্ষসুখাবহঃ। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় কংস প্রজাদের ওপর অযথা কর চাপিয়ে এমন উৎপীড়ন করা আরম্ভ করলেন, যাতে মনে হল রাজকর ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর স্পৃহা নেই—নাত্মরাজ্যে প্রিয়করশ্চণ্ডঃ কররুচিঃ সদা। ঠিক এই রকম চরিত্রের জন্যই পৌরাণিকেরা যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন, সেই সংজ্ঞা হল অসুর, রাক্ষস, দানব ইত্যাদি। পৌরাণিকের নিজের ভাষায়—কংস অসুরভাবের দ্বারা আবিষ্ট অন্তঃকরণে মাংসভক্ষী রাক্ষসের মতো সমস্ত লোকের উৎপীড়ন করতে লাগলেন—ক্রব্যাদো বাধতে লোকান্ অসুরেণাত্মরাত্মনা।

আমরা উগ্রসেন-জ্যেষ্ঠ দেবকের কথা বলতে বলতে কংসের কথায় এসেছিলাম। আমাদের ধারণা—কংসের উন্মাদ অত্যাচার যাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না, তাঁদের মধ্যে দেবক একজন। তিনি যে কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন, তা মোটেই নয়। তিনি একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন, যে মাধ্যমটি তিনি কাজে লাগাবেন কংসের বিরোধিতার জন্য। এই মাধ্যমটি ছিলেন বসুদেব, যিনি ভবিষ্যতে কৃষ্ণের পিতা হবেন।

কংস যেমন অন্ধক উগ্রসেনের পুত্র ছিলেন, তেমনই বসুদেব ছিলেন বৃষ্ণি-সংঘের মুখ্য পুরুষ। অবশ্য বৃষ্ণির বংশ চার-পাঁচটি ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আর সোজাসুজি বৃষ্ণিসংঘের মুখ্য নায়ক না বলাই ভাল। কারণ বৃষ্ণিবংশীয় অক্রূর তখনও কংসের অন্যতম সভাসদ এবং হয়তো তখনও কংসের অনুকূল। বসুদেব ছিলেন আর্য শূরের পুত্র। বৃষ্ণির এক পুত্রের ধারায় অক্রূরের জন্ম, আরেক পুত্রের ধারায় বসুদেবের জন্ম। হরিবংশে যেমন দেখছি, তাতে বোঝা যায় বসুদেব অক্রূরের চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং তিনিও ছিলেন কংসের সভাসদ। কিন্তু কংসের সভাসদ হলেও তিনি কংসের সব মত নির্বিচারে মেনে নিতে পারছিলেন না এবং মনে মনে তিনি বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন কংসের ব্যবহারে।

উগ্রসেন-জ্যেষ্ঠ দেবক তাঁর নিজের মেয়ে দেবকীর সঙ্গে এই ক্ষুব্ধ যুবকের বিয়ে দেবেন

বলে ঠিক করলেন, কিন্তু তার আগে দেখতে হবে এইরকম একটা পছন্দ তিনি করলেন কেন? বসুদেবের ক্ষোভটাই বা তিনি টের পেলেন কী করে? এসব কথা বলতে হলে আমাদের আরও দু-একটা কথা জানতে হবে।

মূল যদুবংশ যখন ভাগ হয়ে অন্ধক, বৃষ্ণি বা ভোজ সংঘে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন এই সংঘগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যেমন ছিল, তেমনই জ্ঞাতিভেদও কিছু কিছু ছিল। এক গোষ্ঠী বা সংঘের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠী বা সংঘ যদি ঘনিষ্ঠ হতে চাইত, তবে সব চেয়ে ঈপ্সিত উপায় ছিল বিবাহ। লক্ষ্য করে দেখুন, বসুদেবের পিতা শূর বা মহাশূর—তিনি কিন্তু এক ভোজরাজের কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন। এই ভোজরাজকন্যার গর্ভেই বসুদেব জন্মান। শোনা যায়—বসুদেবের জন্মের সময় স্বর্গরাজ্যে নাকি 'আনক' নামে এক বাদ্য বেজে উঠেছিল এবং সেইজন্যই বসুদেবের এক নাম 'আনকদুন্দুভি'—আনকানাঞ্চ সংহ্রাদঃ সুমহান্ অভবদ্ দিবি।

বসুদেব যখন প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা ভাবলেন, তখন কিন্তু প্রথমেই তিনি ভোজ, অন্ধক বা বৃষ্ণিগোষ্ঠীর কারও সঙ্গে সম্বন্ধের কথা ভাবলেন না। বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য তিনি বেছে নিলেন হস্তিনাপুরের রাজবংশকে। হস্তিনাপুরে তখন রাজত্ব করছিলেন মহারাজ শান্তনু এবং আমরা জানি শান্তনুর কোনও কন্যা সন্তান হয়নি। কিন্তু শান্তনুর মেজ দাদা বাহ্লীক, যিনি শান্তনুর রাজ্যাভিষেকের পর রাজ্য ছেড়ে তাঁর মামাবাড়ির দেশে চলে গিয়েছিলেন বলে বলেছি, তিনি কিন্তু পিতৃভূমিতে একেবারে পরবাসী ছিলেন না। শান্তনুর মন্ত্রিসভায় তিনি অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন, এবং মহাভারতের যত্রতত্র কৌরবসভার মন্ত্রী হিসেবে আমরা বাহ্লীকের নাম পাব। বাহ্লীকের সর্বময় খ্যাতি পুরুবংশীয় বলেই।

শান্তনুর এই মেজদাদা বাহ্লীকের পাঁচটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। এই পাঁচজনের নাম হল—রোহিনী, ইন্দিরা, বৈশাখী, ভদ্রা এবং সুনাম্নী। বাহ্লীক হস্তিনাপুরের রাজ্য নাই গ্রহণ করুন, রোহিণী ইত্যাদি পাঁচটি কন্যাই কিন্তু পৌরবী বলে পরিচিত ছিলেন—পৌরবী রোহিণী নাম ইন্দিরা চ তথা বরা।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—জরাসন্ধ যখন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবল হয়ে উঠছেন এবং মথুরাধিপতি কংস যখন তাঁর 'এজেন্ট' হিসেবে উত্তর-পশ্চিম ভারত প্রায় পদানত করে ফেলেছেন, তখন হস্তিনাপুরের এই নতুন রাজবংশের সঙ্গে বসুদেবের এই বৈবাহিক সম্বন্ধ রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি—হস্তিনাপুরে মহারাজ শান্তনুর পূর্বে তেমন শক্তিধর রাজা কেউ ছিলেন না। মহারাজ প্রতীপের পর শান্তনুর হাত ধরেই হস্তিনাপুরের পূর্ব গৌরব আবার ফিরে আসছিল। মগধরাজ জরাসন্ধ আপন পূর্বতন কুরুবংশের সম্বন্ধেই হোক, অথবা অন্য কোনও কারণে—কখনই তিনি হস্তিনাপুরের রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা করেননি। করলে, শান্তনুর ক্ষমতা হত না তাঁকে রোখার।

সে যাই হোক, বাহ্লীকের সঙ্গে শ্বশুর-সম্বন্ধ স্থাপন করে বসুদেব কিন্তু হস্তিনাপুরের নবোত্থিত রাজশক্তির সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হলেন এবং এই সম্বন্ধ রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাঁর কাছে জরুরী ছিল বলেই আমরা মনে করি। মহামতি বসুদেবের ঘরে আরও দুটি বৈবাহিক সম্বন্ধও যথেষ্ট খেয়াল করার মতো। অবশ্য এই সম্বন্ধ তিনিই ঘটিয়েছিলেন, নাকি তাঁর পিতা শূর, সে ব্যাপারে কোনও তর্ক না তুলেও বলতে পারি, এই সম্বন্ধগুলিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য- প্রণোদিত।

আপনাদের খেয়াল থাকবে—চৈদ্য• উপরিচর বসু যে রাজ্যে প্রথম এসে জাঁকিয়ে বসেছিলেন, সে রাজ্যের নাম হল চেদি। চেদি আগে যাদবদের দেশ ছিল। পরে এই দেশ দখল করে নেন উপরিচর বসু এবং তাঁর পাঁচ পুত্রের একজনকে তিনি এখানে অধিষ্ঠিত করেন।

হয়তো তাঁর নাম ছিল প্রত্যগ্রহ। অনুমান করা যায়—তাঁরই কোনও অধস্তন পুরুষের সঙ্গে বসুদেবের এক ভগিনীর বিবাহ হয়। এই ভগিনীর নাম হল শ্রুতশ্রবা। বসুদেবের আরেক বোন হলেন পৃথুকীর্তি। এঁর বিবাহ হয় করূষ দেশের রাজা বৃদ্ধশর্মার সঙ্গে। করূষ দেশেও পূর্বে যাদবদের আধিপত্য ছিল, পরে সেখানে সিংহাসনে বসেন বসুরাজের আরেক পুত্র। মনে রাখা দরকার—চেদি এবং করূষ—এই দুই দেশই কিন্তু জরাসন্ধের দেশ মগধের সঙ্গে প্রায় লাগোয়া। সুদূর মথুরা-শূরসেনে বসে মগধ-রাজ্যের পাশাপাশি দুটি রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করার মধ্যে যতখানি হৃদয়ের সরসতা আছে, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি আছে রাজনৈতিক অভিসন্ধি।

কংস যেখানে দিনে দিনে অত্যাচারী হয়ে উঠছেন, সেখানে জরাসন্ধের আত্মীয়জনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে শূর এবং বসুদেব—দুজনেই হয়তো খানিকটা 'রিলিফ' পেতে চেয়েছিলেন। আমরা পরে দেখব—বসুদেবের ভগিনীর এই সম্বন্ধ দুটি একেবারেই বিফলে গিয়েছিল। অর্থাৎ যে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে এই বৈবাহিক সম্বন্ধ দুটি ঘটনো হয়েছিল বলে আমাদের অনুমান, সেই অভিসন্ধি ফলপ্রসূ হয়নি। পরবর্তী সময়ে চেদিতে শিশুপাল জন্মাবেন, করূষদেশে জন্মাবেন দন্তবক্র—এঁরা চিরকাল মথুরা-শূরসেনের বিরোধিতা করবেন।

কিন্তু সে সব পরের কথা, পরেই দেখা যাবে। মথুরা-শূরসেনের অন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে শূর কিংবা বসুদেবের স্থিতিটা আমরা আগে বুঝে নিই। চেদি-করূষে দুই বোনের বিয়ে দিয়ে এবং নিজে হস্তিনাপুরের রাজসম্বন্ধী পাঁচটি কন্যাকে বিয়ে করে বসুদেব কিন্তু মথুরা-শূরসেনে এক রীতিমতো মাননীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। আমরা যেহেতু পরে তাঁকে মথুরাধিপতি কংসের কট্টর বিরোধী নেতার ভূমিকায় দেখতে পাব, তাই ধরে নিতে পারি, অনেক আগে থেকেই তিনি কংসের বিরোধী মত পোষণ করতেন।

ভাগবত পুরাণ কিংবা অন্যান্য কিছু বৈষ্ণবীয় পুরাণে বসুদেবের কাহিনী শুনলে মনে হবে—তিনি একেবারে এক গোবেচারা ভাল মানুষ। রাজনৈতিক বুদ্ধি তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি শুধু কংসের কোপানলে দগ্ধ হয়ে সারা জীবন কংসের কারাগারে পচে মরলেন। আমরা অবশ্য এই মতের পোষণ করি না। আমরা হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত পড়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, জরাসন্ধ-কংসের আমলে যে রাজনীতির আবর্ত তৈরি হয়েছিল, বসুদেবও তার অন্যতম বলি। আমরা মনে করি পূর্বদেশীয় দেশগুলির সঙ্গে বসুদেবের ভগিনীদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির সঙ্গে বসুদেবের নিজের বৈবাহিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করেই উগ্রসেনের বড় দাদা দেবক তাঁর সাত-সাতটি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন বসুদেবের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হলেন দেবকী।

দেবকের সাত মেয়ের নাম হল—সহদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী এবং দেবকী। এঁদের মধ্যে প্রথম ছয়জনের সঙ্গে বসুদেবের আগেই বিয়ে হয়েছিল কি না সে কথা স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই। কিন্তু কনিষ্ঠা অথবা জ্যেষ্ঠা দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের যে আলাদাভাবে এবং মহা আড়ম্বরে বিয়ে হয়েছিল—সেকথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি।

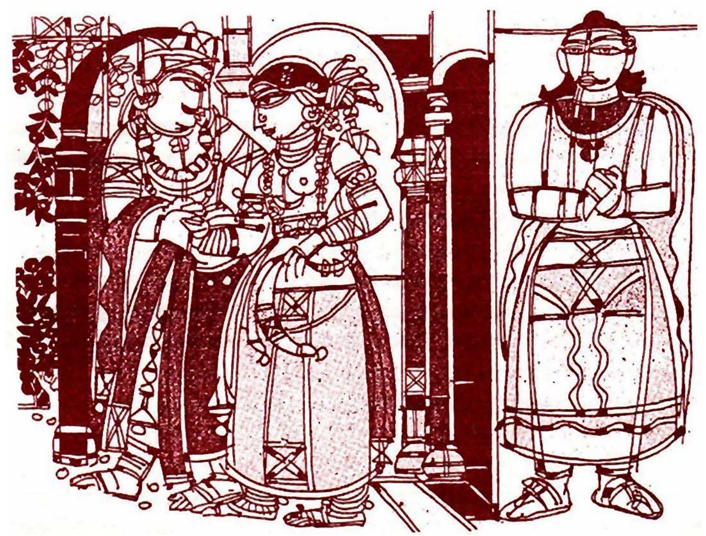

আটান্ন

মহামতি ভীষ্ম সত্যবতীকে রথে চড়িয়ে নিয়ে এসে পিতার সামনে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেই ক্ষান্ত হলেন না, শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে পিতার সঙ্গে সত্যবতীর শুভ-বিবাহও সম্পন্ন করলেন তিনি—বিবাহং কারয়ামাস শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা। এখানে সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়াটি হল প্রবর্তক ক্রিয়া—বিবাহং কারয়ামাস—বিবাহ করালেন। মন্দ লোকেরা অশ্লীল কথ্য ভাষায় কুবাক্য ব্যবহার করে বলে—'বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব'। যার প্রতি এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার যে এই শব্দ শ্রবণমাত্রেই অতি কঠিন এবং কষ্টকর প্রতিক্রিয়া হবে—সে কথা ধরে নিয়েই মন্দ লোকে এমন মন্দ কথা বলে। এই নিরিখে নিজের চোখের সামনে সত্যবতীর সঙ্গে পিতার বিবাহ সম্পন্ন করতে ভীষ্মের মনে কত কষ্ট হয়েছিল—সে খবর মহাভারতের কবি দেননি।

ভীষ্ম দেখলেন—তাঁর পিতা শান্তনু সত্যবতীকে নিয়ে নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন—তাং কন্যাং রূপসম্পন্নাং স্বগৃহে সন্ন্যবেশয়ৎ। সেই মুহূর্ত থেকেই কোনও কষ্টের কথা তো নয়ই, মহাভারতের কবি ভীষ্মকে যেন তাঁর পিতারও অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এমন একজন অভিভাবক, যিনি পিতার বিবাহ দিয়ে পিতার সন্তানগুলি মানুষ করার ভার নিলেন। শান্তনু খুব বেশিদিন বাঁচেননি। সত্যবতীর গর্ভে দুটি পুত্রের জন্ম দিলেন তিনি। দুই পুত্র—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য যৌবনের সন্ধিলগ্নে পৌঁছনোর আগেই শান্তনু স্বর্গত হলেন।

শান্তনু প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলেই যেহেতু নিজের জননী সত্যবতীর সম্বন্ধে কথা বলতে হয়, তাই মহাভারতের কবি কোনও বিস্তারের মধ্যে যাননি। শান্তনুর জীবনে মিতাচারিতার লক্ষণ খুব প্রকট নয়। পূর্ব জীবনে গঙ্গা এবং এই এখন এই মুহূর্তে সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর গার্হস্থ্য

জীবন খুব মিতাচারিতার মধ্যে কাটেনি বলেই মনে হয়। মহাভারতের কবি নিজের মাকে কোনও রকমে শান্তনুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সময় বুঝে তিনি খুব তাড়াতাড়ি ভীষ্মকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শান্তনু স্বর্গত হলে ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। সত্যবতীর বিবাহের সময় দাস রাজার পূর্বকথা এবং শর্ত তাঁর মনে আছে। সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে মহামতি ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রিক্ত সিংহাসন পূর্ণ করে দিলেন চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

রাজ্য পরিচালনা করার পূর্ব অবস্থায় একজন ক্ষত্রিয়ের যে তপস্যা এবং সাধনা দরকার হয়, চিত্রাঙ্গদের তা ছিল না। শান্তনুর বয়স্ক জীবনের আদর নিয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন, বলদর্পিতা এবং দম্ভ তাঁকে খানিকটা পেয়ে বসেছিল। কিছু দেশ জয় করার 'ক্রেডিট' তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এই জয়কার যে কোনও রাজনামের অলংকার-ধ্বনিমাত্র। বাস্তবে তিনি ছিলেন অহংকারী বলদর্পী। কাউকেই তিনি নিজের তুল্য বলে মনে করতেন না—মনুষ্যং ন হি মেনে স কঞ্চিৎ সদৃশমাত্মনঃ।

মহারাজ শান্তনুর মধ্যে যে অমিতাচারিতা ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হল ক্রোধ এবং অহংকার। দেবতা এবং অসুর, যাঁরা চিরকালই মনুষ্যবুদ্ধির উত্তর পর্যায়ে অবস্থিত, চিত্রাঙ্গদ তাঁদের তোয়াক্কা তো করতেন না, বরং সদা সর্বদা তাঁদের নিন্দায় মুখর ছিলেন। আর মানুষ তো তাঁর গ্রাহ্যের মধ্যেই ছিল না—তং ক্ষিপন্তং সুরাংশ্চৈব মানুষান্‌-অসুরাংস্তথা। মহাভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে দেবাসুর-মনুষ্যের মর্যাদা কলঙ্কিত করে কোনও রাজার পক্ষে সুস্থিরভাবে রাজ্যশাসন করা সম্ভব ছিল না। আমরা দেখতে পাচ্ছি—এক গন্ধর্বরাজ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন হস্তিনাপুরে চিত্রাঙ্গদ রাজার কাছে। রাজার কাছে তিনি বলছেন—আমার নামও চিত্রাঙ্গদ। পৃথিবীতে একই নামের দুটো লোক তো আর থাকতে পারে না। সেইজন্য আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই—ত্বয়াহং যুদ্ধমিচ্ছামি...ন গচ্ছেন্নাম তে মম।

চিত্রাঙ্গদ রাজা বলদর্পী মানুষ। দেবতাই হোন অথবা গন্ধর্ব, তাঁদের সব কথা তাঁর কাছে উন্মত্তের প্রলাপ। তিনি কাউকে মানেন না। অতএব দুজনেই পরস্পরকে গালাগালি দিতে দিতে—ইত্যুক্তঃ গর্জমানৌ তৌ—যুদ্ধ করার জন্য হিরন্মতী নদীর তীরে পৌঁছলেন। জায়গাটার নাম কুরুক্ষেত্র, যা আসলে এক বিশাল যুদ্ধভূমি। দুজনের যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং মহাভারতের সংবাদ অনুযায়ী এই যুদ্ধ চলল তিন বৎসর ধরে। আমাদের ধারণায় এই সময়ের বিস্তার হয়তো তিন দিন, তিন মাস নয়, তিন বছরও নয়। যুদ্ধের গরিমা প্রকাশ করার জন্য পৌরাণিক কল্পনায় তিন দিন তিন বছরে পরিণত হয়েছে। দুই চিত্রাঙ্গদের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধ হয়েছিল পরস্পর এককভাবে এবং এই যুদ্ধে কূটকৌশলের জোরে গন্ধর্বরাজ জিতে গিয়ে কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদকে মেরে ফেললেন।

হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে শোকের ছায়া নেমে এল। কিশোর বিচিত্রবীর্যকে দিয়ে বড় দাদার শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ শেষ করে মহামতি ভীষ্ম তাঁকেই সিংহাসনে বসালেন। মহাভারতের কবি চিত্রাঙ্গদার স্বল্প-পরিসর জীবনের কথা জানিয়ে বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা মাত্রই মন্তব্য করলেন—বিচিত্রবীর্য ভীষ্মের কথা মেনে চলতেন—ভীষ্মস্য বচনে স্থিতঃ—এবং পৈতৃক রাজ্যও শাসন করতেন তাঁরই অনুশাসনে চলে।

কথাটা শুনলেই বিপ্রতীপভাবে মনে হয় শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্মের কথা শুনতেন না। একটু আগেই যে কবি বলেছিলেন—চিত্রাঙ্গদ কোনও মানুষকে তাঁর সমকক্ষ জ্ঞান করতেন

AMARBOI.COM

না—আমাদের ধারণায়—এই মানুষটি হলেন ভীষ্ম। ভীষ্মকে তিনি গণনার মধ্যে আনতেন না বলে ভীষ্মও তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন। মহাভারতে নয়টি মাত্র শ্লোকে চিত্রাঙ্গদের কাহিনী প্রাথমিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ভীষ্মর কথা একবারও আসেনি। কথা যা এসেছে, তা সবই চিত্রাঙ্গদের বেপরোয়া ভাব নিয়ে। অথচ শান্তনুর কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মের প্রসঙ্গ আরম্ভ প্রথম থেকে। তিনিই বিচিত্রবীর্যের অভিষেক সম্পন্ন করলেন, তাঁর মতেই বিচিত্রবীর্যের শাসন চলতে লাগল এবং সর্বোপরি মন্তব্য করা হল—বিচিত্রবীর্য ভীষ্মকে যথাবিহিত সম্মান করে চলতেন, যেহেতু ভীষ্ম ছিলেন 'ধর্মশাস্ত্রকুশল'—স ধর্মশাস্ত্রকুশলং ভীষ্মং শান্তনবং নৃপঃ।. পূজয়ামাস ধর্মেণ...।

'ধর্মশাস্ত্রকুশল'—এই একটি মাত্র বিশেষণ ভীষ্মের নামের সঙ্গে যোজিত হওয়ার বিশেষ অর্থ আছে। ধর্মশাস্ত্র বলতে সাধারণভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের বিধিনিষেধ বোঝালেও, আসলে ধর্মশাস্ত্র হল সেকালের আইনের বই। রাজারা কীভাবে রাজ্য শাসন করবেন, কীভাবে করগ্রহণ করবেন, কীভাবে দণ্ড দেবেন, কীভাবে, কোন অবস্থায় শত্রুরাজার সঙ্গে সন্ধি-বিগ্রহের শর্ত দেবেন—এইসব কিছুর আইনি দলিল হল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি। মহামতি ভীষ্মের সময়ে আইনি বিধিনিষেধের যে সমস্ত নীতি-নিয়ম চালু ছিল, তা প্রধানত বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যের শাস্ত্র-পরম্পরা। গঙ্গা যখন ভীষ্মকে শান্তনুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তখনই ভীষ্ম বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যের রাজনীতিশাস্ত্রে পারঙ্গম—উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ। পরবর্তীকালে মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে নারদের রাজনীতিশাস্ত্র সবই তিনি অধিগত করেছেন। এ সবের বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে মহাভারতের শান্তিপর্বে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যখন কিছুতেই রাজা হতে চাইছিলেন না এবং মহাভারতের কবি স্বয়ং যখন তাঁকে রাজা হবার জন্য বারবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, তখন সর্বদর্শী ব্যাসকে যুধিষ্ঠির উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করে বলেছিলেন—আমি যে রাজনীতি, রাজধর্মের কিছুই জানি না, রাজনৈতিক বিপন্নতা তৈরি হলে আমার কী কর্তব্য হবে, তাও তো আমার জানা নেই। আপনিই না হয় রাজধর্মের উপদেশ করুন—রাজধর্মান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ চাতুর্বর্ণ্যস্য চাখিলান্। ব্যাস হেসে বলেছিলেন—আমি নয়, দাদাভাই! রাজধর্ম কিংবা রাজনীতির কূট জানতে চাইলে, তোমাকে যেতে হবে মহামতি ভীষ্মের কাছে, এ ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি—প্রৈহি ভীষ্মং মহাবাহো বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্। আশ্চর্যের ব্যাপার হল—যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাজধর্মের কথা, রাজনীতির কূট; তার উত্তরে ব্যাস বললেন—ধর্মের বিষয়ে যত তোমার সংশয়, সন্দেহ আছে, সব তিনি দূর করে দেবেন—স তে ধর্মরহস্যেষু সংশয়ান্ মনসি স্থিতান্।

এই যে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ হল, এটা রাজার ধর্ম, রাজনীতির রহস্য। আমাদের মূল প্রসঙ্গে উপস্থিত হয়ে বলি—মহারাজ বিচিত্রবীর্য রাজনীতিকুশল (ধর্মার্থকুশল) ভীষ্মের সব কথা শুনতেন, যা হয়তো তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শোনেননি এবং না শুনে গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ কোনও পরিচিত ব্যক্তি নন। তিনি আকস্মিকভাবে এসে একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে (আমার নাম আর তোমার নাম এক হওয়া চলবে না) চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করেছেন, এবং তাঁকে আততায়ীর মতো খুন করে চলে গেছেন। কাউকে যিনি কেয়ার করতেন না, তার শত্রু অনেক। গন্ধর্বরাজকে আমরা এক আকস্মিক আততায়ী বলেই মনে করি। হয়তো সেই কারণেই তাঁর পরিচয়—তিনি গন্ধর্বরাজ এবং চিত্রাঙ্গদকে হত্যা করেই

তিনি চলে গেছেন স্বর্গে অর্থাৎ কোনও অজ্ঞাত জায়গায়—অন্তায় কৃত্বা গন্ধর্বো দিবমাচক্রমে ততঃ।

চিত্রাঙ্গদের রাজত্বকালে ভীষ্ম উদাসীন ছিলেন। পৈতৃক রাজ্য তিনি পাননি অথচ তাঁর পিতার অন্য পুত্র রাজ্যশাসন করছেন। তিনি যদি কোনও কথাই ভীষ্মকে না জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তিনিই বা আগ বাড়িয়ে উপদেশ দিতে যাবেন কেন? এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদের মরণান্তিক উদাহরণ দেখে তাঁর কনিষ্ঠ, বিচিত্রবীর্য, 'দেখে শিখেছেন'। অতএব তিনি রাজত্ব চালাতে লাগলেন 'ধর্মার্থকুশল' ভীষ্মের অভিভাবকতায় আস্থা রেখে। ভীষ্মও তাই কুমার বিচিত্রবীর্যকে যথোপযুক্ত রাজনৈতিক উপদেশ দিয়ে সর্বসময় তাঁকে রক্ষা করে চলতেন—স চৈনং প্রত্যপালয়ৎ।

বাস্তব ঘটনা যা দাঁড়াল, কুমার বিচিত্রবীর্য হস্তিনাপুরের সিংহাসন অলংকৃত করে রাখলেও এই কিশোর বালকটির সমস্ত দায়িত্বভার ভীষ্মের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন সত্যবতী। ফলত রাজ্যের শাসনও চালাতে হত স্বয়ং ভীষ্মকেই। যদিও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারেই ভীষ্ম আগে সত্যবতীর মত গ্রহণ করতেন—পালয়ামাস তদ্‌রাজ্যং সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ—এবং এটাই ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা। যিনি পিতার প্রণয়-সন্তুষ্টির জন্য নিজের সংসার-সুখ, বাৎসল্য-সুখ বলি দিলেন, সেই পিতার প্রথম পুত্র তাঁকে মানল না—এ দুঃখ তাঁর কাছে সইবার নয়। কাজেই বুদ্ধিশালিনী সত্যবতীর বুদ্ধিতে কুমার বিচিত্রবীর্যের ভার যখন ভীষ্মের ওপর এসে পড়ল, তখন যেন তিনি ধন্য হয়ে গেলেন। অসীম মমতায় তিনি এই বৈমাত্রেয় ভাইটির সমস্ত দায়িত্ব আত্মসাৎ করলেন যেন।

হস্তিনাপুরের রাজকুমার বিচিত্রবীর্য একটু বড় হতেই ভারি সুন্দর হয়ে উঠলেন। রাজকুমারের তারুণ্যের অভিসন্ধিতে ভীষ্মের নতুন দায়িত্ব এসে গেল। পিতৃকল্প সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রকল্প বিচিত্রবীর্যের যৌবনসন্ধিতে চিন্তান্বিত হলেন। তাঁর প্রথমে মনে হল—ভাইয়ের বিয়ে দিতে হবে—ভীষ্মো, বিচিত্রবীর্যস্য বিবাহায়াকরোন্মতিম্‌। নানা লোকের সঙ্গে নানা কথায় ভীষ্মের কানে এল—কাশীর রাজার তিনটি মেয়েই স্বয়ংবরা হবেন। ভীষ্ম জননী সত্যবতীর মতামত জানতে চাইলেন।

সেকালের দিনে কাশীর রাজার সম্মান ছিল যথেষ্ট। কাশীর উত্তরে হল কোশল, দক্ষিণে চেদি-করূষ, পূর্বে মগধ আর পশ্চিমে বৎসদেশ। বৌদ্ধগ্রন্থ গুত্তিলজাতকে কাশীনগরীকে সেকালের সমস্ত নগরীর শ্রেষ্ঠতমা বলে বলা হয়েছে। সম্ভব-জাতক আবার সেকালের মিথিলা আর যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের সঙ্গে কাশীর তুলনা দিয়ে বলেছে—কাশী নগরীর আয়তন হল বার যোজন, যেখানে মিথিলা অথবা 'ইন্দপত্ত'র আয়তন মাত্র সাত যোজন—দ্বাদশযোজনিকং সকল-বারাণসী-নগরম্‌।

পুরাণে-ইতিহাসে কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে একাধিকবার। এবং ব্রহ্মদত্তও একজন নন, অনেকজন। আর শুধু পুরাণ-ইতিহাসই বা বলি কেন বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবগ্গও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করে। মহাবগ্গের বর্ণনায়—ব্রহ্মদত্ত ছিলেন যেমন বলী, তেমনই ধনী। যেমন ভোগী, তেমনই পরাক্রমশালী—বারানস্যাং ব্রহ্মদত্তো নাম কাশীরাজা অহোসি অড্‌ঢো মহদ্ধনোমহাভোগো মহাবলো মহাবাহনো মহাবিজিতো পরিপুণ্ণ-কোষ-কোঠ্‌ঠাগারো। পুরাণে একাধিক বিখ্যাত ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়। কাশীর রাজাদের মধ্যে অলর্ক, প্রতর্দনের নামও ভারতজোড়া। বিম্বকসেন, উদকসেন কিংবা ভল্লাটের নামও মহৎকীর্তি কাশীরাজদের অন্যতম।

amarboi.com

বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যাবে কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তরা (পর পর ব্রহ্মদত্তের বংশধরেরা) কোশল রাজ্যটিও জয় করে নিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা, মহাভারতের ভীষ্ম যখন কাশীরাজের তিন কন্যার কথা শুনলেন, তখনও কোশল রাজ্যটি কাশীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ, এই তিন কন্যাকে কাশীরাজের মেয়ে ছাড়াও বারবার 'কৌশল্যা' বলে ডাকা হয়েছে। যাই হোক সত্যবতী কাশীরাজের সম্মান জানতেন। অতএব ভীষ্ম বলামাত্রই তিনি তাঁর তরুণ পুত্রের অভিভাবকের সমস্ত মন্ত্রণা মেনে নিলেন।

ভীষ্ম সঙ্গে কোনও সেনাবাহিনী নিলেন না। যাবার আগে তিনি শুধু জননী সত্যবতীর অনুমতি নিলেন, তারপর একটি সুসজ্জিত রথে করে একা রওনা হলেন কাশী। ভীষ্ম শুনেছেন—কাশীরাজের তিনটি মেয়েই বড় সুন্দরী—কন্যাস্তিস্রোঽপ্সরোপমাঃ—অতএব মনে মনে ঠিক করলেন—তিনটি মেয়েকেই তিনি বিয়ে দেবেন তরুণ বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। ভাইকে তিনি বড় স্নেহ করেন। ভীষ্ম কাশী পৌঁছলেন ঠিক স্বয়ংবরের দিন। দেখলেন—রাজারা সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজসভায়। বিচিত্র আসন মঞ্চে সমাসীন হয়ে তাঁরা কাশীরাজের তিন কন্যার অপেক্ষায় আছেন। ভীষ্মও কাশীর স্বয়ংবরসভায় একটি আসনে বসে গেলেন।

অপরূপ সাজে সেজে বিবাহের লজ্জাবস্ত্র মাথায় দিয়ে তিন কন্যা উপস্থিত হলেন রাজার সভায়। রাজারা নড়েচড়ে বসলেন। কেউ তাঁর কেশরাশি সুবিন্যস্ত করলেন, কেউ বা বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকারের বিন্যাস শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিলেন। প্রৌঢ় বৃদ্ধপ্রায় ভীষ্ম বসে রইলেন দৃঢ়ভাবে কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে।

সভায় উপস্থিত বিবাহেচ্ছু রাজাদের নাম এবং পরিচয় দেওয়া আরম্ভ হল। ইনি বৎসদেশের রাজা, উনি অবন্তীর, তিনি শ্রাবস্তীর—এই রকম রাজনাম উচ্চারণের সঙ্গে তিন কন্যা সেই সেই রাজাদের সামনে দাঁড়িয়ে খানিক নিরীক্ষণ করে অপছন্দের মুদ্রা দেখিয়ে চলে যেতে লাগলেন। বিবাহ-কৌতুকিনী তিন কন্যা এবারে মহামতি ভীষ্মের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ দেখে প্রায় ছুটেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। হয়তো তাঁরা ভাবলেন—স্বয়ংবর সভার মান বুঝি যথেষ্ট নেমে গেছে, নইলে প্রৌঢ়-বৃদ্ধরাও এসে ভিড় বাড়ান কী করে!

ভীষ্মের বৃদ্ধত্ব নিয়ে কাশীরাজের তিন কন্যা যে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছিলেন, তা তাদের ভাবভঙ্গি, এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থেকেই বোঝা গেল। অপাক্রামন্ত তাঃ সর্বা বৃদ্ধ ইত্যেব চিন্তয়া। সভায় সমাগত রাজবৃন্দের মধ্যে শোরগোল আরম্ভ হল। সভায় যাঁরা অল্পবুদ্ধি আর চটুল রাজা ছিলেন, তাঁরা অকথা-কুকথা বলতে আরম্ভ করলেন ভীষ্মের নামে। বলতে লাগলেন—ভীষ্ম লোকটাকে ধার্মিক বলে জানতাম। ব্যাটা বুড়ো ভাম, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে, মাথার চুল পুরো পাকা অথচ কেমন বেহায়া দেখুন, বিয়ে করার লোভে এখানে ঠিক এসে জুটেছে—বৃদ্ধঃ পরমধর্মাত্মা বলীপলিতধারণঃ। কিং কারণম্ ইহায়াতঃ...। অন্য এক তরুণ রাজা চিমটি কেটে বললেন—আরে মশাই! আমরা তো ছোটবেলা থেকে শুনেছি—উনি নাকি আবার বেম্মচারী। উনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—জীবনে আর বিয়ে করবেন না। তা এখন লোকে শুনলে কী বলবে? এত প্রতিজ্ঞা, এতসব ব্রহ্মচারীর ব্রত—তার কী গতি হল মশাই—ব্রহ্মচারীতি ভীষ্মো হি বৃথৈব প্রথিতো ভুবি।

রাজারা কথাও যেমন বলতে লাগলেন, হো হো করে হাসতেও লাগলেন সেই রকম। রাগে ঘৃণায় তাঁর শরীর জ্বলে উঠল। যিনি পরশুরামের অস্ত্রশিষ্য তাকে কিনা এই ধরনের অপমান! এক লহমার মধ্যে তিনি নেমে এলেন বরাসনের মঞ্চ থেকে। পলায়মান তিনটি সুন্দরী কন্যাকে

যাত্রাপথেই থামিয়ে দিয়ে টেনে তুললেন নিজের রথে—রথমারোপ্য তাঃ কন্যাঃ ভীষ্ম প্রহরতাং বরঃ।

আমাকে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেন—কী প্রয়োজন ছিল ভীষ্মের? কাশীরাজ্যে তাঁর নিজের যাবার কী প্রয়োজন ছিল? আর গেলেনই যখন, তখন গিয়ে কেন বললেন না—আমি নয়। আমি আমার বৈমাত্রেয় ভাই তরুণ বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজের মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যেতে এসেছি। না, ভীষ্ম এসব বলেননি, বলার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি জানেন—ক্ষত্রিয়রা নিজের জোরে কন্যা হরণ করে বিয়ে করে। দরকার হলে তিনিও তাই করবেন। অত কথার দরকার কী? তিনি তো ক্ষমতার বলে, সম্মানে কারও চেয়ে খাটো নন। এই অতুল ক্ষাত্রশক্তির প্রসঙ্গ তো আছেই, তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। তবে সে কারণ খুঁজতে গেলে মহামতি ভীষ্মের অবচেতন মনের মধ্যে ঢুকতে হবে এবং সেই অবচেতনার কথা মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে বলেননি।

একটা কথা ভাবুন—আমরা এমন মানুষ দেখেছি—পুরুষ অথবা স্ত্রী, যাঁরা এই জন্মে আর বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন না, তাঁদের বয়সের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই মনের পরিণতি ঘটে না। অন্তত বিবাহিত মানুষের যে পরিণতি ঘটে, সেই পরিণতি ঘটে না। সেই যৌবনকাল থেকে তাঁরা যে কৌমার্য বা কুমারীত্ব বহন করেন, বয়সকালেও সেই কৌমার্যের মনটুকু যায় না। ভীষ্মের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য তিনি মেয়ে আনতে গেছেন বটে কিন্তু স্বয়ংবর-সভার বরাসনে বসলে যে আমোদটুকু হয়, সেই আমোদমাত্রই তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। তাঁর অসীম শক্তি আছে, নিপুণ অস্ত্রকৌশল তাঁর অধিগত, অতএব তরুণ রাজাদের মধ্যে একই সঙ্গে সমাসনে বসলেই বা আমায় কে কী করতে পারে—এইরকম বেপরোয়া ভাব নিয়েই ভীষ্ম একটু আমোদ পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রখর বাস্তব সে আমোদ পেতে দিল কই? সুন্দরী তিন কন্যা 'বৃদ্ধ' বলে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলেন, তরুণ রাজারা বৃদ্ধের আমোদে দুয়ো দিলেন। ভীষ্মের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হল।

এমন কি তখনও তিনি একবারও ঘোষণা করে বললেন না—আমি নই, আমার ভাইয়ের জন্য আমি এই বিবাহ-সভায় এসেছি। বিশেষত তিন রমণীর তাচ্ছিল্য দেখে তাঁর এতই রাগ হল যে, তিনি আরও বেশি করে এমন ভাব করলেন যেন—বুড়ো তো বুড়ো, তোরা স্বয়ম্বরা হয়েছিস, আর আমিও ক্ষত্রিয় পুরুষ, জোর করে ধরে নিয়ে যাব। ভীষ্ম তিন সুন্দরীকে রথে তুললেন আর রাজাদের উদ্দেশ করে বললেন—এই যে মহাশয়রা! এতক্ষণ খুব বড় বড় কথা বলছিলেন। বিয়ে তো আর এক রকম নয়, অনেক রকম। কেউ মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে গুণবান পুরুষের হাতে তুলে দেয়, কেউ বা বরের কাছ থেকে পণ নিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেয়। কেউ ভালবেসে বিয়ে করে, আবার কেউ বা জোর করে ধর্ষণ করে, তারপর বিয়ে করে। যজ্ঞের মাধ্যমে কেউ বিয়ে করে আবার বাপ-মা খুশি হয়েও বিয়ে দেয়। বিয়ের এত সব উপায়, এত সব পথ। কিন্তু আমরা হলাম গিয়ে ক্ষত্রিয় পুরুষ। ক্ষত্রিয় পুরুষেরা স্বয়ম্বর ব্যাপারটাই বেশি পছন্দ করেন এবং তারা শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে জয় করেই কন্যা হরণ করে। এইরকম বিয়েই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত—প্রমথ্য হৃতামাহু-র্জ্যায়সীং ধর্মবাদিনঃ।

ভীষ্ম এবার সমবেত রাজাদের 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বললেন—এই আমি আপনাদের সামনে এই মেয়ে তিনটিকে রথে তুললাম বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য—জিহীর্ষামি বলাদ্ ইতঃ—আপনাদের ক্ষমতা থাকে তো আটকান। আমি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি—স্থিতো'হং

পৃথিবীপালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। কাশীরাজকে শুনিয়ে শুনিয়ে রাজাদের যুদ্ধাহ্বান জানালেন ভীষ্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুন্দরীকে রথে চড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন হস্তিনাপুরের উদ্দেশে।

ভীষ্মের কথা শুনে বিবাহেচ্ছু রাজাদের ক্রোধ চরম বিন্দুতে পৌঁছল। যে কন্যাগুলিকে তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যদ্‌ভোগ্যা ভেবে আনন্দ লাভ করছিলেন, তাদের তুলে নিয়ে গেল এক বুড়ো। রাজারা হাত কামড়ে, ঠোঁট কামড়ে শেষ পর্যন্ত বরের সাজ মণিমুক্তোর মালা গলা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যুদ্ধের জন্য পরিধান করলেন লোহার বর্ম। তারপর সবাই একযোগে হা-রে-রে-রে শব্দ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ক্রমবিলীয়মান ভীষ্মের ওপর। ভীষ্ম একা, রাজারা অনেকে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল—একস্য চ বহূনাঞ্চ তুমুলং লোমহর্ষণম্।

এঁরা দশ হাজার বাণ ছাড়ছেন, তো ভীষ্ম সেগুলো কেটে খান খান করে দিচ্ছেন। এঁরা এই তিন-তিনটে বাণ ছাড়েন, তো ভীষ্ম সেসব বাণ কেটে পাঁচ পাঁচটা বাণে তাদের বিদ্ধ করছেন—অস্ত্রচালনায় এমন ক্ষিপ্রতা দেখে শত্রু রাজারাও ভীষ্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—শত্রবো'পি অভ্যপূজয়ন্। সোজা কথায় বলা যায়, ভীষ্ম যুদ্ধ জিতলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে কল্পিত ভ্রাতৃবধূদের নিয়ে ফিরে চললেন হস্তিনাপুরের দিকে, যেখানে তাঁর নিজের লোকেরা আছেন—কন্যাভিঃ সহিতো প্রায়াদ্ ভারতো ভারতান্ প্রতি।

ভীষ্ম এখনও পর্যন্ত কন্যাদের বলেননি যে, তিনি তাঁদের পাণিপ্রার্থী নন। তিনি তাঁদের শুধু রথে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন মাত্র। যাঁরা এই মুহূর্তে ভীষ্মের এই মৌনতায় ক্ষুব্ধ হন, তাঁদের জানাই ভীষ্মকে আমরা চিরকাল এক বৃদ্ধ-পিতামহের বৃদ্ধ মানসিকতায় দেখেছি। কিন্তু গভীর অন্তরে তিনি যে এক ভীষণ রসিক মানুষ। যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় আত্মস্বার্থ বলি দেওয়ার মধ্যে তিনি যে সরসতা খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই সরসতাই তাঁকে এমন মধুর রসিক করে তুলেছে।

মনে রাখতে হবে—তিনি তাঁর পিতার জন্য নির্দিষ্ট আপন বিমাতাকেও নিজের রথে চড়িয়েই নিয়ে এসেছিলেন পিতার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য—রথমারোপ্য ভাবিনীম্। অতএব সেই পিতার বিবাহের দিন থেকেই তিনি যে কৌরব পরিবারের সর্বময় স্বাত্মপ্রযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই অভিভাবকত্বের জোরেই আজও তিনি ভ্রাতৃবধূদের রথে চড়িয়ে নিয়ে আসছেন। তাঁকে কারও কিছু বলবার নেই। পিতা শান্তনুও তাঁকে কিছু বলেননি, জননী সত্যবতীও তাঁকে কিছু বলেননি, ভাই বিচিত্রবীর্যও তাঁকে কিছু বলেননি। অতএব আমরাও কিছু বলব না। যিনি যৌবনের সমস্ত ভোগসুখ পরিহার করে সম্পূর্ণ পরিবারের জন্য আত্মবলি দেন, তাঁর দোষ ধরার মতো আহাম্মক আমরা অন্তত নই।

AMARBOI.COM

উনষাট

ভীষ্মের অসামান্য অস্ত্রনৈপুণ্যের জন্য মুগ্ধ হয়েই হোক, অথবা ভয়ের জন্যই হোক, অন্যান্য রাজারা আর যখন ভীষ্মের সঙ্গে লড়াই করতে চাইলেন না, তখনি সেই মহাবীর রাজপুরুষকে একাকী দেখা গেল ভীষ্মের পিছনে ধাবিত হতে। ইনি সৌভপতি শাল্ব। সৌভ জায়গাটা কোথায়—আগেই আমরা বলেছি। আরও একটু ভাল করে বলি—কারও ধারণা, সেটা আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিমে কোনও জায়গায়। কারও মতে শাল্বরা থাকতেন যমুনাতীরবর্তী কোনও অঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার গুজরাতের উত্তর-পূর্বে কোনও স্থানে তাঁদের রাজধানী ছিল। আমাদের আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার বাৎসরিক রিপোর্ট অনুযায়ী শাল্বপুর বলে বিখ্যাত যে নগরটি শাল্বদের প্রধান আবাস-ভূমি বলে চিহ্নিত ছিল, সেটার নাম লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে হয়েছিল 'শাল্ওয়ার'। তারপর সেটা থেকে 'হালওয়ার', (তালব্য 'শ' যে কেমন করে 'হ' হয়ে যায়, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'হালায় কয়')। আর 'হালওয়ার' থেকে এখনকার আলওয়ার।

আমরা এর আগে 'আলওয়ার' অঞ্চলটাকে প্রাচীন মৎস্যদেশের অন্তর্গত কোনও স্থান বলে উল্লেখ করেছি। বলেছি—তখনকার মৎস্যদেশ হল জয়পুর, ভরতপুর এবং আলোয়ার অঞ্চল। কিন্তু এই যে সময়ের কথা বলছি, তখনও মৎস্যদেশের সীমা সংকুচিত ছিল হয়তো। কারণ মৎস্যদেশ তখন সবে রূপ পরিগ্রহ করছে। মহাভারতের মধ্যে শাল্বরা অনেক সময়েই মৎস্যদেশীয়দের সঙ্গে যুগ্মভাবে উল্লিখিত হয়েছেন—শাল্বমৎস্যাস্তথা। এতে বোঝা যায় শাল্বদের রাজ্য মৎস্যদেশের অব্যবহিত পাশের রাজ্য। পানিনির সূত্র এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির প্রমাণে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, শাল্বরা সে যুগে যথেষ্ট পরিচিত জনজাতির অন্যতম ছিলেন। পরবর্তী সময়ে শাল্বরাজা মারা যাবার পর মৎস্যদেশের একক গুরুত্ব বেড়ে যাবার

পরপরই হয়তো শাল্বপুর বা আল্‌ওয়ার (আলোয়ার) অঞ্চল মৎস্যদেশের অন্তর্ভূত হয়।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে যে রাজাটিকে আমরা ভীষ্মের পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখলাম, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এক নৃপতি। দেশ বা জনজাতির প্রধান হিসেবে তাঁর নামও শাল্ব। ভীষ্ম যে তিনটি রমণীকে নিয়ে রথ চালিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা যিনি, তাঁর সঙ্গে শাল্বরাজার পূর্ব-প্রণয় ছিল। কাশীরাজের স্বয়ম্বর সভাটিকে শাল্বরাজ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বিবাহের সাধন হিসেবে। ঠিক ছিল—স্বয়ম্বরসভায় অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে শাল্বরাজাও বরাসনে বসে থাকবেন সাধারণ পাণিপ্রার্থী বিবাহেচ্ছু রাজাদের মতোই। কাশীরাজার কন্যারা সভায় আসবেন বরমাল্য হাতে করে এবং পূর্বপ্রণয়িনী রমণীটি ভাল মানুষের মতো শাল্বরাজার গলায় মালা দিয়ে পূর্বপ্রণয়ের সিদ্ধি ঘটাবেন বিবাহের রূপান্তরে। কিন্তু ভীষ্মের জন্য প্রণয়ীযুগলের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কোনও কিছু ঘটবার আগেই সমবেত রাজমণ্ডলীর সঙ্গে ভীষ্মের কথা-কাটাকাটি আরম্ভ হল এবং ভীষ্ম সদম্ভে তিন কন্যাকে রথে চড়িয়ে রথ চালিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরের দিকে।

রাজারা যখন ভীষ্মকে সমবেতভাবে আক্রমণ করলেন, তখন তাঁদের মধ্যে বিবাহভ্রষ্ট শাল্বরাজও ছিলেন। তিনিও একই সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজারা যখন রণে ভঙ্গ দিলেন, তখন শাল্বরাজ আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। একান্ত ব্যক্তিগত ক্রোধে উদ্দীপিত হয়ে শাল্বরাজ একা ধাওয়া করলেন ভীষ্মের পিছন পিছন। মহাভারতের কবি এক বন্য উপমা ব্যবহার করেছেন এই মুহূর্তে। বলেছেন—একটি সাধারণ হস্তী যখন হস্তিনীর পিছন পিছন যেতে থাকে, তখন কামোন্মত্ত হস্তী-যূথপতি যেমন হুড়মুড়িয়ে এসে পূর্বোক্ত হস্তীটির পিছনে দাঁত দিয়ে আঘাত করে তাকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেই হস্তিনীর অনুসরণ করে,—বারণং জঘনে ভিন্দন্ দন্ত্যাভ্যামপরো যথা—মহারাজ শাল্বও তেমনি এসে ভীষ্মের পিছনে আঘাত করে তাঁর অভীপ্সিতা রমণীর পশ্চাদ্‌গামী হতে চাইলেন।

শাল্বরাজ জানতেন না—ভীষ্ম যে রমণীদের রথে উঠিয়েছেন, তাঁদের তিনি কামনা করেন না। কিন্তু শুধুমাত্র ভীষ্মের সঙ্গে একরথস্থা হওয়ার কারণেই শাল্ব ভাবলেন—ভীষ্ম বুঝি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রণয়ী। কামনা প্রতিহত হওয়ার ফলেই শাল্বরাজের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ভীষ্মের কাছাকাছি পৌঁছেই তিনি হুহুংকারে চেঁচিয়ে উঠলেন—থাম্, ব্যাটা! থাম্। যাচ্ছিস কোথায়? শাল্বরাজের কথা শোনামাত্রই ভীষ্মের মনের ভিতর ক্ষত্রিয়ের আগুন জ্বলে উঠল—বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্। সারথিকে বললেন—রথ ঘুরিয়ে একেবারে শাল্বরাজের মুখোমুখি স্থাপন করো। সারথি রথ ঘোরালেন। এবার ভীষ্ম এবং শাল্বরাজ পরস্পরের সামনাসামনি দাঁড়ালেন। সমবেত রাজারা, যাঁরা এর আগে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন এই দুই মহাবীরের যুদ্ধকৌশল নিরীক্ষণ করার জন্য—প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত ভীষ্ম-শাল্বসমাগমে।

মহাভারতের কবি আবারও একটা বন্য উপমা দিলেন। বললেন—একটি গাভীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দুটি বলবান বৃষ যেমন গর্জন করতে করতে পরস্পরের অভিমুখীন হয়—তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে—তেমনি ভীষ্ম এবং শাল্বরাজ পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। আবারও বলি—রথস্থা রমণীর সঙ্গকামনার দৃষ্টিতে ভীষ্মকে বৃষ বলা যায় না, কিন্তু রমণীদের তিনি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, অতএব অন্য রাজাদের কাছে অথবা স্বয়ং শাল্বরাজের কাছে তিনি গাভীসঙ্গলোভী এক বৃষমাত্র। সেইজন্যই তিনি বন্য উপমা।

ভীষ্মের সঙ্গে শাল্বরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষ্ম প্রথমে তাঁকে অতটা আমল দেননি।

অতএব সেই সুযোগে ক্ষিপ্রহস্তে বেশ খানিকটা বাণবৃষ্টি করে ভীষ্মকে তিনি প্রাথমিকভাবে একটু বেকায়দায় ফেলে দিলেন। তাতেও ভীষ্ম খুব একটা ব্যাকুল হননি। কিন্তু দর্শক রাজারা যখন শাল্বরাজের নামে 'সাধু সাধু' রব তুললেন, তখন ভীষ্মও খানিকটা নড়েচড়ে দাঁড়ালেন। সারথিকে বললেন—যেখানে ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন শাল্বরাজ একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে রথটি রাখো তো দেখি। তারপর বাজপাখি যেমন ছোঁ মেরে সাপ ধরে আমিও তেমনি ধরব এই শাল্বরাজকে—ভুজঙ্গমিব পক্ষিরাট্।

সারথি ভীষ্মের কথামতো কাজ করল। তারপর ভীষ্ম প্রথমেই অস্ত্রাঘাতে কাবু করে ফেললেন শাল্বরাজের রথের ঘোড়াগুলোকে। মুহূর্তের মধ্যে শাল্বরাজের সারথি মারা পড়লেন। ভীষ্ম এবার শাল্বের ঘোড়াগুলিকে মেরে বাণে বাণে আকুল করে ফেললেন শাল্বরাজকে। শুধু প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রেখে শাল্বরাজকে ছেড়ে দিলেন ভীষ্ম। শাল্বরাজ কোনও রকমে জীবন নিয়ে ফিরলেন নিজের রাজধানী শাল্বপুরে। ভীষ্মও ফিরে চললেন হস্তিনাপুরে।

শাল্বের এই বিমর্দিত অবস্থা দেখে তিন কন্যার একজন অন্তত আকুল দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করেছিলেন কিনা ভীষ্ম তা খেয়াল করেননি। যুদ্ধে তিনি অক্ষত থাকলেন। সমস্ত শত্রু বিজয় করে হস্তিনাপুরের বিজয়-কেতন উড়িয়ে দিলেন আপন রথে। তারপর কত বন, কত নদী-পাহাড় পেরিয়ে ভীষ্ম তিন রমণীকে অপার স্নেহে নিয়ে এলেন নিজের রাজধানীতে। শাল্বের অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কবির উপমা বদলে গেল। বললেন—যে যত্নে এক পুত্রবধূকে রথে চড়িয়ে নিয়ে আসেন পিতা, যে যত্নে বাপের বাড়ি থেকে আপন ভগিনীকে নিয়ে আসেন ভাই, ঠিক সেইভাবেই মহামতি ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে নিয়ে এলেন কুরুদেশে—স্নুষা ইব স ধর্মাত্মা ভগিনীরিব চানুজাঃ। পিতা যেমন যত্ন করে পুত্রের বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজে আনেন, ভীষ্মও সেইরকম ভাই বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য তিনটি রমণীরত্ন সংগ্রহ করে আনলেন কাশীরাজ্য থেকে—আনিন্যে স মহাবাহুঃ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

কন্যা তিনটিকে নিয়ে ভীষ্ম প্রথমে উপস্থিত হলেন জননী সত্যবতীর কাছে। সত্যবতীর চরণ বন্দনা করে ভীষ্ম বললেন—তোমার ছেলের বিয়ের জন্য তিন-তিনটি মেয়ে নিয়ে এসেছি, মা! ওঁদের স্বয়ংবর হচ্ছিল; ফলে বীরত্ব দেখিয়ে অন্য রাজাদের পরাজিত করে ওঁদের রথে তুলে নিয়ে আসার মধ্যে কোনও দোষ ছিল না। আমি তাই করেছি—বিচিত্রবীর্যস্য কৃতে বীর্যশুল্কা হৃতা ইতি। সত্যবতী ভীষ্মের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে গেলেন। কোনওদিনই তিনি এই বয়স্ক পুত্রটিকে অবহেলা করেননি। আজ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের জন্য তাঁর ঔৎসুক্য দেখে তিনি অভিভূত হয়ে ভীষ্মের মস্তকাঘ্রাণ করে সার্থক জননীর মতোই বললেন—পুত্র! ভাগ্যিস তোমার কিছু হয়নি। এতগুলো রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতে এসেছ, ভাগ্যিস কিছু হয়নি তোমার—আহ সত্যবতী হৃষ্টা দিষ্ট্যা পুত্র জিতং ত্বয়া।

ভীষ্ম এবার বিমাতা সত্যবতীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মেয়ে তিনটিকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হল, কিন্তু এবার তো শাস্ত্রসম্মতভাবে ধুমধাম করে তাঁদের বিবাহ দিতে হবে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। মাতা সত্যবতী সমস্ত কিছুই ছেড়ে দিলেন ভীষ্মের ওপর। ভীষ্ম এবার ঋত্বিক্ এবং বৈতানিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বিবাহের দিন-ক্ষণ, মঙ্গল অনুষ্ঠান এবং আড়ম্বর—সব কিছু নিয়েই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা হবে।

ব্রাহ্মণরা সভায় বসে আছেন। ভীষ্মও বসে আছেন তাঁদের সঙ্গে। আলোচনাও চলছে নিয়মমতো। ঠিক এই সময়ে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সেই ব্রাহ্মণসভায় উপস্থিত হলেন।

তাঁর মনে কোনও ভয়-ডর ছিল না। অধরে ভুবন ভোলানো হাসি। ভীষ্মের কাছে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে—জ্যেষ্ঠা তাসাম্ ইদং বাক্যম্ অব্রবীদ্ হসতী তদা। কথা শোনার জন্য ভীষ্ম একটু উন্মুখ হতেই কাশীরাজকন্যা বললেন—ধর্মজ্ঞ! আমার সামান্য একটা অনুরোধ আছে।

সম্বোধনটা খেয়াল করবার মতো। ধর্মজ্ঞ, মানে যিনি ধর্ম জানেন। একটি সুন্দরী রমণী তাঁর মনের কথা বলছেন। এখানে রাজার ধর্ম অনুসারে চললেই হবে না। একটি রমণীর মনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারে ভীষ্মকে এবার ধর্মজ্ঞতার প্রমাণ দিতে হবে। রমণী হেসে বললেন—অনেক আগে, ওই স্বয়ম্বর সভার অনেক আগেই আমি মনে মনে সৌভপতি শাল্বরাজকে মন দিয়েছি—ময়া সৌভপতিঃ পূর্বং মনসাভিবৃতঃ পতিঃ। আর শাল্বরাজও আমার ইচ্ছেতে সাড়া দিয়ে আমাকেই পত্নী হিসেবে বরণ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। এমনকি আমার বাবাও চাইতেন—এই বিয়ে হোক—এষ কামশ্চ মে পিতুঃ।

কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম অম্বা। সামান্য তিনটি কথা বলে তিনি বোঝাতে চাইলেন—তাঁর ইচ্ছেটা একটা বিলাসমাত্র ছিল না। একটি পুরুষ এবং একটি মেয়েই শুধু নয়। সম্পূর্ণ দুটি পরিবার এই বিবাহের মন্ত্রণা করেছিলেন আগেই। অম্বা বললেন—স্বয়ম্বর যদি সম্পূর্ণ হত, তাহলে সেই স্বয়ম্বরে আমি সৌভপতি শাল্বকেই বরমাল্য দিতাম—ময়া বরয়িতব্যো'ভূচ্ছাল্ব-স্তস্মিন্ স্বয়ম্বরে। কিন্তু সে তো আর হয়নি। তার মধ্যে নানা অনর্থ ঘটে গেল। ভীষ্ম সকলকে হরণ করে নিয়ে এসেছেন হস্তিনাপুরের রাজধানীতে। শাল্বরাজ যুদ্ধেও প্রতিহত হয়েছেন। অম্বার তাই কোনও উপায় ছিল না রাজধানীর নির্জন কক্ষে বিরহের দিন কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া। কদিন সেইভাবেই গেছে। কিন্তু আজ যখন ভীষ্ম সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণদের ডেকে এনেছেন বিবাহ-উৎসবকে শাস্ত্রীয় রূপ দেওয়ার জন্য, তখন আর তিনি বিলম্ব করতে চাইলেন না।

AMARBOI.COM

অম্বার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক, ভীষ্মের শুভবুদ্ধির কাছে প্রার্থনা জানানো। দুই, যদি তিনি কোনওভাবে অস্বীকৃত হন, তাঁর কথা না শোনেন, ভীষ্মের শুভবুদ্ধি যদি কাজ না করে, তাহলে ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁর পূর্বপ্রণয় এবং বাগদানের সংকল্প শুনে অবশ্যই ভীষ্মকে সদুপদেশ দেবেন এবং ব্রাহ্মণ-সভায় ভীষ্মের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব অত প্রবলভাবে খাটবে না। অম্বা বললেন—আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে জানালাম, এখন আমার অবস্থা বুঝে যা ধর্ম বলে মনে হয়, তাই ব্যবস্থা করুন, কারণ এ বিষয়ে ধর্ম কী হওয়া উচিত, তাও আপনি জানেন—এতদ্ বিজ্ঞায় ধর্মজ্ঞ ধর্মতত্ত্বং সমাশ্রয়।

অম্বা ভীষ্মের বংশমর্যাদায় আঘাত দিয়ে আরও একটি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমি অন্য পুরুষকে ভালবেসেছি, ভীষ্ম। সেখানে আপনি রাজধর্ম অতিক্রম করে কী ভাবে আমাকে দিয়ে জোর করে আপনার ভাইকে ভালবাসাবেন? আপনি না কুরুবংশে জন্মেছেন, আপনি না কৌরব! এই কি তার পরিচয়—বাসয়েথা গৃহে ভীষ্ম কৌরবঃ সন্ বিশেষতঃ। অম্বা আরও বলেছিলেন—রাজধর্ম নয়, ভীষ্ম! রাজার অহংকারে আপনি আমাকে হরণ করে আনতে পেরেছেন মাত্র। কিন্তু আপনি আমার অবস্থা বিচার করুন আপনার বুদ্ধি দিয়ে, আপনার মন দিয়ে—এতদ্ বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য মনসা ভরতর্ষভ। অম্বা জানিয়ে দিলেন—শাল্বরাজা এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন নিশ্চয়—স মাং প্রতীক্ষতে ব্যক্তম্—অতএব আপনার ধর্মে যাকে সুবিচার বলে, সেই সুবিচার আমার ওপর করুন।

ব্রাহ্মণসভায় সমবেত ব্রাহ্মণদের সামনে অম্বার এই উক্তিতে যথেষ্ট বিব্রত হলেন ভীষ্ম। বুঝলেন—ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। যাঁরা বলেন—সেকালের ভারতবর্ষে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না,

তাঁরা পদে পদে মার খেতেন, তাঁদের কাছে আমরা অম্বার উদাহরণ দিয়ে থাকি। তিনি রাজধানীর অন্দরমহল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণদের আলোচনা-সভায় উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। নিজের বক্তব্যও পেশ করতে পেরেছিলেন সুশৃঙ্খলভাবে। তাঁকে মাঝপথে কেউ স্তব্ধ করে দেননি। সবচেয়ে বড় কথা—তাঁর কথা শুনে মহামতি ভীষ্ম তাঁর ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। সমবেত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে—বিনিশ্চিত্য স ধর্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈ র্বেদপারগৈঃ—ভীষ্ম অম্বাকে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছেমতো চলার অনুমতি দিলেন। পরিষ্কার ভাষায়—ভাই বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য মনোনীত কন্যাকে তিনি সমস্ত মানসিক বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন। অম্বা সানন্দে চললেন সৌভপতি শাল্বরাজের সঙ্গে দেখা করাব জন্য।

অম্বা হস্তিনাপুর ছেড়ে চলে যাবার জন্য মনস্থ করতেই ভীষ্ম সমস্ত ঘটনা জানিয়েছিলেন সত্যবতীকে। মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক সবার অনুমতি নিয়ে কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং একটি ধাত্রীকে তিনি অম্বার সঙ্গে দিলেন, যাতে হস্তিনাপুর থেকে শাল্বপুর যাবার পথে তাঁর সুরক্ষার কোনও অসুবিধে না ঘটে। অম্বা শাল্বপুর পৌঁছলেন, নির্বিঘ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। অন্যের দ্বারা হৃত হওয়া সত্ত্বেও অম্বা যে তাঁর অভীপ্সিত প্রিয়তমের কাছে ফিরে আসতে পেরেছেন, তার জন্য কতই না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শাল্বরাজ যে তাঁকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠেছিলেন, তা অবশ্য নয়। আর সেই জন্যই এক যুবতী যে কথা বলে না, সে কথাই তাঁকে বলতে হল শাল্বরাজের সামনে। অম্বা বললেন—বীর আমার! আমি ফিরে এসেছি তোমার কাছে—আগতাহং-মহাবাহো ত্বামুদ্দিশ্য মহামতে।

অম্বার সম্বোধনে 'মহাবাহু' এবং 'মহামতি', এই দুটি শব্দই বড় তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র কদিন আগে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি রথ, ঘোড়া, সারথি সব হারিয়ে কোনওমতে প্রাণ নিয়ে ফিরেছিলেন। সে কথা ভেবে শাল্বরাজ যদি কোনওভাবে অপ্রতিভ বোধ করেন। তাই অম্বা ভাব দেখাচ্ছেন—যুদ্ধে হারলেও তুমি সেই বীরপুরুষটিই আছ আমার কাছে অথবা সেই বুদ্ধিশালী নায়কটি—মহাবাহো...মহামতে। অম্বা বললেন—আমি তোমার জন্য ফিরে এসেছি, তুমি আমাকে আদর করবে না একটু, তুমি যা চাও, তোমার যাতে ভাল হয়, আমি তো তাই চাই, রাজা আমার! আমি শুধু তোমার আদরটুকু চাই—অভিনন্দস্ব মাং রাজন্ সদাপ্রিয়হিতে রতাম্।

অম্বার কথাগুলি শুধু সাময়িকতার আবেগতাড়না মাত্র নয়। সৌভদেশের রাজার ধর্মপত্নী হিসেবে বৃত হতে এসেছেন তিনি। অম্বা বললেন—রাজা আমার! তুমি আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ধর্ম পালন করো। আমি তো মনে মনে সুচিরকাল তোমার কথাই ভেবে এসেছি আর তুমিও তো আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবেই চেয়েছিলে—ত্বং হি মে মনসা ধ্যাতস্ত্বয়া চাপ্যুপমন্ত্রিতা।

শাল্ব একটু হাসলেন যেন—স্ময়ন্নিব। সে হাসির মধ্যে প্রেমিকের প্রাণ ছিল না অন্তত। ছিল না কোনও আবেগ, উচ্ছ্বাস। সে হাসির মধ্যে যা ছিল, তা অম্বার মতো প্রেমিকার কাছে বিড়ম্বনামাত্র। সেই অদ্ভুত হাসি হেসেই যেন শাল্ব বললেন—তুমি ভুলে যেও না—তোমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল একজন পুরুষ। সেই পুরুষের স্ত্রী হবার জন্যই যে রমণী চলে গিয়েছিল, তাকে আমি অন্তত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না—ত্বয়ান্যপূর্বয়া নাহং ভার্য্যার্থী বরবর্ণিনি। ঈর্ষান্বিত, অবিশ্বস্ত প্রেমিকের সমস্ত আঘাত হেনে শাল্ব বললেন—ভদ্রে! তুমি ভীষ্মের কাছেই যাও। সে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে তোমাকে জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তোমাকে স্পর্শও করেছিল—পরামৃশ্য মহাযুদ্ধে নির্জিত্য পৃথিবীপতীন্। শাল্ব এবার অম্বার হৃদয়ে আঘাত করে বললেন—আরও একটা কথা। ভীষ্ম যখন সমস্ত রাজাদের (শাল্ব নিজেকেও এই বহুবচনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন নিশ্চয়) যুদ্ধে পরাজিত করে তোমাকে নিয়ে

গেলেন, তখন তোমাকে বেশ খুশি-খুশিই তো লাগছিল—ত্বং হি ভীষ্মেণ নির্জিত্য নীতা প্রীতিমতী তদা।

আচ্ছা স্ত্রীলোকের মনের কথা কে বলবে? দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। যে মুহূর্তে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ভীষ্ম শাল্বরাজাকেও অনায়াসে যুদ্ধে প্রতিহত করে তাঁকে প্রাণদান করে ছেড়ে দিলেন, সেই মুহূর্তে এই যুবতীর অযান্ত্রিক মনের মধ্যে এক মুহূর্তের বিস্ময় অথবা বীরপূজার শ্রদ্ধানুরাগ কাজ করেনি তো? শাল্বকে তিনি মনে-প্রাণে ভালবাসেন সত্যি, তাই বলে শাল্ব-ভীষ্মের অস্ত্রযুদ্ধে ভীষ্মের অপূর্ব রণকৌশল দেখে কাশীরাজবালার হৃদয় এক মুহূর্তের জন্যও অন্তত আচ্ছন্ন হয়নি তো? যদি হয়ে থাকে, তবে সেই মুহূর্তটুকুও তো মিথ্যে নয়।

শাল্ব কি সেই মুহূর্তেই অম্বার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন? অম্বা কি তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে ভীষ্মকে দেখছিলেন। নইলে শাল্বকে তিনি অত ভালবাসেন—সে কথা রথের ওপর দাঁড়িয়েই ভীষ্মকে বললেন না কেন? যে লজ্জা ভেঙে তিনি ব্রাহ্মণদের সভায় এসে সোচ্চারে শাল্বের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, ভালবাসার সেই দৃঢ় উচ্চারণ হস্তিনাপুরের গমনপথেই শব্দিত হতে পারত এবং ভীষ্মের কাছেই হতে পারত। আমরা জানি ভীষ্ম বাধা দিতেন না। কিন্তু কী অদ্ভুত ঘটনা ঘটল—অম্বা তো একবারও ভীষ্মের সামনে শাল্বরাজের নামও উচ্চারণ করলেন না! না রথে উঠবার সময়, না রথে চড়ে যেতে যেতে, না তাঁর একান্ত প্রিয়তম শাল্বরাজ যুদ্ধে প্রতিহত হওয়ার সময়! কেন যে বললেন না? অন্তত সেই মুহূর্তে ভীষ্মের মুখের মধ্যে তিনি কী দেখেছিলেন? হয়তো সেই খণ্ড মুহূর্তের মধ্যে অম্বার মুখের দিকে তাকিয়ে শাল্বরাজের মনে হয়েছিল—অম্বা দুঃখিত নন অন্তত। হয়তো একথা ঠিক, হয়তো নয়।

অম্বা আর শাল্বরাজের উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনতে লাগে অনেকটা সেই ডেসডিমনা আর ওথেলোর শেষের সেদিনের মতোই। ওথেলো বলেছিলেন—that handkerchief which I so loved and gave thee / Thou gav'st to Cassio.

ডেসডিমনা প্রত্যুত্তর করেছিলেন—No, by my life and soul! Send for the man and ask him. I never did offend you in my life/ never lov'd Cassio...I never gave him token.

অম্বা বলেছিলেন—আমি চিরকাল তোমার প্রিয় কাজ করেছি, তোমারই ভাল চেয়েছি—সদা প্রিয়হিতে রতাম্ অর্থাৎ I never did offend you in my life. কিন্তু যে মুহূর্তে শাল্ব বললেন—ভীষ্মের সঙ্গে যাবার সময় তোমাকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল—নীতা প্রীতিমতী তদা—তখন ঠিক ডেসডিমনার 'never lov'd Cassio'র মতোই ভয়ঙ্কর নঞর্থক প্রতিবাদ করে উঠলেন অম্বা—এমন করে বোলো না, রাজা আমার—নৈবং বদ মহীপাল—একথা মোটেই ঠিক নয়। ভীষ্ম আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন, আর আমি খুশি হব? ভাবছ কী করে? আমি এতটুকু খুশি হইনি—নাস্মি প্রীতিমতী নীতা। আমি রীতিমতো কাঁদতে কাঁদতে ভীষ্মের রথে উঠেছিলাম আর তিনি যুদ্ধ জয় করে জোর করে আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন—বলান্নীতাস্মি রুদতী বিদ্রাব্য পৃথিবীপতীন্।

শাল্ব বলেছিলেন—যে রমণী একবার অন্য পুরুষের হস্তগত হয়েছিল, তাঁকে আমি অন্তত স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই না। শাস্ত্রবিধি আমার যতটুকু জানা আছে আর আমি যেহেতু রাজা হিসেবে অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে ধর্মের উপদেশ দিই, সেই উপদেশকারী রাজা সব জেনেশুনে এক পরপূর্বা রমণীকে ঘরে জায়গা দিতে পারে না—কথমস্মদ্‌বিধো রাজা পরপূর্বাং প্রবেশয়েৎ। তুমি তোমার যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পার, এখানে সময় নষ্ট করার কোনও দরকার নেই তোমার—মা ত্বং কালো ত্যগাদয়ম্।

AMARBOI.COM

অম্বা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁকে তিনি এত ভালবাসেন, যাঁর জন্য ঘর ছেড়ে, মর্যাদা ছেড়ে প্রিয়তমের সন্নিধানে পৌঁছেছেন, তাঁর মুখে এই কথা! ভাবলেন—শাল্বরাজার অভিমান হয়েছে, একটা অন্য পুরুষ হঠাৎ করে নিয়ে গেল, অভিমান তো হতেই পারে। তাই অম্বা একটু মিনতি করে বললেন—দেখো শাল্বরাজ! আমার বয়স বেশি নয়, আমি নিজে কোনও অপরাধও করিনি, আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতএব আমাকে স্বীকার করতেই হবে তোমায়—ভজস্ব মাং শাল্বপতে ভক্তাং বালামনাগসাম্।

অম্বা ভাবলেন—ভীষ্মের আসা থেকে আরম্ভ করে বিবাহের শেষ আলোচনার সব বৃত্তান্ত ঠিক ঠিক শাল্বরাজকে বুঝিয়ে বললে হয়তো তিনি বুঝবেন। এ ছাড়া আর উপায়ও তো নেই। অম্বা একটু বুঝিয়ে বললেন—যুদ্ধে হারবেন না বলে ভীষ্মের একটা গোঁ চেপে গিয়েছিল বলেই তোমাকে তিনি অমন করে হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার সমস্ত বৃত্তান্ত বিয়ের আগেই ভীষ্মকে সব জানিয়েছি। তাঁর অনুমতি নিয়েই আমি তোমার কাছে চলে এসেছি চির জীবনের মতো—অনুজ্ঞাতা চ তেনাস্মি তবৈব বশমাগতা। তাছাড়া আসল ঘটনাটা তো তুমি বুঝবে—ভীষ্ম মোটেই আমাকে চাইছেন না, তিনি নিজে কোনও বিয়েও করতে চান না—ন হি ভীষ্মো মহাবুদ্ধির্মামিচ্ছতি বিশাম্পতে। তিনি নাকি তাঁর ভাইয়ের বিয়ের জন্য কন্যা-হরণ করেছেন শুনলাম। আমার আর দুই বোন অম্বিকা এবং অম্বালিকার সঙ্গে তিনি তাঁর ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যের বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন।

অম্বা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়েও দেখলেন—শাল্বরাজের হৃদয়ে তাঁর জন্য কোনও দুর্বলতা তৈরি হয়নি। এই মুহূর্তে তাঁর মতো অসহায় রমণী আর কে আছে? কাজেই নিজের সমস্ত অসহায়তা প্রতিপাদন করেই তিনি এবার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে নিজেকে সপ্রমাণ করতে চাইলেন। অম্বা বললেন—আমি আমার মাথা ছুঁয়ে বলছি—তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও পুরুষের কথা আমি মনে-মনেও কখনও ভাবিনি—ত্বামৃতে পুরুষ ব্যাঘ্র তথা মূর্দ্ধানমালভে। অম্বা বললেন—আমি আমার হৃদয় স্পর্শ করে বলছি—আমি কারও হইনি। কারও সঙ্গে আমার পূর্ব-সম্বন্ধ হয়নি। আমি তোমার কাছে এসেছি কুমারীর সত্তায় তোমার প্রেম এবং অনুগ্রহের যাচনা নিয়ে। তুমি আমাকে বিবাহ করো।

অম্বা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। মস্তক-স্পর্শ, হৃদয়-স্পর্শের মতো সর্বাঙ্গীন প্রতিজ্ঞা এবং বিশ্বাস বিপর্যস্ত হয়ে গেল শাল্বরাজের রুক্ষতার সামনে। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—সাপ যেমন পুরনো খোলস ছেড়ে দেয়,—জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ—ঠিক সেইভাবে অম্বাকে ত্যাগ করলেন শাল্বরাজ। অম্বার এত প্রণয়-বচন, এত কাতরোক্তি—সব যে এক নিমেষে ব্যর্থ হয়ে গেল, তার পিছনে শাল্বরাজের আপন মর্মে ব্যাঘাত অজুহাত যাই থাক না কেন, একেবারে শেষে তিনি সত্যি কথাটি বলেছেন।

অম্বা বলেছিলেন—তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ বলে আমি যে খুব অস্থানে পতিত হব, তা তুমি ভেব না। ভদ্রলোকেরা নিশ্চয়ই আমাকে আশ্রয় দেবেন। শাল্ব বলেছিলেন—তুমি এখান থেকে যাও! আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি ফিরে যাও। যেহেতু ভীষ্ম তোমাকে একবার গ্রহণ করেছেন, অতএব আর আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারি না, কারণ আমি ভীষ্মকে ভয় করি—বিভেমি ভীষ্মাৎ সুশ্রোণি ত্বঞ্চ ভীষ্মপরিগ্রহঃ। হয়তো শাল্বরাজের মুখে অতি সত্যকথনের কারণেই অম্বার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ভীষ্মের ওপর।

AMARBOI.COM

ষাট

সৌভপতি শাল্ব অম্বাকে ত্যাগ করলে অম্বা খুব কাঁদলেন। শাল্বপুর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বারবার নিজেকে বড় অসহায় মনে হল তাঁর। এক উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীর পক্ষে এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা তাঁর যৌবনেরই অপমান বলে মনে হল যেন। তাঁর মনে হল—দ্বিতীয়া কোনও যুবতী নেই এই পৃথিবীতে যে নাকি এমন দুরবস্থায় পড়েছে—পৃথিব্যাং নাস্তি যুবতি-র্বিষমস্থতরা ময়া। ভীষ্ম তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেছেন অনেক আগেই। শাল্বরাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অতি নির্মমভাবে। অন্যদিকে হস্তিনাপুরে ভীষ্মের কাছে শাল্বের প্রতি নিজের ভালবাসার কথা এমন সরবে সোচ্চার বলে এসেছেন অম্বা যে, সেখানে আর তাঁর ফিরে যাবার উপায় নেই—ন চ শক্যং ময়া গন্তুং ময়া বারণসাহ্বয়ম্।

শুধু কোথাও গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা নয়, অম্বার মন এখন দীর্ণ হয়ে উঠল নানা অকারণ স্বগ্রথিত ভাবনার শৃঙ্খলে। যদি এটা না হত, তবে ওই ঘটনাটা ঘটত না, যদি এটা না করে ওটা করতাম, তবে এটা ঘটত না—এইরকম স্বকল্পিত গ্রন্থনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে অম্বা মনে মনে ভাবলেন—মুখ ফুটে শাল্বরাজার প্রতি আমার প্রেমের কথা জানিয়েছিলাম বলেই তো ভীষ্ম আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিলেন; এখন আমি কাকে দোষ দেব? নিজেকে? না ওই ভীষ্মকে?—কিন্নু গর্হাম্যথাত্মানম্ অথ ভীষ্মং দুরাসদম্?

নিজের পিতার ওপরেও অম্বার রাগ হল। ভাবলেন—আমার পিতা-ঠাকুরটিই একটি মস্ত বোকা লোক। তিনিই তো স্বয়ম্বরের আয়োজন করে আমাকে সকলের চক্ষুর সামনে ঠেলে দিলেন—অথবা পিতরং মূঢ়ং যো মে'কার্ষীৎ স্বয়ম্বরম্। স্বয়ম্বরের আয়োজনই যদি না হত, তাহলে গোপনে গোপনে শাল্বরাজার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতে পারত আমার। কিন্তু ওই বোকা

বদমাশ বাবাটি আমার! স্বার্থপরের মতো তিনি নিজে রাজকীর্তি লোকের সামনে তুলে ধরার জন্য আমাকে বেশ্যার মতো সব রাজার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাজাদের সুবিধে হল—যাঁর গায়ের জোর আছে, তিনিই জিতে নিতে পারেন আমাকে, স্বয়ম্বরের নিয়মমতো—যেনাহং বীর্যশুল্কেন পণ্যস্ত্রীব প্রচোদিতা! ভীষ্মও তাই করেছেন।

পিতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের দোষও স্বীকার করে নিলেন অম্বা। আমরা আগে বলেছি—অম্বা একবারও ভীষ্মের কাছে নিজের অনুরাগের প্রসঙ্গ তোলেননি। না স্বয়ম্বরসভায়, না রথে উঠবার সময়, না রথে যেতে যেতে। এখন তাঁর মনে হচ্ছে—ইস্। আমি নিজে কী বোকামিই না করেছি? যখন ভীষ্মের সঙ্গে শাল্বের যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন যদি আমি ভীষ্মের রথ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুট্টে শাল্বরাজের কাছে চলে যেতাম! কিন্তু তা তো আমি করিনি এবং এখন তার ফল পাচ্ছি। এখন কারও কাছেই আমার ঠাঁই নেই—তস্যেয়ং ফলনিবৃত্তি-র্যদাপন্নাস্মি মূঢ়বৎ।

নিজের দোষ, পিতার দোষ, এবং সমস্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতির দোষ—যত দোষই দিন অম্বা, কিন্তু একবারের তরেও তিনি উচ্চারণ করলেন না—মনের গভীরে আকস্মিকভাবে উদগত সেই বুদ্বুদোপম সুখের কথা। ভীষ্মের যুদ্ধকৌশলে, বীরত্বে, ব্যক্তিত্বে তাঁর যে মোহ তৈরি হয়েছিল অবচেতনায়—যা দূর থেকে শাল্ব পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন, সেই সামান্য মোহটুকুর জন্যই যে এই সর্বব্যাপ্ত ক্ষতি হয়ে গেল, সে কথা তিনি একবারও স্বগতভাবে বললেন না। কিন্তু মুখে না বললেও মহাভারতের কবি সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিকের মন্ত্রণা মিশিয়ে।

অম্বা পিতার ওপর রাগ করলেন, নিজের ওপর রাগ করলেন, বিধাতাকেও ধিক্কার দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের দোষ দিয়ে সবার শেষে যেখানে এসে তাঁর সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হল, তিনি মহামতি ভীষ্ম। ভীষ্ম তাঁর কোনও ক্ষতি করেননি, যখনই শাল্বরাজার কথা তিনি উচ্চারণ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ধাই-বামুন সঙ্গে দিয়ে তাঁকে শাল্বরাজার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এসব মহানুভবতা অম্বাও অস্বীকার করেন না। কিন্তু এখন শাল্ব, পিতা, বিধাতা সবাইকে রেহাই দিয়ে তিনি ধরলেন ভীষ্মকে। বললেন—কপালের লিখন যার যেমন থাকে, তা তো হবেই, কিন্তু আমার এই দুরবস্থার জন্য আসল দায়ী হলেন ভীষ্ম—অনয়সাস্য তু মুখং ভীষ্মঃ শান্তনবো মম। যদি কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে হয়—সে তপস্যা করে নিজের শক্তিবর্ধন করেই হোক, অথবা যুদ্ধ করেই হোক—যদি কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে হয় তবে ভীষ্মের ওপরেই তা নেব; সেই আমার সমস্ত দুঃখের মূল—সা ভীষ্মে প্রতি কর্তব্যং...দুঃখহেতুঃ স মে মতঃ।

এই যে প্রতিক্রিয়া, এক নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি এক সুন্দরী রমণীর এই যে প্রতিশোধস্পৃহা—এই প্রতিক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিকের নীতিতে বড় সাধারণ নয়। মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকের কথা যদি ধরেন, তাহলে তাঁরা বলবেন—মানুষের কামনা যেখানে প্রতিহত হয়, সেখানেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এখানে ভীষ্মের প্রতি অম্বার ক্রোধ থেকেই তাঁর প্রতি অম্বার অবচেতন কামনার অনুমান করা যেতে পারে। অথবা এই যে সব ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে অম্বার সমস্ত ক্রোধ ভীষ্মের প্রতি কেন্দ্রীভূত হল, তার পিছনে আছে এক ধরনের বিকার, যে বিকার উদাসীনতা থেকে কখনই জন্মায় না। একটা লোককে খারাপ লাগা বা ভাল লাগা থেকেই এই বিকারের উৎপত্তি হয়। ভীষ্ম অম্বাদের তিন বোনকে কাশীরাজের রাজসভা থেকে তুলে এনেছিলেন। তাতে তাঁদের রাগও হতে পারে, আনন্দও হতে পারে। কিন্তু রাগ বা আনন্দ কোনওটারই প্রকাশ হয়নি তখন। কারণ তাঁদের নিয়ে কী করা হবে, কার সঙ্গে তাঁদের বিয়ে হবে—সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না।

AMARBOI.COM

প্রকৃত বিবাহ উৎসবের আয়োজন শুরু হতেই অম্বা শাল্বের প্রতি তাঁর অনুরক্তির কথা প্রকাশ করলেন, তাতেও তাঁর কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু শাল্বরাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার পর তাঁর সমস্ত রাগ যে ভীষ্মের ওপর গিয়ে পড়ল, এইখানেই হৃদয়-বিকারের লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। মহাভারতের শব্দমাত্র আভিধানিকভাবে বিচার করলে এই বিকারের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—আমার সমস্ত কষ্টের মূল কারণ হলেন ওই ভীষ্ম—দুঃখহেতুঃ স মে মতঃ—সেই মুহূর্তেই ভীষ্মের প্রতি এই ক্রুদ্ধা রমণীর অবচেতন দুর্বলতা প্রমাণ হয়ে যায়।

অম্বা মনে মনে ঠিক করলেন—ভীষ্মকে শাস্তি দিতে হবে। হয় ভীষ্মের থেকে অধিক কৌশলশালী কোনও অস্ত্রবিদের দ্বারা ভীষ্মকে মার খাওয়াতে হবে। নয়ত তপস্যার মাধ্যমে কোনও দেবতাকে তুষ্ট করে অম্বা নিজেই ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ নেবেন। কাউকে দিয়ে ভীষ্মকে মার খাওয়াতে গেলে কাকে ধরতে হবে—এসব অবশ্য তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, একজনকে তিনি খুঁজে বার করবেনই যিনি যুদ্ধে ভীষ্মের অসমোর্ধ্ব প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন। এই সব নানা চিন্তা এবং প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি শাল্বপুরের নগরসীমা অতিক্রম করলেন। সমস্ত লোকালয় পেরিয়ে আসতে আসতেই অরণ্য ঘন ঘনতর হতে লাগল। সুদূর বনের উপান্তে এক আরণ্যক ঋষির আশ্রম চোখে পড়ল অম্বার।

সেদিন আর বেশি কথা হল না। তপস্যা, যজ্ঞ, হোম আর আরণ্যক ঋষি-মুনির উদাসীন শুষ্ক-রুক্ষ মন—সেখানে এক রমণী এসে প্রথমেই সব কিছু প্রকট করে দিতে পারে না। প্রথমে যা হয়, সেই রকম প্রণাম, কুশল-প্রশ্ন আর সদাচার-সংকারেই রাত নেমে এল আশ্রমের অরণ্য-আবাসে। অম্বা আশ্রয় পেলেন, ঋষি-মুনিরা তাঁকে সমস্ত সুরক্ষা দিয়ে রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন—ততস্তাম্ অবসদ্ রাত্রিং তাপসৈঃ পারিবারিতা। পরের দিন অম্বাকে নিয়ে মুনি-ঋষিদের আসর বসল। অম্বা আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা মুনি-ঋষিদের জানালেন। ভীষ্ম তাঁকে কীভাবে হরণ করেছেন, কীভাবে অম্বার কথা শুনে ভীষ্ম তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শাল্বের কাছে এবং অবশেষে কীভাবে শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সব বললেন অম্বা। বলতে বলতে অম্বার চোখ জুড়ে কান্না এল, নিঃশ্বাস উষ্ণ এবং বাষ্পায়িত হল—নিঃশ্বসন্তীং সতীং বালাং দুঃখশোকপরায়ণাম্।

মুনি-ঋষিদের মধ্যে তপোবৃদ্ধ যিনি ছিলেন, তাঁর নাম শৈখাবত্য। আরণ্যক শাস্ত্র-উপনিষদের অধ্যাপক তিনি। তিনি একটু উদাসীন সুরেই বললেন—আমরা তো আশ্রমে থাকি, মা। ধ্যান আর তপস্যা নিয়েই আমাদের দিন কাটে। তোমার এই সমস্যায় এই সব তপস্বীরা কীই বা করতে পারেন—এবং গতে তু কিং ভদ্রে শক্যং কর্তুং তপস্বিভিঃ।

অম্বা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। একটু চতুরাও বটে। তিনি একবারও বললেন না যে, ভীষ্মের ওপর তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। খুব ভালমানুষের মেয়ের মতো তিনি শাল্বরাজের ওপরেই আপাতত সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন—দেখুন, শাল্বরাজ আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার মনে আনন্দ বলে আর কিছু নেই—প্রত্যাখ্যাতা নিরানন্দা শাল্বেন চ নিরাকৃতাঃ।

সংস্কৃত ভাষায় কথাটা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। ভীষ্মের নাম না করেও এই শ্লোকের অর্থ এইরকম হতে পারে—ভীষ্ম আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আর শাল্ব আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থায় আর আমার বাড়িতে নিজের জনের কাছেও ফিরে যাবার উপায় নেই—নোৎসহে চ পুনর্গন্তুং স্বজনং প্রতি তাপসাঃ। তাই ভাবছিলাম—যা হবার তা তো হয়েই গেছে। পূর্বজন্মে অনেক পাপ

করেছি তার ফলও পাচ্ছি। এখন এই অবস্থায় আপনারা আমায় একটু অনুগ্রহ করুন। আমিও সন্ন্যাসিনী হয়ে জীবন কাটিয়ে দেব। যেমন তপস্যা করা যায় না, সেই দুশ্চর তপস্যায় মন দেব আমি—প্রাব্রাজ্যমহমিচ্ছামি তপস্তপ্স্যামি দুশ্চরম্।

অম্বার কথা শুনে শৈখাবত্য মুনি নানান শাস্ত্র-যুক্তি দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে। তবে এক যুবতী মেয়ের মুখে যোগিনী হবার কথা শুনে সমস্ত মুনি-ঋষিদের মনই একটু করুণা-সিক্ত হয়ে রইল। সত্যিই অম্বার জন্য কিছু করা যায় কি না, তার জন্য তাঁদের মনও খানিকটা প্রস্তুত হল। তপস্বীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে ঘরে ফিরে যেতেও বললেন। কেউ ভীষ্মকে গালাগালি দিলেন, কেউ বা শাল্বকেও। কিন্তু নানা আলোচনা করে, সবার দোষ-গুণ বিচার করে, আশ্রয়স্থল হিসেবে কোন জায়গাটা সবচেয়ে যোগ্য হবে, তার বিধান দিলেন মুনিরা। বললেন—মা! এই বয়সে তোমার ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হওয়া সাজে না। আমাদের কথা শোন—অলং প্রব্রজিতেনেহ ভদ্রে শৃণু হিতং বচঃ।

ঋষিরা বললেন—তুমি তোমার বাপের বাড়িতেই ফিরে যাও, মা! তিনি তোমার জন্য সব থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। স্বামী সুস্থ থাকলে, ভাল থাকলে তাঁর বাড়িটাই মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল বটে; কিন্তু স্বামীর বিপদ ঘটলে, মারা গেলে অথবা যা হোক স্বামীর বাড়িতে কোনও ঝামেলা হলে, বাপের বাড়িটাই মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। গতিঃ পতিঃ সমস্থায়া বিষমে চ পিতা গতিঃ। তার ওপরে দেখো, তোমার এই কাঁচা বয়স। তুমি রাজার মেয়ে বলে কথা, তোমার স্বভাবও নরম, শরীরটাও নরম, এই বয়সে তোমার কি যোগিনী হওয়া সাজে—প্রব্রজ্যা হি সুদুঃখেয়ং সুকুমার্য্যা বিশেষতঃ।

মুনিরা এবার আশ্রমে থাকার অসুবিধেগুলোও বললেন। বললেন—তুমি ভাবছ মা! আশ্রমে সন্ন্যাসিনী হয়ে রইলাম, আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল? তপস্যার মধ্যেও অনেক সমস্যা আছে, মা! তোমার মতো সুন্দরীদের তপস্যার ভূমিতেও শান্তি নেই। রাজা-রাজড়ারা অনেক সময়েই আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আশ্রমে আসেন। তাঁরা তোমাকে দেখলেই তোমার সঙ্গ কামনা করবেন, তোমাকে স্ত্রী হিসেবেও পেতে চাইবেন অনেকে। সেও কি কম সমস্যা? তাই বলছিলাম, এই বয়সে তপস্বিনী হওয়ার মন কোরো না অন্তত—প্রার্থয়িষ্যন্তি রাজানঃ তস্মান্মৈবং মনঃ কৃথাঃ।

মুনি-ঋষিদের সব কথা শুনেও অম্বা কিন্তু খুব বিচলিত হলেন না। কারণ তাঁরও বাস্তববুদ্ধি, সামাজিক বোধ কিছু কম নয়। তিনি বললেন—কাশীনগরীতে পিতার ঘরে আর আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, বাবা! আমার আত্মীয়স্বজন, নিজের লোকেরা কেউই আমার অবস্থা ভাল করে বুঝবেন না, ফলে তাঁদের অবজ্ঞার পাত্র হব আমি। ছোটবেলা থেকে বাপের বাড়িতে যে আদর আর মর্যাদা নিয়ে আমি বড় হয়েছি—উষিতাস্মি যথা বাল্যে পিতুর্বেশ্মনি তাপসাঃ—সেই আদর আর আমি পাব না। কারণ এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। কাজেই আপনারা আমাকে যে সুপরামর্শ দিয়েছেন, তার জন্য বড় জোর আমি সাধুবাদ জানাতে পারি, কিন্তু আমার পক্ষে বাপের বাড়ি ফেরা আর সম্ভব নয়—নাহং গমিষ্যে ভদ্রং বস্তত্র যত্র পিতা মম। আমি তপস্যাই করব এবং আমার সুরক্ষার ভার আপনাদের।

ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিরা অম্বার দৃঢ়তায় একটু বিচলিতই বোধ করতে লাগলেন যেন। কী করা যায় এই সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে—এই চিন্তায় যখন তাঁদের মনোজগতে ঝড় চলছে, ঠিক সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন রাজর্ষি হোত্রবাহন। হোত্রবাহন রাজকর্ম করেন বটে, কিন্তু তিনিও মুনি-ঋষিদের মতোই তপঃসিদ্ধ, যাঁর জন্য তাঁকে রাজর্ষি বলা হয়। মুনি-ঋষিরাও তাঁকে

AMARBOI.COM

খুব সম্মান করেন। লক্ষণীয় বিষয় হল—রাজর্ষি হোত্রবাহনের সঙ্গে অম্বার একটা আত্মীয়-সম্বন্ধও আছে। হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ অর্থাৎ মায়ের বাবা, দাদু। স্বাভাবিক কারণেই অম্বার দুরবস্থার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হলেন।

রাজর্ষি হোত্রবাহনের আরও বড় পরিচয় আমরা পরে পাব এবং সেটা অন্য কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণও বটে। কিন্তু পরের কথা পরেই হবে। আপাতত অম্বার ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপটুকুই বিচার্য বিষয়। অম্বার দাদু বলে কথা। হোত্রবাহন তাঁর দুঃখের কথা শোনামাত্রই পরম স্নেহে আদরের নাতনিকে কোলে তুলে নিলেন—তাং কন্যাম্ অঙ্কমারোপ্য পর্য্যশ্বাসয়ত প্রভো—সান্ত্বনা দিলেন নানান মতে। অম্বাও ভীষ্ম, শাল্ব, তাঁদের অঙ্গীকার, প্রত্যাখ্যান—সব সবিস্তারে জানালেন দাদু হোত্রবাহনকে। সব শুনে হোত্রবাহন বললেন—বাপের বাড়ি ফিরে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই তোমার। আমি তোমার দাদু, তোমার দুঃখ দূর করার ভার আমার—দুঃখং ছিন্দাম্যহং তে বৈ...মাতুস্তে জনকো হ্যহম্।

রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হলেন। অম্বার ক্লিষ্ট শীর্ণ শরীর আর মানসিক কষ্ট দেখে তিনি তাঁকে আত্মীয়তার আশ্রয় দিয়ে বললেন—তুমি আমার কাছেই থাকবে—এ তো সাধারণ কথা। সঙ্গে সঙ্গে এও জানাই—তুমি যা চাইছ, তারও উপায় আছে। বলি শোনো—তুমি একবার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরামের কাছে যাও। মহাকালের আগুনের মতো তাঁর তেজ। ভীষ্ম যদি তাঁর কথা না শোনেন, তবে তিনিই একমাত্র পারেন ভীষ্মকে যুদ্ধে হারাতে, এমনকি মেরেও ফেলতে—হনিষ্যতি রণে ভীষ্মং ন করিষ্যতি চেদ্বচঃ। সাধারণ মেয়েরা সংসারে স্বামী-পুত্তুর নিয়ে যে অবস্থায় থাকে, তোমাকে সেই অবস্থা ফিরিয়ে দিতে পারেন একমাত্র পরশুরাম।

কথাটা শুনে অম্বার কান্না পেয়ে গেল। কীভাবে, কোথায় পরশুরামের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, তখন-তখনই তাঁর যাওয়া উচিত কি না—এসব প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা চলল মাতামহ হোত্রবাহনের সঙ্গে। হোত্রবাহন বললেন—পরশুরাম থাকেন মহেন্দ্র পর্বতে। দেখবে এক মহাবনের মধ্যে তিনি তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। আমার নাম করে, আমার পরিচয় দিয়ে তুমি যা চাইছ, সে সব কথা তুমি তাঁকে বলো। দেখবে, তোমার কথা তিনি শুনবেন, কারণ পরশুরাম আমার বন্ধু মানুষ—মম রামঃ সখা বৎসে প্রীতিযুক্তঃ সুহৃচ্চ মে।

হোত্রবাহনের সমস্ত নির্দেশ শুনে অম্বা মহেন্দ্র পর্বতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ ওই আশ্রমেই এসে উপস্থিত হলেন। আশ্রমে উপস্থিত রাজর্ষি হোত্রবাহনকে দেখে অকৃতব্রণ খুবই খুশি হলেন এবং সানন্দে বললেন— মহাত্মা পরশুরাম সবসময় আপনার গল্প করেন। বারবার আমাদের বলেন—সৃঞ্জয়বংশীয় হোত্রবাহন আমার পরম প্রিয় সখা—সৃঞ্জয়ো মে প্রিয়সখো রাজর্ষিরিতি পার্থিব।

রাজর্ষি হোত্রবাহনের আরও একটা পরিচয় বেরল। তিনি সৃঞ্জয়বংশীয়—স চ রাজা বয়োবৃদ্ধঃ সৃঞ্জয়ো হোত্রবাহনঃ। এই পরিচয়টা আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরী। সৃঞ্জয়বংশীয়দের কথা আমরা আগে বলেছি। সৃঞ্জয় পাঞ্চালদেশের রাজা ছিলেন এবং দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডীর পিতা বলে পরিচিত দ্রুপদের পূর্বপুরুষ সৃঞ্জয়। বস্তুত পাঞ্চালদেশের রাজারা সকলেই সৃঞ্জয়ের নামেই বিখ্যাত। পরবর্তী কালে শিখণ্ডীর মধ্যে অম্বার রূপান্তর এবং এখন সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের ভীষ্মবধের পরিকল্পনার মধ্যে বহু পরবর্তী কালের রাজনৈতিক স্থিতিগুলি অনেকটাই সুপ্ত ছিল বলে আমরা মনে করি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম পাণ্ডবদের পক্ষে না এসে কৌরবদের পক্ষেই কেন থেকে গেলেন—এই রাজনৈতিক কূটের সমাধান করার জন্য যাঁরা

শুধু ভীষ্মের মৌখিক কথাটুকু বিশ্বাস করেন, তাঁরা আর যাই বুঝুন মহাভারতের রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝেন না। ভীষ্ম নাকি বলেছিলেন—মানুষ অর্থ এবং অন্নের দাস। আমি কুরুবাড়ির অন্ন খেয়েছি, অতএব সেই ঋণশোধের জন্যই আমাকে কৌরবপক্ষে থাকতে হবে।

ভীষ্মের এই কথাটা বোকা-বোঝানোর মৌখিকতা মাত্র। ভারতযুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাশীর রাজা পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়রাও যোগ দিয়েছিলেন পাণ্ডবপক্ষে। কাশীর রাজার মেয়েদের হরণ করে আনতে গিয়ে সেই স্বয়ম্বরসভায় ভীষ্ম যেভাবে অপমানিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী কালে পাঞ্চাল দেশের রাজা সৃঞ্জয় হোত্রবাহন পরশুরামকে দিয়ে যেভাবে ভীষ্মকে মার খাওয়ানোর পরিকল্পনা করছেন, তাতে ভীষ্মের পক্ষে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করার রাজনৈতিক সমস্যা ছিল। রাজর্ষি হোত্রবাহন যেভাবে অম্বার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং সেকালের ক্ষত্রিয়দের চরম শত্রু পরশুরামের সঙ্গে জোট বাঁধলেন রাজনৈতিক দিক দিয়ে সেটা রীতিমতো এক ধূর্ত পরিকল্পনা।

এ বাবদে মহাভারতের কবির বক্তব্য বড়ই সরল। তিনি যেহেতু মহাকাব্যের কবি, তাই অনর্থকভাবে রাজনৈতিক আবর্ত তৈরি করেন না। নইলে ঈষৎ পূর্বের পরিস্থিতিটাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন—যে আশ্রমের ঋষিরা একটু আগেই অম্বাকে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন, যাঁকে তাঁরা বলেছেন—আমরা ঋষিরা কীই বা করতে পারি তোমার সমস্যায়, সেই আশ্রমেই মুহূর্তের মধ্যে পাঞ্চাল রাজর্ষি হোত্রবাহন এসে পৌঁছলেন, সেই আশ্রমে পরশুরামের নাম উচ্চারণ মাত্রেই তাঁর অনুচর অকৃতব্রণ এসে পৌঁছলেন, আবার তিনি এসে বলছেন কিনা—পরশুরাম এখনই আসছেন—এই সমস্ত ঘটনার শৃঙ্খল মহাকাব্যোচিত আকস্মিকতার সূত্রে গাঁথা হলেও ঘটনাগুলি আমাদের কাছে এত সরল নয়। আর সরল নয় বলেই এই সম্পূর্ণ কাহিনীটা আমরা ভীষ্মের মুখেই শুনতে পাচ্ছি। তিনি এই ঘটনার বলি। এবং এই সমস্ত ঘটনা তিনি নিজমুখে বর্ণনা করেছেন সেই উদ্যোগপর্বে গিয়ে। কীভাবে, কত সুপরিকল্পিত তাঁর পিছনে লাগা হয়েছিল, সে সব ঘটনা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন কুরুবাড়ির নেতাদের কাছে।

আরও লক্ষ্য করে দেখবেন—গীতায় অর্জুন যেখানে বিশাল দুই যুযুধান সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে পড়েছেন, সেখানে যাঁরা শাঁখ বাজিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন তাঁদের মধ্যে পাশাপাশি নাম দুটি হল—কাশীর রাজা এবং পাঞ্চাল শিখণ্ডীর—কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। কাশী এবং পাঞ্চালের এই জোট আরম্ভ হয়েছিল বহু আগে, সেই বিচিত্রবীর্যের বিবাহ-সময়ে এবং সেটা প্রধানত হস্তিনাপুরের সর্বময় কর্তা ভীষ্মের বিরুদ্ধে। আমাদের মতে এই রাজনৈতিক শত্রুতা চলেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত।

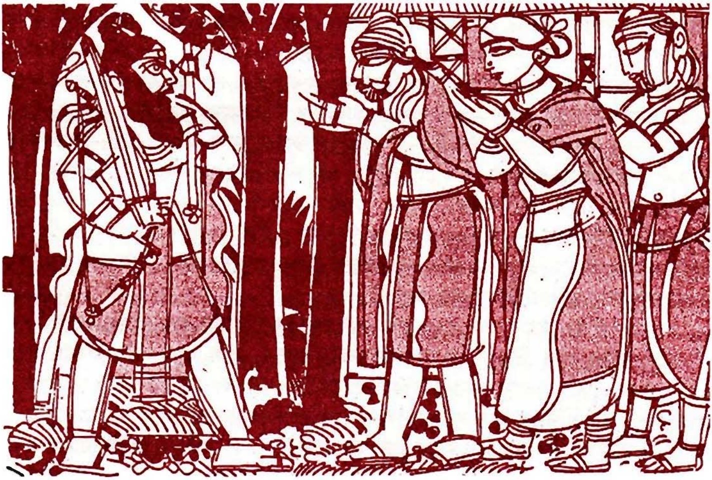

একষট্টি

ওদিকে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী অম্বিকা এবং অম্বালিকার সঙ্গে কুমার বিচিত্রবীর্যের বিয়ে হয়ে গেল। রাজবাড়ির বিয়ে বলে কথা। ধূমধাম যথেষ্ট হল। কিন্তু বিয়ে মিটে যাবার পর দুই স্ত্রীর সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হবার আগেই বোধহয় মহামতি ভীষ্মকে বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধ করবার জন্য যেতে হল। কারণ সেই অম্বা। শাল্বরাজের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর এক মুনির আশ্রমে বসেই তিনি যেভাবে সেকালের রাজনীতি ঘেঁটে তুললেন তা রীতিমতো আশ্চর্যের।

আগেই বলেছি—অম্বার মাতামহ ছিলেন মহাবীর পরশুরামের প্রিয় সখা। মুনি-ঋষিদেরও তিনি নমস্য—রাজর্ষি হোত্রবাহন। পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণ, যিনি এই একটু আগেই শৈখাবত্যের আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রথমে তাঁর কাছেই অম্বার করুণ কাহিনীর সমস্ত বিবরণ দিলেন স্বয়ং সৃঞ্জয় হোত্রবাহন। সেই তিনকন্যার স্বয়ম্বর থেকে আরম্ভ করে অম্বার হস্তিনাপুর থেকে চলে যাওয়া এবং শাল্বরাজের প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত—সব কাহিনী পাঞ্চাল হোত্রবাহনের মুখে শুনলেন অকৃতব্রণ। শেষে খুব ভালমানুষের মতো তিনি জানালেন—এখন তো আর কোনও উপায় নেই— এখন এই আমার দুঃখিনী নাতনিটি তপস্যা করবে বলে এই আশ্রমে এসেছে—সেয়ং তপোবনং প্রাপ্তা তাপস্যে ভিরতা ভৃশম্।

হোত্রবাহন নাকি অম্বাকে আগে ভাল করে চিনতে পারেননি। কিন্তু পরিচয়ের সময় পিতৃকুল-মাতৃকুলের বংশধারার কথা শুনে হোত্রবাহন বুঝেছেন—এটি তাঁরই নাতনি—ময়া চ প্রত্যভিজ্ঞাতা বংশস্য পরিকীর্তনাৎ। মহাকাব্যের সহজ-সরল মনোভূমি থেকে এই বর্ণনাই স্বাভাবিক বটে, তবে আমরা কলিকালের কুটিলতায় ঘটনাগুলিকে এত সরলভাবে বিশ্বাস করিনি। ঘটনা যে তত সরল নয়, তা সবচেয়ে বেশি বোঝা যাবে পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণের উত্তরে অথবা প্রশ্নে। হোত্রবাহন এতক্ষণ অম্বার করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন

অকৃতব্রণের কাছে, অম্বাও তাঁর মাতামহকে সমর্থন করে নিজের বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু হোত্রবাহন কিংবা অম্বা কেউই কিন্তু ভীষ্মকে শাস্তি দেবার কথা তেমন করে বলেননি। হোত্রবাহন সবার শেষে শুধু একবার বলেছিলেন—আমার এই নাতনিটি এখন ভীষ্মকেই তার কষ্টের জন্য দায়ী মনে করছে—অস্য দুঃখস্য চোৎপত্তিং ভীষ্মমেবেহ মন্যতে।

অকৃতব্রণ পরশুরামের সার্থক শিষ্য। পরশুরাম ভয়ঙ্কর ব্যস্ত মানুষ। তিনি পরের দিন সকালে শৈখাবত্যের আশ্রমে এসে পৌঁছবেন—এই সংবাদ আগাম দেবার জন্যই অকৃতব্রণ আগের দিনই এসে পৌঁছেছেন আশ্রমে। সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের মর্যাদা থেকে অকৃতব্রণ বুঝেছেন—হোত্রবাহন খুব কম লোক নন। তিনি তাঁর গুরুর সাহায্য চান। অতএব কীভাবে অথবা কতটুকু সাহায্য এঁরা চান, সেটা অকৃতব্রণের জেনে রাখা দরকার। কারণ কাল সকালেই এ ব্যাপারে তাঁর গুরুকে 'ব্রিফ' করবেন তিনি।

অকৃতব্রণ উত্তর দেবার সময় প্রথম প্রশ্ন যেটা করলেন অম্বাকে, সেটা হল—বৎসে! তুমি কী চাও? শাম্ব এবং ভীষ্ম—এই দুজনের মধ্যে কাকে বেশি ঝামেলায় ফেলতে চাও তুমি—দুঃখং দ্বয়োরিদং ভদ্রে কতরস্য চিকীর্ষসি? তুমি যদি মনে কর—যাতে শাম্বরাজ তোমাকে বিয়ে করেন, সে ব্যাপারে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে, বা তাঁকে জোর করতে হবে, তবে মহাত্মা পরশুরাম তাই করবেন। তোমার যাতে ভাল হয়, তাই তিনি করবেন—নিযোক্ষ্যতি মহাত্মা স রামস্তদ্ধিতকাম্যয়া। অকৃতব্রণ এবার বললেন—আর যদি তুমি মনে কর যুদ্ধে জয় করে ভীষ্মকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে, তুমি যদি এতেই খুশি হও, তবে পরশুরাম তাই করবেন—রণে বিনির্জিতং দ্রষ্টুং কুর্য্যাত্তদপি ভার্গবঃ।

AMARBOI.COM

এই মুহূর্তে কী কঠিন সংকটে পড়লেন এই রমণী। যাঁর কাছে তিনি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন, তাঁর চরিত্রাশঙ্কী সেই শাম্বরাজাকে বিয়ের জন্য জোর করলে, তিনি যদি চাপে পড়ে রাজিও হন, তো সে বিয়ে যে সুখের হবে না, তা তিনি জানতেন। অপরদিকে ভীষ্ম! এক মুহূর্তের জন্য হলেও তো এই প্রৌঢ়-বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। না হয় রাগের মাথায় দাদু হোত্রবাহনকে একবার বলেই ফেলেছিলেন যে, ভীষ্মকে তিনি শাস্তি দিতে চান। তাই বলে এত তাড়াতাড়ি সে ব্যবস্থা করতে হবে। অম্বার মনের গভীরে কী হচ্ছিল, কে জানে?

অকৃতব্রণ প্রশ্ন করলে তিনি অসত্য কথা বলতে পারলেন না। আবারও বলি—কেন, কে জানে? অম্বা বললেন—ভীষ্ম কিছুটি না জেনেই আমাকে অপহরণ করেছিলেন। আমি যে পূর্বাহ্নেই শাম্বরাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম, তাঁকে যে আমি আগে থেকেই মন দিয়েছি—সে কথাও তো তিনি কিচ্ছু জানতেন না—ন হি জানাতি ভীষ্মো মে ব্রহ্মন্ শাম্বগতং মনঃ। অম্বা নিজের কোনও সিদ্ধান্ত জানাতে পারলেন না, যেমনটি পাঞ্চাল হোত্রবাহন জানিয়েছিলেন অকৃতব্রণকে। অম্বা বললেন—আপনারাই বিচার করে স্থির করুন—কার শাস্তি পাওয়া উচিত? কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মই অন্যায় করেছেন, নাকি শাম্বরাজ, নাকি দুজনেই—তা আপনারাই বলুন। আমি আমার দুঃখ-কষ্ট যেমনটি ঘটেছে, তেমনটি নিবেদন করেছি। এখন শাম্ব এবং ভীষ্ম—এই দুজনের মধ্যে সত্যিই কার শাস্তি পাওয়া উচিত—তা আপনারাই সবচেয়ে সযৌক্তিকভাবে ঠিক করতে পারেন—ভীষ্মে বা কুরুশার্দূলে শাম্বরাজে'থবা পুনঃ।

অম্বা আগে যতই রাগ করুন ভীষ্মের ওপরে, ঠিক ঠিক যখন তাঁকে মার খাওয়ানোর প্রশ্ন এল, তখন কিন্তু ভীষ্মের দোষের কথা তিনি কিচ্ছুটি বললেন না। বরঞ্চ, তাঁর ঘটনায় ভীষ্মের যে কোনও দোষই নেই, সেই কথাই তো তিনি শেষ মুহূর্তে 'প্লিড' করলেন, আর তাঁর নাম

বলার সময় একটা শ্রেষ্ঠত্বসূচক বিশেষণও লাগালেন—কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম—ভীষ্মে বা কুরুশার্দূলে, যে বিশেষণ তাঁর পূর্বপ্রিয়তম শাল্বরাজের ভাগ্যে জুটল না। অম্বার মনে সত্যি কী ছিল, তা মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে না বললেও আমরা যেন বুঝতে পারি। কিন্তু সমস্ত ঘটনা মিলিয়ে পরিস্থিতিটা এখন এমনই জটিল হয়ে গেছে যে, এখন আর তাঁর হাতের মধ্যে কিছু নেই। তার মধ্যে ঘটনার কর্তৃত্ব এখন চলে গেছে সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের হাতে। হোত্রবাহন তাঁকে বলেছেন—তুমি আমার কাছেই থাকবে এবং আমিই তোমার দুঃখ দূর করব—দুঃখং ছিন্দাম্যহং তে বৈ ময়ি বর্তস্ব পুত্রিকে।

পরশুরামের শিষ্য অকৃতব্রণ অম্বার মুখে ভীষ্মের নির্দোষ আচরণের কথা এই মুহূর্তে শুনলেও তিনি পূর্বাহ্নেই হোত্রবাহনের কথায় প্রভাবিত হয়েই রয়েছেন। হোত্রবাহন তাঁকে বলেছিলেন—আমার এই নাতনিটি এখন নিজের দুঃখের জন্য ভীষ্মকেই দায়ী করছে। কিন্তু অম্বা যে অকৃতব্রণকে তা বলেননি। ভীষ্ম না শাল্ব, অথবা দুজনেই শাস্তি পাবার যোগ্য—এই বিচারের ভার যখন অকৃতব্রণের ওপর পড়ল, তখন তিনি কিন্তু মত দিলেন হোত্রবাহনের কথা অনুসারেই। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন—বৎসে! ন্যায় এবং ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে তুমি যা বলেছ, বেশ বলেছ—উপপন্নমিদং ভদ্রে। কিন্তু আমার কথা যদি শোন তবে আমি বলব—ভীষ্মই এখানে মূল দোষী। তিনি যদি তোমাকে হস্তিনায় নিয়ে না যেতেন,—যদি ত্বামাপগেয়ো বৈ ন নয়েদ্ গজসাহ্বয়ম্—তাহলে পরশুরামের আদেশে শাল্বরাজ এখনই তোমাকে মাথায় করে নিয়ে যেতেন—শাল্বস্ত্বাং শিরসা ভীরু গৃহ্ণীয়াদ্রামচোদিতঃ।

আমরা বলি—এই 'যদি'র যুক্তিটা নিতান্তই ভুল। ভীষ্ম যদি অম্বাকে হস্তিনায় না নিয়ে যেতেন, তাহলে শাল্বরাজ এমনিই তাঁকে মাথায় নিয়ে নাচতেন, তার জন্য পরশুরামের আদেশের কোনও প্রয়োজন হত না। ভীষ্ম অম্বাকে রথে চড়িয়ে নিয়ে গেছেন সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, অতএব শাল্বরাজের সন্দেহ হয়েছে অম্বার ওপরেই—সংশয়ঃ শাল্বরাজস্য তেন ত্বয়ি সুমধ্যমে।

কারণ যদি শুধু এইটুকুই হত তাহলেও বুঝতাম অকৃতব্রণর ন্যায়ের যুক্তিতে সরলতা আছে। কিন্তু এর পরে তিনি যা বললেন, সেটা শুধু অন্যায়ই নয়, তার পিছনে রীতিমতো উদ্দেশ্য খুঁজে বার করা যায়। অকৃতব্রণ বললেন—সবচেয়ে বড় কথা, ভীষ্ম নিজের পৌরুষ এবং বীরত্ব সম্বন্ধে বড় বেশি আত্মসচেতন এবং সে যে সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে জয় করেছে—এই নিয়েও তার গর্ব আছে যথেষ্ট—ভীষ্ম পুরুষমানী চ জিতকাশী তথৈব চ।

এক সুন্দরী রমণীর বীরপূজার বিস্ময়কে ক্রোধে রূপান্তরিত করার জন্য এই যথেষ্ট। ভীষ্মের যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখে যে রমণী শাল্বরাজের ভাষায় 'প্রীতিমতী' হয়েছিলেন, অকৃতব্রণর কথা শুনে সেই রমণীই এখন বোধহয় পুরনো কথা ভাবতে বসলেন। সত্যিই তো, ভীষ্ম ভীষণ অহংকারী মানুষ। স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত সমস্ত রাজাকে তিনি যুদ্ধাহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—আমি এই মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছি, ক্ষমতা থাকে তো আটকান। সত্যিই তো, এ যে ভীষণ অহংকারের কথা। তারপর শাল্বরাজকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনি হস্তিনায় ফিরলেন। একবার ফিরেও তাকালেন না পরাজিত শত্রু সৌভপতি শাল্বের দিকে, তাঁর প্রিয়তম বীরের দিকে। আর শাল্বরাজও পষ্টাপষ্টি স্বীকার করেছেন যে, তিনি শুধু ভীষ্মের ভয়েই অম্বাকে ফিরিয়ে নিতে পারছেন না। সত্যিই তো এত ক্ষমতা, এত অহংকার এই লোকটার যে, শুধু একবার তাঁকে রথে তুলে নিয়েছিলেন বলে তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তিটি পর্যন্ত তাঁকে অস্বীকার করতে বাধ্য

হয়েছেন। অতএব এ দোষ তো তাঁর নয়, দোষ ভীষ্মেরই। রাজর্ষি হোত্রবাহনের প্ররোচনায় এবং অকৃতব্রণের সমর্থনে অম্বা ভীষ্মকে তাঁর দুরবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করার যুক্তি খুঁজে পেলেন।

অম্বা অকৃতব্রণকে বললেন—মনে মনে আমারও এইরকমই অভিলাষ—হৃদি কামো বিবর্ততে—ইচ্ছে হয়, ওই ভীষ্মটাকে যদি যুদ্ধে বধ করা যেত কোনওভাবে—ঘাতয়েয়ং যদি রণে ভীষ্মমিত্যেব নিত্যদা! এইরকম সম্পূর্ণ নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পরেও কিন্তু অম্বার মনে সংশয় থেকে গেছে। বারবার মনে হয়েছে লোকটার সত্যিই তো দোষ নেই কোনও। তিনি তো কিচ্ছুটি জানতেন না। শাম্বরাজের কথা শোনামাত্র তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন। আর যুদ্ধজয়! তাঁর শক্তি যে সকলের চাইতে বেশি, এও কি কোনও দোষ হতে পারে? অতএব অকৃতব্রণর প্ররোচনায় সম্পূর্ণ আপ্লুত হয়েও অম্বা কিন্তু শেষবারের মতো বললেন—আমি যে যে লোকের জন্য এই সঙ্কটে পড়েছি, সে তিনি ভীষ্মই হোন অথবা শাম্ব—ভীষ্মং বা শাম্বরাজং বা—যাঁকে আপনি দোষী মনে করেন, এমনকি দুজনকেই যদি দোষী মনে করেন, তবে তাঁদের শাসন করার ব্যবস্থা করুন। অর্থাৎ নির্দোষ ভীষ্ম পড়ে পড়ে মার খাবেন, আর শাম্বরাজ তাঁকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবেন—সেটা অম্বার খুব একটা পছন্দ হল না। মার খাওয়াতে হলে তিনি দুজনকেই মার খাওয়াতে চান—ভীষ্মং বা শাম্বরাজং বা।

কিন্তু তিনি যা চান, তা হল না। কারণ সেই রাতটুকু কাটল, তারপর দিনটুকু কাটতেই স্বয়ং পরশুরাম এসে গেলেন শৈখাবত্যের আশ্রমে। আগুনের মতো পরশুরামের তেজ—প্রজ্বলন্নিব তেজসা। মাথায় মুনিসুলভ জটাভার, কাঁধে ধনুক। এক হাতে খড়্গ, আরেক হাতে পরশু। দেখলে বেশ ভয় করে। পরশুরাম এসেই সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের কাছে গেলেন। আশ্রমের সমস্ত মুনি, হোত্রবাহন স্বয়ং এবং অম্বা—সকলে মিলে সাদর অভিনন্দন জানালেন পরশুরামকে। হোত্রবাহনের সঙ্গে পরশুরামের অনেক কথা হল—অনেক পুরনো কথা, সুখ-দুঃখের কথা, পরিচিত পুরাতন দ্বৈত অভিজ্ঞতার কথা। সব কথার শেষে পরশুরাম এবং হোত্রবাহনের বন্ধুত্ব যখন নতুন সরসতায় ভরে উঠল তখনই হোত্রবাহন নিজের কথাটা আস্তে আস্তে পাড়লেন।

amarboi.com

হোত্রবাহন অম্বাকে দেখিয়ে পরশুরামকে বললেন—এইটি আমার বড় আদরের নাতনি। কাশীরাজের মেয়ে গো। তা আমার এই নাতনিটির একটা আর্জি আছে তোমার কাছে। তুমি তার কথা শুনে যা হয় একটা ব্যবস্থা করো—অস্যাঃ শৃণু যথাতত্ত্বং কার্য্যং কার্যবিশারদ। পরশুরাম শুনেই অম্বার দিকে তাকিয়ে বললেন—বলো, কী তোমার বক্তব্য? অম্বা প্রথমেই কিচ্ছু বললেন না। ভীষ্ম কিংবা শাম্ব—এই দুজনের ওপর তাঁর যে গভীর ক্রোধ হয়েছে, তা বেরিয়ে এল ক্রন্দনের রূপ ধরে। তিনি তাঁর পদ্মদলসন্নিভ হস্ত দুটি দিয়ে পরশুরামের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন—রুরোদ সা শোকবতী বাষ্পব্যাকুললোচনা।

একে তো বন্ধু হোত্রবাহনের নাতনি, তাতে আবার তিনি কাঁদছেন। পরশুরাম বিনা দ্বিধায় কথা দিলেন—তুমি যেমন এই সৃঞ্জয় হোত্রবাহনের নাতনি তেমনই আমারও নাতনি। তুমি বলো—কী করতে হবে তোমার জন্য। যা বলবে তাই করব—ব্রূহ যত্তে মনোদুঃখং করিষ্যে বচনং তব। অম্বা বললেন—আমি আপনার শরণ নিয়েছি, আপনি যা ভাল মনে হয় করুন। স্নেহের নাতনিটির মতো হলেও অম্বার শরীরের দিকে এবার পরশুরামের নজর পড়ল। দেখলেন—অম্বা অতিশয় সুন্দরী এবং নবযৌবনবতী। এমন রূপ দেখে—তস্যাস্তু দৃষ্ট্বা রূপঞ্চ বপুশ্চাভিনবং পুনঃ—পরশুরাম করুণায় বিগলিত হলেন। ভাবলেন—এই ভরা যৌবনে

মেয়েটা কী দুঃখটাই বা না জানি পেয়েছে—রামঃ কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ। পরশুরাম অম্বার জীবনকাহিনী শুনতে চাইলেন তাঁরই মুখে।

এক এক করে সেই স্বয়ম্বরসভা থেকে শাল্বরাজের প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত একই কথা আবারও শোনালেন অম্বা। পরশুরাম সমস্ত ব্যাপারটা সহজ করে দিয়ে বললেন—আমি এক্ষুনি কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছি। তিনি নিশ্চয় আমার কথা শুনবেন। আর যদি না শোনেন তো আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব ভীষ্মের সঙ্গে। আমার অস্ত্রের তেজে তাঁকে দগ্ধ করে ছাড়ব। ভীষ্মের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরশুরাম শাল্বরাজের প্রসঙ্গটাও টেনে আনলেন। বললেন—তোমার যদি ভীষ্মের ব্যাপারে এই প্রতিশোধস্পৃহা না থাকে, তবে শাল্বরাজার কথাটাও জানাও। আমি তাঁকেও তোমার ইচ্ছামতো বাধ্য করতে পারি—যাবচ্ছাল্বপতিং বীরং যোজয়াম্যত্র কর্মণি। অম্বা সত্যি কথাই বললেন আবার। বললেন—শাল্বরাজার প্রতি আমার অনুরক্তি জেনেই ভীষ্ম ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু শাল্বকে আমি এমনভাবেই অনুরোধ করেছিলাম, যে অনুরোধ আমার ঘরানার কোনও মেয়ের করার কথা নয়। কিন্তু তিনি আমার চরিত্রের ব্যাপারে আশঙ্কা করেছেন এবং সে আশঙ্কার কারণ ভীষ্ম। তিনি আমাকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আমি যেন কেমন বশীভূত হয়ে পড়েছিলাম—যেনাহং বশমানীতা সমুৎক্ষিপ্য বলাত্তদা—তিনি জোর করেই আমাকে নিজের করায়ত্ত করেছিলেন।

'বশীভূত' হবার কোনও কারণ বলেননি অম্বা। কেমন করে অথবা কী রকম এই বশীকরণ, তাও তিনি ভাল করে বলেননি। আমরাও তা ভাল করে বুঝি না বলেই অনুমানের জায়গাটা আরও প্রশস্ত হয়ে যায়। ভীষ্ম জোর করে নিজের অধিকারে স্থাপন করেন অম্বাকে—যেনাহং বশমানীতা—বশীকরণ শব্দের অর্থ যদি এই দাঁড়ায়, তবে সে অম্বারই ইচ্ছাকৃত—রথে ওঠবার সময়েও তাই, এখনও তাই। পাঞ্চাল হোত্রবাহন, অকৃতব্রণ—সবার যুক্তি মেনে এই মুহূর্তে পরশুরামের সামনে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য ভীষ্মকেই যে শেষ পর্যন্ত এককভাবে দায়ী করলেন অম্বা, তার পিছনে আছে প্রখর বাস্তব। পরশুরামের কাছে অম্বা বললেন—আপনি ভীষ্মকেই মারুন, তিনি আমার সমস্ত দুঃখের মূল—ভীষ্মং জহি মহাবাহো যৎকৃতে দুঃখমীদৃশম্।

এতক্ষণ কিন্তু ভীষ্মের দোষ দেখতে পাননি অম্বা। সেই নির্দোষ মানুষটিই এখন তাঁর চোখে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত হলেন। ঘটনাটা নিতান্তই অদ্ভুত। মনে রাখতে হবে—সমস্ত ঘটনার রাশ এখন পরশুরামের হাতে চলে গেছে। তাঁর মতো অস্ত্রযোদ্ধা ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় কেউ নেই। অম্বা বুঝলেন—এখন তিনি যাঁর কথা বলবেন তাঁর মৃত্যু অবধারিত। এতক্ষণ তিনি যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে ভীষ্মকে কখনই তিনি দোষী সাব্যস্ত করেননি। শাল্বরাজের ওপরেই তাঁর রাগ ছিল বেশি। কিন্তু হোত্রবাহন, অকৃতব্রণ—এঁদের প্ররোচনায় অম্বার মত খানিকটা বদলেছে, আর সেই সঙ্গে আছে প্রখর বাস্তব। পরশুরামের হাতে পড়লে যত বড় যুদ্ধবাজই হোন, তিনি মারা যাবেন। অম্বা শাল্বরাজকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর শেষের ব্যবহার অম্বার কাছে ভীষণ অপ্রিয় হলেও তিনি পুরাতন প্রেমিককে মেরে ফেলার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেন না। সেটা ভাল লাগে না, ভাল দেখায়ও না। সৃঞ্জয় হোত্রবাহন কিংবা অকৃতব্রণ—এই দুজনেই অম্বার পুরাতন প্রেমের কথা ভেবেই ভীষ্মকে দায়ী করেছেন। অম্বাও শেষ পর্যন্ত তাই করলেন। পরশুরামকে তিনি শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—আপনি আমার দুঃখ দূর করুন, ভগবন্। মারুন ওই ভীষ্মকে—তচ্চ ভীষ্মপ্রসূতং মে তং জহীশ্বর মা চিরম্।

কাশীরাজকন্যার প্রস্তাবটা তাঁর নিজের মুখে এতক্ষণ শোনেননি পরশুরাম। কিন্তু শোনার

amarboi.com

পর তাঁর একটু দোনামোনাই হল যেন। দেবব্রত ভীষ্ম পরশুরামের পরম প্রিয় অস্ত্রশিষ্য। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা বা তাঁকে বধ করা—কোনওটাই পরশুরামের পরম ঈপ্সিত ছিল না। পরশুরাম সেইভাবেই একটা ইঙ্গিতও দিলেন। বললেন—রাজকন্যে! আরও একবার ভেবে বলো। ভীষ্ম তোমার পূজনীয় হলেও আমি যদি একবার তাঁকে বলি, তবে তিনি তোমার পা দুটো মাথায় বয়ে নিয়ে যাবেন—শিরসা বন্দনার্হোঽপি গ্রহীষ্যতি গিরা মম।

অম্বা মানলেন না। রমণীর প্রতিহত প্রেম এখন ধ্বংসের রূপ ধারণ করেছে। তিনি বললেন—আপনি যদি আমার তুষ্টির কথা চিন্তা করেন, তবে ভীষ্মকে মেরে ফেলতেই হবে—জহি ভীষ্মং রণে রাম মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্—তাছাড়া আপনি না আমাকে কথা দিয়েছিলেন। অতএব এই হচ্ছে সেই সময়। আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। অম্বার কথা শুনে পরশুরামের সহচর অকৃতব্রণ বললেন—মেয়েটা আপনার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে আছে, মুনিবর! ওকে আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—কন্যাং ন ত্যক্তুমর্হসি। আপনি ভীষ্মকে মারুন তো। আর তা না হলে, হয় সে আপনার কথা মেনে নিক, নয় তো সে এসে বলুক যে, সে আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে আপনার কাছে নির্জিতোঽস্মীতি বা ব্রুয়াৎ কূর্য্যাদ্ বা বচনং তব।

অকৃতব্রণ পরশুরামকে নানা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভীষ্মের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধের সম্ভাবনাটাই চেতিয়ে তুললেন। কিন্তু ব্যাপারটা এঁরা যত সহজ ভাবছেন, তত সহজ যে নয়, সেটা পরশুরাম ভাল করেই জানেন। নিজে প্রখ্যাত অস্ত্রবিদ বলেই ভীষ্মের সঙ্গে লড়াইটা কী রকম হবে, সেটা পরশুরাম ভাল করেই জানেন। সেই কারণেই অকৃতব্রণের চেতিয়ে তোলা ভাষায় উদ্দৃপ্ত হয়ে পরশুরাম একটা প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে বললেন—কথা না শুনলে আমি ভীষ্মকে মৃত্যুদণ্ড দেব ঠিকই কিন্তু তবু আমায় দেখতে হবে যাতে ভাল কথায় কাজ হয়—তথৈব চ করিষ্যামি যথা সাম্নৈব লপ্স্যতে। অর্থাৎ ভাল কথায় কাজ করাটাই পরশুরামের প্রথম ইচ্ছে।

শৈখাবত্যের আশ্রমে থাকা ব্রহ্মর্ষি মুনিদের নিয়ে এবং স্বয়ং অম্বাকে নিয়ে পরশুরাম কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন—কুরুক্ষেত্রং মহারাজ কন্যয়া সহ ভারত। পরশুরাম প্রথমে ভীষ্মের কাছে একটি দূত পাঠালেন। খবর দিলেন—আমি এসেছি—প্রাপ্তোঽস্মি। খবর শুনে ভীষ্ম হস্তিনাপুরের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত এবং একটি দুধেল গাই নিয়ে পরশুরামের সামনে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম প্রণাম করে দাঁড়াতেই পরশুরাম বললেন—ভীষ্ম! এ তোমার কেমন ব্যবহার? তুমি নিজে যখন বিয়ে করবে না, তখন কেনই বা এই মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলে, আর কেনই বা তাকে ত্যাগ করলে? তুমি জান—তুমি কী করেছ? মেয়েটার কোনও দুর্নাম ছিল না, অথচ তুমি তার সর্বনাশ, ধর্মনাশ—সবই করেছ—বিভ্রংশিতা ত্বয়া হীয়ং ধর্মাদাস্তে যশস্বিনী। তুমি একে স্পর্শ করেছিলে বলে এখন শাল্বরাজা একে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পরশুরাম একেবারে ঠিক 'পয়েন্টে' আঘাত করেছেন। ভীষ্মের দিক থেকে ওই একটাই ছেলেমানুষি হয়েছে। তিনি নিজে বিয়ে করবেন না, অথচ কন্যা হরণ করেছেন। পরশুরাম তাই সেই যুক্তিতেই তাঁকে বললেন—তুমি এক্ষুনি আমার আদেশে এই কন্যাকে গ্রহণ করো, যাতে এই রাজপুত্রী নারী-জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে—তস্মাদিমাং মন্নিয়োগাৎ প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভারত। ভীষ্ম সরলভাবে বললেন—আমি এই রমণীকে আর আমার ভাইয়ের হাতে তুলে দিতে পারব না। ভীষ্ম নিজের যুক্তি দেখিয়ে বললেন—শাল্বরাজার কথা বলতেই আমি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি। এখন সব জেনেশুনে কীভাবে এক পরানুরক্তা রমণীকে আমাদের ঘরে

নিয়ে তুলতে পারি?

পরশুরাম যুদ্ধের ভয় দেখালেন, হত্যার ভয় দেখালেন, কিন্তু ভীষ্ম নিজের যুক্তি থেকে একটুও সরলেন না। পরশুরামও নরমে-গরমে ভীষ্মকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। আস্তে আস্তে গুরু-শিষ্যের যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল। পরশুরাম যুদ্ধের ভয় দেখালে ভীষ্ম একটু রেগেই গেলেন। বললেন—আপনাকে এতকাল আমি গুরু বলে মেনেছি, কিন্তু এখন আর আপনি আমার সঙ্গে গুরুর মতো ব্যবহার করছেন না, অতএব আপনার সঙ্গেই যুদ্ধ করব—গুরুবৃত্তিং ন জানীষে তস্মাদ্ যোৎস্যামি বৈ ত্বয়া।

পরশুরাম জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ অথচ তিনি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, যুদ্ধকার্য করেন। যুদ্ধ যে তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব থেকে চ্যুত করেছে—এই কথাও বলতে দ্বিধা বোধ করলেন না ভীষ্ম। পরিশেষে বেশ একটু মেজাজ নিয়েই ভীষ্ম বললেন—আপনি বহু বছর ধরে যত্রতত্র বলে বেড়াচ্ছেন যে, আপনি সমস্ত ক্ষত্রিয়কে জয় করেছেন। আপনি মনে রাখবেন—আপনার ওই ক্ষত্রিয়-নিধন কালে ভীষ্মের মতো ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মায়নি—ন তদা জাতবান্ ভীষ্মঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি মদ্বিধঃ—ফলে ঘাসের ওপর যেমন আগুন জ্বলে, তেমনই তৃণোপম ক্ষত্রিয়দের ওপরে আপনি আপনার তেজ দেখিয়েছেন। কিন্তু আজকে আপনি বুঝবেন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কাকে বলে। আপনার সারা জীবনের যুদ্ধের অভিলাষ আমি আজকেই ঘুচিয়ে দেব—ব্যপনেষ্যামি তে দর্পং যুদ্ধে রাম ন সংশয়ঃ। আপনি কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চকে গিয়ে দাঁড়ান। আমি সেখানেই আসছি—তত্রৈষ্যামি মহাবাহো যুদ্ধায় ত্বাং তপোধন।

যুদ্ধের আগে আত্মশ্লাঘা করাটা যুদ্ধেরই অঙ্গ। এতে পরপক্ষের মানসিক চাপ বাড়ে। ভীষ্মও তাই করলেন। পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের এই যুদ্ধ চলেছিল বহুদিন ধরে। মহাভারতে অন্তত আট অধ্যায় জুড়ে এই যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে। ভীষ্ম নিজমুখে এই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বর্ণনা অত্যন্ত নিরপেক্ষ। সেখানে কখনও ভীষ্মের দেহ পরশুরামের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত, কখনও বা পরশুরাম ভীষ্মের মারণাস্ত্রে প্রায় ধরাশায়ী। শুভার্থী মানুষেরা শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন এবং দুজনকেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধটা শেষ হয়েছিল এমন একটা করুণ সুরে, যার অর্থ ছিল একটাই—পরশুরাম যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেন।

সেকালের অত বড় বীর, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন একুশবার, সেই পরশুরামও নিজের এলেম বোঝেন যথেষ্ট। যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভীষ্ম সবিনয়ে গুরু পরশুরামের চরণ বন্দনা করলেন। পরশুরাম আপন শিষ্যের মাহাত্ম্যে পরম গর্বিত হয়ে বললেন—পৃথিবীতে তোমার মতো ক্ষত্রিয় বীর আর দ্বিতীয়টি নেই—ত্বৎসমো নাস্তি লোকে'স্মিন্ ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীচরঃ। তুমি এখন ফিরে যেতে পার। আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। ভীষ্মকে একথা বলেই পরশুরাম অম্বাকে জানালেন—আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেও আমি কী করতে পেরেছি, তা সকলেই এখানে দেখেছেন—প্রত্যক্ষমেতল্‌-লোকানাং—আমি ভীষ্মকে জয় করতে পারিনি। শক্তি বল, ক্ষমতা বল, আমার সামর্থ্য এইটুকুই। আমার আর কিছুই করার নেই, ভদ্রে। পরশুরাম সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি করে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন এবং শেষ পরামর্শ হিসেবে অম্বাকে বললেন—আমার কথা যদি শোন, তবে তুমি ভীষ্মেরই শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমার পরমা গতি—ভীষ্মমেব প্রপদ্যস্ব ন তে'ন্যা বিদ্যতে গতিঃ।

পরশুরাম যখন অম্বাকে এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন ভীষ্ম তাঁর সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। পরশুরামের মতো বীর যখন যুদ্ধভূমিতে ভীষ্মকে কিছুই করতে পারলেন না

এবং অম্বা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তখন তাঁর পক্ষে ভীষ্মের প্রশংসা করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। অতএব অম্বাও ভীষ্মকে দেব-দানবের অজেয় বলে আখ্যা দিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বললেন যে, আমি কোনওভাবেই তাই বলে ভীষ্মের কাছে ফিরে যেতে পারি না—ন চাহমেনং যাস্যামি পুনর্ভীষ্মং কথঞ্চন। আমি বরং সেই চেষ্টা করব যাতে আমি নিজেই তাঁকে বধ করতে পারি। কী আর বলব, রমণীর প্রতিহত প্রেমের সংজ্ঞাই বোধহয় অম্বা। শাম্বরাজের থেকেও ভীষ্মের ব্যাপারে তাঁর মুগ্ধতা বেশি। এমন বিরাট এক চরিত্র তিনি পূর্বে কল্পনাও করতে পারেননি।

পরশুরাম যুদ্ধ শেষ করে নিজের জায়গা মহেন্দ্র-পর্বতে চলে গেলেন। অম্বা নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য গভীর বনে চলে গেলেন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করবেন বলে। ভীষ্ম ব্রাহ্মণদের স্তুতিগীত আর জয়কার শুনতে শুনতে হস্তিনায় ফিরে এলেন। সমস্ত ঘটনা জানালেন জননী সত্যবতীকে। সত্যবতী ভীষ্মের যুদ্ধজয়ে পরম আনন্দ লাভ করলেন। সবই হল। সবই ভালয় ভালয় শেষ হল। কিন্তু সেই যে রমণীটি ভীষ্ম-বধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বনে চলে গেল, তাঁর জন্য ভীষ্মের চিন্তা রয়ে গেল। হস্তিনাপুরের কতগুলি বিশ্বস্ত গুপ্তচরকে তিনি সদা-সর্বদা নিযুক্ত করে রাখলেন সেই রমণীর গতিবিধি এবং মনোভাব প্রতিনিয়ত ভীষ্মের কাছে জানানোর জন্য—

পুরুষাংশ্চাদিশং প্রাজ্ঞান্ কন্যাবৃত্তান্তকর্মণি।।
দিবসে দিবসে হ্যস্যা গতি-জল্পিত-চেষ্টিতম্।
প্রত্যাহরংশ্চ মে যুক্তাঃ স্থিতা প্রিয়হিতে সদা।।

বাষট্টি

হস্তিনাপুরের রাজা কুমার বিচিত্রবীর্য ভালই রাজ্যশাসন করছিলেন। অবশ্য সে শাসনের মধ্যে তাঁর নিজের অবদান সামান্যই ছিল। শাসন সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত যেহেতু ভীষ্মই নিতেন, তাই বিচিত্রবীর্য খানিকটা অপরিপক্কই থেকে গিয়েছিলেন। এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটির ওপরে ভীষ্মের স্নেহ-ভালবাসাও এতটাই গভীর ছিল যে, এত বড় একটি রাজ্যের বিভিন্ন বিপদ-আপদ -বিপর্যয়ে তিনি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ভাইটির গায়ে কোনও ঝামেলার ছোঁয়াটিও লাগতে দিতেন না। নইলে দেখুন, বিবাহের মতো একটি বিষয়, যা সেকালের রাজাদের নিতান্তই ব্যক্তিগত পছন্দ এবং কন্যা নির্ধারণের ব্যাপার ছিল, সেখানেও কোনও যুদ্ধ বা কোনও অস্বস্তি হবে ভেবে ভীষ্ম তাঁর ছোট ভাইটিকে এগোতে দেননি। তিনি নিজে যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ করে কাশীরাজের দুই মেয়ে অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে তুলে দিলেন ভাইয়ের হাতে।

এর মধ্যে অম্বাকে নিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সূচনা হল, তার মধ্যে একবারের তরেও কুমার বিচিত্রবীর্যের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ভীষ্মের অপার স্নেহ, মমতা আর আদর পেয়ে পেয়ে বিচিত্রবীর্যের এমনই পাওয়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, সংসার এবং রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর যে কোনও কৃত্য আছে, কোনও কিছুতে তাঁকে যে আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে—এসব তিনি বুঝতেই পারতেন না। আর এ ব্যাপারে পিতাপ্রতিম ভীষ্ম এবং জননী সত্যবতীর প্রশ্রয়ও কিছু কম নয়। পিতা শান্তনুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রথম পুত্র চিত্রাঙ্গদ মারা যাবার পর থেকে ভীষ্মও বুঝি যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

এই আতঙ্ক ছিল অনেকটাই এক পুত্রনিষ্ঠ আধুনিক পিতামাতার মতোই। এখনকার দিনে বহুত্র যেমন দেখতে পাই—পিতামাতা সন্তানের গায়ে সামান্য আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেন না, সংসারের যাবতীয় সাধারণ—অসাধারণ কর্মে নবযুবক পুত্রটিকেও যেমন করে পিতামাতা

বাঁচিয়ে চলেন, ভীষ্মও সেইভাবেই একান্তভাবেই বিচিত্রবীর্যকে লালন করেছেন। নইলে, যে স্বয়ম্বর সভায় একান্তভাবেই বিচিত্রবীর্যের গমন প্রার্থনীয় ছিল, যেখানে হস্তিনাপুরের নবযৌবনোদ্ধত রাজা আপন শক্তির প্রথম পরিমাপটুকু করতে পারতেন। সেখানে ভীষ্ম নিজে গিয়ে নিজের বিপদ যেমন ঘটালেন, তেমনই কুমার বিচিত্রবীর্যকেও কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ না দিয়ে অন্য এক ধরনের বিপত্তি ঘটালেন বলে আমরা মনে করি।

এখনকার দিনের সংসারে একেকটি স্নেহাস্পদ পুত্রকে দেখলে যেমন মনে হয়—এ কিছুই করতে পারবে না, এ বড় নরম, বড় 'লাজুক', সংসারের সবচেয়ে ভাল জিনিসটি শুধু এরই প্রাপ্য, হস্তিনাপুরের রাজা বিচিত্রবীর্যকে দেখলেও আমাদের সেইরকম মনে হয়। মহাভারতের কবি একবার মাত্র হস্তিনাপুরের রাজবংশের মাহাত্ম্য খ্যাপন করে বলেছিলেন—বিচিত্রবীর্যের পিতা শান্তনু যেভাবে রাজ্য শাসন করতেন, কুমার বিচিত্রবীর্যের শাসন সেরকম তো ছিলই, বরং বলা উচিত, বিচিত্রবীর্য আপন গুণে পিতাকেও অতিক্রম করেছিলেন—অচিরেণৈব কালেন সো'ত্যক্রামন্নরাধিপঃ।

মহাকাব্যের কবির কাছে বিচিত্রবীর্যের এই খ্যাতি 'রুটিন' মাত্র। আমরা জানি—মহাকাব্যের কবির এই অতিবাদ মহাকাব্যের পরিমণ্ডলে নিতান্তই বর্ণনা। কারণ একটি শ্লোকেই বিচিত্রবীর্যের স্তুতিরচনা সেরে কবি কিন্তু ভীষ্মের প্রসঙ্গে চলে গেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে পিতা শান্তনুকে গুণে যদি কেউ অতিক্রম করে থাকেন, তিনি গাঙ্গেয় ভীষ্ম। শান্তনুর ক্ষেত্রেও রাজ্য শাসনের বা রাজধর্মের যত না গুণ ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল সাংসারিক ভোগ-লালসা। একে কামুকতা বলার সমস্যা আছে, কারণ মাতৃসম্বন্ধে শান্তনু মহাভারতের কবির পিতা। কিন্তু পিতার কামুকতা পুত্রের মধ্যে কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল মহাভারতের কবি পিতার কামুকতার কথা স্পষ্টত না বললেও—ওই একটিমাত্র শ্লোকে বিচিত্রবীর্যের স্তুতি রচনা সাঙ্গ করার পর কবি বেশ খানিকক্ষণ শুধু ভীষ্মের অনন্ত কর্মরাশি বর্ণনা করে গেলেন; আর তার পরেই বিচিত্রবীর্য অম্বিকা আর অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করা মাত্রই—তয়োঃ পাণী গৃহীত্বা তু—ভয়ঙ্করভাবে কামাসক্ত হয়ে পড়লেন—কামাত্মা সমপদ্যত।

মহাভারতের বর্ণনানিপুণ কবি বিচিত্রবীর্যের অনন্ত কামনার প্রতিপদ-বর্ণনার মধ্যে যাননি। পরিবর্তে তিনি অম্বিকা এবং অম্বালিকার রূপ-বর্ণনা করে দিয়েছেন একটি মাত্র শ্লোকে। বুঝিয়ে দিয়েছেন—কামনার এতাদৃশ আধার পাবার ফলেই বিচিত্রবীর্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু তাঁর দুটি স্ত্রী নিয়েই দিন-রাত যাপন করতে লাগলেন। অম্বিকা এবং অম্বালিকার অপূর্ব রূপের মধ্যে কুঞ্চিত কেশ, রক্ত-তুঙ্গ-নখ অথবা পীনশ্রোণীপয়োধরের সৌন্দর্য আমাদের কাছে খুব বড় কথা নয়। আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল—এঁরা দুই বোনই—অম্বিকা এবং অম্বালিকা—দু'জনেই কালো ছিলেন—তে চাপি বৃহতীশ্যামে নীলকুঞ্চিতমূর্ধজে।

লক্ষ্য করে দেখবেন—শান্তনু-পত্নী সত্যবতীর গায়ের রঙও কালো ছিল; এতটাই কালো ছিল যে তাঁর ডাক নামও ছিল কালী। তাঁর উত্তর-বংশে যে দুটি মেয়ে কাশী রাজ্য থেকে এলেন, তাঁদের গায়ের রঙও কালো। কিন্তু এই কালো রঙের সঙ্গে অম্বিকা এবং অম্বালিকার স্তন-জঘনের সৌন্দর্য কুমার বিচিত্রবীর্যকে পাগল করে তুলল। সুরূপা এবং যৌবনবতী কৃষ্ণা রমণীদের ক্ষমতা এবং স্বভাবই বুঝি এইরকম। শেকস্‌পীয়রের 'ব্ল্যাক লেডি'র কথাই বা এখানে অনুল্লিখিত থাকে কেন? যাই হোক বিচিত্রবীর্য নিজেও দেখতে ভাল ছিলেন এবং আপন সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতাও ছিল—রূপযৌবনগর্বিতঃ। অন্যদিকে অম্বিকা এবং

অম্বালিকাও এমন সুন্দর স্বামী লাভ করে স্বামীর সমস্ত কামনা পূরণ করতে লাগলেন তাঁর চাহিদা মতো।

এই চাহিদা সামান্য ছিল না। আগেই বলেছি—রাজপরিবারের সমস্ত সারভাগ পেতে পেতে বিচিত্রবীর্যের এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, যে দুটি রমণীরত্ন লাভ করামাত্রই তিনি উপলব্ধি করলেন—যেন যথাসাধ্য কাম উপভোগ করার জন্যই তাঁর জন্ম এবং জীবন। রাজকার্য নেই, প্রজাপালন নেই, ধর্মাধর্ম নেই, সময়-অসময় নেই, বিচিত্রবীর্য স্ত্রীসম্ভোগ করে যাচ্ছেন। সাত সাতটি বছর এই ক্রমান্বয়ী ভোগেই কাটিয়ে দিলেন বিচিত্রবীর্য—তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীপতিঃ।

এই সম্ভোগের ফল খুব একটা ভাল হল না। বাড়িতে যদি আশি-নব্বই বছরের বৃদ্ধ সক্ষম অবস্থায় থাকেন, তবে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—এই অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগের ফল কী? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও বিবাহিত দম্পতির একতর পুরুষ মানুষটির যদি 'টিবি' হত, তাহলে বয়স্ক জনেরা মনে মনে সন্দেহ করতেন যে, ওই রোগ অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্ভোগের ফল।

আজকের দিনের ডাক্তাররা পুরুষের অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়কে কোনও বৃহৎ উপসর্গ মনে করেন না, কিন্তু সেকালের কবিরাজ এবং বৈদ্যজনেরা অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়কে যক্ষ্মারোগের অন্যতম কারণ বলে মনে করতেন। আমাদের ধারণা—সেকালের দিনের বয়স্কজন এবং কবিরাজ গোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্ত প্রধানত বিচিত্রবীর্যের উদাহরণ থেকেই প্রণোদিত হয়েছিল কি না কে জানে।

অবশ্য কেউ মনে করুন আর নাই করুন, মহাভারতের কবির ধারণা—সাত বছর ধরে অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগ করার ফলে বিচিত্রবীর্যের তরুণ বয়সেই যক্ষ্মা ধরে গেল—বিচিত্রবীর্যস্তরুণো যক্ষ্মণা সমপদ্যত। আমাদের পূর্বকালের বৃদ্ধরাও যে অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগকেই যক্ষ্মারোগের অন্যতম কারণ মনে করতেন, তার ছায়া পাওয়া যাবে হরিদাসের টীকায়। তিনি বলেছেন—বিচিত্রবীর্যের যক্ষ্মা হল। কেন? কারণ অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়—শুক্রক্ষয়নিবন্ধনেন যক্ষ্মারোগেণ। আমরা পূর্বে আরও একবার এই যক্ষ্মারোগের কথা বলেছি—চন্দ্রবংশের মূল পুরুষ চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হওয়ার প্রসঙ্গে।

AMARBOI.COM

যাই হোক বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন আর হস্তিনাপুরের যত বৈদ্য-চিকিৎসক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে তাঁর রোগ উপশমের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হল না অবশ্য। সূর্য যখন অস্তে যায়, যখন যেমন শত চেষ্টা করলেও তাকে ধরে রাখা যায় না, বিচিত্রবীর্যও তেমনই বৈদ্য-চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে দিয়ে মারা গেলেন—জগামাস্তম্ ইবাদিত্যঃ কৌরব্যো যমসাদনম্।

বিচিত্রবীর্য মারা গেলেন। কিন্তু মারা যাবার আগের সেই সাতটি বছর, যখন তিনি স্ত্রীসম্ভোগে মত্ত ছিলেন, তখন মহামতি ভীষ্মের কী দশা গেছে? প্রথমে তো সেই অম্বার তাড়নায় পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধের আগে পরে এবং যুদ্ধের সময়টুকু ধরে ভীষ্ম যে ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তি পাননি, সে কথা বলাই বাহুল্য। মহাভারতের মধ্যে যাঁরা ভার্গব প্রক্ষেপের কথা বলেন, তাঁদের মতে পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধটা অন্য দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতের এই অংশ তাঁদের মতে অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত এবং এখানে যেহেতু ভৃগুবংশীয় ভার্গব পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধ শেষ হয়েছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মিলনের

তাৎপর্য নিয়ে, তাই মহাভারতের এই অংশে ভার্গবদের গুরুত্ব একভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েইছে। মহামতি ভীষ্ম যুদ্ধ করার পরে ভার্গব পরশুরামের চরণ বন্দনা করে এই গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তর্কের খাতিরে এখানে প্রক্ষেপের আলোচনা বাদ দিয়ে যদি মহাভারতে যা আছে তাই সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়টুকু ভীষ্মের দিক থেকে খুব আরাম এবং রক্তচাপহীন অবস্থায় যে কাটেনি, তা অনুমান করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, পরশুরাম ক্ষত্রিয়-শাস্তা এক বীর হিসেবে প্রতীকীভাবেই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছেন। নইলে রামচন্দ্রের আমলে যে পরশুরাম বেঁচে ছিলেন, সেই পরশুরাম এখনও বেঁচে আছেন, এমন অলৌকিক ভাবনার কোনও লৌকিক ভিত্তি নেই। বরং লৌকিকতার তাৎপর্যে পরশুরামকে একটা 'ইনস্টিটিউশন' হিসেবেই ধরা উচিত। বংশ-পরম্পরাতেই হোক অথবা শিষ্য পরম্পরাতেই হোক, ভার্গব পরশুরামেরা ক্ষত্রিয় বীরদের বিরুদ্ধ-ভূমিতে থাকতেন শাস্তা হিসেবে। অম্বা এমনই কোনও এক পরশুরামের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ভীষ্মকে শাস্তি দেবার জন্য। ভীষ্মের শাস্তি হয়নি বটে, কিন্তু তাঁকে যুদ্ধের কষ্ট অবশ্যই ভোগ করতে হয়েছে। শেষে পরশুরাম ভীষ্মের ওপর প্রসন্ন হয়ে চলে গেছেন।

এই অবস্থায় অম্বা নিজের ভার নিজে নিয়েছেন। তিনি বনে গেছেন তপস্যা করতে। ভীষ্ম এতে মোটেই স্বস্তি পাননি। তাঁর 'টেনশন' বেড়েছে। একটি সুন্দরী রমণী তাঁকে প্রার্থনা করে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করার জন্য তপস্যার সিদ্ধি চাইছে—এই বিপরীত পরিস্থিতি ভীষ্মকে মনে-প্রাণে আকুল করেছে। উদ্যোগ-পর্বে ভীষ্ম নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যে—অম্বা যখন তপস্যা করার জন্য বনে গেলেন, সেদিন থেকেই আমি উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ এবং চৈতন্যহীনের মতো হয়ে গিয়েছিলাম—তদৈব ব্যথিতো দীনো গত চেতা ইবাভবম্। এই উদ্বেগের মধ্যে 'না বলা বাণী' বা অনির্বন্ধ প্রেমের কোনও মোক্ষধাম রচিত হয়েছিল কি না, তা রসিক জনের অনুমেয়।

ভীষ্মের উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি শুধু তপস্বিনী অম্বার প্রাত্যহিক গতিবিধি জানবার জন্য—দিবসে দিবসে হ্যস্যা গতি-জল্পিত-চেষ্টিতম্—বিশ্বস্ত পুরুষদের নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, ভীষ্ম তাঁর এই উদ্বেগের কথা দুটি লোককে জানিয়েছেন। একজন নারদ, অন্যজন মহাভারতের কবি স্বয়ং ব্যাস। নারদ সেকালের রাজনীতি সংক্রান্ত তাত্ত্বিক পুরুষদের অন্যতম, আর ব্যাস এক অর্থে তাঁর আপন বৈমাত্রেয় ভাই এবং সর্বদর্শী ঋষি। অম্বা তপস্যা করছেন এই অবস্থায় ভীষ্মের করণীয় কী—এ সম্বন্ধেই তাঁর প্রশ্ন ছিল ব্যাস এবং নারদের কাছে—ব্যাসে চৈব তথা কার্যং...নারদে'পি নিবেদিতম্। এই দুই ঋষিই অম্বার ব্যাপারে তাঁকে কোনও স্বস্তির নির্দেশ দিতে পারেননি। পুরুষকারের চেয়ে দৈবই যে এখানে বলবান হয়ে দাঁড়াবে—শুধু এই সান্ত্বনায় ভীষ্মকে স্থির থাকতে হয়েছে নারদের কথায়, ব্যাসের কথায়।

এই সান্ত্বনার পরেও অম্বার প্রাত্যহিক গতিবিধির ওপর নজর রাখা অবশ্য বন্ধ হয়নি। কবে, কোথায়, কী খেয়ে অম্বা তপস্যা করে যাচ্ছেন ভীষ্ম তার খবর রাখেন। এর মধ্যে কুমার বিচিত্রবীর্যের দেহান্ত ঘটেছে, কিন্তু ভীষ্মর দিক থেকে অম্বার খবর নেওয়া বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে অম্বার এই ঘোর তপস্যাকালও নানা বাধা-বিঘ্ন এবং জটিলতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। ব্রহ্মর্ষিরা তাঁকে তপস্যা বন্ধ করার জন্যও অনুরোধ করেছেন। এই অবস্থায় অম্বার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আমাদের কাছে ভীষণ প্রনিধানযোগ্য হয়ে পড়ে। অম্বা ঋষিদের বলেছেন—ভীষ্মের

বধের জন্যই আমার যত উদ্যোগ, চেষ্টা। তাঁকে বধ করে তবেই আমার শান্তি হবে। অম্বা এর পরে বলেছেন—ভীষ্মের জন্যই আমি চিরকাল দুঃখিনী হয়ে রইলাম, তাঁর জন্যই আমার সারাজীবন স্বামী সুখ জুটল না কপালে, তাঁর জন্যই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম—আমি যেন স্ত্রীও নই, পুরুষও নই—পতিলোকাদ্ বিহীনা চ নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ। অতএব গাঙ্গেয় ভীষ্মকে শেষ না করে আমি ছাড়ব না।

মহাভারতের এক জটিল আখ্যায়িকা বোঝবার জন্য অম্বার এই মন্তব্যটি আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি যেন স্ত্রীও নই এবং পুরুষও নই—নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ—ভীষ্মের কারণে অম্বার এই পরিণতি আমাদের কাছে নতুন এক তথ্য সরবরাহ করে। আপনারা মানবেন—অন্তত এই পর্যায়েও অম্বা শিখণ্ডীতে রূপান্তরিত হননি। অম্বা শুধু নিজের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন মাত্র। ভীষ্ম একদিন তাঁকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন বলে তাঁর জীবনে যে বিপর্যয় এসেছে, তার ফলেই অম্বার এহেন অবস্থা—আমি যেন স্ত্রীও নই পুরুষও নই। অম্বা স্ত্রী নন, কেননা, স্বামীসুখ তাঁর কপালে জুটল না। আবার পুরুষও নন, কেননা একজন পুরুষ মানুষ স্বাধিকারে, ক্ষমতায়, বলে যা করতে পারে, অম্বা তা করতে পারছেন না। অম্বার নপুংসকত্ব এখানেই।

স্বামী-সুখ, সংসার-সুখ যে নারীর অপ্রাপ্ত রয়ে গেল, সে নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের স্বাধিকারটুকু চাইবে—এইটাই স্বাভাবিক। অম্বা নিজ মুখে তাই বলেছেন। বলেছেন—শুধুমাত্র পুরুষ মানুষ হওয়ার সুবিধে পেয়ে ভীষ্ম যেভাবে আমাকে অপমান করেছেন, তাতে নারী জন্মে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, আমি এখন পুরুষ হতে চাই—স্ত্রীভাবে পরিনির্বিণ্ণা পুংস্বার্থে কৃতনিশ্চয়া।

মহাভারতের উপাখ্যানে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে অম্বা এরপর মহাদেবের কাছে পুরুষ হবার বর পেয়েছেন, ওদিকে অপুত্রক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ওই একই মহাদেবের কাছে পুত্রলাভের বর পেলেন এবং তিনিও নাকি ভীষ্মের ওপর শত্রুতার শোধ নেবার জন্যই এই বর চেয়েছিলেন—ভগবন্ পুত্রমিচ্ছামি ভীষ্মং প্রতিচিকীর্ষয়া। ভীষ্মের ওপর পাঞ্চাল দ্রুপদের ক্ষোভ কেন হল, সে কথা পরে আসবে। আপাতত এইটুকু বলা যায় যে, দ্রুপদের পুত্রলাভেচ্ছা এবং অম্বার পুরুষত্বের ইচ্ছা, অপিচ উভয়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য মহাদেবের বর—এইসব কিছু মিলে শিখণ্ডীর জন্ম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল। এবারে আমাদের ভাবনায় আসি।

প্রথম কথা হল—মহাদেব দ্রুপদকে বর দিয়ে দিলেন—তোমার প্রথমে একটি কন্যা হবে এবং সেই ভবিষ্যতে পুরুষ হবে—কন্যা ভূত্বা পুমান্ ভাবী। কিন্তু দ্রুপদ-পত্নী যখন সন্তান লাভ করেন, তখন তিনি একটি পরম রূপবতী কন্যাই লাভ করেছিলেন—কন্যাং পরমরূপাঞ্চ প্রাজায়ত নরাধিপ। লক্ষণীয় ব্যাপার হল—মহাদেবের বর দ্রুপদ কিংবা দ্রুপদ-মহিষীর মনে কতটা ক্রিয়া করেছিল, জানি না, কিন্তু মহাভারতের কবি বলেছেন—দ্রুপদের বুদ্ধিমতী মহিষীটি নিজের মেয়েটিকে পুত্র বলে প্রচার করেছিলেন—দ্রুপদস্য মনস্বিনী/'খ্যাপয়ামাস...পুত্রো হ্যেনং মমেতি বৈ। অন্যদিকে দ্রুপদও তাঁর কন্যাটির সমস্ত স্বরূপ চেপে গিয়ে পুত্রের প্রাপ্য স্মার্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করালেন—প্রচ্ছন্নায়া নরাধিপ/পুত্রবৎ পুত্রকার্যাণি সর্বাণি সমকারয়ৎ। পুরুষের মতো তার একটা নামও রাখা হল—শিখণ্ডী।

আমাদের জিজ্ঞাসা, মহাদেবের বরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে দ্রুপদমহিষীর বুদ্ধিমত্তা এবং দ্রুপদের এত চাপাচাপি—কোনওটারই প্রশ্ন আসে কি না সন্দেহ—রক্ষণঞ্চৈব মন্ত্রস্য। নগরের

AMARBOI.COM

প্রত্যেকটি লোকের কাছে কন্যার স্বরূপ লুকিয়ে প্রচার করা হল—দ্রুপদ পুত্র লাভ করেছেন—ছাদয়ামাস তাং কন্যাং পুমানিতি চ সো'ব্রবীৎ। অন্যদিকে ভীষ্ম বলেছেন—আমি কিন্তু গুপ্তচরের বাক্য, নারদের সংবাদ এবং অম্বার তপস্যার কথা জেনে দ্রুপদের বাড়ির মেয়েটিকে মেয়ে বলেই জানতাম—অহমেকস্তু চারেণ বচনান্নারদস্য চ। জ্ঞাতবান্...।

আমাদের দ্বিতীয় ভাবনা হল—দ্রুপদ রাজা তাঁর মেয়েটির লোকশিক্ষা, শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা শেষ করে ধনুর্বেদ শেখার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেন—ইষ্বস্ত্রে চৈব রাজেন্দ্র দ্রোণশিষ্যো বভূব হ।

তাহলে দেখুন, দ্রুপদ-দম্পতি একটি মেয়েকে ছেলে বলে প্রচার করেছিলেন এবং দ্রোণাচার্যও একটি ছেলে-সাজা মেয়েকে অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এমনকি মেয়েকে ছেলে বলে প্রচারের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে দ্রুপদ দশার্ণ-রাজার মেয়েকে নিয়ে এসে বিয়েও দিয়েছেন শিখণ্ডীর সঙ্গে। এই বিয়ের ঘটনার পর থেকেই শিখণ্ডীর কাহিনীতে যত গণ্ডগোলের শুরু। দশার্ণ রাজার মেয়ে শিখণ্ডীকে পুরুষ না ভেবে শিখণ্ডিনী বলেই চিনল—হিরণ্যবর্মণঃ কন্যা জ্ঞাত্বা তাং তু শিখণ্ডিনীম্। দশার্ণপতি হিরণ্যবর্মা দ্রুপদের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার অভিযোগ আনলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবেন বলে ঠিক করলেন। দ্রুপদ রাজা বিপন্ন হয়ে আপন মহিষীকেও খানিকটা ভর্ৎসনা করলেন।

মহাভারতের কাহিনীতে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার আক্রমণ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ওপর নেমে আসবে এবং এই ভাবী আক্রমণের জন্য দ্রুপদ এবং তাঁর মহিষী দুঃখিত হয়ে আছেন—এই অবস্থায় শিখণ্ডিনী গৃহত্যাগ করে নিবিড় বনে উপস্থিত হলেন। বনের মধ্যে যক্ষ স্থূণাকর্ণের সঙ্গে শিখণ্ডিনীর দেখা হয়। চিন্তায় জর্জর, শুষ্ক-শীর্ণ শিখণ্ডিনীকে দেখে যক্ষ স্থূণাকর্ণ করুণায় বিগলিত হয়। সে প্রস্তাব করে—আমি তোমাকে কিছুকালের জন্য আমার পুংচিহ্ন দান করব, পরিবর্তে তোমার স্ত্রীচিহ্নও আমি সাময়িকভাবে ধারণ করব—কিঞ্চিৎ কালান্তরং দাস্যে পুংলিঙ্গং স্বমিদং তব।

মহাভারতের কালে লিঙ্গ পরিবর্তন করে লিঙ্গ প্রতিস্থাপনের কোনও শৈলী জানা ছিল—ঠিক এই রকম একটা দাবি অথবা অতীতের মাহাত্ম্য-খ্যাপন শুধুমাত্র মহাকাব্যের ভিত্তিতে করা উচিত হবে না হয়তো। আমাদের মতে মহাদেবের বর থেকে আরম্ভ করে দশার্ণ রাজার মেয়ের সঙ্গে শিখণ্ডিনীর বিবাহ এবং যক্ষ স্থূণাকর্ণের সঙ্গে লিঙ্গ-বিনিময় করে শিখণ্ডীর পুরুষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে অলৌকিকতা আছে, সেই অলৌকিকতা ছাড়াও লৌকিক এবং রাজনৈতিকভাবেই শিখণ্ডীর নিজস্ব সত্তা ব্যাখ্যা করা যায়।

আমরা আগে বলেছি—অম্বার সেই কথাটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলেছেন—আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। আমি যেন স্ত্রীও নই, পুরুষও নই—ন স্ত্রী ন পুমান্ ইহ। বস্তুত এই ভাবটুকুর মধ্যেই অম্বা কিংবা শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব লুকিয়ে আছে। দ্বিতীয়ত মনে রাখা দরকার—পাঞ্চাল হোত্রবাহন, যাঁকে আমরা অম্বার মাতামহের পরিচয়ে দেখেছি, তিনি এক সময় অম্বাকে কথা দিয়ে বলেছিলেন—তোমার কোনও চিন্তা নেই, তুমি আমার কাছেই থাকবে, আমি তোমার দুঃখ দূর করব—দুঃখং ছিন্দাম্যহং তে বৈ ময়ি বর্তস্ব পুত্রিকে। আমাদের ধারণা—পরশুরামের যুদ্ধ বিফল হয়ে যাবার পর সৃঞ্জয় হোত্রবাহন তাঁকে পাঞ্চালে নিয়ে গেছেন এবং তাঁকে পাঞ্চাল দ্রুপদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কারণ হোত্রবাহন নিজে পাঞ্চালের লোক এবং যে সৃঞ্জয় বংশে দ্রুপদের জন্ম সেই সৃঞ্জয়ের বংশে অম্বার মাতামহ হোত্রবাহনেরও জন্ম।

যদি বলেন—তাহলে অম্বার এত তপস্যা ভীষ্ম-বধের বর লাভ সবই কি মিথ্যা? আমরা এগুলিকে মিথ্যা বলছি না, তবে তর্কের বুদ্ধিতে জানাই অম্বার পুরুষত্ব লাভের ইচ্ছা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আসলে অম্বার পুরুষত্বের পর্যবসান পুংলিঙ্গলাভে নয়, পুরুষের যোগ্য বিদ্যা লাভে। যে রমণী 'পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা'র গান করে পরবর্তী সময়ে অর্জুনের মন ভোলাবেন, সেই চিত্রাঙ্গদার উদাহরণে যথেষ্টই ধারণা করা যেতে পারে—অম্বার তপস্যা পুরুষ-সুলভ অস্ত্রশিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনও সন্দেহ নেই—অপুত্রক দ্রুপদ যখন অম্বাকে লাভ করলেন তখন তিনি তাঁর অস্ত্রশিক্ষার তপস্যা সুচরিতার্থ করবার জন্য তাঁকে পুরুষ বলেই প্রচার করেছেন। মহাভারতের বচনে জেনেছি—অম্বা তপস্যার অন্তে মহাদেবের বর লাভ করে নিজে আগুন জ্বেলে তাতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তারপর নাকি তিনি দ্রুপদের ছেলে হয়ে জন্মান। আমাদের বিশ্বাসে—এই আত্মাহুতি অম্বার স্ত্রী স্বভাবের অন্ত সূচনা করে। এরপর থেকেই তিনি পুরুষ-সুলভ আচরণ করতে থাকেন এবং পূর্বকথিত হোত্রবাহনের চেষ্টায় পাঞ্চালে দ্রুপদের কাছে পুরুষের মতোই মানুষ হতে থাকেন। ভীষ্মও আপ্তপুরুষের মাধ্যমে খবর পেয়েছেন—শিখণ্ডী আসলে কন্যা। মাঝখানে দশার্ণ রাজার কাহিনী এবং স্থূণাকর্ণের সঙ্গে শিখণ্ডিনী অম্বার লিঙ্গ-বিনিময়ের প্রস্তাব মহাকাব্যের এক চরিত্রের বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে মাত্র।

আরও একটা কথা—দ্রুপদ যখন শিখণ্ডীকে লাভ করেন, তখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে তাঁর রাজ্যভাগ নিয়ে গণ্ডগোল সম্পূর্ণ মেটেনি। কিন্তু দ্রোণাচার্য যে দ্রুপদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই কুরুরাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন, সে কথা তিনি অবশ্যই জানতেন। পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে দ্রোণাচার্য অর্জুনের মাধ্যমে দ্রুপদকে উচিত শিক্ষা দেন। প্রতিশোধ-স্পৃহায় দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাভ করেন দ্রোণ বধের জন্য। কিন্তু দ্রোণ বধের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে জেনেও দ্রোণ তাঁকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হননি। ভীষ্ম নিজে বলেছেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পাণ্ডব-কৌরবদের সঙ্গে শিখণ্ডী দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং এই শিখণ্ডী পূর্বে ছিল স্ত্রী—শিখণ্ডিনং মহারাজ পুত্রং স্ত্রীপূর্বিনং তথা।

দ্রোণাচার্যের ওপর দ্রুপদের যে রাগ ছিল, সেই রাগ ভীষ্মের ওপরেও গিয়ে পড়েছিল দ্রোণাচার্যের কারণেই। কারণ একটাই। দ্রুপদের কাছে দ্রোণাচার্য প্রত্যাখ্যাত হবার পর ভীষ্ম পরম গৌরবে দ্রোণাচার্যকে আশ্রয় দিয়েছিলেন হস্তিনাপুরে। কাজেই দ্রুপদ যখন দেখলেন—একটি রমণী পুরুষের যোগ্য অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে ভীষ্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন সেই রমণীর ইচ্ছামতো তাঁকে পুরুষ হিসেবে প্রচার করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ভীষ্ম যে ক্ষত্রিয়বীরের ধর্ম অতিক্রম করে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলবেন না বা অস্ত্রসন্ধান করবেন না—এটা দ্রুপদের ভালই জানা ছিল এবং জানা ছিল বলেই শিখণ্ডীকে পুরুষ হিসেবে তিনি যতই প্রচার করুন, তিনি যে আদতে স্ত্রীলোক—এই খবরটাও তিনি পরে কখনও লুকোননি। দ্রুপদ চেয়েছিলেন অস্ত্রের সুশিক্ষায় পুরুষের সুবিধে শিখণ্ডী যতটুকু পাচ্ছে পাক, উপরন্তু ভীষ্মবধের সময় স্ত্রীত্বের সুবিধেটুকুও সে পাবে।

শিখণ্ডী যে আদতে স্ত্রী—সে কথা ভীষ্ম যেমন তাঁর নিযুক্ত বিশ্বস্ত চরদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ জানতেন—মম ত্বেতচ্চারা স্তাত...যে মুক্তা দ্রুপদে ময়া—তেমনই তিনি যে স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ সেজে থাকেন সে কথাও ভীষ্মের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়।

আমি কোনও স্ত্রীলোক বা নপুংসকের গায়ে অস্ত্র-সন্ধান করি না—এই বীরমানিতাই

যেখানে ভীষ্মের পক্ষে যথেষ্ট ছিল সেখানে মহাকাব্যের উপাখ্যান-শৈলী ঠিক রাখার জন্যই যেন ভীষ্মকে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের সময় অন্তত চারটে বিকল্পের কথা বলতে হয়েছে। ভীষ্ম দুর্যোধনকে উদ্যোগপর্বে বলেছেন—আমার এই নিয়ম আমি কোনও স্ত্রীলোক, কোনও পুরুষ যে আগে স্ত্রী ছিল, যে পুরুষকে কোনও স্ত্রীর নামে ডাকা হয় এবং যে স্ত্রী পুরুষের মতো সাজে, তার প্রতি আমি বাণ নিক্ষেপ করি না—স্ত্রিয়াং স্ত্রীপূর্বকে চৈব স্ত্রীনাম্নি স্ত্রীস্বরূপিণি। এই কারণে আমি শিখণ্ডীকে মারতে পারি না। এই হল ভীষ্মের চতুর্বিকল্পক প্রতিজ্ঞা।

লক্ষ্য করে দেখবেন—ভীষ্মের এই চারটে বিকল্পের মধ্যেই অম্বা থেকে শিখণ্ডীর পরিণতি বিধৃত আছে। অম্বা আদতে স্ত্রী—তিনি কাশীরাজের কন্যা—জ্যেষ্ঠা কাশীপতেঃ কন্যা অম্বা নামেতি বিশ্রুতা। তিনি দ্রুপদের ঘরে এসে শিখণ্ডী নামে পরিচিত হলেন—যাঁকে মহাকাব্যের কল্পনায় দ্রুপদের ঘরে জন্মালেন বলা যায়—দ্রুপদস্য কুলে জাতা শিখণ্ডী ভারতর্ষভ। এই গেল দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ সে আগে স্ত্রী ছিল, এখন পুরুষ হয়েছে—স্ত্রীপূর্বকে চৈব। তৃতীয় বিকল্প—ভীষ্ম এমন পুরুষের গায়ে বাণ নিক্ষেপ করেন না, যার একটি স্ত্রী-নাম আছে। স্ত্রী-নামটি অম্বা। এবার চতুর্থ বিকল্প যেটাকে আমরা সবচেয়ে সত্য বলে মনে করি, সেটা হল—স্ত্রীস্বরূপিণি—অর্থাৎ ভীষ্ম এমন কোনও মানুষের প্রতি অস্ত্র-সন্ধান করেন না, যিনি আদতে স্ত্রী কিন্তু পুরুষের মতো সাজেন। ইনিই শিখণ্ডী, যিনি স্বরূপত একটি স্ত্রী, অর্থাৎ অম্বা।

শিখণ্ডী যদি পুরুষের মতো না সাজতেন, তাহলে ভীষ্মকে এত বিকল্পের সন্ধান করতে হত না। শুধুমাত্র স্ত্রীলোক অথবা নপুংসকের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করি না, এইটুকু বললেই চলত। কিন্তু শিখণ্ডীই যেহেতু অম্বা তাই ভীষ্মকে স্ত্রী-নাম এবং স্ত্রীস্বরূপ পুরুষের বিকল্প-দুটি জুড়তে হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখব—ভীষ্ম অনেক সময়েই শিখণ্ডীকে নপুংসক না বলে, শুধুমাত্র স্ত্রী হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। বস্তুত শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব লিঙ্গকেন্দ্রিক নয়, এই নপুংসকত্ব স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুরুষ স্বভাবের মিশ্রচারিতা। শিখণ্ডী স্ত্রীলোকই, যিনি ক্ষত্রিয় পুরুষের ব্যবহার অঙ্গীকার করেছেন মাত্র। শিখণ্ডী পুরুষের সাজে অস্ত্র-শস্ত্রে সুশিক্ষিত এক মহিলা।

তেষট্টি

মথুরার রাজা উগ্রসেন যখন কারাগারে বন্দি হয়ে আছেন, কংস যখন আপন অত্যাচারে সমস্ত মথুরাপুরীর প্রজাদের উত্যক্ত করে তুলেছেন, ঠিক এইরকম একটা সময়ে উগ্রসেনের সহোদর দেবক মহামতি বসুদেবের সঙ্গে নিজের সাত মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। সাত মেয়ের মধ্যে দেবকীই জ্যেষ্ঠা না কনিষ্ঠা—তা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। যতদূর মনে হয় তাতে দেবকীই জ্যেষ্ঠা হয়তো, কারণ একসঙ্গে সাতটি মেয়ের বিয়ে হলে বিবাহের বিধিসম্মত স্মার্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সাধারণত জ্যেষ্ঠার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। দেবকীর সঙ্গেও তাই হয়েছে। অন্যদের ক্ষেত্রে পাণিগ্রহণ বা সপ্তপদী গমনের মতো সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। হয়তো অন্যদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানই হয়েছে।

যাই হোক দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হলে কংস মোটামুটি খুশিই হলেন। পিতৃব্যের এই কন্যাটিকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন। অপিচ তাঁর খুশির কারণ আরও একটা ছিল। বসুদেব কংসের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী। কংসের কাজকর্মে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। অতএব এই বিক্ষুব্ধ তরুণ মন্ত্রীর সঙ্গে যদি কংসের ঘরের মেয়ের বিয়ে হয়, তবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাঁর সুবিধে হবে—এই ছিল কংসের ধারণা।

বসুদেব-দেবকীর বিবাহ-প্রসঙ্গে অবতরণ করার আগেই জানাই—অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের মধ্যে এই বিবাহ-প্রসঙ্গ কোথাও নেই। মহাভারতের মধ্যে শত-শতবার কৃষ্ণকে 'বাসুদেব', 'বসুদেবপুত্র' বা 'দেবকীনন্দন' বলে ডাকা হলেও তাঁর জন্ম-কাহিনী বা বাল্য-বয়সের কথা মোটেই উল্লিখিত হয়নি। আরও আশ্চর্য হল—এ বিষয়ে মহা-মহাপণ্ডিতদের তর্ক-যুক্তির ধারা মাঝে মাঝে এতই অযৌক্তিক রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যে, আমরাও খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়ি। মহাভারতের মধ্যে রাজনীতি-ধুরন্ধর এক পাকাপোক্ত কৃষ্ণকে দেখে, অনেক পণ্ডিত

ব্যক্তিই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বৃন্দাবনের রাখাল কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ এক ব্যক্তি নন। সুযোগ বুঝে আরও পাণ্ডিত্য দেখিয়ে অন্য পণ্ডিতেরা আবার বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ এবং দ্বারকার কৃষ্ণ নামক তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এঁদের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ মূলচ্ছেদী এবং অনেকাংশেই সাহেবদের উচ্ছিষ্ট-শেষমাত্র।

কৃষ্ণের কথায় পরে আসব। আপাতত শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, মহাভারতে যেহেতু পাণ্ডব-কৌরবদের জ্ঞাতিবিরোধের ঘটনাই প্রধানত স্থান পেয়েছে, তাই কৃষ্ণের জন্ম বা বাল্য-বয়সের কথা সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। মহাভারতের কবি যেহেতু মহাকাব্যের কবি তাই কথ্যমান বিষয়ে অনেক অপরিচিত উপাখ্যানই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে, কিন্তু কৃষ্ণের বাল্য-পৌগণ্ড সেখানে কোনওভাবেই প্রাসঙ্গিক ছিল না। অতএব তিনি তা লেখেনওনি। কিন্তু পণ্ডিতদের বোঝা উচিত—মহাভারতের মধ্যে যে মানুষটির সার্বত্রিক উপস্থিতি তাঁকে ভগবত্তায় উপনীত করেছে, তাঁর জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং প্রথম যৌবনও যে যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হবে সে কথা সহজেই অনুমেয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা তাই পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে, কৃষ্ণের পূর্বজীবন আমাদের খুঁজে বার করতে হবে আমাদের পুরাণগুলি থেকেই। কারণ পুরাণগুলিই ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রতিম।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—সাহেব-সুবোদের নানা ঢক্কা-নিনাদ এবং তদুচ্ছিষ্টভোগী ঢাকের কাঠি স্বরূপ কতগুলি বাঙালি-সাহেবের একতান করতাল-ধ্বনি শুনে খুব একটা বিচলিত হবার যুক্তি নেই। এর কারণ এই নয় যে, তাঁরা জ্ঞানী-গুণী নন। বরঞ্চ কারণ এই যে তাঁরা জ্ঞানী-গুণী হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ইতিহাসের একান্ত সহজ ধারা পরিহার করে বৈদেশিক বিচার-বিশ্লেষণের বিচিত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে সহজ বস্তুকে অনর্থক জটিল করে তোলেন। যেহেতু ভারতবর্ষের একান্ত আপন শাস্ত্রীয় ইতিহাসের পরম্পরা মোহমুক্তভাবেই বোঝবার চেষ্টা করা যায়, তাই কৃষ্ণের জীবন তথা চরিত্র ব্যাখ্যায় দেশজ বিচারশৈলী প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

কোনও সন্দেহ নেই—আমাদের পৌরাণিকেরা গল্প করতেন বেশি, তথ্য দিতেন কম। কিন্তু তাতে আমাদের অসুবিধে কী? কারণ, সে গল্প তো আমাদের ঠাকুরদাদা-ঠাকুমার মতোই। আমার জন্ম-সনের খবর দিতে গেলে তাঁরা আগে বলবেন—সেবারে ছিল অতি বৃষ্টির বছর, লোকজন বন্যায় মারা যাচ্ছে, ঠাকুর-দালানের পিছনের আম গাছটা সেইবার ভাঙল, যদু গোস্বামীর মেজ মেয়ে সেইবার জন্মাল, আর ঠিক তার পরের সনের ওই তারিখেই তোর জন্ম হল। তাহলে দেখুন—আমার জন্মের খবর জানতে হলে আমার ঠাকুমার মুখে যদু গোস্বামীর মেয়ে থেকে আরম্ভ করে আম্র বৃক্ষের পতন পর্যন্ত—তাও এক বছর আগের ঘটনা—সব আপনাকে জানতে হবে। মহাভারতের কৃষ্ণের আদ্যিকাল জানতে হলেও, আপনাকে তাই পুরাণ, হরিবংশ, সংস্কৃত নাটক, দর্শন, উপনিষদ—সব জানতে হবে; আর এই জানাটা ঠিক হলে মহাভারতের সূত্রধার রাজনীতির ধুরন্ধর ব্যক্তিটিকেও আপনি সঠিক বুঝতে পারবেন। মহাভারতের কৃষ্ণের জন্য কোনও উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বাল্য-পৌগণ্ডহীন এক নতুন কৃষ্ণের উৎপাদন করতে হবে না।

যাঁরা বলেন 'গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার'—তাঁদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা খুব সহৃদয়তা বোধ করছি না, কারণ ভাগবত পুরাণে বসুদেব-দেবকীর বিবাহের মধ্যে অতিকথন কিছু আছে, অলৌকিকতাও কিছু আছে। তা ছাড়া পণ্ডিতদের মতে পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত পুরাণের বয়স বড় অল্প। ভাগবত-পুরাণে বসুদেব-দেবকী এবং কৃষ্ণের কথাতেও তাই

amarboi.com

অল্প-বয়সী রোম্যান্টিকের হৃদয়-স্পর্শ আছে। সে অতি মধুর, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু অতি-মধুরতা অনেক সময় অন্যান্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রতিহত করে, ভাগবত পুরাণেও তাই ঘটেছে। সুমধুর পায়সান্নর প্রকৃত আস্বাদ পেতে গেলে যেরকম ঘনীভূত দুগ্ধের আস্বাদও প্রয়োজন, শর্করার আস্বাদও প্রয়োজন এবং ক্ষুদ্র এলাচী-চূর্ণের আস্বাদও প্রয়োজন, তেমনই কৃষ্ণ জীবনের প্রকৃত আস্বাদ পেতে হলে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত এবং অবশ্যই এলাচী-চূর্ণের সুবাসের মতো ভাগবত পুরাণেরও প্রয়োজন। সব কিছু মিলিয়েই আমাদের কৃষ্ণ-জীবনের আস্বাদ-যোগ্যতা উপভোগ করতে হবে। একটা ঘটনা বলি।

চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামী ললিতমাধব নামে কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত একটি নাটক লিখেছিলেন। নাটকের আরম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে রূপ গোস্বামী চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ যাচনা করে একটি শ্লোক রচনা করেন। ঘটনা হল—কৃষ্ণলীলাময় এই নাটকখানি কেমন হয়েছে সেটা শোনানোর জন্য রূপ পুরীতে আসেন মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভুর সামনে নাটক পড়বার সময় মহাপ্রভুর অন্যতম জীবন-সঙ্গী রায় রামানন্দও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে কবি এবং অত্যন্ত রসিক ভক্ত। ললিতমাধব নাটকের আরম্ভশ্লোক নান্দী-পাঠ সেরেই রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রশংসাসূচক শ্লোকখানি পড়লেন। মহাপ্রভু রূপের ভক্তিতে খুশি হলেও তৃণাদপি সুনীচের নম্রতায় খানিকটা লজ্জিতও হলেন। সামান্য কপট কোপ প্রকাশ করে রূপের উদ্দেশে তিনি বললেন—

> কাঁহা তোমার কৃষ্ণ-রস-কাব্য-সুধাসিন্ধু
> তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষার-বিন্দু।।

রায় রামানন্দ প্রভুর এই রোষাভাস মেনে নিলেন না। বরঞ্চ রূপের প্রশংসা করে তাঁর শ্লোকের যৌক্তিকতা মেনে নিলেন। কবিরাজের ভাষায়—

> রায় কহে—রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
> তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।।

ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণ-জীবন এবং চরিত্র-বর্ণনায় সর্বত্র এই কর্পূরের সুবাস ছড়ানো আছে। অমৃতপূর বর্ণনার মধ্যে এই কর্পূরের সুবাস নিঃসন্দেহে এই পুরাণের পাঠ এবং শ্রবণযোগ্যতা অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে, কিন্তু তাতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের বড় জ্বালা হয়েছে। সে এই মহাপুরাণের অপূর্ব আস্বাদকে নিছক কাব্য-ভ্রমি বলে উড়িয়েও দিতে পারে না, আবার তথ্য-বর্ণনার সময় একে একেবারে বাদ দিতেও পারে না। বাদ দিতে পারে না, কারণ প্রাচীন পুরাণগুলির মূল তথ্যের সঙ্গে ভাগবত পুরাণের তথ্যের মিল আছে, তবে হ্যাঁ, তার সঙ্গে কর্পূরের সুবাসটুকু আমাদের উপরি পাওনা।

ভাগবত পুরাণের সূত্র ধরেই যদি আরম্ভ করি, তাহলে দেখব—আরম্ভটা বড়ই নাটকীয়। বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিয়ে হয়েছে এবং আদরের বোন খুশি হবেন বলেই মথুরাধিপতি কংস স্বয়ং দেবকীকে রথে করে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেবেন বলে ঠিক করেছেন—উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। ঘোড়ার লাগাম কংসের হাতে, আর মথুরার রাজা স্বয়ং আজ বসুদেব-দেবকীর রথের সারথি হয়েছেন বলে তাঁর অনুগামী সমস্ত রাজারা, অভিজাত ব্যক্তিরা রথে চড়ে, হাতি-ঘোড়া-পালকির পংক্তি সাজিয়ে কংসের পিছন পিছন চললেন—রৌক্মৈ রথদশতৈর্বৃতঃ। বাড়ির মেয়ে-বউরা শঙ্খ বাজিয়ে যাত্রা-মঙ্গল সূচনা করলেন, বাদ্যিকরেরা বাদ্যি বাজাতে লাগল। কংস চললেন বসুদেব-দেবকীকে নিয়ে—প্রয়াণপ্রক্রমে তস্য বরবধ্বোঃ

amarboi.com

সুমঙ্গলম্। এমন সময় সেই বহুকথিত, বহুশ্রুত দৈববাণী হল—ওরে বোকা! তুই যাকে এই রথ সাজিয়ে আদর করে নিয়ে যাচ্ছিস, এই রমণীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোকে হত্যা করবে।

ভাগবত পুরাণের এই বর্ণনার সঙ্গে প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনার কোনও তফাৎ নেই। দৈববাণীর কথা সেখানেও আছে। যাঁরা দৈববাণী, বরদান এবং অভিশাপের তাৎপর্যে বিশ্বাস করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মানবেন যে কংসের কাল ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু দৈববাণী, আকাশবাণীতে যাঁদের বিশ্বাস নেই, তাঁরা মনে করেন—ঘটনা ঘটার পর কবি—পৌরাণিকেরা দৈববাণী, অভিশাপ অথবা বরদানকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে বিশিষ্ট বর্ণনায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। আমরা অবশ্য কংসের নিদারুণ অত্যাচারের নিরিখে দৈববাণীর চেয়ে সাধারণ মানুষের অপ্রীতি বা জনরোষকেই প্রধান বলে গণ্য করি। মথুরার জনগণ বসুদেবকে কংসের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সবচেয়ে সোচ্চার নেতা হিসেবে জানত এবং বিশ্বাসও করত যে, কোনও না কোনও দিন এই মানুষটির তরফ থেকেই কংসের বিপন্নতা তৈরি হবে। সেই নেতৃস্বরূপ বসুদেবকে কংস নিজে রথে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন দেখে প্রেক্ষক জনগণ স্থির থাকতে পারেনি। তারাই হয়তো কেউ চেঁচিয়ে বলেছে—ব্যাটা বোকা পাঁঠা! যাকে তুই বয়ে নিয়ে যাচ্ছিস, ওর ছেলেই তোর সর্বনাশ করবে একদিন—সংস্কৃতে এই পংক্তির পৌরাণিক চেহারা দাঁড়াবে এইরকম—

যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভর্ত্রা: রথে স্থিতাম্।
অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি।।

দেববাণীই হোক অথবা জনবাণীই হোক, কথাটা শোনামাত্রই মথুরাধিপতি কংসের সম্মানে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবকীর চুলের মুঠিটা চেপে ধরলেন বাঁ হাতে। ডান হাতে খড়্গ। তাঁর ইচ্ছে দেবকীকে এই মুহূর্তে মেরে ফেলবেন তিনি—ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচে'গ্রহীৎ।

স্বাভাবিকভাবেই দেবকী খানিকটা হতচকিত হয়ে গেলেন। এই তিনি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। স্বামীর সঙ্গে এখনও তাঁর ভাল করে পরিচয়ই হয়নি। সেই অবস্থায় স্বামীর সামনে তাঁর ভাই তাঁকে চুলের মুঠি ধরে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছেন—এ হেন অবস্থায় তাঁর বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেল। বসুদেব কিন্তু একটুও ভেঙে পড়লেন না। কংসকে তিনি চেনেন। বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য যখন হয়, তখন বিরোধী নেতা হিসেবে অনেকবারই কংসের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়েছে। কিন্তু এই সদ্য-বিবাহের পর একটি রমণী যখন তাঁর ভাগ্যের অর্ধভাগিনী হয়ে আছেন, তখন বসুদেবের পক্ষে গলা চড়িয়ে কোনও কথা বলা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কৌশল হিসেবে নিকৃষ্ট লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রথমে মধুর ভাষণই শ্রেয় মনে করেন বসুদেব।

বসুদেব কংসকে একটু তৈলসিক্ত করে বললেন—আপনি হলেন ভোজ-বংশের অলঙ্কার। পৃথিবীর সমস্ত বীরপুরুষ আপনার গুণের প্রশংসা করেন সব সময়। আর সেই আপনি এত গুণী মানুষ হয়েও, এত বড় বীর হওয়া সত্ত্বেও আপনি কিনা এক অবলা রমণীকে বধ করার জন্য উদ্যত হয়েছেন? আর সবচেয়ে বড় কথা, এই অবলা রমণী আপনার বোন। তার ওপরে আজই তার বিয়ে হয়েছে,— স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বনি?

ভাগবত-পুরাণে বসুদেবের মুখে এই প্রশংসা-বাক্যের পরে অনেক দার্শনিক কথাবার্তা শোনা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে কংসের প্রতি এই দার্শনিক উপদেশ খুব যুক্তিযুক্ত নয় বোধহয়। আমাদের যুক্তিতে ওইটুকু সেই কর্পূরের সুবাস এবং এই সুবাসে কংসের মনও সুবাসিত হয়নি—ন নিবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ। বিষ্ণু পুরাণে বসুদেব কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব ভাবেই কোনও দার্শনিকতার মধ্যে যাননি। কংস খড়্গ তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন—এইভাবে

AMARBOI.COM

দেবকীকে মেরো না কংস। এর গর্ভে যত পুত্র জন্মাবে, তাদের জন্মলগ্নেই আমি তোমার হাতে তুলে দেব—সমর্পয়িষ্যে সকলান্ গর্ভানস্যোদরোদ্ভবান।

ভাগবত-পুরাণে এই শেষ কথাটা বলার আগে বসুদেবের মনে সামান্য যুক্তি-তর্ক আছে। বসুদেব সেখানে ভাবছেন—ছেলেপিলে তো পরের ভাবনা। মাথায় যতক্ষণ বুদ্ধি আছে ততক্ষণ ওই বুদ্ধি দিয়েই দেবকীর মৃত্যুটা আগে ঠেকাতে হবে—মৃত্যু-র্বুদ্ধিমতাপোহ্য যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্। অতএব পুত্রের মৃত্যু মৌখিকভাবে স্বীকার করে নিয়েই আগে এই বেচারা দেবকীকে বাঁচাতে হবে—প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্। তাছাড়া—বসুদেব আরও ভাবলেন—ছেলে যদি আমার হয়ই এবং কংসও যদি তার মধ্যে না মরে যায়, তবে সে কি কংসের কিছুই করতে পারবে না? আর অদৃষ্টের ফের, ভবিষ্যতে কীই বা না হতে পারে—বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্ গতি র্ধাতুর্দুরত্যয়া?

আমরা জানি, ভাগবত-পুরাণে বসুদেবের এই ভাবনাগুলি মিথ্যা নয়। কিন্তু বিপন্ন মুহূর্তে এই ভাবনাগুলি এক লহমার মধ্যে মস্তিষ্কের কোষে ক্রিয়া করে যায় এবং সিদ্ধান্তটাও নিঃসৃত হয় এক লহমার মধ্যেই—তোমার কিছু ভয় নেই কংস—ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য—আকাশবাণী থেকে তোমার কোনও ভয় নেই। আমার যে ছেলেদের কাছ থেকে তোমার এত ভয়, সেই ছেলেদের তোমার হাতেই তুলে দেব, ভাই—পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে'স্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্।

বসুদেবের কথার একটা অন্য মূল্য ছিল—সেটা এক কথা। আর বসুদেবের কথায় যুক্তি ছিল—সেটা আরেক কথা। ভাগবত-পুরাণ বসুদেবের ভাবনা-চিন্তা, যুক্তি-তর্কের বিবরণ দিয়েছে। অতএব কংস সেখানে তাঁর বাক্যের যৌক্তিকতা মেনে নিলেন— কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ। আর আমরা যেহেতু বসুদেবকে বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা মনে করি এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণগুলিতে যেহেতু এই নেতৃত্বের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাব, তাই বিষ্ণু পুরাণের বক্তব্য মেনে নিয়ে বলি—বসুদেবের মতো এক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কথা দিলেন বলেই কংস তাঁর কথা মেনে নিলেন। কংস দেবকীকে মারলেন না—ন ঘাতয়ামাস চ তাং দেবকীং তস্য গৌরবাৎ।

ভগবত-পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশ—সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে—কৃষ্ণ জন্মাবার আগে কংসের অত্যাচার-পীড়িতা ধরণী বিষ্ণুর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ভগবান নিজে মানুষরূপে অবতার গ্রহণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। বসুদেব এবং দেবকীর পূর্ব-তপস্যা ছিল এবং তাঁরা পরম ঈশ্বরকে পুত্ররূপে পেতে চেয়েছিলেন। ভগবানের দিক থেকেও এবার সুযোগ এল দেবকীর গর্ভে জন্ম নিয়ে মনুষ্য-লীলার অভিলাষ পূরণ করার।

তবে এ সবই ধর্মের কথা। কৃষ্ণের ভাগবত্তায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা এইরকম একটা বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করতেই পারেন, তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কৃষ্ণের জীবনকে যদি লৌকিক দৃষ্টিতেও দেখা যায়, তবেও কিন্তু কোনও সন্দেহের কারণই নেই, যে কৃষ্ণের জন্ম হবে দেবকীর গর্ভেই, কারণ তাঁর জন্মের পরেই আমরা সঠিক জেনেছি যে, কৃষ্ণ দেবকীরই পুত্র। যাইহোক সে জন্মের কথা পরে আসবে, আগে দেখতে হবে—বসুদেব-দেবকী এখন কী অবস্থায় আছেন।

দেবকীর পক্ষে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর সম্ভব হয়নি। তবে কারাগারের মধ্যে তাঁদের দুজনকেই কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা যেতেই পারে। ভাগবত-পুরাণে দেখা যায়—দেবকীর প্রথম পুত্রটি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞাত বাক্য স্মরণ করে সেই শিশু সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দেন। তাঁর মনে কষ্ট

amarboi.com

ছিল—অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ—তবুও বসুদেব আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত রইলেন। কংসও তাঁর এই ব্যবহার দেখে খুশি হয়ে বললেন—তোমার এই ছেলেটাকে ফিরিয়েই নিয়ে যাও, বসুদেব! এর থেকে আমার ভয় নেই কোনও—প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্। তোমার সেই অষ্টম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হোক, তখন দেখা যাবে। ভাগবত-পুরাণে এই ঘটনার পরেই কংসের সভায় দেবর্ষি নারদের আগমন হচ্ছে। নারদ কংসকে বোঝালেন—বসুদেব-দেবকী, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বৃন্দাবনে বসুদেবের বন্ধুবর্গ—এঁরা সবাই প্রায় দেবতা—সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়াঃ। কাজেই সাবধানে থেকো। স্বয়ং ভগবান যে কংসের মৃত্যু ঘটিয়ে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবেন—এই চরম কথাটাও বলতে নারদ ভুললেন না।

নারদ এইসব কটু-তিক্ত কাহিনী শুনিয়ে চলে যেতেই কংস বসুদেবের কাছ থেকে তাঁর প্রথমজন্মা পুত্রটিকে চেয়ে নিলেন নির্মম শত্রুতায়। পাষাণে আঘাত করে মেরে ফেললেন বসুদেবের পুত্রটিকে। বিষ্ণু-পুরাণে এবং হরিবংশে অবশ্য নারদ বসুদেবের কোনও পুত্র হওয়ার আগেই কংসকে বসুদেবের পুত্রগুলি থেকে সাবধানে থাকতে বলেছেন। ওই পুত্রদের ভগবত্তা খ্যাপনও বাদ যায়নি। নারদের কাছ থেকে বসুদেবের পুত্রদের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরেই নাকি দেবকী-বসুদেবকে লোহার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় এবং ভাগবতের পৌরাণিক এইরকমই বর্ণনা দিতে পছন্দ করেছেন—দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে। বিষ্ণুপুরাণে অবশ্য বসুদেবকে একটি গুপ্ত গৃহের মধ্যে অন্তরীণ রাখা হয়েছে এবং বসুদেবের ব্যক্তিত্বের নিরিখে আমরাও বসুদেবের এই নজরবন্দী অবস্থাটুকুই বিশ্বাস করতে ভালবাসি। তার কারণ পরে বলব—দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ।

একটি করে দেবকীর পুত্র জন্মায়, আর বসুদেব তাকে দিয়ে আসেন কংসের হাতে। কংস তাঁকে পাষাণে আছড়ে মারেন, বসুদেব দেখেন, অথবা শব্দ পান, অথবা উপলব্ধি করেন এই নৃশংস হত্যা। সামগ্রিকভাবেই কংসের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল, কারণ তাঁর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসছে। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁকে হত্যা করবে—এই দৈববাণী মিথ্যে করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন কংস।

দেবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তানটির সম্বন্ধে সমস্ত পুরাণেই প্রচুর অলৌকিকতা আছে। সপ্তম গর্ভের সম্ভাবনা-মাত্রই পরম ঈশ্বর বিষ্ণু যোগমায়া দেবীকে আদেশ করেন—দেবকীর সপ্তম গর্ভটি আকর্ষণ করে বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী পুরু-ভরত বংশের মেয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করতে—তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়। ভগবান স্বয়ং যোগমায়াকেও নির্দেশ দিলেন বসুদেবের পরম বন্ধু নন্দপত্নী যশোমতীর উদরে প্রবেশ করতে।

যোগমায়া মহাবিষ্ণুর আদেশমতো দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে পৌরবী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। কংসের অনুচরেরা, যারা বসুদেব-দেবকীকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা দেবকীর পূর্বদৃষ্ট গর্ভলক্ষণ নিশ্চিহ্ন হতে দেখে কংসের কাছে গিয়ে খবর দিল—দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে—অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুসুঃ। গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করা হয়েছিল বলে রোহিণীর পুত্রের অন্য নাম সঙ্কর্ষণ। বৃন্দাবনে অবশ্য তাঁর ডাক নাম চালু হল বলদেব, বলভদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞায়।

amarboi.com

চৌষট্টি

হস্তিনাপুরে প্রতিষ্ঠিত পুরু-ভরত-কুরু-বংশের অঙ্কুর রীতিমতো বড় হয়ে ফুল-ফল না ফলিয়েই অকালে ঝড়ে পড়ল। কুমার বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। এই মৃত্যুতে যিনি সবচেয়ে বেশি সঙ্কটে পড়লেন, তিনি হলেন মহামতি ভীষ্ম। স্বামীর মৃত্যুতে আরও যে দুইজন বিপন্না মহিলার নাম এখানে করতেই হবে, সেই অম্বিকা ও অম্বালিকা ছাড়াও তৃতীয় যে প্রৌঢ়া রমণীটি মনে মনে বিপর্যস্ত হলেন, তিনি মনস্বিনী সত্যবতী। তবে যেহেতু তিনি অন্য কোনও সাধারণ রমণী নন, তিনি যেহেতু সত্যবতী, তার যৌবনস্থিত পুত্রের অকালমৃত্যুতেও তিনি একটুও ভেঙে পড়লেন না।

আসলে ছোটবেলা থেকে সত্যবতী যে সব ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন— সেই কৈবর্তপল্লীতে মানুষ হওয়া থেকে আরম্ভ করে মহামুনি পরাশরের সঙ্গে তাঁর অনৈসর্গিক মিলন, শান্তনুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ, প্রথম পুত্রের মৃত্যু, দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু—এই সমস্ত সুখ-দুঃখের ঘটনা-পরম্পরা এবং ঘটনার বৈচিত্র্য সত্যবতীর স্নায়ুশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ওপরে ছিল মহামতি ভীষ্মের মতো এক বিশাল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন 'ইনটার‍্যাক্‌শন', যা তাঁকে হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে এক লৌহময়ী প্রতিমার মতো দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছে। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় অন্তর্দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে যে, বহিরঙ্গ রাজ্য-শাসনের সমস্ত ব্যাপারে ভীষ্ম তাঁর সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস চালালেও হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির মধ্যে সত্যবতীই ছিলেন সর্বেসর্বা। বিশেষত রাজবাড়ির সঙ্কটগুলিতে সত্যবতীর ভূমিকা ছিল যে কোনও রাজনীতি-সচেতন প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনেতার মতোই।

শুধু নিজের ক্ষমতা জাহির করা নয়, হস্তিনাপুরের জনসাধারণের প্রয়োজনে এই রাজবংশের পূর্বাবদান স্মরণ করেই সত্যবতী চিন্তিত হলেন। রাজতন্ত্রের অনুশাসনে যে

প্রজাদের দিন চলে, তাঁরা বংশজ শাসনেই বিশ্বাস করেন। বিশেষত যে রাজা প্রজারঞ্জনের ক্ষেত্রে যশের অধিকারী হন, প্রজারা আশা করেন, সেই রাজার বংশধরেরাই তাঁদের আশাপূরণে সফল হবেন, অন্য কেউ নয়। রাজতন্ত্রীয় শাসনের এই মনস্তত্ত্ব গণতন্ত্রের পরিবর্তনশীল নেতাদের অনুশাসনে থাকা নাগরিক-হৃদয় দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু এই মানসিকতা বা জনগণের আশা বস্তুটি এই বাবদে কী রকম হয়, সেটা গণতন্ত্রে বসেও বুঝতে পারবেন—যদি ভারতবর্ষে নেহেরু-পরিবারের বংশজ শাসনের জনপ্রিয়তা আপনারা সাধারণভাবেও খেয়াল করেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুতে যেমনটি হয়—শোক-তাপ-প্রেতকার্য-শ্রাদ্ধাদি, সবই হল এবং তা হল সত্যবতী এবং ভীষ্মের পারস্পরিক আলোচনার পথ ধরেই। সত্যবতী বড় বংশের মেয়ে বলে পরিচিতা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিটা ছিল যে কোনও বিশাল বংশের কুলজা রমণীর মতো। তার ওপরে যে ঘরে তিনি বউ হয়ে এসেছিলেন, সেই হস্তিনাপুরের রাজবংশের মর্যাদা সম্পর্কে সত্যবতী ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাঁর নিজের দুটি পুত্রই এক-এক করে মারা গেল, অথচ তাঁদের কোনও সন্তান রইল না যে, ভরত-কুরুদের রাজমর্যাদা জনমনে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। চিত্রাঙ্গদ অথবা বিচিত্রবীর্য—শান্তনুর এই দুই পুত্রের একটি পুত্রও নেই, অর্থাৎ সত্যবতীর শ্বশুরকুল এবং পিতৃকুল—দুইই লুপ্ত হয়ে গেল—এই বংশবিলুপ্তির জন্য সত্যবতী বোধহয় নিজেকেই দায়ী করলেন—ধর্মঞ্চ পতিবংশঞ্চ মাতৃবংশঞ্চ ভাবিনী।

এতদিনে বুঝি তাঁর পূর্বস্মৃতিগুলি একে একে ফিরে এল, মনে পড়ল সেই অন্যায়ের ইতিহাস, যা তাঁর বিবাহের সময়েই কলঙ্কিত হয়ে গেছে। কোনও সন্দেহই নেই যে, ধর্ম, বংশমর্যাদা এবং রাজধর্মের কথা বলেই সত্যবতী একান্তভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন না। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত আছে সেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চেতনা যাতে সত্যবতীর মতো প্রাজ্ঞা রমণী বিচলিত হয়ে পড়েন। শুধুমাত্র একটি পুত্র-সন্তানের অভাবে আজ হস্তিনাপুরের রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করার মতো কেউ রইল না—এই মানসিক পীড়নের কারণের সঙ্গে যে সত্যবতীর স্বার্থই সবচেয়ে বেশি জড়িত ছিল, সে কথা সত্যবতীর মতো বুদ্ধিমতী রমণী অনুভব করতে পারছেন না, তা হতেই পারে না। বংশবিলুপ্তির জন্য ভাগ্যের পরিহাসের চেয়েও তিনি যে বেশি দায়ী, সে কথা সত্যবতী বোঝেন বলেই এতদিনে তাঁরও যেন বোধোদয় হল।

সত্যবতী জানেন—শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে হবার সময় তাঁর পিতা যে-শর্তে তাঁকে বিবাহ দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই হস্তিনাপুরের প্রথম সুযোগ্য বংশধরের প্রতি এক গভীর বঞ্চনা ছিল। সে সময় পালক পিতা কৈবর্তরাজের ব্যক্তিত্বে তাঁর পক্ষে কোনও কথাও বলা সম্ভব ছিল না। ভীষ্ম বিবাহ করবেন না, ভীষ্ম রাজা হবেন না—এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাত সত্য হস্তিনাপুরের একদা যুবরাজকে একভাবে বঞ্চিত করেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এই বঞ্চনার কথা সত্যবতী মনে মনে অনুভব করতেন বলেই তিনি তাঁর এই সমবয়সী অথবা বেশি-বয়সী পুত্রটিকে অসীম মমতায় যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়ে চলতেন।

সত্যবতীর দুই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাগুলি কী বিপরীত পরিহাস নিয়েই না ফিরে এল সত্যবতীর কাছে। সত্যবতীর যে পুত্রদের হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসানোর জন্য ভীষ্মকে আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করে রাজ্য-শাসনের প্রত্যক্ষ পরিধি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল, আজকে ভাগ্যের পরিহাসে সত্যবতীকে তাঁরই সামনে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে।

www.amarboi.com

বিচিত্রবীর্যের শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে পুত্রবধূ অম্বিকা অম্বালিকাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়ে মনস্বিনী সত্যবতী ভীষ্মের কাছে এলেন এবং সামান্য ভণিতা করেই বললেন—ভীষ্ম! তোমার পিতা মহারাজ শান্তনু ধার্মিক এবং যশস্বী—দুইই ছিলেন। কিন্তু আজ যে অবস্থা হল, তাতে তাঁর পিণ্ড, বংশ এবং যশ—সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে—ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্তিশ্চ সন্তানশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যবতী ভীষ্মকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে তাঁর ধর্মজ্ঞান, কৌলিক আচারের বোধ, এবং বিপৎকালে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার—প্রতিপত্তিশ্চ কৃচ্ছ্রেষু শুক্রাঙ্গিরসয়োরিব—ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

প্রশংসায় মানুষ খানিকটা দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবীভবনের মধ্যে সত্যবতী নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করলে কাজ হবে, এই কথা ভেবেই সত্যবতী বললেন—ভীষ্ম! আমি তোমার ওপর ভরসা করে—তস্মাৎ সুভৃশমাশ্বস্য ত্বয়ি—একটা কাজ করতে বলেছি তোমাকে। তুমি মন দিয়ে শোনো। সত্যবতী বললেন—আমার পুত্র ছিল তোমার ভাই। তাকে তুমি যথেষ্ট ভালওবাসতে। তা সে তো অল্প বয়সেই মারা গেল। একটা ছেলেপিলেও রইল না যে বংশে বাতি দেবে—বাল এব গতঃ স্বর্গম্ অপুত্রঃ পুরুষর্ষভঃ। আমি বলি কী—আমার ছেলের বউ দুটি তো রয়েছে—ইমে মহিষ্যৌ ভ্রাতুস্তে কাশীরাজসুতে শুভে।

সত্যবতী নিজের বক্তব্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্রবধূদের রমণীয়তা এবং তাঁদের উপাদেয়তাও বর্ণনা করেছেন। ভীষ্ম নিজে পছন্দ করে কাশীরাজের মেয়ে দুটিকে ভাইয়ের বিয়ের জন্য হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন বলেই সত্যবতীর কথা বলবার যুক্তি হল—ওরা তো দেখতে শুনতে খারাপ নয়। যথেষ্ট রূপবতী এবং যৌবনবতী। তাছাড়া বেচারাদের দুঃখ দেখ—স্বামীটি মারা গেল, যাক। বেচারারা কোল-আলো করা ছেলে পেল না একটিও—রূপযৌবনসম্পন্নে পুত্রকামে চ ভারত।

AMARBOI.COM

সম্বোধনটা দেখুন কেমন তেল-মাখানো—ভারত। অর্থাৎ ভরতবংশের মর্যাদা সম্বন্ধে যিনি সদা-সচেতন। পুত্রসম্বন্ধী ভীষ্মের সামনে আপন পুত্রবধূদের রূপযৌবনের থেকেও পুত্রকামনাটাই বড় করে দেখিয়ে সত্যবতী বললেন—তা আমি বলি এই মহান কুলের স্বার্থেই তুমি আমার পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো। সত্যবতী মাতৃসুলভ আদেশ দিয়ে বললেন—মনে কোরো না এতে কোনও অধর্ম হবে। তুমি আমার আদেশে—মন্নিয়োগাৎ মহাবাহো—এই পুত্রবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো। এটাই এখন ধর্ম—ধর্মংকর্তুমিহার্হসি।

এমন যুক্তি ভীষ্মের মনে আসতেই পারে যে, পুত্রই যদি চাইব, তবে তো নিজেই বিয়ে-থা করতে পারি। অনুজের রতোচ্ছিষ্ট ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে আমার কিসের প্রয়োজন? হ্যাঁ, এই যুক্তি আসতেই পারে এমনটি ভেবে মনস্বিনী সত্যবতী ভীষ্মকে বিকল্প-ব্যবস্থাও অনুমোদন করে বলছেন—আর না হয় তুমি বিধিসম্মতভাবে নিজেই একটা বিয়ে করো পুত্র!—দারাংশ্চ কুরু ধর্মেণ। আর পিতৃরাজ্যও তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে। ভরত বংশের প্রজাদের তো আর ফেলে দেওয়া যাবে না—রাজ্যে চৈবাভিষিচ্যস্ব ভারতান্ অনুশাধি চ। তুমি তোমার পুত্রবধূদের গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করতে পার, আবার নিজেও বিয়ে করতে পার। কিন্তু যা হোক একটা কিছু করতে হবে। এইভাবে বংশলুপ্তির প্রসঙ্গ যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে তুমি নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পার না। তুমি তোমার বাপ-ঠাকুরদার পিণ্ডলোপ করে তাঁদের নরকে ডোবাতে পার না কিছুতেই—মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।

সত্যবতীর কথার মধ্যে মমতা ছিল, ব্যক্তিত্ব ছিল এবং গুরুজনোচিত আদেশও ছিল। তিনি

বলেছিলেন—আমার আদেশে আমারই পুত্রবধূদের গর্ভে তুমি পুত্র উৎপাদন করো। আমাদের কুলের বৃদ্ধি হবে তাতে—তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সন্তানায় কুলস্য নঃ।

আপনারা জানেন—সেকালে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। যে রমণী অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হলেন অথবা যাঁর স্বামী পুত্র উৎপাদনে অক্ষম, সেই রমণীকে পুত্রহীনতার অভিশাপ নিয়েই সারা জীবন কাটাতে হত না। বিধবা রমণী হলে একই বংশজ দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি সামাজিকরা মেনে নিতেন। দেবর কিংবা স্বামীর বংশজ কেউ না থাকলে ধার্মিক ব্রাহ্মণকেও পুত্র উৎপাদন করার জন্য অনুরোধ করা হত। কিন্তু অপুত্রক রমণী নিজের ইচ্ছামতো যাকে পছন্দ তাকে দিয়েই নিজের গর্ভাধান করাতে পারতেন না। এক্ষেত্রে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ বা হিতৈষী বৃদ্ধদের অনুমতি প্রয়োজন হত। তাঁর বংশরক্ষার প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুত্রোৎপাদনে নিয়োগ করতেন বলেই—এই প্রথার নাম নিয়োগ-প্রথা। সত্যবতীর মুখেও ভীষ্মের প্রতি এই নিয়োগের উচ্চারণ শুনতে পাই—তোমাকে আমি এই কাজে নিযুক্ত করছি—কার্যে ত্বাং বিনিযোক্ষ্যামি তচ্ছ্রুত্বা কর্তুমর্হসি। অথবা সত্যবতী বলছেন—আমার আদেশে তুমি এই ধর্মকার্য সম্পন্ন করো—মন্নিয়োগান্মহাবাহো ধর্মং কর্তুমিহার্হসি।

ভীষ্ম সত্যবতীর কথার উত্তর দিলেন আনুপূর্বিক যুক্তি সহকারে। বললেন—মা! আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, তা অবশ্যই ধর্মসম্মত, কিন্তু পুত্র উৎপাদন করার ব্যাপারে আমি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে তো আপনি ভালই জানেন—প্রতিজ্ঞাং বেত্থ মে পুরা। আপনার বিবাহের পণ হিসেবেই আমাকে এই প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল এবং তাও আপনার না জানা থাকার কথা নয়—জানাসি চ যথাবৃত্তং শুল্কহেতোস্ত্বদন্তরে। আমি এই তিন ভুবন ত্যাগ করতে পারি, আমি যদি দেবতাদের রাজা হই, তো সেই রাজত্বও আমি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করতে পারি না। আজকে যদি সূর্য তার প্রভা ত্যাগ করে অথবা চাঁদ ত্যাগ করে তার শীতলতা—প্রভাং সমুৎসৃজেদর্কঃ...সোমঃ শীতাংশুতাং ত্যজেৎ—তবু আমি আমার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করতে পারি না।

WWW.AMARBOI.COM

সত্যবতী ভীষ্মের কাছে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাতে যে এই বয়স্ক পুত্রটির কাছে বেশ খানিকটা কটু কথা শুনতে হবে, সে কথা তিনি বেশ ভালই জানতেন। এর জন্য তিনি রাগও করলেন না ভীষ্মের ওপর। কারণ, তিনি জানেন—ভীষ্মের প্রতি যে অসম্ভব বঞ্চনা পূর্বেই হয়ে গেছে, তার জন্য এই সামান্য প্রায়শ্চিত্তটুকু তাঁকে করতেই হবে। ভীষ্মের মুখে এত কঠিন কথা শুনেও সত্যবতী তবু অবুঝের মতো বলে উঠলেন—জানি। আমি জানি। তুমি যে দৃঢ়ভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত—তা জানি। আমি এও জানি—আমারই কারণে এই কঠিন প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে—জানামি চৈব সত্যং তন্মমার্থে যচ্চ ভাষিতম্। কিন্তু দেখ, আপদ্-ধর্মের কথা তো তোমাকে বুঝতে হবে। তোমাকে তো ভাবতেই হবে, যাতে তোমাদের এই বিশাল বংশের ধারাটি ছিন্ন না হয়ে যায়, যাতে ধর্ম বিপন্ন না হয়ে পড়ে—যথা তে কুলতন্তুশ্চ ধর্মশ্চ ন পরাভবেৎ।

আপদ্-ধর্ম, বংশ-রক্ষা, কুল-ধর্ম—সত্যবতী অনেক ধর্মের কথা বলেছেন। সন্দেহ নেই—অতিরিক্ত বিপন্নতার মধ্যে মানুষকে তাঁর নীতি-ধর্ম থেকে সরে আসতে হয়। এই সরে আসাটা আপদ্-ধর্মের মধ্যে গণ্য হয় বলেই শাস্ত্রকারেরা তার মধ্যে পাপদৃষ্টি করেন না। প্রচণ্ড অন্নকষ্ট এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে এক মুনিকে কুকুরের মাংস খেয়ে জীবনরক্ষা করতে হয়েছিল—সেই ঐতিহাসিক খবর আমরা মহাভারত থেকেই ভবিষ্যতে উদ্ধার করব। সত্যবতী মনে

করেন—আজ ভরতবংশের কুলতন্তু ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই রকমই এক বিপন্নতা তৈরি হয়েছে, যা জীবনরক্ষার চেয়ে কম কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। সত্যবতী যা বলেছেন, তা ভরতবংশের প্রতি মমতাবশতই বলেছেন, কিন্তু এই বলাটার মধ্যে এমনই এক বিলম্বের বিড়ম্বনা আছে, যা ভীষ্মের প্রতি সুবিচারের তথ্য বহন করে না।

পিতা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহের সময় ভরতবংশের যুবরাজ যুবক ভীষ্মকে যে অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে নিজের যৌবনকে প্রতিহত করতে হয়েছিল, এখন সেই ভীষ্মকেই যদি তার পরিণত বয়সের পরিণতিকে অস্বীকার করে শুধু ভরতবংশের ধারা রক্ষা করার জন্য, তিনি পূর্বে যা করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই করতে হয়, তবে সেটা ভীষ্মের প্রতিই অবিচার করা হয়। মহাভারতের কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও ভীষ্মের প্রতি এই সহানুভূতিটুকু আছে। অতএব কবির জননী হওয়া সত্ত্বেও সত্যবতী যা বলেছেন—তা সে আপদ্-ধর্মই হোক অথবা কুলধর্ম—মহাভারতের কবির মতে সত্যবতী যা বলেছেন, তা ভীষ্মের ওপর অবিচার করে বলেই তা অধর্ম—ধর্মাদ্ অপেতং ব্রুবতীং...কৃপণাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্।

ভীষ্ম সত্যবতীর আপদ্ধর্মের কথার সূত্র ধরেই উত্তর দিলেন। সত্যবতী ভীষ্মকে বলেছিলেন—আমি তোমায় নিয়োগ করছি, আদেশ করছি—কার্যে ত্বাং বিনিযোক্ষ্যামি... মন্নিয়োগান্মহাবাহো—ভীষ্ম সেই আদেশেরও প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। এই প্রত্যুত্তর জননীর প্রতি নয়, কারণ প্রকৃত জননী হলে ভীষ্মের মনোব্যথা তিনি বুঝতেন। এই এক মুহূর্তের আদেশের মধ্যে সত্যবতী তাঁর প্রায় সমবয়স্ক অথবা উত্তরবয়স্ক বন্ধুটির বন্ধুত্ব এবং অবশ্যই পুত্রত্বও অতিক্রম করে অন্যায়ভাবে ভীষ্মের ওপর জোর খাটাচ্ছেন। এই জোর খাটানোটা অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হলেও, সেটা জননীর মতো নয়। ভীষ্মও তাই জননীকে উত্তর দিচ্ছেন না। উত্তর দিচ্ছেন পুরু-ভরতবংশের রাজমাতাকে, রাজরানীকে। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরের রাজ-সিংহাসন এখন রিক্ত। এখানে 'অফিসিয়ালি' আদেশ দেবার মতো এখন কেউ নেই। কিন্তু মহারাজ শান্তনুর পরিণীতা পত্নী এবং রাজা বিচিত্রবীর্যের মাতা মহারাজ শান্তনুর সমস্ত রাজকার্যে উপস্থিত। তিনি রাজবংশের স্থিতিশীলতা নিয়ে চিন্তা করছেন। অতএব ভীষ্ম তাঁকে বোধহয় নিতান্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই সম্বোধন করলেন—রাজ্ঞী বলে।

ভীষ্ম বললেন—রানীমা! আপনি যে এত ধর্ম-ধর্ম করছেন, আপনি ধর্মের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সবাইকে এইভাবে ডুবিয়ে দেবেন না—রাজ্ঞি ধর্মান্ অবেক্ষস্ব মা নঃ সর্বান্ ব্যনীনশঃ। ভীষ্ম এবার ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন ধর্ম স্মরণ করিয়ে সত্যবতীকে বললেন—সত্য থেকে চ্যুত হওয়া অথবা নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসাটা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হতে পারে, না সেটা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মানানসই হয়—সত্যাচ্চ্যুতিঃ ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্মেষু প্রশস্যতে। ভীষ্মের এই কথায় মহারাজ শান্তনুর রাজ্ঞী, সত্যবতী যদি দুঃখ পান, তাই ভীষ্ম তাঁর দুশ্চিন্তার অংশীদার হয়ে প্রস্তাব করলেন—মহারাজ শান্তনুর সন্তানধারা যাতে অব্যাহত থাকে, সেই বংশধর্মের কথা আপনাকে আমি নিশ্চয় বলব এবং যা বলব, তা আপনি হস্তিনাপুরের রাজপুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করুন। আপদ্ধর্ম তো আর একরকম নয়। সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং স্বয়ং পুরোহিত যাঁরা আপদ্ধর্মের নানা বিধানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সামাজিক নীতি-নিয়মের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, আপনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন—আপদ্ধর্মার্থকুশলৈর্লোকতন্ত্রমবেক্ষ্য চ।

ভীষ্মের ভাবটা এই—বংশরক্ষার মতো আপদ্ধর্মের প্রসঙ্গ যদি থাকে, তো সেখানে মুশকিল আসান হলেন ব্রাহ্মণেরা; আমি কেন? ভীষ্ম সত্যবতীর কাছে পরশুরামের একটি ঘটনা বললেন। পরশুরাম পিতাকে হত্যা করেছিলেন হৈহয়-যাদবদের বিখ্যাত রাজা কার্তবীর্য -অর্জুন। প্রতিহিংসা নেবার জন্য পরশুরাম কার্তবীর্য-অর্জুনকে আপন কুঠারের আঘাতে নৃশংসভাবে মেরে ফেলেন এবং তাঁর রক্ত দিয়ে পিতার তর্পণ করেন। কিন্তু শুধু পিতৃহন্তাকে শাস্তি দিয়েই পরশুরামের ক্রোধাগ্নি প্রশমিত হল না। তিনি রথে চড়ে কাঁধে কুঠার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—কোথায় কোন ক্ষত্রিয় আছে, তাঁদের সবাইকে মারবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

পৌরাণিকেরা বলেন—পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে দেন। ক্ষত্রিয়-পুরুষেরা যখন কেউই আর বেঁচে রইলেন না, তখন তাঁদের বিধবা পত্নীরা ক্ষত্রিয়দের বংশধারা কোনওমতে জিইয়ে রাখবার জন্য বেদবিৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছে পুত্রার্থিনী হয়ে মিলন কামনা করলেন। ব্রাহ্মণরাও ক্ষত্রিয়াণী রমণীদের আপদ্গ্রস্ত দেখে আপদ্ধর্মের বিধানে তাঁদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন—উৎপাদিতান্যপত্যানি ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। সেকালের দিনের বৈদিক আচার এবং সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী অন্যের দ্বারা উৎপাদিত ক্ষেত্রজ পুত্রও পরিণেতার পুত্র বলে গণ্য হতেন—পাণিগ্রাহস্য তনয়ঃ ইতি বেদেষু নিশ্চিতম্।

ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে এই রকম দাঁড়ায় : ক্ষেত্র মানে জমি। যে কোনও স্ত্রীলোকই ক্ষেত্র বলে পরিচিত, কেন না, ক্ষেত্র থেকে যেমন ধান-গম পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকেও তেমনি আমরা পুত্র-কন্যার ফল লাভ করি। অতএব ক্ষেত্র অর্থ স্ত্রীলোক। বিবাহিত পুরুষের নিজের স্ত্রী হলেন তাঁর স্বক্ষেত্র। এখন স্বক্ষেত্রে যদি বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত পরিণেতা (যিনি বিয়ে করেছেন) পুরুষের সন্তান না হয়, তবে স্বামী ইচ্ছা করলে অন্য উচ্চকুলজাত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরুষকে টাকা-পয়সা দিয়েই হোক, অথবা ব্যাকুলচিত্তে আহ্বান করেই হোক, অথবা যেভাবে হোক—তিনি তাঁর নিজের স্ত্রী বা স্বক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানাতে পারেন।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেহেতু স্বামীর অনুমতি, তাঁর অর্থ অথবা তাঁর নিজকৃত নিমন্ত্রণ-প্রক্রিয়া জড়িত থাকে, তাই পুত্রটি তাঁর নিজের বলেই পরিচিত হয়—ধনাদিনা উপনিমন্ত্রনাচ্চ ক্ষেত্রপতেরেব সা সন্ততির্ন বিপ্রস্যেতি। এখানে নিয়োগকর্তা স্বামী, পুত্রও তাঁরই। যে সব ঘটনায় স্বামী জীবিত না থাকেন, সেখানে স্ববংশীয় বৃদ্ধরা এই বিষয়ে অনুমতি করেন। আবার যেখানে স্বামীও নেই, বৃদ্ধরাও নেই, সেখানে স্ত্রী স্বয়ং উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে পুত্র যাচনা করতে পারেন, যেমন এই পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হবার পর তাঁদের ক্ষত্রিয় স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। লক্ষণীয়, এই পুত্র-যাচনার মধ্যে স্বামীর বংশধারা রক্ষা করার তাগিদটাই যেহেতু বেশি থাকে, তাই এই 'তথাকথিত' অবৈধ মিলনের মধ্যে রতি, রমণ বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার বৃত্তি পুষ্ট হওয়ার কথাটা গৌণ হয়ে যেত। পুত্র-প্রাপ্তিই যেহেতু প্রধান লক্ষ্য, তাই এই ব্রাহ্মণ-সংসর্গের মধ্যেও ধর্মবুদ্ধিই প্রধান কার্যকরী শক্তি বলে মনে করা হত—ধর্মং মনসি সংস্থাপ্য ব্রাহ্মণাংস্তা সমভ্যয়ুঃ।

ভীষ্ম সত্যবতীর কাছে সাধারণভাবে প্রথমে জানালেন যে, কীভাবে উচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয় বংশ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় উদাহরণে তিনি সেই অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। দীর্ঘতমার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। বলেছি—উতথ্য এবং বৃহস্পতির প্রসঙ্গে। বৃহস্পতি তাঁর অগ্রজ উতথ্যের পত্নী মমতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে গর্ভবতী অবস্থায় ধর্ষণ করেন। মমতার গর্ভস্থ সন্তান বৃহস্পতির শাপ লাভ করে অন্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন।

amarboi.com

অথবা গর্ভবতী অবস্থায় ধর্ষিতা হবার কারণেই হয়তো তিনি অন্ধ দীর্ঘতমার জননী হন।

দীর্ঘতমার নিজের জন্ম-কাহিনী যাই হোক, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণগুলিতে যেমন খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখছি তাঁর মধ্যেও কিছু কিছু যৌন বিকার তৈরি হয়েছিল। তিনি নিজে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। খোদ ঋগ্‌বেদে তাঁর নামে কতগুলি সূক্ত আছে। কিন্তু বিদ্যাবত্তা এবং শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি এতটাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র তাঁকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। ভেলায় ভাসতে ভাসতেই দীর্ঘতমা এসে পৌঁছন আনব বা অনুবংশীয় রাজার দেশে। এখনকার দেশস্থিতিতে এই দেশ হল মুঙ্গের-ভাগলপুর অঞ্চল। এই দেশের রাজা বলির কোনও পুত্র ছিল না। রানী সুদেষ্ণা অপুত্রক অবস্থায় দিন কাটান। রাজবংশের ধারা বজায় রাখতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং এই ব্যর্থতা বোধহয় অনেকটাই তাঁর স্বামীর কারণেই। যাই হোক বলিরাজ দীর্ঘতমার কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁর স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার জন্য—সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্যাসু মম মানদ।

দীর্ঘতমা বলিরাজের অনুরোধে স্বীকৃত হলেন বটে, কিন্তু রানী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমাকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ দেখে রাজার অজ্ঞাতসারে তাঁর দাসীটিকে পাঠিয়ে দিলেন মুনির কাছে। মুনি সবই বুঝলেন এবং পরে অবশ্য বলিরাজের অনুরোধে এবং তিরস্কারে সুদেষ্ণাও দীর্ঘতমার সঙ্গে মিলিত হন। দীর্ঘতমার ঔরসে সুদেষ্ণার গর্ভে যে পুত্ররা জন্মাল, তাঁদের নাম জড়িয়ে আছে আমাদেরই পূর্ব ভারতের দেশগুলির সঙ্গে। এই পুত্রগুলির নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। বলিরাজের পুত্রদের নাম থেকেই না হয় আমরা আমাদের পরিচিত দেশগুলির নাম পেলাম, কিন্তু এই সম্পূর্ণ ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যেটা লক্ষ্য করতে হবে, সেটা হল পরক্ষেত্রে উৎপাদিত দীর্ঘতমার এই পুত্রেরা কেউ দীর্ঘতমার পিতৃত্ব নিয়ে বিখ্যাত হলেন না। বলিরাজের নামেই তাঁরা সবাই বালেয় ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত হলেন।

মহামতি ভীষ্মও সত্যবতীর কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করার জন্য ভীষ্মের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ না করে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-ঋষিদের স্মরণ নিলে তাঁর পূর্বকৃত সত্য-প্রতিজ্ঞা থেকেও তিনি ভ্রষ্ট হবেন না, অপরদিকে অম্বিকা ও অম্বালিকার সন্তানরাও বিচিত্রবীর্যের নামে পুরু-ভরত-কুরুবংশের গৌরবেই বিখ্যাত হবেন। ভীষ্ম শেষ সিদ্ধান্ত জানালেন—এই পৃথিবীতে মহাধনুর্ধর, মহা-বলবান এবং পরম-ধার্মিক অনেক রাজাই আছেন—জাতাঃ পরমধর্মজ্ঞা বীর্যবন্তো মহারথাঃ—যাঁরা ব্রাহ্মণের বীজে পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়েছেন—এবমন্যে মহেষ্বাসা ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়া ভুবি। অতএব আপনিও সেই ব্যবস্থা করুন, মা! সেই ব্যবস্থা করুন। সিদ্ধান্তের শেষে ভীষ্ম আবারও সত্যবতীকে জননীর সম্বোধনে সম্বোধন করলেন, কারণ সত্যবতী এখন তাঁর প্রায় সমবয়স্ক পুত্রটির কথা বন্ধুর মতো শুনছেন। ভীষ্ম বললেন—আমার কথা শুনে আপনার যেমনটি মনে চায় তাই করুন মা—এতচ্ছ্রুত্বা ত্বমপ্যত্র মাতঃ কুরু যথেপ্সিতম্।

পঁয়ষট্টি

ভীষ্ম তাঁর পূর্বকৃত সত্য-প্রতিজ্ঞা ছেড়ে মায়ের কথা শুনতে রাজি হলেন না। মায়ের কথা শোনাও নিশ্চয়ই ধর্ম, আপদ্ধর্মও ধর্ম, আবার সত্যরক্ষাও ধর্ম। মহাকাব্যের সমাজে এই সমস্ত ধর্মেরই মূল্য আছে, আবার এই ধর্ম সাধনের মধ্যে তর-তমও আছে। মায়ের কথা, আপদ্ধর্ম—এই দুয়ের থেকেও ভীষ্মের কাছে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার ধর্মই বড় হয়ে উঠল, কারণ প্রথমত বর্ণাশ্রমের আচারে ক্ষত্রিয়ের কাছে সত্য বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার মতো বড় ধর্ম আর নেই। আর দ্বিতীয়ত মা যা চান, অথবা এখন যা আপদ্ধর্ম বলে বলা হচ্ছে, তার সমাধান ভীষ্ম ছাড়াও অন্য লোকও করতে পারেন। অর্থাৎ বিকল্প ব্যবস্থা এখানে হতে পারে। ভীষ্ম মাকে বলেছেন—আপনি গুণবান কোনও ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করুন। তিনিই প্রসিদ্ধ ভরত বংশের ধারা রক্ষা করবেন।

যে বংশে পুরু, ভরত, কুরুর মতো রাজা জন্মেছেন, সেই বংশ উপযুক্তভাবে রক্ষা করতে গেলে যাকে-তাকে দিয়ে কাজ হবে না—এ কথা ভীষ্মের মতো আর কে জানেন। ভীষ্ম তাই চরম 'প্রোফেশন্যালিজম' দেখিয়ে জননী সত্যবতীকে বলেছেন—দরকার হলে টাকা-পয়সা কবুল করুন, কিন্তু গুণবান কোনও ব্রাহ্মণকে এই ব্যাপারে আমন্ত্রণ করে আনতে হবে—ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিদ্ ধনেনোপনিমন্ত্র্যতাম্।

'গুণবান ব্রাহ্মণ'—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সত্যবতীর মাথায় চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। যেমন আমাদেরও হয়। কঠিন রোগ সারাতে গেলে আমরা ডাক্তার ডাকি। এখানে বিকল্প থাকে। আমরা কখনও প্রচুর টাকা-পয়সা খরচা করে বড় ডাক্তার ডাকি, এবং অর্থমূল্যের বিশ্বাসে তাঁর ওপর ভরসাও করি। অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি কেউ ডাক্তার থাকেন, তবে তাঁর ওপরে আমরা কিন্তু কখনও কখনও বেশি নির্ভর করি। তিনি হয়তো বড়

চিকিৎসকের তুলনায় কিছু কম উজ্জ্বল হতে পারেন, কিন্তু স্বজন বলেই তাঁর মায়া-মমতা এবং ব্যক্তিগত স্পর্শগুলি আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানে সত্যবতীর ক্ষেত্রেও তাই হল।

তিনি অর্থমূল্যের বিনিময়ে বিধিসম্মতভাবেই একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিয়ে তাঁর দুই পুত্রবধূর গর্ভাধান করাতে পারেন। কিন্তু আপন রক্তের সম্বন্ধের মধ্যেই যদি সেই মমত্বময় বিপত্তারণ মানুষটি সত্যবতী পেয়ে যান, তবে এই রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে অন্য ব্রাহ্মণকে ডেকে আনার প্রয়োজন কী? এর মধ্যেই সেই কাছের মানুষটির সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন, তাঁকে তিনি স্বচ্ছন্দে স্মরণ করতে পারছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিটি তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ হলেও হস্তিনার রাজবাড়ি তাঁকে চেনে না। হস্তিনার রাজবধূর গর্ভে যেখানে সন্তান উৎপাদন করাতে হবে, সেখানে নিজের একক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত রাজবাড়ির ভাগ্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তিনি যা ভাবছেন, তা মহারাজ শান্তনুর প্রথম পুত্র ভীষ্মের কাছে জানাতে হবে। পিতার জীবিত অবস্থা থেকেই যিনি প্রায় হস্তিনার রাজবাড়ির অভিভাবকের মতো, তাঁকে অতিক্রম করে সত্যবতী একা সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। যে সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ ভরত-বংশের সামগ্রিক ধারাকে প্রভাবিত করবে, সেটা ভীষ্মের সঙ্গে আলোচনা করতেই হবে।

সত্যবতী তাঁর এই সখাসম পুত্রের কাছে সবই খুলে বলবেন ঠিক করলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর বড় লজ্জা করছে। সেই কুমারী অবস্থায় মহামুনি পরাশরের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল—আজ এতদিন পরে সেই ক্ষণিক মিলনের কথা পুত্রকল্প ভীষ্মের কাছে বিবৃত করবেন তিনি। তাঁর বড় লজ্জা করল। লজ্জা পেলে মানুষ বোকার হাসি হেসে লজ্জাকে চাপা দিতে চায়। সত্যবতীও তাই করলেন। হাসি-হাসি মুখ করে দু-একবার ইচ্ছাকৃতভাবে থতমত খেয়ে—বাচা সংসজ্জমানয়া—সত্যবতী তাঁর পূর্ব জীবনের এক চরম ঘটনা ভীষ্মকে বলতে উদ্যত হলেন—বিহসন্তীব সব্রীড়ম্ ইদং বচনমব্রবীৎ।

নিজের জীবনের এই লুক্কায়িত ঘটনা, যা হয়তো মহারাজ শান্তনুও জানতেন না, সেই ঘটনা তিনি ভীষ্মের কাছে কেন বলছেন, তার কারণ সত্যবতী নিজেই বলেছেন। সত্যবতী বলেছেন—একমাত্র তোমার কাছেই আমি আমার মনের কথা বলতে পারি, ভীষ্ম! কারণ তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—বিশ্বাসাত্তে প্রবক্ষ্যামি। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই বিশ্বাসের মর্ম বোঝেন বলেই বলেছেন—এই বিশ্বাসের মানে হল ভীষ্মের সঙ্গে সত্যবতীর অন্তরঙ্গতা—বিশ্বাসাদ্ অন্তরঙ্গত্ববুদ্ধেঃ। আমরা আগেই জানিয়েছি—সত্যবতী তাঁর এই সমবয়স্ক বা কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক পুত্রটিকে বন্ধুর মতো দেখতেন। হয়তো এই অন্তরঙ্গতা ছিল বলেই সত্যবতী ভীষ্মকেই শুধু এই কাহিনী বলতে পারেন, আর কাউকে নয়।

সত্যবতী বললেন—আমাদের এই ভরত বংশের কুল রক্ষার জন্য আমার এই জীবনকাহিনী তোমাকেই শুধু বিশ্বাস করে বলতে পারি—বিশ্বাসাত্তে প্রবক্ষ্যামি সন্তানায় কুলস্য নঃ। সত্যবতী আরও বললেন—বংশবিলুপ্তির মতো এই বিপন্ন সময়ে আমাদের কী করা উচিত, সে কথা তোমাকে না বলেই বা থাকি কী করে—ন তে শক্যমনাখ্যাতুম্ আপদ্ধর্মং তথা বিধম্। না বলে পারছি না এই কারণে যে, তুমিই এখন এই বংশের ধর্মরক্ষক, তুমিই সত্যরক্ষক, আর সবচেয়ে বড় কথা—তুমি আমাদের একমাত্র অবলম্বন—ত্বমেব নঃ কুলে ধর্মঃ ত্বং সত্যং ত্বং পরা গতিঃ।

আগেই বলেছি—মনস্বিনী সত্যবতী একা কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। তিনি তাঁর জীবনকাহিনী বিবৃত করে ভরত বংশের প্রবাহ রক্ষায় সাহায্য করতে চাইছেন, কিন্তু তিনি যা

www.amarboi.com

বলছেন, তা করণীয় কিনা সে সিদ্ধান্তের ভার দিলেন ভীষ্মের হাতে, কারণ হস্তিনাপুরের পূর্ব-যুবরাজ তিনি। তাঁর পুত্রেরা নামে রাজা হলেও হস্তিনাপুরের রাজতন্ত্র ভীষ্মের হাতেই ছিল এবং এখন তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর পরেও ভীষ্মই প্রখ্যাত ভরত বংশের সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করছেন। সত্যবতী তাই বললেন—আমার এই কাহিনী শুনে যা করবার তুমি করো—তস্মান্নিশম্য সত্যং মে কুরুষ্ব যদনন্তরম্।

সত্যবতী বলতে আরম্ভ করলেন—আমার বাবার একখানা নৌকা ছিল, জান। আমার তখন কাঁচা বয়স—গতা প্রথমযৌবনে—তো আমি সেই নৌকায় বসে ছিলাম যমুনা নদীর ওপর। এমন সময় মহামুনি পরাশর যমুনা পার হবার জন্য আমারই নৌকায় এসে উঠলেন।

সত্যবতী তাঁর এই মিলন-কাহিনী খুব সংক্ষেপে বলছেন ভীষ্মের কাছে। কারণ তিনি পুত্রকল্প, আবার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি তিনি বাদও দিচ্ছেন না, কারণ সত্যস্বরূপ ভীষ্মের কাছে তিনি কিছুই লুকোবেন না। নৌকা বেয়ে নিয়ে যাবার সময় পরাশর কীভাবে তাঁকে দেখে মোহমুগ্ধ হয়ে পড়লেন, মুনির মুখে ধীর-মধুর প্রেমের কথা শুনে আস্তে আস্তে সত্যবতী নিজেও কীভাবে তাঁর বশীভূত হয়ে পড়লেন—সব ঘটনা আনুপূর্বিক ভীষ্মকে শোনালেন সত্যবতী। কন্যা অবস্থায় তাঁর এই মিলন-কাহিনী শুনে ভীষ্ম যদি ভাবেন—তাঁর পিতা শান্তনু শুধুই বঞ্চিত হয়েছেন, কেননা যে রমণীর কুমারীত্ব হৃত হয়েছে, তাঁকে বিবাহ করে তাঁর পিতা কী পেলেন জীবনে—ভীষ্ম যদি এই কথা ভেবে দুঃখিত হন, সত্যবতী তাই বলেছেন—আমার কোনও উপায় ছিল না, বাবা। এদিকে মহর্ষি শাপ দেবেন এই ভয়, ওদিকে পিতার ভয়। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় মুনি আমাকে এমন একটি দুর্লভ বর দিলেন যে, আর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার উপায় রইল না আমার—বরৈরসুলভৈরুক্তা ন প্রত্যাখ্যাতুমুৎসহে।

সত্যবতী বলে চললেন—আমাদের মিলন হয়েছিল সেই নৌকার ওপরেই। মুনি আপন তেজে চারদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে আমাকে যুগপৎ অভিভূত এবং বশীভূত করে ফেললেন—অভিভূয় স মাং বালাং তেজসা বশমানয়ৎ। আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হলে মুনি বললেন—এই নদী মধ্যগত দ্বীপের মধ্যে আমার দ্বারা উৎপন্ন গর্ভ প্রসব করে তুমি আবারও কন্যা হয়ে যাবে—কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি।

সত্যবতীর ভাবটা এই—আমি তোমার পিতাকে বঞ্চিত করিনি পুত্র। নিজের গূঢ় মিলন বর্ণনা করে সত্যবতী বললেন—আমার সেই কুমারী অবস্থার পুত্রটি এখন দ্বৈপায়ন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এক মহাযোগী, মহা-ঋষি হয়ে গেছে—পারাশর্যো মহাযোগী স বভূব মহানৃষিঃ। চারটে বেদ ভাগ করেছে বলে লোকে তাকে ব্যাস বলেও ডাকে আবার গায়ের রঙ আমারই মতো কালো বলে লোকে তাকে কৃষ্ণ বলেও ডাকে—লোকে ব্যাসত্বম্ আপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ।

এই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসকে ভীষ্ম খুব ভাল করেই চেনেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভীষ্মের যে এইরকম এক ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ আছে তা বোধহয় তিনি জানতেন না। সত্যবতী ভীষ্মের কাছে তাঁর কন্যাবস্থার পুত্রটির গুণখ্যাপন করতে লাগলেন, যেন ভীষ্ম তাঁর গুণ জানেন না। এই কিছুদিন আগে অম্বার তপস্যার ঘটনা এবং পরশুরামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা তো তিনি এই দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং নারদের সঙ্গেই আলোচনা করেছিলেন। অতএব ভীষ্ম তাঁর পরম-ঋত্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সত্যবতী সেই ভীষ্মের কাছেই পুত্রের গুণপনা ব্যাখ্যা করছেন। সত্যবতী বললেন—ছেলে আমার যেমন সত্যবাদী, তেমনি জিতেন্দ্রিয়। অহোরাত্র এমন তপস্যা

করেছে যে, পাপ বলে কোনও জিনিস নেই তার মধ্যে—সত্যবাদী শমপরস্তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে পিতা পরাশরের পদবি অনুসরণ করেছে।

সত্যবতী আপন পুত্রের এত গুণ-ব্যাখ্যান করছেন, তার কারণ আছে। বস্তুত নিয়োগ প্রথায় পুত্র উৎপাদন করতে গেলে এমনই একজন পুরুষকে আহ্বান জানানো দরকার, যিনি জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত। এতে পরম্পরাক্রমে জ্ঞান এবং বিদ্যাবত্তা নিয়োগজাত পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, যাঁকে পরক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদনের জন্য আহ্বান করা হবে তিনি যেন কামুকতার বশবর্তী হয়ে না আসেন। নিযুক্ত হবার মুহূর্তে বাস্তব পরিস্থিতিই কামুকতার সঞ্চার করবে, কিন্তু নিযুক্ত পুরুষ যদি পূর্বাহ্নেই কামে বশীভূত হয়ে থাকেন, তবে তাঁকে দিয়ে পরের স্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করানোটা খুব বড় একটা মানসিক বিপর্যয় তৈরি করে। সত্যবতী তাই তাঁর পুত্রের সত্যবাদিতার সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিরুদ্ধির কথা জোর দিয়ে বলেছেন—শমপরঃ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ-ব্যাপৃতঃ। শুধু 'অন্তরিন্দ্রিয়' এইজন্য যে, এর সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়েরও নিরুদ্ধি ঘটলে পুত্রোৎপাদনের ঘটনাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

শমদমাদির পরম সাধনা যাঁর করায়ত্ত, ঐহিক-পারত্রিক কোনও কামনা বা ফলে যাঁর কোনও স্পৃহা নেই সেই রকম একজন মানুষই যে এক রমণীর গর্ভে নিরাসক্তভাবে পুত্র উৎপাদন করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও। সত্যবতী ভীষ্মকে বললেন—আমি এবং তুমি, দুজনেই যদি এই তেজস্বী মুনিকে তোমার ভ্রাতৃ বধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করার জন্য নিযুক্ত করি—স নিযুক্তো ময়া ব্যক্তং ত্বয়া চাপ্রতিমদ্যুতিঃ—তবে সে কিছুতেই না বলতে পারবে না। আমার এই পুত্রটি আমাকে ছেড়ে যখন পিতার সঙ্গে তপস্যা করতে গেল, তখন আমাকে বলেছিল—কোনও প্রয়োজন হলে আমাকে ডেকো, আমি ঠিক চলে আসব। আজ সেই প্রয়োজন উপস্থিত। ভীষ্ম! এখন তুমি এ বিষয়ে অনুমতি করো তাহলে আমি তাকে স্মরণ করতে পারি—তং স্মরিষ্যে মহাবাহো যদি ভীষ্ম ত্বমিচ্ছসি।

amarboi.com

এই প্রস্তাব যে ভীষ্মের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় হয়েছে, তা তাঁর পরবর্তী মন্তব্য থেকেই বোঝা যাবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে তিনি এতটাই সম্মান করেন যে, তাঁর নাম শোনামাত্রই তিনি হাত জোড় করে দাঁড়ালেন—মহর্ষেঃ কীর্তনে তস্য ভীষ্মঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। বললেন—মা! যিনি কাজ করার আগেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং এগুলির ফলাফল—দুইই চিন্তা করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীদের গর্ভে পুত্রোৎপত্তির জন্য যা আপনি বলেছেন, তা শুধু ধর্মসম্মতই নয়, তা আমাদের বংশের পক্ষেও হিতকর হবে, আমাদের তাতে মঙ্গল হবে। আপনার এই প্রস্তাব আমার অত্যন্ত ভাল লাগছে—উক্তং ভবত্যা যচ্ছ্রেয় স্তন্মহ্যং রোচতে ভৃশম্।

লক্ষণীয় বিষয় হল, মহামতি ভীষ্ম একজন বীর ক্ষত্রিয় পুরুষ। তিনি কুরুবাড়ির সংসার-সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু তিনি বিবাহ করেননি। তিনি আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিয়েছেন এবং তিনি রাজ-সিংহাসনও ভোগ করবেন না বলে ঠিক করেছেন। এক কথায় তিনি গৃহস্থ হওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যাসী। অন্যদিকে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস একজন ব্রাহ্মণ মহর্ষি। কোনও সামাজিক বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়নি। জন্মমাত্রেই তিনি পিতার সঙ্গে তপস্যায় নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি এখনও পর্যন্ত অবিবাহিত। কিন্তু তিনি সুদূর আশ্রম থেকে কুরুবাড়ির সংসার-সীমার মধ্যে ফিরে আসছেন কুরুবাড়ির বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

ব্যাস এবং ভীষ্ম দুজনেই কুরুবাড়ির মূল বংশধর বিচিত্রবীর্যের ভাই—একজন মাতার

সম্বন্ধে, অন্যজন পিতার সম্বন্ধে। পিতৃ-সম্বন্ধ অনুযায়ী ক্ষত্রিয় ভীষ্মই তাঁর বংশরক্ষায় সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন বলে তাঁর মাতৃসম্বন্ধের ভাই ব্রাহ্মণ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী দুই ক্ষত্রিয়াণীর ক্ষেত্রে বা গর্ভে ব্রাহ্মণ্যের বীজ বপন করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ মহর্ষি তাঁর বীজ বপন করেই চলে যাবেন, আর ক্ষত্রিয় ভীষ্ম কুরুবাড়ির সংসার-সীমান্তে দাঁড়িয়ে এই বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখবেন, সেই অঙ্কুরকে তিনি লালন করবেন, সেই অঙ্কুরকে বিস্তারিত শাখা-প্রশাখায় মহীরুহে পরিণত হতে দেখবেন এবং সেই মহীরুহের মহতী বিনষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টি পর্যন্ত দেখে যাবেন। এই বিশাল এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার দ্রষ্টা হয়ে থাকবেন ভীষ্ম, আর তাঁর পরিপূরক ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্রষ্টার ভূমিকায় থাকবেন ব্যাস—যিনি ভারত-বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এবং ভবিষ্যতে মহাভারতের কবি হবেন। আপাতত ভারত বংশের মূল ক্ষেত্রে সৃষ্টির জন্য তাঁর ডাক এসেছে—এই সৃষ্টির বিষামৃতই তাঁকে পরে মহাভারতের কবি করে তুলবে।

আপাতত ভীষ্ম সত্যবতীকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে সত্যবতী কাল বিলম্ব না করে তাঁর প্রথম পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসকে মনে মনে স্মরণ করলেন। মহর্ষি সেই মুহূর্তে বেদ-পাঠে নিরত ছিলেন। সেই অবস্থাতেই জননী তাঁকে কোনও প্রয়োজনীয় কাজে স্মরণ করছেন মনে করে তিনি সকলের অলক্ষিত অবস্থায় মায়ের সামনে আবির্ভূত হলেন।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস এতটাই উচ্চ স্তরের যোগী এবং মুনি যে, তাঁর সম্বন্ধে যেন এমন অলৌকিকভাবে বললেই ভাল মানায়। কিন্তু মহাভারতের সর্বত্রই এই দেবোপম ঋষিরা এবং এমনকি স্বয়ং দেবতা বলে প্রথিত পুরুষেরাও এমন মনুষ্যোচিতভাবে লীলায়িত হয়েছেন যে, ব্যাসের মায়ের সামনে আসাটুকুও লৌকিকভাবেই উপস্থাপিত করা যায়। বাস্তব জগতে আমরাও শ্রদ্ধেয় মানুষকে দেখা হলে বলে থাকি—আপনাকে স্মরণ করছিলাম। একইভাবে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করে বিশ্বস্ত কাউকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। হয়তো সেই সময় তিনি বেদ পড়ছিলেন—স বেদান্ বিব্রুবন্ ধীমান্। কিন্তু সেই সময় মা তাঁকে স্মরণ করছেন শুনে কাউকে কিচ্ছুটি না বলে সবার অজ্ঞাতে তিনি মায়ের কাছে চলে এসেছেন—প্রাদুর্বভূবাবিদিতঃ ক্ষণেন কুরুনন্দন।

AMARBOI.COM

এই যে কাউকে কিছু না বলে মায়ের ডাক শোনা মাত্রই বেদপাঠ ছেড়ে চলে আসা—এই সমস্ত প্রক্রিয়াটার মধ্যে এমন ত্বরিত গতি এবং আবেগ ছিল যে, মহাভারতের কবি সেটাকে অলৌকিকভাবে বর্ণনা করে তাঁর নিজের কাছে মায়ের আদেশের মূল্য কতখানি, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। এতকাল পরে তাঁর কুমারী অবস্থার প্রথমজ পুত্রটিকে দেখে সত্যবতীর অন্তর্গূঢ় স্নেহধারা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ছেলে এখন মহাযোগী হয়েছে, মহা-ঋষি হয়েছে, তাই প্রথমে সাধারণের সম্মান-বিধি অনুসারে একটু কুশল প্রশ্ন বা স্বাগত-ভাষণ করেই সুচিরকালের ব্যবধানে দৃষ্ট পুত্রটিকে জননী সত্যবতী দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। এতকাল পরেও যেন তাঁর মাতৃস্তন্যের উষ্ণ ধারা ক্ষরিত হল প্রায়—পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রস্রবৈরভিষিচ্য চ। সত্যবতীর চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হল আনন্দে, এতকাল পর পুত্র দর্শনের সন্তুষ্টিতে—মুমোচ বাষ্পং দাসেয়ী পুত্রং দৃষ্ট্বা চিরস্য তম্।

আজন্ম সংসার-বিরাগী ব্যাসও উদ্বেল মাতৃস্নেহে আকুল বোধ করলেন। কীই বা দেবার আছে! সমস্ত পুণ্যতীর্থের জল তাঁর কমণ্ডলুতে ভরা ছিল। সেই জল মায়ের মাথায় ছড়িয়ে দিলেন দেবতার আশীর্বাদের মতো—তামদ্ভিঃ পরিষিচ্যার্তাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ। বুঝিয়ে

দিলেন—এতকাল এত তীর্থে ঘুরে ঘুরে তপস্যার ফল লাভ করেছি, মা! আজ সেই সর্বতীর্থোদ্ভব জল তোমার গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে আমার জন্মাবধি সম্পূর্ণ জীবৎকালের সঙ্গে স্পর্শ ঘটালাম তোমার। মায়ের মাথায় তীর্থজল ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে যথাবিধি অভিবাদন করলেন ব্যাস। বললেন—তোমার মনের যা ইচ্ছে তাই করব আমি। তুমি যেমন আদেশ করবে এবং যেমনটি তোমার ভাল লাগে, তেমনটিই আমি করব—শাধি মাং ধর্মতত্ত্বজ্ঞে করবাণি প্রিয়ং তব।

মহামুনি ব্যাস এসেছেন হস্তিনায়। ব্যাস তো শুধু মায়ের নন, তিনি যে সবার। খবর পেয়ে হস্তিনাপুরের রাজপুরোহিত এসে মঙ্গল-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন মহর্ষির শুভাগমনের জন্য। মহর্ষি ব্যাসও রাজপুরোহিতের দেওয়া পাদ্য-অর্ঘ্য সাদরে স্বীকার করলেন। তিনি আসনে উপবেশন করতেই সত্যবতী আবার তাঁর প্রথমজন্মা পুত্রটির কাছে এসে বসলেন। কথাগুলো রাজপুরোহিতের সামনেই হওয়া ভাল, কারণ রাজপুরোহিত তৎকালীন রাজযন্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। রাজবাড়িতে যা ঘটছে, সমস্ত প্রজাদের স্বার্থে তা তাঁর জানার অধিকার আছে।

সত্যবতী পুত্রকে আবারও কুশল প্রশ্ন করলেন। এতকাল পরে তাঁর মাতৃত্বের দাবি কতটা টিকবে, সেটাও যেন একটু বুঝে নিতে চাইলেন তিনি। পুত্রকে বললেন—কবি!

সম্বোধনটা ভারি চমৎকার। পৃথিবীর প্রথম কবিতাবলীর মর্মকথা বুঝে নিয়ে সেগুলির শ্রেণী বিভাগ করেছেন ব্যাস। কোনটা মন্ত্র, কোনটা গান সব বুঝে নিয়ে তিনি চতুর্বেদের পৃথক সংকলন করেছেন—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুর-স্তপসা ভগবানৃষিঃ। তা এমন মানুষকে তাঁর জননী কবি বলবেন না তো কি? তাছাড়া সংস্কৃতে কবি শব্দের অর্থ বড় গভীর। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সব তিনি দেখতে পান বলে ক্রান্তদর্শী কবির সঙ্গে ঋষির কোনও পার্থক্য নেই। সত্যবতী সেই ক্রান্তদর্শী পুত্রের কাছে আপন মাতৃত্বের দাবি জানাচ্ছেন। বলছেন—কবি! সংসারে একটি ছেলে যেমন পিতার সবচেয়ে বড় সহায়, তেমনি সে তার মায়েরও সবচেয়ে বড় সহায়। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে স্বচ্ছন্দে শাসন করতে পারেন, তেমনি মাও তাঁকে শাসন করতে পারেন—তেষাং যথা পিতা স্বামী তথা মাতা ন সংশয়ঃ।

সত্যবতী গৌরচন্দ্রিকা করছেন। এতকাল পিতার সংস্পর্শে ছিলেন, অতএব পিতার কথাই মান্য, আর এতকাল মায়ের সঙ্গে তাঁর থাকা হয়নি বলে মায়ের কথার কোনও মূল্য নেই—এই লঘুতা যাতে না ঘটে তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন সত্যবতী। তিনি বললেন—আমার কুমারী অবস্থায় তুমি যেমন আমার সমাজ-সম্মত প্রথম পুত্র—বিধানবিহিতঃ স ত্বং যথা মে প্রথমঃ সুতঃ—তেমনি বিচিত্রবীর্যও আমার কনিষ্ঠ পুত্র। আবার দেখ—পিতার দিক দিয়ে মহামতি ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্যের ভাই, তেমনি মায়ের দিক দিয়ে তুমিও তার ভাই—যথা বৈ পিতৃতো ভীষ্ম-স্তথা ত্বমপি মাতৃতঃ। আমার মুশকিল হয়েছে—শান্তনব ভীষ্ম বিবাহ করবেন না এবং রাজ্যও পালন করবেন না বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই অবস্থায় তোমার ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যের মঙ্গলের জন্য এবং মহান কুলের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি যা বলব, তা তোমায় একটু মন দিয়ে শুনতে হবে, বাবা!

এক বিচিত্রবীর্য এবং তাঁর বংশরক্ষা—এর মধ্যে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থেরই শুধু চরিতার্থতা থাকে, তাই সত্যবতী বলছেন—হস্তিনাপুরবাসী সমস্ত প্রজাদের প্রতি যদি কোনও দয়া থাকে তোমার—(ভাবটা এই, সে দয়া আমার অন্তত আছে)—, সকলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি তোমার কোনও ভাবনা থাকে, আর ওই স্বামী-পুত্রহীনা বেচারা ওই বউ-দুটির ওপর যদি কোনও মায়া থাকে তোমার, তবে আমি যা বলব, তা শুনে তোমায় একটি কাজ করতে হবে,

AMARBOI.COM

বাবা—আনৃশংস্যাচ্চ যদ্ব্রূয়াং তচ্ছ্রুত্বা কর্তুমর্হসি।

সত্যবতী আর ভণিতা করছেন না। কারণ, তখনকার দিনের সামাজিক রীতিনীতি এবং বিপন্নতায় সত্যবতী এখন কী প্রস্তাব করবেন, সে আন্দাজ ব্যাসের হয়ে গেছে বলেই সত্যবতী এবার ঝটিতি তাঁর বক্তব্য জানালেন। বললেন—তোমার ছোট ভাইয়ের দুটি স্ত্রীই দেবরমণীদের মতো সুন্দরী। তাদের রূপ-যৌবন যথেষ্ট এবং তারা ধর্মানুসারে পুত্রকামনা করে—রূপযৌবন সম্পন্নে পুত্রকামে চ ধর্মতঃ। ব্যাসের সামনে পুত্রবধূদের রূপযৌবনের কথা উচ্চারণ করে সত্যবতী বোঝাতে চাইলেন—বিচিত্রবীর্য মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই যুবতী বধূর সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে, এমনকি কোল-আলো করা দুটি সন্তানও নেই, যাদের দিকে তাকিয়ে এরা জীবন কাটাবে।

অতএব সত্যবতীর প্রস্তাব—আমার এই দুই পুত্রবধূর গর্ভে তুমি পুত্র উৎপাদন করো। একমাত্র তুমিই এই কাজ করতে পার, বাছা—তয়োরুৎপাদয়াপত্যং সমর্থো হ্যসি পুত্রক। 'পুত্রক' সম্বোধনটির মধ্যেও ভারি সুন্দর ব্যঞ্জনা আছে। অল্পার্থে 'ক' প্রত্যয় হয়। 'ক' প্রত্যয়ের প্রয়োগে বড়কে ছোট করে দেখানো যায়, যেমন বাল, বালক, মানব, মানবক (শিশু)। 'পুত্রক' শব্দের ব্যঞ্জনা—তুমি যত বড় ঋষিই হও না কেন, বেদ-বিভাগ করে তুমি যত বড় কবিই হও না কেন, মায়ের কাছে এখনও তুমি সেই আদরের শিশুটিই আছ। অতএব আমার কথা শুনতে হবে বাছা! ব্যাস যদি ভাবেন—এই কর্মে শুধু স্নেহময়ী মায়েরই অনুমোদন আছে, হস্তিনার পূর্বজাত দায়ভাক্ ভীষ্মের অনুমোদন নেই, তাই সে কথা সত্যবতী আগেই বলে নিয়েছেন —ভীষ্ম এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুরোধ করেছেন, আর আমারও এই আদেশ—ভীষ্মস্য চাস্য বচনান্নিয়োগাচ্চ মমানঘ। তুমি বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে পুত্রের জন্ম দাও। তাতে আমার কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধারাও অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তোমারও সন্তান জন্মাবে—অনুরূপং কুলস্যাস্য সন্তত্যাঃ প্রসবস্য চ।

AMARBOI.COM

জননীর এই আদেশ দ্বৈপায়ন ব্যাসের মনে কোনও আকস্মিকতা সৃষ্টি করেনি। এক পুত্রবধূর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্য অন্য পুত্রের নিয়োগ যেহেতু তদানীন্তন সমাজ-সচল প্রথা, কাজেই সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাস কিছুই আশ্চর্য হননি। তিনি এমন ঘটনা অনেক দেখেওছেন—দৃষ্টং হ্যেতৎ সনাতনম্। অতএব জননীর উদ্দেশে তিনি সাধারণভাবেই বললেন—মা! তুমি ঐহিক এবং পারত্রিক সব ধর্মই জান। তোমার বুদ্ধিও ধর্মবোধে পরিশীলিত। কাজেই তোমার আদেশ মেনে শুধু ধর্মের খাতিরেই তোমার ইচ্ছাপূরণ করব—তস্মাদহং ত্বন্নিয়োগাদ্ধর্মমুদ্দিশ্য কারণম্। আমি নিশ্চয়ই আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য দেবোপম পুত্র উৎপাদন করব। কিন্তু তার জন্য তোমার রাণীদের কিছু কষ্ট করতে হবে। আমি যেমন বলব, ঠিক সেইভাবে তোমার দুই রাজবধূ এক বৎসর কাল ব্রত পালন করুন—ব্রতং চরেতাং তে দেব্যৌ নির্দিষ্টমিহ যন্ময়া। এতে তাঁদের শুদ্ধি ঘটবে এবং সেই ব্রতক্লিষ্ট শুদ্ধ অবস্থাতেই আমার সঙ্গে মিলন হবে তাঁদের। নীতি-নিয়ম-ব্রতহীন অবস্থায় আমার সঙ্গে কোনও রমণীর সঙ্গতি হতে পারে না—ন হি মাম্ অব্রতোপেতা উপেয়াৎ কাচিদঙ্গনা।

ব্যাসের ভাবটা বোঝা যায়। উপযুক্ত পুত্রের জন্য পিতা-মাতাকে তপস্যা করতে হয়। শুধুই কামজাত পুত্রের দ্বারা জগতের কোনও হিত সাধন হয় না বলেই ব্যাস মনে করেন। তাছাড়া বিচিত্রবীর্যের সাহচর্যে দুই রানীর এতদিন যে কাম সাধন চলেছে, সেই একই বৃত্তিতে তপোধন দ্বৈপায়ন ব্যাসের সাহচর্য লাভ করা যায় না। তপঃক্লিষ্ট মুনির কাছে পুত্র কামনা করলে তার

জন্য তাঁদেরও চিত্ত শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্যই ব্যাস এক বৎসরের ব্রত-নিয়মের কাঠিন্য আরোপ করতে চাইছেন রানীদের ওপর—সংবৎসরং যথান্যায়ং ততঃ শুদ্ধে ভবিষ্যতঃ।

সত্যবতী দেখলেন—এক বছর সময় বড় কম নয়। তার ওপর যোগী-মুনি বলে কথা। কখন কী মতি-গতি হয় কে জানে? হয়তো এক বৎসর পর এসে ছেলে বলল—না, এখনও কাল পরিপক্ক হয়নি, চিত্ত শুদ্ধ হয়নি। তখন আবার কোন বিপদ হবে কে জানে? সত্যবতী ভাবলেন—একবার যখন তাঁর পুত্রটিকে হাতের কাছে পাওয়া গেছে, তখন যেভাবেই হোক তাকে দিয়ে ঈপ্সিত কাজটি করিয়ে নিতে হবে। সত্যবতী তাঁর প্রিয় পুত্রকে কাতর হয়ে অনুরোধ জানালেন—বাবা! এখনই যাতে রানীরা গর্ভ ধারণ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাই করো, বাবা! —সদ্যো যথা প্রপদ্যেতে দেব্যৌ গর্ভং তথা কুরু। এ দেশে এখন রাজা নেই। অরাজক রাজ্যে বৃষ্টি হয় না, অরাজক রাজ্যের ওপর দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি থাকে না। আর আমরাই বা কী করে এই অরাজক রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করব। তাই বলছিলাম—তুমি বাবা আর বিলম্ব করো না। রানীরা যাতে এখনই গর্ভ ধারণ করতে পারেন, তুমি সেই ব্যবস্থা করো। সন্তান জন্মালে তাঁদের বড় করে তুলবেন মহামতি ভীষ্ম, তুমি কোনও চিন্তা করো না—তস্মাদ্ গর্ভং সমাধৎস ভীষ্মঃ সম্বর্ধয়িষ্যতি।

সত্যবতীর প্রস্তাব শুনেই বোঝা যায়—আজকের মহাকবি যে সাবেগে বলেছিলেন—কৌরব-পাণ্ডবের এক পিতামহ—সে কথাটা ততটা আক্ষরিক সত্য নয়। আসলে দুই পিতামহ—একজন মহামুনি ব্যাস, অন্যজন ক্ষত্রিয় ভীষ্ম। কাশীরাজের দুই কন্যাকে এনে তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। আজ বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তিনিই রয়ে গেলেন তাঁর সন্তানদের বড় করে তোলার জন্য। প্রকৃতির প্রতিশোধ বোধহয় এমনটাই হয়। যিনি বিবাহ করবেন না, রাজ্য গ্রহণ করবেন না বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে রইলেন, তাঁকেই সংসারের সবচেয়ে মায়াবদ্ধ জীবটির মতো ভাইয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্য, তাঁর ছেলেপিলে মানুষ করার জন্য সংসার আঁকড়ে বসে থাকতে হচ্ছে। সন্ন্যাসী মুনি মুহূর্তের গর্ভাধান-সম্পন্ন করে আবারও তপস্যায় ফিরে যাবেন, আর ক্ষত্রিয়ের তপস্যা এমনই যে, প্রতিজ্ঞাত সত্য রক্ষা করার জন্য, রাজ্য রক্ষার জন্য ভীষ্মকে সারা জীবন আরও এক সাধনা করে যেতে হবে। নিজে সন্তানহীন, অথচ সারা জীবন তাঁকে অন্যের সন্তানের মায়ায় মুগ্ধ হতে হবে—ভীষ্মঃ সম্বর্ধয়িষ্যতি।

ছেষট্টি

AMARBOI.COM

দ্বৈপায়ন বলেছিলেন—তোমার পুত্রবধূদের সম্বচ্ছর ধরে ব্রত-নিয়ম পালন করতে হবে, তবেই তাঁদের শুদ্ধ সত্তার মধ্যে সন্তানের জন্ম দেব আমি। সত্যবতীর উপরোধে ব্যাসের এই প্রস্তাব টিকল না। সত্যবতী দেরি করতে রাজি হলেন না। ব্যাস তখন বললেন—আমাকে যদি আকালিকভাবে এখনই পুত্র উৎপাদনে ব্রতী হতে হয়, তবে তোমার পুত্রবধূদের অনেক সহ্য-শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। তাঁদের সহ্য করতে হবে আমার বিকৃত রূপ এবং সেইটাই তাঁদের ব্রতের কাজ করবে—বিরূপতাং মে সহতাং তয়োরেতং পরং ব্রতম্। ব্যাস আরও বললেন—আমার শরীরে থাকবে দুর্গন্ধ, আমার রূপ হবে জঘন্য, আমার পরিধানেও থাকবে বিকারের ছোঁয়া। তোমার পুত্রবধূরা যদি এই সমস্ত বিকার মেনে নিয়েও আমার সঙ্গে সঙ্গত হতে পারেন, তবে আজই তাঁদের গর্ভে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মাবে—যদি মে সহতে গন্ধং রূপং বেশং তথা বপুঃ।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়, ব্যাস এইরকম একটা শর্ত দিলেন কেন? কেনই বা তাঁর চেহারায়, পরিধানে এই স্বেচ্ছাকৃত বিকার ঘনিয়ে আনছেন তিনি? আমাদের ধারণা, কারণ এখানে একটাই। সেকালের দিনের নিয়োগ-প্রথার সুফল হিসেবে একজন স্বামী-পুত্রহীনা নারীও সন্তানের মুখ দেখতে পারতেন। কিন্তু এই সন্তান-লাভের জন্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে ওঠাটা কোনও গৃহস্থ বাড়ির অভিভাবকেরই কাম্য হত না। আর এটাই তো স্বাভাবিক। ধরুন, কারও পুত্র স্বর্গত হয়েছে। ছেলের বউ সুস্থ, স্বাভাবিক এবং বয়স কম। তাঁর কোনও সন্তানও নেই। গৃহস্থ চান, তাঁর পুত্রবধূর কোলে একটি সন্তান আসুক। এই অবস্থায় সেকালের প্রথায় গৃহস্থ মানুষ অন্যের দ্বারা গর্ভাধান করাতে রাজি হলেও তিনি কি চাইবেন যে তাঁর পুত্রের প্রেমাস্পদা বধূ অন্যের লালায়িত লালসার বিষয়ীভূত হোন।

আমরা জানি, এমনটি কেউ চাইবেন না। সেকালের দিনের নিয়োগ প্রথাতেও তাই কিছু বিধি-নিয়ম ছিল। নিয়োগ প্রথায় নিযুক্ত পুরুষ মানুষটির গায়ে ঘি, দই, লবণ ইত্যাদি মাখিয়ে তাকে একেবারে জ্যাবজ্যাব করে ফেলা হত, যাতে সেই পুরুষের দেহ-স্পর্শ কোনওমতেই এক রমণীর হৃদয়ে প্রফুল্লতা না আনে। গর্ভাধান সম্পন্ন হত অন্ধকারে, যাতে সেই পুরুষের রূপ রমণীর মনে কোনও সুখচ্ছায়া না ফেলে। পরিষ্কার বোঝা যায়—গর্ভাধানের মতো কর্তব্য কর্মটির মধ্যে শুধু কর্তব্য ছাড়া আর কিছুই থাকুক— এটা তখনকার সামাজিকেরা চাইতেন না।

আজকের সামাজিক বিচারে এই প্রথা কতটা নৃশংস অথবা নিযুক্তা রমণীর মতামতের অপেক্ষা না করে শুধু বৃদ্ধদের অনুমতিতে এই প্রথা সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কতটা সুবিচার ছিল, সে কথা আজকের পরিশীলিত সমাজিক মননে বিচার করে কোনও লাভ নেই। কেননা আজকের সামাজিক নীতি-নিয়মগুলিও হয়ত সেকালের মাপকাঠিতে অতীব নৃশংস। কাজেই সেই তারতম্যের আলোচনায় না যাওয়াই ভাল। আমাদের বক্তব্য—ব্যাস যে এই বিকৃত রূপ, পরিধানের বিকার তথা নিজ দেহকে দুর্গন্ধময় করে তুলে বিচিত্রবীর্যের বধূদের সামনে এক অসহ্য বিকার প্রকট করে তুলতে চাইলেন, তার পিছনে কারণ একটাই। কোনওভাবেই যেন এখানে কামনার অবকাশ না থাকে। তাঁকে যেন কোনওভাবেই রানীদের ভাল না লাগে। সাধারণ নিয়োগ-প্রথায় যেমন ঘৃত-দধি মাখানোর ব্যবস্থাও থাকে, ব্যাস সেই রাস্তায় গেলেন না। এমনকি নিশীথের অন্ধকারে তিনি আলোর ব্যবস্থাও রাখতে বলেছেন। অন্ধকারে থাকলে কল্পনায় একজনকে সুপুরুষ ভাবা যেতে পারে। ব্যাস সে ফাঁকটুকুও রাখেননি। তাঁর চেহারায় তিনি এমনই এক ঘৃণ্য-বিকার ঘনিয়ে তুলবেন, যেন তা দেখেই আর কোনও সুখ-কল্পনার অবকাশ থাকবে না। যাঁরা ভাবেন—দ্বৈপায়ন ব্যাস রানীদের শয্যায় অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হবেন, তাঁদের এই অলৌকিকতার মধ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করি। অথবা ব্যাস যে বিকার নিয়ে রানীদের সামনে উপস্থিত হবেন, তা এতটাই অস্বাভাবিক যে, একভাবে সেটাকে আবির্ভাবই বলা যেতে পারে। এই আবির্ভাবে সমস্ত কামনা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর সেই ছাই থেকেই জন্মাবে কর্তব্যের অঙ্কুর; দাবাগ্নিদগ্ধ কদলীকান্ড থেকেও যেমন অঙ্কুরোৎপত্তি হয় সেইরকম।

ব্যাসের দিক থেকে গর্ভাধানের সংকেত লাভ করে সত্যবতী বড় রানী অম্বিকার কাছে উপস্থিত হলেন, নির্জনে—মানসিকভাবে তাঁকে প্রস্তুত করানোর জন্য। বিচিত্রবীর্যের অন্যতম প্রিয়তমা মহিষী অম্বিকা। তিনি এতকালের রাজরানী। সত্যবতীর মতো না হলেও তাঁরও কিছু ব্যক্তিত্ব আছে। হঠাৎ করে তাঁর কাছে গিয়ে বলা যায় না—তুমি প্রস্তুত হও, তোমার ভাশুর আসছেন তোমার সঙ্গে মিলিত হতে। সত্যবতী জানেন—প্রলোভনের বস্তু এমন কিছু তাঁর সামনে উপস্থিত করতে হবে, যাতে তাঁর পুত্রবধূ স্বয়ংই আকর্ষণ বোধ করেন। তার সঙ্গে থাকতে হবে সামাজিক আচার এবং ধর্মের প্রলেপ। সত্যবতী ভূয়োদর্শিনী, মনস্বিনী। রাজরানীর ব্যক্তিত্ব স্মরণ করেই সত্যবতী যুক্তি সাজালেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। বললেন—কৌশল্যা!

আমরা আগে বলেছি—কোশল দেশটি কাশীর সঙ্গে এক সময় রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হয়েছিল এবং অম্বিকার পিতা কাশীরাজ মূলত কোশল দেশের জাতক না হলেও অম্বিকার সঙ্গে কোশলদেশের যোগাযোগ ছিল জন্মগত। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে 'কৌশল্যা' বলে ডেকে

সত্যবতী যেমন তাঁর নিজের মুখে পুত্রবধূর বাপের বাড়ির স্নেহমমতা ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি একাধারে তিনি তাঁর পুত্রবধূর মধ্যে একটি দেশের ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ভাবটা এই—কোশল দেশের মায়ায় তোমাকে যেমন কৌশল্যা বলে ডাকছি, তেমনি আজকে তোমার ডাক পড়েছে হস্তিনার জনসাধারণের কাছ থেকে। তাঁদের কথাও তোমাকে ভাবতে হবে।

সত্যবতী বললেন—কৌশল্যা! তোমার কাছে ধর্ম-সম্মত কথাই একটা বলব। কিন্তু কথাটা আগেই না বলে সত্যবতী নিজেকে দায়ী করলেন প্রাথমিকভাবে। কথার মধ্যে পুত্রবধূর নিরুপায়তা এবং নির্দোষত্ব বজায় রেখে নিজের ওপর দোষ চাপানোটাই সত্যবতীর মনস্বিতা। সত্যবতী বললেন— সবই আমার কপালের দোষ, অম্বিকা! আমার কপাল-দোষেই আজ এই প্রসিদ্ধ ভরত বংশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে—ভরতানাং সমুচ্ছেদো ব্যক্তং মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ। আমি তো এই বংশলোপের ভয়ে খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। আমার-তোমার পিতৃবংশীয় লোকেরা অর্থাৎ আমাদের শ্বশুরকুলের সবাই তো সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় বুদ্ধিমান ভীষ্ম এই বংশের বৃদ্ধির জন্য আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছেন—ভীষ্মো বুদ্ধিমদান্মহ্যং কুলস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে।

আমরা জানি— বুদ্ধিটা সত্যবতীরই, ভীষ্ম সেটাকে সাদর সমর্থন করেছেন। পুত্রবধূদের কাছে মহামতি ভীষ্মের কথাটা বেশি মর্যাদাকর এবং ওজনদার হবে ভেবেই সত্যবতী ভীষ্মের নাম করে অম্বিকাকে বললেন—ভীষ্ম আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছেন ঠিকই, তবে সে বুদ্ধির সফলতা নির্ভর করছে সম্পূর্ণই তোমার ওপর—সা চ বুদ্ধি-স্তয্যধীনা। আমার ইচ্ছা—তুমি বুদ্ধি সফল করে লুপ্তপ্রায় ভরত বংশকে পুনরুদ্ধার করো— নষ্টঞ্চ ভারতং বংশং পুনরেব সমুদ্ধর। ভীষ্মের বুদ্ধিটা আসলে কী—সত্যবতী তা স্পষ্ট করে কিছু বললেন না, কেননা তিনি আন্দাজ করতে পারেন—রাজবধূরা আকারে ইঙ্গিতে ঠিকই কিছু বুঝেছেন। নিয়োগ-প্রথা সেকালের সমাজ-সচল প্রথা হলেও রাজবধূদের দিক থেকে সংকোচ কিছু থাকবেই। সেই সংকোচ এবং লজ্জার শব্দমাত্রও উচ্চারণ না করে যে বিষয়ে তাঁর পুত্রবধূটি প্রলুব্ধ হয়ে রয়েছেন, সত্যবতী সেই কথা উচ্চারণ করলেন। সত্যবতী বললেন—সুশ্রোণী! (এই শব্দের ব্যঞ্জনা—এখনও তোমার রূপ-যৌবন-বয়স যে কোনও পুরুষের কাম্য) দেবরাজ ইন্দ্রের মতো একটি ছেলে হতে পারে তোমার। তুমিই সেই অসামান্য পুত্রের জন্ম দিতে পার—পুত্রং জনয় সুশ্রোণি দেবরাজসমপ্রভম্। তোমার সেই গর্ভজাত পুত্রই এই বিখ্যাত বংশের ধারা রক্ষা করবে, আর সেই পুত্রই হবে ভবিষ্যতের রাজা—স হি রাজ্যধুরং গুর্বীমুদ্‌বক্ষ্যতি কুলস্য নঃ।

পুত্রহীনা রমণীর কাছে পুত্রের আশ্বাস যতটুকু মধুর লাগে, অম্বিকার কাছে ততটাই নিশ্চয় মধুর লাগল সত্যবতীর আশ্বাস। কিন্তু যে উপায়ে সেই বহু প্রতীক্ষিত পুত্রলাভ ঘটবে, সেই উপায়টি অম্বিকার কাছে কতখানি অবাঞ্ছিত—তা কি সত্যবতী জানেন? জানেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনিও নিরুপায় অথবা 'ডেসপারেট'। এক অতি সুখী পুত্রবতী জননী অন্য এক পুত্রহীনা দুঃখিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমাকে বলেছিলেন—আমি যদি হতাম, আমি যে কোনও উপায়ে পুত্রলাভ করতাম। তাতে যদি অপরিচিত কারও সঙ্গে মুহূর্তের জন্য যান্ত্রিকভাবে সঙ্গতও হতে হত, তাও আমি লজ্জিত হতাম না। আমি জানি— পুত্রহীনার চোখের জল দেখেই, তিনি এত বড় কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে স্বামী বেঁচে থাকতে বা স্বামী স্বর্গত

হলে ভারতবর্ষের সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত রুচিতেও অনীপ্সিত পুরুষের সাহচর্যে গর্ভধারণ যে কতটা বেদনার, তা বুঝতে পারবেন তিনিই, যিনি এমন অস্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ করেছেন।

পুত্রহীনা অম্বিকা পুত্রের আশ্বাস পেয়ে যতটা আনন্দ লাভ করলেন, দুঃখও পেলেন ঠিক ততটাই। মহাভারতের কবি এই দুঃখটা বর্ণনা করেছেন অদ্ভুত একটা শব্দ প্রয়োগ করে। তিনি বলেছেন—সত্যবতী ধর্মের দোহাই দিয়ে, এই কাজের ধর্মসঙ্গতি যথাসম্ভব ব্যাখা করে অনেক বোঝালেন অম্বিকাকে এবং বহু কষ্টে তাঁকে রাজিও করালেন—সা ধর্মতো'নুনী য়ৈনাং কথঞ্চিদ্ ধর্মচারিণীম্। কী রকম অম্বিকা? বিশেষণ দিচ্ছেন—ধর্মচারিণীম্। এর সোজা অর্থ হল, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বৈধব্যের কারণে ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ব্রত-নিয়মের কাঠিন্যে ব্রহ্মচারিণীর মতো জীবনযাপন করছেন, সত্যবতী তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করালেন। কিন্তু অর্থটা যে এত সোজা নয় তা বলে দিয়েছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ। তিনি বলেছেন—কথঞ্চিৎ, মানে কোনও প্রকারে বহু কষ্টেসৃষ্টে । যিনি অন্য পুরুষের স্পর্শ কোনওভাবেই সহ্য করতে পারছেন না, এই রকম অম্বিকাকে বহু কষ্টে রাজি করালেন—এনাং পুরুষান্তরস্পর্শম্ অনিচ্ছন্তীম্ ইতি সূচয়তি— কথঞ্চিদিতি।

অম্বিকা শাশুড়ির মুখে বংশের প্রয়োজন এবং তাঁর ধর্ম-সম্মত ব্যাখ্যা শুনে কোনওমতে তাঁর প্রস্তাবে নিমরাজি হতেই রাজবাড়িতে উৎসব লেগে গেল। সত্যবতী ব্রাহ্মণদের ডেকে, মহর্ষি-দেবর্ষিদের ডেকে খুব করে ভোজ দিলেন। ক্রমে দিন শেষে রাত্রি হল। সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূ অম্বিকাকে শয়ন-গৃহে নিয়ে গেলেন ধীরে, সযত্নে। তাঁর গলার স্বর মৃদু হল, সত্যবতী বললেন—অম্বিকা! তোমার এক ভাশুর আছেন, তিনি আজ তোমার সঙ্গে মিলিত হতে আসবেন। তুমি সাবধানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করো। রাত্রির অর্ধকাল অতীত হলে তিনি আসবেন। তাঁর লক্ষ্য কিন্তু তুমিই— অপ্রমত্তা প্রতীক্ষ্যৈনং নিশীথে হ্যাগমিষ্যতি। সত্যবতী অম্বিকার মানসিক প্রস্তুতি খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে শয়ন-গৃহ ছেড়ে চলে গেলেন।

একা মহার্ঘ শয্যায় শুয়ে রইলেন অম্বিকা। কাশীরাজনন্দিনী, বিচিত্রবীর্যের প্রথমা প্রেয়সী। ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছিল অনেক—দীপ্যমানেষু দীপেষু। অম্বিকা রাজবাড়ির এক বিদগ্ধা রমণী। ভরত বংশের ধারা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে কোনওদিন তাঁকে এমন অস্বস্তিতে পড়তে হবে, এমন কথা তিনি ভাবেননি। সত্যবতী তাঁকে বলে গেলেন— তোমার ভাশুর আসবেন নিশীথিনীর অন্ধকারে। কিন্তু কে এই ভাশুর? ভীষ্ম কি? অন্য কেউ যিনি ভাশুর-স্থানীয়? অম্বিকা এক এক করে ভাবতে লাগলেন। তাঁদের চেহারা, হাব-ভাব বয়স, মিলিত হবার সময় তাঁদের একেকজনের বিকার—এই সব—সা'চিন্তয়ত্তদা ভীষ্মমন্যাংশ্চ কুরুপুঙ্গবান্। বহুতর দীপালোকিত শয়ন-কক্ষে কত শত কথা তাঁর মনে আসছে—ভীষ্ম তাঁদের তিন বোনকে হরণ করে নিয়ে এলেন, মহারাজ বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, তাঁর প্রাণাধিক ভালবাসা, তাঁর মৃত্যু এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজ এই রম্য অভিযান—এত সব ভাবতে ভাবতেই রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত হল।

মহর্ষি বেদব্যাস উপস্থিত হলেন অম্বিকার শয়ন কক্ষে—শয়নং প্রবিবেশ হ। মহাভারতের কথক-ঠাকুর তাঁর কথাগুরু বেদব্যাসের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—তাঁর মাথায় ছিল

AMARBOI.COM

পিঙ্গল জটাভার, এক গাল দাড়ি, কালো গায়ের রঙ, আর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল—তস্য কৃষ্ণস্য কপিলাং জটাং দীপ্তে চ লোচনে। দ্বৈপায়ন তাঁর মাকে বলেছিলেন—আজই যদি তোমার বধূর সঙ্গে মিলন চাও, তবে আমার বিকৃত রূপ, বিকৃত বেশ আর গায়ের দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে তোমার বধূকে। আমাদের ধারণা—তিনি আর নতুন কী বিকার ঘনিয়ে আনবেন নিজের চেহারায়। তাঁর চেহারাটাই তো ওইরকম। আমরা ছোটবেলায় বৈষ্ণব-সজ্জনদের মুখে মহামতি ব্যাসের একটা ধ্যানমন্ত্র শুনতাম। সেই শ্লোক মন্ত্রে ব্যাসের প্রথম উপাধি হল—বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনে যাঁর বুদ্ধি পরিশীলিত হয়েছে এই তাঁর আন্তর রূপ। দ্বিতীয় রূপ হল বাহ্যরূপ—চামড়ার কাপড় পরিধানে, কালো গায়ের রঙ, মাথায় কপিল-তুঙ্গ জটাভার—কৃষ্ণত্বিষং কনকতুঙ্গ-জটাকলাপম্। আর মধ্যে আছে দুটি আগুনের ভাঁটার মতো চোখ—

রাজবাড়ির সার্বত্রিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যে রাজবধূ জীবন কাটিয়েছেন, যিনি ভীষ্ম কিংবা রাজপরিবারের ভাশুর স্থানীয় অন্য কারও কথা ভেবে নিজের মনকে তবু একটু প্রস্তুত করছিলেন, সেই রাজবধূ রাজবালা মহর্ষি বেদব্যাসের এই অকল্পনীয় রূপ দেখে ভয়ে চোখ বুজলেন— দৃষ্ট্বা দেবী ন্যমীলয়ৎ। ঘরে দীপ জ্বালা রয়েছে ব্যাস উপস্থিত হয়ে রমণীর হৃদয়হারী কোনও চাটুবাক্য বললেন না, কোনও শৃঙ্গার-নর্মে মন দিলেন না। শুধু মায়ের ইচ্ছাপূরণ করে ইতিকর্তব্য পালন করলেন। ওদিকে অদ্ভুত আশঙ্কায়, ভয়ে রাজবধূ অম্বিকা চক্ষু মুদে আপন রুচি-বিরোধী এক পুরুষ-সংসর্গ সহ্য করে গেলেন। একবারের জন্যও তিনি চোখ খুলে ব্যাসের দিকে আর তাকালেন না— ভয়াৎ কাশীসুতা তন্তু নাশক্নোদভিবীক্ষতুম্।

রানীর শয়ন-কক্ষ থেকে ব্যাস বেরিয়ে চলে যাবার পথেই তাঁকে ধরলেন সত্যবতী। জিজ্ঞাসা করলেন—খুব ভাল ছেলে হবে তো, বাবা। রাজার ছেলে রাজপুত্রের মতোই হবে তো সে— অপ্যস্যাং গুণবান্ পুত্র রাজপুত্রো ভবিষ্যতি? সত্যবতীও বোধহয় পুত্রের চেহারা দেখে তত ভরসা পাননি। অবশ্য প্রশ্নটাও ঠিক পুত্রের কাছে মায়ের মতো নয়। এ যেন ভবিষ্যদ-দ্রষ্টা এক ঋষির কাছে সাধারণ রমণীর আকুতি—ভাল ছেলে হবে তো, বাবা! ব্যাস জননীর কথা শুনে দৈবপ্রেরিত ব্যক্তির দূরদৃষ্টিতে বললেন—মা! এই রানীর গর্ভে যে ছেলেটি হবে, তাঁর গায়ে থাকবে হাতির মতো শক্তি। তিনি বিদ্বান, ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান হবেন যথেষ্টই। কিন্তু সেই ভাবী ছেলের মা এমনই একটা ব্যবহার করল, যে ছেলেটি তাঁর অন্ধ হয়েই জন্মাবে—কিন্তু মাতুঃ স বৈগুণাদ্ অন্ধ এব ভবিষ্যতি।

সত্যবতী বললেন—কী সর্ব্বনেশে কথা, বাবা! একজন অন্ধ মানুষ কি কুরুবংশের উপযুক্ত রাজা হতে পারে— নান্ধঃ কুরূণাং নৃপতিরনুরূপস্তপোধন? তুমি বাপু কুরুবংশের উপযুক্ত, রাজা হওয়ার মতো একটি পুত্র-জন্মের ভাবনা করো। সে'ও তার পিতার বংশের ধারা বজায় রাখবে। ব্যাস আর কী করেন। মায়ের কথায় রাজি হলেন আবার।

কাশীরাজনন্দিনী অম্বিকা যথা সময়ে একটি অন্ধ পুত্র প্রসব করলেন। এখনকার দিনে হলে বলা যেত, অনীপ্সিত এক ধর্ষণের ফলেই অম্বিকার পুত্রের এই অঙ্গহানির বিকার ঘটেছে। অথবা ব্যাসের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ওপর ভরসা না থাকলে বলা যায়—অম্বিকার পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মানোর পরেই সত্যবতী তাঁর দ্বিতীয় অনুরোধটি করেছেন ব্যাসের কাছে। এই অনুরোধের মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ অম্বিকা অলৌকিকভাবে ব্যাসের মিলন-মুহূর্তেই তাঁর

সদ্যগর্ভ প্রসব করেননি। তিনি সন্তান ধারণ করেছেন এবং যথাকালেই প্রসব করেছেন—সাপি কালে চ কৌশল্যা সুষুবে'ন্ধং তমাত্মজম্।

অন্ধ পুত্রের মুখ দেখে ভুয়োদর্শিনী সত্যবতী আবারও আহ্বান জানালেন ব্যাসকে। এবারে এবার বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয়া মহিষী অম্বালিকার পালা। সত্যবতী তাকেও ধীরে-মধুরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শয়ন-কক্ষে পাঠালেন—পুনরেব তু সা দেবী পরিভাষ্য স্নুষাং ততঃ।

অম্বালিকা অপেক্ষা করতে লাগলেন নিযুক্ত পুরুষ ব্যাসের আগমনের জন্য। ব্যাস একইভাবে জটা-দাড়ি আর দীপ্ত চক্ষুর বিকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হলেন অম্বালিকার শয়ন-প্রকোষ্ঠে—ততস্তেনৈব বিধিনা মহর্ষিস্তামপদ্যত। অগ্রজা অম্বিকার অভিজ্ঞতায় অম্বালিকা মনের জোর করেই চোখ বন্ধ করলেন না বটে, কিন্তু ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন একেবারে। সেই ভয়েই তিনি বুঝি একেবারে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন— বিবর্ণা পাণ্ডুসঙ্কাশা সমপদ্যত ভারত। মিলন সম্পূর্ণ হল এইভাবেই— ভয়ে, বিবর্ণতায়।

আগের বারে যাঁর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল, সেই ভীতা নিমীলিতচক্ষু অম্বিকার সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগই পাননি ব্যাস। এক অন্তহীন বিকর্ষণের মধ্যেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এবারে শত শত প্রজ্বলিত দীপামালার মধ্যে তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকা এক বিবর্ণ মলিন সন্ত্রস্ত মুখ ব্যাস দেখতে পেলেন। সে মুখের মধ্যে তৃপ্তির আভাস ফুটে না উঠলেও, তার মধ্যে অনভিনন্দন বা সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাব ছিল না। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা রমণীর মুখপানে তাকিয়ে ব্যাস দুটো কথা বলার সুযোগ পেলেন। বললেন—আমার এই বিরূপ বিষম আকৃতি দেখে তুমি যখন এমন বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেলে, তাই তোমার পুত্রটির চেহারাও হবে এইরকম নিষ্প্রভ বিবর্ণ গোছের। আমি বলি—তার নাম রেখো পাণ্ডু—তস্মাদেষ সুতস্তে বৈ পাণ্ডুরেব ভবিষ্যতি। মাথা নত করলেন অম্বালিকা।

শয়ন-কক্ষ থেকে নির্গত হতেই দ্বৈপায়নকে ধরলেন সত্যবতী। বললেন—এবারে একটি সুলক্ষণ পুত্রের জন্ম হবে তো? ব্যাস বললেন—এই পুত্রটি যথাকালে প্রবল পরাক্রান্ত এবং জগদ্বিখ্যাত হবে। কিন্তু মা! অম্বালিকার পূর্ব আচরণ আচরণনুযায়ী এই ছেলেটির গায়ের রঙ হবে বিবর্ণ পাণ্ডু।

গায়ের রঙ দিয়ে আর কী হবে! সত্যবতী খুব একটা হতাশ হলেন না। কিন্তু তবুও আবার কী মনে করে দ্বৈপায়ন পুত্রকে তিনি তৃতীয়বার অনুরোধ করে বসলেন। হয়ত এই অনুরোধও পাণ্ডু জন্মাবার পরেই তিনি করেছিলেন। হয়ত বা পাণ্ডুর বিবর্ণতা দেখে তাঁর বড় কোনও আশঙ্কা হয়নি। কিন্তু একবারের তরেও হয়ত বড় রানী অম্বিকার দশা দেখে তাঁর মায়া হয়েছিল। হয়তো ভেবেছিলেন—স্বামী বেঁচে নেই এবং একটি জন্মান্ধ পুত্রের মুখ দেখে সারাজীবন কাটাতে হবে তাকে। মনে মনে হয়ত সে দুষবে তার শাশুড়িকে। সত্যবতীর জন্যই তো তার এই দুর্দশা। সত্যবতী মাতৃসুলভ বায়না করে ব্যাসকে তৃতীয়বার অনুরোধ জানালেন—আরও একবার অম্বিকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

জন্মেই যে বিরাগী পিতার সঙ্গে তপস্যায় চলে গিয়েছিল, সে পুত্রের মনে মাতৃকৃত্যের দায় ছিল। ব্যাস মায়ের কথায় রাজি হলেন। ওদিকে পাণ্ডু জন্মালেন। চেহারাটি বিবর্ণ হলেও রাজা হওয়ার মতো সমস্ত লক্ষণই তাঁর মধ্যে ছিল অতি প্রকট—পাণ্ডুলক্ষণসম্পন্নং দীপ্যমানমিব

AMARBOI.COM

প্রিয়া। সত্যবতী আবারও ব্যাসকে আহ্বান জানালেন এবং আবারও বড় রানী অম্বিকাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করলেন। অম্বিকা সামনাসামনি সত্যবতীর কথা অমান্য করলেন না। কিন্তু মহর্ষির তপঃক্লিষ্ট দেহের সেই দুঃসহ গন্ধ, ওই জটা-দাড়ির ঘন সন্নিবেশ— তিনি মনে মনে মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি ভাবলেন—শাশুড়ির কথা মাথায় থাক। তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার ওই বিষমরূপী মহর্ষির সঙ্গ করা সম্ভব নয়— নাকরোদ্ বচনং দেব্যা ভয়াৎ সুরসুতোপমা।

শাশুড়ির কাছে তিনি স্বীকার করে এসেছিলেন বলেই নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারে সত্যবতী কোনও সন্দেহও করেননি। কিন্তু অম্বিকার বুদ্ধি ছিল অন্যরকম। নির্দিষ্ট দিনে তিনি ঠিক করলেন—নিজে নয়, তাঁর সুন্দরী দাসীটিকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন সেই শয়নকক্ষে—সেখানে ব্যাস আসবেন জননীর অনুরোধ মেনে নতুন করে গর্ভাধান করার জন্য। নিশীথিনীর মায়া-শয়নে মুনির চিত্ত যাতে বিগলিত হয়, তার জন্য অম্বিকা নিজে তাঁর দাসীটিকে খুব করে সাজালেন। রাজ-আভরণে, বসনে-ভূষণে দাসীটিকে অপ্সরার মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল—ততঃ স্বৈর্ভূষণৈ র্দাসীং ভূষয়িত্বাপ্সরোপমাম্।

আধুনিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই যে দাসীর কথা বললাম, এঁদের সামাজিক স্থিতি মোটেই ভাল ছিল না। কোনও রাজার বাড়িতে এঁরা থাকতেন, অথবা রাজারা এঁদের কিনে নিতেন। তারপর রাজকন্যার বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে এই অসহায়া রমণীদের পাঠিয়ে দেওয়া হত রাজকন্যার সঙ্গে। প্রথমত নতুন রাজবাড়িতে রাজকন্যার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, নতুন বাড়িতে লজ্জানম্রা, রাজবধূ যাতে সহজ হয়ে উঠতে পারেন নতুন আস্তানায়, সে ব্যাপারে এঁরা সাহায্য করতেন। দ্বিতীয়ত, রাজবধূরা যখন ঋতুর কারণে স্বামী-সহবাসে অক্ষম হতেন, তখন রাজাদের সঙ্গ দিতেন এই রমণীরাই।

জাতিগতভাবে এঁরা সমাজের তিন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ঘরের মেয়ে হতেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এঁরা ছিলেন শূদ্র বর্ণের। কিন্তু সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে এঁরা অনেকেই ছিলেন যথেষ্ট সুন্দরী এবং সৌন্দর্যের কারণেই এক রাজা তাঁদের যৌতুক দিতেন, অন্য রাজা তাঁদের ভোগ করতেন। মহাকাব্যের সমাজে এই দাসীরা অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজা বা মুনি-ঋষির জননী হয়েছেন।

আমরা পূর্বে দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ মুনির কাহিনী কীর্তন করেছি। হস্তিনার রাজবাড়িতে পুত্রোৎপাদনের জন্য ব্যাসের নিয়োগের পূর্বে ভীষ্ম এই দীর্ঘতমারই উদাহরণ দিয়েছিলেন সত্যবতীর কাছে। অঙ্গ-দেশের রাজা বলি তাঁর স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্র-উৎপাদনের জন্য অন্ধ দীর্ঘতমাকে নিয়োগ করেন। অন্ধতার সঙ্গে দীর্ঘতমার বার্ধক্যও ছিল আর ছিল কিছু যৌন বিকারও। রাজরানী সুদেষ্ণা অপুত্রক হলেও রাজকীয় রুচিতে বাধে বলে এই অন্ধ-বৃদ্ধ মুনির সঙ্গে—অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ তং জ্ঞাত্বা—সহবাস করতে রাজি হননি প্রথমে। অতএব তিনিও প্রথমে তাঁর দাসীটিকেই সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দীর্ঘতমার কাছে। সে শূদ্রা রমণীর গর্ভে যে সব পুত্র জন্মে তাঁরা অনেকেই ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-মুনি। তাঁদের মধ্যে কাক্ষীবান তো রীতিমতো বিখ্যাত।

আমাদের ধারণা, হস্তিনার রাজবধূ দীর্ঘতমার উদাহরণেই নিজের দাসীটিকে নিজের

বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করে পাঠিয়ে দিলেন মহর্ষি বেদব্যাসের কাছে—প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় ততঃ কাশীপতেঃ সুতা। রাজবাড়ির দাসীর কাছে এ ছিল অপরিমিত সৌভাগ্য। সে চিরকাল রাজার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। রতি-রঙ্গের যাতনাটুকুই তার কাছে সাধারণ, রাজার সন্তান ধারণের সুযোগ তার সবসময় হয় না। আজ সে পুত্রলাভের জন্য সাদরে নিযুক্তা। তাছাড়া পরমর্ষি বেদব্যাসের সম্মান-মর্যাদা সেও কি জানে না? সে হস্তিনার রাজবাড়িতে থাকে; রাজকীয় পরিশীলনে তার বোধ অনেক উন্নত হয়ে গেছে এবং ইতোমধ্যে দুই রাজবধূর গর্ভে দুটি পুত্রসন্তান দেখে আজ সে আপ্লুত বোধ করছে। মহামুনি ব্যাস তাঁর গর্ভে পুত্র জন্মাবেন এই মর্যাদায় আজ সে অভিভূত।

এতকাল কী হয়েছে, বিচিত্রবীর্যের রানীরা বিষণ্ণ মুখে বিষন্ন ভাবনায় ঘরে শুয়ে থেকেছেন। কোনও আমন্ত্রণ নেই, অভিবাদন নেই অভিনন্দন তো দূরের কথা। রাজরানীর পরিশীলিত রুচিতে তথা আধুনিক দৃষ্টিতেও ব্যাসের প্রতি এই আচরণ হয়ত অসম্মত নয়। কিন্তু ব্যাসের দিক থেকে ব্যাপারটা কী রকম? তিনি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিতে এসেছেন তৎকালীন সামাজিক প্রথা মেনে এবং রীতিমতো আমন্ত্রিত হয়ে। তাঁর কাছে রাজবধূদের এই বিষবৎ পরিহারের আচরণ কেমন লেগেছে ?

আজ কিন্তু সেরকম ঘটল না। আজ তিনি দেখলেন—এক সুন্দরী রমণী সর্বাভরণ ভূষিতা হয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছে। শয়নকক্ষে নয়, রাজগৃহের দ্বারে। তিনি আসতেই সে রমণী তাঁকে সাদরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল শয়নকক্ষ পর্যন্ত—সা তমৃষিম্ অনুপ্রাপ্তং প্রত্যুদ্‌গম্যাভিবাদ্য চ। ঋষির অনুমতি নিয়েই সে তাঁকে আসন দিল বসতে, আহার দিল ফল-মূল। ভারি খুশি হলেন বেদব্যাস। তাঁর শুষ্ক-রুক্ষ মুনি-জীবনে কোনও সুন্দরী রমণী এমন মধুর ব্যবহার করেনি তাঁর সঙ্গে। ব্যাস বড় খুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে বসে বসে বেশ খানিকক্ষণ গল্প করলেন। গল্পে-সল্পে, কথারঙ্গে কখনও তার হাত দুটি ধরলেন মুনি, কখনও হাত রাখলেন কাঁধে, পিঠে; 'কানে কানে কহিবার ছলে' দাসীর লজ্জারুণ কুসুম-কপোল চুম্বনও করলেন হয়ত—বাগ্‌ভাবোপপ্রদানেন গাত্র-সংস্পর্শনেন চ। লগ্ন অনুকূল হল, আলিঙ্গন ঘনতর হল। ব্যাস দাসীর সঙ্গসুখে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন—কামোপভোগেন রহস্তস্যাং তুষ্টিমগাদৃষিঃ।

হয়ত এই তৃপ্তির কারণও ছিল। এখানে নিয়োগ প্রথার নিয়ম মেনে কামনার গন্ধহীন কোনও যান্ত্রিকতা নেই। মহর্ষির দিক থেকেও নেই, শূদ্রা দাসীর দিক থেকেও নেই। অন্যদিকে সত্যবতী পূর্বে ব্যাসকে ডেকে এনে বলেছিলেন—তুমি তোমার ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে বিচিত্রবীর্যের এবং তোমার নিজেরও পুত্র উৎপাদন করো—অনুরূপং কুলস্যাস্য সন্তত্যাঃ প্রসবস্য চ। আমাদের ধারণা বিচিত্রবীর্যের দুই রানীর গর্ভে দুটি পুত্র উৎপাদন করার পর এই যে তৃতীয় দাসী—এই দাসীগর্ভজাত পুত্রটিকেই তাঁর একান্ত আপন পুত্র মনে করেই ব্যাস পরম আনন্দ লাভ করলেন। মহর্ষির বিবাহ হয়নি। সমাজের বিধান অনুযায়ী না হলেও এই শূদ্রা দাসীর অভিবাদন অভিনন্দনে তিনি প্রথম বিবাহের আনন্দ পেলেন যেন।

সহবাসের অন্তে পরম প্রীত ব্যাস—মহর্ষিঃ প্রিয়মানয়া—দাসীর কপালে হস্তস্পর্শ করে বললেন—আমার অনুগ্রহে আজ থেকে আর তুমি দাসী থাকবে না—অভুজিষ্যা ভবিষ্যতি। ব্যাস আরও বললেন—আমি মনে করি কোনও মহাপুরুষ আসছেন তোমার গর্ভে—অয়ঞ্চ তে

শুভে গর্ভঃ শ্রেয়ানুদরমাগতঃ। যিনি তোমার পুত্র হয়ে জন্মাবেন তিনি হবেন পরম ধার্মিক এবং বুদ্ধিমান মানুষের মধ্যে তিনি হবেন শ্রেষ্ঠ। দাসীকে আশীর্বাদ করে দ্বৈপায়ন ব্যাস বাইরে এলেন। জননীর কাছে বিদায় নেবার সময় বড় রানী অম্বিকার ছলিক আচরণের কথাও যেমন জানালেন, তেমনি জানালেন, শূদ্রা দাসীর সঙ্গে তাঁর আনন্দ-মিলনের কথা—প্রলম্ভম্ আত্মনশ্চৈব শূদ্রায়াং পুত্রজন্ম চ।

মায়ের ঋণ তো কখনও পূরণ করা যায় না। কিন্তু জন্ম থেকেই যিনি তপস্বীর ব্রত গ্রহণ করেছেন, তিনি অন্তত তিন-তিনবার মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে সন্তানের ঋণ শোধার চেষ্টা করে গেলেন। কারণ সেকালের ধারণা ছিল—সন্তানের জন্ম হলে তাঁদের ভাল মন্দ নিয়ে যখন মানুষ ব্যাপৃত থাকে, সন্তানের মূত্রপুরীষ পরিষ্কার করে তাদের বড় করে তোলার জন্য মানুষ যে কষ্ট এবং ভাবনা করে সে ভাবনার মাধ্যমেই একভাবে পিতৃ-মাতৃ-ঋণ খানিকটা শোধ হয়। ব্যাস তপস্বী, তাই মায়ের অনুজ্ঞা পালন করে সন্তানের জন্ম দিয়ে গেলেন, কিন্তু তাদের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন তাঁরই গৃহস্থাংশ ভীষ্মের ওপর। কিন্তু ভাবনার সময় যখন আসবে, তখন তাঁকে বারবার ঠিক ফিরে আসতে হবে হস্তিনার দ্বন্দ্ব-দীর্ণ সংসারের প্রাঙ্গণে। বারবার তাঁকে সত্যের পথ বলে দেবার জন্য আশ্রম ছেড়ে আসতে হবে। আসতে হবে মমতার টানে, নাড়ির টানে। আসতে হবে মহাভারতের কবি হয়ে ওঠার উপকরণ সংগ্রহের জন্য—স্রষ্টার মতো, সাক্ষী-চৈতন্যের মতো।

নির্দেশিকা/নির্ঘণ্ট

অ

অংশুমতী ৩৪২
অকৃতব্রণ ৪২১-২৮
অক্রূর ৩৫০, ৩৮০, ৩৯৮, ৪০০
অগস্ত্য ১৮২-৮৩, ১৮৬-৮৭
অগ্নি ৩২-৩৩, ৯৪, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৩, ১৬২, ১৮২, ১৯৮, ২৩১
অগ্নিপুরাণ ৬৪
অগ্নিষ্টোম ২০১
অঙ্গ ২৮০, ৩৭০, ৩৯৭, ৪৫১, ৪৬৬
অঙ্গিরা ১১৮-২১, ১৯২, ২০৫-০৭, ২১৩, ২১৮-২০, ২৪২, ৩২৫
অজগর ১৭১
অজমীঢ় ৩৩১-৩৩, ৩৪০, ৩৫০
অণূহ ১৯১, ১৯৩
অত্রি ১০৮-০৯, ১১৮, ১২৩, ১৬৭, ২২৩-২৪, ২২৬, ২৫৪, ৩৮৪
অথর্বণ ১৬০
অথর্ববেদ ১
অদিতি ১৯৫
অদৃশ্যন্তী ৩৮৪
অদ্রিকা ৩৮৬
অনন্তনাগ/শেষনাগ ৪৩, ৪৫
অনমিত্র ৩৮০
অনসূয়া ১৯২-৯৩, ২৯৪-৯৫, ৩০২, ৩০৮
অনাধৃষ্টি ৩৭৭
অনু ২৬৫, ২৭১-৭২, ২৭৪-৮০, ৩৪০, ৪৫১
অনেনা ১৭৩
অন্তরীক্ষ ১০৪
অধিদেব-শূর ৩৮০
অধ্বর্যু ২১৫
অন্ধক ৩৩২, ৩৫০-৫১, ৩৭৪-৭৬, ৩৭৯-৮০, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০-০১
অবন্তী ২৮০, ২৮২, ২৮৬, ৪০৭
অবীক্ষিত ২৮২-৮৪
অভিজিৎ ৩৫১, ৩৭৫, ৩৮০
অভিজ্ঞান শকুন্তল ১, ১১, ২৪৯, ২৯৫, ৩০২, ৩০৬-০৭, ৩০৯, ৩১৪, ৩১৬
অভিধানচিন্তামণি ৩৭১
অভিমন্যু ৩৬, ৩৯, ৪০, ৩৪৭
অমরাবতী ৫৮, ৮১
অমাবসু ১৬২-৬৩
অমৃত মন্থন ৫৫-৫৬, ৫৯, ৬৪, ৬৯-৭০, ৭৩-১০৫
অম্বরীষ ১২৪
অম্বা ৪১৩-২১, ৪২৩-২৯, ৪৩০-৩১, ৪৩৪-৩৮, ৪৫৪
অম্বালিকা ২৬২, ৪১৬, ৪২৩, ৪৩২-৩৩, ৪৪৭, ৪৫১, ৪৬৪-৬৫
অম্বিকা ২৬২, ৪১৬, ৪২৩, ৪৩২, ৪৪৭, ৪৫১, ৪৬১-৬৫, ৪৬৭
অযোধ্যা ১২৪-২৫, ২৮২, ২৮৭-৮৮, ৩৪৯-৫০, ৩৭২
অযোধ্যাকাণ্ড ১১৭
অয়তি ১৯৪
অরিমেজয় ৩৬৭

অরিষ্টনেমি ৬১
অরুণা ৩৪২
অরুণেশ্বর ১৫১
অরুন্ধ ২৮১
অর্চনানা ২২৩-২৪, ২২৬
অর্জুন ১১, ২৬, ৩৬-৩৭, ৪৪, ৪৮-৫০, ১০৬, ১০৮, ১৪৪, ১৭১, ১৯৫, ২৮৬, ৩৩৪, ৩৪৭, ৩৬৩, ৪২২, ৪৩৭
অলকাপুরী ১৫৪, ১৫৬
অলর্ক ৪০৬
অশোকবন ২৫৯-৬০, ২৬৩-৬৫
অশোকসুন্দরী ১৬৫-৬৭, ১৭০, ১৯১, ১৯৩-৯৪
অশ্বঘোষ ৩৪
অশ্বমেধ ২৮১, ২৯৬, ৩১৮-১৯, ৩২৮
অশ্বিদয় ২১৫
অশ্বিনী ৯৮
অশ্বিনীকুমার ১৬, ৯৪
অষ্টবসু ৩৫৫
অষ্টাদশ পুরাণ ৪১৫
অসম ৩৯৭
অসমঞ্জ ২৮৮
অসিত ৩৯৪
অস্তি ৩৭৮
অহল্যা ১৯
অহিচ্ছত্র ৩৩২

আ

আইনস্টাইন ৫৬
আজমীঢ় বংশ ১৯১
আদিত্য যজ্ঞ ১৪৮, ৪৯
আনব ৪৫১
আপস্তম্ব ২১৫, ৩১৮
আপি ১৫৮
আবু ৩৭৮
আয়াতি ১৯৪
আয়ু ১৬২-৭০, ১৭২, ১৯৫-৯৭
অয়োগব ২৯৬-৯৭
আরব্ধ যজ্ঞ ৩৮৫
আর হ্রদ ১০৩
আরাবল্লী ৪১০
আরুণি ১৬-১৭, ২০৭
আর্চিলোকাস্ ৮৪
আলেকজান্ডার ২৭৯
আলিবর্দী ৩৯৭
আস্তীক ৩০, ৩৩, ৩৫, ৫১-৫৩, ৫৫, ১০৫, ১৮৪
আহবনীয় ১৬২
আহুক-আহুকী ৩৫১, ৩৭৫-৭৬, ৩৮০, ৩৮২
অ্যাডাম এবং ইভ ১০৮

ই

ইক্ষ্বাকু ১২৪-২৫, ১২৭, ২৮২, ২৮৪, ২৮৭-৮৮, ৩২০, ৩২২, ৩২৯, ৩৪৯-৫০, ৩৫৫
ইথিওপিয়ন ৮৮
ইন্দিরা ৪০১
ইন্দুমতী ১৬৮-৭০
ইন্দ্র ৩, ১৬, ১৯, ২৫, ৩০, ৫২-৫৩, ৫৭-৫৮, ৬৭, ৭০-৭২, ৭৪, ৭৭-৭৯, ৮১-৮৩, ৮৮-৯১, ৯৩-৯৪, ৯৭-৯৮, ১০৪, ১১৩-১১৬, ১১৯-১২৩, ১৩৫, ১৪৩-৪৮, ১৫৪, ১৭০, ১৭৩-৭৭, ১৭৯-৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯৫-২০৫, ২০৮, ২১৯, ২২১, ২২৭-২৮, ২৩৮, ২৪২, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৬, ২৯৭-৯৯, ৩২৭, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৯৩, ৪৬২।
ইন্দ্রলোক/ইন্দ্রালয় ১১০, ১১৩
ইন্দ্রপ্রস্থ ২৬, ১৭২, ৪০৬

ইন্দ্রসভা ৮১, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৪
ইন্দ্র সুত্রামা ২১৫
ইন্দ্রাণী ১৭৪-১৮১, ১৮৩
ইল ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৩০
ইলাবৃত বর্ষ ১০৩-০৪, ১৩০, ১৪৩, ১৯৫
ইলাহাবাদ ১৩০, ১৩২, ২৭৪-৭৫
ইলিন ২৮৪
ইলিয়াড-ওডিসি ৮৪
ইলিন ২৮৪
ইস্‌সিগিলি ৩৭৩

ঈ

ঈশ্বর কৃষ্ণ ৯৫, ৯৭

উ

উগ্রশ্রবা সৌতি ৩-৫, ৭, ৯-১২, ১৪-১৬, ২৩-২৪, ২৭-২৯, ৩৩, ৩৫, ৪৩, ৫৪-৫৬, ৬৯, ৭৫, ১০৫-০৬, ১৮৪
উগ্রসেন ১২, ৩৭৩, ৩৭৬-৮২, ৩৯৭-৪০০, ৪০৬, ৪৩৯
উচথ্য ৩২৪
উচ্চৈশ্রবা ৫১, ৭২
উৎকল ১২৬
উতঙ্ক ১৫-২৮, ৩৫, ৫০-৫১
উতথ্য ১১৮, ৩২৪-২৫, ৩২৭
উত্তরকুরু ৩৬, ১০৩
উদয়গিরি ৩৭৩
উদ্দালক আরুণি ১৬০-৬১, ২০৭
উপদেবী ৪০২
উপবাহ্যকা ৩৩২, ৩৫০
উপমন্যু ১৬-১৭
উপরিচর বসু ১১৮, ৩৬৮-৭১, ৩৭৬, ৩৮৬-৮৭, ৩৯৪, ৪০১
উপশ্রুতি ১৮০
উমাবন ১২৫
উমা হৈমবতী ৮৬
উমেশচন্দ্র গুপ্ত ৪৪
উলূপী ৪৪, ৩৬৩
উর্বশী ১১৪, ১৩৩, ১৩৬-৩৮, ১৪২-৪৪, ১৪৬-৫৯, ১৬১-৬২, ১৬৪, ১৯০
উশিজ ১১৮, ৩২৪
উশীন ২৮০

ঊ

ঊর্জস্বতী ২০৫

ঋ

ঋক্ষ ৩৩৩
ঋগ্‌বেদ ১, ২৫, ৫২, ৭৯, ৯৪, ১০৩, ১৩৩, ১৪০, ১৪২-৪৩, ১৪৯, ১৫২-৫৪, ১৫৭, ১৬২, ১৮৫, ১৯২, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ৩৫৯, ৩৬৮-৬৯, ৩৭১, ৪৫১
ঋতুরাজ বসন্ত ১৪৫
ঋত্বিক ৩৪৫-৪৬
ঋষিগিরি ৩৭২-৭৩

এ

এলাপত্র ৪৩

ঐ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২৫২, ৩১৯-২০, ৩২৭
ঐরাবত ৪৩, ৪৫, ৫৭-৫৮, ৭২, ১৮৪
ঐলুষ ২২৫

ও

ওড়িশা ৩৯৭
ওথেলো ৪১৫
ওলডেনবার্গ ১৫৯, ১৬০

ঔ

ঔর্ধ ২২৮

ক

কঙ্ক ৩৭৭
কংস ৩৫০-৫২, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৭ ৩৭৯-৪০১, ৪৪১-৪৪
কচ ৬৭, ২০১, ২০৭-২৩, ২২৭-২৮, ২৪২, ২৪৭, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৯০, ৩৩৪
কঠোপনিষদ ৭৯
কণ্ব ১, ১১, ১৯২, ২৩২, ২৪৯, ২৬৭, ২৯০, ২৯২-৯৬, ২৯৮-৯৯, ৩০১-০৮, ৩১০, ৩১৮, ৩৩১
কথাসরিৎসাগর ৭৭
কদ্রু ৩৫, ৪৪-৪৫, ৫১, ৫৫
কনৌজ (কন্নকুব্জ) ২৮০
কপিবংশ ১৬১
কপোতরোমা ৩৮০
কবন্ধ ১৬০
কবষ ২২৫
কমলিকা ১৫১
করন্ধম ২৮৩-৮৪
করূষ ৩৭১, ৩৭৩, ৪০২, ৪০৬
কর্ণ ১০৮, ২৯১
কলি ৩৮-৩৯
কলিঙ্গ ২৮০, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৯৭, ৪৫১
কলিযুগ ৩৬-৩৭, ৪০, ৪৩
কল্পদ্রুম ১৬৫
কল্মাষপাদ ৩৮৩-৮৪
কল্যাণ সিংহ ১১৭
কাকবর্ণ ৩৭১
কাক্ষিবান ৪৬৬
কাঠিয়াবাবা ১
কাণ্বায়ন ৩৩১
কান্তিপুর ৪৪
কাফকা ৩৬
কামদেব ১৪৫
কামশাস্ত্র ১৭
কাবেরী ৮১
কাব্যপ্রকাশ ৮৫
কামু ৩৬
কালকা ৩০
কালকূট বিষ ৬৪
কালিদাস ১, ১১, ৭৭, ১৩৯, ১৪২-৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৬১, ১৯৪, ২৩২-৩৩, ২৪৯, ২৬৭, ২৮১, ২৯০-৯২, ২৯৪-৯৬, ২৯৮, ৩০২-০৪, ৩০৭-১০, ৩১৪, ৩১৬, ৩৫৩, ৩৬৭
কালিয় ধনঞ্জয় ৪৩, ৪৪
কালিয়-নাগ ২৬
কার্টিয়াস ২৮০
কালী ৩৮২, ৩৮৫-৮৬, ৪৩২
কাত্যায়ন ২৯৭
কার্তবীর্যার্জুন ২৮০, ২৮২, ২৮৬-৮৭, ৩২২, ৩৪৮, ৩৭৪, ৩৯৯, ৪৫০
কাশী ১০৪, ১২০, ২৮৭, ২৮৯, ৩২০, ৩৬৯, ৩৭৬, ৪০৬-০৭, ৪২০, ৪২২, ৪৩২, ৪৬১, ৪৬৩-৬৪
কাশীদাস ৭৭
কাশীরাজ ৪১১-১৩, ৪১৫, ৪১৮, ৪২৬-২৭, ৪৩৮, ৪৫৯
কাশ্মীর ৫০, ৮৫, ১০৪, ১৩২, ১৩৪, ২৮১
কাশ্যপ ১, ২৭, ২৯, ৩১, ৪৫, ৫১, ৭১, ১০০, ১৪০-৪১, ১৯৫
কিম্পুরুষ বর্ষ ১০৩
কীকট ৩৭১
কীর্তি ১১০
কুকুর ৩৫১, ৩৭৬, ৩৭৯-৮১, ৩৯৭
কুঞ্জর ৪৩, ৪৫
কুন্তী ৯৪, ১০৩, ২৯০

কুবের ৮২, ১৪৬-৪৭, ১৯৯
কুবের সভা ৮১, ৮২
কুভা ২৭৫
কুমারবন ১২৫
কুমারসম্ভব ২৯৮
কুরু/কৌরব ৫, ১১, ১৩, ১৯, ২৬, ৩৮-৪০, ৪৪, ৪৬-৪৭, ৫৬, ৭৭, ৯৮, ১০৬-০৯, ১১৮, ১২৪, ১৩০, ২৭৬-৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮৯, ৩১৬, ৩১৮, ৩৩২, ৩৪১-৪২, ৩৪৭, ৩৫১, ৩৫৩-৫৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭১-৭২, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৮৯, ৪০১, ৪১৩, ৪২১, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪৫, ৪৫১-৫২, ৪৫৯, ৪৬৪
কুরুক্ষেত্র ৪৫, ৫১, ১৫৭, ২৯০, ৩৪১-৪২, ৩৪৭, ৩৬৭, ৩৯৮, ৪০৪-০৫, ৪২১-২২, ৪২৮
কুরুজাঙ্গল ৩৪১-৪২, ৩৪৭, ৩৬৭
কুরুরাজ্য ৪৩৭
কুশ ৩৫০
কুশস্থলী ১২৪
কুশাম্ব ৩৭০-৭১
কুষাণ রাজত্ব ৪৪
কৃতবর্মা ৩৫০, ৩৮০, ৩৯৮
কৃত্তিকা ৯৮
কৃত্তিবাস ৩৪, ৭৭
কৃমিলাশ্ব/কপিল/কাম্পিল্য ৩৩১
কৃশ ৪১, ৪২
কৃত্বী ১৯১-৯৩
কৃষ্ণ ২৬, ৩৬-৩৭, ৪৫, ৪৭, ৭৫, ৮০, ৮৬-৮৭, ৯৬, ১০৬, ১৪৪, ১৫৪, ২৭৯-৮০, ৩২০, ৩৩২, ৩৪৯-৫২, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৭৯-৮১, ৩৯৮, ৪৩৯-৪১, ৪৪৩
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ৩৮৯, ৪৫৪-৫৬
কৃষ্ণলীলা ৪৪১
কেতু ৬৬
কেতুমাল ৩৬
কেশী ১৪৬-৪৮, ১৫৫
কেশিনী ৩৩১-৩৩
কৈবর্ত পল্লী ৪৪৫, ৩৯০-৯১, ৩৯৩
কৈলাস ৫৭, ১৪৬
কৈশিক ৩৭৬
কোলাহল ৩৭০
কোশল ৩৭৯, ৪০৬-০৭, ৪৬১-৬২
কোশাম্বী ১৫৩, ১৬০-৬১, ১৮৪
কৌটিল্য ১১৫, ৩৭৫
কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র ২০, ১১৫, ১৩৯
কৌরব্য ৪৩, ৪৪
কৌরব সভা ৩৫৬
কৌশল্যা ৩৫০, ৪০৭, ৪৬১-৬২
কৌশাম্বী ৭৮-৭৯, ৩৭০, ৩৭৩
কৌশিক ৩৪৯
কৌশিকী ৩৪২
কৌস্তভ মণি ৬৫, ৬৭
ক্যাসপিয়ন সাগর ১০৩
ক্রতু ১১৮, ৩৮৫
ক্রথ ৩৪৯
ক্রমতি ১২৪
ক্রব্যাদ ৮২
ক্রুমু ২৭৫
ক্রোষ্টুর বংশ ২৮২, ৩৪৮
ক্ষত্রোপেত দ্বিজ ৩৩১
ক্ষীর সাগর ৬১, ৬৩, ৬৮

খ

খাণ্ডবদাহ ২৬, ৫০
খাণ্ডব-বন ২৬, ৪৫, ৪৮, ৩৪২
খিল-হরিবংশ ৩৪৬

গ

গঙ্গা ৮, ২৫, ৫৭, ৮১, ১৩৪-১৩৫, ১৫১,

২৭৪, ২৭৭, ২৭৯-৮১, ২৮৭-৮৯, ৩১৯-২১, ৩৩০, ৩৩২, ৩৫২-৫৬, ৩৬১-৬৬, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯০-৯২, ৩৯৫, ৪০৩, ৪৫১
গজসাহ্বয় ৩৩১
গন্ধবতী ৩৯০
গন্ধমাদন ১৫৬
গন্ধর্বলোক ২৪, ২৮, ১৩৭, ১৫৪
গন্ধর্ব কিন্নর ২৫, ৭৭, ৮২
গয় ১২৬, ১৭৩
গরুড় ৪৫, ১৮১
গরুড় পুরাণ ৬৮
গান্ধার ২৮১, ৩৪০, ৩৮৭
গান্ধারী ২৬২, ৩৫৬, ৩৮০, ৩৮৭
গিরিকা ৩৬৯-৭০, ৩৮৬-৮৭
গিরিব্রজ ৩৭২
গিরীন্দ্রশেখর বসু ১০০, ১০৩-০৪
গুজরাত ৪১০
গুপ্তযুগ ২৯০, ৩০৯
গৃহপতি ২৩১
গেল্‌ড্‌নার ১৫৩
গোন্দা ২৮০
গোভানু ২৮৩
গোমতী ২, ২৩২
গোমিথুন ৩৭-৩৮
গৌতম ১৯, ৫৮, ৭২
গৌতমী ১৩২, ১৯২, ৩০৮
গৌরমুখ ২, ৪৩, ৪৬
গ্রন্থিনী ১৫৮
গ্রিস ৮৪

ঘ

ঘটোৎকচ ৮৮
ঘূর্ণিকা ২৩৬
ঘৃতাচী ১৪৫

চ

চণ্ডিকা ৭০-৭৩
চন্দ্র ৬৪, ৮১, ৯০, ৯৭-১০০, ১০৮-০৯, ১১০-১৮, ১২১-৩১, ১৩৭-৩৮, ১৪২, ১৪৬-৪৮, ১৬২, ১৬৬, ১৭০, ১৭২-৭৩, ১৮৩-১৮৬, ১৮৭, ১৯০-৯১, ১৯৭, ২৩২, ২৫৪, ২৭৩-৭৫, ৩১৮, ৩২১, ৩২৫, ৩২৮, ৩৩০
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ১৩২, ৩৩৯
চন্দ্রমা ৯৯
চন্দ্রশুক ১৩১
চন্দ্রাংশ/চন্দ্র ৪৪, ৫৬
চম্পা ৩৭২
চাণক্য ৩৩৯
চিত্রক ৩৮০
চিত্রঙ্গদ ৪০৩-০৬, ৪৩১, ৪৪৬
চম্বল ৩৩২
চিত্ররথ ১৪৮, ৩৩৪
চিত্ররথী ২৮২
চিত্রলেখা ১৪৬-৪৮, ১৫০
চিত্রশিখণ্ডী ১১৮
চিত্রাঙ্গদা ৩৬৩, ৪৩৭
চিদি ৩৪৯
চিন্তামণি ২
চীন ১০৮
চেত ৩৬৮
চেতি বংশ ৩৬৯
চেদি ১১৮, ৩৪৯, ৩৬৭-৬৮, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৯৭, ৪০১-০২, ৪০৬
চেনাব ২৮০
চৈতন্য ৮৫, ২৫৮, ৩৪৯, ৪৪১
চৈত্যক ৩৭২, ৩৭৩
চৈদ্য ৩৬৮-৭০, ৩৭৬, ৩৮৬
চৈত্ররথনবন ১৫৪, ২৫৬

চ্যবন ৩৩, ৩৪, ৩৩২-৩৩

ছ

ছাত্রগিরি ৩৭৩

জ

জন্তু ৩৪৬
জনম ১২৪
জনমেজয় ৫-৬, ১১-১৭, ২০, ২৬-২৮, ৩৩, ৩৫, ৪২, ৪৯-৫৫, ৭৫, ৭৭-৭৮, ৮৮, ১০৫-০৭, ১৮৪, ২৭৫, ২৮৯, ৩৪৭
জমদগ্নি ২৮৮
জম্বুদ্বীপ ১৩১-৩২
জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার ১৩২
জয়ন্ত ১০০, ২০৩
জয়ন্তী ২০০-০৬
জয়ধ্বজ ২৮৬-৮৭
জয়পুর ২৭৬, ৩৭১, ৩৮৭, ৪১০
জরৎকারু ৩০, ৩৫, ৫১-৫২
জরাসন্ধ ৩৭৩-৭৪, ৩৭৬-৮২, ৩৯৭-৯৮, ৪০০-০২
জহ্নু ১৬৩, ৩৬৭
জামদগ্ন্য ২৮৮, ৩৬৫
জাম্ববান ২৫
জাহ্নবী ১৬৩
জ্যামঘ ৩৪৮, ৩৭৬
জিমার হাইনরিখ ৪৫
জেনোফেনিস ৮৭-৮৮
জেন্দ আবেস্তা ১০৩
জ্যোতি বসু ১১৭

ঠ

ঠাকুরদাস ১৬৫

ড

ডিয়োডোরাস ২৮০
ডেসডিমনা ৪১৫

ত

তক্ষক ২১-২৭, ৪২-৪৩, ৪৫-৫৩, ১৮৪
তক্ষশিলা ২৬-২৭, ৫০, ৫২, ২৮১
তপতী ৩৩৪-৩৯, ৩৪১
তপোধন ৪৫৮
তপোবন ১-৩, ২৯৫, ৩০১, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১, ৩১৩-১৪
তাপ্তী নদী ২৮০, ২৮৬
তারা ১১১, ১২১-২২
তালজঙ্ঘ ২৮৭, ৩৪৭
তিনিক্ষু ২৮০
তিলোত্তমা ৭৯, ১৪৫
তুঘ্নবন ৩৪২
তুর্কিস্থান (পূর্ব) ১০৩-০৪
তুর্বসু ২৬৪, ২৭১-৮৬, ২৮৮, ২৯৬, ৩২২, ৩২৭, ৩৪০
তৃষ্টু বংশ ২৭৬
তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩৪২
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২৩
ত্রিপুর/ত্রিপুরা ৬১
ত্রিপুর দুর্গ ৩০, ১০৪
ত্রেতা যুগ ৩৬-৩৭
ত্রিসানু ২৮৩

থ

থ্রেসিয়ান ৮৮
থানেশ্বর ৩৪২

দ

দক্ষ ৯৮-৯৯, ১০৯
দক্ষিণাগ্নি ১৬২
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ২৬
দত্তাত্রেয় ১৬৭-৬৮
দধিসাগর ৬৭
দণ্ডপানি ৩৮

দনু ১৯৫-৯৬, ২০৬
দশরথ ৭৭, ১২৪, ১৮৮, ৩২৬
দশার্ণ ৩৯৭, ৪৩৬-৩৭
দারুক ৩৯৮
দার্ভ্য ২২৩
দাশরাজ ৩৮৫, ৩৮৭-৮৮
দাশরাজ্ঞ যুদ্ধ ২৭৫
দাশাহ ৩২৮
দিতি ১৯৫, ২০৬
দিবোদাস ২৮৭
দিব্য ৩৫০
দিলীপ ৩৪৭
দিল্লি ৩৪২
দীর্ঘতমা (মামতেয়) ১৩০, ৩২৫-২৬, ৩২৮, ৪৫০-৫১, ৪৬৬
দুগ্ধসাগর ৬৭
দুর্গা ৭৫, ৮৭
দুর্জয় ২
দুর্বাসা ৫৭-৫৮, ৮১, ৩০৭-০৯
দুর্যোধন ১৩-১৪, ১০৮, ৩৫৬, ৩৯৬, ৪৩৮
দুষ্যন্ত ১১, ৭৭, ১৩৯, ২৩২, ২৪৯, ২৮১, ২৮৪-৯২ ২৯৪-৩০৭, ৩০৯-২০, ৩২৮, ৩৪৭, ৩৬৫
দৃঢ়ায়ু ১৬২
দৃষদ্বতী ৩৭, ২৭৫, ২৭৭, ৩৪২
দেওলি ৩৫২
দেবক ৩৭৬, ৩৮০, ৩৯৭, ৩৯৯-৪০০, ৪০২
দেবকী ৪০০, ৪০২, ৪৩৯-৪১, ৪৪৩-৪৪
দেববৃধ ৩৫০, ৩৫২-৫৩, ৩৮০
দেবব্রত ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৯০-৯৬, ৪২৮
দেবমীঢুষ ৩৮০
দেবরক্ষিত ৪০২
দেবল ৩৯৪
দেবলোক ১০৪, ১৭৪, ২২৭
দেবযান পথ ১০৪
দেবযানী ২০৪-২১৪, ২১৭-২২, ২২৭-২৯, ২৩৩-৪৩, ২৪৪-৫২, ২৫৪-৭২, ২৯০, ৩৩৪
দেবাতিথি ৩৪৭
দেবাপি ৩৫৫-৬০
দৌষ্যন্তি ৩০৯-২০
দ্বাপর যুগ ৩৬-৩৭
দ্বারকা ৩৬, ২৮০, ৪৪০
দ্বিমীঢ় ৩৩১
দ্বৈপায়ন ৩৮৮, ৪৫৪, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৬৭
দ্যুতি ১১০
দ্রুপদ ৩৩২, ৩৪৬-৪৭, ৩৫১, ৩৭৪, ৪২১, ৪৩৫-৩৮
দ্রুমিল ৩৭৭-৭৮
দ্রুহ্য ২৬৫, ২৭১-৭২, ২৭৬-৮১, ৩৪০
দ্রোণাচার্য ২৪০, ৩৫৬, ৪৩৬-৩৭
দ্রৌপদী ৫০, ৬৬, ১০৪, ১১৬, ৩৩১, ৪২১

ধ

ধন্বন্তরী ৬৫-৬৬, ৬৮
ধীবর ৩৮৫
ধীমান ১৬২
ধূমিনী ৩৩১, ৩৩৩
ধৃতরাষ্ট্র ১৪-১৫, ৪৩-৪৪, ১০৯, ২৬২, ২৭৩, ৩৩১, ৩৫৬, ৩৫৯
ধৃষ্টদ্যুম্ন ১১৬, ৪২১, ৪৩৭
ধ্রুব ১৯৪

ন

নক্ষত্রলোক ১২৪
নগেন্দ্রনাথ বসু ৪৪
নচিকেতা ৭৯
নথু ১৬৪-৭০, ১৭২-৭৭, ১৭৯-৮৭, ১৯০, ১৯৬, ১৯৮, ২৩০-৩১, ২৫৪, ২৭০

নন্দ ৪৪৪
নন্দনকানন ১৬৫
নন্দনবন ৭৯, ১৫৪-৫৫
নর ১৪৪
নর নারায়ণ ১৪৪-৪৫, ১৪৮
নরসিমা রাও ১১৭
নর্মদা ২৫, ২৮০, ২৮৬, ৩৪৮
নল ৩৮০
নাগজনজাতি ৩৩২
নাগজাতি ৪২, ৪৭-৫১, ৫৩, ১০৫, ১৭২, ১৮৪, ১৯০
নাগলোক ২৫
নাগপুর ৪৫, ৩৩১
নাগবংশ/কুল ৩০, ৩৫, ৪৩-৪৪, ৫০, ৫২-৫৩, ১৮৯-৯০
নাগসাহ্বয় ৩৩১
নাভাগ ১২৪
নাভানেদিষ্ঠ ১২৪
নারদ ৫০, ৮২, ১২০, ১৫২, ১৭০, ১৯৮, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৫৪
নারায়ণ ৫৬, ৫৯-৬০, ৬৪-৬৫, ১১০-১১১, ১৪৪-৪৬, ৩৯৯
নাহুষ ৪৩-৪৪
নিঘ্ন ৩৮০
নিমখারবন বা নিমসর ২-৩
নিরুক্ত ৯৩, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৭১
নিষধ ১০৩
নিষাদ (নিষীদ) ১৩৪-৩৫
নীল ৩৩১
নীলকণ্ঠ ৩১, ৬৩, ৬৫, ২৩৩, ৩৪৬, ৪৫৩, ৪৬৩
নীলিনী ৩৩১, ৩৩
নেহেরু ৪৪৬
নৈমিষারণ্য ১-৩, ৫, ১০, ১৪-১৫, ৩৩, ১৩৮
ন্যগ্রোধ ৩৭৭

প

পঙ্কজ মল্লিক ৮৪
পঞ্চাল ৩৩১, ৩৩৩, ৪৩৫-৩৬
পতঞ্জল কাপ্য ১৬০
পতঞ্জলি ৩৫২
পদ্মপুরাণ ৬৪-৬৬, ১৬৬, ১৬৮
পদ্মাবতী ৪৪
প্রয়াগ-পতিষ্ঠান ২৮০
পরশুরাম ১৩৪, ১৬৭, ২৮৮, ৩৬৫-৬৬, ৪০৭, ৪২১-২৯, ৪৩০, ৪৩৩-৩৪, ৪৩৬, ৪৫০, ৪৫৪
পরলোক ১০২
পরাশর ১৮, ৮১, ১০০, ৩৮৪-৮৮, ৩৯০, ৩৯৫, ৪৪৫, ৪৫৩-৫৫
পরীক্ষিত ৫, ১২, ১৪-১৫, ২৫-২৬, ৩৩, ৩৫-৪৩, ৪৫, ৫০, ৫২, ৭৮, ৩৪৭, ৩৬৭
পরীণ ৩৪২
পর্ণাশা ৩৫২-৫৩
পর্বত ৮১, ৩৬৯
পশুমেধ যজ্ঞ ৩৪৫
পহ্লব ২৮৭-৮৮
পাকিস্তান ৮০
পাঞ্জাব ১০৪, ১৩২, ১৩৪, ২৭৫, ৩৬৯
পাঞ্চাল ২৭৭, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৯-৪৭, ৩৫০-৫১, ৩৬৭, ৩৭৪, ৩৭৬, ৪২১-২২, ৪২৭, ৪৩৭
পাণিনি ৯২, ৩৫২, ৩৭৫, ৪১০
পাণ্ডব বংশ/কুল ৫, ১১, ১৪-১৫, ১৯, ২৫-২৬, ৩৫-৩৭, ৪০, ৪৮-৪৯, ৭৭-৭৮, ৮৮, ১৩০, ২৮১, ৩১৬, ৩১৮, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৫৬, ৩৭২, ৪২১-২২, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৫৯

পাণ্ডু ৩৯, ৪৫, ১০৩, ৩৩১, ৩৫৬, ৪৬৫
পাবনা ১৬৬
পামির ১০৩
পারজিটার ১৯১-৯৩, ২৮৩, ২৮৮, ৩২০, ৩২৭-২৮, ৩৭৮
পারদ ২৮৮
পারিজাত ৬৫, ৬৭, ৮১
পার্বতী ৮৬, ১০৯, ১২৫, ১৬৫-৬৬
পাশুপত ১৭১
পিকাসো ৩৬
পিঁজবন ২৭৫, ৩৩৩
পিতৃলোক ১০৪
পিহান ১৩২
পীবরী ১৯২-৯৩
পুণ্ড্র ৪৫১
পুণ্ড্রবর্ধন ১৬৬
পুনর্বসু ৩৮০
পুরন্দর ২৯৭
পুরী ৪৪১
পুরু ১৩১, ২৬৫, ২৭০-৭৯, ২৮১-৮২, ২৮৪-৮৯, ৩০৬, ৩১২, ৩২০, ৩৩০-৩১, ৩৪৭, ৩৬৬, ৪০১, ৪৪৪-৪৫, ৪৪৯, ৪৫১-৫২
পুরুমীঢ় ৩৩১
পুরূরবা (ঐল) ৭৭, ১২৬, ১৩২-৪২, ১৪৪, ১৪৭-৪৮, ১৫০-৫৩, ১৫৫-৬৫, ১৬৭, ১৭০, ১৮৬, ১৯০, ২৭০, ২৮৯
পুরোডাশ ১৯৮
পুলস্ত্য ১১৮, ১৯২-৯৩, ৩৮৫
পুলহ ১১৮, ১৯০-৯৩, ৩৮৫
পুলোমা ২৯-৩৩, ৫২, ১৩২, ১৯৯
পুষ্টিমান ৩৭৭
পূর্ব-মীমাংসা দর্শন ৭৯
পৃথিবী ৩৭, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯-৪০, ১৪৩, ১৫৮, ১৬১, ১৯৮, ৩১৯, ৩৩৬, ৩৬৫, ৩৬৮, ৪১৭, ৪৫০
পৃথু ৩, ১০, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯, ১৬১, ৩৮০
পৃথুকীর্তি ৪০২
পৃথ্বী ১০, ১৩৪
পৃষ্ণ ৩৪৬-৪৭, ৩৫১, ৩৭৪
পৃশ্নি ৩৮০-৮১
পৈজবন ৩৩৩, ৩৪১
পৈধান/বৈধান ১৩২
পৌন্ড্র ১৬৬
পৌরব ২৮২, ২৮৪, ২৮৭, ২৯২, ২৯৬, ৩০৪-০৫, ৩০৯-১০, ৩১৯, ৩২১, ৩৩২, ৩৪০, ৩৬
পৌরবী ৪০১
পৌলমী ৩০
পৌষ্য ১৭, ২০-২৬
প্যালেস্টাইন ১৮৪
প্রচেতা ২৮১
প্রজাপতিবংশ ১৯৩
প্রতর্দন ২৮৭, ৪০৬
প্রতিক্ষত্র ৩৮০
প্রতিষ্ঠান-পুর/রাজ্য ১৩০-৩২, ১৩৪, ১৫০, ১৫৫, ২৮৫-৮৭, ২৮৯, ৩১৯-২০, ৩৩০
প্রতীপ ৩৪৭, ৩৫১, ৩৫৩-৫৭, ৩৬০, ৪০১
প্রত্যগ্রহ ৩৭০
প্রমগদ ৩৭১
প্রয়ান্দ ৩১৯
প্রভা ১৯৫
প্রসেন ৩৮০
প্রহ্লাদ ৬০, ৭০-৭২, ৭৪, ১৯৬, ১৯৯, ২০৬
প্রাগজ্যোতিষপুর ৩৯৭
প্রাপ্তি ৩৭৯
প্রিয়ংবদা ১৯২-৯৩, ২৯৪-৯৫, ২৯৯, ৩০২, ৩০৬, ৩০৮
প্রমদ্বরা ৩৩, ৩৫

ব

বঙ্গদেশ ২৮০, ৩৭০, ৩৯৭, ৪৫১
বৎস-দেশ ৭৮, ৪০৬-০৭
বদরীনারায়ণ ১০৪
বদ্রিকাশ্রম ১৪৪-৪৫
বনসা ৩৫২
বনস্পতি ২৩১
বনায়ু ১৬২
বন্দেই ৩৭০
বপুষ্টমা ৪৯
বভ্রু ৩৮০
বরাহ ৩৭২
বরুণ ৮১, ৮২-৮৩, ৯০, ১৭৪, ১৮২, ২৩১
বলদেব ৪৪৪
বলভদ্র ৪৪৪
বলরাম ৪৫, ১৬৭, ৩৮০
বলি ৬০, ৬২, ৭২, ৮৯-৯২, ১০০-০১, ১০৩, ১০৫, ১৯৯, ৪০৬, ৪৫১, ৪৬৬
বশিষ্ঠ ১৮, ৫৮, ৯৬, ১১৮, ১৩৪, ১৪৯, ১৬৯, ১৭০, ২৭৬, ২৯৭, ৩২৬, ৩৩৭-৪০, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৮৩-৮৫
বসু ৩৫৭, ৩৬৮-৩৭০, ৩৭৩, ৩৮৭, ৪০২
বসুদেব ৩৮০-৮১, ৩৯৮, ৪০০-০২, ৪৩৯-৪৪
বসুদেবতা ৩৬১
বসুমতি ৩৭১
বহুপুত্রী ১৯৬
বহ্নি ২৮৩
বাংলা ৩৯৭
বাংলাদেশ ১৬৬
বাচস্পতিমিশ্র ৭৯
বাজপেয় যজ্ঞ ৩১৮
বাদরায়ন ৮৪
বামন ১৯৯
বায়ুদেবতা ৭৪, ৮৮, ৯৪, ১৩৯-৪১
বায়ুপুরাণ ১০৪, ১২৭-২৮, ১৩৮, ১৬১, ১৬৩, ২০৫, ২৭৮, ২৮৩, ৩১৬, ৩২৫-২৬, ৩৮৬
বারণসাহ্বয় ৬৫, ১৫১
বারুণী ৩৩১
বাল্মীকি ৩৪, ৫৬, ৮২, ৮৮, ৩৭১
বাসব ৩৮৬-৮৭, ৩৯২
বাসবী ৩৮৫-৮৬, ৩৮৮
বাসুকি ৪৩, ৪৫, ৫১-৫৩, ৬১-৬৪, ১০০, ১৮৪
বাসুদেব ৩৭৯, ৪৩৯
বাহু ২৮৭-৮৮
বাহ্যকা ৩৩২, ৩৫০
বার্হদ্রথ ৩৭০, ৩৭৯, ৩৮২
বার্হদ্রথপুর ৩৭২-৭৩
বার্হপত্য ১৬২
বাহ্লীক ৩৩২, ৩৫৬, ৩৫৯-৬০, ৪০১
বিকুণ্ঠ ৩৩১
বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত ৪৪
বিক্রমোর্বশীয় ১৪২
বিচিত্রবীর্য ৩২৮, ৪০৩-০৬, ৪০৮-০৯, ৪১২, ৪১৪, ৪১৬, ৪২২-২৩, ৪৩১-৩৪, ৪৪৬-৪৭, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৭-৫৯, ৪৬১, ৪৬৩-৬৪, ৪৬৬-৬৭
বিজয়া ৩২৮
বিজরা ১০৩
বিতথ ৩২৪, ৩২৮
বিতস্তা ৫০
বিদর্ভ ২৮০, ২৮২, ২৮৯, ৩৪৮-৪৯, ৩৭৬, ৩৯৭
'বিদায় অভিশাপ' ২১৭, ২১৯-২৯, ২৯০
বিদিশা ৪৪, ২৮২-৮৩
বিদুর ১৪, ১০৯, ২৬২, ৩৫৬
বিদেহ ২৮৯

বিদুরথ ৩৮০
বিদ্যাধরী ৫৭, ৫৮
বিদ্যাসাগর ২৫৮, ২৬৫
বিনতা ৩৫, ৪৪-৪৫, ৫১, ৫৫, ২৭৫-৭৭
বিন্দুমতী ২৮২, ২৮৭
বিন্ধ্য ১০৪, ১৩৪-৩৫, ৩৭২
বিপুলা ১৬৯
বিপুলগিরি ৩৭২
বিপুল বৈহার ৩৭২
বিপ্রচিত্ত ১৬৬
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ ৮০
বিশাখ-যূপ ১৭১
বিশ্বাচী ২৭১
বিশ্বকর্মা ৮১, ১৩৮
বিশ্বাবসু ১৫৫, ১৬০
বিশ্বামিত্র ১৮, ১০০, ১০৪, ২৭৫-৭৬, ২৯৭-৩০০, ৩১১-১২, ৩৮৩
বিশ্বেশ্বর ১০৪
বিষ্ণু ১১, ১৫, ৩৮, ৪৫, ৫৯-৬৪, ৬৬-৬৭, ৭১-৭৩, ১০১, ১০৩, ১০৯-১০, ১২২, ১২৪, ১৪৪, ১৫০-৫১, ১৭৯, ১৮১, ১৯৫, ২৬০, ৩৯৯, ৪৪৪
বিষ্ণুলোক ১০৩
বিষ্ণুপুরাণ ৬০, ৬৪, ১৫৯, ১৬২, ৩১৬, ৩৫৮-৫৯, ৩৮৫, ৪০২, ৪৪১-৪৪
বিষ্ণুমতী ৭৮
বিস্মকসেন ৪০৬
বিহার ৩৯৭
বীতহব্য ২৮৭, ৩৪৭
বীতিহোত্র ২৮৭, ৩৪৭
বুদাউন ৩৩২
বুদ্ধ ২৫৮, ২৮০
বুদ্ধচরিত ৩৪
বুধ ১২৪-৩১, ১৩৮, ১৪২, ১৭০, ১৮৬, ১৯১, ২৫৪
বুন্দেল খণ্ড ৩৬৭, ৩৭০
বৃকদেবী ৪০২
বৃত্র ৪৪
বৃত্রঘ্ন ৩১৯
বৃদ্ধশর্মা ১৭৩, ৪০২
বৃন্দাবন ৩৫২, ৪৪০, ৪৪৪
বৃষপর্বা ২০৬-০৭, ২১০-১১, ২২৭-২৯, ২৩২-৩৩, ২৩৬-৩৮, ২৪০-৪৩, ২৪৪-৪৭, ২৪৯, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮
বৃষভ ৩৭২
বৃষ্ণি ৩৩২-৩৩, ৩৫০-৫১, ৩৭৪-৭৫, ৩৭৯-৮১, ৩৯৮, ৪০০-০১
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১৬০-৬১
বৃহদিষু ৩৩১-৩২
বৃহদ্দেবতা ২, ১৪৮, ২২৪, ২২৭, ৩৫৭, ৩৫৯
বৃহদ্ধর্মপুরাণ ৩৭১
বৃহদ্রথ ৩৭০-৭৩
বৃহদ্রথপুর ৩৭২
বৃহস্পতি ৩, ৬৭, ৭০, ৭২, ১০৯, ১১১-২৪, ১২৭, ১৩৮, ১৭৬,-৭৯, ১৮২, ১৯০, ১৯৮-০১, ২০৪-০৮, ২১০-১৩, ২১৫, ২১৭-১৮, ২২০, ২২৭, ২৪৩, ২৮১, ২৮৪, ৩২৪-২৮, ৩৩৪, ৩৬৫, ৪৫০
বেণ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯-৪০
বেণুমতী ২১৮, ২৪৭
বেত্রবতী ৩৫৩, ৩৬৭
বেদ ১৭-২২, ৫০, ১৪৯
বেদব্যাস ৮৭, ১৪৯, ৩৮৮, ৩৯৬, ৪৬৩-৬৪, ৪৬৬-৬৭
বেদান্ত দর্শন ৭৪, ৭৯
বেরঞ্জা ২৮০
বেরিলি ৩৩২
বেশনগর ৪৪
বেস্সন্তর জাতক ৩৬৮

বৈকুণ্ঠ ৭৬, ৮৪
বৈজয়ন্ত ৮১, ১৪৬, ২৫৮
বৈদেহ বংশ ১২৪
বৈবস্বত মনু ১২৫
বৈভার ৩৭২
বৈশম্পায়ন ৪-৬, ১০, ১৪-১৫, ২৯, ১০৬-০৭, ২৭৪, ২৮৯, ৩১৯
বৈশাখী ৪০১
বৈশালী ১২৪, ২৮১-৮৪, ২৮৬, ২৮৯
বৈহার ৩৭২
ব্যাস/ব্যাসদেব ৪-৭, ১০, ১২, ১৪-১৫, ২৯, ৪৭, ৫৬, ৮৩-৮৪, ৮৮, ১০৬-০৭, ২৬২, ২৮১, ৩৮৬, ৩৮৮, ৪০৫, ৪৩৪, ৪৫৪-৬১, ৪৬৫, ৪৬৭
ব্রহ্ম ৮৪, ৮৮, ১৭৮, ৩৫৫
ব্রহ্মতত্ত্ব ৭৬, ৮৭
ব্রহ্মদত্ত ৪০৬-০৭
ব্রহ্মলোক ১০৩, ১৩৫, ১৪১, ৩৫৫
ব্রহ্মপুরাণ ১২৮
ব্রহ্মবন্ধু ৩৭১
ব্রহ্মশির ১২২
ব্রহ্মসভা ৮২
ব্রহ্মা ১০, ২৯-৩০, ৪১, ৫৬, ৫৮-৫৯, ৬৪, ৬৭, ৮২-৮৩, ৮৯-৯১, ৯৬-৯৮, ১০০, ১০৮-১০, ১১৮, ১২৩-২৪, ১২৭, ১৩৫, ১৫০-৫১, ১৯১, ১৯৫-৯৬
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ১৩৮
ব্রহ্মাবর্ত ৩৭, ৩৬৯
ব্রাত্য ৩৭১

ভ

ভগবত গীতা ১১, ৪৭, ১০৬, ১৭৬, ১৮৮, ২৫৭, ৪২২
ভগবতী ১৬৫
ভগীরথ ৩২২
ভজমান ৩৫০-৫১, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৯৮
ভট্টিকাব্য ২৯১
ভদ্রাশ্ব ৩৬
ভদ্রা ৪০১
ভরণী ৯৮
ভরত ১০৩, ১৫০-৫২, ২৭৫-৭৭, ২৮১, ৩১৬-২৯, ৩৩১-৩৩, ৩৩৫, ৩৪১-৪২, ৩৫৩, ৩৫৫-৫৬, ৩৬০, ৩৬৫-৬৬, ৪৪৪-৪৫, ৪৪৯, ৪৫১-৫৩, ৪৬২-৬৩
ভরতপুর ৩৭১, ৩৮৭, ৪১০
ভরদ্বাজ ১৮, ১০২, ১১৮, ৩২৩-২৮
ভল্লাট ৪০৬
ভাগবত পুরাণ ১৮, ২৫-২৬, ৩৯, ৪৫, ৫৯-৬১, ৬৪, ৬৬, ৭০, ৭৩, ৮০, ১২৭-২৮, ১৫২, ১৫৪, ২২৮, ৪০২, ৪৪০-৪৪
ভাগলপুর ৪৫১
ভাজন ৩০০, ৩৮০
ভারতকথা ১১
ভারত-প্রেমকথা ৩৩
ভারতবর্ষ ১০৩-০৪, ১০৬, ১৩০, ১৪১, ১৪৩, ১৮৮, ২৮১-৮২, ২৮৯, ৩১৬, ৩১৮, ৩২১-২৩, ৩৩২, ৩৪০, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৮৯, ৪৪৬
ভার্গব ৮, ২৯, ৩৪, ২৫৭, ৩৮৩, ৪৩৩-৩৪
ভাস ২৬
ভিলসা ৪৪
ভীম ৭, ৮৮, ১০৬, ১০৮, ১৭১-৭২, ১৮৫, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৬৩
ভীমসেন ১২, ৩৪৭
ভীল ২৭৯
ভীষ্ম ৯৬, ৯৮, ১০৮, ১১৬, ১৪০, ১৯২, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৬, ৪০৩-৪২৯, ৪৩০-৩৮, ৪৪৫-৫৯, ৪৬২-৬৩, ৪৬৬-৬৭
ভৃজ্যু লাহায়নি ১৬০-৬১
ভূলোক ১৩৭

ভূমন্যু ৩২৪-২৬, ৩২৮
ভূরিশ্রবা ৪০৬
ভৃগু ২৯-৩৫, ১০২, ১৯৯-২০০, ২১২, ২৮৮, ৪৩৩
ভোজ ২৭৮, ৩৭৪-৭৫, ৩৮০-৮১, ৪৪২

ম

মগধ ৩৭০-৭৪, ৩৭৬, ৩৭৮-৭৯, ৩৮২, ৪০৬
মঝ্‌ঝিমনিকায় ৩৭২
মণিনাগ ৪৩
মণিবাহন ৩৭১
মৎস্য ৭৮, ২৭৬, ৩৪৬, ৩৭১, ৩৭৮, ৩৮৩, ৩৮৭-৮৮, ৩৯৪, ৪১০-১১
মৎস্য পুরাণ ৬০-৬২, ৬৫, ৬৭, ১৩০, ১৪৭-৪৮, ১৯৩, ৩১৬, ৩২৫-২৭
মথুরা ২৬, ৪৪, ২৭৯-৮০, ৩২১, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৭-৫০, ৩৫২, ৩৭২-৭৩, ৩৭৫-৭৭, ৩৭৯, ৩৮২-৮৩, ৩৯৭-৪০০, ৪০২, ৪৩৯-৪২
মদ্রদেশ ১৬০, ৩৮৭
মধু ৩৪৯-৫০
মধুপুর ৩৫০
মধুবন ৩৫০
মধোপুর ৩৫২
মনমোহন সিং ১১৭
মনু ১০, ১৮, ১০৪, ১১৭-১৮, ১২৪-১৩১, ১৮৫, ২৩০, ৩৪০, ৩৭২, ৩৯৯
মনুসংহিতা ১৮, ২০, ১৮৫
মন্থনরজ্জু ৬১
মন্দর ৬৩, ৬৭
মমতা ১১৮, ৩২৪-২৫, ৩২৭-২৮, ৪৫০
মমতা ব্যানার্জী ১১৭
মম্মটাচার্য ৮৫
ময়-দানব ৩০
মরীচি ১১৮
মরুৎ সোম যজ্ঞ ৩২৫
মরুত্ত ১১৮-২১, ২৮১, ২৮৩-৮৮, ২৯৬-৯৭, ৩২২, ৩২৭-২৮
মরুদ্‌গণ ২২৬
মর্ত্যলোক ১০৪, ২৩৮, ৩৫৫
মল্লার ৩১৯
মহাকাল ৯১
মহাদেব ৩৬, ৬৪-৬৫, ১২২, ১২৬, ১৬৫, ১৭১, ১৯৯-২০২, ৪৩৫-৩৭
মহাপ্রভু ৪৪১
মহাবংশ ৪০৬
মহাভারত
  আদিকাপর্ব ৮৩, ২৮৪
  বনপর্ব ৫০, ১৯৫, ৩৪১
  শান্তিপর্ব ৮৯, ১৩৯, ৪০৫
  উদ্যোগ-পর্ব ১০৯, ৩৫৬, ৪২২, ৪৩৪
  অনুশাসন ১২৬, ২৮৭
  সভাপর্ব ৩৭৯
মহাভিষ ৩৫৫, ৩৬২
মহাভোজ ৩৫০, ৩৮০
মহামন ২৮০
মহাস্পূর ৪০১
মহেন্দ্র ৪২১, ৪৩০
মহেশ্বর ৫৯, ৬৭, ১২৪, ১৫০, ১৫১
মাগধ ১০, ১৩২-৩৩
মাতলি ৭৮
মাথৈল্য ৩৭১
মাদ্রী ৩৮০, ৩৮৭
মাধব লবণ ৩৫০
মাধব্য ২৩২
মানস সরোবর ১০৪, ১৯৫
মান্ধাতা ২৮২, ২৮৭, ৩২২, ৩৪১
মাবেল্লা ৩৭০-৭১, ৩৮৬
মারীচ ১১
মারুত ৩৭১
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৮২-৮৪

মার্তিকাবত ৩৮০
মালিনী নদী ১-২, ২৯৩, ২৯৯
মাহিষ্মতী ২৮০, ২৮২, ২৮৬
মাহেশ্বরী বিদ্যা ৬৭
মিত্রাবরুণ ১২৭-২৮, ১৪৮-৪৯, ১৫১
মিথিলা ৪০৬
মিলান্দার ৩৬৯
মিরাট ৩৩০
মিলিন্দপন্‌হো ৩৬৮
মুঙ্গের ৪৫১
মুদ্‌গল ৩৩১
মৃত-সঞ্জীবনী ৬৮, ১০৫
মেকলা ১৬৯
মেগাস্থিনিস ৩৪৮, ৩৫০
মেঘদূত ২৩৩, ৩৫৩, ৩৬৭
মেনকা ৫৭, ১১৪, ১৪৫-৪৭, ১৫০-৫১, ২৯৭-৯৯, ৩১১-১৩
মোক্ষ ৮৫-৮৬
মৌদ্‌গল্যায়ন ৩৩১
ম্যাক্সমুলার ১৪২

য

যক্ষ ৮১, ৯৭
যক্ষ-রক্ষ ২৫
যর্জুবেদ ১
যতি ১৯৪, ২৩০, ২৩২
যদু ১৫, ২৬৪, ২৭১-৭৭, ২৭৮-৮১, ২৮২, ২৮৬, ৩২০-২১, ৩২২, ৩২৮, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৪৮-৫০, ৩৫২, ৩৭০-৭১, ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৯৮-৪০১
যবন ২৮৭-৮৮
যবীনর ৩৩১
যম ৭৯, ৮২, ১৭৪, ১৮২, ১৯২, ২৬০
যমসভা ৮১
যমী ১৯২
যমুনা ২৫-২৬, ১৫১, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৭-৮৯, ৩১৯-২১, ৩৩০, ৩৪১, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৭৭-৭৮, ৩৮২-৮৩, ৩৮৫, ৩৮৭-৮৮, ৩৯০-৯২, ৩৯৯, ৪১০, ৪৫৪
যযাতি ১৯৪, ২৩০-৩১, ২৩২-৩৫, ২৩৮, ২৪৮-২৫৪, ২৫৫-৭৫, ২৭৭-৮১, ২৮৫, ২৮৯, ৩৩১, ৩৪৭-৪৮, ৩৫০, ৩৬০
যশোমতী ৪৪৪
যাজ্ঞবল্ক্য ৮১, ১৬০
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩২৯
যাদব ২৭৮-৮০, ২৮৬-৮৮, ৩২০, ৩৩৩, ৩৪৭-৪৮, ৩৭৩-৭৪, ৩৭৬-৭৭, ৩৭৯, ৩৯৮, ৪৫০
যাদবী ২৮৮
যাস্ক ৩২, ৯৩-৯৪, ৩৭১
যুক্তিদীপিকা ৯৭
যুধাজিৎ ৩৮০
যুধিষ্ঠির ১১, ১৩-১৫, ৩৬, ৩৮, ৪৫, ৫০, ৮২, ৯৬, ১০৬, ১০৮, ১৭১-৭৩, ১৮৩-৯০, ১৯৫, ২৮১, ৩২২, ৩২৮, ৩৩১-৩২, ৩৪১, ৩৭৯, ৪০৫-০৬
যুবনাশ্ব ২৮২
যুযুৎসু ২৬২
যুযুধান ৩৮০
যোগমায়া ৪৪৪
যোজনগন্ধা ৩৯০

র

রজি ১৭৩, ১৯৬-৯৯
রত্নগিরি ৩৭৩
রদাঁ ৩৬
রথবীতি ২২৩-২৪, ২২৬
রঘু ১৯, ৭৭
রবীন্দ্রনাথ ১৫১, ১৫৬, ২১৮-২০, ২২৮, ২৯০-৯১, ৩০৭
রমাপ্রসাদ চন্দ ৩৬৮

রমেশচন্দ্র মজুমদার ২৭৪-৭৫, ২৭৭
রম্ভা ১১৪, ১৪৫-৪৭, ১৫০
রাক্ষসমেধ যজ্ঞ ৩৮৪
রাজগির ৩৭২
রাজগিরি ৩৭২
রাজলক্ষ্মী ৭৮, ৯১-৯২
রাজশাহী ১৬৬
রাজর্ষি ৪২০
রাজসূয় যজ্ঞ ১১০, ৩১৮, ৩২২, ৩২৮
রাজস্থান ৩৫২, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৮
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২৩১
রাপ্তী ২৮০
রাবণ ৩০, ১০০, ১৭৯
রামচন্দ্র ৮৬, ১২৪, ১৬৬, ২৮২, ৩২৬ ৩৪৯-৫০
রামপ্রসাদ ৮৫
রামমোহন ২৫৮
রামানন্দ ৪৪১
রামায়ণ ১৮, ৩৪, ৭৭, ১৬৬, ১৭৯, ১৮৮, ২২৫, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৭১
বাল্মীকি ১০০, ২২৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২১৫
রাশিয়া ১০৩
রাষ্ট্রপাল ৩৭৭
রাহু ৬৬
রুক্মিণী ৩৪৯
রুরু ৩৩-৩৫
রূপ গোস্বামী ৩৪৯-৪৪১
রেবতী ১৬৭
'রেবতীর পতিলাভ' ১৬৭
রোমহর্ষণ ২৯
রোহিণী ৯৮-১০০, ১০৯, ৪০১, ৪৪৪
রোহিলখণ্ড ৩৩২

ল

লক্ষ্মী ৬৪-৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, ১০১, ১১০-১১, ১৪৭, ১৫১, ১৯৯
লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর ১৫০-৫১
লখনউ ২
লবটুলিয়া ৩৭২
ললিতমাধব ৩৪৯, ৪৪১
ললিত্থ ৩৮৭
লাঠোর ৩৮৭
লোমপাদ ৩৪৯
লোমহর্ষণ ৩-৪, ১০, ৫৪, ৫৬, ১০৬
লৌমহর্ষণি ৪-৫

শ

শক ২৮৭-৮৮
শকুন্তলা ১, ১১, ১৩৯, ২৩২, ২৪৯, ২৬৭, ২৮৯-৯১, ২৯৩-৩১৭, ৩৬৫
শক্রি ১০০, ৩৮৩-৮৪
শঙ্কর ১০৯, ১২৫
শঙ্করাচার্য ৮৪, ৮৭, ৯৪, ৯৭, ২৭৬
শঙ্কু ৩৭৭
শচীদেবী ৩০, ৮১, ১৭৪-৮৩, ১৯৮
শতদ্রু ২৭৫-৭৭
শতপথ ব্রাহ্মণ ১০১, ১৪১-৪২, ১৫২-৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১-৬২, ২৫২, ২৭৭, ২৯৬, ৩১৮-২০, ৩৩২
শতরূপা ১৯১
শতনীক ৭৮, ৩২০
শতায়ু ১৬২
শফঙ্ক ৩৮০
শমী ৩৮০
শমীক ৪১-৪৩, ৪৫-৪৬, ৪৮-৪৯
শম্বর ৬১
শম্ভু ২০৪
শরশয্যা ৯৬
শর্মিষ্ঠা ২২৮-২৯, ২৩৩, ২৩৬-৪২ ২৪৪-৫২, ২৫৬, ২৫৮-৭১
শর্যাতি ১২৪

শশবিন্দু ২৮২, ২৮৭, ৩৪৭-৪৮, ৩৭৪
শার্ঙ্গরব ৩০৮
শণ্ডিল্য ৭৮
শান্তনু ৯৮, ১০৮, ৩৫১, ৩৫৫-৫৬, ৩৭৩-৭৬, ৩৮২, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯০-৯৩, ৪০১, ৪০৩-০৫, ৪০৯, ৪৩১-৩২, ৪৪৫-৪৭, ৪৫৩, ৪৫৭
শান্তিদেবা ৪০২
শালওয়ার ৪১০
শাল্ব ৩৭৮, ৪১০, ৪১২-২১, ৪২৩-২৮ ৪৩০
শিখণ্ডী ৪২১-২২, ৪৩৫-৩৮
শিনি ৩৮০-৮১
শিব ৫০, ৭৫, ৮১, ৮৫-৮৭, ১২২, ১৬৫-৬৬, ১৭০, ১৮১, ১৮৮
শিবি ৩৫৫
শিশুপাল ৩৪৯, ৩৬৮, ৪০২
শুকদেব ৪৭, ১৯১-৯৩
শুক্তিমতী ৩৪৮, ৩৬৭-৭০
শুক্রাচার্য ৫৯, ৬৭-৬৮, ৭০, ১০৫, ১১৬, ১১৮, ১২২-২৩, ১৯৯-২২৭, ২২৯, ২৩৪, ২৩৬-৪৩, ২৪৪-৫৮, ২৬০-৬১, ২৬৩, ২৬৬-৭৩, ৩৬৫, ৪০৫
শুনক ৩৪
শূর ৩৪৮, ৩৮০, ৪০০-০২
শূরসেন ২৭৯, ৩৩২, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৭২-৭৩, ৩৭৫-৭৭, ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৯৭-৯৯, ৪০২
শূরসেনী ২৮২, ৪০০
শৃঙ্গী ৪১-৪২, ৪৫-৪৬, ৪৮-৪৯
শেকসপীয়ার ৪৩২
শেফার ২৭৯
শৈখাবত্য ৪১৯-২০, ৪২৩-২৪, ৪২৬, ৪২৮
শৈনেয় ৩৭৯
শৈব্যা ৩৪৮
শৈশুনাগ ৩৭১
শোনাশ্ব ৩৮০
শৌনক ১-৪, ১০, ১৪-১৬, ২৮-২৯, ৩৩-৩৫, ৪৩, ১৪৮
শৌরশেনী ৩২১
শ্যাবাশ্ব ২২৩-২৪, ২২৬-২৭
শ্যামা ২৯০
শ্রাবস্তী ২৮০, ৪০৭
শ্রীদেবা ৪০২
শ্রীহরি ৭, ৬৪, ৬৮
শ্রুতশ্রবা ১৩, ৫০, ৪০২
শ্রুতসেন ১২

ষ

ষাঁড় ১৮১

স

সওয়াই ৩৫২
সংফাস্‌স ২৮০
সংবর্ত ১১৮-১২১, ২৮৪-৮৫, ৩২৪, ৩২৭-২৮
সংবাদসূক্ত ১৪২
সংযাতি ১৯৪
সাংকাশ্য ২৮০
সক্রেটিস ৮৭
সগর ২৮৮
সঞ্জীবনী ৬৭, ২০১-০৭, ২১১-১৫, ২১৭, ২২০, ২২৭, ২৩৪, ২৩৮, ২৪০
সন্তান ৩৫০
সত্বান্ ৩৭৪
সত্যক ৩৮০, ৩৯৮
সত্যকাম (জাবাল) ১৩০
সত্যপ্রসব ২৩১
সত্যবতী ৩৮৬-৮৮, ৩৯০, ৩৯৩-৯৬,

৪০৩-০৪, ৪০৬-০৭, ৪০৯, ৪১২-১৪, ৪৩০-৩২, ৪৪৫-৬৭
সত্যভামা ৩৫০, ৩৮০
সত্যযুগ ৩৬
সত্রাজিৎ ৩৮০
সনক ১২৫
সনৎকুমার ১৩৫, ১৪১
সনন্দ ১২৫
সন্তানক ৫৭
সমন্তপঞ্চক ৫
সমুদ্রগুপ্ত ৪৪
সমুদ্রমন্থন ৫৬-৫৭, ৫৯-৬৫, ৬৭-৬৮, ৭১-৭২, ৭৪, ১০০, ১৪২, ১৫০
সমৃমিপ ৩৭৭
সম্বরণ ৩৩৩-৪২, ৩৪৭, ৩৬৭
সম্মতা ২৮৪
সম্ভব-জাতক ৪০৬
সরযূ ২৭৫, ২৮৫, ৩৭২
সরস্বতী ৩৭-৩৮, ৮১, ১০০, ২১৫, ২২৫
সর্পনাগ ২৫
সর্পযজ্ঞ ১২, ১৪-১৬, ২৭-২৮, ৩৫-৩৬, ৫১-৫২, ১০৫-০৬, ১৮৪
সর্বদমন ৩০৫-০৬, ৩১৬
সহজন্যা ১৪৬-৪৭
সহদেব ৩৪০-৪১
সহদেবা ৪০২
সহস্রজিৎ ২৮২
সহস্রানীক ৭৮-৭৯
সাংখ্যকারিকা ৯৮, ১০০
সাংখ্যদর্শন ৯৫, ৯৭
সাইবেরিয়া ১০৩
সাতকর্ণী ১৩২
সাতনা রেওয়া ২৮১-৮৬, ২৮৯, ৩৪০
সাতবাহন ১৩১
সাত্বত ৩২০, ৩৩২-৩৩, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৭৪, ৩৮০
সাত্রাজিত ৩২০
সাবিত্রী ১৯১
সায়নাচার্য ১৫৬
সার্বভৌম-মহাভৌম ৩৪৭
সিদ্ধবাবা ১
সিনীবালী ১১০
সিন্ধু ৮১, ১৯৫, ২৫৭, ২৭৫-৭৬, ৩৩৯, ৩৭৮
সিম্বলিজম্‌ ৩৬
সুক্‌থঙ্কর ২৯
সুকুমারী ভট্টাচার্য ২৯
সুতনু ৩৭৭
সুদাস ২৭৫, ২৭৭, ৩৩৩, ৩৩৯-৪২
সুদেষ্ণা ৪৫১, ৪৬৬
সুদ্যুম্ন ১২৬-৩১, ১৪৩
সুধন্ব ১৬০
সুধন্বা ৩৬৯-৭০, ৩৬৭, ৩৭৬
সুনন্দা ৩৫৪
সুনামা ৩৭৭
সুনাম্মী ৪০১
সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী ১১৭
সুপর্ণ ৪৫
সুপ্রতীক ২
সুবর্ণা ৩২৯
সুবাহু ৩৫০
সুবোধ ঘোষ ৩৩
সুমতি ১২০
সুমিত্র ৩৮০
সুমেরু ৫৬-৫৭, ৫৯
সুখামুন ৩৭৭-৭৮

সুর ৬৭
সুরভি ৬৪, ৭২
সুশ্রুত ৬৮
সুহোত্র ৩২৮-৩০
সুক্ষ্ম ৪৫১
সুণার্কর্শ ৪৩৬-৩৭
সূত ৪, ১১
সূতজাতি ৩, ১০
সূর্য ৭৪, ৮৮, ৯০, ৯৭, ১২৪-২৫, ১৩০, ১৪২, ১৭৪, ২৮২, ৩৩৪-৩৫, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৮৩
সূর্য-বিবস্বান্ ১২৫
সৃঞ্জয় ৩৩১-৩৩, ৩৪৩, ৩৫০, ৪২১-২৪, ৪৩৬
সেমেটিক সভ্যতা ১৮৪
সেনাগিরি ৩৭২
সোম ৭৪, ২৬০
সোমক ৩৩২, ৩৪০-৪৭
সোমতীর্থ ২৯৩
সোমদেব-ভট্ট ৭৭
সোমনস্‌স ৩৪৭
সোমবংশ ১৭৩
সোমযজ্ঞ ১০
সোমরস ৬৬, ১০৯, ২১৫
সোমশ্রবা ১৩, ৫০, ১৮৪
সৌত্রামণি ২১৫-১৬
সৌভ ৪১০, ৪১৩-১৪
সৌভরি ১৮
স্কন্দগুপ্ত ৪৪
স্কন্দপুরাণ ৩৪
স্বয়ংবর ২৮২, ৪০৮, ৪১১-১৩, ৪১৭-১৮, ৪২২-২৩, ৪২৭
স্বয়ম্ভোজ ৩৮০
স্বর্গপুরী ১৫৪
স্বর্গরাজ্য ৩২৭
স্বর্ভানবী ১৬৭, ১৭৩, ১৯৬
স্বর্ভানু ১৬৭, ১৯৬
স্বর্ণপ্রস্থ ১৩১
স্বর্ণযুগ ৩৪৮
স্বর্ণলঙ্কা ৩০
স্ট্রাবো ১৩২
হকিং, স্টিফেন ৫৬
হরপ্রসাদ ৩০৭
হরিণকেতন রথ ১৪৮
হরিদাস ৪৩৩
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ৬৩
হরিবংশ ৬৭, ১২৩-২৪, ১২৮, ১৩০, ১৯১-৯৩, ২৮৩-৮৪, ৩১৬, ৩২৬, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৭৫, ৩৭৭-৭৯, ৩৯৮, ৪০০, ৪০২, ৪৪০-৪১, ৪৪৩-৪৪
হরিবর্ষ ১৩৩
হরিশচন্দ্র ১৯, ২৮২
হরিহর-ভবানী স্তোত্র ৮৭
হর্যশ্ব ২৮৭, ৩৩১
হলিক ৫১, ৬২
হস্তিনাপুর/নগরী ১৩, ২৬, ৩৫, ৪০, ৪৫-৪৬, ৫০, ১৩১, ২৮৯, ৩০৬, ৩২৮-৩৫, ৩৩৮-৪২, ৩৪৭, ৩৫২-৫৪, ৩৫৬, ৩৬১-৬৪, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭২-৭৬, ৩৮২, ৩৮৮-৮৯, ৩৯০-৯২, ৩৯৫, ৪০১-০২, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৯, ৪১২-১৫, ৪১৭, ৪২৩, ৪২৫, ৪২৮, ৪৩০-৩৩, ৪৩৭, ৪৪৫-৪৬, ৪৪৯, ৪৫৩-৫৪, ৪৫৮, ৪৬২, ৪৬৬-৬৭
হস্তিপদ ৪৫
হস্তিপিণ্ড ৪৩, ৪৫
হস্তী ২৮৯, ৩২৯-৩৯
হালওয়ার ৪১০
হিউয়েন সাঙ ৪০০
হিড়িম্বা ৩৬৩

হিন্দুস্থান ৮০
হিরন্মতী ৪০৪
হিরণ্বতী ৩৪২
হিরণ্যকশিপু ১৯৯
হিরণ্যপুর ১৪৬-৪৭
হিরণ্যবর্মা ৪৩৬
হিলেব্রানডট্ ১৫৯
হুণ্ডদৈত্য ১৬৬-১৭০
হৃদিক ৩৮০
হেমকূট ১০৩, ১৪৮
হেমচন্দ্র ৩৪১-৪২
হেরাক্লিটাস ৮৪
হেসিয়ড ৮৮
হৈহয় ২৮২-৮৪, ২৮৬-৮৯, ৩২০, ৩৪৭, ৪৫০
হোমধেনু ২১৮
হোত্রবাহন ৪২০-২৭, ৪৩৬-৩৭
হোমার ৮৪, ৮৮